আল-মুকাদ্দিমা প্রথম খণ্ড

ইবনে খালদুন

অনুবাদ । গোলাম সামদানী কোরায়শী

আল-মুকাদ্দিমা

[প্রথম খণ্ড]

দিব্যপ্রকাশ

www.amarboi.org

আল-মুকাদ্দিমা

[প্রথম খণ্ড]

ইবনে খালদুন

গোলাম সামদানী কোরায়শী
অনূদিত

www.amarboi.org

তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০১২
প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭
প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮২

দিব্যপ্রকাশ

আল্ মুকাদ্দিমা (১ম খণ্ড)
ইবনে খালদুন

প্রকাশক
দিব্যপ্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২১৫৭৪
dibyaprakashbooks@gmail.com

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মঈনুল আহসান সাবের

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন, ঢাকা

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

অনলাইনে বই পেতে
www.rokomari.com

মূল্য : ৬৫০ টাকা US $ 30

AL-MUQADDIMAH-VOL I : Bengali translation of Ibn Khaldun's 'Al-Muqaddima' from 'Kitabul Ibar' by Ghulam Samdani Quraishy. First Published in Bengali 1982. First Dibyaprakash edition : February 2007. Cover design : Moinul Ahsan Saber. Price Tk. 650

ISBN 984 483 259 4

www.amarboi.org

বিষয়সূচি

আল্লামা ইবনে খালদুন ১৩
আল-মুকাদ্দিমা : আলোচনা ৪৮
অনুবাদ প্রসঙ্গ ৫৮
প্রারম্ভ স্তুতি ৬৫
ইতিহাস প্রসঙ্গ ৬৭
উৎসর্গ ৭৪

ভূমিকা

ইতিহাসের বিষয় গুরুত্ব, তাঁর বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ এবং ইতিহাসবিদদের সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতির বিবরণ ও কারণ; বনি ইসরাইলের সৈন্যসংখ্যা; তুব্বা রাজন্যবর্গের দিগ্বিজয়; ইরাম নগরীর কাহিনী; বরমেকীদের পতন; আকসামের মদ্যপান; মামুনের প্রেম; উবায়দী বংশধারা; ইদরিসী বংশধারা; আল মেহেদীর বংশধারা; ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব; শিক্ষকতা প্রসঙ্গ; বিচারক প্রসঙ্গ; ভুল বর্ণনা পদ্ধতি; প্রতিবর্ণীকরণ সমস্যা; প্রাথমিক বক্তব্য। ৭৫

প্রাথমিক বক্তব্য ১১৩

প্রথম অধ্যায়

[সমগ্র মানব সভ্যতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রস্তাবনা] ১২৩

প্রথম প্রস্তাবনা ১২৫

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা	:	সভ্যতা অধ্যুষিত ভূভাগ এবং তন্মধ্যস্থ সমুদ্র, নদনদী ও বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে ১৩০
দ্বিতীয় প্রস্তাবনার সংযোজন	:	পৃথিবীর দক্ষিণ চতুর্থাংশ অপেক্ষা উত্তর চতুর্থাংশের জনবসতির আধিক্য ও তার কারণ ১৩৬
ভূচিত্রের বিশদ বিবরণ[২৩]	:	প্রথম অঞ্চল; দ্বিতীয় অঞ্চল; তৃতীয় অঞ্চল, চতুর্থ অঞ্চল; পঞ্চম অঞ্চল; ষষ্ঠ অঞ্চল; সপ্তম অঞ্চল ১৪০
তৃতীয় প্রস্তাবনা	:	নাতিশীতোষ্ণ ও শীতোষ্ণ অঞ্চলসমূহ; মানুষের গাত্রবর্ণ ও তাদের অন্যবিধ বহু অবস্থার উপর বায়ুর[৬৪] প্রভাব সম্পর্কে ১৭৫
চতুর্থ প্রস্তাবনা	:	মানব চরিত্রের উপর বায়ুর প্রভাব সম্পর্কে ১৮০
পঞ্চম প্রস্তাবনা	:	মানব সভ্যতায় খাদ্যের প্রাচুর্য ও ক্ষুধাজনিত বিভিন্ন অবস্থা এবং মানবদেহ ও চরিত্রের উপর তৎসৃষ্ট প্রভাব সম্পর্কে ১৮২

www.amarboi.org

ষষ্ঠ প্রস্তাবনা : স্বাভাবিকভাবে অথবা সাধনার দ্বারা অদৃশ্য জগৎকে উপলব্ধিকারী মানুষের প্রকারভেদ এবং তৎপূর্বে আলোচ্য প্রত্যাদেশ ও স্বপ্নদর্শন সম্পর্কে ১৮৭

নবুয়তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা : মানবীয় জীবাত্মার প্রকারভেদ; ওহী; ইন্দ্রজাল; স্বপ্ন দর্শন; অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান; ভবিষ্যদ্বক্তা; বাহলূল গোষ্ঠী; বালুকা লিখন; নীম গণনা ১৯৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

[যাযাবরী জীবন, বর্বর জাতি ও উপজাতি, তাদের জীবনান্তর্গত বিভিন্ন অবস্থা এবং এতদসম্পর্কীয় কতিপয় পরিচ্ছেদ ও বিশদ বিবরণ] ২২৭

প্রথম পরিচ্ছেদ : যাযাবরী ও নাগরিক জীবন উভয়েই স্বাভাবিক ২২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আরব[১] বেদুইন জীবন সৃষ্টির দিক থেকে স্বাভাবিক ২৩১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যাযাবরী জীবন নাগরিক জীবন অপেক্ষা প্রাচীন ও পূর্ববর্তী এবং প্রান্তর সভ্যতা ও জনপদের ভিত্তি ও সঞ্চয়াগার ২৩৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রান্তরবাসীরা নগরবাসীদের অপেক্ষা সততায় অধিকতর নিকটবর্তী ২৩৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নগরবাসিগণ হতে প্রান্তরবাসীরা শৌর্যবীর্যে অধিকতর নিকটবর্তী ২৩৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : নীতিনিয়মের সহায়তা নগরবাসীদের সংগ্রামমুখিতা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বিলোপ করে ২৪০

সপ্তম পরিচ্ছেদ : একমাত্র গোত্রপ্রীতির অধিকারী গোত্রগুলোই প্রান্তরে বসবাস করতে সক্ষম ২৪৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ : গোত্রপ্রীতি একমাত্র রক্তসম্পর্ক ও তার সমস্থানীয় সম্বন্ধ থেকেই অস্তিত্বে আসতে পারে ২৪৫

নবম পরিচ্ছেদ : সুস্পষ্ট বংশধারা কেবল তৃণশূন্য প্রান্তরবাসী বন্য প্রকৃতির আরব বেদুইন এবং তাদের সমস্থানীয় অন্যান্যের মধ্যে পাওয়া যায় ২৪৭

দশম পরিচ্ছেদ : বংশধারায় মিশ্রণ কীভাবে ঘটে ২৪৯

একাদশ পরিচ্ছেদ : নেতৃত্ব সর্বদা গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন বংশের একটি বিশেষ অংশেই বিরাজ করে ২৫১

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন অংশের নেতৃত্ব তাদের বংশ ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয় ২৫২

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : গোত্রপ্রীতির অধিকারীদের জন্যই বাস্তব কৌলীন্য ও যথার্থ বংশমর্যাদার অবকাশ আছে এবং অন্যদের বেলায় তার স্বরূপ আলংকারিক ও রূপক ২৫৫

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : আশ্রিত পোষ্য ও অনুগতদের কৌলীন্য ও মর্যাদা তাদের প্রভুদের অনুরূপ বিষয়াদি অনুসারেই হয়ে থাকে; তাদের নিজেদের বংশধারা অনুসারে নয় ২৫৮

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : একই বংশধারায় বংশমর্যাদার স্থায়িত্ব মাত্র চার পুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ২৬০

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : বর্বর জাতিগুলোই প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবান ২৬৩

www.amarboi.org

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : গোত্রপ্রীতির শেষ লক্ষ্য হল রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ২৬৫
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধাসমূহের অন্যতম হল কোন গোত্রের বিলাসব্যসন ও প্রাচুর্যের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া ২৬৭
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধাসমূহের অন্যতম কোন গোত্রের হীনমন্যতা ও অপরের প্রতি আনুগত্য ২৬৮
বিংশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তির নিদর্শনসমূহের মধ্যে সচ্চরিত্রের প্রতিযোগিতা অন্যতম এবং এর বিপরীত অবস্থা ২৭১
একবিংশ পরিচ্ছেদ : বর্বর জাতিগুলোর সাম্রাজ্য সীমাই অধিকতর বিস্তৃত হয়ে থাকে ২৭৪
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : কোন বংশের মধ্যে গোত্রপ্রীতি অক্ষুণ্ন থাকলে তার একটি শাখা থেকে রাজ্য চলে গেলেও পুনরায় অন্য একটি শাখায় ফিরে আসবে ২৭৫
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : বিজিত সর্বদাই বিজয়ীর বৈশিষ্ট্য, পরিচ্ছদ, পেশা এবং অন্যান্য যাবতীয় অবস্থা ও অভ্যাসের অনুসরণ করে থাকে ২৭৭
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ : কোন জাতি পরাজিত হয়ে অন্যের অধীনস্থ হলে তার বিলুপ্তি দ্রুততর হয় ২৭৯
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : আরব বেদুইনরা কেবল প্রান্তরীয় অঞ্চলগুলোতেই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে ২৮১
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ : আরব বেদুইনরা যে জনপদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তার বিনষ্টি দ্রুততর হয় ২৮২
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : সাধারণভাবে আরব বেদুইনরা কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য যেমন নবী বা পুণ্যাত্মার স্মৃতি অথবা মহান ধর্মীয় ঐতিহ্যের মাধ্যম ব্যতীত রাজ্য লাভে সক্ষম হয় না ২৮৪
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ : আরব বেদুইনরা রাজ্য শাসনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুপযুক্ত ২৮৫
ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : প্রান্তরবাসী গোত্র ও সম্প্রদায়গুলোর জীবন পল্লীবাসীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ২৮৭

তৃতীয় অধ্যায়

[সাধারণ সাম্রাজ্য, রাষ্ট্রশক্তি, খেলাফত ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় বিভিন্ন পদমর্যাদা এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিচিত্র অবস্থা। এতে নীতিমালা ও পরিপূরক গুণাবলি সম্পর্কীয় আলোচনা বিদ্যমান] ২৮৯
প্রথম পরিচ্ছেদ : সাধারণ সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তি একমাত্র গোত্রশক্তি ও গোত্রপ্রীতির সাহায্যেই লাভ হয়ে থাকে ২৯১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যখন কোন সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত হয়, তখন গোত্রপ্রীতির প্রয়োজনীয়তা ফুরায় ২৯২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত গোত্রের কোন অংশের পক্ষে গোত্রপ্রীতি ব্যতীতই সাম্রাজ্য স্থাপন কখনও কখনও সম্ভব হয়ে ওঠে ২৯৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও বৃহৎ শাসন ক্ষমতার ভিত্তি হল নবুয়ত অথবা সত্য প্রচারজনিত ধর্মমত ২৯৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের প্রাথমিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মমত তার জনসংখ্যার অনুপাতে লব্ধ গোত্রপ্রীতিকে এক নতুন শক্তি দান করে থাকে ২৯৮

www.amarboi.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ধর্মমত প্রচার ও গোত্রপ্রীতির সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না ৩০০
সপ্তম পরিচ্ছেদ : প্রতিটি সাম্রাজ্যের জন্যই অঞ্চল ও স্থানের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, তা অপেক্ষা বেশি হয় না ৩০৪
অষ্টম পরিচ্ছেদ : যে কোন সাম্রাজ্যের আয়তন, বিস্তার ও স্থায়িত্ব তার জনশক্তির স্বল্পতা ও আধিক্যের অনুপাতে হয়ে থাকে ৩০৬
নবম পরিচ্ছেদ : অধিক গোত্র ও গোত্রশক্তিবিশিষ্ট অঞ্চলগুলোতে সাম্রাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা খুব কমই হয়ে থাকে ৩০৮
দশম পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তির স্বভাব হল যাবতীয় গৌরব নিজের জন্য কুক্ষিগত করা ৩১১
একাদশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তির স্বভাব হল বিলাসব্যসনে লিপ্ত হওয়া ৩১৩
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তির স্বভাব হল স্থিরতা ও শান্তি কামনা ৩১৪
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : যখন রাজ্যশক্তির স্বভাব একক গৌরব, বিলাসব্যসন ও স্থিরতায় সুদৃঢ় হয়, তখনই সাম্রাজ্যে ক্ষয় দেখা দেয় ৩১৫
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যও ব্যক্তির ন্যায় স্বাভাবিক জীবনকালের অধীন ৩১৮
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের প্রান্তরীয় অভ্যাস হতে নাগরিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া ৩২১
ষোড়শ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের প্রথমদিকে বিলাসব্যসন তাতে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করে থাকে ৩২৫
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের বিভিন্ন পর্যায় ও তার অবস্থাসমূহের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন পর্যায়ে অধিবাসীদিগের চরিত্রগত পরিবর্তন ৩২৬
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : প্রতিটি সাম্রাজ্যের মৌলশক্তির অনুপাতেই স্মৃতি নিদর্শন স্থাপিত হয়ে থাকে ৩২৯
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের অধিকারী আশ্রিতপোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহায্যে স্বীয় জাতি ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর উপর ক্ষমতা বিস্তার করে থাকে ৩৩৯
বিংশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যে আশ্রিতপোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবস্থা ৩৪১
একবিংশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যে অনেক সময় সম্রাটকে রাজকীয় ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত রাখা এবং তাঁর উপর অন্যান্য প্রভাব বিস্তারের ঘটনা দেখা দেয় ৩৪৩
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : সম্রাটের উপর অন্যান্য প্রভাব বিস্তারকারীরা তাঁর রাজকীয় উপাধিতে হস্তক্ষেপ করে না ৩৪৫
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তির তাৎপর্য ও তার প্রকার বৈচিত্র্য ৩৪৭
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ : অতিরিক্ত কঠোরতা রাজশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর এবং অনেক সময় তার বিলুপ্তির কারণ হয়ে থাকে ৩৪৯
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : খেলাফত ও ইমামতের অর্থ ৩৫১
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ : খেলাফতের পদমর্যাদা ও শর্তাদি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রচলিত মতপার্থক্য ৩৫৩
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : ইমামত সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতামত ৩৬২
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ : খেলাফতের রাজশক্তিতে পরিণত হওয়া ৩৭০
ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : আনুগত্য-শপথের তাৎপর্য ৩৮০
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ ৩৮২
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : খেলাফতের ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ ৩৯৪

www.amarboi.org

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : আমীরুল মোমেনীন উপাধিটি খেলাফতের একটি নিদর্শন এবং খলিফাদের সময় থেকে তা সৃষ্টি হয়েছে ৪০৫
ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ : খ্রিস্টধর্মের 'পোপ' ও 'পেট্রিআর্ক' উপাধি এবং ইহুদিদের 'কোহেন' নামের ব্যাখ্যা ৪১১
চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তি ও সরকারি বিভিন্ন পদমর্যাদা এবং তাদের পদবী ৪১৭
পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন সাম্রাজ্যে অসি ও মসি বিভাগের মর্যাদার পার্থক্য ৪৪৬
ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তির নিদর্শন ও শাসন ব্যবস্থার বিশেষ প্রতীক ৪৪৮
সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ এবং যুদ্ধ সংঘটনে বিভিন্ন জাতির অনুসৃত প্রক্রিয়া ৪৬৫
অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ : রাজকোষ এবং তার সমৃদ্ধি ও বিনষ্টির কারণ ৪৭৬
উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় শুল্ক ধার্য করা হয় ৪৭৮
চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : সম্রাটের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ প্রজাদের জন্য ক্ষতিকর এবং রাজকোষের জন্য সঙ্গতি বিনাশক ৪৮০
একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : সম্রাট ও তাঁর সভাসদদের সমৃদ্ধি লাভ সাম্রাজ্যের মধ্যভাগেই ঘটে থাকে ৪৮৩
দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : সম্রাট প্রদত্ত প্রাপ্যাদির সংকোচন রাজকোষের অসঙ্গতির পরিচয় বহন করে ৪৮৭
ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : উৎপীড়ন সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে ৪৮৮
চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যগুলোতে কী করে সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং তাদের অবক্ষয়ের সময় তা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় ৪৯৪
পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : একটি সাম্রাজ্যের দুইভাগে বিভক্ত হওয়া ৪৯৬
ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যে একবার অবক্ষয় দেখা দিলে তার আর নিবৃত্তি হয় না ৪৯৯
সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : কি করে সাম্রাজ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয় ৫০১
অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : প্রতিটি সাম্রাজ্য প্রথমে তার সীমা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত হয় এবং পরে পর্যায়ক্রমে সংকুচিত হয়ে বিনাশ ও ধ্বংস হয়ে যায় ৫০৫
উনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের নবায়ন ও নবপ্রতিষ্ঠা কী করে ঘটে ৫০৮
পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : নবোত্থিত রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে অধ্যবসায়ের পরিচয় দেয়; হঠাৎ আক্রমণ করে না ৫০৯
একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের শেষের দিকে জনবসতির প্রাচুর্য এবং অধিক মাত্রায় মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ৫১৩
দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : মানুষের সামাজিক বিষয়াদির শৃঙ্খলা বিধানের জন্য শাসননীতির প্রয়োজন ৫১৫
ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : ফাতেমী সাম্রাজ্য, এ সম্পর্কে মানুষের মতামত এবং তার রহস্য উদ্‌ঘাটন ৫২৭
চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্য ও জাতি সম্পর্কে পূর্বাভাস এবং তদন্তর্গত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা ও দিব্যজ্ঞান সম্পর্কে রহস্যোদ্‌ঘাটন ৫৫৩

চতুর্থ অধ্যায়

[বিভিন্ন দেশ ও নগরী; সমগ্র মানব সভ্যতা এবং তাতে ক্রিয়াশীল আগত ও অনাগত অবস্থাসমূহ] ৫৭১

www.amarboi.org

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	সাম্রাজ্য শহর-নগরের পূর্ববর্তী এবং এগুলোর রাজশক্তির দ্বিতীয় ফসল ৫৭৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	রাজশক্তি নাগরিক জীবনের দিকে আকর্ষণ করে ৫৭৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	একমাত্র সমৃদ্ধ রাজশক্তিই বিরাট নগরী ও সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করতে সক্ষম ৫৭৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	বৃহৎ ও ব্যাপক সৌধকীর্তি স্থাপন কোন একক সাম্রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয় ৫৭৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	নগর পরিকল্পনায় যে সকল বিষয় লক্ষ রাখা দরকার এবং তৎপ্রতি উদাসীনতা যে পরিণামের সৃষ্টি করে ৫৮০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	মসজিদ ও পৃথিবীর মহান সৌধরাজি ৫৮৪
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	আফ্রিকিয়া ও মাগরিবে শহর-নগরের সংখ্যা খুবই কম ৫৯৬
অষ্টম পরিচ্ছেদ	:	ইসলামের নিজস্ব সাম্রাজ্যশক্তি এবং তার পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর তুলনায় তার স্থাপত্য ও নির্মাণ শিল্প অত্যন্ত কম ৫৯৮
নবম পরিচ্ছেদ	:	আরবদের নির্মিত সৌধাবলির অল্পসংখ্যক ব্যতীত সমুদয়ই অতি সত্বর ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে ৫৯৯
দশম পরিচ্ছেদ	:	শহর-নগরে অবক্ষয়ের লক্ষণ কী করে প্রকাশ পায় ৬০০
একাদশ পরিচ্ছেদ	:	শহর-নগরের সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক তৎপরতার শ্রেষ্ঠত্ব তাদের অধিবাসীদের সংখ্যার আধিক্য এবং স্বল্পতা অনুসারেই হয়ে থাকে ৬০১
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	:	নগরসমূহের দ্রব্যমূল্য ৬০৫
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	:	প্রান্তরবাসীদের পক্ষে জনবসতিবহুল নগরীতে বসবাস করা অসুবিধাজনক ৬০৮
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	:	সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের দিক থেকে বিভিন্ন অঞ্চল ও নগর জীবন একই প্রকার ৬০৯
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	:	নগর পরিবেশে কৃষিখামার ও ভূসম্পত্তি সংগ্রহ এবং তার উপকারিতা ও উৎপাদন ৬১২
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ	:	নগরের পুঁজিপতিদের জন্য জাঁকজমক ও প্রতিরোধ শক্তি থাকা প্রয়োজন ৬১৪
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	:	নাগরিক সভ্যতা সাম্রাজ্যেরই অবদান এবং তার ধারাবাহিতকা ও দৃঢ়তাতেই সভ্যতার সমৃদ্ধি ৬১৫
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	:	নগর সংস্কৃতি সভ্যতার শেষ পর্যায়, এর আয়ুষ্কালের অন্তিম এবং এর বিকৃতির লগ্ন নির্দেশক ৬১৯
উনবিংশ পরিচ্ছেদ	:	যে নগরগুলো রাজশক্তির কেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করে, সাম্রাজ্যের পতন ও অবক্ষয়ে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হয় ৬২৪
বিংশ পরিচ্ছেদ	:	কোন কোন নগর অন্য নগর অপেক্ষা বিশেষ শিল্পকর্মের দ্বারা চিহ্নিত হয় ৬২৮
একবিংশ পরিচ্ছেদ	:	নগর জীবনে গোত্রপ্রীতির অস্তিত্ব এবং নগরবাসীর কতকাংশের অপর কতকাংশের উপর প্রাধান্য বিস্তার ৬২৯
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ	:	নগরবাসীদের ভাষা ৬৩১

www.amarboi.org

অবতরণিকা

আল্লামা ইবনে খালদুন
আল-মুকাদ্দিমা ও অনুবাদ প্রসঙ্গ

www.amarboi.org

www.amarboi.org

আল্লামা ইবনে খালদুন

['হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে']

সর্বকালের স্মরণীয় প্রতিভা ও ঐতিহাসিক দর্শনের জনক আল্লামা ইবনে খালদুন তিউনিসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ৭৩২ হিজরির ১ রমজান (২৭ মে, ১৩৩২ খ্রি:) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম ওলী উদ্দিন আবু যায়েদ আবদুর রহমান ইবনে মুহম্মদ ইবনে খালদুন আল-হাযরামী। এ নামের মধ্যে 'ওলী উদ্দিন' তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত উপাধি; যার অর্থ হল 'ধর্মের অভিভাবক'। আবু যায়েদ তাঁর ডাকনাম; মূল নাম আবদুর রহমান এবং তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ। তাঁর পিতামহের নামও ছিল মুহম্মদ। ইবনে খালদুন তাঁর পারিবারিক নাম আর এ নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত। এর মূলে 'খালদুন' পরিবারের সর্বব্যাপী সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্রিয়াশীল ছিল। দীর্ঘকাল ধরে এ পরিবার স্পেনে ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে ও খ্যাতি ও প্রতিপত্তি গড়ে তুলেছিলেন। তবে ইবনে খালদুনের পূর্বপুরুষ 'খালদুন' নামীয় এ ব্যক্তিটি ঠিক কত পুরুষ পূর্বে সশরীরে বর্তমান ছিলেন, সে সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। এমনকি এ খালদুনই দক্ষিণ আরবের হাদ্রামাত থেকে স্পেনে এসেছিলেন কিনা, তাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি। তবু এ কথা ঠিক যে, ইবনে খালদুনের পূর্বপুরুষরা একসময়ে দক্ষিণ আরবের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁর 'আল-হাযরামী' উপাধির মধ্যে সে ইতিহাসেরই ইঙ্গিত বিদ্যমান। সম্ভবত তাঁর এ বংশগত পরিচয়ের কল্যাণেই তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার আরব-বেদুইন গোত্রগুলোর উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তারের অধিকারী হন।

যদ্দুর জানা যায়, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে স্পেন বিজয়ের সময় ইবনে খালদুনের পূর্বপুরুষ ভাগ্যান্বেষণে স্পেনে গিয়ে উপস্থিত হন। স্পেনীয় ঐতিহাসিক ইবনে হজমের মতে খালদুনের এ পূর্বপুরুষের নাম ছিল 'খালেদ' এবং এ খালেদ শব্দটিই 'খালদুন' উচ্চারিত হয়ে শেষ পর্যন্ত 'খালদুন'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য ইবনে খালদুন স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। বরং তিনি যেভাবে খালদুন বংশের প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষ থেকে নিজেকে অধস্তন দশম পুরুষ ধরে সংখ্যা গণনা করেছেন, তা সন্দেহের উদ্রেক করে। কারণ আল-মুকাদ্দিমায় এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বর্ণিত নিয়ম অনুসারে এক শতাব্দীতে তিন পুরুষ ধরলেও এ সংখ্যা নিতান্তই কম বলে মনে হয়।

www.amarboi.org

সে যাই হোক, স্পেনে আসার পর খালদুনের সেই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ 'কারমোনা'তে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তখন এ পরিবারটির সদস্যরা ভাগ্যান্বেষণের কোন্ পর্যায়ে ছিলেন তা জানা না গেলেও খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ দিকে কুরাইব ইবনে খালদুনের আবির্ভাবে এ পরিবারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইনি তৎকালীন উমাইয়া শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শেভিলায় একটি অর্ধস্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। প্রায় একদশক রাজ্য শাসনের পর ৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে উক্ত কুরাইব নিহত হলেও বলতে গেলে এ অর্ধস্বাধীন নরপতিই খালদুন পরিবারের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। কারণ, এর পরে উক্ত পরিবার বিভিন্ন সময়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও তাদের খ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়। এ সময় থেকেই এ পরিবারের সদস্যরা শুধু রাজনীতি নয়, জ্ঞানগুণের চর্চাতেও সুনাম অর্জন করতে থাকেন। এ জন্যই দেখা যায় খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে শেভিলার কর্তৃত্ব বলতে গেলে এ খালদুন পরিবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। অবশ্য তাদের এ প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তির ধারাবাহিক কোন ইতিহাস নেই। এর কারণ হিসাবে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খালদুন পরিবারের স্পেনের বাস্তুত্যাগকে দায়ী করা হয়। এ সময় আতঙ্কগ্রস্ত খালদুন পরিবারের অনেক ঐতিহ্যচিহ্নই বিনষ্ট হয়েছে।

তবে একথা সত্য যে, তৎকালীন নিয়মানুসারে নগর কর্তৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ক্ষমতা ছিল অপরিহার্য। এজন্য ধারণা করা যায় যে, খালদুন পরিবারে বহু ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় সমসাময়িককালে সকলের আদর্শস্থানীয় যে ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। একাদশ শতাব্দীতে আমরা খালদুন পরিবারের এমনি একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই। ইনি আবু মুসলিম আমর ইবনে আহমদ ইবনে খালদুন। ৪৪৯ হিজরিতে শেভিলায় তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী মাসলামা আল মাজরিতীর শিষ্য ছিলেন এবং এতদ্বিষয়ে তাঁর নিজেরও খ্যাতি ছিল। ইবনে খালদুন তাঁর এ পূর্বপুরুষের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন। ইনি বিখ্যাত কুরাইব ইবনে খালদুনের ভ্রাতা মুহম্মদের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ ছিলেন।

এমনিভাবে প্রায় সুদীর্ঘ পাঁচশত বছরের ঐতিহ্য বহন করে খালদুন পরিবার যখন সর্বত্র সুপরিচিত ও সম্মানিত এবং শেভিলার নগরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন তথাকার আলমোহেদ শাসনের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। খ্রিস্টানদের অগ্রাভিযান ক্রমশ স্পেনের মুসলিম শাসনকে সংকুচিত করে আনতে থাকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে খালদুন পরিবার উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার নিরাপদ পরিবেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। অবশ্য সেখানেও তাঁরা অপরিচিত ছিলেন না। তদুপরি তাদের এক আত্মীয় ইবনুল মুহতাসিব ছিলেন আফ্রিকার এ অঞ্চলেরই অধিবাসী। তিনি এক সময়ে তথাকার হেফসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়াকে একটি ক্রীতদাসী উপহার দিয়েছিলেন। কালক্রমে এ ক্রীতদাসীই সম্রাটের কতিপয় সন্তানের জননী হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে উক্ত ইবনুল মুহতাসিব সম্রাট পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। খালদুন পরিবার ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণকালে এ ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট সহায়ক হয়। এ

www.amarboi.org

ছাড়া স্পেনে অবস্থানকালে তাঁদের পারিবারিক কৃতিত্ব এ ভিন্ন পরিবেশেও তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা লাভকে সহজ করে তুলে। সুতরাং খালদুন পরিবার আফ্রিকায় এসেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথেই বসবাস করতে আরম্ভ করেন।

তদুপরি শুধু এক খালদুন পরিবারই নয়, বরং স্পেনের বহু গণ্যমান্য পরিবার একই, কারণে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বস্তুত তাদের আগমনের ফলে স্পেনের সভ্যতা-সংস্কৃতির এক ব্যাপক প্রভাব উক্ত অঞ্চলের জনজীবনে অনুভূত হতে থাকে। ইবনে খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় এ সম্পর্কে বারংবার উল্লেখ করেছেন। এর ফলে একদিকে যেমন তৎকালীন আফ্রিকার শিক্ষা-দীক্ষায় নতুন চৈতন্যের সৃষ্টি হয়, তেমনি অন্যদিকে এরই কল্যাণে এ স্পেনীয় মুসলিমরা আফ্রিকার রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন। সম্ভবত এ কারণেই উক্ত আশ্রয় গ্রহণের ঘটনার প্রায় একশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেও ইবনে খালদুন স্পেনের এ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর জন্মভূমি আফ্রিকা হলেও মূলত ইবনে খালদুন ছিলেন স্পেনের মানস সন্তান। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে স্পেনের অধিকতর আধিপত্যই এর কারণ। তদুপরি তুলনামূলকভাবে খালদুন পরিবারের স্পেনে বসবাসের দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যও এর সাথে যুক্ত হয়েছে। এর ফলেই ইবনে খালদুনের সত্তার দ্বিধাবিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে। সে যাহোক, তবে একথা সত্য যে, তাঁর এহেন দৈহিক ও মানসিক দ্বিধাবিভক্তি তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে এক অদ্ভুত বৈচিত্র্য দান করেছে। হয়ত এর জন্যই তিনি আফ্রিকার সম্রাটদের দরবারে উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত থেকেও তাকে তার নিজের কর্তব্য বলে ভাবতে পারেননি; বরং সর্বদাই তার এ প্রকার কর্মে নিয়োগকে নিতান্ত চাকরি বলে মনে করেছেন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় আনুগত্যের অধিক কোনো প্রকার দায়িত্ববোধে নিজকে জড়িত করেননি। তদুপরি আফ্রিকার সাথে তাঁর এ প্রকার মানসিক বিচ্ছিন্নতা তাঁকে তাঁর চোখের সম্মুখে আবর্তিত ঘটনাবলিকে অনেকটা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে সাহায্য করেছে। এমনকি যে সকল ব্যাপারে তিনি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছেন, সেখানেও তাঁর নিরাসক্তি লুক্কায়িত থাকেনি। এর ফলেই ইবনে খালদুন কখনো আফ্রিকা, কখনো স্পেন এবং জীবনের শেষকাল মিশরে অতিবাহিত করেছিলেন।

স্পেন ত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় এসেছিলেন ইবনে খালদুনের পিতামহের পিতামহ হাসান ইবনে মুহম্মদ। তিনি এখানে এসে প্রথমদিকে কিছুকাল সিওটায় বসবাস করেন। সম্ভবত এ নতুন পরিবেশের অবস্থা যাচাই করে মনস্থির করার প্রয়োজন ছিল। শেষ পর্যন্ত হেফসী সম্রাট আবু জাকারিয়ার দরবারে যোগ দিতে মনস্থ করেন। মক্কায় হজ্বব্রত সমাপন করে হাসান ইবনে মুহম্মদ 'বন'-এ সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হলে সম্রাট তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী একটি জায়গীরও দান করেন। এভাবে হেফসী সম্রাটদের সাথে খালদুন পরিবারের সখ্যতার সূত্রপাত হয় এবং কালক্রমে তাঁদের খ্যাতি ও সমৃদ্ধি দেখা দেয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও উক্ত পরিবারের সদস্যরা শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। ইবনে খালদুনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পূর্বপুরুষের অনেকেই এ হেফসী সম্রাটদের মধ্যকার বিদ্রোহ বিপ্লবে বিপর্যস্ত হয়েছে। তবু তাঁদের মধ্যে বিজয়ী পক্ষের সাথে যুক্ত থাকার একটা অভ্যাস ছিল বলে এ প্রকার সাময়িক

www.amarboi.org

বিপর্যয়ের পর আবার সুদিন ফিরে এসেছে। পারিবারিক ঐতিহ্যের এ বিশেষ দিকটি আমরা ইবনে খালদুনের মধ্যেও লক্ষ করব।

ইবনে খালদুনের পিতামহের পিতামহ হাসান সম্রাট আবু জাকারিয়ার শাসন আমলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর পুত্র আবু বকর উচ্চ রাজকীয় পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন 'সাহিবে আশগাল' বা অর্থমন্ত্রী। কিন্তু হেফসী সম্রাটদের বিরুদ্ধে আমীর আবু উমারার বিদ্রোহের সময় তিনি ধৃত ও নিহত হন। এ দুর্ঘটনা যতই মর্মান্তিক হোক, এর থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, উক্ত আবু বকর খালদুন পরিবারের অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী ছিলেন। অন্যদিকে শুধু রাজনীতি নয়, জ্ঞানের চর্চাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি সরকারি লেখকদের রীতিনীতি সম্পর্কীয় একটি পুস্তিকাও রচনা করেন। তাঁর এ পুস্তিকার বিষয়বস্তু যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন, স্বয়ং ইবনে খালদুনের বর্ণনা অনুসারে মনে হয়, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের এ রচনা থেকে প্রভূত অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

খালদুন পরিবার রাজকার্যের প্রয়োজনে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতে বাধ্য হলেও তিউনিসেই তাদের স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলেছিলেন। এখানেই উক্ত আবু বকর ধৃত ও নিহত হন। তাঁর পুত্র অর্থাৎ ইবনে খালদুনের পিতামহের নাম ছিল মুহম্মদ। তিনি 'নায়েবে হাজেব' বা সহকারী দ্বাররক্ষীর একটি সাধারণ পদমর্যাদায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তথাপি তাঁর পৌত্রের বর্ণনা অনুসারে বোঝা যায়, এ ধরনের একটি সামান্য পদে অবস্থান করলেও হেফসী সম্রাটরা তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন এবং এ কারণে তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাব ছিল অসামান্য। এর ফলশ্রুতি হিসাবে শেষ জীবনে তাঁকে উচ্চতর পদমর্যাদা দান করা হয়; কিন্তু তিনি নিজেই তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। সম্ভবত তাঁর পিতার করুণ পরিণতি তাঁকে উচ্চপদ লাভের লোভ সংবরণ করতে উৎসাহিত করে থাকবে। এর ফলে তিনি শান্তিতে অবসর জীবন-যাপন করার সুযোগ পান এবং ধর্মে কর্মে মনোযোগ দেন। ৭৩৭ হিজরিতে পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

বস্তুত ইবনে খালদুনের এ শান্তিপ্রিয় সম্মানিত পিতামহের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানেই তাঁর পিতা মুহম্মদ পাণ্ডিত্য অর্জনে উৎসাহিত হয়েছিলেন। তিনি কোরান ও ধর্মীয় শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং আরবি ব্যাকরণ ও সাহিত্যেও তাঁর দক্ষতা ছিল। এ কারণেই রাজকীয় পদমর্যাদা বা রাজনীতির প্রতি তিনি নিরাসক্ত ছিলেন। ১৩৪৮—৪৯ খ্রিস্টাব্দের সর্বগ্রাসী প্লেগ মহামারীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র ইবনে খালদুনের বয়স তখন সতের বছর। পরবর্তীকালে ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে পিতার গুণগ্রাম সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। বস্তুত এ মন্তব্যের মধ্যে শুধু পিতার প্রতি পুত্রের আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয় ঐতিহাসিক সত্যও বিদ্যমান। কারণ, পিতার আনুকূল্য ও আগ্রহেই ইবনে খালদুন তাঁর মেধা বিকাশের সহায়ক পরিবেশ লাভ করেছিলেন। তৎকালীন প্রথা অনুসারে প্রতিটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্তাই স্বীয় সন্তান-সন্ততির জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা পোষণ করতেন। কিন্তু ইবনে খালদুনের পিতা শুধু অনুসন্ধিৎসু ছিলেন না, তিনি নিজেও পুত্রদের শিক্ষাদানে অংশগ্রহণ করেছেন।

www.amarboi.org

সম্ভবত এর ফলেই পিতামহ ও পিতার এ পুণ্য প্রভাব ইবনে খালদুনের জীবনে এমন সুফল প্রসব করেছে; তিনি এমনভাবে অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ও রাজকীয় পদমর্যাদার যো... গুণাবলিতে বিভূষিত হয়ে উঠতে পেরেছেন। পরিবারের প্রভাব কীভাবে বংশধরদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, ইবনে খালদুনের মধ্যে আমরা তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাভ করতে পারি।

পারিবারিক ঐতিহ্যগত প্রভাবের কথা বলছি এ কারণে যে, তৎকালীন যুগ পরিবেশে শিক্ষা-দীক্ষার যে প্রচলন ও প্রতিপত্তি ছিল, তা ছিল একান্তই ক্ষয়িষ্ণু। বিশেষ করে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্লেগ মহামারীর তাণ্ডবলীলা সে ক্ষয়কে আরো অবধারিত করে এনেছিল। ইবনে খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় এ সম্পর্কে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বর্ণনা দান করেছেন এবং জনবসতির অভাবে কীভাবে সর্বপ্রকার শিল্পকর্মও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তারও উদাহরণ উপস্থিত করেছেন। সুতরাং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার জনজীবনে যে এর প্রভাব পড়েছিল, সেকথা উল্লেখ না করলেও চলে। তবু ইবনে খালদুনের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, তিনি এ বিলীয়মান শিক্ষাদীক্ষা থেকেও নিজের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। একারণেই তাঁর পিতার নিকট শিক্ষালাভের সৌভাগ্য অর্জন ও তাঁর পুণ্য প্রভাবকে নিজের জীবনে গ্রহণ করেও ইবনে খালদুন তাঁর অন্যান্য শিক্ষকদের কথাও সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। কারণ, তৎকালে ধর্মীয় বিধান দান ও অন্যান্য ব্যাপারে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এ পরিচিতির একটি প্রথাগত ব্যাপক মূল্য ছিল। যে কোনো বিষয়ে মন্তব্য প্রদানের সূত্র হিসাবে এ শিক্ষকদের কথা উল্লেখ করতে হত। এ কারণে ইবনে খালদুনও সে প্রথাকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন। তবু তাঁর শিক্ষকদের বিবরণ দানের ক্ষেত্রে স্পেনীয় কিংবা তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা যে ধরনের ধারাবাহিক উল্লেখের মর্যাদা পেয়েছেন, অন্যরা তেমনটি পাননি। এর কারণ ইতিপূর্বেও একবার উল্লেখ করেছি; ইবনে খালদুন মনন ও মানস প্রক্রিয়ার দিক থেকে স্পেনের সাথেই অধিকতরভাবে যুক্ত ছিলেন।

ইবনে খালদুনের প্রাথমিক শিক্ষার ধারা প্রথাগতভাবেই আরম্ভ হয়। তিনি মুহম্মদ ইবনে সাদ ইবনে বোর্রাল-এর তত্ত্বাবধানে কোরান ও কোরান সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানার্জনে ব্রতী হন। আরবি ভাষার শিক্ষক হিসাবে প্রথমেই তাঁর পিতার নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি ছাড়াও এ ব্যাপারে তাকে আরো বহু শিক্ষকের সহায়তা লাভ করতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ ইবনে আল আরবি আল হাসায়রী, মুহম্মদ ইবনে আশ্‌শাওয়াশ আজ্জারজালী, আহমদ ইবনে আল আস্‌সার এবং মুহম্মদ ইবনে বাহর প্রমুখ জ্ঞানীদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত শিক্ষক ইবনে খালদুনকে আরবি কাব্যেও পাঠদান করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর আগ্রহাতিশয্যেই ইবনে খালদুন কাব্য রচনা ও কাব্য সমালোচনার দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর আল-মুকাদ্দিমার শেষ অধ্যায়ে আমরা তাঁর কাব্য সমালোচনার পরিচয় লাভ করি। তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর কাব্যসাধনার পরিচয় থাকলেও আল-মুকাদ্দিমায় এর কোন উদ্ধৃতি নেই। এখানে তিনি তাঁর সমসাময়িক বহু কবির কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন; কিন্তু নিজের কবিতার উদ্ধৃতি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর এ সংযম আমাদেরকে শুধু বিস্মিত করে না, তাঁর বিচক্ষণতারও পরিচয় বহন করে।

www.amarboi.org

ইবনে খালদুনের সমসাময়িককালে হাদিসশাস্ত্র ও ফেকাহশাস্ত্র অত্যন্ত পরিণত বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। এতদুভয় বিষয়ের বিস্তার ও ব্যাপ্তি বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় আচ্ছন্ন হয়ে জটিল আকার ধারণ করেছিল। আল-মুকাদ্দিমায় এ সকল বিষয়ের আলোচনায় ইবনে খালদুন এ জটিলতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে মালেকী মজহাব সম্পর্কে তাঁর আলোচনা সবিস্তারে উপস্থিত হয়েছে। কারণ তিনি নিজেও এ মজহাবের অনুসারী ছিলেন। এ কারণেই পূর্বোক্ত বিষয়াবলি অপেক্ষা এ দুটি বিষয়ে ইবনে খালদুনের শিক্ষকদের পরিচয় তুলনামূলকভাবে অধিকতর খ্যাতিযুক্ত। হাদিসশাস্ত্রের ইবনে খালদুনের শিক্ষক ছিলেন শামসউদ্দিন মুহম্মদ ইবনে জাবির ইবনে সুলতান আলওয়াদিওয়ালী এবং ফেকাহশাস্ত্রে তাঁকে শিক্ষাদান করেছিলেন মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আজ্জাইয়ানী, মুহম্মদ আল কাশীর ও বিখ্যাত মুহম্মদ ইবনে আবদুস্ সালাম আলহাওয়ারী (১২৭৮-১৩৪৮ খ্রি:)।

কিন্তু ইবনে খালদুনের শিক্ষালাভের এ ধারাবাহিকতা খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ একান্তই অশান্ত হয়ে উঠে। ইবনে খালদুনের জন্মের পূর্বকাল থেকে আরম্ভ করে শৈশবকাল পর্যন্ত প্রায় অস্থিতিশীল হেফসী সাম্রাজ্য বারংবার ভাঙাগড়ার সম্মুখীন হয়েও কোনো প্রকারে টিকে ছিল; এ সময়ে তা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। তিউনিসের বুক থেকে তা বলতে গেলে নিশ্চিহ্নই হয়ে যায়। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফেজের মারিনী সম্রাট আবুল হাসান তিউনিস অধিকার করেন। তিনি ১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিলমিসানের আবদুল ওয়াদিদ রাজ্যের শাসক হিসাবে শক্তি সঞ্চয় করে আসছিলেন। কিন্তু এ বিজয়ের পরবর্তী বছরই কায়রোয়ানের আরব বেদুইনদের হাতে পরাজিত হয়ে আবুল হাসান তিউনিসের অধিকারও ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হন। এর ফলে তথাকার হেফসী শাসনের ভাগ্যে পরিবর্তন দেখা দিলেও তা তার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মারিনী সম্রাট আবুল হাসানের পুত্র আবু ইনান ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় তিউনিস বিজয় করতে সক্ষম হন। অবশ্য তাঁর এ বিজয়ও ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। কারণ তখন হেফসী সাম্রাজ্য নতুন শক্তিতে জাগ্রত হবার চেষ্টা করছে। এরই ফলে আবু ইনানের মৃত্যুর পর হেফসী সাম্রাজ্যের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পথে সামান্য বাধাবিপত্তি ছাড়া খুব বড় কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয়নি।

অবশ্য ইবনে খালদুনের জীবনে এ প্রকার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের চাইতেও বেশি প্রভাব বিস্তার করে সেই সর্বনাশা মহামারী, যার কথা আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি। এ মহামারীতে তিনি তাঁর সুযোগ্য অভিভাবক পিতাকে হারান। তাঁর মাতাও এ মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদুপরি এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর অধিকাংশ শিক্ষক ইহলোক ত্যাগ করেন। এভাবে তাঁর চতুর্দিকের সম্পূর্ণ পৃথিবীই এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং এমতাবস্থায় ইবনে খালদুনের শিক্ষার ধারাবাহিকতা যে ব্যাহত হবে, এ আর বিচিত্র কি!

বস্তুত শৈশবকালীন শিক্ষা যে কোনো শিশুমনে একটা পরোক্ষ প্রভাবই সৃষ্টি করে থাকে। সে তখন একান্ত অনুকরণপ্রিয়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রভাব গ্রহণের যে যোগ্যতা, তা আসে অনেক পরে। বিশেষ করে মননশীলতার যে পর্যায় মানুষের

www.amarboi.org

জীবনকে স্বনিয়ন্ত্রিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, এর জন্য আমরা তার বয়সের একটি বিশেষ সন্ধিকালকে চিহ্নিত করতে পারি আর এ হল তার পনেরো থেকে পঁচিশ বছরকালীন বয়ঃক্রম। এ সময়েই সে শিক্ষাদীক্ষা শেষ করে জীবিকা অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। এবং তার ভবিষ্যৎ জীবনধারা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিশেষ খাতের সৃষ্টি করে। এ কারণেই এ সময়ে তার শিক্ষা জীবন বা জীবন পরিবেশে অশান্তির মাত্রা বেশি থাকলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি জীবন সংগ্রামেও তার নিজস্ব পরিমণ্ডল বেছে নিতে অপারগতা দেখা দেয়। এদিক থেকে ইবনে খালদুনের বিষয়টি বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাব তাঁর এ বিশেষ বয়ঃক্রম ১৩৪৭ থেকে ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পড়েছে। আর আমরা এ-ও লক্ষ্য করেছি যে, এ সময় তাঁর জীবন পরিবেশ ছিল একান্তই অশান্ত ও বেদনাহত। তবু এমনি সর্বনাশা পরিবেশের অশুভ প্রভাবকে ইবনে খালদুন কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করেছেন। তিনি যদি সাধারণ হতেন, তা হলে এ প্রভাবের দুর্বহ যাতনা থেকে মুক্তি পাওয়া তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। কিন্তু তিনি অসাধারণ ছিলেন বলেই এ মরুসদৃশ পরিবেশ থেকেও তাঁর উদগ্র জ্ঞানপিপাসা জীবনরস সংগ্রহ করে নিয়েছে।

১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে মারিনী সম্রাট আবুল হাসানের তিউনিস বিজয়ের সময় অনেক স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যক্তিই তাঁর সাথে তিউনিসে এসে প্রবেশ করেছিলেন। বিজয়ের পরবর্তী পর্যায়ে ইবনে খালদুন তাঁদের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের অনেকের পাণ্ডিত্যই তাঁকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এর থেকে মনে হয় তাদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল! কিন্তু এখানে-সেখানে তাদের সামান্য উল্লেখ ছাড়া তাদের যোগ্য কোনো রচনার সন্ধান পরবর্তীকালে পাওয়া যায়নি। তবু ইবনে খালদুন যাঁদের কাছে একান্ত সক্রিয় আগ্রহে শিক্ষালাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ ইবনে সুলায়মান আসসাতী, আব্দুল মোহাইমিন ইবনে মুহম্মদ আল-হাযরামী এবং বিশেষভাবে মুহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-আবিলীর (১২৮৩-১৩৫৬ খ্রি:) নাম উল্লেখযোগ্য। এ শেষোক্ত শিক্ষককে ইবনে খালদুন তাঁর প্রধান শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর এ সুযোগ্য শিক্ষকের পাণ্ডিত্যে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, মনে হয়, তাঁর মাতৃভূমি তিউনিস ত্যাগের পশ্চাতে এ শিক্ষকের প্রভাব বিদ্যমান। বস্তুত এ ক্ষেত্রে তিনি এ মান্যবর শিক্ষকের পদাংক অনুসরণ করেছেন। তাঁর তিউনিস ত্যাগ তাঁর প্রিয় শিষ্যের মনেও জন্মভূমি ত্যাগের বাসনা জাগিয়ে তুলেছে।

উপরোক্ত জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছাড়াও সম্রাট আবুল হাসানের সঙ্গে আরো অনেক জ্ঞানীগুণী তিউনিসে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে রেদোয়ান আল মালাকী ছিলেন ইবনে খালদুনের প্রায় সমবয়সী। অন্যান্যের মধ্যে মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে সাব্বাগ এবং মুহম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মারজুক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। এ শেষোক্ত জনের সঙ্গে ইবনে খালদুনের খুব একটা সৎভাব ছিল না। অবশ্য এঁদের কাউকেই তিনি শিক্ষক বলে উল্লেখ করেননি।

সে যাহোক, সাময়িকভাবে এমনি ধরনের জ্ঞানীগুণী শিক্ষকদের সান্নিধ্য লাভ করে ইবনে খালদুনের জ্ঞানার্জনের পিপাসার নিবৃত্তি হয়নি। তিনি আরো অনেকের কাছ থেকে

www.amarboi.org

আরো অনেক কিছু জেনে নেবার জন্য ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠেন। বস্তুত তিউনিসের পরিবেশ আর তাঁর আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল না। পিতা-মাতা নেই; বড় ভাই মাহম্মদ পরিবারের কর্তা হলেও তাঁদের স্থান পূরণ করতে পারছিলেন না। তদুপরি হেফসী সাম্রাজ্যের পতিত অবস্থা পরিবেশকে আরো বেদনাতুর করে তুলেছিল। ইবনে খালদুন কোনোক্রমেই এ অবস্থার পরিবর্তন কল্পনা করতে পারেননি; যদি তিনি তা করতে পারতেন এবং তাঁর সংগৃহীত জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন, তাহলে তিউনিসে থেকেই তিনি এ বেদনাহত পরিবেশের অনিবার্যতাকে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করতেন। হয়ত বা খ্যাতিমান খালদুন পরিবারের এক সুযোগ্য সন্তান হিসাবে তিউনিসের সম্রাটদের সভাসদরূপে তাঁর জীবন কাটিয়ে দিতেন। আর তা হলে তাঁর পক্ষে বাইরের পৃথিবীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ ও আল-মুকাদ্দিমার ন্যায় মহৎগ্রন্থ রচনা কোনোকালেই সম্ভব হয়ে উঠত না।

সম্রাট আবুল হাসান তিউনিসের অধিকার ত্যাগ করার পর দুর্বল হেফসী সম্রাটরা ইবনে তাফরাজীন নামীয় এক সামন্তের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছিলেন। ইবনে খালদুন পারিবারিক প্রথা অনুসারে এ সামন্তের দরবারেই একটি সামান্য পদে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। তাঁর এ পদটির নাম ছিল 'সাহিবে আলামা'; অর্থাৎ সরকারি পত্রাদির প্রথমে তিনি বড় বড় অক্ষরে 'আল্ হামদু লিল্লাহ্' এবং শেষে 'আশ্শুকরু লিল্লাহ্'—এ বাক্য দুটি লিখতেন। বস্তুত এ পদটির তেমন কোনো কার্যকর গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু এর সহায়তায় তিনি প্রায় প্রতিটি রাজকীয় গোপনীয়তায় অংশগ্রহণ করতে পারতেন এবং প্রয়োজনে পরামর্শ দেবার সুযোগও পেতেন। এদিকের প্রতি লক্ষ করলে বলতে হয়, এ পদটির একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল এবং এর মাধ্যমে ইবনে খালদুন ইচ্ছা করলে বৃহত্তর রাজনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু কোনো কিছুই ইবনে খালদুনের তৎকালীন মানসিক অস্থিরতাকে দূর করতে পারেনি; এমনকি বড় ভাই মুহম্মদের প্রলোভন বাক্যও তাঁকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়নি। নতুনতর পদমর্যাদার প্রলোভন, বড় ভাইয়ের অসন্তুষ্টি আর জন্মভূমির মায়া সকল কিছুর বাধা এড়িয়ে ইবনে খালদুন ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে তিউনিস ত্যাগ করে চলে যান।

তখন তিউনিসের হেফসী সম্রাটদের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কুস্তানতুনিয়ার জনগণের প্ররোচনায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এ বিদ্রোহ দমনে তিউনিস থেকে যে সৈন্যদল প্রেরিত হয়, তার সাথে ইবনে খালদুনও ছিলেন। সৈন্যদলের অগ্রযাত্রার হৈ-হুল্লোড়ের মাঝে সুযোগ বুঝে তিনি পালিয়ে যান এবং খালদুন পরিবারের খ্যাতির কল্যাণে এমনিভাবে পলায়ন করেও তিনি যোগ্য ব্যক্তিদের সহায়তা লাভে সক্ষম হন। কিছুদিন তিনি আবার আলমোরারিতী শায়খদের সান্নিধ্যে কাটান। সেখান থেকে সিওটা ও কাফসা হয়ে বিস্করায় উপস্থিত হন। এ সময়েই বিভিন্ন আরব বেদুইন গোত্রের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। কিন্তু এ ধরনের উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ তাঁর মনকে ক্রমশ অস্থির করে তুলে। ফলে তিনি স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য ফেজের মারিনী সম্রাট আবু ইনানের দরবারে উপস্থিত হন। যদ্দুর মনে হয়, তাঁর এ প্রথম সাক্ষাৎ তেমন ফলপ্রসূ হয়নি; যার

www.amarboi.org

ফলে ইবনে খালদুন সামন্ত ইবনে আবু আমরের সাথে বগিতে চলে যেতে বাধ্য হন। ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকাল পর্যন্তই তিনি বগিতে কাটান। এ সময়েই সামন্ত ইবনে আবু আমরের মাধ্যমে ইবনে খালদুন সম্রাট আবু ইনানের আমন্ত্রণলিপি লাভ করেন। এতে তাঁকে মারিনী সম্রাটের দরবারী জ্ঞানীগুণীদের একজন হয়ে যোগদান করতে বলা হয়। ইবনে খালদুন এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং যথাসময়ে ফেজের রাজকীয় দরবারে উপস্থিত হন।

রাজকীয় দরবারের অন্যতম জ্ঞানী হিসাবে ফেজে ইবনে খালদুনের সময় ভালভাবেই কাটছিল। এখানে তিনি আরো অনেক জ্ঞানীগুণীর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর জ্ঞানের পিপাসা মিটিয়ে নিতে সক্ষম হন। এখানেই তিনি বিশিষ্ট কোরানবিদ মুহম্মদ ইবনে আস্‌সাফফার-এর সাক্ষাৎ পান এবং এখানেই তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল-মাক্কারীর সান্নিধ্যে আসেন। এ শেষোক্ত গুণী অন্য আরো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির ন্যায় নিজের জন্মতারিখ প্রকাশ করাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। তাঁর মতে প্রকৃত জ্ঞানীর জন্ম ও মৃত্যু বলে কিছু নেই। এ বিশিষ্ট জ্ঞানী ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ অথবা ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁর মরদেহ ত্যাগ করেন। যাহোক, এখানে ইবনে খালদুন বিশিষ্ট পণ্ডিত মুহম্মদ ইবনে আহমদ আলবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। জনশ্রুতি অনুসারে ইনি ইবনে খালদুনের তিউনিসের বিশিষ্ট শিক্ষক মুহম্মদ ইবনে আব্দুস্ সালামকে দর্শনবিজ্ঞানের ন্যায় বিতর্কমূলক বিষয়ে শিক্ষাদান করেছিলেন। এ ছাড়া স্বল্প পরিচিত কাজী মুহম্মদ ইবনে আবদুর রাজ্জাক এবং মুহম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া আল বারজীও এ সকল জ্ঞানীগুণীর মধ্যে ছিলেন। স্পেনের ইবনে খত্তিবের অনুরোধে এ সময়ে ইবনে খালদুন আল বারজীর কবিতার একটি সংকলন সেখানে পাঠান এবং সেটি ইবনে খত্তিব রচিত গ্রানাডার ইতিহাসে কবিদের পরিচিতি অধ্যায়ে সংযোজিত হয়।

ফেজে অবস্থানকালে ইবনে খালদুন আরো যে সকল জ্ঞানীর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্র বিশারদ ইব্রাহিম ইবনে জারজারও ছিলেন। ১৩৬৪ সনে পুনরায় এ বিশিষ্ট পণ্ডিতের সঙ্গে শেভিলার পেদ্রো দি ক্রয়েলের দরবারে ইবনে খালদুনের দেখা হয়। ফেজে তিনি মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে শরীফ মুহম্মদ ইবনে আহমদ আসসবতীকে (১২৯৪-১৩৫৯) দেখতে পান এবং ১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষক আবুল বরকাত মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল বালফিফীর সান্নিধ্যে আসেন। এ বিশিষ্ট জ্ঞানীর কথা ইবনে খালদুন তাঁর আল মুকাদ্দিমায় বারংবার শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন। এ প্রথম সাক্ষাতে ও পরবর্তীকালে ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দে ইবনে খালদুন তাঁর নিকট ইমাম মালেকের 'মুয়াত্তা' গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করেন এবং তাঁর মিশরীয় শিষ্য ইবনে হজর আস্কালানীর বর্ণনা অনুসারে ইবনে খালদুন তাঁর এ বিশিষ্ট শিক্ষককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

এ সকল বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যের কথা আরো ব্যাপকভাবে উল্লেখের প্রয়োজন এ জন্য যে, ইবনে খালদুনের প্রতিভা বিকাশে এঁদের সকলেরই কিছু না কিছু অবদান রয়েছে। আজকের দিনেও আমরা যেমন সাধারণভাবে দেখতে পাই, যে কোনো

www.amarboi.org

জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিত ব্যক্তির ছাত্রাবস্থা কখনো শেষ হয় না; ইবনে খালদুনের সমসাময়িককালেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বরং তখনকার অবস্থা অনুসারে এ সান্নিধ্যের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। কারণ তখন পুস্তকাদির এমন ব্যাপক প্রচলন ছিল না। এজন্যই জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিত ব্যক্তিরা যোগ্য কোনো ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করতে পারলে তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করতে দ্বিধা করতেন না। তেমনি প্রয়োজন মনে করলে তাঁর যোগ্যতর সহপাঠীদের সাহচর্যেও অবস্থান করতেন। এতে নিন্দনীয় কিছুই ছিল না এবং ইবনে খালদুন নিজে সর্বত্র এ প্রথার যথেচ্ছ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজেও তাঁর সহপাঠীদের সাহচর্যে এসে জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। ১৩৬৩ থেকে ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গ্রানাডায় তাঁর অবস্থানকাল এজন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এমনকি তাঁর সর্বাপেক্ষা অনিশ্চিত সময়, যখন তিনি ১৩৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দের দিকে বিস্করায় অবস্থান করছেন, তখনও জ্ঞানীদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেননি। তথাকার জনৈক জ্ঞানীর নিকট প্রাপ্ত বিবরণ তিনি তাঁর মুকাদ্দিমায় ব্যবহার করেছেন।

দেশ ভ্রমণ ও বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ যে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকে প্রসারিত করে এবং তার সংকীর্ণতা দূর করতে সহায়ক হয়, ইবনে খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুতরাং তাঁর নিজের মধ্যে এরই প্রতিফলন আমরা লক্ষ করব। তবু এ কথা হয়ত বলা যায় যে, ফেজে সম্রাট আবু ইনানের দরবারে অবস্থানকালেই ইবনে খালদুনের গঠনমূলক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। বস্তুত তাঁর সতের বছর বয়ঃক্রমের পর থেকেই তাঁর শিক্ষা লাভের ধারাকে কোনো প্রকারেই সুবিন্যস্ত বলা যায় না। বরং বলতে হয়, তখন থেকেই তিনি যেখানে যা পেয়েছেন কুড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মানস গঠনের দিকে লক্ষ্য করলেও এ প্রকার অবিন্যস্ত শিক্ষার প্রভাবই দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠে। এ কারণেই সম্ভবত তিনি কোনো একটি বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে পারেননি। বস্তুত ইবনে খালদুন সম্পর্কে তাঁর শত্রুদের প্রচারিত অভিযোগের কথা বাদ দিয়েও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি তৎকালে প্রচলিত কোনো বিষয়েই মৌলিক কিছু যোগ করার চেষ্টা করেননি। অন্তত তাঁর বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ কীর্তি আল-মুকাদ্দিমায় আমরা এর কোনো নিদর্শন খুঁজে পাই না। কিন্তু কোনো একটি বিষয়ে মৌলিক কিছু যোগার করলেও সকল বিষয়কে একত্র করে জীবন সংগ্রামের গভীর রহস্য অনুধাবনে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল একান্ত বিশিষ্ট ও মৌলিক। এ ক্ষেত্রেই তিনি সকলকে অতিক্রম করে তাঁর নিজস্ব চেতনাকে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর এ অন্তর্দৃষ্টিই ঐতিহাসিক দর্শনের ভিত্তিকে সুসংস্থাপিত করেছে।

ফেজো সম্রাট আবু ইনানের দরবারে ইবনে খালদুন পণ্ডিতবর্গের মধ্যেই অবস্থান করছিলেন। সম্রাটের সঙ্গে জুম্মা ও ঈদের নামাজেও তিনি উপস্থিত থাকতেন। তাঁর এ প্রকার বিশেষ সাহচর্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সম্রাট তাঁকে রাজকীয় দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ইবনে খালদুন সম্মতি দিতে ইতস্তত করেন। কাজটি ছিল সম্রাটের নিকট আগত বিভিন্ন আবেদনপত্রে সম্রাটের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা। ইবনে খালদুন উক্ত কাজ থেকে এ বলে পিছিয়ে যাচ্ছিলেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষের কেউই এ ধরনের কোনো কাজ করেননি। পদটির গুরুত্ব যাই হোক, আসলে এটি কেরানীর কাজ;

www.amarboi.org

অথচ খালদুন পরিবারের সদস্যরা সর্বদা মন্ত্রণা, প্রশাসন এবং তুলনামূলকভাবে অন্যবিধ উচ্চ রাজকীয় পদ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেননি। এমনকি তিউনিসের রাজদরবারে ইবনে খালদুনের সেই 'সাহিবে আলামা'র পদটিও তুলনামূলকভাবে এর চাইতে গুরুত্ব বহন করত। তদুপরি তিনি তখন জ্ঞানেগুণে অধিকতর খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন। তেইশ-চব্বিশ বছরের একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী গুণী যুবকের জন্য এ ধরনের একটি পদ কিছুতেই যোগ্য নয়। সুতরাং সম্রাট আবু ইনান বাহ্যত তাঁর প্রতি যত সম্মানই প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁর মূল্যায়নের এ তাচ্ছিল্যে ইবনে খালদুন মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। অনিচ্ছায় এ পদটি গ্রহণে বাধ্য হয়ে তাঁর বিরক্তি আরো গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠে।

ইতিপূর্বে মারিনী সম্রাট আবু ইনান বগির হেফসী বংশীয় সামন্ত আমীর আবু আবদুল্লাহ্‌কে পরাজিত করে তাঁর রাজ্যপাট অধিকার করে নিয়েছিলেন। আমীর আবু আব্দুল্লাহ্ নজরবন্দী হিসাবে ফেজেই অবস্থান করছিলেন। ইবনে খালদুনের সাম্প্রতিক বিরক্তি তাঁকে উক্ত আবু আব্দুল্লাহ্‌র সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে উৎসাহিত করে। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁদের এ বন্ধুত্ব ক্রমশ গাঢ় ও স্থায়ী হয়ে উঠে। এর ফলে সম্রাট আবু ইনান ইবনে খালদুনের আনুগত্যে সন্দিহান হয়ে পড়েন। আর এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি ইবনে খালদুন কারারুদ্ধ হন। তাঁর এ প্রকার কারাবরণের কিছুকাল পরেই সম্রাট আবু ইনান তিউনিস বিজয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। যদ্দুর মনে হয়, এ অভিযান পরিচালনার পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবেই হেফসী সম্রাটদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন একজন তিউনিসীকে কারারুদ্ধ করা আবু ইনান একান্ত অপরিহার্য মনে করেছিলেন। বিশেষ করে ইবনে খালদুনের শক্তিমত্তা এ পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থই ভয়ের কারণ ছিল।

সম্ভবত এ কারণেই তিউনিসের পতনের পরও আবু ইনান তাঁকে মুক্তি দিতে সাহসী হননি। ইবনে খালদুন বারবার তাঁর মুক্তির জন্য আবেদন জানিয়েছেন, দীর্ঘ কবিতা রচনা করে সম্রাটের দরবারে পাঠিয়েছেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। এর ফলে তাঁর কারাবাস প্রায় দুবছরকাল স্থায়ী হয়। সম্রাট আবু ইনানের মৃত্যুর পর ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তিনি মুক্তি পান। একজন উদীয়মান জীবনশিল্পীর জন্য এ প্রকার দীর্ঘকালের কারাবাস খুবই ক্ষতিকর, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ এর ফলে ইবনে খালদুনের মন ও মননে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এতদসঙ্গে এর অন্য একটি দিকও ছিল আর সেটিই তাঁর এ ক্ষতিকে পুষিয়ে দিয়েছে। বস্তুত এমনি বাধ্যতামূলক নির্জন বাসে অবস্থান করে তিনি জীবন ও জগতের প্রতি এক নতুন দৃষ্টিতে তাকাবার সুযোগ পেয়েছেন। আর এ দৃষ্টিই তাঁকে ইতিহাসের গভীর অরণ্যে জীবনের গতিপথ নির্ধারণে সহায়তা করেছে। সুতরাং যত বেদনাদায়কই হোক না কেনো, এ কারাবাস তাঁকে পরিণামে লাভবান করেছে।

সম্রাট আবু ইনানের মৃত্যুর পর মারিনী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পরবর্তী পর্যায়ে মাত্র কয়েক বছরের জন্য একবার একজন উদ্যোগী যুবকের অধীনে এ মক্তির পুনর্জাগরণ ঘটেছিল; নতুবা বলতে গেলে তখন থেকেই মারিনী রাজশক্তি এমন এক দুর্ভাগ্যের শিকারে পরিণত হয়, যা ইবনে খালদুন তাঁর

www.amarboi.org

আলমুকাদ্দিমায় বারংবার ও বিশেষ গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেছেন। অযোগ্য মারিনী সম্রাটরা প্রধানমন্ত্রীর ক্রীড়নকে পরিণত হন। পরিবেশ এমন বিশৃঙ্খল হয়ে উঠে যে, গোত্রশক্তির অধিকারী যে কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মারিনী পরিবারের যে কোনো একজন সদস্যকে সম্মুখে রেখে রাজ্য বিস্তার ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার খেলায় মেতে উঠেন। স্বয়ং ইবনে খালদুনও অবস্থার চাপে পড়ে এবং তাঁর কারাবাসের সেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আগ্রহে এ খেলায় যোগ দিতে বাধ্য হন। এখানে একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে, রাজনীতির এ পাশা খেলায় তিনি অন্যান্যের চাইতে কম দক্ষ ছিলেন না। পরবর্তী জীবনে ইবনে খালদুন তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় ও বাস্তুবিপর্যয়ের জন্য মানুষের ষড়যন্ত্রকে দায়ী করেছেন। এজন্য আমরা এ মহৎ প্রতিভাধরের প্রতি একান্ত সঙ্গত কারণেই সহানুভূতিশীল হতে পারি; তবুও একান্ত শ্রদ্ধার সাথে একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, এ সকল ষড়যন্ত্রের বীজ তিনি নিজেই বপন করেছিলেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে বীজের তিক্ত ফসলই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে।

সম্রাট আবু ইনান তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। তখন তিনি তাঁর ভাই আবু সলিমসহ পরিবারের অন্য অনেককে স্পেনে নির্বাসিত করেন। আবু ইনানের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধানমন্ত্রী হাসান ইবনে উমর নির্ধারিত উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে না বসিয়ে সম্রাটের এক শিশুপুত্রকে বসান এবং সমুদয় ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত করে নেন। এ সময় নির্বাসিত আবু সলিম সিংহাসনের দাবি নিয়ে ফিরে আসেন এবং ইবনে খালদুন তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন। আবু সলিম ঘামোরার জনগণের সহায়তায় এবং ইবনে খালদুনের সক্রিয় সহযোগিতায় ক্ষমতা হস্তগত করতে সমর্থ হন। পুরস্কার স্বরূপ ইবনে খালদুনকে তাঁর রাজ্যসচিব করে নেন। আবু সলিমের শাসনকালের শেষ পর্যায়ে ইবনে খালদুন 'মাজালিম' বিভাগের দায়িত্বে সমাসীন ছিলেন। এ বিভাগটি মূলত সেসব অন্যায় অবিচারের প্রতিকার করত, যা সরাসরি ধর্মীয় বিধানের আওতায় পড়ে না। তবু এটিই ইবনে খালদুনের প্রথম আইন-আদালত সম্পর্কীয় পদমর্যাদা।

এ সময় ইবনে খালদুন রাজকীয় পদমর্যাদার প্রভাব ছাড়াও গদ্য ও পদ্য রচনার ক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জন করেন। স্পেনের ইবনে খতিব তাঁর এ সময়কার রাজকীয় ও ব্যক্তিগত পত্রাবলির ভাষা ও বক্তব্যের প্রশংসা করেছেন। এ সময়ে তিনি বহু কসিদা বা দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। নানাদিক থেকে তাঁর জ্ঞান ও গুণের সুখ্যাতি দেখা দেয়। এর ফলে তিনি যেমন অনেক বন্ধু লাভ করেন তেমনি অনেক শত্রুরও সৃষ্টি হয়। সম্রাট আবু সলিমের অন্য এক মন্ত্রী ইবনে মারজুক ইবনে খালদুনের প্রভাব প্রতিপত্তিতে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেন। অন্যদিকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তখন অন্য এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে সামরিক ও বেসামরিক লোকদের এক সফল অভ্যুত্থানে আবু সলিম ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে নিহত হন।

ইতিমধ্যে এ কয়েক বছরের ব্যবধানে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন। তিলমিসানে আব্দুল ওয়াদিদ বংশীয়রা পুনরায় ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। আরো পূর্বদিকে বগি, কুস্তানতুনিয়া ও তিউনিসে

www.amarboi.org

হেফসী সম্রাটরা আবার তাঁদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে এনেছিলেন। অথচ এ সময়ে ফেজের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। আবু সলিমের মৃত্যুর পর বিশৃঙ্খল রাজনীতির আবর্ত আবার উথলে উঠেছিল। ইবনে খালদুন এ আবর্তে পরে ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিজয়ীদের পক্ষে থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও দিন দিন তিনি আশঙ্কাকাতর হয়ে পড়ছিলেন। অবশেষে তিনি ফেজ ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পরিবেশে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ফেজের তৎকালীন শাসকরা ইবনে খালদুনকে ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। কারণ তাদের ভয় ছিল যে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা সম্পর্কে ইবনে খালদুন যে প্রগাঢ় জ্ঞান রাখতেন, তা শত্রুদের হাতে পড়লে মারাত্মক ফলাফলের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ইবনে খালদুন একান্তই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর এ প্রকার আগ্রহের জয় হল এবং ফেজের শাসকদের সাথে তিনি চুক্তিবদ্ধ হতে রাজি হলেন। চুক্তির বিষয় ছিল, তিনি ফেজ ত্যাগ করে সোজা স্পেনে চলে যাবেন; উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার অন্য কোথাও বসবাস করতে চেষ্টা করবেন না। এ চুক্তি অনুসারে ইবনে খালদুন সিওটা হয়ে ১৩৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর স্পেনের তৎকালীন একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র গ্রানাডায় গমন করেন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে সর্বপ্রথম পরিবার-পরিজনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদিগকে শ্যালকের নিকট কুস্তানতুলিয়ায় পাঠিয়ে দেন। অবশ্য তাঁর স্ত্রীর পরিচয় বা সন্তানাদির সংখ্যা সম্পর্কে তিনি কোনো কথাই বলেননি। এমনকি তিনি কখন বিয়ে করেছিলেন, সে সম্পর্কেও তিনি অদ্ভুতভাবে নীরব। তবে ধারণা করা হয় যে, ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে তিউনিস ত্যাগের পর তিনি বিয়ে করেন। হেফসী সম্রাটদের একজন বিশিষ্ট সেনাপতি ও সমরমন্ত্রী মুহম্মদ ইবনে হাকিম ছিলেন তাঁর শ্বশুর। ফেজে তিনি এ ইবনে হাকিম তনয়াকে নিয়েই বিবাহিত জীবন-যাপন করেন।

ইতিপূর্বে আমরা ইবনে খালদুনের পিতা-মাতার মৃত্যুর পর বড় ভাই মুহম্মদকে পরিবারের কর্তা হতে দেখেছি। ইনি ছাড়াও ইবনে খালদুনের আরো ভাই ছিলেন। তবে সকলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ভাই ইয়াহিয়া তুলনামূলকভাবে খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি কয়েকবারই উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ইবনে খালদুন প্রসঙ্গক্রমে তাঁর পিতা ও ভাইদের কথা তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করলেও তাঁর ব্যক্তিগত পরিবার-পরিজনদের কথা তেমন গুরুত্বসহকারে ও বিস্তৃত আকারে কোথাও তুলে ধরেননি। সুতরাং একথাও জানার উপায় নেই যে, পূর্বোক্ত ইবনে হাকিমের কন্যা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো স্ত্রী ছিল কিনা। তবে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনিই যে ইবনে খালদুনের প্রধানা স্ত্রী ছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গক্রমে ইবনে খালদুনের এক পুত্রের জন্মের কথা আমরা জানতে পারি। ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এ ঘটনাটি ঘটে। তবে উক্ত পুত্রের জননী যে উক্ত ইবনে হাকিম তনয়া, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অবশ্য অনুরূপ ধারণা পোষণ করার বিরুদ্ধেও কোনো প্রমাণ উপস্থিত নেই। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায়, ইবনে খালদুনের স্ত্রী ও পাঁচটি কন্যা সন্তান নৌকাডুবিতে মারা যায়। ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিউনিস থেকে মিশরে আসার সময় এ

www.amarboi.org

দুর্ঘটনা ঘটে। শুধু তাঁর দুই পুত্র মুহম্মদ ও আলী মিশরে পৌঁছতে সক্ষম হয়। অবশ্য ইবনে খালদুন স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি। সুতরাং অন্যসূত্রে প্রাপ্ত উপরোক্ত দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হয়ত সর্বাংশে সত্য নয়। তবু তাঁর একমাত্র স্ত্রীর উল্লেখ থেকে মনে হয়, ইনিই হয়ত সেই পূর্বোক্ত ইবনে হাকিম তনয়া; ইনিই নৌকাডুবিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সম্ভবত পরবর্তীকালে মিশরে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। এ সম্পর্কে ইতিবাচক যে বিবরণটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তা ইবনে খালদুনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কীয় একটি ধারণামাত্র। এ কারণেই এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। অবশ্য সম্রাট তৈমুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ই ইবনে খালদুন মিসরে অবস্থানরত তাঁর পরিবার পরিজনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ পরিবার বলতে স্ত্রী-পুত্রাদি সকলকে না-ও বোঝাতে পারে। তবু অনুরূপ ধারণা পোষণ করার বিরুদ্ধেও কোনো প্রমাণ নেই। কারণ তাঁর পক্ষে পুনরায় বিয়ে করা অসঙ্গত বা অসম্ভব ছিল না।

ইবনে খালদুন মৃত্যুকালে কোনো সন্তান রেখে গিয়েছিলেন কিনা, এ ব্যাপারেও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। বিশেষ করে তারা যদি পুত্র সন্তান হত, তা হলে কোনো না কোনো দিক থেকে তাঁদের সন্ধান মিলতই। কিন্তু তেমন কোনো প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। ইবনে খালদুনের আত্মজীবনীর বর্ণনা অনুসারে তাঁর এক পুত্র মরক্কোর সুলতানের অধীনে চাকরিরত ছিল। কিন্তু উক্ত বর্ণনাটির দ্ব্যর্থবোধকতা এ সংবাদটিকেও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

বস্তুত ইবনে খালদুনের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন সম্পর্কে এটুকুই আমাদের জ্ঞানের পুঁজি এবং যে কোনো পাঠকের জন্য তাঁর ন্যায় মহৎ প্রতিভার ব্যক্তিগত জীবনের এ সংক্ষিপ্ত সংবাদ একান্তই অতৃপ্তিদায়ক। আমরা একথা জানি যে, যে-কোনো মহৎ শিল্পীর শিল্পকর্মই তাঁর প্রকৃত জীবন-কাহিনী এবং আমরা একথাও জানি যে, ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী জীবনচর্চার প্রতিকৃতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন; তবু তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের আনন্দ-বেদনাকে জানার লোভ আমাদের যায় না, আমরা জানতে চাই তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্ব পারিবারিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ লীলা-বিলাসকে কীভাবে গ্রহণ করেছে; কীভাবে তার আশা নিরাশায় আন্দোলিত হয়েছে। কিন্তু ইবনে খালদুন এ ব্যাপারে আশ্চর্যভাবে নিশ্চুপ, উদাসীন; কারণ তাঁর এ সংক্ষিপ্ত পারিবারিক সংবাদও তাঁর আত্মজীবনীর ঘটনাবহুল বর্ণনার মধ্যে একান্ত আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত। যেন তিনি তাঁর জীবনের বৃহৎ ও মহৎ অভিজ্ঞতাগুলোর বর্ণনা প্রসঙ্গে নিতান্ত অনিচ্ছায় এ প্রকার সংক্ষিপ্ত সংবাদ তুলে ধরেছেন।

এ প্রকার অনীহা ও উদাসীনতার কারণ কী? তবে কি ইবনে খালদুন তাঁর পারিবারিক জীবনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না? তাইবা কী করে বলা যায়; যদি প্রকৃত অবস্থা এমনিই হত তাহলে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ে তাঁর পরিবারবর্গ বিপদের সম্মুখীন হতেন না। অনেক সময়েই তাদেরকে ইবনে খালদুনের প্রতি হিংসাপরায়ণ শাসকের হাতে নজরবন্দী থাকতে হয়েছে। নৌকাডুবির দুর্ঘটনার সকল বিবরণ সত্য না হতে পারে, কিন্তু এর ফলে ইবনে খালদুন যে ব্যথিত ও বিবাগী হয়ে উঠেছিলেন, এ তথ্য কিছুতেই

www.amarboi.org

অস্বীকার করা যায় না। ফলে আমাদের যদ্দুর মনে হয়, পরিবারের প্রতি অনুরক্ত থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে তাদের সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলেই এমন এক নির্লিপ্ততার সৃষ্টি হয়েছে। ফেজ থেকে স্পেনে গমনকালেই এ প্রকার বিচ্ছিন্নতার শুরু এবং মাঝে মাঝে স্বল্পকালের সাহচর্য ছাড়া জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।

ইবনে খালদুনের গ্রানাডায় যাবার সংবাদ পেয়েই তথাকার তৎকালীন শাসক পঞ্চম মুহম্মদ ও তদীয় প্রধানমন্ত্রী বিখ্যাত পণ্ডিত ইবনে খতিব তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করেছিলেন। এর কারণ ইবনে খালদুনের সঙ্গে তাঁদের পূর্বের ঘনিষ্ঠতা। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সম্রাট আবু ইনান সিংহাসন অধিকারের সময় তাঁর ভাই আবু সলিমকে স্পেনে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। তখন আবু সলিম বস্তুত এ গ্রানাডায় সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদের আশ্রয়েই ছিলেন। পরে তাঁর সক্রিয় সহায়তা ও ইবনে খালদুনের সহযোগিতায় তিনি ফেজের সিংহাসন অধিকার করেন এবং ইবনে খালদুনকে তাঁর সচিব করে নেন। এ সময় সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদেরও ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে এবং তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী ইবনে খতিবসহ ফেজে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তখনো তাঁদেরকে সম্রাট আবু সলিম ও ইবনে খালদুন রাজকীয় সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন এবং বস্তুত তাঁদের সহায়তায় সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদ আবার সিংহাসন ফিরে পান। সুতরাং সম্রাট আবু সলিম না থাকলেও ইবনে খালদুনের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না এবং তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এ রাজকীয় সম্বর্ধনায়। ফলে সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদের দরবারে ইবনে খালদুন সসম্মানে বরিত হলেন এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী ইবনে খতিবের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব নতুন সজীবতায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

গ্রানাডার সিংহাসন পুনরুদ্ধারের সময় সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদ কাস্টিলার খ্রিস্টান সম্রাট 'পেড্রো দি ক্রুয়েলের' নিকট থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি চুক্তি হবার কথা ছিল। সম্রাট মহম্মদ ইবনে খালদুনকে এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য দূত হিসাবে কাস্টিলায় পাঠালেন। ১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইবনে খালদুন উপরোক্ত দায়িত্ব নিয়ে শেভিলায় যান। সম্রাট পেড্রো তাঁকে সসম্মানে বরণ করেন। উক্ত চুক্তি সম্পাদনে ইবনে খালদুন অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এমনকি সম্রাট পেড্রো দি ক্রুয়েল পর্যন্ত তাঁর পাণ্ডিত্য ও কূটনৈতিক আরণে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ইবনে খালদুনকে শেভিলার রাজদরবারে যোগ্য পদে থেকে যাবার আবেদন জানান এবং খালদুন পরিবারের যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর নিকট প্রত্যর্পণের আশ্বাস দেন। ইবনে খালদুন সম্রাটের এহেন সমাদরে অভিভূত হয়েছিলেন। আর তা হবারই কথা। কারণ এ শেভিলাই তাঁর পিতৃপুরুষদের দীর্ঘকালীন লীলাভূমি। তবু গ্রানাডার সম্রাটের বদান্যতা স্মরণ করে ইবনে খালদুনের পক্ষে সম্রাট পেড্রোর এ সাদর আমন্ত্রণে সাড়া দেয়া সম্ভব হয়নি।

গ্রানাডার সু-সংস্কৃত পরিবেশে ইবনে খালদুন অনেকটা নিরাপত্তা অনুভব করেছিলেন। এজন্যই কুস্তানতুনিয়া থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকে এখানে আনিয়ে নেন এবং একটি গ্রামের জায়গীর লাভ করে শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। এখানে তাঁর প্রকাশ্য কোনো শত্রু ছিল না সত্যি; কিন্তু গোপন শত্রুর অভাব ছিল না।

www.amarboi.org

বিশেষ করে সে শত্রুতার উপাদান তিনি নিজের মধ্যেই বহন করে ফিরছিলেন আর তা ছিল তাঁর সাধারণ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। এর ফলে সম্রাটের দরবারে তাঁর প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়ছিল এবং তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করছিলেন যে, তাঁর বন্ধুশ্রেষ্ঠ ইবনে খতিবও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠছেন। ফলে সম্রাটের ব্যবহারেও কিছুটা উদাসীনতা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইবনে খালদুনের পক্ষে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না এ কারণে তাঁদের বাইরের বন্ধুত্ব আপাতদৃষ্টিতে অটুট রইল বটে, কিন্তু ভিতরের আদান-প্রদানে বারংবার বাধার সৃষ্টি হতে লাগল। এ এক মারাত্মক অস্বস্তিকর অবস্থা; প্রকাশ্য শত্রুতার চাইতেও এর অশান্তি অধিকতর মর্মপীড়াদায়ক। তবু ইবনে খালদুন তাঁর এ বন্ধুটিকে বন্ধু বলেই উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। সম্ভবত গ্রানাডার এ সাহচর্য ছাড়া আর একবার মাত্র ইবনে খালদুন ইবনে খতিবকে দেখতে পেয়েছিলেন আর তা ঘটেছিল শেষোক্তের বিপর্যস্ত অবস্থায় ফেজে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণের সময়। ১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এখানেই নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন।

যাহোক গ্রানাডায় ইবনে খালদুনের এ ক্রমবর্ধমান মানসিক অস্বস্তির সময় তিনি তাঁর পুরাতন বন্ধু হেফসী পরিবারের আবু আবদুল্লাহ্‌র নিকট থেকে একটি সাদর আমন্ত্রণ লাভ করেন। আবু আদুল্লাহ্ ১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বগির শাসনক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। তাঁর বন্ধুত্বের জন্যই ইবনে খালদুন ফেজে দীর্ঘদিন কারাবাস করেছিলেন, একথা আমীর আবু আবদুল্লাহ্ ভুলেননি। তাই তিনি ইবনে খালদুনকে বগিতে এনে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। ইবনে খালদুন একান্ত আগ্রহের সাথে এ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন। ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রানাডা ত্যাগের প্রস্তুতির সময় ইবনে খালদুন সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদের তরফ থেকে ইবনে খতিবের লিখিত একটি অতিশয় প্রশংসাসূচক ও আপ্যায়নমূলক পত্র লাভ করেন। কিন্তু এ পত্রের ভাষা বা বক্তব্য কোনোটাই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি পরবর্তী মাসেই বগিতে চলে আসেন এবং রাজকীয় সমারোহে বরিত হন। ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে এ অভ্যর্থনার মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন।

ইবনে খালদুন বগির শাসক আবু আবদুল্লাহর 'হাজেব' তথা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হেফসী সাম্রাজ্যের ভাগ্যোন্নয়নের বিধিলিপি তখন নির্ধারিত হয়েছিল আমীর আবু আবদুল্লাহ্‌র জ্ঞাতি ভাই আবুল আব্বাসের জন্য। এ কারণেই কুস্তানতুনিয়ায় তিনি দিন দিন শক্তিতে ও সম্পদে অপরাজেয় হয়ে উঠেছিলেন। আবু আব্দুল্লাহ্‌র পক্ষে সামরিক শক্তি দিয়ে তাঁর এ ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি রোধ করা সম্ভব ছিল না। এজন্যই সম্মুখ সমরে একবার পরাজিত হবার পরই তাঁর অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। তবু ইবনে খালদুন তাঁর এ বন্ধুস্থানীয় শাসকের আশা ত্যাগ করেননি। তিনি মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বগির পাহাড়ী অঞ্চলের বারবার গোত্রগুলো থেকে কর আদায় করে প্রয়োজনীয় সম্পদের দ্বারা আবু আব্দুল্লাহ্‌র শক্তিকে সতেজ করে তুলতে সচেষ্ট হন। এ কাজে তাঁর কনিষ্ঠ ভাই ইয়াহিয়া ইবনে খালদুনও তাঁকে সাহায্য করেছিলেন; কারণ তখন তিনিও আমীর আবু

www.amarboi.org

আব্দুল্লাহ্‌র অধীনে চাকরিরত ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই শেষ রক্ষা হয়নি। ১৩৬৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আমীর আবু আব্দুল্লাহ্ অকালে মারা যান। তাঁর পরিবার-পরিজন একান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। ইবনে খালদুনের নিকট তাদের অবস্থার পরিবর্তন কিংবা নিজের আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের কোনো পথই খোলা ছিল না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে রক্ষা করার জন্যই আবুল আব্বাসের পক্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

বস্তুত এ সময়ের আট-নয়টি মাস ইবনে খালদুনের অস্থির জীবনে মারাত্মক দুশ্চিন্তা বহন করে আনে। তিনি তাঁর জীবন সম্পর্কে সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়েন। কারণ, আমীর আবু আব্দুল্লাহ্‌র পক্ষে তিনি যে ধরনের আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা শত্রুর মনে প্রতিহিংসা জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিলো। এ সময়ে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রাজনীতিতে তাঁর অনেকটা স্বাধীন বিচরণ সুযোগ পেলে ভিন্ন পথ গ্রহণ করতে পারতো; অন্তত মৃত আবু আব্দুল্লাহ্‌র কোনো সন্তানকে সম্মুখে দাঁড় করিয়ে তিনি ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কিছুই করেননি; করার উপায় ছিলো না। তবু আবুল আব্বাসের পক্ষে যোগ দিয়েই তিনি বুঝতে পারেন যে, এখানে তাঁর অবস্থান খুব সুবিধাজনক হবে না। সুতরাং কৌশল অবলম্বন করে তিনি আবুল আব্বাসের কিছুটা অসম্মতি সত্ত্বেও তাঁর পক্ষ থেকে রিয়াহ-ওয়াদিয়া বেদুইনদের মধ্যে কাজ করার জন্য বিস্করা চলে যেতে সক্ষম হন।

ইতিপূর্বেও আমরা লক্ষ করেছি যে, বেদুইনদের মধ্যে ইবনে খালদুনের পরিচিতি ও প্রভাব ছিল অসামান্য। বারবার বা আরব যে কোনো বেদুইন গোত্রে তিনি অবলীলাক্রমে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে তাদের মতামতে পরিবর্তন সাধন করতে পারতেন। বস্তুত তাঁর এ প্রকার পরিচয় ও প্রভাব আমাদেরকে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অমায়িকতা ও সারল্যের সে বৈশিষ্ট্য না থাকলে বেদুইনদের মধ্যে এ ধরনের প্রভাব বিস্তার তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। আসলে এ প্রভাবের সূত্রপাত হয় ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর তিউনিস ত্যাগের সময়। তখন তিনি বিস্করা, সিওটা ও বগির বিভিন্ন বেদুইন গোত্রে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এ কারণেই বর্তমানেও মূলত আশ্রয় লাভের জন্য তিনি তাদের মধ্যে ফিরে আসেন। কিন্তু বিস্করায় পৌঁছেই তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর ছোট ভাই ইয়াহিয়াকে আবুল আব্বাস নজরবন্দী করে রেখেছেন। ইবনে খালদুন চলে আসার সময় তাঁর এ প্রকার বিপদ হবে কল্পনা করতে পারেননি; কিন্তু এখন আর তাঁর পক্ষে ছোট ভাইকে উদ্ধার করার জন্য ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত ইয়াহিয়ার নজরবন্দী অবস্থা থেকে ইবনে খালদুন যেমন তাঁর প্রতি আবুল আব্বাসের আশঙ্কার কথা বুঝতে পেরেছিলেন, তেমনি একথাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এ হেফসী সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতির সহজ কোনো পথ নেই। সুতরাং ইবনে খালদুন অনন্যোপায় হয়ে বিস্করার বেদুইন গোত্রগুলোর মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন।

এ সময়ে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রাজনৈতিক অবস্থা এমন জটিল কিছু ছিল না। একটা সরল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে তিউনিস, তিলমিসান, বাঁগ ও কুস্তানতুনিয়ার

www.amarboi.org

ক্ষমতাধারীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছিলেন। বিশেষ করে ইবনে খালদুনের অবস্থান সংশ্লিষ্ট এলাকায় আবুল আব্বাস ও আবু হাম্মুর প্রতিযোগিতা দিন দিন লক্ষগোচর হয়ে উঠছিল। কিন্তু এ সকল শক্তির কোনটিরই এমন কোন প্রাধান্য ছিল না যে, অন্যগুলোকে অবলীলায় কুক্ষিগত করে নিতে পারে। একমাত্র শক্তির এ ভারসাম্য বিনষ্ট হতে পারত বেদুইন গোত্রগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে; বস্তুত তাদের যে কোনো একপক্ষে যোগদান অন্যপক্ষের পরাজয়কে সুনিশ্চিত করে তুলত। আর বলাবাহুল্য যে, ভাগ্য নির্ধারণকারী বেদুইনদের এ শক্তি ও সহায়তার উপর ইবনে খালদুনের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

বিস্করায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি মেলে ইবনে খালদুন যখন সময় কাটাচ্ছিলেন, তখন তিনি তিলমিসানের শাসক আবু হাম্মুর নিকট থেকে একটি আমন্ত্রণলিপি লাভ করেন। এ আবু হাম্মুর ইবনে খালদুনের পূর্বতন বন্ধু ও প্রভু বগির শাসক আবু আব্দুল্লাহ্‌র এক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। সেই সুবাদে তিনি ইবনে খালদুনকে নিজের পক্ষে টানতে চেষ্টা করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর শ্বশুর আবু আদুল্লাহ্‌র এককালের রাজ্যপাট বগি জয় করা এবং এক্ষেত্রে ইবনে খালদুন বেদুইনদের শক্তিকে তাঁর পক্ষে সংহত করে অনায়াসে তাঁকে সফল করে তুলতে পারেন। ইবনে খালদুন এ সাদর আমন্ত্রণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর তৎকালীন অনিশ্চিত অবস্থায় এ আবেদন এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিল। কিন্তু তবু এ আবেদনে সাড়া দিতে ইবনে খালদুন ইতস্তত করছিলেন। খুব সম্ভব আবু হাম্মুর অনিশ্চিত অবস্থাই এর কারণ ছিল। এজন্য দেখতে পাই ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মসে আবু হাম্মুর তাঁকে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পুনরায় যে প্রশংসাপূর্ণ পত্র লিখেন, তাতেও ইবনে খালদুন বিচলিত হননি। তবে অবস্থা পর্যালোচনার জন্য তিনি তাঁর ছোট ভাই ইয়াহিয়াকে আবু হাম্মুর নিকট পাঠিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া ইতিপূর্বে আবুল আব্বাসের কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়ে এখানে এসে ভাইয়ের সাথে বাস করছিলেন।

আবু হাম্মুর এ ধরনের সাদর আমন্ত্রণে সাড়া না দেবার কারণ হিসাবে আমরা ইতিপূর্বে তাঁর অনিশ্চিত অবস্থার কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু ইবনে খালদুন স্বয়ং এর যে কারণ উল্লেখ করেছেন, তা হল এ যে, রাজনীতির অনিশ্চয়তা ও উচ্চপদের স্থায়িত্বহীনতা তাঁর মন-মানসকে উত্যক্ত করে তুলেছিল। তদুপরি এ সবের মায়াজালে জড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে তিনি তাঁর জ্ঞানের পিপাসাকে অতৃপ্ত করে রেখেছিলেন। বস্তুত ইবনে খালদুনের জীবনে এ কয়টি বছরের রাজনৈতিক তিক্ত অভিজ্ঞতা, যাকে তিনি বিপদসংকুল জলাভূমিতে বিচরণের সাথে তুলনা করেছেন, তা নানাদিক থেকে তাৎপর্যবহ। এর ফলশ্রুতি হিসাবেই পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানার্জনের জন্য শান্ত পরিবেশ ও স্বস্তির প্রতি তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা বারংবার তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে। কারণ ইবনে খালদুন যথার্থই বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজনীতির উচ্চমঞ্চে একবার সমাসীন হলে, তার থেকে নেমে নিরাপদ আশ্রয়ে বেরিয়ে আসা খুবই কষ্টকর; বরং অনেকাংশে অসম্ভব। এ কারণেই খুব সামান্য কিছু সময় ছাড়া তিনি রাজকীয়

www.amarboi.org

পদমর্যাদার এ আবর্ত থেকে নিজেকে কখনোই সরিয়ে আনতে সক্ষম হননি। বস্তুত তিনি যে ধরনের বিশেষ ক্ষমতা, জ্ঞান ও গুণের অধিকারী ছিলেন, রাজ্য চালনায় তার চাহিদা ছিল সর্বত্র। এর সাথে মিশেছিল তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক অদ্ভুত আবেগ। এজন্যই দেখা যায়, যখন তাঁর রাজকীয় পদমর্যাদা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, কেবল তখনি তিনি শান্তি ও স্বস্তির কথা বলেছেন। অন্যথায় সময় ও সুযোগ দেখা দিলে উচ্চপদের আহ্বানে তিনি স্থির থাকতে পারেননি; তাঁর জীবন সংগ্রামের স্পৃহা তখন নতুনভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। এজন্যই আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে আবু হাম্মুর সাদর আমন্ত্রণে সাড়া না দেবার কারণকে তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেছিলাম। বস্তুত পরবর্তী ঘটনাবলির দ্বারা তাঁর এ দূরদৃষ্টি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

এ সময়ে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রাজনীতিতে এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। উদ্যোগী ও বীর্যবান মারিনী যুবক আবদুল আজিজের নেতৃত্বে পুনরায় এ সাম্রাজ্যের জাগরণ দেখা দেয়। তিনি ফেজের নতুন শাসকরূপে ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে তিলমিসান আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এর ফলে আবু হাম্মুর অবস্থা সাময়িকভাবে শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত সনের এপ্রিল মাসে শেষ পর্যন্ত ইবনে খালদুন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বেদুইনকে সঙ্গে নিয়ে আবু হাম্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আবদুল আজিজের ক্রমবর্ধমান শক্তির বিস্তার রোধ করা আবু হাম্মুর পক্ষে সম্ভব হবে না এবং পরিণামে তা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ইবনে খালদুনের অবস্থানকে অসম্ভব করে তুলবে। পূর্বতন মারিনী সম্রাট আবু সলিমের মৃত্যুর পর ফেজ ত্যাগ করার সময় মারিনীদের সঙ্গে ইবনে খালদুনের সম্পর্কের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়, তাতে করে মারিনী শাসকদের অভ্যুদয়ে তাঁর শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এজন্যই তিনি পুনরায় স্পেনে আশ্রয় গ্রহণ করার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বনি সায়েফ ও নিমারার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হুনাইন বন্দরে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় দেরি করতে বাধ্য হন। এ সময়ে সম্রাট আবদুল আজিজের একদল সৈন্যের হাতে ইবনে খালদুন ধরা পড়েন। মারিনী সম্রাট নিজের প্রয়োজনেই তাঁর গতিবিধির উপর লক্ষ রেখেছিলেন এবং তাঁর স্পেনে যাবার উদ্যোগ যথার্থই আবদুল আজিজকে বিচলিত করে তুলেছিল। কারণ এর ফলে তথাকার রাজশক্তির উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা আক্রমণের পরিকল্পনা ত্বরান্বিত হবে। বস্তুত তৎকালে ফেজ ও গ্রানাডার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। সুতরাং আবদুল আজিজের আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

যাহোক ধৃত ও নিগৃহীত ইবনে খালদুন সম্রাট আবদুল আজিজের দরবারে উপস্থিত হতে বাধ্য হলেন। সেখানে তাঁকে মারিনীদের সাথে পূর্ববর্তী তিক্ততার কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যাদান করতে হল এবং আবদুল আজিজের মনতুষ্টির জন্য বুঝিয়ে বলতে হল যে, বগি জয় করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার হবে। অবশ্য এ সত্ত্বেও ইবনে খালদুন মারিনী দরবার ত্যাগ করার কালে তাঁর জীবন সম্পর্কে সংশয়মুক্ত হতে পারেননি। সুতরাং তাঁর এ প্রকার অন্তরীণাবস্থা যখন মাত্র একরাত্রি স্থায়ী হল এবং পরদিন সকালেই তিনি মুক্তি পেলেন, তখন তিনি যথার্থই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তথাপি প্রথম সুযোগেই তিনি তিলমিসানের নিকটবর্তী 'আল-উব্বাদ'-এ গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে

www.amarboi.org

বিখ্যাত সাধক শায়ক আবু মাদায়েনের মাজার বিদ্যমান। ইবনে খালদুন সেখানে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় কাটিয়ে দিতে মনস্থ করলেন।

কিন্তু সম্রাট আবদুল আজিজের কবল থেকে এত সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে, কয়েক সপ্তাহ পরেই তাঁর কাঠোর নির্দেশ গিয়ে পৌঁছল যে, ইবনে খালদুনকে মারিনী সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় রাজকীয় পদমর্যাদা গ্রহণ করতে হবে। ইবনে খালদুন এ নির্দেশ অমান্য করার সাহস পাননি। আসলে আবদুল আজিজ বেদুইনদের মধ্যে ইবনে খালদুনের সেই অনন্য প্রভাবকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইবনে খালদুন কিঞ্চিৎ চেষ্টা করলেই তাদেরকে মারিনী সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করে দিতে পারেন। সুতরাং তাঁকে যখন এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি সানন্দে তা বরণ করে নিলেন। কারণ ইবনে খালদুনও মনে মনে মারিনীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান থেকে দূরে কোনো মুক্ত অঞ্চলে যাবার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। তাই ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট তিনি বিস্করায় গিয়ে পৌঁছান এবং আবার আরব বেদুইনদের রাজনীতিতে নিজকে জড়িত করে নেন। অবশ্য এবারকার তাঁর এ তৎপরতায় পূর্বেকার সেই উত্তাপ আর ছিল না। তবু সেখানে তাঁকে পূর্ণ দুটি বছর কাটাতে হয়।

এ সময় তিনি সম্রাট আবদুল আজিজের তরফ থেকে ফেজে চলে আসার জন্য একটি নির্দেশ পান। কিন্তু তাঁর ফেজে পৌঁছার আগেই আবদুল আজিজের মৃত্যু হয়। ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে তিনি ফেজের উদ্দেশ্যে বিস্করা ত্যাগ করেছিলেন; সাথে তাঁর পরিবার-পরিজনও ছিল। সুতরাং যাত্রার কয়েকদিন পরেই সম্রাটের এ মৃত্যু সংবাদ ইবনে খালদুনকে মানসিক দিক থেকে বিচলিত করে তুলেছিল। কারণ, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়, এতে অনেক সময় বন্ধুও শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ফেজের অবস্থা তাঁর জানা ছিল না; সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর এ প্রকার আশঙ্কাকে বাস্তব করে তোলার জন্য পথিমধ্যেই বিপদ ওৎ পেতে ছিল। আবু হাম্মুর নিয়োজিত একদল বেদুইন তাঁকে অনুসন্ধান করে ফিরছিল। তিনি তাদের হাতে ধরা পড়তে পড়তে কোনো প্রকারে বেঁচে যান এবং অনেক কষ্টে নভেম্বর মাসে ফেজে গিয়ে উপস্থিত হন। শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই তিনি তখন বিপর্যস্ত।

ফেজের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন একান্তই অস্থির এবং এ অস্থিরতা গ্রানাডার সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটায় আরো বিপদসংকুল হয়ে দাঁড়ায়। সিংহাসনে সমাসীন নতুন সম্রাট ও তদীয় প্রধানমন্ত্রী ইবনে গাজী এর ফলে এক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হন। ইবনে খালদুন এ ইবনে গাজীর সহায়তা লাভ করেছিলেন এবং জ্ঞানানুশীলনে নিজকে সমর্পণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর পতনে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একাই নিরাশ হয়ে পড়েন। নতুন সম্রাট আবুল আব্বাস আহমদ ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী ইবনে উসমানের বিরূপতায় তাঁর এ নিরাশা আরো বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ইবনে গাজীর পতনের মূলে যে কারণটি ছিল, তা ইবনে খালদুনের মন-মানসকে নিতান্তই বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

www.amarboi.org

এ কারণটি ইবনে খালদুনের পুরাতন বন্ধু গ্রানাডার বিখ্যাত সাহিত্যিক ও এককালের প্রধানমন্ত্রী ইবনে খতিবের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ইবনে খালদুন ফেজে আসার পূর্বেই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গ্রানাডার নতুন শাসক ইবনে আহমর উক্ত ইবনে গাজীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ইবনে খতিবকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে; কিন্তু তিনি তা করেননি। এর ফলেই গ্রানাডার ষড়যন্ত্রে তাঁর পতন ঘটে। ইবনে খালদুন এসব জানা সত্ত্বেও ফেজের বিরূপ পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গ্রানাডায় আশ্রয় নিতে সচেষ্ট হয়ে উঠেন। তাঁর ধারণা ছিল ইবনে খতিবের স্থলে নিয়োজিত নতুন প্রধানমন্ত্রী ইবনে জামরাক হয়ত তাঁর প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে পারবেন। কারণ, ইনিও বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং সম্রাট আবু সলিমের সময় ইবনে খতিবের সাথে ফেজে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তখনই ইবনে খালদুনের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। সুতরাং গ্রানাডার এ বিদ্বান প্রধানমন্ত্রীর অধীনে তাঁর জ্ঞানানুশীলনের কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা হতে পারবে। কিন্তু তাঁর যাবার আগ্রহ থাকলেও ফেজের নতুন শাসকরা কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁদের পক্ষে যতটুকু বাধা দেবার, তা তাঁরা দিয়েছিলেন; তবু ১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে ইবনে খালদুন গ্রানাডায় যাবার অনুমতি লাভ করেন। অবশ্য এ অনুমতি শুধু তাঁর একার জন্যই ছিল, তাঁর পরিবার-পরিজনের অন্য কাউকে যাবার অনুমতি দেয়া হয়নি।

গ্রানাডায় যাবার পথেই সমুদ্র বন্দরে ইবনে জামরাকের সাথে ইবনে খালদুনের সাক্ষাৎ হয়। ইবনে জামরাক তখন ইবনে খতিবের বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য ফেজে আসছিলেন। ইবনে খালদুনের গ্রানাডা গমনকে তিনি স্বাগত জানান এবং ফেজের শাসককে তাঁর পরিবার-পরিজন গ্রানাডায় পাঠিয়ে দেবার জন্য সুপারিশ করবেন কথা দেন। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হয়নি। কারণ এর কিছুদিন পরেই ইবনে খালদুন জানতে পারেন যে, ইবনে খতিব নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন। কৌশলে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয় এবং অশেষ নির্যাতন করে তাঁকে হত্যা করা হয়। গ্রানাডার এ বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক কবরের অধিকারটুকুও পাননি; তাঁর মরদেহকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল।

ইবনে খালদুনের এ প্রকার মানসিক অবস্থায় গ্রানাডার রাজদরবারে ফেজের একটি আবেদন গিয়ে পৌঁছে। তারাও ইবনে খালদুনকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেবার জন্য গ্রানাডার শাসককে অনুরোধ জানান। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইবনে খতিবের ন্যায় তাঁকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। কিন্তু গ্রানাডার শাসক ইবনে খালদুনের প্রতি এতটা নিষ্ঠুর হতে পারেননি। তারা তাঁকে ফেজের শাসকদের হাতে না দিয়ে আফ্রিকায় ফেরত পাঠান। ভগ্নমনোরথ ও বিপর্যস্তদেহ ইবনে খালদুন হুনাইন বন্দরে অবতরণ করে উদ্দেশ্যহীন ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করতে থাকেন। এ সময় তাঁর পূর্বতন বন্ধু বনি আরিফের গোত্রপ্রধান মুহম্মদ ইবনে আরিফের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর সহায়তায় শেষ পর্যন্ত তিনি আবু হাম্মুর কাছে যাবার সুযোগ লাভ করেন। আবু হাম্মুর তখন পুনরায় তিলমিসানের শাসনক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। ইবনে খালদুন তাঁর অনুমতি নিয়ে তিলমিসানের পার্শ্ববর্তী 'আল উব্বাদ'-এ এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁর পরিবার-পরিজনও এখানে এসে তাঁর সাথে মিলিত হন।

www.amarboi.org

এভাবে ইবনে খালদুন আবু হাম্মুর আশ্রয়লাভ করলেও তাঁর মনে শান্তি ছিল না। গত কয়েক বছর ধরে রাজনীতির যে লীলা তিনি অবলোকন করেছিলেন এবং যেভাবে এর সাথে জড়িত হয়ে নিজকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তা তাঁর মন-মানসকে ক্রমশ বিষিয়ে তুলেছিল। বিশেষ করে তাঁর বন্ধু ইবনে খতিবের করুণ পরিণতি তাঁকে এ খেলার নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল। এজন্যই আবু হাম্মুর সাথে ইতিপূর্বেকার তিক্ত সম্পর্ক সহজ হয়ে আসায় তিনি আরো শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, যে কোনো সময়ে আবু হাম্মু তাঁকে রাজকীয় কার্যে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাতে পারেন এবং অনুরূপ পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। তদুপরি ইবনে খালদুনের ছোট ভাই ইয়াহিয়া পূর্ব থেকেই আবু হাম্মুর অধীনে কর্মরত ছিলেন। সুতরাং নানা দিক থেকে দুশ্চিন্তায় তাঁর মানসিক অবস্থা বারবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিল।

এমনি অবস্থায় আবু হাম্মু তাঁকে তাঁর পক্ষ থেকে 'দাওয়াইয়া' আরব বেদুইন গোত্রে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। রাজকীয় পদ থেকে মুক্তি পাওয়ার এ সুযোগ ইবনে খালদুন হাতছাড়া হতে দেননি। তিনি অতি সত্বর তিলমিসান ত্যাগ করেন এবং সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অবস্থিত যুগানা গোত্রের এক শক্তিমান শাখা বনি আরিফের আশ্রয়ে গিয়ে উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে এ বনি আরিফেরই গোত্রপ্রধান মুহম্মদ ইবনে আরিফ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন; এবারও তিনি সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁর মধ্যস্থতার ফলেই আবু হাম্মুর সম্ভাব্য বিরূপতা স্তিমিত হয়ে আসে এবং খালদুন সপরিবারে বনি আরিফের আশ্রয়ে বসবাস করার সুযোগ পান।

ইবনে খালদুনের প্রতি বনি আরিফের এ সহায়তা ও আশ্রয়দান ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার নগর পরিবেশ ও রাজদরবারগুলো যা পারেনি বনি আরিফ তা সম্ভব করে তুলেছিল। বস্তুত তাদের এ প্রকার নিরাপদ আশ্রয় না পেলে খালদুনের পক্ষে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি আল-মুকাদ্দিমা রচনা করা হয়ত সম্ভব হয়ে উঠত না। মুহম্মদ ইবনে আরিফের সাথে ইবনে খালদুনের বন্ধুত্বের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যদ্দুর মনে হয়, ইবনে খালদুনের পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই এ বন্ধুত্বের সূত্রপাত। সুতরাং এবার যখন ইবনে খালদুন সেই পাণ্ডিত্য ও এর ফলশ্রুতি সম্পর্কে তাঁর এ বেদুইন বন্ধুকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, তখন সর্বপ্রকারের সুযোগ তাঁর জন্য অবারিত হয়ে উঠল। এক সময়ে মারিনী সম্রাট আবু ইনান বনি আরিফের সহায়তায় মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে গ্রামসহ একটি দুর্গ দান করেছিলেন। ইবনে খালদুন সপরিবারে সেই দুর্গ 'কেলাতু ইবনে সালামা'য় বসবাস করার সুযোগ লাভ করলেন। বস্তুত এমন শান্তিপূর্ণ নিরাপদ পরিবেশ ইবনে খালদুন ইতিপূর্বে আর কোথাও পাননি।

প্রায় দুই যুগ পূর্বে মারিনী সম্রাট আবু ইনানের দরবারে থাকাকালে ইবনে খালদুন তাঁর গঠনমূলক শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি টেনেছিলেন। এরপর জীবন সংগ্রামের বিচিত্র লীলা দেখতে দেখতে এবং আবর্তমান ইতিহাসের নিকট থেকে অনেক কিছু শিখতে শিখতে তাঁর সময় কেটেছে। এরই মধ্যে সময় পেলেই তিনি তাঁর লেখনীর তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। কিন্তু জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি বহন করবে যে কীর্তি, তাকে ভাষাদান করার কোনো সুযোগই তিনি পাননি। তাই এবার এ কেলাতু ইবনে

www.amarboi.org

সালামার নির্জন নিরুপদ্রব পরিবেশে তাঁর সেই তিল তিল সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি পৃথিবীর ইতিহাস—'কিতাবুল ইবার' লিখতে বসলেন। কী গভীর আবেগ ও ঐকান্তিক প্রেরণা এ সময়ে তাঁর সমগ্র চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এর পরিচয় তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এক সর্বগ্রাসী মহৎ অনুপ্রেরণায় বুঁদ হয়ে আমি আমার পরিকল্পিত ইতিহাসের ভূমিকা শেষ করেছি এবং এটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অদ্ভুতভাবে সে নিজেই তার শব্দ ও অর্থের যোগান দিয়ে গেছে।' এ ভূমিকাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'আল-মুকাদ্দিমা'; ৭৭৯ হিজরি বা ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এটি সমাপ্ত করেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত ইতিহাস সমাপ্ত করতে তাঁকে আরো চার বছর পরিশ্রম করতে হয় এবং এ সময়ে তিনি তিউনিসের গ্রন্থাগারগুলোর সাহায্য গ্রহণ করতে সমর্থ হন।

ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনী, আল-মুকাদ্দিমা কিংবা তাঁর ইতিহাসের কোথাও এ কথার উল্লেখ করেননি যে, তিনি আল-মুকাদ্দিমার পূর্বে অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা শুধু জানতে পেরেছি যে, বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি বহু দীর্ঘ কবিতা ও পত্রাদি রচনা করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীতে এসবের অনেক উদ্ধৃতিও বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে তাঁর ভাষাজ্ঞান ও বাক্‌বৈদগ্ধের যে পরিচয় রয়েছে, তা যে কোনো বিচারে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর স্থান নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। এমন কি তিনি যদি আল-মুকাদ্দিমা ও ইতিহাস রচনা নাও করতেন, তা হলেও সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হত। কিন্তু এ সকল গদ্য ও পদ্যের কোনো সংকলনও তিনি ইতিপূর্বে প্রকাশ করেননি। তাঁর আত্মজীবনীতে শুধু একটি রচনার কথাই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত হয়েছে, যা তিনি ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তৈমুরলঙের নির্দেশে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ভূগোল সম্পর্কীয় দীর্ঘ বিবরণ তাঁর পাণ্ডিত্যের কোনো বিশেষ পরিচয় বহন করে না। যদ্দুর মনে হয়, এটি ইবনে খালদুনের একান্তই অনিচ্ছাকৃত রচনা; তদুপরি এটি কখনো প্রকাশিতও হয়নি। অথচ এর তুলনায় বহুগুণ বেশি জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ইবনে খালদুনের ছিল। তিনি প্রথম জীবনে বহু পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। আমরা তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও বন্ধু ইবনে খতিবের বর্ণনা থেকে এ সংবাদ জানতে পারি।

ইবনে খতিব ইবনে খালদুনের যে সকল গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে 'কসিদা বুরদা' সম্পর্কীয় তাঁর একটি টীকা, যার মধ্যে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য ও বহু বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। তিনি ইবনে রুশদের বহু রচনার সার-সংক্ষেপও তৈরি করেন। যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়নকালে ইবনে খালদুন তৎকালীন শাসকের জন্য এর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি রচনা করেন এবং এর মধ্যেও তাঁর বিষয় অনুধাবনের গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম ফখরুদ্দিন রাযীর 'আল-মুহাসসাল' গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্তসারও ইবনে খালদুন রচনা করেন এবং ইবনে খতিবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়কালে এ নিয়ে তাঁরা আলোচনাও করেন। ইবনে খতিবের লেখা ফেকাহশাস্ত্র সম্পর্কীয় একটি 'রেয়াজ' পদ্যের একটি বিস্তারিত ভাষ্য রচনা করেছিলেন ইবনে খালদুন। ইবনে খতিবের মতে এটি তাঁর শাস্ত্র সম্পর্কীয় গভীর পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধে

www.amarboi.org

পরিপূর্ণ। এ ছাড়া ইবনে খালদুন হিসাবশাস্ত্র সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধরনের গ্রন্থও রচনা করেন। ইবনে খতিব এগুলোর বাইরেও তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনা এবং রাজকীয় নথিপত্রের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁর কবিত্ব শক্তি সম্পর্কেও ইবনে খতিবের শ্রদ্ধাবোধ ছিল। আর এসব কিছুই ছিল আল-মুকাদ্দিমা রচনার পূর্বকালীন তাঁর লেখনীর তৎপরতা।

বস্তুত যে কোনো একজন সাধারণ লেখকের জন্য জীবনের প্রথম ত্রিশ বছরে উল্লেখিত রচনাবলির অধিকারী হওয়া লেখক হিসাবে স্বীকৃতি লাভের জন্য যথেষ্ট ছিল। অবশ্য ইবনে খালদুনের অসাধারণ প্রতিভার জন্য এ ধরনের স্বীকৃতি একান্তই মূল্যহীন। কারণ, এর কোনোটিই তাঁর প্রতিভার যথার্থ পরিচয় বহন করে না; কেননা আমরা একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাব যে, এ সকল রচনার অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক; তাও প্রায় সর্বাংশেই মৌলিকত্ব বর্জিত। তদুপরি ইবনে খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় যে কোনো রচনার সংক্ষিপ্তসারকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক স্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এসব কিছু মিলিয়েই তিনি তাঁর প্রথম জীবনের রচনাবলির উল্লেখ কোথাও করেননি। এতে আমরা কিঞ্চিৎ বিস্ময়বোধ করলেও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করব যে, তাঁর মহৎ প্রতিভার তুলনায় এ সকল রচনার মূল্যমান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বস্তুত আল-মুকাদ্দিমাই তাঁর কালজয়ী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং এজন্যই তিনি শুধু ঐতিহাসিক দর্শনের জনক নন, সর্বকালের স্মরণীয় ও বরণীয় মনীষা হিসাবেও স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

ইবনে খালদুনের এ মহৎ সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবার চেষ্টা করব। কিন্তু এখানে বিস্তারিত কিছু বলবার না থাকলেও একটি কথা আমাদেরকে বলতে হবে যে, তাঁর এ মহৎ সৃষ্টিই তাঁর অন্যান্য অনেক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকে অবহেলার বিষয় করে তুলেছে। যে ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে তিনি এ আল-মুকাদ্দিমা রচনা করেছিলেন, স্বয়ং সে ইতিহাসই এর ছায়ায় নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এজন্যই যদ্দুর মনে হয়, তাঁর ইতিহাসের অন্যান্য অংশের প্রতি এ পর্যন্ত খুব সুবিচার করা হয়নি। অন্তত কিতাবুল ইবারের প্রতি এ পর্যন্ত যে ধরনের কটুকাটব্য করা হয়েছে, তা সর্বাংশে সত্য নয়। এ সকল বিরূপ মন্তব্যের অধিকাংশের জন্যই আমরা তাঁর শত্রুতায় আচ্ছন্ন সমালোচকদেরকে দায়ী করতে পারি। অবশ্য বিরূপ মন্তব্য প্রকাশের এ কাজটি আরম্ভ করেছিলেন ইবনে খালদুনের সুযোগ্য মিশরীয় শিষ্য ইবনে হজর আস্কালানী। তিনি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন যে, ইবনে খালদুনের ইতিহাসে পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্যগুলোর যে বিবরণ বিদ্যমান, তাতে এমন কোনো বিশেষত্ব নেই, যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। বস্তুত ইবনে হজরের এ মন্তব্যটি অনেকাংশে সত্য হলেও এমন কোনো বিশেষ জ্ঞানের সন্ধান দেয় না। কারণ এ সম্পর্কে ইবনে খালদুন নিজেই তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর ইতিহাসটিকে মূলত বারবারদের বিবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন। কারণ তিনি যেভাবে এ ইতিহাস রচনা করতে চান, তাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন; অথচ পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে তাঁর এ প্রকার অভিজ্ঞতার একান্তই অভাব। এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে মাসউদীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার

www.amarboi.org

কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্যগুলোর বিবরণ যে, বৈশিষ্ট্যহীন চর্বিত চর্বণে পর্যবসিত হবে, এ সম্পর্কে স্বয়ং ইবনে খালদুন অবহিত ছিলেন। তবু ইতিহাস রচনার পূর্বাপর ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য তাঁকে এ সকল বিবরণ সন্নিবেশ করতে হয়েছে। অবশ্য এ সত্ত্বেও এ সকল বিবরণে ইবনে খালদুনের নিজ পরিবেশন বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক সংযোজনের পরিচয়ও বিদ্যমান। তবু তুলনামূলকভাবে তাঁর ইতিহাসে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বিবরণাবলিই অধিকতর মনোজ্ঞ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর কারণও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি; এক্ষেত্রে ইবনে খালদুনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। এজন্যই তাঁর এ বিবরণ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এখনো অপরিহার্য উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

অবশ্য আধুনিক সমালোচকেরা ইবনে খালদুনের ইতিহাস সম্পর্কে ভিন্নদিক থেকে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল, ইবনে খালদুনের ইতিহাস তাঁর আল-মুকাদ্দিমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিবেচিত হয়নি। ভূমিকায় তিনি যে নতুন আশাবাদে পাঠককে উজ্জীবিত করেছিলেন, তাঁর ইতিহাসের বিবরণ সে তুলনায় অনেকখানি নিরাশাব্যঞ্জক। এ মন্তব্য যত কঠোরই হোক না কেন, এতে সত্য আছে। তবে এর সঙ্গে একথাও অবশ্যই আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, সমালোচকরা ইবনে খালদুনের সীমাবদ্ধ অবস্থার প্রতি সর্বাংশে দৃষ্টি দেননি। কারণ আল-মুকাদ্দিমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমগ্র ইতিহাসকে বিচার করতে হলে যাযাবর নাগরিক নির্বিশেষে সমুদয় জীবন পরিবেশের যে বাস্তব বিবরণ সম্মুখে থাকা দরকার, তা ইবনে খালদুনের আয়ত্তে ছিল না। এমনকি পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষেত্রেও একথা তুলনামূলকভাবে প্রযোজ্য। বস্তুত ইবনে খালদুন কোনো কোনো প্রতিভাধরের পক্ষেই এর প্রয়োজনীয় সামগ্রিক বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তদুপরি তৎকালীন পরিবেশের সীমাবদ্ধতাকেও আমাদের স্মরণ করা উচিত। এমনিতেই তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না; এক্ষেত্রে আল-মুকাদ্দিমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমগ্র ইতিহাসকে শুধরে নেবার চেষ্টা করলে, সে শত্রুতা আরো মারাত্মক হয়ে উঠত এবং ঐতিহাসিকসহ তাঁর ইতিহাসকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করত না। এর একটি সামান্য উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। আল-মুকাদ্দিমায় ইবনে খালদুন আরবীয় সাম্রাজ্যের বিকাশ, তার সংস্কৃতি চেতনা ও স্থাপত্য কীর্তি সম্পর্কে যে বাস্তব ও কঠোর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, এর সত্যতা অস্বীকার করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবু এরই ফলে আরবীয় জগৎ তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল। মিশরে অবস্থানকালে তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতার যে বিষাক্ত চক্র গড়ে উঠে, এর মূলে তাঁর এ প্রকার মন্তব্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনেকখানি উৎসাহ যুগিয়েছিল।

সুতরাং ইবনে খালদুনের পক্ষে যা সম্ভব ছিল না, তা নিয়ে তাঁকে দোষারোপ করে লাভ নেই; বরং তিনি যে তাঁর ঐতিহাসিক মানবিক দৃষ্টিকোণকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন, এ আমাদের পরম লাভ। তিনি নিজেই তাঁর এ সীমাবদ্ধতাকে ভাষা দিয়ে বলেছেন যে, কোনো নতুন বিষয়ের উদ্ভাবকের পক্ষে কখনোই তার সামগ্রিক বা প্রায়োগিক সম্পূর্ণতা বিধান করা হয় না; উত্তরসূরিরাই সে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

www.amarboi.org

সময়ের ব্যবধানে হলেও পরবর্তীকালে সে দায়িত্ব নানা স্থানে নানাভাবে পালিত হয়েছে এবং আমাদের মনে হয়, অনেক দেরিতে হলেও আমাদের এদেশেও সে দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সে যাহোক, কেলাতু ইবনে সালামায় ইবনে খালদুন তাঁর ইতিহাসের ভূমিকা শেষ করার পর পুনরায় স্বভাবতঃই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর ন্যায় একজন সাহচর্যপ্রিয়, অস্থির কর্মী পুরুষের জন্য দীর্ঘদিন এমনি এক নির্জন পরিবেশে আবদ্ধ থাকা ক্রমশ অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল। সুতরাং তিনি সে স্থান ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন। তদুপরি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্যও এ স্থান ত্যাগ করার প্রয়োজন ছিল। কারণ এখানে শান্তি থাকলেও প্রয়োজনীয় বই পুস্তক ও জ্ঞানীগুণীর সাহচর্যের অভাব ছিল। সেজন্যই ইবনে খালদুন তিউনিসে ফিরে যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কারণ তাঁর জানা মতে এক মাত্র তথাকার গ্রন্থাগারগুলোই তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু নিজের জন্মভূমি তিউনিসে প্রবেশ করাও তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। তখন সেখানে শাসক ছিলেন হেফসী সম্রাট আবুল আব্বাস। এ আবুল আব্বাস সেই ব্যক্তি, এখন থেকে এগার বছর পূর্বে ইবনে খালদুন যার পক্ষাবলম্বন করে পরে দূরে সরে গিয়েছিল। কাজেই তিউনিসে প্রবেশ করতে হলে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। ইবনে খালদুন একজন গবেষকের জ্ঞান সাধনার প্রয়োজন উল্লেখ করে তাঁর কাছে তিউনিসে আসার অনুমতি দেবার জন্য আবেদন জানালেন। সম্রাট আবুল আব্বাস খালদুন পরিবারের ঐতিহ্য ও ইবনে খালদুনের পাণ্ডিত্যের প্রতি মোটামুটি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এজন্যই শেষ পর্যন্ত তাঁকে তিউনিসে ফিরে আসতে অনুমতি প্রদান করেন। ইবনে খালদুন ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে সপরিবারে তিউনিসে ফিরে আসেন।

এ তিউনিস ইবনে খালদুনের জন্মস্থান ও আকৈশোরের লীলাভূমি, এখানে তাঁর পিতৃপুরুষ তথা পিতামাতার কবর অবস্থিত এবং এখানেই খালদুন পরিবারের প্রায় শতাব্দীকালীন স্থায়ী আবাসগৃহ ছিল; সুতরাং দীর্ঘদিন পরে তিনি এখানে ফিরে এসে খুবই স্বস্তি অনুভব করছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এখানেই তিনি জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তার সে ইচ্ছা ফলবতী হয়নি। এ ক্ষেত্রে তাঁর নিজের দোষ কতটুকু ছিল, তা জানার উপায় নেই; তবে আমরা ইতিপূর্বেই একবার বলেছি যে, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও গুণপনাই তাঁর শত্রু সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তৎকালীন কোনো পরিবেশই তাঁর এ সর্বজয়ী প্রভাবে আতঙ্কিত না হয়ে পারেনি। যদ্দুর মনে হয়, বর্তমানেও আমরা সেই প্রভাবেরই অমোঘ ফল তাঁর তিউনিস ত্যাগের মধ্যে লক্ষ করব।

সম্রাট আবুল আব্বাস ইবনে খালদুনকে তিউনিসে আগমনের অনুমতি দিলেও সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত হতে পারেননি; অবশ্য তাঁর ব্যবহারের মধ্যে সে সংশয়ের কোনো চিহ্ন ছিল না। অথচ ইবনে খালদুনের প্রতি তাঁর এ প্রকার সাধারণ ব্যবহারই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল। বিশেষ করে যারা আবুল আব্বাসের সঙ্গে ইবনে খালদুনের পূর্ববর্তী তিক্ত সম্পর্কের কথা জানতেন, তারা আপাত দৃশ্যমান এ সহজ সম্পর্কের মধ্যেই ইবনে খালদুনের প্রভাবের সূত্রপাত কল্পনা করে নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। এজন্যই এরপর আবুল আব্বাস এক সামরিক অভিযান পরিচালনাকালে

www.amarboi.org

তারা ইবনে খালদুনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। তারা সম্রাটকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইবনে খালদুন তিউনিসে থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারেন। সুতরাং সম্রাট তাঁকে অভিযানের সঙ্গী হতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ইবনে খালদুন এ ধরনের রাজকীয় অভিযানের সঙ্গী হবার উৎসাহ উদ্দীপনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই একান্ত অনিচ্ছা ও উদাসীনতার সাথে তিনি এতে যোগদান করেন। সম্রাটের নিকট তাঁর এ প্রকার অনিচ্ছা লুক্কায়িত থাকেনি এবং স্বার্থান্বেষীরাও এর মধ্যে নিজেদের ধারণার সত্যতা আবিষ্কার করে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। ইবনে খালদুন নিজেও এ সকল চক্রান্ত সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। এ কারণেই তিনি তাঁর ইতিহাসের একটি পাণ্ডুলিপি সম্রাট আবুল আব্বাসের নামে উৎসর্গ করেন। তাঁর ধারণা ছিল, এর মধ্য দিয়ে সম্রাটের প্রতি তাঁর আনুগত্য সম্পর্কে সংশয়ের অবসান ঘটবে। কিন্তু প্রচলিত প্রথা অনুসারে এ পাণ্ডুলিপির শেষে সম্রাট ও তাঁর শাসনকালের গুণকীর্তন সংবলিত কোনো অধ্যায় ছিল না; অবশ্য ইবনে খালদুন একটি দীর্ঘ কবিতায় সে কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তথাপি স্বার্থান্বেষীরা তাঁর এ প্রকার আচরণের মধ্যেও আনুগত্যের অভাব আবিষ্কার করেছিল। ফলে দরবারী চক্রান্তকারীরা অনবরত ইবনে খালদুনের বিরুদ্ধে তাদের হীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার উৎসাহে মেতে উঠেছিল।

অথচ ইবনে খালদুন তখন মনে প্রাণে শান্তি কামনা করছিলেন। কারণ তাঁর উপর তখন তাঁর পরিকল্পিত ইতিহাসটি সর্বাঙ্গসুন্দর করে সম্পূর্ণ করার মতো গুরুদায়িত্ব চেপে বসেছিল। এ কারণেই সাময়িকভাবে দরবার বা দরবারী মর্যাদার প্রতি তাঁর লোভ ছিল না বললেই চলে। সম্ভবত এজন্যই তিনি তিউনিসে এসেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য শিক্ষার্থীদের ভীড় জমতে থাকে। এভাবে অতি অল্প দিনেই তিনি তিউনিসের শিক্ষা পরিবেশে নিজের বিশিষ্টতা সপ্রমাণ করতে সক্ষম হন। ফলে এখানেও শত্রুতার আবির্ভাব ঘটে। তাঁর এ প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইবনে আরফা বিদ্বেষী হয়ে উঠেন এবং নানাভাবে ইবনে খালদুনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় যোগ দেন। এর কারণ হিসাবে যতটুকু জানা যায়, ইবনে খালদুন তাঁর চেয়ে বয়সী এ পণ্ডিতের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাপোষণ করতে অসমর্থ হন। তদুপরি তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ইবনে আরাফার শিক্ষার্থীদেরকেও আকর্ষণ করে এনে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এ সকল কারণে তিউনিসের এ প্রধান বিচারক দারুণভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেন। ফলে তাঁর এ প্রকার শত্রুতার মনোভাব জীবনের শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। এজন্যই অনেক পরে, যখন ইবনে খালদুন মিশরে প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত, তখন ইবনে আরাফা হজ্জে গমনকালে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, প্রধান বিচারকের পদটিকে তিনি একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদ বলেই জানতেন; কিন্তু তাতে ইবনে খালদুনের ন্যায় এক ব্যক্তির অধিষ্ঠান দেখে সে সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। বস্তুত তার এ প্রকার মন্তব্য ইবনে খালদুনের তৎকালীন মিশরীয় শত্রুদেরকে যথেষ্ট উত্তেজিত করেছিল। সুতরাং বর্তমানে তিনি যে তিউনিসের পরিবেশকে ইবনে খালদুনের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য।

www.amarboi.org

এভাবে ইবনে খালদুন দুদিক থেকেই আক্রান্ত হয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ক্রমশ সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং পুনরায় যখন সম্রাট আবুল আব্বাস অন্য একটি সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তখন ইবনে খালদুন তাতে তাঁর যোগদান সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে দেশত্যাগের প্রস্তুতি নিলেন। এছাড়া তাঁর পক্ষে অন্য কিছু করার উপায় ছিল না; স্বদেশ যদি শত্রুতায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠে, তাহলে বিদেশে আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর কি! কাজেই তিনি সম্রাটের নিকট হজ্জব্রত পালনের জন্য অনুমতি চাইলেন। এ ব্যাপারে সম্রাটের পক্ষ থেকে অনুমতি দেবার কোনো বাধা ছিল না; তবু সতর্কতাবশত তিনি সপরিবারে যাবার অনুমতি দেননি। কারণ, ইবনে খালদুন হজ্জব্রত পালন করুন আর না করুন, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করতে চাইলে সম্রাট তাঁর পরিবার-পরিজনকে নজরবন্দী করে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন। কিন্তু এর আর প্রয়োজন হয়নি; ইবনে খালদুন তাঁর অবশিষ্ট জীবনে আর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ফিরে আসেননি।

১৩৮২ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে ইবনে খালদুন তাঁর জন্মভূমির শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের নিকট বিদায় নিয়ে তিউনিস ত্যাগ করেন। বন্দরে এ সময়ে বহুলোক উপস্থিত হয়েছিলেন। সকলের সঙ্গেই এ তাঁর শেষ দেখা; এমনকি তাঁর পরিবার-পরিজনের সঙ্গেও। পূর্বদিকেই তিনি যাত্রা করেছিলেন; কিন্তু আপাতত হজ্জব্রত উদযাপন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় মিশরের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে যে সপ্রশংস মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা শুধু মুখের কথা নয়, তাঁর অন্তরেও এদেশটির প্রতি এ গভীর আকর্ষণ বিরাজ করছিল। তিনি সেখানেই আশ্রয় নেবার চেষ্টা করলেন। অথচ সেখানে যাবার জন্য তাঁর ন্যায় মহৎ ব্যক্তির পক্ষেও হজ্জব্রতের অজুহাত সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। কারণ মিশরের কথা বললে তিনি অনুমতি পেতেন কিনা সন্দেহ। তবে এ ব্যাপারে ইবনে খালদুন শুধু একা নন; এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁর পূর্বসূরি অনেকেই অনুরূপ অজুহাতে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এক্ষেত্রে ইবনে খালদুন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন মাত্র।

সে যাহোক, প্রায় চল্লিশ দিন সমুদ্র যাত্রার পর ইবনে খালদুন আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে অবতরণ করেন। পরে সেখান থেকে ১৩৮৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি কায়রো যেতে সমর্থ হন। সেখানে পৌঁছেই তাঁর মনে হয়, তিনি যেন এক নতুন জগতে প্রবেশ করেছেন। কায়রো সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা ছিল, তা তিনি দূর থেকে জানা ও লোক মুখে শোনা বিষয়াদির দ্বারা গড়ে তুলেছিলেন; কিন্তু বাস্তব উপস্থিতি সে ধারণাকে ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেনের বহু নগরী তিনি দেখেছেন; কিন্তু কায়রোর সাথে এদের কারোর কোনো তুলনাই চলে না। এর বিস্তৃত জনবহুল পথঘাট, এর সুদৃশ্য আকাশচুম্বী সৌধমালা, এর পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ বিপণিকেন্দ্র, এর শিক্ষার্থীমুখর বিচিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি নীলনদের বদান্যতায় সৃষ্ট এর মনোরম প্রাকৃতিক শোভা ইবনে খালদুনের মনে এক অদ্ভুত আবেগের সৃষ্টি করেছিল। ফলে তিনি এখানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটিয়ে দেবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন।

www.amarboi.org

কিন্তু কায়রো তাঁর হৃদয়কে যতই আকৃষ্ট করুক, এখানে নিজের যোগ্য স্থান লাভ করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার খালদুন পরিবারের সর্বব্যাপী পরিচিত এবং তদসংশ্লিষ্ট বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় যে সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, এখানে তার কোনোটাই তেমনভাবে উপস্থিত ছিল না। অবশ্য একথা সত্য যে, তৎকালে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার অনেক ভাগ্যান্বেষী নানা কাজে ব্যাপৃত হয়ে মিশরে অবস্থান করছিল এবং ইবনে খালদুনের নিজের ও তাঁর বংশের খ্যাতি স্বল্প পরিমাণে হলেও সেখানে এসে পৌঁছেছিল; তবু শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও গুণপনাই তাঁকে এ অপরিচিত পরিবেশে তাঁর যোগ্য মর্যাদা লাভে সহায়তা করেছে। এরই কল্যাণে তিনি কায়রো পৌঁছার পরই আলাউদ্দিন তিম্বুগা জাওয়ানী নামে এক প্রভাবশালী তুর্কি আমীরের সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বস্তুত এ আমীরই তাঁকে কায়রোর তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে পরিচিতি লাভের প্রাথমিক সুযোগ করে দেন এবং তাঁরই মাধ্যমে মিশরের তৎকালীন শাসক সম্রাট মালীক জহীর বারকুকের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে।

ইবনে খালদুনের মিশরে পৌঁছার কিছুদিন পূর্বেই এ নতুন সম্রাট ক্ষমতায় এসেছিলেন। সুতরাং তিনি স্বভাবতঃই তাঁর সভাসদদের গুণগত মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নতুন মনীষা ও নতুন ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধানে ছিলেন। ইবনে খালদুনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাই তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বস্তুত ইবনে খালদুনের প্রতি তাঁর এ প্রকার মুগ্ধাবস্থা সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং তাঁরই বদান্যতায় তিনি ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপনা ও প্রধান বিচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। এমনিভাবে ইবনে খালদুন কায়রোতে তাঁর জীবনের শেষ তেইশটি বছর কাটিয়ে দেবার সময় যে ধরনের অযাচিত বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন, তেমনটি তাঁর ভাগ্যে অন্য কোথাও ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পরিবেশে এ প্রকার বন্ধুত্ব লাভ ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। আবার এরই ফলে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক শত্রুচক্রও গড়ে উঠেছিল, যা তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে বারংবার প্রতিহত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। সাময়িকভাবে শত্রুদের এ চেষ্টা সাফল্যলাভ করলেও তা স্থায়ী হয়নি এবং বন্ধুদের আশ্বাস ও সহায়তা সর্বদাই ইবনে খালদুনকে নবীন উদ্যমে আশাবাদী করে তুলেছে। নতুবা ইবনে খালদুনের পক্ষে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কায়রোতে অবস্থান করা সম্ভব হত না। তিনি অন্যান্য স্থানের মতো এখান থেকেও অন্য কোথাও পাড়ি জমাতেন।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মিশরে স্বল্প পরিমাণে হলেও ইবনে খালদুনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এসে পৌঁছেছিল। বিশেষ করে তাঁর আল-মুকাদ্দিমার ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়বস্তুর সুখ্যাতি ও নিন্দা উভয়েই কায়রোর শিক্ষিত সমাজকে ইতিপূর্বেই কিয়ৎ পরিমাণে উৎসাহী করে রেখেছিল। সুতরাং স্বয়ং লেখকের কায়রো উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে সাহচর্যের আগ্রহ সৃষ্টি করে। ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে এ আগ্রহের মনোজ্ঞ বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের সর্বপ্রকার চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এজন্যই তাঁর

www.amarboi.org

বক্তৃতামালায় অনেকেই যেমন নিরাশ হয়েছেন, তেমনি অনেকেই নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। বস্তুত ইবনে খালদুন তাঁর নিজের বিষয় পরিধিতে একান্তই অসাধারণ ছিলেন এবং তাঁর বিষয়বস্তু প্রকাশের ওজস্বিতা ছিল সর্বতোভাবে আকর্ষণীয়। তাঁর এ গুণটি না থাকলে কায়রোর বিদ্বজ্জন পরিবেশে তাঁর অবস্থান খুব স্থায়ী হতে পারত না। কারণ, তৎকালীন সীমাবদ্ধতা অনুসারে তাঁর কোনো রচনারই প্রচুর অনুলিপি প্রস্তুত করে আগ্রহী পাঠকদের ঔৎসুক্য পূরণ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং একান্ত সঙ্গত কারণেই আগ্রহী ব্যক্তিরা শ্রোতা হিসাবে লেখকের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং শিষ্য, শ্রোতা নির্বিশেষে সকলেই একথা স্বীকার করেছেন যে, ইবনে খালদুন অতুলনীয় বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেই তাঁর এ বাগ্মিতা জ্ঞানপিপাসু গুণীজনের শ্রুতিগোচর হয়। তাঁর এ প্রকার জনপ্রিয়তার প্রভাব লক্ষ করেই সম্রাট বারকুক তাঁকে ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কৌমিয়া মাদ্রাসার মালেকী ফেকাহশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। উক্ত পদে যোগদানকালে ইবনে খালদুন যে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন, তা তাঁর আত্মজীবনীতে উদ্ধৃত রয়েছে। কায়রোর প্রায় সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁর এ সারগর্ভ ভাষণ শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর বিষয় বিন্যাস, ওজস্বিতা ও ভাষার কারুকার্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ ধরনের আরো দুটি ভাষণ সম্পর্কে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এর একটি জাহিরিয়া মাদ্রাসা ও অন্যটি সারগাতমিশিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় যোগদানকালে তিনি প্রদান করেন। এ সকল ভাষণে সমসাময়িক ইতিহাসের উপাদান ছাড়া তৎকালীন শিক্ষাদান প্রণালীর বিশেষ বিবরণ লাভ করা যায়। এভাবে ইবনে খালদুন কায়রোর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজের অধীত ও অর্জিত জ্ঞান বিতরণের সুযোগ লাভ করেন।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কায়রোর উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইবনে খালদুন যে সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য নিয়োজিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে হাদিস ও ফেকাহশাস্ত্রই প্রধান। আল-মুকাদ্দিমায় তিনি যে নতুন বিষয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন কিংবা সাধারণভাবে তাঁর ইতিহাসে যে সকল বিষয়ের বিবরণ বিদ্যমান, তা নিয়ে প্রথাগত অধ্যাপনার কোনো সুযোগই তিনি পাননি। এতে করে তৎকালীন জ্ঞানচর্চার সীমাবদ্ধতার কথা যেমন আমরা বুঝতে পারি, তেমনি যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যস্থানে প্রতিষ্ঠাদানের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত পরিবেশের এ সীমাবদ্ধতা ও সুযোগের অভাবেই ইবনে খালদুন তাঁর নিজস্ব বিষয়ে যথার্থ অধ্যাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনায় আল-মুকাদ্দিমার বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বাধা ছিলো না, হয়তো ইবনে খালদুন স্বেচ্ছায় এ সম্পর্কে পৃথক আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করে থাকবেন; কিন্তু বাস্তবে এর কোনোটিই আমাদের উদ্দিষ্ট উত্তরসূরি গঠনে সাহায্য করতে পারে না। এজন্যই একান্ত দুঃখের সাথে আমরা লক্ষ করব যে, ইবনে খালদুনের এ ঐতিহাসিক দর্শনের যেমন কোনো পূর্বসূরি নেই, তেমনি কোনো উত্তরসূরিও ছিল না।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়, আর তা হল এ যে, খালদুন পরিবারে ইবনে খালদুনই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি, যিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

www.amarboi.org

ইতিপূর্বে তাঁর পরিবারের অন্য অনেকেই এ জ্ঞান বিতরণে অগ্রসর হয়ে এসেছেন; কিন্তু সে ছিল তাঁদের পেশা নয়, নেশা। এর বিনিময়ে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কোনো অর্থই তাঁরা গ্রহণ করেননি। ইবনে খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় শিক্ষকতার এ পেশাগত পরিবর্তন এবং এর বাস্তব ফলশ্রুতির কথা বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি নিজেই এর শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। অবশ্য এছাড়া তাঁর উপায়ও ছিল না; এ ভিন্ন পরিবেশে জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কী উপায়ই বা তিনি গ্রহণ করতে পারতেন। অন্যদিকে তাঁর এ পেশায় হয়ত তাঁর ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য সামাজিক মর্যাদা সহজলভ্য ছিল; তবু মনে হয়, পেশাগত শিক্ষকতার এ হীনতা থেকে নিজকে দূরে সরিয়ে নেবার জন্যই তিনি প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন।

কৌমিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হওয়ার কয়েক মাস পরেই সম্রাট বারকুক ইবনে খালদুনকে মিশরের মালেকী মজহাবের প্রধান বিচারকের পদে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। ইবনে খালদুন প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করলেও পরে সাগ্রহে এ নতুন পদমর্যাদা গ্রহণ করেন। এতে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এ ধরনের প্রতিপত্তি লাভের দিকে ইবনে খালদুনের আসক্তি ছিল সর্বাধিক। আমরা তাঁর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার জীবনে বারংবার এর বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করেছি। কিন্তু ইতিহাস আরম্ভ করার পর তিনি একান্ত প্রয়োজনেই সে আসক্তি থেকে নিজকে মুক্ত করে নিতে চেয়েছিলেন। কারণ শান্ত জীবনের ছত্রচ্ছায়ায় বসতে না পারলে তাঁর আরাদ্ধ কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এজন্যই তিউনিসে অবস্থানকালেই তিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং এখানে এসেও সে ধারাই অনুসরণ করেছিলেন। খুব সম্ভব পেশাগত শিক্ষকতার হীনতা ও সম্রাট বারকুকের নিকট থেকে এ অযাচিত আহ্বান তাঁর সেই সুপ্ত আসক্তিকে জাগিয়ে দিয়েছিল। নতুবা বারবার এ পদ থেকে চ্যুত হয়েও তিনি এটিকে আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করতেন না। অবশ্য এর সাথে আমরা তাঁর শত্রুকে পরাজিত করার এক অনমনীয় চেতনাকেও যোগ করতে পারি। তবু ইবনে খালদুনের ন্যায় এমন একজন মহৎ প্রতিভাধর ও পরিণত বয়সী ব্যক্তির নিকট থেকে এ ধরনের একগুয়েমি কেমন যেন বেখাপ্পা বলে মনে হয়। কারণ, তিনি তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় একথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেছেন যে, যে কোনো প্রকার পদমর্যাদার স্থায়িত্ব, শক্তির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠালাভ গোত্রপ্রীতির সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া ফলপ্রসূ হয় না। অথচ এক্ষেত্রে তিনি প্রধান বিচারক হিসাবে যে ধরনের সংস্কারের কাজ আরম্ভ করেছিলেন, এর পিছনে কোনো প্রকার গোত্র শক্তির সহায়তা ছিল না। এ কারণেই শত্রুদের চক্রান্তে তিনি বারবার বিপর্যস্ত হয়েছেন। তবু তাঁর সৌভাগ্য বলতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত তিনি এ প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত থেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে এ প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অযোগ্যতা, দুর্নীতি, গোষ্ঠীপ্রীতি ও ঘুষ প্রথাকে কঠোর হস্তে দমন করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে শুধু মিশরীয় নয়, মিশরে অবস্থানকারী তাঁর স্বদেশীয় বহুলোকও তাঁর বিরোধী হয়ে উঠে। বস্তুত তৎকালীন মিশরে এ সকল

www.amarboi.org

ব্যাপার প্রথাগতভাবে স্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এর সঙ্গে সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও জড়িত ছিলেন। ফলে, একজন বিদেশী, তিনি যত জ্ঞানীগুণীই হোন না কেন, প্রধান বিচারকের পদে সমাসীন হয়ে দীর্ঘদিনের প্রথাকে পরিবর্তন করে ফেলবেন, এ বিষয়টি তারা সহ্য করতে পারেননি। কাজেই এক বছর যেতে না যেতেই তাঁদের চক্রান্তের ফলে ইবনে খালদুন উক্ত পদ থেকে বিচ্যুত হন।

এ সময়ের আরো একটি দুর্ঘটনা তাঁর মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত করে দেয়। নৌকাডুবির এ দুর্ঘটনার কথা আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি। কৌমিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেই ইবনে খালদুন তিউনিস থেকে তাঁর পরিবার পরিজনকে এখানে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর অনুরোধে ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্রাট বারকুক তিউনিসের সম্রাট আবুল আব্বাসের নিকট এ প্রসঙ্গে একটি পত্র পাঠান। এর উত্তরে আবুল আব্বাস মিশরীয় সম্রাটের জন্য কতিপয় অশ্বের উপঢৌকনসহ ইবনে খালদুনের পরিবারবর্গকে মিশরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যে জাহাজটি তাদেরকে বহন করে এনেছিল, আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের নিকটে তা ঝড়ের মুখে পড়ে ডুবে যায় এবং আরোহীদের সকলেই নিহত হয়। এ মর্মান্তিক সংবাদে ইবনে খালদুন একান্তই বিরাগী হয়ে পড়েছিলেন এবং সবকিছু ত্যাগ করে কিছুদিনের জন্য নির্জনবাস অবলম্বন করেন।

কিন্তু সম্রাট বারকুকের আবেদন ও বন্ধুস্থানীয়দের উপদেশ আবার তাঁকে নব প্রতিষ্ঠিত জহীরিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনায় যোগ দিতে বাধ্য করে। এ মাদ্রাসাটি সম্রাট জহীর বারকুক তাঁর নিজের নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে যোগদান করার পর ইবনে খালদুন, সম্ভবত মানসিক শান্তি কামনায় তাঁর বহুদিনের পরিত্যাক্ত হজ্জব্রত পালনের ইচ্ছাকে এবার পূরণ করতে সচেষ্ট হন এবং সম্রাটের অনুমতিক্রমে ১৩৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সে উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। দীর্ঘ আট মাস কাল মক্কা, মদিনার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে এবং বহু জ্ঞানীগুণীর সাহচর্য লাভ করে তিনি পুনরায় কায়রোতে ফিরে আসেন। এর কয়েক মাস পরে ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁকে সারগাতমিশিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয় এবং কিছুদিন পরে একই সঙ্গে তিনি 'বাইবার' মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে আলোপ্পার শাসক আমীর ইয়াল বুগা নাসিরীর নেতৃত্বে সম্রাট বারকুকের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় এবং এতে সাময়িকভাবে সম্রাট তাঁর সিংহাসন থেকে বিচ্যুত হন। কিন্তু ১৩৯০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকেই তিনি বিজয়ীর বেশে কায়রোতে প্রবেশ করে তাঁর সিংহাসন অধিকার করেন। সম্রাট বারকুকের এ অনুপস্থিতির সময় কায়রোর ধর্মশাস্ত্রবিদরা তাঁর বিরুদ্ধে একটি ফতোয়া জারী করেছিলেন। এতে ইবনে খালদুনের দস্তখত ছিল। এর ফলে সাময়িকভাবে সম্রাট বারকুকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অবশ্য পরে প্রমাণিত হয় যে, বিরোধী শক্তির চাপে পড়ে একান্ত অনিচ্ছায় তিনি উক্ত ফতোয়ায় দস্তখত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেই শত্রুপক্ষের চক্রান্তে তিনি 'বাইবার' মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারিত হন। তবু সম্রাট ও ইবনে খালদুনের মধ্যকার সম্পর্ক যে মোটামুটি

www.amarboi.org

অক্ষত ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর অধ্যাপনার পদটি অক্ষত থাকায়। দীর্ঘদিন তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় প্রধান বিচারকের পদে যোগ দেন এবং এর কিছুদিন পরেই সম্রাট বারকুকের মৃত্যু হয়।

সম্রাট বারকুকের পর মিশরের সিংহাসনে বসেন তাঁর দশ বছর বয়স্ক বালকপুত্র নাসির-আল-ফেরাজ। এ পরিবর্তনেও ইবনে খালদুনের পূর্বতন পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। তিনি নবীন সম্রাটের সঙ্গী হয়ে দামেস্ক পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁর অনুমতিক্রমে ফিলিস্তিন, জেরুজালেম, বেথলেহেম, হিব্রুন প্রভৃতি নগরীর দর্শনীয় পুণ্যস্থানগুলো ঘুরে বেড়ান। কিন্তু মিশরে ফিরে এসেই বুঝতে পারেন যে, তাঁর প্রধান বিচারকের পদের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত তার অনুপস্থিতির সুযোগে দানা বেঁধে উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত এ চক্রান্তের ফলেই ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে তিনি প্রধান বিচারকের পদ থেকে বিচ্যুত হন।

এ সময়ে সংবাদ এসে পৌঁছায় যে, সম্রাট তৈমুরলঙ্গের নেতৃত্বে তাতারী সৈন্যদল আলেপ্পো জয় করে দামেশ্‌কের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মিশরীয় সম্রাট শত্রুদের এ অগ্রাভিযান প্রতিহত করার জন্য সসৈন্যে দামেশ্‌কে যাত্রা করেন। ইবনে খালদুন তখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে অধিষ্ঠিত না থাকলেও সৈন্যদলের সঙ্গে যাবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। এ ধরনের অভিযানের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর প্রচুর এবং বস্তুত এরই হাত এড়াবার জন্য তিনি এক সময়ে জন্মভূমি ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর পক্ষে তেমন কিছু করার উপায় ছিল না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তিনি সৈন্যদলের সঙ্গী হন এবং ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে দামেশ্‌কে পৌঁছান। মিশর থেকে আরো বহু জ্ঞানীগুণী ধর্মশাস্ত্রবিদ এ সৈন্যদলের সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাঁরা শহরেই অবস্থান করতে থাকেন। ইত্যবসরে মিশরীয় সৈন্যরা শহরের উপকণ্ঠে কয়েকটি যুদ্ধে তাতারীদেরকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এ সময়ে কায়রো থেকে সংবাদ এসে পৌঁছায় যে, সেখানে সিংহাসন অধিকারের একটি ষড়যন্ত্র চলছে। এ সংবাদে ব্যস্তসমস্ত সম্রাট নাসির আল-ফেরাজ তাতারীদের হাতে দামেশকের ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়ে মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন। ইবনে খালদুনসহ সকল জ্ঞানীগুণী দামেশ্‌কেই অবস্থান করতে বাধ্য হন এবং অচিরেই তাতারী সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় নগরীর অধিবাসীরা তদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু সৈন্যরা এক্ষেত্রে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে প্রতিদিনই আতঙ্কের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত জ্ঞানীগুণীরা ইবনে খালদুনের নেতৃত্বে সম্রাট তৈমুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুনের আত্মজীবনীর বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, তাঁরা লুকিয়ে ইবনে খালদুনসহ অন্য কয়জন ধর্মীয় নেতাকে নগরীর প্রাচীর থেকে নিচে নামিয়ে দিতে সমর্থ হন। ইবনে খালদুন নগর তোরণের কাছে অবস্থানরত তাতারী সৈন্যদের নিকট নিজের উদ্দেশ্য খুলে বলেন এবং তারা তাঁকে সম্রাট তৈমুরের নিকট নিয়ে যায়। সেখানে তিনি সসম্মানে তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তাঁদের মধ্যে নগরীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কীয় বিষয় ছাড়াও অন্য অনেক বিষয়ে আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সম্রাট তৈমুর তাঁর

www.amarboi.org

পাণ্ডিত্য ও নির্ভীকতায় মুগ্ধ হন এবং তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে নগরীর অধিবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু পরিণামে আত্মসমর্পণে দেরি করার অজুহাত দেখিয়ে তাতারীরা তাদের এ অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। তারা নগরীতে প্রবেশ করে যথেষ্ট লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ ও রক্তপাত ঘটায়। ইবনে খালদুন তৈমুরের আশ্রয়ে নগরীর বাইরে বসে এ সকল সংবাদ শুনে খুবই মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে এর প্রতিকার করার কোন উপায়ই ছিল না। তদুপরি সম্রাট তৈমুর তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ভূগোল ও অন্যান্য বিষয় সংবলিত একটি বিবরণ লিখে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটি নিয়েও তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। সেজন্য অন্য জ্ঞানীগুণীরা-যথা সময়ে সম্রাট তৈমুরের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেও ইবনে খালদুন এখানেই অবস্থান করছিলেন।

ইবনে খালদুন দীর্ঘকাল ধরে তাঁর জন্মভূমি থেকে দূরে বিদেশে বসবাস করছিলেন। সেখানে ফিরে যাবার ইচ্ছা আর তাঁর ছিল না। সম্ভবত এ কারণেই জন্মভূমি ত্যাগকালে এর প্রতি যে বিতৃষ্ণা তাঁর মনে জাগ্রত ছিল, তা পরবর্তীকালে ক্রমশ দূর হয়ে তার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এজন্যই দেখা যায়, মিশরে আসার পর তিনি নানাভাবে মিশর ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার শাসকদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তদুপরি এমনি রাজকীয় ও সাধারণ আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাঁর ইতিহাসে সংযোজনযোগ্য আধুনিক উপাদান সংগ্রহ করে নেয়াও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। জন্মভূমির যে ইতিহাস তিনি রচনা করেছিলেন, তা যেন তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করে, সেদিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। জন্মভূমির প্রতি বিতৃষ্ণা থাকলে দূর বিদেশে বাস করে এভাবে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা তিনি করতেন না। সুতরাং সম্রাট তৈমুরের তাঁবুতে বসে সেই জন্মভূমির বিবরণ লিখতে তাঁর মন খুব একটা সায় দেয়নি। তবু নির্দেশ তাঁকে পালন করতে হয়েছিল এবং একটি দীর্ঘ বিবরণই তিনি সম্রাট তৈমুরকে উপহার দিয়েছিলেন। মঙ্গল ভাষায় এটি অনুবাদ করে শোনার পর সম্রাট তৈমুরও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ইবনে খালদুন সম্রাটের নিকট থেকে সসম্মানে ও নিরাপদে মিশরে ফিরে আসার অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু জন্মভূমির বিবরণ একজন দিগ্বিজয়ী শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে আসার বেদনা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেননি। তাই মিশরে এসে তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মারিনী সম্রাটের নিকট তৈমুর ও তাঁর সৈন্যদল সম্পর্কে একটি দীর্ঘ ও বাস্তব বিবরণ লিপিবদ্ধ করে পাঠান। যদ্দুর মনে হয়, এর মাধ্যমে তিনি তাঁর মানসিক যাতনা উপশমের উপায় খুঁজে নিয়েছিলেন।

যাহোক, মিশর থেকে দীর্ঘ ছয় মাস দূরে অবস্থান করার পর ইবনে খালদুন ১৪০১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পুনরায় সেখানে ফিরে আসেন। এরপর তিনি আরো পাঁচ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে কয়েক বার প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও তা থেকে বিচ্যুত হওয়া ছাড়া তাঁর জীবনের অন্য কোনো বিশেষ সংবাদ জানা যায় না। ১৪০১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি তৃতীয় বার প্রধান বিচারক হন এবং ১৪০২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পদচ্যুত হন। পুনরায় ঐ বছরেরই জুলাই মাসে চতুর্থবার উক্তপদে যোগদান করেন এবং ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়।

www.amarboi.org

পুনরায় ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পঞ্চম বার ঐ পদে যোগ দেন এবং তিন মাস পরে পদচ্যুত হন। তার শেষ বা ষষ্ঠ বার উক্ত প্রধান বিচারকের পদে যোগদানের সময় ছিল ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস এবং এ যোগদানের কয়েকদিন পরেই এ বিরল মনীষার অধিকারী সংগ্রামী কর্মী পুরুষ ১৭ মার্চ, ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে লোকান্তরিত হন।

বস্তুত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইবনে খালদুন তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তার অনমনীয় সংগ্রামী চরিত্রের পরিচয় রেখে গেছেন এবং প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁর মৃত্যুবরণ একথাই প্রমাণ করেছে যে, তিনিই জয়ী। তাঁর এ বিজয় শত্রুদের সর্বপ্রকার চক্রান্ত ধূলিস্মাৎ করে দেহ থেকে দেহহীন মননের রাজ্যে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে; সেখানে তিনি সর্বকালের প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত। আর এরই স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি আল-মুকাদ্দিমায়। এবার আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁর সেই অমর কীর্তি সম্পর্কে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

www.amarboi.org

আল-মুকাদ্দিমা

['হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত']

আল-মুকাদ্দিমা আল্লামা ইবনে খালদুনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিন্তু সাধারণভাবে যে কোনো সাহিত্যিক, শিল্পী ও গবেষকের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলতে যা বোঝায়, আল-মুকাদ্দিমা শুধু তা নয়; বরং তার চাইতেও অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। বস্তুত মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে এ এক নতুন দৃষ্টি এবং এমন এক দৃষ্টি, যার ফলে ইতিহাসের বহু চেনা-জানা-শোনা উপাদান যেমন অচেনা হয়ে যায়, তেমনি বহু অখ্যাত অবজ্ঞাত উপাদানও নতুন পরিচয়ের মর্যাদায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে। আমরা ইতিপূর্বে এ দৃষ্টিকেই তাঁর ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছি এবং একথাও বলেছি যে, এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে খালদুনের যেমন যথার্থ কোনো পূর্বসূরি নেই, তেমনি তাঁর কোনো যথার্থ উত্তরসূরিও গড়ে উঠেনি। একান্তভাবে আধুনিককালে আমরা সমাজতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের যে ধারার সাক্ষাৎ লাভ করি, তা হয়ত ইবনে খালদুনের অন্তর্দৃষ্টিকেই আরো সমৃদ্ধ আকারে উপস্থিত করেছে; কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ খালদুনী অন্তর্দৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত নয়। কারণ যে বস্তুবাদী আবহ আজকের এ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উপস্থিত তা সর্বাংশে ইবনে খালদুনের সত্তায় বিধৃত ছিল না। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সরল বাস্তবতা নিয়ে একান্তভাবেই ভাববাদী।

ইবনে খালদুনের জীবনকাল খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী। এ সময়ে তাঁর জীবন পরিবেশে যে সীমাবদ্ধতা বিরাজ করছিল, সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এজন্যই আমরা দেখতে পাব তিনি ইবনে রুশদের বিরোধিতা করেছেন এবং দার্শনিক জীবন চেতনায় তিনি বরং ইমাম গাজ্জালীর সাথে একাত্মতা অনুভব করার দিকে এগিয়ে গেছেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি দর্শন ও কিমিয়াশাস্ত্রের অসারতা প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তবু একথা সত্য যে, তিনি ইমাম গাজ্জালীর অনুসারী নন। এ ক্ষেত্রেও ইবনে খালদুন তাঁর নিজস্ব বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল। তদুপরি ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি যে বাস্তব কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর এ বিশিষ্টতাকে আরো সুদূর প্রসারী করে তুলেছে।

ইসলামী জগতে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ধারা একান্ত প্রাথমিক পর্যায়েই আরম্ভ হয়েছিল। এক্ষেত্রে গ্রিক ঐতিহ্যের সমৃদ্ধির কথা বাদ দিলে সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিম মনীষার অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। ইবনে খালদুনের জীবনকাল পর্যন্ত ব্যাপক বিস্তৃতিসহকারে ইতিহাস রচনার এ ধারা অনুসৃত হয়ে এসেছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে অন্য

www.amarboi.org

কেউ ইতিহাসের বাস্তবতাকে এমন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। এমন কি গ্রিক ঐতিহ্যেও এর অনুপস্থিতি সমভাবে লক্ষণীয়। বস্তুত ইবনে খলদুনই সর্বপ্রথম এর প্রয়োজনীয়তাকে ভাষা দিয়েছেন। এর কারণ তাঁর সম্মুখে লীলায়িত বাস্তব জগৎ ও ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে তিনি একটা প্রচণ্ড বিরোধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে বিরোধিতাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁর পূর্বসূরি বা সমকালীন আর কারোর মধ্যেই জীবন সংগ্রামের এ ব্যাপকতা ছিল না। এজন্য মনে হয়, এ বিরোধের উপলব্ধি—জীবনের এ বাস্তব অভিজ্ঞতা সবকিছু মিলিয়েই ইবনে খলদুনকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনে উৎসাহিত করেছে। বস্তুত তাঁর ইতিহাসের ভূমিকায় এ প্রকার বিরোধ ও অভিজ্ঞতার বিচিত্র পরিচয় বিদ্যমান।

এক্ষেত্রে ভূমিকা বলতে আমরা তাঁর ইতিহাসের যথার্থ ভূমিকার প্রতিই ইঙ্গিত করেছি। কারণ 'আল-মুকাদ্দিমা' শব্দের অর্থ যদিও বা ভূমিকাই, তথাপি এ আল-মুকাদ্দিমা এবং আমাদের উদিষ্ট সেই ভূমিকার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য বুঝবার জন্য আমাদেরকে তাঁর ইতিহাসের সমগ্র বিষয় পরিধি উল্লেখ করতে হবে। ইবনে খলদুন তাঁর ইতিহাসটিকে তিনটি গ্রন্থে ও সাতটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। এ ব্যাপক পরিকল্পনার ভূমিকায় তিনি ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, ঐতিহাসিকদের ভ্রান্তি, এর কারণ ও ফলশ্রুতি এবং তাঁর ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। মূলত তাঁর এ ভূমিকার বিস্তৃতি তেমন কিছু নয়; অবশ্য এর মধ্যেই তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর ইতিহাসের গ্রন্থে এ ভূমিকার পরিপূরক বিচিত্র বিষয় সন্নিবেশ করেছেন। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট ও তৎকালে প্রচলিত এমন কোনো বিষয় নেই, যা তিনি এতে সংগ্রহ করেননি। পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত এ প্রকার প্রতিটি বিষয়কেই তিনি সমাজ প্রগতির সাথে সংশ্লিষ্ট করে এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এ কারণেই তাঁর এ ব্যাপক সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ একদিকে গ্রন্থটিকে যেমন একটি বিশ্বকোষ জাতীয় রচনায় পরিণত করেছে, অন্যদিকে তেমনি এটি তাঁর ভূমিকারই বিষয় বিস্তার বলে পরিগণিত হয়েছে। এর ফলে শুধু বর্তমানে নয়, ইবনে খলদুনের জীবনকালেই তাঁর ভূমিকা ও প্রথম গ্রন্থ 'আল-মুকাদ্দিমা' বা ভূমিকা নামে পরিচিত লাভ করে। ইবনে খলদুন স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতেও আল-মুকাদ্দিমাকে এভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইবনে খলদুনের এ প্রথম গ্রন্থটি একটি বিশ্বকোষ জাতীয় রচনা। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির যে বিচিত্র উপাদানের আলোচনা তিনি এতে তুলে ধরেছেন, তার বিস্তারিত মূল্যায়ন এখানে সম্ভব নয়; তবু আমরা এর বিশেষ কয়টি দিক নিয়ে তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করব। এ প্রকার চেষ্টার সীমাবদ্ধতা সহজেই অনুমেয়।

ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমায় প্রবেশ করলে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা হল তাঁর সামগ্রিক বিষয় বিন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুরূপে মানুষের

www.amarboi.org

অধিষ্ঠান। বস্তুত মানুষের শ্রম ও চিন্তার ফসল রূপেই সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরূপতা ও সহায়তাই মানুষকে এ সকল উপাদান সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ কোন একক মানুষের পক্ষে যেহেতু জীবনের সামগ্রিক চাহিদা মিটিয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়, সেজন্যই মানুষ স্বেচ্ছায় সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করতে উৎসাহিত হয়েছে এবং পরস্পরের সহায়তায় জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে নিয়েছে।

অন্যদিকে মানুষের এ প্রকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সামাজিক বিকাশ সর্বত্র সমানভাবে হয়নি। এর কারণ প্রকৃতির বিরূপতা। এ প্রসঙ্গে ইবনে খলদুন গ্রিক ও সমকালীন ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, এ সামাজিক বিকাশ পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমভাবাপন্ন অঞ্চলেই অধিকতর ঘটেছে। এ তুলনায় তৎসন্নিহিত অসমভাবাপন্ন উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলগুলোতে এর বিকাশ নিম্ন পর্যায়ের এবং সর্ব উত্তরে অত্যধিক শৈত্য ও সর্ব দক্ষিণে অত্যধিক উষ্ণতার জন্য ও বিকাশ সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুরূপ বিকাশের তারতম্যে প্রকৃতির এ প্রকার বিরূপতা ও সহায়তা এক প্রধান স্থান অধিকার করে আছে।

অবশ্য সভ্যতা সংস্কৃতির বিনির্মাণে এভাবে সামাজিক শক্তি ও প্রকৃতির উপস্থিতিকে প্রাধান্য দেয়া সত্ত্বেও ইবনে খলদুন অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাস করেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি একত্ববাদের ধারণাকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ আকারে উপস্থাপিত করেছেন এবং যাদু, ইন্দ্রজাল ইত্যাদি সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণা পোষণেও তিনি নিস্পৃহ নন। অনেক ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁকে এ সকল সংস্কার সম্পর্কে ইতিবাচক বক্তব্য রাখতে উৎসাহিত করেছে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে ইবনে খলদুন তৎকালীন জীবন পরিবেশে আধ্যাত্মবাদ ও অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল, তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।

তবু তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা ইতিহাসের যে বাস্তব পর্যালোচনা তিনি উপস্থিত করেছেন, তাতে এ প্রকার অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাব একান্তই সীমিত। এজন্যই তিনি, এমন কি ইসলামের অভ্যুদয় ও বিকাশের পশ্চাতেও মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির সক্রিয়তাকে অনুধাবন করেছেন। তিনি তৎকালীন আরবের উপর 'মুজার' তথা কোরায়েশ গোত্রের অসামান্য প্রভাব এবং ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারে সে প্রভাবের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। অনুরূপভাবে মানুষের সামাজিক বিকাশ ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কীয় যে যুক্তি সাধারণভাবে ইসলামী জগতে বিদ্যমান, ইবনে খলদুন সে যুক্তির ধারাকে অস্বীকার করে একান্তভাবে মানুষের স্বভাবসুলভ প্রয়োজন ও সংঘবদ্ধ সামাজিক শক্তির সক্রিয়তাকে সম্মুখে নিয়ে এসেছেন। চিন্তাশক্তির বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যে প্রাণিজগতেরই অধীন এবং এ বৈশিষ্ট্যের কল্যাণেই যে তথাকথিত ধর্মহীন জাতিগুলোর মধ্যেও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে, এ তথ্যকেও তিনি তার যুক্তির সমর্থনে উল্লেখ করেছেন। এমনকি যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয় শক্তির এ উপস্থিতির যে ধারণা সাধারণভাবে বিদ্যমান, তাকেও তিনি সফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক যে

www.amarboi.org

সবলতা ও দুর্বলতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ধরনের আরো উদাহরণ তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় বিদ্যমান। এ সকল দিক থেকে লক্ষ করলে ইবনে খলদুনের এ প্রকার দৃষ্টিকোণকে একান্তই ঐহিকতা মণ্ডিত বলে মনে হবে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে তা ঐহিকতার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ নয়। যদ্দুর ধারণা করা যায়, ইবনে খলদুন মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশে অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাবের গুণগত নয়, বরং পরিমাণগত সম্পর্ক স্থাপনের উপরই অধিকতর জোর দিয়েছেন।

এ কারণেই শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে বলতে হয় যে, ইবনে খলদুনের মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। সমগ্র প্রাণিজগতে তাঁর বিশিষ্টতার মৌল কারণ যে চিন্তাশক্তি, তা আল্লাহ্‌রই দান; অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করি গ্রিক ও ইসলামী দর্শনের এক সম্মিলিত প্রভাব ইবনে খলদুনের মানসপ্রক্রিয়াকে পরিচালিত করেছে এবং এর ফলে একদিকে তিনি যেমন সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অতীন্দ্রিয়তার প্রায় সকল কুহেলিকা নস্যাৎ করতে এগিয়ে গেছেন, অন্যদিকে তেমনি সামান্য পরিমাণে হলেও অতীন্দ্রিয় শক্তির অধীনতাপাশে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বস্তুত তাঁর ঐতিহাসিক দর্শনে এ প্রকার বৈপরীত্য বা সহাবস্থানের প্রচেষ্টা তাঁর জীবন পরিবেশেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। ইবনে খলদুন তাঁর বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও একে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেননি। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেও একাধিকবার উল্লেখ করেছি।

এভাবে অতীন্দ্রিয় শক্তির বদান্যতাধন্য মানুষ যখন তাদের চিন্তাশক্তির আকর্ষণে পরস্পরের সহায়তা লাভে এগিয়ে গেছে এবং সম্মিলিত প্রয়াসে পৃথিবীর বুকে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে, তখনই 'উমরান' বা সভ্যতার জন্ম হয়েছে। ইবনে খলদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় আলোচিত এ নতুন বিষয়ের নামকরণে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য শব্দটি একমাত্র এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি; আল-মুকাদ্দিমার অন্যত্র তিনি একে 'জনবসতি' অর্থেও প্রয়োগ করেছেন। এ উমরান শব্দটির ধাতুগত অর্থ নির্মাণ করা; আবাদ করা। সুতরাং এ শব্দটি ইবনে খলদুনের বক্তব্য উপস্থাপনের লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তদুপরি এর সঙ্গে ব্যবহৃত অন্য একটি শব্দের অর্থ মিলিয়ে নিলে তাঁর বক্তব্যের সমগ্র ধারাটিই আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। সে শব্দটি হল, 'এজতেমাউল বশরী' বা মানব সমাজ। অর্থাৎ সহজ কথায় সভ্যতা-সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, তা হল এ মানব সমাজেরই বিনির্মিত কীর্তিমালা।

কিন্তু মানব সমাজ বা এ জনশক্তির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উপরোক্ত কীর্তিমালা সর্বত্র সমানভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। অনুরূপ বৈচিত্র্যের কারণ হিসাবে প্রাকৃতিক প্রভাবের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ইবনে খলদুন এ প্রকার বহির্গত কারণ ছাড়াও সমাজশক্তির অন্তর্গত একটি কারণও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ কারণটিকে তিনি নাম দিয়েছেন 'আসাবিয়া' বা গোত্রপ্রীতি। এ প্রীতির শক্তি যে পরিমাণে সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় হয়েছে, সভ্যতা বিনির্মাণে তাঁর প্রভাবও হয়েছে ততোই স্থায়ী ও দর্শনীয়। বস্তুত এ গোত্রপ্রীতি থেকেই মানুষের গোত্রবদ্ধ জীবনের বিকাশ এবং এটি মানুষের সমাজ বিকাশের প্রাথমিক স্তর। ইবনে খলদুন একেই 'বদোয়া' বা

www.amarboi.org

যাযাবরী জীবন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ যাযাবর গোত্রশক্তিই আরো সংঘবদ্ধ হয়ে রাজ্য স্থাপন করেছে, নগর গড়ে তুলেছে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। এমন কি রাজ্য বিস্তারের তারমত্য ও তার স্থায়িত্বের বৈচিত্র্যের মধ্যেও ইবনে খলদুন এ গোত্রপ্রীতির অমোঘ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছেন। ফলত সমাজ বিকাশের সর্বত্র তিনি এ গোত্রশক্তির প্রবল প্রতাপ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সোচ্চার।

ইবনে খলদুনের চতুর্দশ শতকীয় জীবন পরিবেশ হয়ত বা এ গোত্রপ্রীতির ধারণা সম্পর্কে সহনশীল মনোভাব পোষণ করত; হয়ত এর বাস্তবতা তারা জীবনের অনিবার্য অভিজ্ঞতা থেকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবকালে এবং পরবর্তী ইসলামী চিন্তাধারাতেও এ 'আসাবিয়া' বা গোত্রপ্রীতিকে সুনজরে দেখা হয়নি। ইসলাম এ যাযাবরী গোত্রপ্রীতির বাধা অপসারিত করেই সমগ্র আরবকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিল। তখন এ সংঘটনশীল সামগ্রিক ঐক্যকে যারা গোত্রের প্রতি আসক্তির দ্বারা প্রতিহত করতে চেয়েছে, তারা তাদের এ প্রকার আচরণের জন্য নিন্দনীয় হয়েছে। এরই ফলে গোত্রপ্রীতি মাত্রেই নিন্দার বিষয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামের সেই ধর্মীয় ঐক্য অটুট থাকেনি; খেলাফতের স্তর পেরিয়ে সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটেছে এবং গোত্রপ্রীতির অমোঘ প্রতিক্রিয়া তার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে লক্ষগোচর হয়ে উঠেছে। তথাপি ইসলামী চিন্তাধারায় গোত্রপ্রীতির এ শক্তিকে সর্বাংশে স্থান দেয়া হয়নি; শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অশুভ প্রভাবের সৃষ্টি না করলে তার উপস্থিতিকে মেনে নেয়া হয়েছে। সম্ভবত ইবনে খলদুনই সর্বপ্রথম গোত্রপ্রীতি সম্পর্কে এ প্রকার নেতিবাচক মনোভাব ত্যাগ করে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তার ইতিবাচক অনিবার্য ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি বলতে গেলে, সমাজ প্রগতির মৌলশক্তিকে আবিষ্কার করেছেন। বস্তুত এজন্যই তিনি, বলতে পেরেছেন যে, শুধু রাজ্যবিস্তার নয়, ধর্ম তথা যে কোনো সংস্কারমূলক কার্যক্রমের জন্য এ গোত্রপ্রীতি বা সংঘবদ্ধ শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর প্রমাণ হিসাবে ইতিহাস থেকে তিনি বহু ঘটনা ও দুর্ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

তথাপি আমরা লক্ষ করব, এ প্রকার বলিষ্ঠ ইতিবাচক বক্তব্য তুলে ধরা সত্ত্বেও ইবনে খলদুন গোত্রপীতির সংকীর্ণতাকে সর্বত্র পরিহার করে চলেছেন। বস্তুত সমাজ প্রগতির নিয়ামকরূপে ঐক্যবদ্ধ জনশক্তি সম্পর্কীয় তাঁর এ ধারণা এক সর্বজনীন প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত। এক্ষেত্রে তিনি ইসলামের সেই সত্যপ্রীতি ও সামাজিক ন্যায়কেই অধিকতর বাস্তবতার সাথে ভাষা দিয়েছেন। এজন্যই তিনি নিজে দক্ষিণ আরবের সাথে সম্পর্কযুক্ত 'হাযারামী' উপাধি ব্যবহার করলেও আরবীয় সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংস্কৃতি চেতনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য বিচার করে যথাযথ মন্তব্য উপস্থাপনে দ্বিধান্বিত হননি। তাঁর এ প্রকার কঠোর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এমনকি তাঁর জন্মভূমির বারবার জীবন পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েও তিনি তাদের বীরত্বের যেমন প্রশংসা করেছেন, তেমনি তাদের সংকীর্ণতাকেও সমান বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন। ইসলামী সংস্কৃতি বিনির্মাণে অনারব মনীষার অবদান যে সর্বাপেক্ষা অধিক এ সত্য উচ্চারণ করতেও তিনি ইতস্তত করেননি। এরই ফলে

www.amarboi.org

সভ্যতা-সংস্কৃতির নিয়ামক এ জনশক্তির অন্তর্গত দুর্বলতাকে তিনি আশ্চর্য নিপুণতায় ভাষা দিতে পেরেছেন।

বস্তুত সভ্যতার অগ্রগতি সাধনে নিয়োজিত জনশক্তির মধ্যে একান্ত স্বাভাবিক কারণেই অনুরূপ দুর্বলতার প্রকাশ ঘটে। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্র মিলিত হয়ে উক্ত জনশক্তি গড়ে তোলে, তাদের সকল অংশই সমমর্যাদা নেতৃত্বদানের সুযোগ পায় না; বরং সেখানেও সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গোত্রটিই এ দুর্লভ সম্মানে ভূষিত হয়। এভাবে তাদের দ্বারা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটলে সেই নেতৃত্বদানকারী গোত্রটির নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ পর্যায়েই এ সম্মিলিত জনশক্তির মধ্যে প্রথম অনৈক্যের সূত্রপাত হয়। যে ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তিনি তার গোত্র বা সন্তান-সন্ততির জন্য সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী জনশক্তির অন্যান্য অংশগুলোকে পদাবনত করার কৌশল অবলম্বন করেন। ফলে রাজত্ব ও রাজকোষ সম্রাটের পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং এ পারিবারিক স্বার্থসংরক্ষণের জন্য তিনি তার অধীনে নিয়োজিত কর্মচারী, সৈনিক ও সেবকের সমবায়ে একটি আজ্ঞাবহ জনশক্তি গড়ে তোলেন। এভাবে দুর্বলতার প্রাথমিক পর্যায় সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে সাম্রাজ্যের অনুষঙ্গী বিলাসব্যসনের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। কারণ সম্রাট তার স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনেই প্রজাসাধারণের মধ্যে সমীহের ভাব উদ্রেককারী জাঁকজমকের সৃষ্টি করতে বাধ্য হন। পরিণামে সম্রাটের সেবকবৃন্দ এবং প্রজাদের মধ্যেও এ জাঁকজমক তথা বিলাসিতার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে একদিকে যেমন জনশক্তির সংগ্রামী মনোভাব নষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি জীবন যাপনে ব্যয়বাহুল্য ঘটে। আর এ ক্রমবর্ধমান ব্যয় সংকুলানের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। এক্ষেত্রে সম্রাটের পক্ষে অতিরিক্ত কর ধার্য করা ব্যতীত অন্য উপায় থাকে না। এখানেই দুর্বলতার তৃতীয় পর্যায়ের আরম্ভ এবং পরিণামে করভারে জর্জরিত কৃষক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ বৃত্তির প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। এভাবে সাম্রাজ্য তথা সভ্যতা নির্মাণকারী জনশক্তির পতন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়।

ইবনে খলদুন সভ্যতা নির্মাণকারী জনশক্তির এ প্রকার উত্থান-পতনের আধার হিসাবে 'দওলত' বা সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, সাম্রাজ্যের বিস্তার ও স্থায়িত্ব উক্ত জনশক্তির অনুপাতেই ঘটে থাকে এবং যে সাম্রাজ্য যত শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়, সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতি সাধনে তার অবদান ততই দর্শনীয় হয়ে উঠে। অবশ্য এতদসত্ত্বেও ইবনে খলদুন এ সাম্রাজ্যেরও বয়ঃসীমা নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে যে কোনো সাম্রাজ্য সজীব সক্রিয় অবস্থায় তিন পুরুষের অধিক টিকে থাকে না; এরপরও তার স্থায়িত্ব অবক্ষয়ের অধীন জীবন্মুক্ত অবস্থার নামান্তর মাত্র। আধুনিক রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায়, আল-মুকাদ্দিমায় তার কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই; অনেক স্থলেই রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য একই পরিণতির অধীন। ইবনে খলদুনের বিশ্লেষণে গোত্রপ্রীতির আকর্ষণে সংঘবদ্ধ জনশক্তিই ক্ষমতার উৎস এবং তাদের পতন ও

www.amarboi.org

পরিবর্তনে তাই সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠে আর এ পরিবর্তনে শুধু সাম্রাজ্যের সীমা ও শক্তিমত্তারই পরিবর্তন ঘটে না; বরং তাঁর চরিত্রও ভিন্নতর হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য এ সত্ত্বেও ইবনে খলদুন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি বিবেচনা করেছেন এবং অত্যন্ত বাস্তব উদাহরণসহ বিজয়ী ও বিজিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

এভাবে ইবনে খলদুনের মানুষ আদিম যাযাবর গোত্রজীবন থেকে যাত্রা শুরু করে পরিণামে নাগরিক সভ্যতার রূপকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দীর্ঘ যাত্রাপথে শ্রমই হল তার মূল পুঁজি এবং এ শ্রমকে সে কখনো অস্ত্রে, কখনো শাস্ত্রে, কখনো উৎপাদনে ব্যবহার করে এগিয়ে এসেছে। বস্তুত এ শ্রম দিয়ে যেমন সে তার জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়েছে তেমনি উদ্বৃত্ত শ্রমের সাহায্যে গড়ে তুলেছে বিরাট নগর, বিলাসী শিল্পকলা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সম্ভার। শ্রমের এ প্রকার নিয়োগ ও প্রাপ্তির স্তর পরম্পরা বিশ্লেষণে ইবনে খলদুন আশ্চর্যভাবে অতীন্দ্রিয়তার প্রভাব মুক্ত। এ কারণেই তিনি তৎকালে প্রচলিত শ্রমবিমুখ জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তাঁর এ আক্রমণ থেকে তাই জ্যোতিষশাস্ত্র, কিমিয়াশাস্ত্র, গুপ্তধন সন্ধান ও ভাগ্য গণনার বিচিত্র নিয়ম-কানুন কোনো কিছুই রেহাই পায়নি। তিনি সোজা ভাষায় বলেছেন যে, যারা পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জনের সহজ পথ ত্যাগ করেছে তারাই এ সকল শ্রমবিমুখ শাস্ত্রাদির উপর নির্ভর করে প্রতারণার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। অবশ্য পরিণামে তারা নিজেরাই প্রতারিত হয়েছে। কারণ সভ্যতার ভিত্তি প্রতারণা নয় পরিশ্রম। এজন্যই ইবনে খলদুনের মতে শ্রমের প্রতি অবহেলা অন্যায় এবং শ্রমের যথাযথ মূল্য না দিয়ে তার ফল ভোগ করা সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য অবিচার। ফলত এ ধরনের অন্যায় অবিচারের মাত্রাধিক্য থেকেই সভ্যার অগ্রগতি ব্যাহত হয় ও তার অবলুপ্তি অনিবার্য হয়ে উঠে।

ইবনে খলদুনের মতে নাগরিক সভ্যতাই সভ্যতার শেষ পর্যায়। কারণ জীবন বিকাশের স্বাভাবিক আকর্ষণে মানুষের অগ্রগতি এখানে এসেই স্থিতি লাভ করে এবং পুনরায় সে তার পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। এ প্রকার চক্রবৎ পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে শ্রমের প্রতি আগ্রহ এবং শেষ পর্যায়ে তৎপ্রতি অবহেলা বিরাজ করে। ইবনে খলদুন এ উভয় আচরণের স্বাভাবিক কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এছাড়া মানুষের গত্যন্তর নেই। মানুষের জীবনের যেমন বিকাশ ও সমাপ্তি আছে, তেমনি তার প্রচেষ্টারও বিকাশ ও সমাপ্তি বিদ্যমান।

আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, আমাদের এ প্রকার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ইবনে খলদুনের সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। আমরা শুধু তাঁর ইতিহাসের তথ্যাদি বিশ্লেষণে উপস্থাপিত সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণের মূল সূত্রটির উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি এবং আমরা লক্ষ করেছি যে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা ইতিহাসের মূল নিয়ামক শক্তিকে অবলোকন করতে সমর্থ হয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিতে তাঁর এ প্রকার অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ যত প্রাথমিক স্তরেরই হোক না কেন, চতুর্দশ শতাব্দীর জীবন পরিবেশে এ ছিল এক বিপ্লবাত্মক বিষয়। এজন্যই তিনি লিখেছেন,

www.amarboi.org

"নানা কারণে এটা একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। আমি এ বিষয়ের আলোচনা কোথাও খুঁজে পাইনি। জানি না, এটা কি তাঁদের উদাসীনতার ফল কিংবা এ ব্যাপারে তাঁদের কোনো ধারণাই ছিল না; অথবা হয়ত তারা এ বিষয় নিয়ে প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু আমাদের নিকট তা এসে পৌঁছায়নি। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়াদির সীমা-পরিসীমা নেই এবং মানব সমাজে জ্ঞানীগুণীর সংখ্যাও অপরিমিত। আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে যা পেয়েছি, অপ্রাপ্তির পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক বেশি। পারসিকদের সেই জ্ঞান কোথায় যা পারস্য বিজয়কালে হজরত উমর (রাঃ) নিশ্চিহ্ন করে দিতে বলেছিলেন! কোথায় কেলাদিয়ান, সিরিয়ান ও ব্যাবিলনবাসীদের জ্ঞানের ঐতিহ্য! তাদের মধ্যে তার যে নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, যে ফলশ্রুতি ঘটেছিল, তা কোথায় বিলুপ্ত হল! কোথায় গেল তাদের কিবতী ও পূর্ববর্তীদের জ্ঞানের ঐশ্বর্য! আমাদের নিকট শুধু একটি জাতির জ্ঞান-গুণই এসে পৌঁছেছে, তাঁরা হলেন গ্রিক। এটাও সম্ভব হয়েছে সম্রাট মামুনের জন্য। তিনি কষ্ট স্বীকার করে, বহু লোককে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে এবং বহুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তা সম্ভব করে তুলেছেন। কিন্তু এ একটি জাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতির জ্ঞানের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না!"

এ উদ্ধৃতি থেকে আমরা ইবনে খলদুনের জ্ঞানস্পৃহার ব্যাপকতা সম্পর্কে যেমন অবহিত হতে পারি, তেমনি তাঁর এ 'নতুন বিষয়'-এর পরিবেশ সম্পর্কেও আমাদের ধারণা করে নিতে অসুবিধা হয় না। সম্ভবত এ কারণেই তৎকালীন যুগমানস তাঁর এ নতুন বিষয়ে বিন্যস্ত অন্তর্দৃষ্টির সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি।

ইবনে খলদুন মিশরে জীবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় কাটিয়েছেন। এ সময়ে তিনি শিক্ষকতার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর পূর্বেও তিউনিসে ও অন্যত্র তিনি এ কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন। তাঁর এ প্রকার শিক্ষকতায় যত সীমাবদ্ধতাই থাক না কেন, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর এ নতুন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন। মিশরে তাঁর দুজন শিষ্য ইবনে হজর ও আল মাকরিজী পরবর্তীকালে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের শিষ্য আস্‌সাখাবী ও ইবনে খলদুনের স্বদেশের আল-মাক্কারী সকলেই ইতিহাস চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই ইবনে খলদুনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন ও তাঁর ঋণও স্বীকার করেছেন; কিন্তু গুরুর এ কালজয়ী অন্তর্দৃষ্টির কোন অনুসরণ বা বিস্তার তাঁদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। এর কারণ আমরা তৎকালীন যুগ পরিবেশের মধ্যেই খুঁজে পাব। জীবন বিমুখী যে অবক্ষয়ী চিন্তাধারা সে কালের গণমানসকে আবৃত করে রেখেছিল, তা থেকে এ সকল জ্ঞানীগুণী কেউই মুক্ত হতে পারেননি। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, স্বয়ং ইবনে খলদুনও এর থেকে মুক্ত ছিল না। এ কারণেই তাঁর প্রায় শতাব্দীকাল পরবর্তী ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলীর 'প্রিন্স' গ্রন্থে সমকালীন জীবন পরিবেশের যে বাস্তব বিবরণ আমরা দেখতে পাই ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমায় অনুরূপ কোনো বাস্তবতার পরিচয় নেই। সমকালীন রাজনীতিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর; কিন্তু কী ইতিহাসের তথ্য বিচার, কী রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের কার্যকারণ বিশ্লেষণে; কোথাও তিনি তাঁর এ অভিজ্ঞতাকে ভাষা দেননি। বরং তাঁর অধিকাংশ উদাহরণ ও দৃষ্টান্তই অতীতের ব্যাপার। সুতরাং তাঁর উত্তরসূরি শিষ্য-প্রশিষ্যরা যে আরো বেশি মাত্রায় এ প্রকার সীমাবদ্ধতার দ্বারা পীড়িত হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

www.amarboi.org

অবশ্য একথা সত্য যে, আল-মুকাদ্দিমার সঙ্গে প্রিন্সের কোনো তুলনাই চলে না। প্রিন্স যতই বাস্তবানুগ হোক না কেন, আল-মুকাদ্দিমায় বিস্তৃত পরিসর তার মধ্যে নেই। সে একটি মাত্র বিষয় রাজনীতি নিয়েই তার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। এমন কি এ নির্দিষ্ট বিষয়েও প্রিন্সের বর্ণনার দ্বারা বিশেষ করে শাসকের গুণাবলি সম্পর্কীয় মারি অরি পারি যে কৌশলে'র কূটনীতি আল-মুকাদ্দিমায় নেই। এজন্য অনেক সমালোচক রহস্য করে বলেছেন যে, প্রিন্সের গুণাবলি ইবনে খলদুনের জীবনে কিছুটা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর অবদান এ থেকে মুক্ত। বস্তুত প্রিন্স অপেক্ষা আল-মুকাদ্দিমার বিষয়বিন্যাস আরো ব্যাপক, আরো সুদূরপ্রসারী। এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, ইবনে খলদুন সভ্যতা-সংস্কৃতির তৎকালে প্রচলিত, সর্বপ্রকার উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বিষয়েই তাঁর মৌলিক কোন সংযোজন নেই; বরং তিনি যেখানে যা পেয়েছেন সযত্নে কুড়িয়ে এনে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করেছেন। অনেকস্থলে বিষয়টির উপস্থিতিই তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করে তুলেছে; অনেক স্থলে তিনি একটি বাক্য বা কোরানের একটি আয়াত ব্যবহার করে তীর্যকভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করেছেন। বস্তুত এভাবে তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিচিত্র বিষয়ের সংগ্রহ ও বিন্যাসে ইবনে খলদুন আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তবু এর ফলেই তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় আমরা এমন কিছু ত্রুটির সন্ধান পাই, যা অনিবার্যভাবে এ বিচিত্র বিষয়ের অনুষঙ্গী হয়ে এতে প্রবেশ করেছে। প্রথমেই যে ত্রুটিটি যে কোন সচেতন পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল এ যে ইবনে খলদুন বহুবারই একই বিষয়ের বর্ণনাগত পুনরাবৃত্তি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকে তিনি একবার শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে এবং পুনর্বার জীবিকার মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের পুনরাবৃত্তি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও আধুনিক পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। বরং একথাই মনে হবে যে, ইবনে খলদুনের এ ধরনের পুনরাবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করে তাঁর আল-মুকাদ্দিমার বিস্তৃতি প্রায় অর্ধেক কমিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু পাঠক যদি চতুর্দশ শতকীয় বিষয় বর্ণনার ধারা ও শিক্ষাদান প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি দেন, তাহলে এ প্রকার পুনরাবৃত্তিমূলক বর্ণনাকে অনায়াসে সহ্য করে নিতে পারবেন। বস্তুত আল-মুকাদ্দিমার বর্ণনা বক্তৃতার ভঙ্গিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত হয়েছে। এ কারণেই এর ভাষা যথাসম্ভব বিশ্লেষণ বাহুল্যবর্জিত সরলতায় বিশিষ্ট। তাঁর আকর্ষণীয় বাগ্মিতা ভাষার এ সারল্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

ইবনে খলদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় বিচিত্র বিষয় সংগ্রহ করলেও যেখানে যা পেয়েছেন, হুবহু তাই গ্রহণ করেননি; বরং যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিজের প্রয়োজন অনুসারে নিজের ভাষাতেই তা বিন্যস্ত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর এ প্রকার সংক্ষিপ্তকরণ কিছুটা দুর্বোধ্যতা ও আড়ষ্টতার সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে বিষয়গত পরিভাষার ক্ষেত্রেও সর্বত্র সমতা রক্ষা হয়নি; এমনকি বর্ণনার ভাষাতেও এরই ফলে বিষয়ানুসারী বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন সচেতন পাঠক তাঁর সমগ্র আল-মুকাদ্দিমা পাঠ করে একথা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, ইবনে খলদুনের মূল ভূমিকাটিই সর্ববিষয়ে এর শ্রেষ্ঠ অংশ। বস্তুত এ ভূমিকাতে ইবনে খলদুন তাঁর ভাষাজ্ঞান, বর্ণনাশৈলী ও যুক্তি বিন্যাসের

www.amarboi.org

এক অপূর্ব নিদর্শন তুলে ধরেছেন। তাঁর আল-মুকাদ্দিমার অন্যান্য অংশ সে তুলনায় অনেকখানি নিষ্প্রভ। এর কারণও আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি; সংগৃহীত বিষয়ের অনুসারী হয়েই এ সকল ত্রুটি আল-মুকাদ্দিমায় প্রবেশ করেছে। পরিবেশের ন্যায় পরিবেশনের এ বাধ্যবাধকতা থেকেও ইবনে খলদুন নিজকে মুক্ত করতে সক্ষম হননি।

অবশ্য তাঁর বিরাট অবদানের তুলনায় এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি একান্তই নগণ্য। সূর্যের ন্যায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রখর ঔজ্জ্বল্য তাঁর সমস্ত কলঙ্ক রেখাকে অবলীলায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এ কারণেই ইবনে খলদুন আজ সারা বিশ্বে ঐতিহাসিক দর্শন ও সমাজতত্ত্বের অবিসংবাদিত জনকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। পাশ্চাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ আর্নল্ড টেয়েনবি বলেছেন যে, ইবনে খলদুনের ঐতিহাসিক দর্শন জ্ঞানের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত অনতিক্রান্ত সৃষ্টির মর্যাদায় বিভূষিত হয়ে আছে। জর্জ মারটনও বলেছেন যে, কেবলমাত্র মধ্য যুগেই নয়, প্রাচীন ঐতিহাসিকদের সময় থেকে ম্যাকিয়াভেলী পর্যন্ত ইতিহাসতত্ত্ব ও মানবিক অভিজ্ঞতার দর্শনের রাজ্যে ইবনে খলদুনের সমকক্ষ আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। বলা বাহুল্য এ স্বীকৃতি, এ সাধুবাদ ইবনে খলদুনের যথার্থই প্রাপ্য। তবু একথা উল্লেখের প্রয়োজন আছে যে, যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের ইতিহাস চেতনায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে বিধৃত করতে না পারব, যতদিন একান্ত বাস্তব প্রয়োজনে তাঁর প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে দেখতে না পরব, ততদিন তাঁর যথার্থ মূল্যমান আমাদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।

www.amarboi.org

অনুবাদ প্রসঙ্গ

['যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না।']

অনুবাদ একটি দুরূহ শিল্প। কারণ এ 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'র সৃষ্টি নয়; বরং প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিকে অনুসরণের বাধ্যবাধকতায় সীমাবদ্ধ এক সৃজনকর্ম। এজন্যই এক্ষেত্রে সহজ সাবলীল হওয়া একান্তই দুরূহ ব্যাপার। তদুপরি অনুবাদের বিষয় ও অনুবাদকের মধ্যে যদি কালগত ব্যবধান দীর্ঘ হয়, তাহলে সে দুরূহতা আরো বৃদ্ধি পায়। কারণ যথার্থ অনুবাদের জন্য, গৃহীত বিষয়, তার যুগ-পরিবেশ ও লেখকের মানস প্রক্রিয়া অনুধাবন করা একান্তই প্রয়োজন। কালের ব্যবধান এক্ষেত্রে অনেক সময়েই প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। সম্ভবত এ কারণেই সফল অনুবাদ কর্মের সংখ্যা এত বিরল।

বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে আল্লামা ইবনে খলদুনের কালজয়ী মহৎসৃষ্টি আল-মুকাদ্দিমার অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণকালে যে ধরনের একটি ব্যাপক আগ্রহ আমাদের উৎসাহিত করেছিল, আজ সে কাজ সম্পন্ন করে মনে হচ্ছে, হয়ত উপরোক্ত বাধা আমরা সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারিনি। বস্তুত ইবনে খলদুনকে আরো নিবিড়ভাবে জানার আগ্রহেই এ দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু যতটুকু জানতে পেরেছি, তা নিজের ভাষায় পাঠককে জানাতে পেরেছি কি না, সে সন্দেহই এ মুহূর্তে মনকে পীড়িত করছে। অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু বলার প্রাক্কালে তাই পাঠকের সমীপে আমাদের এ দুর্বলতার কথা সবিনয়ে নিবেদন করে রাখলাম।

প্রথমেই 'আল-মুকাদ্দিমা' শব্দটির কথা বলব, এটি অনুবাদ নয়, প্রতিবর্ণীকরণ; মূল গ্রন্থের নামকরণে ব্যবহৃত এ শব্দটিকে আমরা যথাযথ বহাল রেখেছি। কারণ ইবনে খলদুনের অমর সৃষ্টি এ নামেই সারা বিশ্বব্যাপী পরিচিত। অবশ্য শব্দটির উচ্চারণে কিছুটা বিতর্কের অবকাশ আছে। অনেকে শব্দটিকে 'আল-মুকাদ্দিমা' বলেও উচ্চারণ করে থাকেন; আবার অনেকে 'আল' তথা নির্দেশক প্রত্যয়টি বাদ দিয়ে শুধু 'মুকাদ্দিমা' বা 'মুকাদ্দম' উচ্চারণের পক্ষপাতী। এ ক্ষেত্রে আমরা কর্তৃবাচ্যে 'আল' যুক্ত অর্থাৎ 'আল-মুকাদ্দিমা' শব্দটিই বেছে নিয়েছি। অবশ্য কর্মবাচ্যের 'আল-মুকাদ্দিমা' গ্রহণেও অসুবিধা নেই; তবে এ ধরনেরই একটি 'আল' হীন শব্দ আমরা 'মামলা-মকদ্দমা'য় ব্যবহার করে থাকি। সুতরাং এ সহজ পরিচিতি থেকে গ্রন্থের নামটিকে কিছুটা দূরে রাখাই আমাদের অনুরূপ নির্বাচনের উদ্দেশ্য।

আল-মুকাদ্দিমা চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা হলেও বহির্জগতে এর পরিচিতি লাভ ঘটেছে অনেক পরে। এর কারণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে পাশ্চাত্য জগতে ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, আল-ফারাবী প্রমুখ মনীষীদের রচনাবলি অনুবাদের যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়, ইবনে খলদুন পরবর্তীকালের হওয়ার জন্য তাঁদের সাথে অনূদিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন নি। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে

www.amarboi.org

পাশ্চাত্যজগৎ এ কালজয়ী প্রতিভার সন্ধান পায়নি। তখন থেকেই ইবনে খলদুনের জীবন ও সৃষ্টি কর্মের আলোচনা বিভিন্ন ভাষায় দেখা দিতে থাকে। কিন্তু তাঁর আল-মুকাদ্দিমার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় তুর্কি ভাষায় ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে। পীরজাদা আফেন্দী এ অনুবাদকার্যটি সম্পন্ন করেন। পরবর্তীকালে ডি. স্লেনকৃত একটি ফরাসি অনুবাদ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সাম্প্রতিককালে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে ফ্রেঞ্জ রোজেনথাল কৃত একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাভাষায় ইতিপূর্বে আল-মুকাদ্দিমার অংশবিশেষের অনুবাদ প্রকাশিত হলেও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এ প্রথম।

বর্তমান অনুবাদের জন্য বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার থেকে প্রাপ্ত আল-মুকাদ্দিমার যে সংস্করণটি আমরা ব্যবহার করেছি, তা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এ যে, এ সংস্করণটি সুসম্পাদিত হয়নি। উস্তাদ ইউসুফ হাসান দাগের নামে এক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী অত্র সংস্করণের বিষয়সূচি ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেছেন; কিন্তু সংস্করণটির উৎস কি, সে সম্পর্কে উক্ত বিশেষজ্ঞ বা প্রকাশক কেউই কোনো প্রকার সন্ধান দেননি। তবে অনুবাদকার্যে ব্যবহার করতে গিয়ে আমাদের যদ্দুর মনে হয়েছে, এ সংস্করণটির সাথে নসর আল-হোয়ায়রিনী সম্পাদিত 'বুলাক' সংস্করণটির যথেষ্ট মিল আছে। এ সত্ত্বেও এতে প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনীর যেমন অভাব, তেমনি অসম্পূর্ণতাও বিদ্যমান। এ কারণেই আমরা মূল গ্রন্থের এ প্রকার-ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে অনুবাদটিকে যথাসম্ভব পূর্ণতা দানের জন্য ফ্রেঞ্জ রোজেনথালকৃত ইংরেজি অনুবাদটির সাহায্য গ্রহণ করেছি।

ফ্রেঞ্জ রোজেনথাল তাঁর এ অনুবাদটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে তুরস্কের বহু গ্রন্থাগার ঘেঁটে একাধিক সংস্করণ মিলিয়ে মূল গ্রন্থের একটি যৌগিক পাঠ তৈরি করে তার অনুবাদ করেছেন। এর সঙ্গে তাঁর ভূমিকা, টীকা-টিপ্পনী ও নির্ঘণ্ট বিন্যাস যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য। বস্তুত এ অনুবাদটি আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমরা এ অনুবাদ থেকে আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থের পরিত্যক্ত কয়েকটি প্রয়োজনীয় পাঠ উদ্ধার করে আমাদের বর্তমান অনুবাদে ব্যবহার করেছি এবং আমাদের মূল গ্রন্থের ব্যতিক্রমধর্মী বা তদতিরিক্ত পাঠকে অনুবাদের মাধ্যমে টীকায় তুলে দিয়েছি। এর ফলে বর্তমান অনুবাদটি মূল গ্রন্থের বিভিন্ন পাঠ সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করাতে সক্ষম হবে বলে আমরা মনে করি। কারণ এ ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। স্বাধীনভাবে ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমার একাধিক সংস্করণ মিলিয়ে যৌগিক পাঠ তৈরির সুযোগ আমাদের নেই। সুতরাং আমাদের এ প্রাথমিক অনুবাদ প্রচেষ্টা যাতে কিছুটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, সে উদ্দেশ্যেই এ প্রকার সাহায্য গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হয়েছি।

অবশ্য এ সত্ত্বেও আমাদেরকে একথাও স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ফ্রেঞ্জ রোজেনথালের অনুবাদে ব্যবহৃত যৌগিক পাঠেও বর্জনযোগ্য প্রক্ষেপ বিদ্যমান। তিনি একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি পাদটীকায় একটি পাঠ পেয়েছিলেন; সম্ভবত বিষয়বস্তুর আকর্ষণেই এদিকে মূলপাঠে সংযোজিত করার লোভে সংবরণ করতে পারেননি। আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এ পাঠটি পাইনি এবং প্রক্ষেপ বলে মনে হওয়ায় টীকায় অন্যান্য অতিরিক্ত পাঠের ন্যায় এর অনুবাদও সংযোজন করিনি। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে ও আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আমরা আলোচ্য পাঠটির অনুবাদ নিম্নে তুলে ধরছি।

www.amarboi.org

"এখানে এ কথা হয়ত বলা যেতে পারে যে, বংশধরদের অনুরূপ সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়মে অসম্ভব হলেও এটা বনি ইসরাইলের প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ তাদের অনুরূপ প্রবৃদ্ধি অলৌকিক ক্রিয়ারই ফলশ্রুতি। যেমন হাদিসে এসেছে—'আল্লাহ্ বনি ইসরাইলের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের নিকট প্রত্যাদেশ পাঠিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁদের বংশধারা ততক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে যাবেন, যতক্ষণ না তা পৃথিবীর বালুকণা ও আকাশের তারকা অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি পালন করে তাঁদের বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের প্রতি তাঁর অসাধারণ কৃপা প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুরূপ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না এবং এর বিরুদ্ধে কারো কিছু বলবারও অবকাশ নেই।

কেউ উপরোক্ত হাদিসটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারে যে, অনুরূপ বৃদ্ধির এ বিষয়টি কেবলমাত্র তৌরাত গ্রন্থেই উল্লেখিত হয়েছে এবং এটা সকলেরই জানা আছে যে, এ তৌরাত গ্রন্থটি উহুদীদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। তার প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, তৌরাতের অনুরূপ পরিবর্তনের কথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই স্বীকার করেন না এবং অনুরূপ পরিবর্তন বলতে ঠিক কী বোঝায়, তাও সুস্পষ্ট নয়। তদুপরি যে কোন জাতির দ্বারা তাঁদের মধ্যকার প্রত্যাদেশ সংরক্ষিত গ্রন্থাদির পরিবর্তন সাধন সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী। ইমাম বোখারী তাঁর বিশুদ্ধ হাদিস সংকলনেও তা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বনি ইসরাইলের বংশধারা বৃদ্ধির ব্যাপারটি একটি অলৌকিক ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয়টি কেবলমাত্র অন্যান্য জাতির বেলাতেই প্রযোজ্য।

এ কথা সত্য যে, এ ধরনের একটি বিপুল সংখ্যক সৈন্যদলের সুসমন্বিত যুদ্ধ প্রচেষ্টা একান্তই দুরূহ ব্যাপার; তবে এ ক্ষেত্রে কোন যুদ্ধই অনুষ্ঠিত হয়নি এবং বাস্তবে এর প্রয়োজন ছিল। এ কথাও সত্য যে, প্রতিটি সাম্রাজ্যই তার ক্ষমতা অনুযায়ী সৈন্যদল গঠন করেছে; কিন্তু বনি ইসরাইল প্রাথমিক পর্যায়ে অনুরূপ কোন সৈন্যদলে রূপান্তরিত হয়নি এবং তাদের কোন সাম্রাজ্যও ছিল না। তাদের এ প্রকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি এ জন্যই ঘটেছিল যে, যাতে তারা কেনানের উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কারণ এ সেই দেশ, যার আধিপত্য লাভের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছিলেন—এবং তন্নিমিত্ত উক্ত অঞ্চলকে পবিত্রও করেছিলেন। সুতরাং এতদসম্পর্কীয় সমুদয় ব্যাপারই অলৌকিক ক্রিয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ই সত্যের পথ দেখান।"

প্রসঙ্গের সাথে উদ্ধৃত এ পাঠটি মিলিয়ে দেখলেই পাঠক আমাদের মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। ঐতিহাসিকদের প্রান্তিক আলোচনায় ইবনে খলদুন বনি ইসরাইলের সৈন্য সংখ্যার অতিরঞ্জিত বর্ণনা প্রসঙ্গে যে সকল যুক্তি দিয়েছিলেন, কোনো যোগ্য ব্যক্তি অলৌকিকত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে সে সকল যুক্তি খণ্ডনের অপচেষ্টা করেছেন এবং অবলীলাক্রমে তা ইবনে খলদুনের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত অলৌকিকত্বের এ যুক্তিই যদি ইবনে খলদুনের শেষ বক্তব্য হয়, তাহলে অতিরঞ্জনের ভ্রান্তি হিসাবে সমস্ত বিষয়টি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ একান্তই প্রহসন বলতে হবে; এর আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না।

অনুরূপভাবে আরো একটি, প্রক্ষেপ নয়, পাঠ পরিবর্তনের ঘটনা আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে লক্ষ করেছি। ইবনে খলদুন নবুয়তের তাৎপর্য বর্ণনায় জড়জগৎ,

www.amarboi.org

বৃক্ষজগৎ ও প্রাণিজগতের পর্যায়ক্রমিক বিকাশের যে বিবরণ তুলে ধরেছেন, তাতে মানুষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর হিসাবে বানর জগতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এর মূল শব্দটি হল 'আরমুল কেরাদত'; কিন্তু কোন যোগ্যব্যক্তি একে পরিবর্তন করে 'আলমুল কুদরত' বা 'মহিমা জগৎ' করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে, প্রসঙ্গের সাথে এর কোনো মিল নেই। তবে সুখের বিষয় এ যে, উক্ত যোগ্য ব্যক্তিটি আল-মুকাদ্দিমার শেষের দিকে বর্ণনাগত পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে উপস্থিত মূল শব্দটির পরিবর্তন সাধন করতে পারেননি। ফলে আমাদের পক্ষে অতি সহজেই মূল শব্দটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং রোজেনথালের অনুবাদেও এর সমর্থন বিদ্যমান।

এ ধরনের প্রক্ষেপ ও পরিবর্তন হয়ত আরো ঘটেছে, (হয়ত আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থের উৎসর্গ অংশটি এমনি এক প্রক্ষেপের নিদর্শন) তবে তা একান্ত স্থূল না হলে আমাদের এ সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টায় তা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। কারণ প্রক্ষেপ ও পরিবর্তন বিচারে যে ধরনের ব্যাপক পাঠ বিশ্লেষণের প্রয়োজন, তা বর্তমানে আমাদের সাধ্যের বাইরে এবং আমরা এ-ও লক্ষ করেছি যে, রোজেনথাল আমাদের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক সুযোগ লাভ করেও এক্ষেত্রে আমাদেরকে সাহায্য করতে অক্ষম। বস্তুত এ ব্যাপারে উপরোক্ত অলৌকিকত্বের একটি উদাহরণই আমাদের অনুরূপ ধারণার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং ভবিষ্যতে অধিকতর সুযোগ লাভ অথবা যোগ্যতর কোনো গুণীজনের উদ্যোগের প্রতীক্ষা ছাড়া বর্তমানে এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু নেই। তবে এ ধরনের একটি উদ্যোগ গ্রহণের যে প্রয়োজন আছে, সে কথাটিও অত্যন্ত সবিনয়ে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। কারণ যে পরিবেশে ইবনে খলদুনের এ মহৎ গ্রন্থটি সংরক্ষিত ও লিপিকৃত হয়েছে, সেখানে এ ধরনের প্রক্ষেপ ও পরিবর্তনের অবকাশ ছিল প্রচুর এবং বাস্তব অবস্থা সাক্ষ্য দেয় যে, এখনো তা দূর হয়নি।

ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমার ভাষা খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকীয় প্রাচীন আরবি। আমরা ইতিপূর্বে এ ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং বিষয়ানুসারী বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছি। নানা কারণে আমাদের পক্ষে এ ভাষার আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব হয়নি; আমরা ভাবানুবাদের দ্বারস্থ হয়েছি। তবে এক্ষেত্রে যাতে মূলকে অতিক্রম করার স্বেচ্ছাচারিতা দেখা না দেয়, তজ্জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। বাংলা ভাষায় মূলের বোধগম্য স্বরূপ ফুটিয়ে তোলাই আমাদের লক্ষ ছিল। তথাপি পাঠক দেখতে পারেন যে, মূল ভাষার আড়ষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা আমাদের এ অনুবাদেও সংক্রমিত হয়েছে। এর কারণও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং আমাদের পক্ষে মূল ভাষা ও বিষয়ের এ বাধ্যবাধকতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে 'ভূগোল' ও 'যায়েরজা' সম্পর্কীয় বর্ণনায় এ ত্রুটি লক্ষ করা যাবে।

আমরা ইতিপূর্বে একথাও উল্লেখ করেছি যে, ইবনে খলদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় বিচিত্র বিষয় সংগ্রহ করলেও বিষয়ানুসারী পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বত্র সমতা রক্ষা করেননি। কারণ বিষয়ের জন্য তিনি বিষয়ের আলোচনা করেননি; বরং তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূরণের জন্যই এ বিচিত্র আলোচনা টেনে এনেছেন। কাজেই পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের প্রতি গুরুত্ব দেয়া তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। এর ফলে অনুবাদের ক্ষেত্রেও আমরা সে সমতা রক্ষা করতে পারিনি। অবশ্য ইবনে খলদুন তাঁর নিজস্ব বিষয়ে এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর 'উমরান' (সভ্যতা ও

www.amarboi.org

জনবসতি), 'আসাবিয়া' (গোত্রপ্রীতি), 'বদোয়া' (যাযাবরী জীবন) ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার সে সচেতনতার সাক্ষ্য বহন করছে।

ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমায় বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে অজস্র নাম উল্লেখিত হয়েছে; আমরা যথাসম্ভব এসব নামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি টীকায় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য যে, এর অধিকাংশই রোজনথালের অনুবাদের টীকা থেকে নেয়া। কারণ আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থটি এ ব্যাপারে খুব একটা সহায়ক হয়নি; তবে এতে ব্যবহৃত শব্দার্থের টীকাগুলো আমাদের খুব কাজে লেগেছে। আরো একটি বিষয় রোজেনথালের অনুবাদ থেকে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হয়েছে, সেটি হল, তৎকালীন পৃথিবীর মানচিত্র। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এটি নেই। রোজেনথালও তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, আল-মুকাদ্দিমার অনেক সংস্করণেই অঙ্কনের দুরূহতার জন্য এ মানচিত্রটি পরিত্যক্ত হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থটিও অনুরূপ কোন সংস্করণেরই পরিচয় বহন করছে।

বর্তমান অনুবাদে আমরা ইবনে খলদুনের জীবনের একটি রেখাচিত্র ও আল-মুকাদ্দিমার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সংযোজন করেছি। এক্ষেত্রেও রোজেনথাল অন্য অনেকের নিকট থেকে আমরা ঋণ গ্রহণ করেছি। সকলের কথা উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ ইনান রচিত 'ইবনে খলদুনের জীবন ও অবদান' নামীয় পুস্তকটির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পুস্তকটি ইবনে খলদুনের ষষ্ঠশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মিশরে রচিত হয়। পরে লাহোরের শাহ মুহম্মদ আশরাফ এর একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ পুস্তকটিতে মিশরীয় অভিভাবকত্বের ছাপ থাকলেও তা আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

বস্তুত আল্লামা ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমার ন্যায় বিশ্বকোষ জাতীয় একটি গ্রন্থের অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করতে গিয়ে আমাদেরকে নানাভাবেই নানাজনের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। অনেকেই এক্ষেত্রে অযাচিতভাবে উৎসাহ প্রদান করে সহায়তা করেছেন। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, পাঠ্যপুস্তক বিভাগের পরিচালক জনাব আব্দুল হক, উপপরিচালক জনাব নুরুলহুদা ও জনাব মুহম্মদ ইব্রাহিম এবং বিভাগীয় অফিসার কবি আসাদ চৌধুরীর আন্তরিক ও সক্রিয় সহানুভূতি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ময়মনসিংহের অধ্যাপক বশির উদ্দিন, অধ্যাপক যতীন সরকার, অধ্যাপক আবদুল কাদির খান ও শ্রী আশুতোষ পালের উদ্দীপনা দান একান্তই উল্লেখযোগ্য। এমনিভাবে আরো অনেকের সোৎসাহ সহযোগিতা না পেলে আমার ন্যায় অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে এ দুরূহ কর্ম সম্পন্ন করা হয়ত সম্ভব হত না।

আমরা দুর্বলতার কথা ইতিপূর্বেই পাঠকের সমীপে নিবেদন করেছি। সুতরাং আর বাগবিস্তার না করে ইবনে খলদুন স্বীয় ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে যে উক্তি রেখে গেছেন, তা দিয়েই বক্তব্যের ইতি টানছি।

> 'সুধীমণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই আমার জ্ঞানের পুঁজি এবং
> অক্ষমতার স্বীকৃতিই মুক্তিপ্রাপ্তির একমাত্র পথ।"

বিনীত

আকুয়া, ময়মনসিংহ — গোলাম সামদানী কোরায়শী

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

www.amarboi.org

আল-মুকাদ্দিমা

[প্রথম খণ্ড]

'কিতাবুল ইবার' নামক
বিশ্ব ইতিহাসের ভূমিকা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রারম্ভ স্তুতি

[পরম করুণাময়—দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে—]

অপরিসীম দয়ার অধিকারী মহান প্রভুর কৃপা ভিখারী বান্দা আবদুর রহমান ইবনে মুহম্মদ ইবনে খলদুন হাযরামী (আল্লাহ্ তার সহায় হউন) বলছে ...

সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সকল সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষমতার অধীশ্বর এবং পবিত্র নাম ও গুণাবলি সমস্তই তাঁর। তিনি সর্বজ্ঞতা, গুপ্ত বাসনা ও সুপ্ত কামনা সকলই তাঁর গোচরীভূত। তিনি পরম ক্ষমতাবান, আকাশ-পৃথিবীর সমুদয় বস্তু ও বিষয় তাঁর আয়ত্তাধীন।

তিনি পৃথিবী থেকে আমাদিগকে প্রাণীর আকারে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদিগকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর বুকে আমাদের জন্য আহার্য ও জীবিকার পথ সুগম করেছেন। তাঁরই অনুগ্রহে আমরা মাতৃজঠর ও আবাসগৃহে আশ্রয় লাভ করেছি এবং তাঁরই প্রদত্ত খাদ্যসম্ভার ও জীবিকা আমাদের জীবন ধারণের সহায় হয়েছে। তাঁরই ইচ্ছায় কালচক্রের আবর্তন আমাদিগকে ধ্বংস করছে এবং তাঁরই ইঙ্গিতে আমাদের জন্য মৃত্যুর সময় নির্ধারিত হয়ে আছে। অথচ একমাত্র তিনিই অবিনশ্বর, স্থিতিবান—তাঁর জরা নেই, মৃত্যু নেই।

আমাদের নেতা, আমাদের পথপ্রদর্শক আরবদেশবাসী নিরক্ষর নবী হজরত মুহম্মদের (সঃ) উপর অশেষ শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি সেই পয়গম্বর, যাঁর কথা তৌরাত, ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে শনিবারের পরে রবিবারের আগমনের পূর্বেই তাঁর অস্তিত্ব সংস্থাপিত হয়েছে।[১] তিনি তখনও অস্তিত্বময়, যখন শনিগ্রহ ও পৃথিবীর ধারণকারী মৎস্য ইয়াহামুত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি।[২] আর তিনিই সেই রসূল, যাঁর সত্যতা সম্পর্কে কবুতর ও মাকড়সা সাক্ষ্য প্রদান করেছে।[৩]

---

১. এখানে সময় সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তদুপরি ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ শনি ও রবিবারকে মর্যাদার চোখে দেখে বলে, এতে তাদের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ শেষ নবী হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সৃষ্টি সকলের অগ্রগামী। এ মর্মে একটি হাদিসও বিদ্যমান—'আওয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরী'—আল্লাহ্ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। ইসলামী ঐতিহ্যে এ তত্ত্বটি আধ্যাত্মবাদের দান ও পরবর্তী সংযোজন।

২. সেমেটিক পুরাণ অনুসারে সর্বপ্রথম সবকিছু জলময় ছিল এবং তার উপর ভাসমান ছিল প্রভুর সিংহাসন। অতঃপর তিনি পর্যায়ক্রমে আলো, আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন। এর পর আকাশ ও পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হল। সপ্তাকাশের উপর শনিগ্রহ এবং সপ্ততল পৃথিবীর নিচে সমুদয়ের ভারবহনকারী মৎস্য 'ইয়াহামুত'—একটি অতি প্রাচীন ধারণা।

৩. মদিনায় হিজরত করবার সময় মুহম্মদ (সঃ) যে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার প্রবেশ-পথে কবুতর বাসা বেঁধে ডিম দিয়েছিল অথবা মাকড়সা জাল তৈরি করেছিল। কোরেশগণ

www.amarboi.org

শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বংশধর ও সঙ্গীদের উপর, যাঁরা তাঁর সংসর্গ লাভ ও আদর্শ অনুসরণ করে খ্যাতিমান হয়েছেন; যাঁরা তাঁর সাহায্য-সহায়তার জন্য সর্বদা ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন এবং তাঁর শত্রুদের সমস্ত শক্তি বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হে আল্লাহ্! তুমি শান্তি বর্ষণ কর হজরত মুহম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারী-অনুগামীদের উপর যতদিন ইসলাম তার সৌভাগ্য-মহিমা পরিব্যপ্ত করে রাখবে এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির ঐক্যরজ্জু বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে।

শান্তি বর্ষণ কর, প্রচুর এবং অবারিত শান্তি।

হজরতের অনুসরণ করে তা দেখতে পায় এবং ফিরে আসে। বিশেষজ্ঞদের মতে উক্ত ঘটনা সংশয়মুক্ত নয়।

www.amarboi.org

ইতিহাস প্রসঙ্গ

অতঃপর ইতিহাস এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা বিশ্বের সকল জাতি ও গোত্রের নিকট সমভাবে আদরণীয়। এর জন্য দেশভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করতেও তারা দ্বিধা করে না। বুদ্ধিমান-নির্বোধ নির্বিশেষে সকলেই একে ভালবাসে। রাজন্যবর্গ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এর প্রতি সমধিক আগ্রহী। পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী এর মধ্যে উপদেশ অনুসন্ধান করে।

কেননা ইতিহাস বাহ্যত অতীতকালের ঘটনাবলি ও রাষ্ট্রসমূহের বিবরণ মাত্র। তাও সে এমন উদাহরণ ও বক্তব্যসহ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে, যাতে আমরা অতি সহজেই এ সকল বিষয়কে আমাদের আলোচনা ও দৃষ্টান্ত দানের মধ্যে ব্যবহার করতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে, কালচক্রের আবর্তন সকল বিষয় এবং বস্তুকেই নিয়ত পরিবর্তন করছে। একটি রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব ঘটছে, তার ব্যাপক বিস্তৃতি পৃথিবীর সমৃদ্ধি আনয়ন করছে, আবার কালের অমোঘ বিধানে তার পতন আসন্ন হচ্ছে এবং পরিণামে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ইতিহাসের অন্তর্নিহিত শক্তি এ বাহ্য বিবরণের তুলনায় অধিকতর ব্যাপক ও তাৎপর্যমণ্ডিত। এটা আমাদের সম্মুখে বিষয় ও ঘটনাবলির কারণ এবং বিকাশ ও বিনাশের মৌলিক উপাদানসমূহকে উদ্‌ঘাটিত করে। এ কারণেই ইতিহাস যথার্থভাবে বিজ্ঞানের[৪] অন্তর্ভুক্ত এবং তাকে বিজ্ঞানের বিষয় হিসাবে গণ্য করা উচিত।

বস্তুত বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ সত্যকে সম্মুখে রেখেই ঘটনাবলির বিবরণ সংগ্রহ ও তা গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত করে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকেই উক্ত ঘটনাবলির সাথে মিথ্যা কাহিনী ও কল্পিত বর্ণনার সংযোজন করেছেন। বিচার-বিশ্লেষণের পরিবর্তে ধারণা ও শ্রুতিনির্ভর কল্পনা ইতিহাস বর্ণনায় তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। পরবর্তীকালের ইতিহাসবিদগণ ক্রমশ এ ধারাকেই অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং তাদের এ কল্পিত ও অতিরঞ্জিত বিবরণই আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে। এতে অনুসন্ধানের চেষ্টা নেই। বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে কলুষমুক্ত করবার কোন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। এর ফল দাঁড়িয়েছে যে, তারা অন্ধ বিশ্বাসের শিকারে পরিণত হয়েছেন এবং বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন লোকদিগের বিবরণের উপর

---

৪. মূলে 'হিকমত' আছে। ইংরেজি অনুবাদক রোজেনথাল এটা 'দর্শন' অর্থে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য এক সময়ে দর্শন ও বিজ্ঞান একীভূত ছিল, ইবনে খলদুন সেই সময়ের লোক। তবু আমরা একে বিজ্ঞান অর্থে ব্যবহার করলাম। কারণ পরবর্তীকালে আরবিতেও হিকমত ও ফিলসফা পৃথকভাবে উল্লেখিত হয়েছে এবং অধুনা ইতিহাসের এ দিকটি সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

www.amarboi.org

বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। এ কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাসের এমন ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। কিন্তু সত্য কখনও লুক্কায়িত থাকে না এবং বিচক্ষণ জ্ঞানীর নিকট মিথ্যার মুখোস খসে পড়তে দেরি হয় না। সুতরাং ঐ সকল ইতিহাস রচকদের বর্ণনা যতই রসঘন ও মুখরোচক হোক না কেন, দূরদর্শীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার অন্তর্নিহিত অসারতাকে সহজেই আবিষ্কার করে সত্যকে উদ্ধার করতে সক্ষম।

এজন্যই অসংখ্য লোক রচনায় আত্মনিয়োগ করলেও এবং তাদের বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব সমাজ সম্পর্কীয় বর্ণনা বিরাট আকৃতির হলেও, যাঁরা ইতিহাসবিদ হিসাবে যথার্থই খ্যাতি ও বিশ্বস্ততার অধিকারী, তাঁদের সংখ্যা একান্তই নগণ্য—আঙুলে গণনা করা যায় ও আরবি স্বরবর্ণ অপেক্ষা অধিক নেই। যেমন ইবনে ইসহাক, তাবারী, ইবনুল কালবী, মুহম্মদ ইবনে উমর আল-ওয়াকেদী, সাইফ ইবনে উমর আল-আসাদী, আল-মাসউদী প্রমুখ বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ।[৫]

অবশ্য মাসউদী ও ওয়াকেদীর গ্রন্থসমূহে আপত্তিকর বর্ণনা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান। বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিকট তা সুপরিচিত। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁদের বিবরণ সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য হয়েছে এবং ইতিহাস বর্ণনায় ও গ্রন্থ রচনায় তাঁরা তাঁদের আদর্শকে অনুসরণ করেছে। কিন্তু বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ দৃষ্টির সম্মুখে এটা সুস্পষ্ট যে, তাঁদের বর্ণনার কোন অংশ গ্রহণযোগ্য এবং কোন অংশ বর্জনীয়। কারণ সভ্যতার বিভিন্ন স্তর ও ঘটনার সাথে জড়িত জীবনবিধানের বর্ণনাই ঐতিহাসিক সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে। এতদ্‌ব্যতীত সাধারণ ঘটনাবলির বর্ণনা মাত্রই যথেষ্ট নয়।

এ সকল ঐতিহাসিকের অধিকাংশ গ্রন্থই সাধারণভাবে প্রণিধানযোগ্য। কেননা তাঁরা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সমকালীন বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। সাম্রাজ্যের সুবিধার জন্যই তাঁরা গ্রহণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পেরেছেন। তাঁদের মধ্যে মাসউদীর ন্যায় অনেকেই প্রাক্ ইসলামিক জাতি ও রাষ্ট্রসমূহ এবং তাদের সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

এদের পরবর্তীকালে যাঁরা ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের অনেকেই বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছেন এবং কতকাংশে প্রাচীন ও অসংলগ্ন বিষয়াদির সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। আবার অনেকে

---

৫. * মুহম্মদ ইবনে ইসহাক বিখ্যাত 'সিরাত' গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ১৫০/১৫১ (৭৬৭/৭৬৮ খ্রি:) হিজরিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

* মুহম্মদ ইবনে জাবির আত্তাবারী, বিখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা। জীবনকাল ২২৪/২২৫-৩১০ (৮৩৯/৯২৩ খ্রি:) হি:।

* হিশাম ইবনে মুহম্মদ ইবনুল কালবী। মৃত্যু ২০৪/২০৬ (৮১৯/৮২১ খ্রি:) হি:।

* মুহম্মদ ইবনে উমর আল-ওয়াকেদী ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস ও হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবনী রচয়িতা। জীবনকাল ১৩০-২০৭ (৭৪৭-৮২৩ খ্রি:) হি:।

* সাইফ ইবনে উমর আল-আসাদী। মৃত্যু ১৮০ (৭৯৬-৭৯৭ খ্রি:) হি:।

* আলী ইবনে আল-হোসাইন আল-মাসউদী। মৃত্যু ৩৪৫/৩৪৬ (৯৫৬.৯৫৭ খ্রি:) হি:। ইবনে খলদুনের মিশরীয় শিষ্য ইবনে হজরের মতে মাসউদী শিয়া ও মোতাজিলা সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অলীক অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে।

www.amarboi.org

সমসাময়িক ইতিহাসের বিবরণ দিতে গিয়ে নিজ দেশ, রাষ্ট্র বা অঞ্চলবিশেষের বর্ণনার উপর ইতিহাসকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন। যেমন স্পেনের ইতিহাস লেখক ইবনে হাইয়ান।[৬] তিনি শুধু স্পেন ও তথাকার উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিবরণদানের মধ্যেই ইতিহাস রচনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আফ্রিকিয়ার[৭] ইতিহাস রচনাকারী ইবনে রফিকও আফ্রিকিয়া ও নিজ রাষ্ট্র কায়রোয়ানের বাইরে দৃষ্টিপাত করেননি।

অতঃপর এমন একদল ইতিহাস লেখকের আবির্ভাব ঘটল, যারা মানসিকতার দিক থেকে সংকীর্ণ এবং বিশ্বাসের দিক থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও অবিবেচক। তাঁরা পূর্বসূরিদের পদাংক অনুসরণ করে তাঁদের বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। কালচক্রের আবর্তন কীভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং তদ্দরুন মানবচরিত্র ও সমাজ প্রগতি কিভাবে বিবর্তিত হয়, তার কার্যকারণ তাঁরা আদৌ উপলব্ধি করতে পারেননি। সুতরাং তাঁরা অতীতের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়েছেন এবং অসতর্ক ও উদাসীনভাবে সংগৃহীত তাঁদের সমসাময়িক ও প্রাচীন সঞ্চয়ের সমুদয় অংশই সমর্থনের অযোগ্য হয়ে রয়েছে। এর ফল এ দাঁড়িয়েছে যে, তাঁদের বর্ণনা মাত্রই, তার ভিত্তি জানা যায়নি; তাঁরা কতকগুলো পৃষ্ঠা সাজিয়েছেন, যাতে বিষয় গুরুত্ব বলতে কিছু নেই। প্রাচীন ও নবীন সমুদয় ঘটনার বর্ণনাতেই তাঁদের মূর্খতা দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে।

ফলত তাঁদের সংগৃহীত বিবরণ ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির অভাবে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। তাঁরা কোন রাষ্ট্রের বিবরণ দিতে গিয়ে একান্তই যান্ত্রিকভাবে বাহ্যজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন। তার উত্থান-পতন, সুবিধার-অসুবিধার বিবরণে কার্যকারণ বিশ্লেষণের কোন প্রকার চেষ্টা করেননি। এ কারণে তাঁদের সংগৃহীত ইতিহাস পাঠককে শুধু রাষ্ট্রশক্তির প্রারম্ভ অথবা বিনাশের কথাই জ্ঞাপন করায়; একটি রাষ্ট্রশক্তি কীভাবে অন্য একটি শক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়—কীভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে; সে সম্পর্কে কোন ধারণাই দেয় না। বস্তুত এ সকল ঐতিহাসিকের জন্য পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ অপেক্ষা এ কার্যকারণের বিশ্লেষণের উপর অধিকতর দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তা হয়নি। আমার ভূমিকায় উপরোক্ত বিশ্লেষণের প্রতি মনোনিবেশ করব।

এর পর এমন একদল ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটল, যাঁরা সংক্ষিপ্তকরণকেই তাঁদের মূল লক্ষ্য করলেন। ফলে তাঁদের সংগৃহীত ইতিহাস শুধু সম্রাটদের নামের তালিকায় রূপান্তরিত হয়েছে। এতে বংশলতিকার বিবরণ বা বিস্তারিত কোন বর্ণনাই নেই। রাজত্বের উত্থান-পতনের কালকেও তাঁরা শুধু সংখ্যা দ্বারা বর্ণনা করেছেন। ইবনে রশিক[৮] তাঁর 'মিজানুল আমল' গ্রন্থে এবং তাঁর অনুসারীগণ স্ব স্ব সংকলনে অনুরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিকদের চিরাচরিত পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে এদের বর্ণনা একান্তই অনির্ভরযোগ্য ও উদ্ধৃতিদানের অতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই উপরোক্ত গ্রন্থাবলি ইতিহাস নামেরও অযোগ্য।

---

৬. ইবনে হাইয়ান ইবনে খলফ। জীবনকাল ৩৭৭-৪৬৯ (৯৮৭-৯৮৮-১০৭৬ খ্রি:) হি:।

৭. আফ্রিকিয়া—আফ্রিকার রোমান শাসিত একটি প্রদেশের নাম। ইবনে খলদুন তাঁর ইতিহাসে এই নামটি বারবার ব্যবহার করেছেন।

৮. হাসান ইবনে রশিক। জীবনকাল ৩৯০-৪৫৬/৪৬৩ (১০০০-১০৬৪/১০৭০ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

এ সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থের বিবরণ পর্যালোচনা করে আমি যখন ঐগুলোকে মৌলিক তত্ত্বের আলোকে বিচার করতে লাগলাম, তখনই আমার মনে হল, আমি যেন ক্রমাগত আলস্য-নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে উঠছি। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই একখানি ইতিহাস রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আমার অক্ষমতা অনুভব করা সত্ত্বেও একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে অতীত ঘটনাবলির রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হলাম। এ উদ্দেশ্যে তাকে আমি বিবরণ-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নানা অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। এতে আমি রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভবের কারণগুলোকে যথাযথভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

আমার আলোচনা মূলত দুটি জাতির বিবরণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এ দুটি জাতির লোক বর্তমানেও 'মাগরিব'[৯] ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল এবং শহরগুলোতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছি। তাদের সাম্রাজ্য প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোন রাজ্যের কথাই আমি পরিত্যাগ করিনি এবং সম্রাট ও অমাত্যবর্গের কথাও তুল্য গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছি। এ দুটি জাতি আরব ও বারবার। এরা দীর্ঘকাল যাবত মাগরিবে আধিপত্য বিস্তার করে আছে এবং তার ব্যাপকতা এত অধিক যে, উক্ত অঞ্চলে এ দুই জাতি ব্যতীত অন্যদের অস্তিত্ব ধারণা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আমি উক্ত দুই জাতির কথা ও গৃহীত অন্যান্য বিবরণকে যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ আকারে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছি। অতঃপর তা বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের বিবেচনার জন্য তাঁদের সম্মুখে তুলে ধরেছি। আর এটা করতে গিয়ে আমি সম্ভাব্য সকল পন্থার মধ্যে একটি অভিনব পন্থা গ্রহণ করেছি এবং তদনুযায়ী গ্রন্থটিতে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। আমি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৌল উপাদানগুলো বর্ণনা করেছি। মানব সমাজের প্রগতি ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে যে সকল অন্তর্গত ও বহির্গত শক্তি কার্যকরী হয়ে থাকে, তাও যথাযথভাবে তুলে ধরেছি। এর ফলে অন্ধবিশ্বাস ও শ্রুতিনির্ভরতা হতে পাঠক মুক্তি লাভ করতে পারবে এবং অতীতের ঘটনাবলি বিশ্লেষণের আলোকে ভবিষ্যতের চিত্রও নিজের চোখের সম্মুখে দেখতে পাবে।

আমি এ ইতিহাসকে একটি ভূমিকা ও তিনটি গ্রন্থে বিভক্ত করেছি।

ভূমিকা (আল-মুকাদ্দিমা)

এতে ইতিহাসের বিষয় গুরুত্ব বর্ণনা ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ এবং ইতিহাসবিদদের ভুল-ভ্রান্তির বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম গ্রন্থ

এতে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবরণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদান—যেমন দেশ ও রাষ্ট্র, জীবিকা ও উপার্জন, কৃষ্টি ও শিল্প, জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রভৃতি তাদের অন্তর্নিহিত কার্যকারণসহ বর্ণিত হয়েছে।

---

৯. এখানে মাগরিব অর্থে পাশ্চাত্য নয়। এতে সাধারণভাবে আরব দেশের ও আফ্রিকার পশ্চিম অঞ্চল বিশেষকে বোঝানো হয়েছে। বর্তমানে এর সাধারণ নাম মধ্যপ্রাচ্য।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় গ্রন্থ

এতে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আরবীয় জাতি, গোত্র ও রাষ্ট্রসমূহের বর্তমানকাল পর্যন্ত অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এতদ্‌সঙ্গে তাদের সমসাময়িক[১০] বিভিন্ন বিখ্যাত জাতি ও রাষ্ট্রের, যেমন নাবাতী,[১১] সিরীয়, পারসিক, বনি ইসরাইল, কিবতী, গ্রিক, বাইজেন্টাইন, তুর্কি ও ফিরিঙ্গী (ইউরোপীয় জাতি)-দের সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক বর্ণনা বিদ্যমান।

তৃতীয় গ্রন্থ

এতে বারবার জাতি ও তাদের সমগোত্রীয় 'জানাতা' এবং তাদের বংশাবলির প্রাথমিক অবস্থা থেকে আরম্ভ করে মাগরিবে অবস্থানকারী গোত্রগুলো ও রাষ্ট্রসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

অতঃপর বর্ণনার ধারা পূর্বদিকের আলোর সন্ধানে অগ্রসর হয়েছে, তওয়াফ ও জিয়ারতের[১২] মাধ্যমে ফরজ ও সুন্নত আদায় করেছে এবং তার স্মৃতিগ্রন্থ ও স্মৃতিক্ষেত্রসমূহে বিচরণ করে ফিরেছে। আর এটা করতে গিয়ে তৎসংশ্লিষ্ট অনারব রাষ্ট্রগুলোর বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছে এবং বিশেষভবে পূর্বের ধারা অনুসরণ করে তুর্কি আধিপত্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরেছে।

এ সকল বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও যাতে পাঠকের উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে এবং প্রতিটি সংবাদ ও বর্ণনার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস—বর্তমান ইতিহাস গ্রন্থে পৃথিবীর ইতিহাস সামগ্রিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের বিবরণসমূহ তার কার্যকারণ বিশ্লেষণ এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে এর পাঠক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে যুগপৎ অবহিত থাকতে পারে। ফলত এ গ্রন্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অপূর্ব সংগ্রহ।

যেহেতু আমরা এ গ্রন্থে আরব ও বারবার জাতির নাগরিক ও যাযাবরী জীবনের বর্ণনা, তাদের সমসাময়িক বিভিন্ন রাষ্ট্রের আনুপূর্বিক বিবরণ এবং বিচিত্র উপদেশ ও তথ্যাবলি সংগৃহীত হয়েছে, এজন্য আমি এর নামকরণ করেছি—

আরব, অনারব ও বারবার জাতিসমূহের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণসহ তাদের সমসাময়িক বৃহৎ রাষ্ট্রমণ্ডলীর তথ্যাদি ও উপদেশাবলির পুস্তক।[১৩]

যতদূর সম্ভব, আমি এ গ্রন্থে প্রাচীন জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের প্রারম্ভিক ঘটনাবলির বিস্তারিত, বিবরণ, তাদের পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের কার্যকারণ এবং আনুষঙ্গিক ত্রুটি-

---

১০. সমসাময়িক বলতে এটাই বুঝায় যে, আরবীয় গোত্রগুলো সৃষ্টির প্রারম্ভ হতেই বিদ্যমান ছিল।

১১. আরবীয় ধারণা অনুসারে ইরাকের প্রাচীন জাতিবিশেষ। এদিক হতে প্রাচীন সিরীয় ও মেসোপটেমীয়দেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সম্ভবত প্রাচীন বাবেলোনীয় সভ্যতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন 'কিবতী' শব্দের দ্বারা মিশরীয় সভ্যতাকে বোঝানো হয়েছে।

১২. তওয়াফ—কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ ও জিয়ারত—হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সমাধি পরিদর্শন। প্রথমটি হজের অংশ বিশেষ, এই কারণে ফরজ—অবশ্য কর্তব্য এবং দ্বিতীয়টি সুন্নত প্রথাগত দায়িত্ব।

১৩. গ্রন্থের মূল আরবি নামটি নিম্নরূপ—
কিতাবুল ইবার ফি দিওয়ানিল্ মুবতাদা ওল খবর ফি আইয়ামিল্ আরব ওল্ আজম ওল্ বারবার ও মান আসারাহুম্ মিন্ যাবিস্ সুলতানিল্ আকবার।

www.amarboi.org

বিচ্যুতির বর্ণনা বিশদভাবে করেছি। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান যেমন ধর্ম ও রাষ্ট্র, নগর ও গ্রাম, মর্যাদা ও অমর্যাদা, সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যালঘুতা, জ্ঞান ও শিল্প, শ্রম ও বিলাসিতা এবং সর্বোপরি তাদের নাগরিক ও যাযাবরী জীবনের পরিবর্তমান গতিপ্রকৃতি ও ঘটনাবলির সমুদয় বিবরণ তুলে ধরেছি। ফলত এতে সংঘটিত ও সংঘটিতব্য উভয়বিধ তথ্যের ইঙ্গিত বিদ্যমান।

আমার বিশ্বাস, যদিও এ গ্রন্থ দুষ্পাপ্য ও অপূর্ব জ্ঞানের এবং সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির দ্বারা সুসজ্জিত; তথাপি আমার পক্ষে স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও জ্ঞানের স্বল্পতার কথা সবিনয়ে স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। বিচক্ষণ ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মনীষীদের সমীপে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা যেন একে প্রশংসার দৃষ্টিতে না দেখে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন এবং এর মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও স্খলন-পতন পরিলক্ষিত হলে মার্জনা করেন। সুধীমণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই আমার জ্ঞানের পুঁজি এবং অক্ষমতার স্বীকৃতিই মুক্তি প্রাপ্তির একমাত্র পথ। আমি সমকালীন ভ্রাতৃবর্গের সদিচ্ছা কামনা করি এবং পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র প্রার্থনা—তিনি যেন স্বীয় দয়ায় এ অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস গ্রহণ করেন। কেননা তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং একমাত্র তিনিই উত্তম সহায়।[১৪]

---

১৪. কোরান—৩, ১৭৩।

www.amarboi.org

উৎসর্গ[১৫]

যখন আমি আরব্ধ গ্রন্থের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করলাম, চক্ষুষ্মানদের জন্য তার জ্ঞান-প্রদীপকে উজ্জ্বল করে তুললাম এবং সমুদয় বিষয়বস্তুকে সুবিন্যস্ত করে তত্ত্বের রাজ্যে এক নতুন পথ ও তথ্যের জগতে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আবিষ্কার করলাম, তখন এ গ্রন্থকে উৎসর্গ করবার ইচ্ছা আমার মনে উদয় হল।

আমি একটি গ্রন্থ ধর্মযোদ্ধাদের অগ্রনায়ক, বিশ্বাসীদের শাসক মহামান্য সম্রাট আবুল ফারিস আবদুল আজিজ ইবনে মওলানা আস্ সুলানুল মুয়াজ্জম—আবু সালিম ইব্রাহিম ইবনে মওলানা আস্ সুলতানুল মুকাদ্দস আমীরুল মুমেনীন আবুল হাসান মারিনীর গ্রন্থাগারে অর্পণ করলাম।

বস্তুত তিনি বাল্যকাল থেকেই পরম ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মভীরুতার দুর্লভ অলংকারে বিভূষিত। মার্জিত রুচি, প্রশংসনীয় উন্নত চরিত্র ও চিন্তাধারার তিনি জ্বলন্ত প্রতীক। তিনি প্রাচীন ও আধুনিককালের সর্ব মর্যাদার উত্তরসূরি—সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অমূল্য ভূষণ—শ্রেষ্ঠ সম্মান ও গুণের আকর। নানাবিধ জ্ঞান ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের সাথে জড়িত থেকে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় তিনি ব্রতী। তিনি মানবীয় গুণাবলির দ্বারা অলংকৃত এবং বাস্তব ও ফলপ্রসূ মাতমত জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্নদিগের অগ্রনায়ক। তিনি ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, আল্লাহ্তায়ালার সপ্রভ দীপ্তি ও আশীর্বাদের আকর। তিনি পার্থিব কঠোরতায় করুণা অভিষিক্ত এবং বিদ্রোহ দমনে বিজয়ী। তিনি বিশৃঙ্খল অবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত করতে মহাপুরুষ।

তিনি পারিবারিক জীবনের সন্দিগ্ধ ধারণা বিদূরিত করে তাকে নবজীবনের নবীন আভরণে ভূষিত করবার জন্য খোদাদত্ত এমন শক্তির অধিকারী, যা বিরুদ্ধচারীদের প্রতিকূলতা ও বিপথগামীদের বৈরিতা কখনও অবদমিত করতে পারেনি। বনি মরিয়ম বংশের এমন সকল খ্যাতিমান মহান রাজপুরুষের সাথে তাঁর রক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান, যাঁরা

১৫. ইবনে খলদুনের বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদকে ফ্রেঞ্জ রোজেনথাল তাঁর অনুবাদে এই অংশটির কোন অনুবাদ দেননি। পাদটীকায় বলেছেন, মূল পাণ্ডুলিপির কোন কোন সংস্করণে এই অংশটি বিদ্যমান। বর্তমান বাংলা অনুবাদের জন্য ব্যবহৃত মূল গ্রন্থের বৈরুত সংস্করণে এ 'উৎসর্গ' অংশটি থাকায় আমরা এর অনুবাদ সন্নিবেশিত করলাম। এতে মধ্যযুগীয় গ্রন্থ উৎসর্গ সম্পর্কে একটি বহুল প্রচলিত রীতি পরিচয় পাওয়া যাবে। তদুপরি ফেজের মারিনী সম্রাট আবুল ফারিস আবদুল আজিজের (১৩৬৬-৭২ খ্রি:) প্রতি উচ্চারিত স্তুতি বাক্যের মধ্যে সমসাময়িক ইতিহাসের জটিলতার ইঙ্গিতও বিদ্যমান। নতুবা ইবনে খলদুনের ন্যায় বিচক্ষণ জ্ঞানীর পক্ষে এ ধরনের স্তুতি উচ্চারণ সম্ভবপর হত না (ইবনে খলদুনের জীবনী দ্র:)। অন্যদিকে তাঁর ইতিহাস রচনার সময়কাল বিবেচনা করলে এ 'উৎসর্গ' অংশটি সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

www.amarboi.org

ধর্মকে সজীব রেখেছেন এবং সৎপথ অন্বেষণকারীদের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ মানব জাতিকে তাঁর শান্তিময় ছত্রছায়াতলে আশ্রয়দান করুন এবং তাঁর জন্য ইসলামে সুসংবাদ প্রদানের আশা পূর্ণ করুন।

সকল যুগের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকারীদের জন্য উৎসর্গ করে এ গ্রন্থ কেন্দ্রীয় শাসনের রাজধানী মহানগরীর গ্রন্থাগারে প্রদত্ত হল। এ নগরী সৎপথ প্রদর্শন ও অনুসরণের চিরপবিত্র পীঠস্থান, শিক্ষার সজীব উদ্যান ও আল্লাহ্তালার গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান আহরণের মহিমান্বিত ক্ষেত্র। আবুল ফারিসের সুমহান শাসন ব্যবস্থার সুযোগ্য দৃষ্টিকে এ গ্রন্থ নিশ্চয়ই আকর্ষণ করবে এবং তাঁর গুণগ্রাহিতার অমর স্পর্শ লাভ করে স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য বহন করতে সক্ষম হবে। কেননা সকল গ্রন্থকারের জ্ঞানভাণ্ডার স্বরূপ গ্রন্থাবলি তাঁরই সান্নিধ্যে এসে উৎসর্গীকৃত হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বাহন এখানে উপনীত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে।

আমাদিগকে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর মহান দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ক্ষমতা এবং তাঁর সহৃদয় সান্নিধ্য লাভের অফুরন্ত সুযোগ দান করুন। আমরা যেন সর্বদা তাঁর সেবাকার্যে নিয়োজিত থাকতে পারি এবং তাঁর চরণে আত্মদানকারীদের মধ্যে আমাদের স্থান যেন প্রথম সারিতে নির্ধারিত হয়। তাঁর আশ্রিত রাজনীতিজ্ঞ ও ধর্মনিষ্ঠদিগকে যেন আল্লাহ্ সর্বদা তাঁর শাসনব্যবস্থার সহায়রূপে সম্মানিত রাখেন।

পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। তিনি যেন আমাদের কার্যাবলি সকল কলুষ কালিমা ও দ্বিধাসন্দেহ মুক্ত করে যথার্থ সদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত রাখেন। কেননা তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সহায়।

www.amarboi.org

ভূমিকা[১৬]

[ইতিহাসের বিষয় গুরুত্ব, তার বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ এবং ইতিহাসবিদদের সম্ভাব্য ত্রুটিবিচ্যুতির বিবরণ ও কারণ।]

ইতিহাস অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্যতম। এর উপাদানগুলো যেমন উপকারী, তেমনি এর উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। ইতিহাস আমাদিগকে মানব জাতির অতীত কার্যাবলি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবহিত করায়। ইতিহাস পাঠে আমরা প্রেরিত পুরুষদের মহৎ জীবনকাহিনী জানতে পারি। এটা আমাদের রাজন্যবর্গের শাসনব্যবস্থা ও তাঁদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে। এর ফলে আমরা পারলৌকিক ও ইহলৌকিক কল্যাণের পথ অনুসরণ করতে এবং নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হই।

এজন্যই ইতিহাস রচনায় বহুবিধ সূত্র, জ্ঞান ও বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন। ইতিহাসবিদকে অবশ্যই মননশীলতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হতে হবে। মাত্র এ দুটি গুণ ইতিহাস রচয়িতাকে সত্যের অনুসারী ও স্খলন-পতন-ত্রুটি থেকে মুক্তি করতে পারে। কোন ঐতিহাসিক লব্ধ বিবরণকে মানব জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্রনীতির মৌলিক তাৎপর্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উপাদানগত বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি পরোক্ষকে প্রত্যক্ষের ও অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের মাপকাঠিতে বিচার না করে তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে তুলে ধরেন, তাহলেই তাঁর স্খলন-পতন ও সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া বিচিত্র নয়। এ কারণেই বহু ইতিহাস রচয়িতা, কোরানের ভাষ্যকার ও ঐতিহ্য বিশারদগণ তাদের বর্ণিত কাহিনী ও ঘটনাবলিতে ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকারে পরিণত হয়েছেন। কারণ তাঁরা প্রাপ্ত বিবরণকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। তাকে বাস্তব মৌলিকত্ব, সমতুল্য বিষয়াদির সাথে সমতুল্য বিধান, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান, মানব জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেননি। এর ফলে তাঁরা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মিথ্যার দিশাহীন প্রান্তরে ঘুরে মরেছেন। বিশেষ করে সম্পদ ও সৈন্যসংখ্যার পরিমাণ বর্ণনায় তাদের অবাস্তব ধারণা মিথ্যাকেও অতিক্রম করেছে। এ ব্যাপারে তাঁদের উচিত ছিল বাস্তব মৌলিকতা ও নিয়ম-নীতির সহায়তা গ্রহণ করা; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এ যে, তাঁরা আদৌ তা করেননি।

---

১৬. বস্তুত এই 'ভূমিকাই' যথার্থ আল-মুকাদ্দিমা। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুণে ইবনে খলদুনের ইতিহাসের প্রথম গ্রন্থও আল-মুকাদ্দিমার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে ও পরিচিতি লাভ করেছে।

www.amarboi.org

বনি ইসরাইলের সৈন্যসংখ্যা

মাসউদী ও অন্য অনেক ইতিহাস রচয়িতা বনি ইসরাইলের সৈন্যসংখ্যা বর্ণনায় অনুরূপ ভ্রান্তির কবলে পতিত হয়েছেন। তাঁদের মতে হজর মুসা (আঃ) মরু প্রান্তরে অবস্থানরত সৈন্যদলকে গণনা করছিলেন। তাদের মধ্যে যারা অস্ত্র বহন করতে পারে, এমন বিশ বছর বয়স্ক ও তদূর্ধ্ব বয়সের লোকের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষেরও অধিক। এ বিপুল সংখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ মিশর ও সিরিয়ার[১৭] সঙ্গতির কথা বিবেচনা করেননি। যে-কোন দেশের জন্যই এমন নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য থাকা বাঞ্ছনীয়, যা তার আয়তন, ব্যয়ভার বহন ও সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। অন্যথায় তা অবাস্তব হতে বাধ্য। বাস্তব অবস্থা ও সুপরিজ্ঞাত রীতিনীতির সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করলেই উপরোক্ত বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

তদুপরি এরূপ একটি বিপুল সংখ্যক সৈন্যদলের যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হওয়াও অবাস্তব ঘটনা। কারণ সংশ্লিষ্ট দেশ বা প্রান্তরে তার স্থান সংকুলান সম্ভব নয়। অন্যদিকে এ বিপুল সংখ্যক সৈন্য সারিবদ্ধ অবস্থায় দণ্ডায়মান হলে দৃষ্টি সীমার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ অথবা বহুগুণ দূরে অবস্থান করবে। এমতাবস্থায় এরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কী করে যুদ্ধ করতে পারে কিংবা একদল অন্য দলের উপর জয়ী হতে পারে! কারণ এ বিরাট সৈন্যদলের এক অংশ অন্য অংশের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবার সুযোগই পাবে না। বর্তমানকালেও অনুরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত এক বিন্দু জল যেমন অন্য এক বিন্দু জলের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে, তেমনি বর্তমানও আমাদের সম্মুখে অতীতের সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করে তোলে।

বনি ইসরাইলের রাজ্য অপেক্ষা পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল অনেকগুণ বেশি। তাঁদের উপর 'বখতেনসরে'র[১৮] বিজয় লাভই এ মন্তব্যের সাক্ষ্য বহন করে। তিনি শুধু জয়ীই হননি, বরং বনি ইসরাইলের সকল শহর দখল করে আধিপত্য বিস্তার করেছেন এবং তাঁদের তীর্থভূমি ও রাজধানী জেরুজালেমকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। অথচ এ বখতেনসর ছিলেন পারস্য সাম্রাজ্যের একটি অঙ্গরাজ্যের কর্মকর্তা মাত্র। অনেকের মতে তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তীয় এক বিশিষ্ট গোত্রপতি ছিলেন। বস্তুত এ সাম্রাজ্য ইরাকে আরব, ইরাকে আজম, খোরাসান, মাওরায়ান্নাহার ও আবোয়াব[১৯] পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বনি ইসরাইলের অধিকৃত এলাকা অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ ছিল। তথাপি পারস্য সম্রাটদের সৈন্যসংখ্যা কোন প্রকারেই উপরোক্ত পরিমাণে উপনীত হয়নি। তাঁদের যে বৃহত্তম সৈন্যবাহিনীকে কাদেসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করা হয়েছিল, তার সৈন্য সংখ্যাও এক লক্ষ বিশ হাজারের বেশি নয়। অবশ্য ঐতিহাসিক সাইফের[২০] মতে উক্ত সৈন্যদল তাদের অনুসারীসহ দুই লক্ষের অধিক হতে পারে। কিন্তু হজরত আয়েশা

---

১৭. মূলে 'শাম' শব্দটি আছে। কথিত আছে, এটা হজরত নূহের পুত্র সামের নামানুসারে পরিচিত হয়।

১৮. নেবুচাডনেজার।

১৯. মাওরায়ান্নাহার—ট্রান্সওক্সানিয়া ও আবোয়াব—কাস্পিয়ানসাগর তীরবর্তী দারবন্দ।

২০. বিখ্যাত ঐতিহাসিক সাইফ ইবনে উমর আল-আসাদী (৫ নং টীকা দ্র:)।

www.amarboi.org

(রাঃ) ও ইমাম জুহরীর[২১] বক্তব্য অনুসারে কাদেসিয়ার প্রান্তরে সেনাপতি সাদের[২২] বিরুদ্ধে রুস্তমের[২৩] সৈন্যসংখ্যা অনুসারীসহ ছিল মাত্র ষাট হাজার।

এতদ্ব্যতীত বনি ইসরাইলের সৈন্যসংখ্যা উল্লেখিত পরিমাণ অধিক হলে তাঁদের সাম্রাজ্যের বিস্তার আরও ব্যাপক হত এবং শাসন ব্যবস্থাও তদনুযায়ী বিস্তৃতি লাভ করত। বস্তুত রাষ্ট্রের আয়তন ও ক্ষমতা অনুযায়ীই কর্মচারী ও সৈন্যসংখ্যা অল্পাধিক হয়ে থাকে। আমরা এ ব্যাপারে প্রথম গ্রন্থের 'রাষ্ট্র' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ও ফলত যে জাতির রাজ্যসীমা সিরিয়ার ফিলিস্তিন, জর্ডান ও হিজাজের মদিনা এবং খয়বরের বাইরে কখনও বিস্তৃতি লাভ করেনি, তাঁদের বিষয়ে বিবেচনা প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞদের মতে হজরত মুসা (আঃ) ও হজরত ইয়াকুব (ইসরাইল)-এর মধ্যে মাত্র চার পুরুষের ব্যবধান।[২৪] হজরত মুসার পিতা এমরাম, এমরামের পিতা ইয়াসহর, ইয়াসহরের পিতা কাহাস বা কাহিস, কাহাসের পিতা লেবী এবং লেবীর পিতা ইসরাইল। তৌরাত গ্রন্থেও তাঁদের বংশ পরিচয় অনুরূপভাবে লিখিত হয়েছে। মাসউদীর মতে ইসরাইলের নিজ পরিবারবর্গসহ মিশরে তৎপুত্র ইউসুফের নিকট আগমনের সময় তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন এবং মুসার সাথে বনি ইসরাইলের মিশর ত্যাগের কাল পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ছিল দুইশ বিশ বছর। এ দুইশ বছর বনি ইসরাইল বিভিন্ন ফেরাউন নামধারী সম্রাটের অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়। সুতরাং এ চার পুরুষে জনসংখ্যার অনুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্তি কোন বিবেচনাতেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

যদি ধরে নেয়া হয় যে, উক্ত সংখ্যা হজরত সুলায়মানের সময়কার, তাহলেও যুক্তির বিচারে অসম্ভব বলে ধারণা জন্মায়। কারণ হজরত সুলায়মান ও হজরত ইসরাইলের মধ্যে মাত্র এগার পুরুষের ব্যবধান। হজরত সুলায়মানের পিতা হজরত দাউদ (আঃ), দাউদের পিতা যেশা, যেশার পিতা অবেদ, অবেদের পিতা বুয়াজ, বুয়াজের পিতা সালমন, সালমনের পিতা নাহশুন, নাহশুনের পিতা আমিনাদব, আমিনাদবের পিতা রাম, রামের পিতা হাজরুন, হাজরুনের পিতা বারেস, বারেসের পিতা যিহুদা ও যিহুদার পিতা ইয়াকুব। এ এগার পুরুষেও উক্ত জনসংখ্যা তাঁদের ধারণামতে ছয় লক্ষে[২৫] উপনীত হতে পারে না। অবশ্য শতক কিংবা সহস্রের কোঠায় পৌঁছা অসম্ভব নয়; কিন্তু এর উপরে গেলেই অবাস্তব হতে বাধ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান সুপরিচিত হার অনুসারে গণনা করলেই এ সকল ঐতিহাসিকের বর্ণনার মিথ্যা ও অবাস্তব দিকটি সম্যকরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়বে।

---

২১. মুহম্মদ ইবে মুসলিম আজ্জুহরী। মৃত্যুকাল ১২৩-১২৫ (৭৪০-৭৪২/৪৩ খ্রি:) হিজরির মধ্যবর্তী।

২২. সাদ ইবনে আবি ওক্কাস, বিখ্যাত সাহাবী।

২৩. পারস্য সেনাপতি। ইনি শাহনামার সেই কিংবদন্তী খ্যাত রুস্তম নয়।

২৪. বাইবেলে তিন পুরুষের নাম উল্লেখিত হয়েছে—যেমন ইয়াকুবের পুত্র লেবী, লেবীর পুত্র কহাৎ, কহাতের পুত্র অম্রম ও অম্রমের পুত্র মোশি বা মুসা। ইংরেজি অনুবাদক রোজেনথাল তিন পুরুষের কথা লিখেছেন। পাদটীকায় তিনি বলেছেন যে, মূলগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে চার পুরুষই ছিল, পরে ইবনে খলদুন তা শুদ্ধ করেন। আমাদের ব্যবহৃত বৈরুত সংস্করণে চার পুরুষ বিদ্যমান। অবশ্য বাইবেলে তিন পুরুষের কথা উল্লেখিত হলেও সময়ের ব্যবধানে হল চারশ ত্রি[illegible] বছর।

২৫. বাইবেলে ৬০৩৫৫০ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

বনি ইসরাইলের ঐতিহ্যগত বর্ণনা অনুসারে হজরত সুলায়মানের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র বার হাজার। তাঁর রাজধানীর বিভিন্ন ঘাঁটিতে এক হাজার চারশ অশ্বারোহী সর্বদা অপেক্ষমান থাকত। এটাই সত্য বিবরণ। সুতরাং অন্যবিধ অসার, অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ সুলায়মানের শাসনকালই বনি ইসরাইলের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি ও রাজ্য বিস্তৃতির সময়।

এভাবে সমসাময়িক বহুলোকের মধ্যেও অনুরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা যখন নিজ নিজ রাষ্ট্রের বা নিকট অতীতের কিংবা মুসলমান ও খ্রিস্টানদের সৈন্যসংখ্যা বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন অথবা কোন রাষ্ট্রের রাজস্ব, ব্যয়ভার, সৌভাগ্যশালীদের ধনসম্পদ এবং বিলাসীদের বিলাসব্যসনের বিবরণ দিতে যান, তখনই তাঁরা অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন ও মাত্রাজ্ঞানের সমস্ত সীমা অতিক্রম করেন। পাঠক যদি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের নথিপত্র অনুসন্ধান করে সৈন্যসংখ্যার পরিমাণ জেনে নিতে পারেন, ধনাঢ্যদের সম্পদ ও সৌভাগ্যের হিসাব করতে পারেন এবং বিলাসীদের বিলাসব্যসনের ব্যয়ভার সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন, তাহলে দেখতে পাবেন তাঁদের বর্ণনার এক-দশমাংশও সেখানে বিদ্যমান নেই। এটা আর কিছু নয়, অস্বাভাবিকের প্রতি মানব-প্রকৃতির সাধারণ আকর্ষণ, জিহ্বার সহজ বিলাসিতা এবং পূর্বাপর বিবেচনাহীন কথা বলবার বদভ্যাস। এর ফলে মানুষ আত্মসমালোচনা করতে ভুলে যায়, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বলে বা লিখে ফেলা বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে আলস্যবোধ করে এবং তজ্জন্য যথার্থ সূত্র বা ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে অপারগ হয়। এ প্রকার ঐতিহাসিকগণ জিহ্বার বল্গা শিথিল করে তাকে মিথ্যার চারণভূমিতে ইতস্তত বিচরণ করতে সুযোগ দেয় এবং আল্লাহ্ নির্দেশিত সত্যকে অবহেলা করে। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবার জন্য মিথ্যার বেসাতি করে ফিরে।[২৬] এটা অতিশয় দুঃখজনক ব্যাপার।[২৭]

তুব্বা রাজন্যবর্গের দিগ্বিজয়

আরব উপদ্বীপ ও ইয়ামেনের তুব্বা রাজগণ সম্পর্কেও ঐতিহাসিকগণ অনুরূপ ভিত্তিহীন কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কথিত হয় যে, তুব্বা রাজগণ তাঁদের আবাসভূমি ইয়ামেন থেকে বের হয়ে আফ্রিকার ও মাগরিবের বারবারদের অঞ্চলগুলো জয় করেন। তাঁদের প্রাথমিক শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গের মধ্যে আফ্রিকাশ ইবনে কায়েস ইবনে সাইফী অন্যতম। তিনি হজরত মুসার সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তীকালের। তিনি আফ্রিকিয়ায় অভিযান পরিচালনা করে বারবারদিগকে পরাজিত করেন এবং তিনিই তাদেরকে ঐ নামে অভিহিত করেন। আফ্রিকাশ বারবারদের ভাষা শুনে বলেছিলেন, এটা কী ধরনের

---

২৬. কোরান ৩১, ৬।

২৭. এর পর ইংরেজি অনুবাদক রোজেনথাল তিনটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন, যেগুলো তাঁর পাদটীকার স্বীকৃতি অনুযায়ী মূল গ্রন্থের টীকা হতে গৃহীত হয়েছে। বস্তুত এ বক্তব্য ইবনে খলদুনের নয়। কারণ এতে বনি ইসরাইলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অলৌকিকত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এটা পূর্ব যুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী।

www.amarboi.org

বর্বরতা! এ উক্তি থেকেই বর্তমানকাল পর্যন্তও তারা বারবার নামে আখ্যায়িত হয়ে রয়েছে। মাগরিব থেকে আফ্রিকাশের প্রত্যাবর্তনের সময় সেখানে হিমিয়ারদের কিছু গোত্রকে তিনি রেখে আসেন। তারা সেখানে বসবাস করতে থাকে এবং কালক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মিশে যায়। এদেরই মিশ্রিত জনগোষ্ঠীর নাম হল 'মিনহাজা' ও 'কুতামা'। এ সূত্র থেকে তাবারী, জুরজানী[২৮], মাসউদী ইবনুল কালবী, বায়হকী[২৯] প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ বলেছেন যে, মিনহাজা ও কুতামা হিমিয়ার[৩০] গোত্রের অন্তর্গত। কিন্তু বারবার বংশতালিকা বিশারদগণ এ বক্তব্য অস্বীকার করেছেন এবং তাঁদের এ অস্বীকৃতিই যথার্থ।

মাসউদী আরও লিখেছেন যে, হজরত সুলায়মানের সমসাময়িক জুল আযআর নামীয় একজন তুব্বা সম্রাট আফ্রিকাশের পরবর্তী[৩১] সময়ে মাগরিব অধিকার করে তাকে দগ্ধ করেন। এভাবে তৎপুত্র ইয়াসের সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তিনি মাগরিব জয় করে তথাকার 'বালুকা প্রান্তর'[৩২]-এর নিকটে উপনীত হন এবং বালুকার জন্য অগ্রসর হতে অপারগ হয়ে ফিরে আসেন।

অনুরূপভাবে শেষ তুব্বারাজ আসাদ আবু কারের সম্পর্কেও ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, তিনি পারস্যের কায়ানী সম্রাট ইস্তাসেফের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি মোশেল ও আজরবাইজান অধিকার করেন। তিনি তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে বিপুল পরিমাণে হত্যা করেন। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তাদের মধ্যে ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাঁর তিনপুত্র পর্যায়ক্রমে পারস্য সাম্রাজ্য, মাওরায়ান্নাহারের তুর্কি গোত্রভুক্ত সগদিয়ানদের এলাকা এবং বাইজেন্টাইন রাজ্যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। প্রথমজন সমরকন্দ পর্যন্ত অধিকার ও মরু অঞ্চল অতিক্রম করে চীনদেশে গিয়ে উপনীত হন এবং সেখানে দ্বিতীয় ভ্রাতা, যিনি সগদিয়ানদিগকে[৩৩] পরাজিত করে পূর্বাহ্নেই সেখানে পৌঁছেছিলেন, তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন। অতঃপর দুই ভ্রাতা একত্র হয়ে চীনে অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ স্বদেশে ফিরে আসেন। তাঁরা চীনে[৩৪] কিছু সংখ্যক হিমিয়ার গোত্রকে রেখে আসেন, যারা অদ্যাবধি সেখানে বসবাস করছে। তৃতীয় ভ্রাতা কনস্টান্টিনোপল বিধ্বস্ত করে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পদানত করেন এবং স্বদেশে ফিরে আসেন।

---

২৮. আলী ইবনে আবদুল আজিজ। মৃত্যুকাল—৩৯২ (১০০২ খ্রি:) হিজরি।

২৯. মূল গ্রন্থে 'আল বেইলী' বিদ্যমান। রোজেনথাল ইংরেজি অনুবাদে 'বায়হকী' লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম কিতাবুল কামায়েম। তাঁর নাম আলী ইবনে জায়েদ। জীবনকাল ৮৯৯-৫৬৫ (১১০৬-১১৬৯ খ্রি:) হিজরি।

৩০. হিমিয়ার শব্দটি হজরত নূহের পুত্র হামের নামানুসারে তার বংশাবলির জন্য গৃহীত হয়েছে বলে কথিত।

৩১. মূল গ্রন্থে 'কাবলা আফ্রিকাশ'—আফ্রিকাশের পূর্বে—আছে। যতদূর সম্ভব মুদ্রণ প্রমাদ।

৩২. 'ওয়াদিউর রমল'—রোজেনথাল একে কিংবদন্তীখ্যাত 'বালুকা নদী' বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত নদীতে জলের মতই বালুকা স্রোত প্রবাহিত হয়।

৩৩. মূল গ্রন্থে 'সমরকন্দ' শব্দটি আছে। এটাও মুদ্রণপ্রমাদ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

৩৪. মূলে চীন দেশ আছে। রোজেনথালের অনুবাদে 'তিব্বতের' নাম উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবত তিনি তাঁর অনুবাদে ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিতে তিব্বতের নাম পেয়ে থাকবেন।

www.amarboi.org

এ সকল বিবরণের সমুদয় অংশই অবাস্তবতায় পরিপূর্ণ। এটা কল্পনাপ্রসূত ভিত্তিহীন ধারণা মাত্র। ইতিহাস অপেক্ষা গল্পকারদের কল্পিত কাহিনীর সাথেই এর সাদৃশ্য সমধিক। কারণ তুব্বার রাজন্যবর্গ আরব উপদ্বীপের অধিবাসী। তাঁদের রাজধানী ছিল ইয়ামেনের সানা শহর। আরব উপদ্বীপ তিন দিক হতেই সমুদ্র বেষ্টিত। এর দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বদিকে ভারত মহাসাগর থেকে বসরা পর্যন্ত বিস্তৃত পারস্য উপসাগর এবং পশ্চিম দিকে ভারত মহাসাগর থেকে মিশরের সুয়েজ পর্যন্ত বিস্তৃত লোহিত সাগর।[৩৫] যে-কোন পাঠক মানচিত্রে তা লক্ষ করতে পারেন। ইয়ামেনের সানা থেকে মাগরিবে যেতে হলে সুয়েজ ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের[৩৬] মধ্যকার দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রায় দুইদিন সময় লাগে। এ দীর্ঘ দূরত্ব বিস্তৃত অঞ্চলকে নিজের আয়ত্তাধীনে না এনে কোন দিগ্বিজয়ী সম্রাটের পক্ষে স্বীয় সৈন্যদলসহ তা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এটা স্বাভাবিক ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। উপরোক্ত অঞ্চলে আমালেকাগণ বাস করত, সিরিয়ায় ছিল কেনানীগণ এবং মিশর ছিল কিবতীদের অধীনে। পরবর্তীকালে আমালেকগণ মিশর অধিকার করে এবং সিরিয়া বনি ইসরাইলের দখলে চলে যায়। যাহোক কোথাও এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তুব্বা সম্রাটগণ উপরোক্ত জাতিগুলোর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন কিংবা ঐ সকল অঞ্চলের কোন অংশ দখল করেছিলেন।

তদুপরি সমুদ্র উপকূল থেকে মাগরিব অঞ্চলের ব্যবধান বেশ ব্যাপক এবং সৈন্যদলের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সামগ্রী ও আসবাবপত্রের পরিমাণও বিপুল। সুতরাং সৈন্যদলসহ উপরোক্ত অঞ্চলগুলো অতিক্রম করবার সময় শস্য, পশু ও অন্যান্য সামগ্রী লুণ্ঠন ব্যতীত রসদ সংগ্রহের অন্য পথ নেই। দিগ্বজয়ী যে কোন সৈন্যদল স্বাভাবিকভাবে উক্ত কাজ করে থাকে। যদি ধরে নেয়া যায় যে, তাঁরা সমগ্র রসদ সামগ্রী নিজ দেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন; তথাপি উক্ত বিপুল পরিমাণ রসদ পরিবহনের জন্য বিরাট সংখ্যক বাহনের প্রয়োজন। তার সংগ্রহ ও পরিচালনা যেমন ধারণার অতীত, তেমনি গমন পথের সমগ্র অঞ্চল নিজেদের অধীনে আনয়ন ব্যতীত এ বিপুল বাহিনীসহ অগ্রসর হওয়াও প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকে এরূপ ধারণা করাও ঠিক নয় যে, উক্ত সৈন্যদল পথিমধ্যের রাজ্যগুলোর সাথে কোন প্রকার বিবাদে প্রবৃত্ত না হয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাঁদের রসদ সামগ্রী সংগ্রহ করেছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রীয় অবস্থা অনুসারে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মানতে হয়। সুতরাং ঐ সকল বিবরণ ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

তাঁদের উল্লেখিত 'বালুকা প্রান্তর', যা সৈন্যদলের অগ্রগমনে বাধার সৃষ্টি করেছিল, তার কথাও মাগরিবে কখনও শোনা যায়নি। অথচ সুদূর অতীত থেকে মাগরিবের যত্রতত্র গমনাগমনকারী পরিব্রাজক ও অভিযাত্রীদের সংখ্যা বহু। তাঁরা যুগে যুগে এর পথঘাটের বিবরণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। সুতরাং তাঁদের বর্ণিত প্রান্তর মূলত অবাস্তব মুখরোচক গল্পের উপাদান ছাড়া অন্য কিছু নয়। মানুষ স্বভাবতঃই এগুলো বলতে ভালবাসে।

---

৩৫. মূলে আছে 'বাহরুস্ সুয়েস'—সুয়েজ সাগর।

৩৬. মূলে আছে 'বাহরুস্ শামী—শাম সাগর।

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে তাঁদের পূর্বদেশীয় রাজ্য ও তুর্কি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ বিজয় সম্পর্কেও বলা যায়। সুয়েজ অঞ্চলের পথঘাট অপেক্ষা যদিও উক্ত অঞ্চলগুলোর পথঘাট প্রশস্ততর ও সুগম, তথাপি দূরত্বের পরিমাণ অনেকগুণ অধিক। তদুপরি তাদের পূর্বেই পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ভূমি অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু তাঁরা কোথাও বর্ণনা করেনি যে, সম্রাটগণ পারস্য বা রোমান সাম্রাজ্য দখল করেছিলেন। অবশ্য এঁরা পারস্যবাসীদের সাথে ইরাক সীমান্তে, বাহরাই ও হীরার মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং আরব উপদ্বীপের দজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকাগুলোতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। এটাও সংঘটিত হয়েছে তুব্বা সম্রাট জুল আযআর ও কায়ানীরাজ কায়কাউস এবং আবু কারেব ও ইস্তাসেফের[৩৭] মধ্যে। এর পরেও কায়ানী ও সাসানী সম্রাটদের সাথে সংঘর্ষের বিবরণ বিদ্যমান। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এটা কখনই সম্ভব হয়নি যে, তাঁরা পারস্য সম্রাটদিগকে পরাজিত করে তুর্কি অঞ্চল ও তিব্বত[৩৮] অধিকার করেছিলেন। এ প্রকার ধারণা পোষণ করা বাস্তবের সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্যদিকে সৈন্যদলের রসদ সামগ্রী সংগ্রহ ও পরিবহনের বিষয়টি পূর্বেই সবিস্তারে আলোচনা করেছি। অধিকতর দূরত্বের জন্য তা এ প্রসঙ্গে অধিকতর প্রযোজ্য। এজন্যই এ সকল বিবরণ ভিত্তিহীন প্রক্ষেপের সমতুল্য। যদিও মেনে নেয়া যায় যে, এগুলোর বর্ণনাসূত্র যথার্থই শুদ্ধ, তবু বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটা সন্দেহমুক্ত নয়। কাজেই সমগ্র বিষয়টিই তখন সন্দেহযুক্ত হয়ে দাঁড়ায় এবং সত্য থেকে দূরে সরে যায়।

ইবনে ইসহাকও ইয়াসরব[৩৯] এবং আউস ও খাজরাজ গোত্রের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তুব্বা রাজন্যবর্গ কর্তৃক পূর্বদেশ অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তাতে পূর্বদেশ বলতে ইরাক ও পারস্যকে বোঝান হয়েছে, তিব্বত ও তুর্কি অঞ্চল নয়। কারণ উক্ত অঞ্চলদ্বয়ে অভিযানের অসম্ভাব্যতা পূর্বেই যুক্তি-প্রমাণসহ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং পাঠকের নিকট অনুরূপ কোন বর্ণনা এসে পৌঁছলে, তা গ্রহণ করবার পূর্বে তিনি যেন গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং বিশুদ্ধ রীতি-নীতির আলোকে তাকে বিশ্লেষণ করে দেখেন। কেবল এভাবেই তিনি সত্যের সন্ধান পেতে পারেন। আমাদিগকে সত্যের অনুসারী করুন।

ইরাম নগরীর কাহিনী

উপরোক্ত কল্পিত বর্ণনাদ্বয় অপেক্ষাও ভিত্তিহীন অলীক বিবরণ কোরানের ভাষ্যকারগণ সূরায়ে 'আল ফজর'[৪০] সম্পর্কে প্রদান করেছেন। তাঁরা কোরানের এ উক্তি—'তুমি কি দেখনি, তোমার প্রভু আদ গোত্রের প্রতি কী ব্যবহার করেছেন—স্তম্ভধারী ইরাম' তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ইরাম বিরাট বিরাট স্তম্ভধারী সৌধের একটি নগরীর

৩৭. এই নামটি নানাভাবে উল্লেখিত হয়েছে—ইস্তাসেফ, বিস্তাসেফ, গুস্তাসেফ ইত্যাদি।

৩৮. মূলে আছে 'তুব্বত।'

৩৯. মদিনার প্রাচীন নাম ইয়াসরব। হযরত (সঃ) ইয়াসরবে হিজরত করবার পর এর নামকরণ হয় মদিনাতুন্নবী।

৪০. কোরান; ৮৯, ৬-৭।

www.amarboi.org

নাম। তাঁদের মতে আদ ইবনে আউস ইবনে ইরামের দুই পুত্র ছিল, তাদের নাম শাদিদ ও শাদ্দাদ। তাঁরা উভয়েই পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। অতঃপর শাদিদের মৃত্যু হলে শাদ্দাদ সমগ্র রাজ্যের অধিকারী হন। সমসাময়িক সকল রাজন্য তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। শাদ্দাদ একদিন স্বর্গের সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনে নিজেই অনুরূপ একটি স্বর্গ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এডেনের প্রান্তরে তিনশ বছরে এ স্বর্গপুরী নির্মিত হয়। শাদ্দাদ নয়শ বছর জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

এ স্বর্গপুরীর সৌধগুলো মণি-মানিক্য খচিত, এর চতুর্দিকে বৃক্ষাদির দ্বারা সুশোভিত এবং সদা উৎক্ষেপমান ফোয়ারার দ্বারা বিভূষিত ছিল। এভাবে এ স্বর্গপুরীর সৌন্দর্যবিন্যাস সমাপ্ত হলে শাদ্দাদ তাঁর সভাসদবর্গসহ তাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হলেন। কিন্তু তা থেকে একদিন এক রাত্রের দূরত্বে উপনীত হতেই আল্লাহ্‌র আকাশ থেকে তাদের উপর বজ্রপাত করলেন এবং তারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হল।

এ কাহিনী তাবারী সালাবী,[৪১] জমখমরী[৪২] ও অন্যান্য কোরান ব্যাখ্যাতাগণ তাবেয়ী আব্দুল্লাহ্ ইবনে কেলাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত তাবেয়ীর একটি উট হারিয়ে গেলে তার অনুসন্ধানে বের হয়ে উক্ত স্বর্গপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তথা থেকে প্রচুর মণি-মানিক্য বহন করে আনেন। আমীর মাবিয়ার নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাঁকে ডাকিয়ে আনেন এবং তাঁর নিকট সমুদয় ঘটনা জানতে পারেন। মাবিয়া কাব-আল আহবারকে[৪৩] এ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, এটাই স্তম্ভধারী ইরাম নগরী! তিনি আরও বলেন যে, আমীর মাবিয়ার সমসাময়িক কোন মুসলমান, যার গাত্রবর্ণ ধূসর লাল, দেখতে খর্বকায় এবং যার ভ্রূ ও স্কন্ধে তিল বিদ্যমান—উক্ত ব্যক্তি তাঁর উট অনুসন্ধান করতে গিয়ে সেখানে প্রবেশ করবে। অতঃপর মুখ ফিরিয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে কেলাবাকে[৪৪] দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন—'আল্লাহ্‌র কসম, এ সেই ব্যক্তি।'

অথচ এ পর্যন্ত উক্ত শহরের কোন চিহ্ন পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায়নি। যেখানে এ নগরী নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়, সেই এডেন প্রান্তর ইয়ামেনের মধ্যভাগে অবস্থিত। তাতে আবহমানকাল ধরে জনবসতি চলে আসছে। পরিব্রাজকগণ তার সমস্ত পথঘাট বিচরণ করে ফিরেছেন; কিন্তু উক্ত নগরীর কোন সংবাদ কেউ দেননি। প্রত্নবিশারদগণও কোথাও এর উল্লেখ করেননি, সাধারণ মানুষের মুখেও এর কথা শোনা যায় না। বর্ণনাকারীগণ যদি বলতেন যে, উক্ত নামের একটি শহরের অস্তিত্ব এক সময়ে বিদ্যমান ছিল, পরে কালক্রমে অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর মতই তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তা হলেও মানাত। কিন্তু তাঁরা সুস্পষ্টভাবে এ কথাই বলছেন যে, উক্ত নগরীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। অনেকে দামেশ্‌ক নগরীকে ইরাম বলে মনে করেন। কারণ

---

৪১. আহমদ ইবনে মুহম্মদ : মৃত্যু ৪২৭ (১০৩৫ খ্রি:) হি:।

৪২. মুহম্মদ ইবনে উমর : ৪৬৭-৫৩৮ (১০৭৫-১১৪৪ খ্রি:) হি:।

৪৩. ইবনে মতি আল-হুমায়রী : মৃত্যু ৩২-৩৪ (৬৫৪-৬৫৬ খ্রি:) হি:।

৪৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে জায়েদ ইবনে আমর আল জুরামী, তাঁর ডাক নাম ছিল আবু কেলাবা। তিনি তাবেয়ী অর্থাৎ সাহাবীদিগকে দেখেছেন মাত্র, হজরত মুহম্মদ (সঃ)-কে দেখেননি।

www.amarboi.org

দামেশ্‌ক এক সময়ে আদ জাতির দখলে ছিল। আবার অনেকে বর্ণনায় রহস্যজাল বিস্তার করে বলেন যে, উক্ত নগরী চর্মচক্ষে দৃশ্যমান নয়। একমাত্র যোগসাধনাকারী ও যাদুকরগণই তার সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারেন। এ সকল ধারণার সমুদয় অংশই কল্পনার মায়াজাল মাত্র।

কোরানের ভাষ্যকারগণকে যে বিষয়টি উক্ত কাহিনী বর্ণনায় উৎসাহিত করেছে, তাহল আরবি ব্যাকরণের কলাকৌশল। 'জাতেল ইমাদ' (স্তম্ভধারী) শব্দটিকে ইরামের বিশেষণ ধরাতেই এ প্রকার বিপত্তি ঘটেছে। তাঁরা ইমাদের অর্থ করেছেন স্তম্ভ। এর ফলে স্তম্ভধারী সৌধের কল্পনা মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। হযরত ইবনে জুবায়ের[৪৫] থেকে 'আদ'কে ইরামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে কোরানের যে পাঠ প্রচলিত আছে, তা তাঁদেরকে আরও বেশি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ফলে তাঁরা ইরাম নগরীর আদ জাতি সম্পর্কে এ সকল কাহিনীর অনুসন্ধান করেছেন। বস্তুত এ সকল কাহিনী অবাস্তব, ভিত্তিহীন এবং হাস্যরস উৎপাদনকারী স্বকপোলকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

প্রকৃতপক্ষে ইমাদ অর্থ তাঁবুর খুঁটি, স্তম্ভ নয়। যদি এর অর্থ স্তম্ভও ধরা হয়, তথাপি এর দ্বারা বিশেষ কোন অট্টালিকা বা নগরীর কল্পনা করা উচিত হয়। বরং এর অর্থ হবে সাধারণভাবে বহু সৌধ বা স্তম্ভের নির্মাণকারী। শাদ্দাদ যেহেতু মহা প্রতাপশালী সম্রাট ছিলেন, সেই কারণেই তিনি ও আদবংশীয় অন্যান্য সম্রাট বহু অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। আর যদি ইবনে জুবায়েরের পাঠ অনুসারে আদকে ইরামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে অর্থ করা হয়, তাহলে ইরামের আদ জাতি বোঝাবে। যেমন বলা হয় কেনানার কোরায়েশ, মুজারের ইলিয়াস ও নেজারের রাবিয়া। এর দ্বারা বিশেষ গোত্রভুক্তির কথা বোঝানো হয়। অথচ এ সহজ অর্থ ত্যাগ করে এ প্রকার ভিত্তিহীন অবাস্তব কাহিনী চয়ন করায় যে পরিমাণ অনুসন্ধিৎসা ব্যয় হয়েছে, তা একান্তই অর্থহীন। এটা শুধু মিথ্যার কলুষ-কালিমায় আল্লাহ্‌র কোরানকে বিকৃত করেছে মাত্র।

বরমেকীদের পতন

ঐতিহাসিকদের এ প্রকার ভিত্তিহীন কাহিনী বর্ণনার আরও একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বরমেকীদের উপর আব্বাসী সম্রাট হারুনুর রশীদের বিরাগের কারণস্বরূপ জাফর ইবনে ইয়াহিয়া ও আব্বাসার প্রেম কাহিনী রচনা। আব্বাসা হারুনুর রশিদের ভগ্নি এবং জাফর ছিলেন তাঁর প্রধান অমাত্য। তাঁদের মতে সম্রাট ইতিপূর্বে জাফরের সাথে তদীয় ভগ্নির বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দিলেও দৈহিক মিলনের কথা বারণ করে দিয়েছেন। সম্রাটের ইচ্ছা ছিল, তাঁরা উভয়েই যেন তাঁর মদ্যপানের আসরে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। এভাবে সুযোগ দেয়ার ফলে আব্বাসা জাফরের প্রতি অতিশয় আসক্তা হয়ে পড়লেন। এবং তাঁর সাথে গোপনে মিলিত হওয়ার জন্য কলাকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।[৪৬] যথা সময়ে সেই সুযোগ দেখা দিল এবং ঐতিহাসিকদের মতে

---

৪৫. আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জুবায়ের, বিখ্যাত সাহাবী। হজরত আয়েশার ভগ্নি হজরত আসমার পুত্র।

৪৬. আব্বসার এই কলাকৌশলের দীর্ঘ বর্ণনা মাসউদী তাঁর 'মারুজুজ্‌ জাহাব' গ্রন্থে প্রদান করেছেন। এই বিষয়ের উপর আরবি ভাষায়—'আব্বাসা' নামে একটি উপন্যাস বিদ্যমান।

www.amarboi.org

আব্বাসা সুরাসক্ত অবস্থায় জাফরের অঙ্কশায়িনী হলেন। এর ফলে আব্বাসা নাকি গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং সম্রাট এ সংবাদ শুনতে পেয়ে জাফর তথা বরমেকীদের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেন।

একান্ত পরিতাপের বিষয় এ যে, এ কাহিনী রচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ সম্রাট ভগিনী আব্বাসের ধর্মবোধ, বংশমর্যাদা ও চরিত্র-গৌরবের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত করেননি। আব্বাসা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের প্রদৌহিত্রী। তাঁদের উভয়ের মাত্র চার পুরুষের ব্যবধান এবং তাঁরা সকলেই আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের পরে ধর্মের নেতা ও সমাজের পুরোধা ছিলেন। আব্বাসের পিতা হলেন মুহম্মদ আল মাহদী, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ্ আবু জাফর আল-মনসুর, তাঁর পিতা মুহম্মদ আস্‌সাজ্জাদ, তাঁর পিতার সম্রাটদের জনক আলী, তাঁর পিতা কোরানের ব্যাখ্যাতা[৪৭] আব্দুল্লাহ্ এবং তাঁর পিতা হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর পিতৃব্য হজরত আব্বাস (রাঃ)। আব্বাসা সম্রাটের কন্যা ও সম্রাটের ভগ্নি এবং তাঁর ভাগ্যে যুগপৎ রাষ্ট্রীয় মহিমা ও নবুয়তের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদার সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ রসূলের সংসর্গ লাভের সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত এবং তাঁর পিতৃব্য হওয়ার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। আব্বাসা জন্মগতভাবে ইসলামের এমন সকল মনীষীর সাথে সম্পর্কযুক্ত, যাঁরা সকলেই নিষ্ঠাবান ধর্ম প্রবক্তা, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের জ্যোতি ও স্বর্গীয় দূতগণের অবতরণস্থল হিসাবে খ্যাতিমান। তাঁর জীবৎকালে বেদুইন জীবনের কঠোরতা ও ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধনার যুগ অন্তর্হিত হয়নি; তখনও বিলাসব্যসন ও চরিত্রহীনতার আচরণ এমন ব্যাপক হয়ে উঠেনি।

সুতরাং এ আব্বাসা যদি সতীত্ব ও চরিত্র হারিয়ে বসেন, তাহলে আর কার মধ্যে পাওয়া যাবে? তাঁর গৃহ থেকেই যদি পবিত্রতা ও শালীনতা অন্তর্হিত হয়, তবে তা আর কোথায় প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে? বস্তুত জাফর ইবনে ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কী করে সম্ভব হতে পারে! কী করে তিনি আরবীয় বংশমর্যাকে একজন অনারব মুক্ত ক্রীতদাসের পদতলে ন্যস্ত করতে পারেন। একজনের পূর্বপুরুষ রসূলের পিতৃব্য ও কোরায়েশ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যজনের পিতৃপুরুষ অনারব পারস্যবাসী! আব্বাসীয়রাই বরমেকীদিগকে ক্রীতদাসের কলংক থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করেছিলেন। এমতাবস্থায় স্বীয় উচ্চ মর্যাদা ও পিতৃপুরুষগণের গৌরব ভুলে গিয়ে একজন অনারব মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের সাথে নিজ ভগ্নির বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন সম্রাট হারুনুর রশীদের পক্ষেই বা কি করে সম্ভব হয়! যদি কোন চিন্তাশীল পাঠক এ ব্যাপারটিকে যথাযথ বিবেচনা করেন এবং আব্বাসাকে একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সম্রাটের সাধারণ আত্মসচেতন ভগ্নি বলে মনে করেন, তাহলে তাঁর বিবেক এ কথা কিছুতেই সমর্থন করবে না যে, আব্বাসা নিজ বংশের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত একজন ক্রীতদাসের সাথে এ প্রকার গর্হিত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। বরং নিজের যুক্তিতেই এ ঘটনা মিথ্যা অপবাদ বলে প্রত্যাখ্যান করবেন। পরিতাপের বিষয়, কোথায় আব্বাসা ও হারুনুর রশীদের মর্যাদা আর কোথায় সাধারণ মানুষের অবস্থা!

৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসা; তিনিই কোরানের ব্যাখ্যা অর্থাৎ 'তফসির' রচনার পথিকৃৎ।

www.amarboi.org

প্রকৃতপক্ষে বরমেকীদের পতনের যথার্থ কারণ সাম্রাজ্যের ব্যাপারে তাঁদের অযথা হস্তক্ষেপের মধ্যে নিহিত ছিল। তাঁরা যেভাবে সাম্রাজ্যের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে রাজকোষকে নিজেদের আওতাধীন করে ফেলেছিলেন, তাতে স্বয়ং সম্রাট হারুনুর রশীদকেও সামান্য অর্থের জন্য তাঁদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। বস্তুত তারা রাষ্ট্রের সর্ব বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করে রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্রাটের অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত সম্রাটের পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব ছিল না। এভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাঁদের কুক্ষিগত হয়ে পড়লে তাঁদের খ্যাতি দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ ও মর্যাদা স্বভাবতঃই তাঁদের কবলে পতিত হয়। তাঁরা এ সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে মন্ত্রিত্ব, সচিবত্ব, সেনাপৈত্য ও দ্বারবানী—এক কথায় অসি ও মসী সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে বসেছিলেন। এতে অন্য কারও কোন কিছু বলবার বা করবার অবকাশ ছিল না। বলা হয় যে, একই সময়ে সম্রাটের প্রাসাদে ইয়াহিয়া ইবনে খালিদ বরমেকীর বংশধরদের মধ্য থেকে পঁচিশ জন অমাত্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতে অন্যান্য অমাত্যবর্গ ও সভাসদদের প্রতাপ খর্ব হয়ে পড়েছিল এবং তাঁরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

এ সর্বগ্রাসী প্রভাবের অন্যতম কারণ, জাফরের পিতা ইয়াহিয়া একাধারে হারুনের শিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন। বলতে গেলে তাঁরই স্নেহের ছায়ায় রশীদ লালিত হয়ে সম্রাট হিসাবে অভিষিক্ত হন। এর ফলেই ইয়াহিয়া তাঁর উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই হারুন তাঁকে 'পিতা' বলে সম্বোধন করতেন এবং বরমেকী পরিবারকে তাঁর সাম্রাজ্য পরিচালনায় অবাধ অধিকার দান করেছিলেন। এর ফল এ দাঁড়াল যে, তাঁদের ক্ষমতা ও মর্যাদা অতিদ্রুত বেড়ে গেল এবং সকলের দৃষ্টি তাঁদের দিকে আকৃষ্ট হল। উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকলেই তাঁদেরকে মান্য করত, বদান্যতার জন্য সর্বশ্রেণীর লোক তাঁদের দ্বারস্থ হত এবং দূর-দূরান্ত থেকে রাজন্যবর্গের উপঢৌকন ও অমাত্যবর্গের উপহার তাদের সমীপে এসে পৌঁছত। রাজকোষের অর্থ যথেচ্ছা ব্যবহারের ফলে তাঁদের ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠত এবং তাঁরা নিজেদের আত্মীয়বর্গ ও শিয়া[৪৮] সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে অবাধ ধন বিতরণ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা সম্ভ্রান্ত বংশীয় নিঃস্বদের জন্য জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং বন্দীদিগকে যথেচ্ছা মুক্তি দিতে লাগলেন। এর ফলস্বরূপ তাঁদের উদ্দেশ্যে এমন প্রশংসা বাণী উচ্চারিত হতে আরম্ভ করল, যা স্বয়ং সম্রাটের জন্যও উচ্চারিত হয়নি। বস্তুত বরমেকীগণ তাঁদের উদ্দেশ্যে আগত সকল প্রার্থীকেই দান-ধ্যানের দ্বারা বশীভূত করে নিলেন এবং এভাবে গ্রামে-গ্রামান্তরে, নগরে-বন্দরে রাজ্যের সর্বত্র তাঁদের প্রভাব অপ্রতিহত হয়ে উঠল।

অনতিবিলম্বে এর প্রতিক্রিয়াও দেখা দিল। সম্রাটের অন্তরঙ্গ সভাসদগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন; বিচক্ষণ বুদ্ধিমানগণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন এবং উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন। হিংসা বিদ্বেষ ও কুৎসা রটনা আপন মূর্তি পরিগ্রহ করল

৪৮. শিয়া বলতে এখানে হজরত আলী (রাঃ)-র বংশধরদেরকে বোঝানো হয়েছে। বস্তুত তাঁদের সাথে আব্বাসীয়দের সম্পর্ক ভাল ছিল না।

www.amarboi.org

এবং ষড়যন্ত্রের বৃশ্চিক রাজ্যের কোমল শয্যাগুলোতে তাদের আসন সংস্থান করে নিল। এমন কি জাফরের মাতুল গোত্র বনি-কাহ্তাবা পর্যন্ত এ ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান অংশীদার হয়ে উঠল। আত্মীয়তার বন্ধন ও রক্তের সম্পর্ক কোন কিছুই তাঁদের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করতে পারল না। এর ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্বেষের কারণগুলো তাদের প্ররোচনায় বৃহৎ হয়ে উঠল এবং বৃহৎগুলো মারাত্মক শত্রুতায় পরিণত হল। উদাহরণ স্বরূপ ইয়াহিয়া ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালেবের ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ইনি 'নফসে যাকিয়া' (পবিত্রাত্মা) মুহম্মদ আল মাহদীর ভ্রাতা এবং ইনিই সম্রাট মনসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। অথচ এ ইয়াহিয়াকে পত্রযোগে সম্রাট হারুনুর রশীদের নির্ভয় দানের ফলে প্রাগুক্ত জাফরের ভ্রাতা ফজল ইবনে ইয়াহিয়া দায়লম অঞ্চল থেকে রাজধানীতে নিয়ে আসেন। তাবারীর বর্ণনা মতে ফজল তাঁর জন্য হাজার হাজার দিরহাম ব্যয় করেছিলেন।

যাহোক, সম্রাট হারুন উক্ত ইয়াহিয়াকে[৪৯] জাফরের হাতে অর্পণ করে নিজ গৃহে অন্তরীণ অবস্থায় আবদ্ধ রাখতে আদেশ দেন। জাফর তাঁকে নিজ গৃহে কিছুদিন আবদ্ধ রাখবার পর নবী বংশীয়দের রক্তের মর্যাদার অজুহাতে সম্রাটের আদেশ ছাড়াই গোপনে মুক্ত করে দেন। এর ফলে সম্রাটের বিরোধিতা ও রাষ্ট্রের কাজে অযথা হস্তক্ষেপের এ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। সম্রাট জাফরকে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এ অভিযোগ স্বীকার করে ফেললেন। এর উত্তরে প্রকাশ্যে সম্রাট যদিও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর অন্তরের গভীরে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। এভাবে জাফর নিজের জন্য ও নিজ পরিবারবর্গের জন্য নিজ কৃতকর্মের দ্বারা ধ্বংসের পথ রচনা করেছিলেন। অবশেষে সত্যিই একদিন তাঁদের পতন অনিবার্য হয়ে উঠল, তাঁদের মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ল এবং তাঁদের অস্তিত্ব ও গৃহাদি ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল। তাঁদের গৌরবগাঁথা অতীতের কাহিনী ও অনাগত ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্তস্থল হয়ে দাঁড়াল।

যে কোন চিন্তাশীল পাঠক, যিনি বরমেকীদের কার্যকলাপ বিবেচনা করবেন এবং তার সাথে তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি বিচার করে দেখবেন, তাঁর নিকট তাদের পতনের কারণগুলো অতি সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হবে। পাঠক! সম্রাট হারুন, তাঁর পিতামহর পিতৃব্য দাউদ ইবনে আলীর সাথে বরমেকীদের পতন সম্পর্কে যে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন যা ইবনে আবাদ রাব্বিহির[৫০] বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে, তৎপ্রতি লক্ষ করুন এবং এর সাথে কিতাবুল ইক্দের কবিদের অধ্যায়ে বর্ণিত হারুন ও ফজল ইবনে ইয়াহিয়ার সাথে আসমাইর[৫১] খোশগল্পের কথা মিলিয়ে দেখুন; তাহলে অতি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে সম্রাটের মনে যে বিদ্বেষ জমে উঠেছিল, তাই তাঁদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এভাবে

৪৯. কারবালার ঘটনাকে সম্মুখে রেখেই আব্বাসীয়রা ক্ষমতা দখল করছিলেন; কিন্তু উক্ত ঘটনার নায়ক হোসেনের বংশধরদের প্রতি তাঁরা সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। ইয়াহিয়ার দৃষ্টান্ত তার সামান্য একটি অংশ মাত্র।

৫০. আহমদ ইবনে মুহম্মদ। জীবনকাল ২৪৬-৩২৮ (৮৬৩-৯৪০ খ্রি:) হিজরি।

৫১. আবু সাইদ আবদুল মালেক ইবনে কুরায়েব; ১২৩-২১১ (৭৪৩-৮৩১ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

সম্রাটের অন্তরঙ্গ সভাসদগণ তাঁদের বিরুদ্ধে সম্রাটের অন্তরে লুক্কায়িত বিদ্বেষবহ্নি যাতে তীব্রভাবে জ্বলে উঠে, তজ্জন্য গায়কদের মুখে নিম্নের কাব্যাংশটি[৫২] তুলে দিয়েছিল।

হায়, হিন্দা যদি নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করত
এবং আমাকে এ মর্মবেদনা থেকে মুক্তি দিত!
অবশ্য একবার আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ ঘটেছিল;
সেইতো দুর্বল, যে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না।

তাঁদের ইচ্ছা ছিল, সম্রাট এটা শুনে আত্মসচেতন হয়ে উঠবেন। ঘটলও তাই। সম্রাট এটা শুনামত্র বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমিই সেই দুর্বল ব্যক্তি। এভাবে তাঁরা তাঁর অন্তর্নিহিত বিদ্বেষকে জাগিয়ে তুলল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে বরমেকীদের ধ্বংসকে বাস্তবায়িত করল। আল্লাহ্ আমাদিগকে মানুষের ষড়যন্ত্র ও তাদের দুরবস্থা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

ঐতিহাসিকগণ সম্রাট হারুনের সুরাসক্তি ও অন্তরঙ্গদের সাথে সুরাপানের আসর বসাবার যে অবমাননার কাহিনী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ দুর্মতির কোন জ্ঞানই আমাদের নেই। খেলাফতের উত্তরসূরি, ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতিভূ সম্রাট হারুনের পক্ষে এটা কি করেই বা সম্ভব! তিনি সর্বদা জ্ঞানী-গুণী ও অধ্যাত্মবিদ মনীষীদের সাহচর্যে থাকতেন। ফজি ইবনে আয়াজ,[৫৩] ইবনে সামাক,[৫৪] উমরীর[৫৫] ন্যায় গুণী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করতেন এবং সুফীয়ান সউরীর[৫৬] ন্যায় মনীষীর সাথে তাঁর পত্রালাপ চলত। তাঁদের ধর্মকথা শুনে তিনি ক্রন্দন করতেন এবং হজের সময় কাবা প্রদক্ষিণরত অবস্থায় এ প্রকার দুর্মতি থেকে বেঁচে থাকতে প্রার্থনা করতেন। তাঁর উপাসনার প্রতি নিষ্ঠা ও নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায়ের আগ্রহ, বিশেষ করে ফজরের নামাজ আদায়ে তাঁর দীর্ঘকালীন সময়ানুবর্তিতা এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। তাবারী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে তিনি প্রতিদিন একশ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন এবং এক বছর হজ্জব্রত পালন ও অন্য বছর ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর বয়স্য রহস্যপ্রিয় ইবনে আবি মরিয়মকে কোরান ও নামাজ সম্পর্কে মাত্রাজ্ঞানহীন উক্তির জন্য ভর্ৎসনা করেছিলেন। সম্রাট একদিন নামাজে কোরানের এ আয়াতটি পাঠ করছিলেন—"আমার কি হল যে, আমি তাঁর উপাসনা করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[৫৭] তাঁর পিছনে দণ্ডায়মান ইবনে আবি মরিয়ম এটা শোনা মাত্রই বলে উঠল, "আল্লাহ্‌র কসম, জানি না কেন?" সম্রাট

৫২. এই কাব্যাংশটির রচয়িতা উমর ইবনে আবি রাবিয়া, ইনি ৭০০ খ্রি: পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

৫৩. ১৮৭ (৮০৩ খ্রি:) হিজরিতে মৃত্যু বরণ করেন।

৫৪. মুহম্মদ ইবনে সাবিহ, ১৮৩ (৭৯৯/৮০০ খ্রি:) হিজরিতে মৃত্যু ঘটে।

৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব, ইনি ১৮৪ (৮০০/৮০১ খ্রি:) হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

৫৬. সুফিয়ান নামে দুজন বিখ্যাত ছিলেন, একজন সউরী, অন্যজন ইবনে উয়ায়না, এখানে সম্ভবত শেষের জনের কথা বলা হয়েছে। ইনি ১০৭-১৯৮ (৭২৫/৭২৬-৮১৪ খ্রি:) হিজরি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

৫৭. কোরান; ৩৬, ২২ : ১।

www.amarboi.org

এটা শুনে হাসি সংবরণ করতে পারলেন না সত্য, কিন্তু পর মুহূর্তেই ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "হে ইবনে আবি মরিয়ম, নামাজের মধ্যেও ঠাট্টা করতে আরম্ভ করলে? সাবধান, রঙ্গরস আর যা নিয়েই কর, কোরান ও নামাজ সম্পর্কে তোমার জিহ্বাকে সংযত রেখ।"

তদুপরি সম্রাট হারুন জ্ঞান ও ধর্মচর্চায় বিশিষ্ট সারল্যের অধিকারী ছিলেন। কারণ তাঁর সময় পূর্বসূরি পুণ্যাত্মাদের প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তিনি তাঁর পিতামহ আবু জাফর আল মনসুরের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশি নয়। তিনি হারুনকে বালক অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে ও পরে মনসুরের ধর্ম সম্পর্কীয় জ্ঞান ছিল দৃষ্টান্তমূলক। তিনিই 'মুয়াত্তা'[৫৮] গ্রন্থ সংকলনের জন্য ইমাম মালিককে বলেছিলেন, "হে আবু আব্দুল্লাহ, বর্তমানে পৃথিবীতে আমার ও তোমার ন্যায় জ্ঞানী আর কেউ নেই। আমাকে সাম্রাজ্যের কর্তব্য পালনে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে; সুতরাং মানুষের যাতে উপকারে আসে তেমনই করে তুমি একটি গ্রন্থ সংকলন কর। এতে ইবনে আব্বাসের নম্রতা ও ইবনে উমরের[৫৯] কঠোরতা, উভয়কেই পরিহার করে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মানুষের কাছে এটা উপস্থিত কর।" ইমাম মালিক এ উক্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছিলেন, বস্তুত আবু জাফর এর মার্ধ্যমে তৎকালে আমাকে গ্রন্থ সংকলনের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সম্রাট হারুনের পিতা আল মাহদী তাঁর পিতা আল মনসুরকে বয়তুল মাল থেকে নিজ পরিবারবর্গের জন্য নতুন পোশাকাদির ব্যয় গ্রহণ করতে ইতস্তত করতে দেখেছেন। তিনি একদিন তাঁর পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি পরিবারবর্গের পুরাতন কাপড় জোড়াতালি দিয়ে পরিধানের উপযোগী করবার ব্যাপারে দরজীদের সাথে পরামর্শ করছেন। এতে মাহদী বিরক্তিবোধ করে বললেন, "হে আমীরুল মোমেনীন,[৬০] এ বছর পরিবারের পোশাকিদের দায়িত্ব আমি নিজে গ্রহণ করলাম। আমার প্রাপ্য ভাতা থেকে তার বন্দোবস্ত করব।" মনসুর তাঁর পুত্রকে এ দায়িত্ব পালনে বাধা দেননি। কিন্তু কোন প্রকারেই বয়তুল মাল থেকে অর্থব্যয়ের বিষয়টি সমর্থন করেননি। সম্রাট হারুন এমনই এক পুণ্যাত্মার দৌহিত্র।

এ যদি অবস্থা হয়, তাহলে হারুনের পক্ষে তাঁর পিতা ও পিতামহের নৈকট্য ও ধর্মজ্ঞানের প্রভাব বিসর্জন দিয়ে কী করে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে সুরাসক্তি ও তজ্জন্য প্রকাশ্যে আসর বসানো সম্ভব! অথচ আমরা জানতে পারি যে, প্রাক্-ইসলামী বেদুইন জীবনেও সম্ভ্রান্ত লোকদের সুরাসক্তি দূষণীয় ব্যাপর বলে বিবেচিত হত। অধিকন্তু যে আঙুরের রস চোলাই করে মদ্য প্রস্তুত হয়ে থাকে, তাও তাদের অঞ্চলে জন্মায় না। এ কারণে আরবের অধিকাংশ লোক মদ্যপানকে ঘৃণার চক্ষে দেখত। বস্তুত সম্রাট হারুন ও তাঁর পিতৃপুরুষগণ ধর্মনিষ্ঠায় ও শালীনতায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক

---

৫৮. হাদিসের সংকলন।

৫৯. উভয়ের নামই আব্দুল্লাহ্। প্রথম জনের জন্য ৪৭ নং টীকা দ্র: এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর, হজরত উমরের পুত্র, তিনি ৭৩/৭৪ (৬৯২/৯৩ অথবা ৬৯৩/৯৪ খ্রি:) হিজরিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৬০. হে বিশ্বাসীদের নেতা।

www.amarboi.org

সকল ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা সদজ্ঞান ও সৎস্বভাব অর্জনে বেদুইন জীবনের সারল্যকে অনুসরণ করতেন।

তাবরী ও মাসউদী সম্রাট হারুনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক জিব্রাইল ইবনে বখতেশোর[৬১] সাথে জড়িত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। একদিন সম্রাট হারুনের দস্তরখানে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মাছও পরিবেশিত হয়েছিল। বখতেশো সম্রাটকে তা খেতে বারণ করলেন এবং খানসামাকে উক্ত মাছ তাঁর কক্ষে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। সম্রাটের নিকট চিকিৎসকের এ ব্যবহার কেমন রহস্যজনক মনে হল। তিনি গোপনে তাঁর এক দাসকে এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে আদেশ দিলেন। সে যথাস্থানে গিয়ে দেখতে পেল যে, বখতেশো উক্ত মাছ আহার করছেন।

চিকিৎসক বখতেশোর নিকট ও সম্রাটের এ অনুসন্ধান অজ্ঞাত রইল না। তিনি তাঁর ত্রুটি সংশোধনের জন্য তিন টুকরো মাছ সংগ্রহ করে তার এক টুকরোর সাথে ঔষধযুক্ত মাংস, মসলাযুক্ত সব্জী ও স্নিগ্ধ মিষ্টান্ন মিশ্রিত করলেন। দ্বিতীয় টুকরোটির উপর কিঞ্চিৎ বরফের জল ঢেলে দিলেন এবং তৃতীয়টির সাথে মিশালেন বিশুদ্ধ মদ্য। এভাবে তিন টুকরো মাছ তিনটি পাত্রে স্থাপন করে খানসামাকে বললেন, প্রথম ও দ্বিতীয়টি সম্রাটের জন্য, তাতে মাছের সাথে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকুক বা না থাকুক এবং তৃতীয়টি কেবল মাত্র আমার জন্য। সম্রাট নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে বখতেশোকে ডেকে পাঠালে খানসামা তাঁর সাথে উক্ত মাছের তিনটি পাত্র উপস্থিত করল। তখন দেখা গেল যে, মদ্য মিশ্রিত মাছটি ছিন্নভিন্ন হয়ে তরলাকৃতি ধারণ করেছে এবং অন্য দুটিও বিকৃত হয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এতে বখতেশো এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সম্রাট যে খাদ্য গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করছেন, তা অতি অল্প সময়ে নষ্ট হয়ে যায়।

যাহোক, এ ঘটনা থেকে এ একটি কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মদ্যপান সম্পর্কে সম্রাটের অনাসক্তি তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর ও পরিচারকদের নিকট সুপরিচিত ছিল। এ ঘটনাও তো প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সম্রাট হারুন অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য কবি আবু নাওয়াসকে কারারুদ্ধ করে রাখেন এবং অনুতপ্ত হয়ে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেননি। পাঠকগণ এ সকল ঘটনা বিবেচনা করতে পারেন।

অবশ্য সম্রাট হারুন ইরাকবাসীদের[৬২] মতানুসারে আঙুরের রস পান করতেন। এ বিষয়ে তাঁদের বিধান সর্বজন বিদিত। কিন্তু এ জন্য তাঁর প্রতি মদ্যপানের দোষারোপ করা ঠিক নয় এবং এ উদ্দেশ্যে মিথ্যা কাহিনী বর্ণনাও অনুচিত। কারণ যে মদ্যপান সকলের নিকট মহাপাপ বলে বিবেচিত হয়, সম্রাট হারুনের ন্যায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কী করে সেই মহাপাপের অনুষ্ঠান করতে পারেন! বস্তুত তাঁর বংশাবলি তথা জাতির সকলেই বেদুইন জীবনের সারল্য ও ধর্মনিষ্ঠার ফলে তাঁদের আহার-বিহার ও ভূষণ-ব্যসনে অমিতাচার ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রাচুর্য লাভের পরও

---

৬১. জিব্রাইল, অত্র রাজত্বের প্রাথমিক বিখ্যাত চিকিৎসকদের অন্যতম। মৃত্যু ২১৩ (৮২৮/২৯ খ্রি:) হিজরি।

৬২. ইমাম আবু হানিফার মতে আঙ্গুরের রস অর্থাৎ 'নাবিজ' পান করায় কোন দোষ নেই। তিনি ইরাকবাসী ছিলেন।

www.amarboi.org

এর পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং তাঁদের পক্ষে শালীনতা থেকে অশালীনতা ও সিদ্ধ থেকে নিষিদ্ধের প্রতি আগ্রহী হওয়ার বিষয়টি সর্বদাই বিবেচনাযোগ্য।

তাবারী, মাসউদী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, উমাইয়া ও আব্বাসী যুগের প্রাথমিক সম্রাটদের সকলেই তাঁদের অশ্বারোহণের সময় সামান্য পরিমাণ রৌপ্যখচিত কোমরবন্দ, তরবারী, লাগাম ও জিনপোষ ব্যবহার করতেন। সম্রাট হারুনের পরবর্তী অষ্টম আব্বাসী সম্রাট মুতাজ ইবনে মুতাওয়াক্কিল সর্বপ্রথম আসবাবপত্রে স্বর্ণ ব্যবহারের প্রবর্তন করেন। বস্তুত যুগের ধারা অনুসারে তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদেও সেই সারল্য বিদ্যমান ছিল। এমতাবস্থায় আপনি নিজেই অনুমান করতে পারেন তাঁদের আহার্য-পানীয়ের অবস্থা কী ছিল! আপনি যদি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাথমিক সারল্য ও বেদুইন চরিত্রের কথা স্মরণ রাখেন, তাহলে উপরোক্ত আলোচনা থেকে সমগ্র বিষয়টিই আপনার নিকট পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের প্রথম গ্রন্থে আরও আলোচনা করব। আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করুন।

আকসামের মদ্যপান

ঐতিহাসিকগণের প্রায় সকলেই সম্রাট মামুনের কাজী ও সহচর ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম[৬৩] সম্পর্কে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তাও উপরোক্ত কাহিনীগুলোর মতই বা প্রায় ভিত্তিহীন। তাঁরা বলেছেন যে, কাজী আকসামের মদ্যপানের প্রতি এতদূর আসক্তি ছিল যে, এক রাতে তিনি অতিরিক্ত মদ্যপানে অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে চৈতন্য লাভের জন্য সুবাসিত পানীয় জলের পাত্রে ডুবিয়ে রাখা হয়। চৈতন্যপ্রাপ্তির পর কাজী আকসাম নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন :

হে আমার নেতা! হে সমগ্র মানব জাতির কর্ণধার!
যে আমাকে পানীয় দিয়েছিল, সে অবশ্যই তাঁর বিচারে অন্যায় করেছে
আমি পরিবেশনকারীর প্রতি অমনোযোগী ছিলাম বলেই
সে আমাকে ধর্ম ও বিবেকশূন্য করে ফেলেছে।

এ ব্যাপারে মামুন ও কাজী আকসামের বিষয়টি সম্রাট হারুনের অনুরূপ। তাঁরা সকলেই আঙুরের রস পান করতেন এবং তা তাঁদের বিচারে নিষিদ্ধ ছিল না। তাঁরা মদ্যপানে অচেতন হয়ে পড়তেন বলে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। সম্রাট মামুন ও কাজী আকসামের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ছিল, তা একান্তই ধর্মীয় সম্পর্ক। এমন কি জানা যায়, তাঁরা একই কক্ষে রাত্রিতে শয়ন করতেন। সম্রাট মামুনের সদগুণ ও অমায়িক ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি একরাত্রে তৃষ্ণার্ত হয়ে জেগে উঠেন এবং পাছে বন্ধু আকসামের ঘুম ভেঙে যায়, এজন্য অতি সন্তর্পণে পানির কুঁজা অন্বেষণ করে ফিরেন। তাঁরা উভয়ে এক সঙ্গে জামাতে ফজরের নামাজ আদায় করতেন। এর সঙ্গে মদ্যপানের বিষয়টির সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৬৩. মৃত্যুকাল ২৪২/২৪৩ (৮৪৬ খ্রি:) হিজরি।

www.amarboi.org

অন্যদিকে কাজী আকসাম ছিলেন একজন বিশিষ্ট হাদিস শাস্ত্রবিদ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল[৬৪] ও কাজী ইসমাইল[৬৫] উভয়েই তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিরমিজী[৬৬] তাঁর সূত্রে স্বীয় সংকলনে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিস বিশারদ আল মুজনী[৬৭] বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম বুখারী[৬৮] তাঁর বিখ্যাত সহি সংকলনের বাইরে অন্যত্র কাজী আকসামের নিকট থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ উপরোক্ত সকলের প্রতি মিথ্যা দোষারোপের সমতুল্য।

অনুরূপভাবে অবিবেচক লোকেরা বালকদের প্রতি কাজী আকসামের আসক্তির দুর্নাম রটিয়েছে। এটা করতে গিয়ে তারা আল্লাহ্‌র উপর দোষারোপ ও ধর্মীয় জ্ঞানীদের উপর মিথ্যা অপবাদ দানের ন্যায় গর্হিত অন্যায় করেছে। তারা কাজী আকসামের শত্রুদের নিকট থেকে এ সকল মিথ্যা কাহিনী সংগ্রহ করেছে। কারণ সম্রাটের বন্ধুত্ব ও স্বীয় গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁকে অনেকেই হিংসা করত। অথচ তাঁর শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বিশিষ্টতা স্বীকার করে নিয়ে এ প্রকার মিথ্যা অপবাদের কোন অবকাশ থাকে না।

কাজী আকসামের প্রতি এরূপ মিথ্যা অপবাদের কথা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট বর্ণিত হলে তিনি বলেছেন, "সোবহানাল্লাহ্, সোবহানাল্লাহ্।[৬৯] কে এ কথা বলে?" তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এটা অস্বীকার করেন। কাজী ইসমাইল কাজী আকসামের প্রশংসা করায় তাঁকে উক্ত অপবাদের কথা জানান হল এবং এর উত্তরে বললেন, "আল্লাহ্ রক্ষা করুন, কোন বিদ্রোহী বা বিদ্বেষীর কথায় কি তাঁর ন্যায় ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা ধূলিস্মাৎ হতে পারে!" তিনি আরও বললেন, "তাঁর নামে বালকদের প্রতি আসক্তির যে অপবাদ দেয়া হয়ে থাকে, তা হতে, আল্লাহ্ জানেন, ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম সম্পূর্ণ পবিত্র। আমি তাঁর অন্তরঙ্গ সংবাদ অবগত আছি। আমি তাঁকে অত্যন্ত খোদাভীরু বলেই জানি। কিন্তু তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও হাসিখুশি ভাবের জন্যই লোকে এ প্রকার দোষারোপ করতে সাহসী হয়েছে।" ইবনে হিব্বান[৭০] তাঁকে বিশ্বস্তদের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে কাজী আকসামের উপর আরোপিত এ সকল অপবাদের দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন নেই। কারণ এর কোনটিই যুক্তি বিচারে প্রমাণিত হয়নি।

মামুনের প্রেম

এ ধরনের ভিত্তিহীন কাহিনীর মধ্যে অন্য একটি হল 'ইকদ' রচয়িতা[৭১] ইবনে আবদে রাব্বিহির বর্ণিত 'ঝোলার' কাহিনী। সম্রাট মামুনের সাথে হাসান ইবনে সহলের কন্যা

---

৬৪. আহমদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে হাম্বল, হাম্বলী মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা। জীবনকাল ১৬৪-২৪১ (৭৮০-৮৫৫ খ্রি:) হিজরি।
৬৫. ইসমাইল ইবনে ইসহাক, মালেকী মজহাবের কাজী ছিলেন।
৬৬. মুহম্মদ ইবনে ইসা; মৃত্যু (৮৯২ খ্রি:) হিজরি।
৬৭. রোজেনথাল তাঁর অনুবাদে 'মিজাই' বলেছেন। ইনি ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান, জীবনকাল ৬৫৪-৭৪২ (১২৫৬-১৩৪১ খ্রি:) হিজরি।
৬৮. সর্বাগ্রগণ্য হাদিসশাস্ত্রবিদ, সহি বোখারীর সংকলন মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল; জীবনকাল ১৯৪-২৫৬ (৮১৩-৮৭০ খ্রি:) হিজরি।
৬৯. আল্লাহ্ পবিত্র, আল্লাহ্ পবিত্র; বিস্ময় প্রকাশের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়।
৭০. জীবনকাল ২৭৪-৩৫৪ (৮৮৭—৮৮/৯৬৫ খ্রি:) হিজরি।
৭১. গ্রন্থটির নাম 'ইকদুল্ ফরিদ'—৫০ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

'বোরান'-এর বিবাহের কারণ প্রসঙ্গে উক্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বলা হয় যে, এক রাতে মামুন তাঁর অনুগামীসহ বাগদাদের পথে পথে বিচরণ করেছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টিতে পড়ল, কোন অট্টালিকার গবাক্ষ পথ থেকে রেশম রজ্জুতে আবদ্ধ চরকিসহ একটি ঝোলা দুলছে। তিনি কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে তাতে উঠে বসলেন এবং রজ্জু আকর্ষণ করতেই তা চলতে আরম্ভ করল। ক্রমে এ ঝোলা তাঁকে একটি সভাকক্ষে নিয়ে গেল। অতঃপর আবদে রব্বিহি উক্ত কক্ষের দৃষ্টি বিমোহন ও মনোমুগ্ধ শয্যার সৌন্দর্য, স্থাপত্যের সৌন্দর্য ও দৃশ্যাবলির সৌসাদৃশ্যের বর্ণনা করেছেন। হঠাৎ সেই সভাকক্ষে সম্রাট মামুনের সম্মুখে পর্দার অন্তরাল থেকে অতুলনীয় সুষমা ও মহিমার রানী এক রূপসী এসে উপস্থিত হল। সে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে তার সাহচর্যে অবস্থানের জন্য আহ্বান করল। সম্রাট তার সাথে প্রভাতকাল পর্যন্ত মদ্যপান করে কাটালেন। অতঃপর প্রভাতে তিনি বাইরে অপেক্ষমান অনুগামীদের নিকট ফিরে আসলেন। উক্ত রূপসীর সাহচর্য তাকে এতদূর মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি তাঁর পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাতে বাধ্য হলেন।

অথচ ধর্মশিক্ষা ও জ্ঞানান্বেষা সম্পর্কে সম্রাট মামুনের যে পরিচিতি বিদ্যমান, তার সাথে এ সকল ঘটনার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের নিকট থেকে 'খুলাফায়ে রাশেদীনে'[৭২] রীতি-নীতি এবং জাতির আদর্শস্থল উক্ত চার খলিফার চরিত্র অনুসরণের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জ্ঞানীদের সাথে তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন এবং নামাজ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-নিষেধকে যথাযথভাবে মেনে চলতেন। সুতরাং তাঁর চরিত্রে রাত্রির অভিসারযাত্রা, যত্র-তত্র ভ্রমণের স্বেচ্ছাচারিতা, গল্প-কাহিনীর নায়কসুলভ আচরণ ও বেদুইন প্রেমের লীলা-বিলাস কী করে সম্ভব হতে পারে! কিংবা এটা হাসান ইবনে সহলের কন্যা সম্পর্কেও কী করে বিবেচনা করা যায়। তাঁর পিতৃগৃহের কৌলিন্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবেশের মধ্যে এ প্রকার শিথিল আচরণের কথা কল্পনাও করা যায় না।

ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাবলিতে অনুরূপ মুখরোচক কাহিনী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এ সকল কাহিনী রচনা ও বর্ণনায় তাঁদেরকে নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি সাধারণ আকর্ষণ ও অহেতুক অপরের ছিদ্রান্বেষণই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ, তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অনুরূপ লীলা-বিলাসকে অতীতের ঘটনাবলির আলোকে যাচাই করে নেয় এবং এ কারণেই, পাঠক হয়ত লক্ষ করে থাকবেন, তারা সমতুল্য ঘটনার অনুসন্ধানে গ্রন্থাবলি পৃষ্ঠা হাতড়িয়ে ফিরে। অথচ তারা যদি এর পরিবর্তে পূর্বসূরিদের অন্যবিধ অবস্থা, তাঁদের চরিত্রের পরিপূর্ণতা ও দৃঢ়তার সুখ্যাতিকে অনুসরণ করতে পারত, তাহলে তা তাদের জন্য কতই না ভল হত।[৭৩] হায়, তারা যদি এটা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারত।[৭৪]

---

৭২. বিশ্বস্ত প্রতিনিধিবৃন্দ; হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এর পরবর্তী চার খলিফাকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

৭৩. কোরান ৩, ১১০; ৪, ৪৬, ৬৬; ৪৭, ২১; ৪৯, ৫।

৭৪. কোরান ২, ১০২, ১০৩; ১৬, ৪১; ২৯, ৪১, ৬৪; ৬৮, ৩৩।

www.amarboi.org

আমি একদা সম্রাট তনয় কোন অমাত্যকে সঙ্গীত ও বাদ্যের প্রতি তাঁর অতিরিক্ত আসক্তির জন্য তিরস্কার করে বলেছিলাম, তোমার পদমর্যাদা ও সুখ্যাতির জন্য এটা ক্ষতিকর। এর উত্তরে সে বলল, আপনি কি ইব্রাহীম ইবনে আল মাহ্দীর[৭৫] কথা জানেন না। তিনি তো এ শিল্পে নেতৃস্থানীয় এবং সমসাময়িক সঙ্গীতজ্ঞদের শিরোমণি ছিলেন। আমি তাকে বললাম, সোবহানাল্লাহ্! হায়, তুমি যদি তাঁর পিতা বা ভ্রাতার আদর্শ অনুসরণ করতে কিংবা উক্ত গুণের ফলে ইব্রাহীম পিতৃপুরুষের পদমর্যাদা থেকে কত দূরে পতিত হয়েছেন, তা যদি বিচার করে দেখতে! আমার এরূপ ভর্ৎসনার জন্য সে আর কোন কথা বলল না এবং মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।[৭৬]

উবায়দী বংশধারা

কায়রোয়ান ও কায়রোর উবায়দী বংশীয় শিয়া সম্রাটদের সম্পর্কেও অনুরূপ ভিত্তিহীন কাহিনী অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা একদিকে যেমন তাঁদেরকে নবী বংশের অন্তর্গত বলে স্বীকার করেননি, তেমনই তাঁদের সাথে ইমাম ইসমাইল ইবনে জাফর সাদেক-এর রক্ত সম্পর্ক নিয়েও নানা প্রকার কুকথা বলেছেন। তাঁরা এ সকল বর্ণনা তাঁদের গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশ করতে গিয়ে দুর্বল আব্বাসী সম্রাটের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে রচিত এবং শত্রুদের নিমিত্ত কথিত সর্বপ্রকার অপবাদ ও মিথ্যা দোষারোপের উপর নির্ভর করেছেন। যাহোক, আমার উবায়দী সম্রাটদের বিবরণদানের সময় বর্তমান গ্রন্থের অনুরূপ কিছু কাহিনী উদ্ধৃত করব। বস্তুত ঐতিহাসিকগণ এ সকল বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে ঘটনাবলির সাক্ষ্য ও বাস্তব অবস্থার প্রমাণ বিবেচনায় উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন। নতুবা তাঁরা অবশ্যই বুঝতে পারতেন যে, তাঁদের দাবি সর্বৈব মিথ্যা এবং কোন অবস্থাতেই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

তাঁরা সকলেই শিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রারম্ভ সম্পর্কে একই ধরনের বিবরণ প্রদান করেছেন। যখন আবু আব্দুল্লাহ্ আল মুহতাসিব[৭৭] কুতামাদিগকে নবী বংশীয়দের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বললেন, এ সংবাদ প্রচারিত হল এবং উবায়দুল্লাহ্ আল মেহেদী ও তৎপুত্র আবুল কাশেমের প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা সকলেই জানতে পারল, তখন শেষোক্ত দুজন প্রাণভরে আব্বাসী সাম্রাজ্যের অধীন পূর্বাঞ্চল থেকে পলায়ন করলেন। তারা বণিকের ছদ্মবেশে মিশর হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ছাড়িয়ে গেলেন। তাঁদের পলায়নের খবর যথারীতি মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার তৎকালীন শাসনকর্তা ইসা আন্ নওশেরীর নিকট প্রেরণ করা হল। তিনি তৎক্ষণাৎ একদল অশ্বারোহীকে তাঁদের অনুসন্ধান করতে

৭৫. সম্রাট আল মাহ্দীর পুত্র। জীবনকাল ১৬২-২২৪ (৭৭৯-৮৩৯ খ্রি:) হিজরি। সামান্য সময়ের জন্য কোন কোন গোত্র তাঁকে সম্রাট হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

৭৬. আল্লাহ্ ... এই বাক্যটির অনুবাদ রোজেনথালে নেই।

৭৭. এর সাহায্যেই ফাতেমী বংশীয়রা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করে। ইনি বসরায় মুহাতাস্বি (ক'তায়অল) হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

www.amarboi.org

পাঠালেন। কিন্তু অনুসরণকারীগণ ছদ্মবেশের দরুন তাঁদের সাক্ষাৎ পেয়েও চিনতে পারল না। সুতরাং তাঁরা অতি সহজেই মাগরিবে পলায়ন করতে পারলেন।

কিন্তু আব্বাসী সম্রাট আল মুতাজিদ[৭৮] ইতিমধ্যে আফ্রিকিয়ার কায়রোয়ানের শাসক 'আগালেবা' এবং সিজিলামাসার শাসক 'বনি মেদরার'কে উক্ত পলাতকদের অনুসন্ধান করতে ও তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে আদেশ করেছিলেন। এর ফলে সিজিলামাসার শাসক বনি মেদরারের—'আল ইসায়া' নিজ শহরে তাঁদেরকে খুঁজে বের করলেন এবং আব্বাসী সম্রাটের সন্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য বন্দী করে রাখলেন। এ ঘটনা কায়রোয়ানস্থ আগালেবাদের মধ্যে শিয়া মতবাদ প্রসারের পূর্বে ঘটেছিল। অতঃপর তাঁদের শিয়া মতবাদের আহ্বান মাগরিব ও আফ্রিকিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করল এবং ক্রমশ তা ইয়ামেন, আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর, সিরিয়া ও হেজাজে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এর ফলে তাঁরা আব্বাসীদের অধিকৃত মুসলিম সাম্রাজ্যকে সরাসরি দুভাগে ভাগ করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সর্বত্র তাঁদের অধিকার ও প্রভাবকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে এনেছিলেন। এমন কি দায়লমস্থ তাঁদের অনুগামী আমীর আল-বুসাসিরির সহায়তায় বাগদাদ ও ইরাকে শিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। উক্ত আমীর অনারব সামন্তবর্গের[৭৯] সাথে তার বিধানের সূত্র ধরে আব্বাসীদের উপর অধিকার বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর ফলে বাগদাদের মসজিদগুলোতে এক বছরকাল খোতবা পাঠে শিয়া সম্রাটদের নাম উল্লেখিত হয়।

এ সকল ঘটনার মধ্যদিয়ে বিস্তৃত শিয়া প্রভাব আব্বাসীদেরকে সর্বদা উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল এবং সাগরপারের স্পেন থেকে উমাইয়া সম্রাটগণ শিয়াদের কার্যকলাপে উৎকণ্ঠিত ও তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। এ সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে নবীবংশের সাথে তাঁদের রক্তসম্পর্কের দাবি মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয়। তদুপরি উবায়দীদের দাবি কারামতীদের[৮০] দাবির সাথে মিলিয়ে দেখলেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে পড়ে। বস্তুত কারামতীদের দাবি ছিল মিথ্যা। এ কারণে অতি অল্পদিনেই তাদের চক্রান্তজাল ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাঁদের অনুসারীগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে অশুভ পরিণামের দিকে ঠেলে দেয়। তারা যথার্থই তাদের অপকর্মের ফল ভোগ করতে বাধ্য হয়। যদি উবায়দীদের অবস্থাও তাদের অনুরূপ হত তাহলে কিছুটা দেরিতে হলেও তা প্রকাশ হয়ে পড়ত। কবি বলেছেন—[৮১]

'লোকের স্বভাব থাকুক যতই সংগোপনে।
পড়বে ধরা লোকের চোখে লোকের মনে॥'

---

৭৮. যতদূর সম্ভব তাঁর উত্তরাধিকারী আল মুকতাফির সময়ে এই ঘটনা ঘটে—সময় ২৯৩ (৯৩৫/৬ খ্রি:) হিজরি।

৭৯. সলজুক সম্রাট তুগরিল বেগের সময় ১০৫৮-১০৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই বিরোধ দেখা দেয়।

৮০. এরা খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দির শেষার্ধে শিয়া মতবাদের আশ্রয়ে ও বাবেকের নেতৃত্বে আর্মেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চল হতে বের হয়ে সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করত। ৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসী সম্রাট আল মুতসিমের তুর্কি সেনাপতির হাতে বাবেক নিহত এবং ৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে আল মুতাজাদের হাতে এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৮১. ছত্র দুটির রচয়িতা জুহায়ের ইবনে আবি সলমা—প্রাচীন আরবি কবি।

www.amarboi.org

অন্যদিকে তাঁদের সাম্রাজ্যকাল দুইশত সত্তর বছর পর্যায়ক্রমে স্থায়ী হয়েছিল এবং তাঁরা হজরত ইব্রাহিমের দাঁড়াবার ও প্রার্থনা করবার স্থান, হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জন্মভূমি ও সমাধি হজ্জব্রত পালনকারীদের অপেক্ষা করার স্থান ও স্বর্গীয় দূতদের অবতরণস্থল প্রভৃতির ন্যায় পবিত্র স্থানগুলো[৮২] দীর্ঘদিন তাঁদের অধিকারে রেখেছিলেন। অতঃপর তাঁদের আধিপত্যের কাল শেষ হল। অথচ এ সময়ে তাঁদের অনুসারীগণ তাঁদের প্রতি যথার্থ ভক্তি ও ভালবাসা! প্রদর্শন করেছে এবং ইমাম ইসমাইল ইবনে জাফর সাদিকের সাথে তাঁদের রক্ত সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস পোষণ করেছে। এ কারণে উবায়দী সাম্রাজ্যের পতন ও তার প্রতিপত্তি নিশ্চিহ্ন হবার পরও এ সকল অনুসারীরা একাধিকবার তাঁদের বিশেষ মতবাদ প্রচার করতে এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততির নামে মানুষের আনুগত্য লাভ করতে উদ্যোগী হয়েছে। তারা উবায়দী বংশীয়দিগকেই একমাত্র খেলাফতের যোগ্য বিবেচনা এবং বংশানুক্রমে পূর্ববর্তী ইমামদের নিকট থেকে এ উত্তরাধিকার লাভের কথা গভীরভাবে বিশ্বাস করেছে। তারা যদি তাঁদের বংশধারা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত, তাহলে তাঁদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে এমনভাবে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিত না। কারণ কোন সাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও নিজের কর্তব্য সম্পর্কে দ্বিধা পোষণ করে না, তার সাম্প্রদায়িক চেতনাতেও ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না এবং নিজের বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার মত কোন কাজও সে করতে পারে না।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এ যে, কাজী আবু বকর আল বাকিল্লানীর[৮৩] ন্যায় ইলমে কালামবিদ ও তর্কচূড়ামণি ব্যক্তি ও উবায়দীদের বংশধারা সম্পর্কীয় এ বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছেন এবং বিরোধী বক্তব্যকে অত্যন্ত দুর্বল বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ সমর্থন যদি এ কারণে হয়ে থাকে যে, তিনি শিয়া মতবাদের অনুসারী হয়ে উবায়দীদের ন্যায় ধর্মের সনাতন পথ পরিত্যাগ করেছিলেন, তাহলেও তাঁর মতবাদ উবায়দীদের উত্থান সম্পর্কিত প্রচারণা এবং বংশধারা সম্পর্কিত দাবির বিরোধী হতে পারে না। কারণ তাঁরা নিজেরা বিপথগামী হতে পারেন কিন্তু তজ্জন্য আল্লাহ্র নিকট তাঁদের রক্ত সম্পর্ক মিথ্যা হবে কি করে!

এ কারণে আল্লাহ্ হজরত নুহকে পুত্রের সম্পর্কে বলেছেন, হে নুহ, সে তোমার পরিবারের কেউ নয়; যথার্থই এটা একটি অপকর্ম। সুতরাং তুমি এমন কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করো না যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই।[৮৪] হজরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর কন্যা ফাতেমাকে বলেছিলেন, হে ফাতেমা, সৎকাজ কর আল্লাহ্র নিকট আমি তোমার কোন উপকারে আসব না। বস্তুত যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয় জানতে পারে ও তার সত্যতা সম্পর্কে তার বিশ্বাস জন্মায়, তখন তার তা প্রকাশ করে বলা উচিত। আল্লাহ্ই সত্য কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন।

---

৮২. অর্থাৎ মক্কা ও মদিনা।

৮৩. মুহম্মদ ইবনে অত্ তৈয়ব, মৃত্যুকাল ৪০৩ (১০১৩ খ্রি:) হিজরি। ইবনে খলদুনের মতে মালিকী মজহাবের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভা।

৮৪. কোরান, ১১, ৪৬। ৮৫ কোরান, ৩৩, ৪।

www.amarboi.org

উবায়দীগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির সন্দেহে তাড়িত হয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শিয়া মতবাদের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে তাঁদের সমগোত্রীয়দের বিদ্রোহমূলক অত্যাচার তাঁরা সহ্য করেছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁরা দূর-দূরান্তে তাঁদের আহ্বান জানাতে চেষ্টা করেছেন। এবং বারবার বিদ্রোহের সূত্রপাত করেছেন। এ কারণে তাঁরা সর্বদা আত্মগোপন ও ছদ্মবেশে অবস্থান করতেন এবং এর ফলেই তাঁদের পরিচয় অদ্যাবধি রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। কবি বলেছেন :

কালের কাছে জিগাও যদি বলবে না সে আমার নাম,
বলবে না সে কোথায় ছিল, কোথায় আছে, আমার ধাম।[৮৬]

এজন্যই উবায়দুল্লাহ্ আল মেহেদীর পিতামহ ও ইমাম ইসমাইলের পুত্র মুহম্মদকে গুপ্ত ইমাম বলা হয়ে থাকে। তাঁকে এ উপাধি তাঁর অনুসারীরাই দান করেছে। কারণ তাদের ধারণা, শক্তিশালী শত্রুদের ভয়ে তিনি আত্মগোপন করেছেন। আব্বাসীদের অনুসারীরা ফতেমা বংশীয়দের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার সময় এ বিষয়টিকে কাজে লাগিয়েছে। বস্তুত উবায়দীদের বংশধারায় কলঙ্ক আরোপ করে তারা দুর্বল আব্বাসী সম্রাটদিগকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে। এটা তাঁদের অনুসারী ও অমাত্যবর্গে নিকট খুবই উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে। বিশেষ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সেনাপতিরা এর মধ্যে তাঁদের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকবার এবং সম্রাটকে রক্ষা করবার উপকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন। তথাপি উবায়দীদের অনুসারী বারবার-কুতামা সৈনিকদের হস্ত থেকে তাঁরা সিরিয়া, মিশর ও হেজাজ রক্ষা করতে পারলেন না। অতঃপর বাগদাদের কাজীরা ফতোয়া জারী করে তাঁদের বংশধারায় কলঙ্ক আরোপ করলেন। শহরের গণ্যমান্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা সকলেই এতে যোগ দিলেন। তাঁদের মধ্যে আশ্ শরীফ আল্ রাজী[৮৭] ও তাঁর ভ্রাতা আল মুরতাজা[৮৮] ইবনুল বতহাবী[৮৯] এবং ধর্মশাস্ত্রবিদদের মধ্যে আবু হামেদ আল-আইসফারায়নী[৯০] , আল কুদুরী[৯১], আস-সইমারী[৯২], ইবনুল আকফানী[৯৩], আল আবী ওয়ারদী[৯৪] ও শিয়া শাস্ত্রবিদ আবু আব্দুল্লাহ্ ইবনে নুমান[৯৫] প্রমুখ বিখ্যাত জ্ঞানীরা ছিলেন। তাঁরা আব্বাসী সম্রাট আল কাদিরের শাসন আমলে ৪৬০ (১০৬৮ খ্রি:) হিজরির[৯৬] এক উৎসব মুখর[৯৭] দিনে বাগদাদের জনসমক্ষে এ ঘোষণা প্রকাশ করেন। এর ভিত্তি ছিল বাগদাদের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ও প্রসারিত জনশ্রুতি। আবার

৮৬. সূত্র দুটি কবি আবু নাওয়াসের (২৪ পৃষ্ঠা দ্র:)।
৮৭. মুহম্মদ ইবনে আল হোসাইন, জীবনকাল ৩৫৯-৪০৬ (৯৬৯/৭০-১০১৫ খ্রি:) হি:।
৮৮. আলী ইবনে আল হোসাইন, জীবনকাল ৩৫৫-৪৩৬ (৯৬৬-১০৪৪/৪৫ খ্রি:) হি:।
৮৯. ইবনে আসিরের মতে তিনি শিয়া সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিদ ছিলেন।
৯০. আহমদ ইবনে মুহম্মদ, জীবনকাল ৩৪৫-৪০৬ (৯৫৬/৫৭-১০১৬ খ্রি:) হি:।
৯১. আহমদ ইবনে মুহম্মদ, জীবনকাল ৩৬২-৪২৮ (৯৭২/৭৩-১০৩৭ খ্রি:) হি:।
৯২. আবু আব্দুল্লাহ্ আল হোসাইন ইবনে আলী, জীবনকাল ৩৫১-৪৩৬ (৯৬২/৬৩-১০৪৫ খ্রি:) হি:।
৯৩. আবু মুহম্মদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহম্মদ, জীবনকাল ৩১৬/২০-৪০৫ (৯২৮/৩২-১০৪৫ খ্রি:) হি:।
৯৪. আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহম্মদ, মৃত্যু ৪২৫ (১০৩৪ খ্রি:) হি:।
৯৫. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে আল মুয়াল্লিম, ৪১৩ (১০২২ খ্রি:) হি:।
৯৬. রোজেনথালের অনুবাদে ৪০২ (১০১১ খ্রি:) হি: উল্লেখিত হয়েছে।
৯৭. মূলে আছে 'ইয়াওমুম্ মাশগুদ'; রোজেনথাল এর অনুবাদ করেছেন 'স্মরণীয় দিবস'।

www.amarboi.org

এ সাধারণদের অধিকাংশই ছিল আব্বাসীদের অনুগত এবং উবায়দীদের বংশধারায় কলঙ্ক আরোপকারী। ঐতিহাসিকগণ যেমন শুনেছেন ও স্মরণ রেখেছেন, সেরূপ বর্ণনা করে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনকি আব্বাসী সম্রাট আল মুতাজিদ উবায়দুল্লাহ্ সম্পর্কে কায়রোয়ানের বনি আগলাব ও সিজিলামাসার বনি মেদরারের নিকট যে পত্র লিখেছিলেন, তাতেও উবায়দী বংশধারার সত্যতার যোগ্য ও মনোজ্ঞ প্রমাণ বিদ্যমান। বস্তুত আল মুতাজিদ নবী বংশের ধারা সম্পর্কে অন্য যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর অবহিত।

রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য এ পৃথিবীর এক বিরাট পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র। এখানে জ্ঞানীদের জ্ঞান ও শিল্পীদের শিল্পকর্ম এসে উপনীত হয়। এখানে লুপ্ত ঐতিহ্য ও গুপ্ত মনীষার অনুসন্ধান করা হয়। এখানে এসে গল্প ও ইতিহাস তাদের বাহন থামায়। সুতরাং এখানে যে বস্তুর চাহিদা বিদ্যমান, তার চাহিদা সর্বত্র। রাষ্ট্র যদি এ ব্যাপারে সর্বপ্রকার অন্যায়, কুসংস্কার, দুর্বলতা ও কপটতা পরিহার করে সৎপ্রথা ও সাবলীল পন্থা অবলম্বন করে, তাহলে তার বিক্রয় কেন্দ্রে বিশুদ্ধ স্বর্ণ-রৌপ্যের চাহিদাই বড় হয়ে উঠে। কিন্তু যখন এটা স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষের দ্বারা পরিচালিত এবং অত্যাচার ও অন্যায়ের কবলে নিপতিত হয় তখন সেখানে নিকৃষ্ট ও অবিশুদ্ধ মুদ্রারই জয়-জয়কার। বিচক্ষণ ব্যক্তির তখনই পরীক্ষার সময়; তিনি একে দেখেন, তাকে পরখ করেন; অতঃপর তাদের মধ্য থেকে নিজের বিবেচনা মত একটিকে সংগ্রহ করেন।

ইদরিসী বংশধারা

উপরোক্ত কাহিনীর অনুরূপ কিংবা এটা থেকেও জঘন্যতর কাহিনী হল ইদরিস ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালেবের (আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) জন্ম সম্পর্কে কুৎসা রটনাকারীরা যা কানে কানে বলে থাকে। এ ইদরিস তাঁর পিতার পরবর্তীকালে মরক্কোর[৯৮] ইমাম নির্বাচিত হন। শত্রুরা বিদ্বেষবশত অনুমান করে যে প্রথম ইদরিসের মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রীর গর্ভাবস্থা তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়নি বরং এটা তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস রশীদের। সুতরাং দ্বিতীয় ইদরিস রশীদের ঔরসজাত সন্তান। আল্লাহ্ এ প্রকার কুৎসা রটনাকারীদেরকে সর্বদা হেয় করুন এবং তাঁদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিন। এদের মূর্খতা কী অদ্ভুত। এরা কি জানে না যে প্রথম ইদরিস বারবারদের মধ্যে বিবাহ করেছিলেন। তিনি মাগরিবে পদার্পণ করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বারবার বেদুইনদের মধ্যে জীবন কাটিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে বেদুইন জীবনে কোন গোপনীয়তার স্থান নেই। কারণ তাদের পরিবেশে এমন কোন গুপ্ত স্থান নেই, যেখানে অনুরূপ গর্হিত কাজ সম্পন্ন হতে পারে। তাদের সকল অবস্থাই প্রতিবেশীগণ দেখতে পারে এবং প্রতিবেশীগণ জানতে পারে। কারণ তাদের গৃহের প্রাচীর পরস্পর সংলগ্ন এবং একই ছাদের নিচে কোন প্রকার দূরত্ব ব্যতীতই তারা বসবাস করে। রশীদ তাঁর মালিকের মৃত্যুর পরে তদীয় পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেছিল এবং তার

৯৮. মূলে আছে 'মাগরিবে আকসা'—সুদূর মাগরিব; রোজেনথালও এর অনুবাদ মরক্কো লিখেছেন।

www.amarboi.org

মালিকের বন্ধু-বান্ধবদের ও অনুসারীদের দৃষ্টির সম্মুখেই সে তার দায়িত্ব পালন করেছিল। প্রথম ইদরিসের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় ইদরিসের নেতৃত্বের প্রতি মরক্কোর সমুদয় বারবার গোত্রই বশ্যতা স্বীকার করে। তাদের এ বশ্যতা স্বীকার ছিল সম্পূর্ণ অকুণ্ঠ ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তারা রক্তাক্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁর প্রাণ রক্ষার্থে মৃত্যুর সাগর অতিক্রম করতে প্রস্তুত ছিল। যদি তাদের আত্মা ঘুণাক্ষরে অনুরূপ সন্দেহের কথা জানতে পারত, যদি কোন প্রতিশোধকামী শত্রু ও সন্দেহ পোষণকারী কপটের নিকট থেকেও অনুরূপ কিছু তাদের কর্ণে প্রবেশ করত, তাহলে তারা সকলে না হোক, কিছু সংখ্যক লোক হলেও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, তা হয়নি। সুতরাং একমাত্র বনি আব্বাসের যুদ্ধবাজ সেনানী এবং বনি আগলাবের মধ্যকার তাঁদের কর্মচারীদের মুখ থেকেই এ কুৎসা জন্মলাভ করেছে। বনি আগলাব তৎকালে আব্বাসীদের পক্ষ থেকে আফ্রিকিয়া শাসন করছিল।

ঘটনাটি ছিল এ যে, যখন প্রথম ইদরিস বলখের[৯৯] যুদ্ধের পর মাগরিবের দিকে পলায়ন করলেন, তখন আল হাদি বনি আগলাবকে তাঁর অনুসন্ধান করতে ও তাঁর প্রতি লক্ষ রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সতর্কতা কোন কাজে লাগেনি। ইদরিস মাগরিবে পৌঁছতে সক্ষম হলেন। সেখানে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ হল এবং তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এর ফলে সম্রাট হারুনুর রশীদ আলেকজান্দ্রিয়ায় নিযুক্ত তাঁদের দ্বারা মুক্ত ক্রীতদাস ও কর্মচারী ওয়াজিহকে[১০০] দোষী সাব্যস্ত করলেন। তাঁর প্রতি শিয়া মতবাদ গ্রহণ ও মাগরিবে পলায়নের ক্ষেত্রে ইদরিসকে সাহায্য করার অভিযোগ আরোপ করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। অতঃপর সম্রাট রশীদ তাঁর পিতা আল মাহদী কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের মধ্য থেকে আশ্ শামাখকে ইদরিসের হত্যার জন্য নিযুক্ত করলেন। সে প্রকাশ্য পথ ত্যাগ করে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করল। মাগরিবে পৌঁছে ইদরিসের সাথে মিলিত হয়ে বনি আব্বাসের সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করল। ইদরিসও সরল বিশ্বাসে তাকে গ্রহণ করলেন। এর পর সুযোগ মত নির্জনে শামাখ তাঁকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করতে সক্ষম হল। ইদরিসের মৃত্যু সংবাদ বনি আব্বাস খুব আনন্দের সাথে উপভোগ করলেন। তাঁদের ধারণা জন্মিল, এর ফলে মাগরিবে শিয়া মতবাদ প্রচারের সমস্ত উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার মূল উৎপাটিত করা সম্ভব হবে। কিন্তু যখন ইদরিসের স্ত্রীর গর্ভাবস্থার কথা তাঁরা শুনতে পেলেন, তখন, আল্লাহ্‌র কসম, কুৎসা রটান ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর রইল না। অতঃপর যখন মাগরিবে শিয়া মতবাদের প্রচার ও প্রসার দীপ্তিমান হয়ে উঠল এবং ইদরিস ইবনে ইদরিসের নেতৃত্বে শিয়া সাম্রাজ্য নতুন শক্তি লাভ করল, তখন এটা তাঁদের বুকে মৃত্যুবাণের অপেক্ষাও অধিক আঘাত হেনেছে। দুর্বলতা ও শৈথিল্য তখন আব্বাসী সাম্রাজ্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

---

৯৯. রোজেনথাল লিখেছেন 'ফেক্কা'—মক্কার নিকটবর্তী একটি অঞ্চল, এখানে শিয়াদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। আমরা মূল গ্রন্থের অনুকরণ করলাম।

১০০. ইবনে আসিরের মতে ওয়া 'জহের হত্যাকারী রশীদ না হাদি, তা নিশ্চিত নয়। ওয়াজিহ মিশরে ডাকবিভাগ ও চরদের মূল দায়িত্ব পালন করতেন।

www.amarboi.org

সীমান্ত অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল। সুতরাং মাগরিবের দূর প্রান্তে অবস্থানরত ও বারবারদের দ্বারা সুরক্ষিত প্রথম ইদরিসকে হত্যা করবার জন্য সম্রাট হারুনুর রশীদের পক্ষে কৌশলে বিষ প্রয়োগ ব্যতীত অন্য পথ ছিল না। কাজেই উক্ত শিয়া রাষ্ট্রের পুনরুত্থান তাঁদেরকে বিচলিত করে তুলল। তাঁরা আফ্রিকিয়াস্থ তাদের সাহায্যকারী বনি আগলাবকে তাদের সীমান্ত সুরক্ষিত করে এ বিস্তারমান শক্তির আক্রমণ থেকে আব্বাসী সাম্রাজ্যকে রক্ষার নির্দেশ দিল। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যাতে এ শক্তি অধিক দূর বিস্তৃত হবার পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—এ বক্তব্য মামুন ও তৎপরবর্তী আব্বাসী সম্রাটগণ সকলেই বনি আগলাবের নিকট উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু বনি আগলাব মরক্কোবাসী বারবারদের তুলনায় একান্তই দুর্বল ছিল। মূলত এ দুর্বলতা কেন্দ্রীয় আব্বাসী শাসন থেকে উৎসারিত হচ্ছিল। কেননা তাঁরা তখন অনারব মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের কবলে পতিত হয়েছেন। তারা সম্রাটদের উপর এমন আধিপত্য বিস্তার করেছে যে, সাম্রাজ্যের সমুদয় বিষয়ই তাদের স্বার্থপরতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। তারা রাজকোষ, রাজকর্মচারী ও রাজ অমাত্যবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করে সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১০১]

সম্রাট পিঞ্জরাবদ্ধ ওয়াসীফ ও বুগার মাঝে,
তারা যা বলায়, তাই বলেন তিনি তোতার সাজে।

সুতরাং বনি আগলাবের অমাত্যবর্গ সর্বদাই সম্ভাব্য আক্রমণের ভয় করতেন এবং নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার জন্য অজুহাতের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। কখনও তাঁরা মাগরিব ও তদঞ্চলবাসী বারবারদিগকে তুচ্ছ করে কথা বলতেন; আবার কখনও ইদরিসের শক্তিমত্তা ও তাঁর অনুসারীদের দোর্দণ্ড প্রভাবের ভয় দেখাতেন। তারা আব্বাসীদেরকে জানাতেন যে ইদরিস দলবলসহ তাঁদের রাজ্যসীমা অতিক্রম করেছে এবং তার প্রমাণস্বরূপ তারা নিজেদের প্রেরিত উপঢৌকন ও রাজস্বে ইদরিসী মুদ্রা জুড়ে দিতেন। এরূপ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাতে বনি আগলাব আব্বাসী সম্রাট কর্তৃক তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। এ কারণে তারা কখনও ইদরিসের আক্রমণের ভয় দেখাতেন, আবার কখনও তাদের উপর অত্যধিক চাপ আরোপ করলে ইদরিসীদের পক্ষাবলম্বন করবেন বলে জানাতেন। অন্যদিকে সুযোগ বুঝে তারা আবার ইদরিসীদের বংশধারায় কলঙ্ক আরোপ করতেন এবং দূরত্বের সুবিধার জন্য সত্যমিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের ভয় তাদের ছিল না। আর বনি আব্বাসের দুর্বল সম্রাটরা তখন এমন অবস্থায় উপনীত যে, তাঁরা ও তাঁদের অনুসারী অনারব অমাত্যবর্গ সকলেই বিনা বিচারে সর্বপ্রকার জনশ্রুতি গ্রহণ করতেন। বনি আগলাবের ক্ষমতার শেষদিন পর্যন্ত তারা অনুরূপভাবেই আব্বাসীদেরকে প্রতারণা করে গেছেন।

এজন্যই বিনা বাধায় ইদরিসী বংশধারায় আরোপিত এ জঘন্য কুৎসা জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করতে পেরেছে। সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিরা এ কুৎসার পুঁজি নিয়ে ইদরিসীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করেছে। আল্লাহ্ এদের

১০১. মাসউদী এই সূত্র দুটি উদ্ধৃত করেছেন। কবির নাম অজ্ঞাত। এতে বর্ণিত সম্রাট আল মুস্তাইন তুর্কি সেনাপতি ওয়াসীফ ও বুগার হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন।

www.amarboi.org

পরিণতিও জঘন্য করুন। হায়, এরা কী করে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সনাতন পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে বাস্তব সত্য ও জল্পনা-কল্পনার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবার মানসিকতা হারিয়ে ফেলল!

বস্তুত ইদরিস তাঁর পিতার ঔরসজাত সন্তান এবং সন্তান ঔরসের জন্যই নির্ধারিত।[১০২] নবী বংশের উপর থেকে অনুরূপ কলঙ্ক-কালিমা দূর করা বিশ্বাসীদেরই অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ পবিত্র, তিনি তাঁদের উপর থেকে সকল কলুষ দূর করে তাঁদেরকে যথানিয়মে পবিত্র রেখেছেন। কাজেই ইদরিসের পিতৃপরিচয় এ সকল কলুষ ও কুৎসা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এটাই কোরানের নির্দেশ। যদি কেউ এর বিপরীত ধারণা পোষণ করে, তবে সে নিজেই তার পাপের জন্য দায়ী হবে এবং পথভ্রষ্টতার অভিশাপ ডেকে আনবে।

আমি উপরোক্ত কুৎসার বিরুদ্ধে আলোচনা কিছুটা দীর্ঘায়িত করেছি। কারণ এর দ্বারা আমি এ সন্দেহের মূলোৎপাটন করতে চাই এবং বিদ্বেষপরায়ণদের মুখ বন্ধ করতে ইচ্ছা করি। কেননা আমি ইদরিসীদের প্রতি হিংসাপরায়ণ ও তাদের বংশধারায় কুৎসা আরোপকারী কোন এক ব্যক্তির মুখ থেকে স্বকর্ণে এ অপবাদ শুনেছি। সে তার ধারণা অনুসারে মাগরিবেরই কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে এর উদ্ধৃতি দিচ্ছিল। সম্ভবত সে ঐতিহাসিক সেই স্বল্পসংখ্যক লোকের অন্তর্গত, যারা ইদরিসীদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের স্মৃতির প্রতি অকৃতজ্ঞ। নতুবা মূল বিষয় সম্পূর্ণ সন্দেহের ঊর্ধ্বে ও পবিত্র। কারণ যে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, তার সন্দেহ দূর করতে যাওয়াও এক প্রকার ত্রুটি বৈকি। তবুও আমি তাঁদের জন্য ইহজগতে বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম, এ আশায় যে, তাঁরাও কিয়ামতের দিন আমার হয়ে তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন।

আরেকটি কথা জেনে রাখা ভাল যে, যারা ইদরিসী বংশের কুৎসা রটনা করছে, তাদের অধিকাংশই ইদরিসের সন্তান-সন্ততির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ কারণ, তারা নিজেরাও নবী বংশের অন্তর্গত কিংবা দাবিদার। কেননা এ মহান বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া পৃথিবীর সকল জাতি ও গোত্রের নিকট অতীব মর্যাদার বিষয়। এজন্যই এর উপর এত অপবাদের আঘাত এসেছে। ফেজ ও সমগ্র মাগরিবে বসবাসকারী এ বনি ইদরিস খ্যাতি ও সম্মানের এমন এক উচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত, অন্য কারও পক্ষে তার নিকটবর্তী হওয়ার কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। কারণ তা পর্যায়ক্রমে পূর্বসূরি জাতি ও গোত্রের নিকট থেকে বর্তমান উত্তরসূরিদের নিকট এসে পৌঁছেছে। তাঁদের পিতামহ এবং ফেজের প্রতিষ্ঠাতা ও সমৃদ্ধির নায়ক ইদরিসের গৃহ তাঁদের গৃহের মাঝখানে অবস্থিত। তাঁদের মহল্লা ও পথের সম্মুখভাগেই তাঁর মসজিদ বিদ্যমান। তাঁদের শহরের উচ্চতম মিনারায় তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এমনি ধরনের আরও বহু স্মৃতিচিহ্ন বিরাজমান, যার সংবাদ বারংবার পর্যায়ক্রমে বর্ণিত হয়ে এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে তা যেন চাক্ষুষ দৃষ্ট বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং নবীবংশের অন্য সকলে যখন ইদরিসীদের আল্লাহ দত্ত এ খ্যাতি ও সম্মানের দিকে তাকায়, তখন তাদের মধ্যে নবী বংশের গৌরব ও রাজকীয় মহিমার এমন কিছুই দেখতে পায় না, যা

১০২. এটা একটি হাদিস; ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের একটি সূত্রও বটে।

www.amarboi.org

তাদের পূর্ব পুরুষগণ এ মাগরিবে অর্জন করেছেন। কাজেই তারা নিজেদেরকে নিঃস্ব ভাবতে থাকে এবং ইদরিসীদের কারও সমকক্ষ হতে পারবে না বলে নিরাশ হয়ে পড়ে।

বস্তুত নবী বংশের রক্তধারার অন্যান্য অংশীদার, যাদের ভাগ্যে এখনও অনুরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ ঘটেনি, তাঁদের উচিত নিজেদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা। কারণ মানুষ তাঁদের বংশধারার সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাসী। অবশ্য জ্ঞান ও অনুমান, বিশ্বাস ও ধারণার মধ্যে সর্বদাই পার্থক্য বিদ্যমান।

এরূপ নিঃস্ব অবস্থার কথা যখন কেউ জানতে পারে, তখন তার নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এজন্য তাদের অধিকাংশের মধ্যে এহেন ইচ্ছা জাগ্রত হয় যে, যদি কোন প্রকার ইদরিসীদেরকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যেত! এ ইচ্ছা তাদের বিদ্বেষপ্রসূত এবং এর আকর্ষণেই তারা হিংসার শিকারে পরিণত হয়ে অপবাদের দ্বারস্থ হয়। এভাবেই বক্ষ্যমান জঘন্য কুৎসা ও মিথ্যা দোষারোপ তাদের মধ্যে জন্মলাভ করে। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, নিজেদের ধারণা ও অনুমানকে অপরের উপর প্রয়োগ করে সব কিছুই সম্ভব বলে মনে করা। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

বস্তুত মাগরিবে এ সম্ভ্রান্ত নবীবংশের এমন অন্য কেউ নেই, যার বংশধারা ইদরিসীদের ন্যায় সত্য ও খ্যাতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ সম্মান হাসানের বংশধরদেরই প্রাপ্য। বর্তমানে ফেজে এ বংশের সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত গোত্র বনি ইমরান। তাঁরা ইয়াহিয়া আল হোতী ইবনে মুহম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া আল আওয়াম ইবনে আল কাসেম ইবনে ইদরিস ইবনে ইদরিসের বংশধর। তাঁরা এ অঞ্চলে নবীবংশের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত হিসাবে তাঁদের পিতৃপুরুষ ইদরিসের গৃহে বাস করছেন। বস্তুত তাঁরাই সমগ্র মাগরিবের একচ্ছত্র নেতৃত্বের অধিকারী। যাহোক, আমরা ইদরিসীদের ইতিহাস বর্ণনার সময়, আল্লাহ্ চাহেত, তাঁদের কথা উল্লেখ করব।[১০৩]

আল মেহেদীর বংশধারা

এ সকল জঘন্য অপবাদ ও মিথ্যা মতবাদের অনুরূপ আরও একটি মতবাদ হল ইমাম আল-মেহেদীর বিরুদ্ধে প্রচারণা। আল মোহেদ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এ কীর্তিমান পুরুষ যখন আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচার ও পূর্ববর্তীদের অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করলেন, তখন মাগরিবের দুর্বল ধর্মশাস্ত্রবিদগণ তাঁর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে তাঁর সমুদয় দাবিকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলেন। এমন কি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নবী বংশের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়েও তারা কটাক্ষ করেছেন। বস্তুত তাঁর উন্নততর অবস্থাই এ সকল ধর্মশাস্ত্রবিদদের মনে তাঁর প্রতি হিংসার জন্ম দিয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে প্রচারণার ইন্ধন যুগিয়েছে। প্রথম দিকে তারা তাঁকে নিজেদের ধারণা অনুসারে ধর্মীয় ব্যাপারে জ্ঞান ও বিচারের ক্ষেত্রে তাদের সমকক্ষ মনে করতেন। কিন্তু ক্রমশ আল-মেহেদী তাদেরকে অতিক্রম করে গেলেন; তাঁর নেতৃত্ব সকলে মেনে নিল।

---

১০৩. এর পর রোজেনথাল বনি ইমরানের বংশধারা ও তার তৎকালীন নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের মূল গ্রন্থে এটা নেই।

www.amarboi.org

এতেই তারা হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন এবং তাঁর সমস্ত দাবি ও ধর্মীয় মতামতকে মিথ্যা বলে প্রচার করতে লাগলেন।

এর আরও একটি কারণ হল, এ সকল ধর্মশাস্ত্রবিদ আল-মেহেদীর শত্রু লামতুনা সম্রাটদের নিকট থেকে যে প্রকার সম্মান ও সুবিধা লাভ করতেন, তা আর কারও নিকট পাবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ লামতুনা সম্রাটগণ খুবই সরল প্রকৃতির ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তাঁদের দরবার জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত। তাঁরা তাদের নিকট থেকে সদুপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এ বিষয়ে প্রতি অঞ্চলের গণ্যমান্য লোকেরাই তাঁদের নিকট যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করতেন। যাহোক, এ সম্মান ও সুবিধার জন্য ধর্মশাস্ত্রবিদগণ লামতুনা সম্রাটদের ঘনিষ্ঠ অনুসারী এবং তাঁদের শত্রুদের শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে আল-মেহেদীর বক্তব্য ও সমালোচনায় পীড়িত হয়ে তাঁর উপর আক্রমণ চালালেন এবং লামতুনা সম্রাটদের সন্তুষ্টি বিধানে ও তাদের সাম্রাজ্য সংরক্ষণে এ বিরোধিতাকে কাজে লাগালেন।

অথচ আল-মেহেদীর মর্যাদা ও অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি তাদের বিশ্বাসাদির সাথেও একমত পোষণ করতেন না। পাঠক, আপনি কি ধারণা করতে পারেন যে, তিনি কিরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন; যার ফলে একটি সাম্রাজ্যের বিরোধিতা এবং তদাশ্রিত ধর্মশাস্ত্রবিদদের অন্যায় আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন! তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে ধর্মযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানালেন এবং একটি সাম্রাজ্যের বিরাট শক্তি, অপরিমিত ঐশ্বর্য ও অগণিত সাহায্যকারী থাকা সত্ত্বেও তাকে সমূলে উৎপাটিত করে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করলেন। এ সকল যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর অনুসারীরা কি পরিমাণ নিহত হয়েছিল, তার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। তারা আমৃত্যু তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল এবং তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিল। তারা তাঁর মতবাদ প্রচার ও তাঁর বিশ্বাসকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যই সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করেছিল। এর ফলে তাঁর মতবাদ সর্বাগ্রে স্থান লাভ করে সাগরের উভয় তীরে[১০৪] সাম্রাজ্য বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল। অথচ এতদসত্ত্বেও আল-মেহেদী আমৃত্যু কৃচ্ছ্রতা; কৌমার্য ও বিপদে ধৈর্যধারণকারী এবং সম্পদ সম্ভোগে নিস্পৃহ ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি কোন প্রকার পার্থিব সম্পদই রেখে যাননি। এমনকি যে সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়, তাও তাঁর ছিল না। কাজেই আমার জানতে ইচ্ছে হয় যে, যদি তাঁর এ সাধ্য-সাধনার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান না হয়, তবে তাঁর অন্য কি উদ্দেশ্য ছিল! যেহেতু এটা তাঁকে কোন পার্থিব সম্পদেরই অধিকারী করেনি। তদুপরি তাঁর উদ্দেশ্য যদি বিশুদ্ধ না হত, তাহলে তা কখনও পূর্ণতা লাভ করত না এবং তাঁর মতবাদেরও এমন ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটত না। এটাই আল্লাহ্‌র নিয়ম, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে।[১০৫]

ধর্মশাস্ত্রবিদরা যে আল-মেহেদীর ফাতেমী বংশীয় হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন, বস্তুত এর জন্য তাঁরা কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেননি। যদি মনে করা হয় যে,

---

১০৪. উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেন।

১০৫. কোরান, ৪০, ৮৫।

www.amarboi.org

তিনি তা দাবি করে ফাতেমী বংশের সাথে রক্তসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন, তথাপি যেহেতু সকলেই তাঁর দাবি মেনে নিয়েছে, কাজেই তা বাতিল করবার যোগ্য প্রমাণ কোথায়! যদি তাঁরা বলেন যে, নেতৃত্ব স্ববংশীয় লোক ব্যতীত অন্যের উপর ন্যস্ত হতে পারে না, যেমন তার সত্যতা সম্পর্কে আমরা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করব, তাহলেও এ কথা বোঝা দরকার যে, এ ব্যক্তি সমগ্র মাসমোদা গোত্রের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন, তাঁর প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস ও বশ্যতা স্বীকারে কোন প্রকার ত্রুটি ছিল না, এমন কি তাঁর নিজস্ব গোত্র হরগার নির্দেশও তারা মেনে চলেছে এবং এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর মতবাদ প্রচারের ইচ্ছাকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এ নেতৃত্ব লাভের ব্যাপারে আল-মেহেদী কখনও তাঁর ফাতেমী বংশধারার উপর নির্ভর করেননি এবং মানুষও তাঁকে এ কারণে মেনে নেয়নি; বরং হরগা-মাসমোদা গোত্রের মধ্যে তাঁর অসামান্য প্রভাব ও তাদের নিজস্ব লোক বলেই তারা তাঁকে অনুসরণ করেছে। ফাতেমী বংশের কথা মানুষ ভুলে গিয়েছিল এবং তার স্মৃতিও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল, শুধু তাঁরাই তাঁদের মধ্যে বংশপরম্পরায় তার স্মৃতি বহন করছিলেন। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, তাঁদের পূর্ব পরিচয় রূপান্তরিত হয়ে অনুসারীদের পরিচয়ে পরিচিত হয়েছিল। এর ফলে গোত্রপ্রীতির ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ব পরিচয় কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করেনি। সংশ্লিষ্ট গোত্রগুলোর নিকট তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পূর্ব পরিচয় গুপ্ত থাকবার ফলে এ প্রকার বহু ঘটনাই ঘটেছে।

এ ক্ষেত্রে বাজিলার[১০৬] নেতৃত্ব নিয়ে আরফাজা ও জরিরের মধ্যকার মতানৈক্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কীভাবে আরফাজা আখদ গোত্রের অন্তর্গত হয়েও বাজিলাদের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন এবং তারই দাবিতে জরিরের সাথে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় হজরত উমর (রাঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, তা যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। এটা হতেও পাঠক সত্যের স্বরূপ বুঝে নিতে পারবেন। বস্তুত আল্লাহ্ই সত্যের পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব

ঐতিহাসিকদের এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য থেকে বহু দূরে সরে এসেছি। অবশ্য এর প্রয়োজনও ছিল। কারণ এভাবেই বহু বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও বিশ্বস্ত তথ্যবিশারদ ব্যক্তি বর্ণনায় ও মতামত প্রকাশে পদস্খলিত হয়েছেন। অতঃপর তাঁদের বর্ণিত বিষয়কে সর্বপ্রকার বিবেকবর্জিত উদাসীন প্রকৃতির লোকেরা অনুসরণ ও অনুকরণ করেছে। অবশ্য তাঁরা নিজেরাও এ সকল তথ্য বর্ণনার সময় কোন প্রকার বিচার-বিবেচনা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেননি। ফলে যেমন পেয়েছেন, তেমনভাবেই তাঁদের সঞ্চয় ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বস্তুত এ কারণেই ইতিহাসকে কল্পকাহিনী ও বিভ্রান্তিকর বিষয়ের আধার বলে মনে করা হচ্ছে এবং তার পাঠকগণও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকারে পরিণত হচ্ছেন। ইতিহাস যেন সাধারণ মানুষের প্রতি সাধারণ সম্পত্তি!

১০৬. একটি গোত্রের নাম। এই ঘটনার বিবরণ পরে দেয়া হয়েছে।

www.amarboi.org

অথচ একজন ইতিহাসবিদকে রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়মাবলি, সৃষ্টজগতের বিচিত্র প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি, চরিত্র, প্রথা, মত, পথ ও অন্যান্য সকল বিষয়ের দিক থেকে স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্যের বিষয়টি যথার্থভাবে জেনে নিতে হয়। এ সকল বিষয়ে তাঁর বর্তমানের জ্ঞান ব্যাপক ও গভীর হওয়া প্রয়োজন। যাতে তাঁর পক্ষে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে প্রাপ্ত উপকরণের সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের ভিত্তিতে তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হয়। কোন কোন বিষয়ে সামঞ্জস্যের কারণ ও অন্যান্য বিষয়ে অসামঞ্জস্যের কারণ তাঁকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তি, তাদের প্রকাশের প্রাথমিক অবস্থাসমূহ, বিকাশ ও অনুপ্রেরণার কারণগুলো এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠী ও তাদের পর্যাপ্ত তথ্যাদি জেনে নিতে হবে। ইতিহাসবিদ এ অনুসন্ধান এমনভাবে করবেন, যাতে প্রতিটি ঘটনা ও বিষয়ের উৎসমূল এবং উৎপত্তিগত কারণ সম্পর্কে তিনি অবহিত হতে পারেন। এর পর তিনি তাঁর নিজস্ব সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, তাঁরাও গত হয়েছেন। ক্ষমতা এখন অনারবদের হাতে; যেমন পূর্বদিকে তুর্কি, পশ্চিমে বারবার ও উত্তরে ফিরিঙ্গীদের কবলিত। আরবদের সঙ্গে তাদের জীবনধারাও অনেকাংশে চলে গেছে, অবস্থা ও প্রথারও পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের শৌর্যবীর্য বিস্মৃত হয়েছে ও তাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়েছে।

প্রাচীন মনীষীগণ একমাত্র এ দিক থেকে বিচার করেই ইতিহাসকে মহৎ বিষয় বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাবারী, বোখারি ও তাঁদের পূর্বে ইবনে ইসহাক এবং তাঁদের তুল্য যোগ্য জ্ঞানীগণ এ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এ বিশেষ তত্ত্বটি সম্পর্কে অবহিত নন, ফলে তাঁদের উক্ত বিষয়ে আত্মনিয়োগ মূর্খতার পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে ইতিহাস অত্যন্ত সহজ বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ, এমন কি যাদের উক্ত বিষয়ে কোন গভীর জ্ঞান নেই, তারাও ইতিহাসের পঠন-পাঠন, আহরণ, অনুসন্ধান ও অনুকরণে ব্যাপৃত হয়েছে। এর ফলে ভালর সাথে মন্দ, মজ্জার সাথে খোসা ও সত্যের সাথে মিথ্যা মিশে একাকার হয়ে গেছে। অবশ্য আল্লাহ্‌র হাতেই সমস্ত বিষয়ের শেষ পরিণাম।[১০৭]

ইতিহাসের আরও একটি গোপন ত্রুটি হল, সময় ও যুগের পরিবর্তনে জাতি ও গোত্রগুলোর মধ্যে যে অনিবার্য পরিবর্তন দেখা দেয়, তৎপ্রতি উদাসীনতা। অবশ্য এটা দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় অত্যন্ত সংগোপনে অবস্থান করে এবং দৃশ্যমান হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। এজন্যই এটা অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত অন্য সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

এটা এ যে, পৃথিবী ও মানব সমাজের অবস্থা, তাদের অভ্যাস ও গোত্র চেতনা কখনও একই আকৃতি ও নির্দিষ্ট প্রকৃতিতে অবস্থান করে না। সময় ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এরাও পরিবর্তিত হয়; এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উপনীত হয়ে থাকে। এটা ব্যক্তি, যুগ ও নাগরিক জীবনের জন্য যেমন সত্য, তেমনি বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল, কাল ও সাম্রাজ্যের জন্যও বাস্তব। এটাই আল্লাহ্‌র নিয়ম, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে এসেছে।[১০৮]

---

১০৭. কোরান, ৩১, ২২।
১০৮. কোরান, ৪০, ৮৫।

www.amarboi.org

প্রাচীন পারসিক, সিরিয়ান, নেবতী, তুব্বা, বনি ইসরাইল ও কিবতী জাতিগুলো এক সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তারা তাদের দেশ, রাজ্য, শাসন ব্যবস্থা, শিল্পকর্ম, ভাষা, পরিভাষা ও অধীনস্থ লোকদের প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ধারা ও অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলি থেকেই আমরা পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে তাদের অবদানের কথা জানতে পারি। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় পারসিক, বাইজেন্টাইন ও আরব জাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। এর ফলে পূর্বোক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং জীবনধারা পূর্বের ন্যায় বা অনুরূপ ও তদপেক্ষা ভিন্ন আকৃতি বা প্রকৃতিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে দেখা দেয়। এর পর মুজার সাম্রাজ্য বিস্তারে ইসলামের আবির্ভাব হয় এবং এ সকল অবস্থার সমুদয় অংশই এক বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়ায়, যার অধিকাংশ নিদর্শন বর্তমানকালেও পাওয়া যায়। উত্তরসূরিগণ এটা পূর্বসূরিদের নিকট থেকে লাভ করেছে। এর পর আরব সাম্রাজ্যও তার ঐশ্বর্যের যুগসহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যারা এ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নিজেদের শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, তারাও গত হয়েছেন। ক্ষমতা এখন অনারবদের হাতে; যেমন পূর্বদিকে তুর্কি, পশ্চিমে বারবার ও উত্তরে ফিরিঙ্গীদের কবলিত। আরবদের সঙ্গে তাদের জীবনধারাও অনেকাংশ চলে গেছে, অবস্থা ও প্রথার পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের শৌর্যবীর্য বিস্মৃত হয়েছে ও তাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়েছে।

অবস্থা ও অভ্যাসের পরিবর্তনের যে কারণটি সর্বজনবিদিত, তাহল এ যে প্রতিটি গোত্রের অভ্যাস তাদের সম্রাটের অভ্যাসকে অনুসরণ করে থাকে। যেমন, প্রবাদে বলা হয় : মানুষ শাসকের ধর্ম অনুসরণ করে। সম্রাটগণ যখন কোন রাজ্য বা ক্ষমতা অধিকার করেন, তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে পূর্বসূরিদের অভ্যাস গ্রহণ করেন। ক্রমশ তাঁরা এর কতকাংশ ত্যাগ করে নিজেদের অভ্যাসগুলোকেও এর সাথে মিশ্রিত করেন। এর ফলে রাজ্যের অনুসৃত অভ্যাসসমূহ পূর্বসূরিদের অভ্যাসের দরুন কিছুটা বিরোধিতা দেখা দেয়। এর পর যদি অন্য রাজ্যের উদ্ভব ঘটে, তাহলে নুতন অভ্যাসগুলোও এর সাথে মিশ্রিত হয়ে বিরোধের সূত্রপাত ঘটায় এবং প্রাচীনতর অভ্যাসগুলোর সাথে এ বিরোধ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে মিশ্রণ ও বিরোধের ফলে অভ্যাসের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। যতদিন মানবগোষ্ঠী রাজ্য ও ক্ষমতা বিস্তারে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকবে ততদিন অবস্থা ও অভ্যাসের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটবেই।

দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান ও তুলনামূলক বিচার মানুষের একটি অতি পরিচিত প্রবৃত্তি, অবশ্য এগুলো ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। উদাসীনতা ও বিস্মৃতির আকর্ষণে এগুলো মানুষকে তার উদ্দেশ্য ও গন্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি অতীত ঘটনাবলির অনেক কিছু শুনছে, অথচ ইতিমধ্যে এতে যে পরিবর্তন এসেছে, তা বুঝতে চেষ্টা করেনি; ফলে সে তার অসম্পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা দ্বিধাহীন চিত্তে বর্তমানকে বিচার করতে বসে এবং ভুল করে। অনেক সময় অতীত ও বর্তমানের মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক হওয়ায় তার ভুলের মাত্রাও সেই পরিমাণে ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়।

www.amarboi.org

শিক্ষকতা প্রসঙ্গ

এ প্রসঙ্গে একটি তুলনামূলক ভুলের আলোচনা করা যায়। ঐতিহাসিকগণ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের[১০৯] অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, তাঁর পিতা ইউসুফ একজন শিক্ষক ছিলেন। যদিও বর্তমানকালে শিক্ষকতা জীবিকা অর্জনের জন্য নিয়োজিত অন্যান্য পেশার ন্যায় একটি পেশা মাত্র। এর সাথে গোত্র চেতনার কোন সম্পর্ক নেই বললেও চলে। ফলে, শিক্ষকরা দুর্বল, অসহায় ও ভিত্তিহীন শ্রেণীতে পরিণত হয়েছেন। অথচ এতদসত্ত্বেও জীবিকা অর্জনের পেশায় নিয়োজিত বহু দুর্বল ব্যক্তি ও শিল্পকর্মী এমন মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হন, যা লাভ করবার যোগ্যতা তাঁদের নেই। তাঁদের ধারণা, ইচ্ছা করলেই তাঁরা তা পেতে পারেন। ফলে আশার ছলনায় ভুলে তাঁরা অগ্রসর হন এবং এমন একটি রজ্জু অবলম্বন করতে চেষ্টা করেন, যা অনেক সময় তাঁদের হাত থেকে ফসকিয়ে যায় ও তাঁরা ধ্বংসের পাথারে নিপতিত হন। তাঁরা এটা বুঝতে চান না যে, এ মর্যাদা লাভের যোগ্য তাঁরা নন। কারণ তাঁরা জীবিকা অর্জনের পেশায় নিয়োজিত কর্মী ও শিল্পী মাত্র। তাঁরা এটাও চিন্তা করেন না যে, ইসলামের প্রারম্ভকালে এবং উমাইয়া ও আব্বাসী শাসন আমলে শিক্ষার অবস্থা এরূপ ছিল না। শিক্ষাকে তখন আদৌ পেশা হিসাবে গ্রহণ করা হত না। বরং শিক্ষা ছিল ধর্মপ্রবর্তকের মুখ নিঃসৃত বাণী ও ধর্মের বিস্মৃত জ্ঞান পুনরুদ্ধারের এক প্রচারমূলক প্রচেষ্টা। তৎকালে সম্ভ্রান্ত বংশীয়, গোত্রচেতনাসম্পন্ন ও জাতির কর্ণধার ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাই আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর সুন্নতের শিক্ষাদান করতেন। এটা কোন পেশাধারী শিক্ষা ছিল না, বরং ধর্ম প্রচারের মানসেই তাঁরা এতে উদ্যোগী হতেন। কারণ, কোরান তাঁদেরই মধ্যকার একজন রসূলের উপর অবতীর্ণ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, তাঁদের অনুপ্রেরণার উৎস এবং ইসলাম তাঁদের ধর্মমত। এর জন্যই তাঁরা যুদ্ধ করেছেন ও শহীদ হয়েছেন। এরই ফলে তাঁরা সকল জাতির মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। সুতরাং এর শিক্ষা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার বাসনা তাঁদের মধ্যেই জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। এজন্যই এ কাজে তাঁরা কোন প্রকার অহমিকার গ্লানি ও ভর্ৎসনার পীড়া অনুভব করেননি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ, হজরত মুহম্মদ (সঃ) আরবের গোত্র প্রতিনিধিদের সাথে তাঁর শ্রেষ্ঠ সহচরদেরকে পাঠাতেন, যাঁতে তাঁরা ধর্মের বিধি-নিষেধ ও ইসলামের সৌন্দর্যকে যথাযথভাবে তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর দশজন সহচরকে[১১০] এবং অতঃপর আরও অনেককে পাঠিয়েছিলেন।

এর পর ইসলাম যখন স্থায়িত্ব লাভ করল, তার প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়ল এবং দূরদূরান্তের বিভিন্ন জাতি এসে আরবদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করল, তখন এ ধর্মমতকে ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবার প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ কালচক্রের আবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল এবং বিভিন্ন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি

---

১০৯. উমাইয়া শাসন আমলে ইরাকের বিখ্যাত প্রাদেশিক শাসনকর্তা।

১১০. এরা স্বর্গলাভের সুসংবাদপ্রাপ্ত বলে খ্যাত। প্রথম চারজন খলিফা, তালহা, জুবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবি ওক্কাস, সায়িদ ইবনে জায়েদ ও আবু ওবায়দা ইবনে আল্ জাররাহ (রাঃ)।

www.amarboi.org

সমাধানের জন্য কোরান ও হাদিস থেকে সূত্র বের করবার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। সুতরাং জ্ঞানার্জন তখন এমন একটি বিষয়, যার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং তারই আকর্ষণে তা ক্রমশ শিল্পকর্ম ও পেশায় পরিণত হল। আমরা বর্তমান গ্রন্থের শিক্ষা ও শিক্ষাদান অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

অন্যদিকে গোত্রপ্রধানরা তখন একমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসনে মনোনিবেশ করলেন এবং জ্ঞানদানের বিষয়টি অন্যদের জন্য ছেড়ে দিলেন। ফলে শিক্ষাদান অতি সহজেই জীবিকা অর্জনের পেশায় পরিণত হল। সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও রাজ্যপরিচালকগণ শিক্ষাদানকে হেয় জ্ঞান করতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং তা দুর্বলদের করতলগত হল এবং শিক্ষাদানের সাথে শিক্ষাদানকারী ও গোত্রপ্রধান ও রাজ্যপ্রধানদের নিকট হেয় বিবেচিত হতে লাগলেন। কাজেই এ অবস্থার সাথে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের তুলনা করা চলে না। কারণ তাঁর পিতা বনি সফিকের নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং বনি সফিক যে গোত্রপ্রীতি ও মর্যাদার দিক থেকে কোরায়েশদের সমতুল্য বিবেচিত হত, পাঠকের তা অবশ্যই জানা আছে। তাঁর শিক্ষাদানও এ যুগের ন্যায় জীবিকা অর্জনের পেশা ছিল না, বরং তা ছিল, আমরা যেমন বর্ণনা করেছি, সেই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধারা অনুসারী।

বিচারক প্রসঙ্গ

অনুরূপ প্রসঙ্গে ইতিহাস পাঠক ও সমালোচকদের আরও একটি ভুল সিদ্ধান্তের আলোচনা করছি। তাঁরা অতীতকালের কাজীদের অবস্থা সম্পর্কে শুনতে পান যে, তাঁরা রাজ্য পরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করে যুদ্ধ ও সৈন্য পরিচালনায় পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতেন। এর ফলে তাঁদের নিজেদেরও অনুরূপ ক্ষমতা লাভের বাসনা জাগ্রত হয়। তাঁরা অতীত ও বর্তমানের কাজীদের অবস্থা একই সমান বিবেচনা করতে থাকেন। যখন তাঁরা শুনেন যে, সম্রাট হিশামের[১১১] উপর প্রভাব বিস্তারকারী তাঁর দেহরক্ষী ইবনে আবু আমেরের[১১২] পিতা এবং শেভিলার রাজন্যবর্গের অন্যতম ইবনে আব্বাসের পিতা কাজী ছিলেন, তখন তাঁরা তাঁদেরকে বর্তমানকালের কাজীদের ন্যায় মনে করেন। তাঁরা ভেবে দেখেন না যে, ইতিমধ্যে কাজীদের পদমর্যাদায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমরা বর্তমান ইতিহাসের প্রথম গ্রন্থে এ সম্পর্কে যথাবিহিত আলোচনা করব।

বস্তুত ইবনে আবু আমের ও ইবনে আব্বাস স্পেনের উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী আরবীয় গোত্রগুলোর প্রভাবধন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা নেতৃত্ব ও রাজ্য পরিচালনার মর্যাদা কাজী পদের প্রভাবে লাভ করেননি এবং বর্তমানের কাজী পদের সাথে তার তুলনা করাও চলে না। কারণ তৎকালে রাজ্য পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী গোত্র ও তদীয় অনুসারীদের মধ্যেই উক্ত পদ দেয়া হত। যেমন বর্তমানে মাগরিবে মন্ত্রিত্বের বেলায় প্রযোজ্য হচ্ছে। তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ পালনের প্রতি পাঠক লক্ষ করুন; এটা কি গোত্রচেতনার যথেষ্ট

---

১১১. স্পেনের উমাইয়া সম্রাট।

১১২. আল মনসুর ইবনে আবু আমের, মৃত্যু ৩৯২ (১০০২ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যতীত সম্পন্ন হতে পারত। সুতরাং শ্রোতৃবৃন্দ শোনামাত্রই যে ধারণা পোষণ করতে থাকে, তাতে বাস্তব বিচার-বিবেচনার লেশমাত্রও নেই।

বর্তমান স্পেনের আরবীয় গোত্রগুলোর দূরদর্শী বংশধরেরা অনুরূপ ভুলের কবলে পতিত হচ্ছে। আরবীয় সাম্রাজ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট গোত্রচেতনা যেখানে বহুকালপূর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এমন কি তারা বারবার গোত্রচেতনার প্রভাব থেকেও মুক্তি লাভ করেছে; এর ফলে তাদের আরবীয় বংশধারাই শুধু অবশিষ্ট আছে; কিন্তু যে গোত্রচেতনা ও পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা খ্যাতি ও মর্যাদা অর্জন করা যায়, তার চিহ্নমাত্রও নেই। বস্তুত বর্তমানে তারা নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়ে অতি সাধারণ প্রজায় পরিণত হয়েছে। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও তারা ধারণা করে যে, তাদের বংশধারার গৌরব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে মিলিত হলেই তারা জয়ী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠবে। এ কারণেই তাদের মধ্যকার বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কর্মী ও শিল্পীরা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে মর্যাদা লাভের জন্য গলদঘর্ম হচ্ছে। ফলত যে ব্যক্তি পশ্চিমের এ সমুদ্রতীরে গোত্র, গোত্রচেতনা ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অবস্থানসমূহ বিবেচনা করবে এবং বিভিন্ন জাতির সাথে প্রতিযোগিতায় ক্ষমতা লাভের সূত্রটিকে বিশ্লেষণ করবে, তার পক্ষে অনুরূপ ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা খুবই সামান্য।

ভুল বর্ণনা পদ্ধতি

অনুরূপ ভ্রান্তির আরও একটি উদাহরণ ঐতিহাসিকদের সাম্রাজ্য ও সম্রাটের ধারাবাহিকতা বর্ণনায় অনুসৃত পদ্ধতি। তা করতে গিয়ে তাঁরা সম্রাটের নাম, বংশপরিচয়, পিতার নাম, মাতার নাম, সম্রাজ্ঞীদের নাম, উপাধি, অঙ্গুরীয় এবং তৎকর্তৃক নিয়োজিত কাজী, দেহরক্ষী ও মন্ত্রীদের নাম বর্ণনা করে থাকেন। এটা উমাইয়া ও আব্বাসী যুগের ঐতিহাসিকদের অন্ধ অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাঁরা তৎকালীন যুগ-প্রয়োজনকে বিবেচনা করে দেখেন না। তৎকালে ঐতিহাসিকগণ সম্রাট ও তদীয় পুত্রকন্যার জন্য ইতিহাস রচনা করতেন। যাতে তাঁরা তাদের পূর্বসূরিদের অবস্থা ও আচরণ জানতে পেরে নিজেদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারেন এবং তজ্জন্য তাঁরা তা জানতে আগ্রহীও ছিলেন। সুতরাং কীভাবে পূর্ববর্তী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে জড়িত লোকদিগকে কাজে লাগাতে হবে, কীভাবে নিজেদের দাস ও অনুসারীদের মধ্যে পদ ও মর্যাদা বণ্টন করতে হবে—তার কথাও ঐতিহাসিকরা সবিস্তারে বর্ণনা করতেন। কাজীদের কথাও সেখানে থাকত। কারণ, তাঁরাও উজিরদের মতোই গোত্রচেতনার অংশীদার ছিলেন। যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। কাজেই তখন এ সকল বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এর পর বহু বিচিত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং কালের ব্যবধানও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন শুধু রাষ্ট্রনায়কদের পরিচয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তি ও সংঘর্ষজনিত সম্পর্ক এবং কে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে ও কে পারবে না, তাই ঐতিহাসিক উপাদানের মূল চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বর্তমানকালের ইতিহাস রচনাকারীর পক্ষে ঐ সকল অতীত রাষ্ট্রের সম্রাট তনয়, সম্রাজ্ঞী, অঙ্গুরীয়, উপাধি, কাজী, মন্ত্রী,

www.amarboi.org

দেহরক্ষী প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় দানের দ্বারা কারও উপকার করবার সম্ভাবনা নেই। কারণ তাঁরা নিজেরাই এ সকল বস্তু ও ব্যক্তির শক্তির উৎস, গোত্র পরিচয় ও পদমর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। একমাত্র প্রাচীন ইতিহাসবিদদের বর্ণনার অন্ধ অনুকরণ ও তাঁদের উদ্দেশ্যের প্রতি উদাসীনতাই তাঁদেরকে এ সকল বর্ণনার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। এর ফলে তাঁরা ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

অবশ্য এমন মন্ত্রীবর্গের কথা বর্ণনা করা যেতে পারে, যাঁরা সম্রাটদের উপর তাঁদের অপরিসীম প্রভাব-প্রতিপত্তির নিদর্শন রেখে গেছেন। যেমন হাজ্জাজ, বনি মুহাল্লাব, বরমেকা, বনি সহল ইবনে নওবখত, কাফুর আল ইখশিদী, ইবনে আবু আমের ও তাঁদের ন্যায় খ্যাতিমান অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ। বস্তুত তাঁদের পিতৃপরিচয় ও অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কখনই দূষণীয় নয়। কেননা রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁরা সম্রাটদেরই অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী।

আমরা এ স্থানে আরও একটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করে আমাদের এ অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করব। তা এ যে, ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ যুগ বা গোত্রের বিবরণ মাত্র। অবশ্য তাতে যে বিভিন্ন অঞ্চল, গোত্র ও যুগের সাধারণ অবস্থার বর্ণনা সন্নিবেশিত করা হয়; কারণ তার উপরেই ঐতিহাসিক তাঁর রচনার ভিত্তি স্থাপন করেন, তার মধ্যেই তাঁর অধিকাংশ উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হয় এবং তা থেকেই তাঁর বিবরণ দানের সূত্রগুলো বের হয়ে আসে। বস্তুত শুধু এ বিষয় নিয়েও অনেকে ইতিহাস রচনা করেছেন; যেমন মাসউদী তাঁর 'মরুজুজ্‌জাহাব' নামক গ্রন্থ লিখেছেন। তাতে তিনি তাঁর সমসাময়িক তিনশ ত্রিশের[১১৩] পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চলের ব্যাপক বিবরণ প্রদান করেছেন। তিনি তাদের ধর্মমত, অভ্যাস, নগর, পর্বত, সমুদ্র, রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য এবং আরব ও অনারব গোত্রগুলোর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন। এভাবে তিনি ঐতিহাসিকদের নেতা এবং তাঁর গ্রন্থ তাঁদের ইতিহাস জ্ঞানের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা এর সাহায্যে ঐতিহাসিক বিবরণের সত্যতা যাচাই করে থাকে।

অতঃপর আল বকরী[১১৪] এ ধারায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি পূর্বসূরির সমুদয় বিষয়ের সাথে বিশেষভাবে বিভিন্ন রাজ্য ও পথ-ঘাটের বিবরণ সংযোজন করেন। কারণ তাঁর সময়ে জাতি ও গোত্রসমূহের অবস্থার মধ্যে তেমন বৃহৎ কোন পরিবর্তন ও ব্যাপক কোন বৈচিত্র্য দেখা দেয়নি। অবশ্য বর্তমানকালে, এ অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে মাগরিবের অবস্থা, আমরা যেমন দেখছি, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পঞ্চম শতাব্দীতে আগত আরবীয় গোত্রগুলো মাগরিবের আদিম অধিবাসী বারবারদিগকে শক্তি ও সংখ্যায় পরাজিত করে তাদের স্থান গ্রহণ করছে। তারা বারবারদেরকে অধিকাংশ রাজ্য থেকে উৎখাত করেছে এবং যেগুলো এখনও অবশিষ্ট আছে, সেখানেও অংশীদার হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা চলাকালে অষ্টম শতাব্দীর[১১৫] মধ্যভাগে পূর্ব ও পশ্চিমের সর্বত্র

---

১১৩. ৩৩০ (৯৪০ খ্রি:) হিজরি।

১১৪. প্রখ্যাত ভূগোলবিদ্‌ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুহাম্মদ। জীবনকাল ৪৩২-৪৮৭ (১০৪০/৪১-১০৯৪ খ্রি:) হি:।

১১৫. খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দি।

www.amarboi.org

প্লেগ এক মারাত্মক মহামারীরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এর আক্রমণে জাতিগুলো বিনষ্ট ও গোত্রগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এটা সভ্যতার বহু মূল্যবান অবদান গ্রাস করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এ বিপদ সাম্রাজ্যগুলোতে এমন এক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল, যখন ঐগুলো অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়েছে এবং তাদের স্বাভাবিক স্থিতিকাল শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং এ অতর্কিত আক্রমণ তাদেরকে শক্তির দিক থেকে আরও শিথিল, প্রভাবের দিক থেকে আরও খর্ব এবং শাসন ক্ষমতাকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে। এদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে পতনোন্মুখ ও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে এবং জনসংখ্যা হ্রাসের ফলে সভ্যতার গতি স্তিমিত হয়ে পড়েছে। বস্তুত নগর ও সৌধ উজাড় হয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ও নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়েছে, আবাসভূমি ও গৃহ শূন্য হয়েছে এবং সাম্রাজ্য ও গোত্র দুর্বল হয়েছে। সমগ্র জনঅধ্যুষিত পৃথিবীই বদলে দিয়েছে। মনে হয় পূর্বাঞ্চলও এ মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তবে অবশ্যই তা পশ্চিমের তুলনায় জনবসতির অনুপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে। এটা এমনই অকল্পনীয় যে, মনে হয় যেন পৃথিবীর অস্তিত্বই নিজের বিনষ্ট ও সংকোচের দিকে আহ্বান জানিয়েছিল এবং সে নিজেই তাতে সাড়াও দিয়েছে। আল্লাহ্ই সমগ্র জগৎ ও তার অন্তর্গত সমুদয়ের উত্তরাধিকারী।

যখন এভাবে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, তখন মনে হয়, সৃষ্টিই যেন আমূল পরিবর্তিত হয়েছে এবং পৃথিবী তার ভিত্তিসহ পাল্টে গেছে। এটা যেন এক নবীন সৃষ্টি, ভিন্ন জীবন ও অভিন্ন জগৎ। সুতরাং এ যুগের জন্য এমন একটি ঐতিহাসিকের প্রয়োজন, যিনি সৃষ্টির সামগ্রিক অবস্থা, বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের বিবরণ, তাদের পরিবর্তিত অভ্যাস ও ধর্মমতের বর্ণনা দিতে গিয়ে মাসউদীর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন এবং তাঁর যুগের জন্য ইতিহাসের এমন একটি ভিত্তি প্রস্তুত করে যাবেন, যাতে তাঁর পরে আগমনকারী ঐতিহাসিকগণ তাকে অনুসরণ করে অগ্রসর হতে পারেন।

আমি আমার এ গ্রন্থে মাগরিব অঞ্চলের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে যতদূর সম্ভব বিশদভাবে অথবা তার বিবরণের সাথে সংশ্লিষ্ট আকারে ও ইঙ্গিতে উপরোক্ত বিষয়াদির আলোচনা করব। কেননা আমার ইচ্ছা, আমি এ গ্রন্থটিকে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল[১১৬] অপেক্ষা বিশেষ করে মাগরিবে জাতি ও গোত্রগুলোর অবস্থা এবং রাজ্য ও সাম্রাজ্যসমূহের বিবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। কারণ পূর্বাঞ্চলের জাতিগুলো ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান নেই এবং আমি তা যেভাবে বর্ণনা করতে মনস্থ করেছি, তাতে অপরের নিকট থেকে গৃহীত পরোক্ষ জ্ঞান কোন কাজে আসবে না। অবশ্য মাসউদীর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তাঁর গ্রন্থের বর্ণনা মতে তিনি এ উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তের অঞ্চল ও নগরগুলো ভ্রমণ করেছিলেন। তথাপি তিনি মাগরিব অঞ্চলের বর্ণনা করতে গিয়ে তার সামগ্রিক অবস্থা তুলে ধরতে পারেননি। একমাত্র তিনিই সকল জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী।[১১৭] আল্লাহ্ই সমুদয় জ্ঞানের শেষ

---

১১৬. কিন্তু কার্যত ইবনে খলদুন এ বক্তব্য অক্ষুণ্ণ রাখেননি। তিনি পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেছেন।

১১৭. কোরান ১২, ৭৬।

www.amarboi.org

আশ্রয়। মানুষ দুর্বল ও সীমাবদ্ধ এবং এ সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি নির্ধারণ অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্ যার সহায়তা করেন, তার পথ সুগম এবং তার উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে। গ্রন্থ রচনার যে উদ্দেশ্য আমার মনের মধ্যে পোষণ করছি, তার সফল বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ্র অপার সাহায্য প্রার্থনা করি। কারণ তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী ও পথপ্রদর্শক। তাঁরই উপর নির্ভর করছি।

প্রতিবর্ণীকরণ সমস্যা

শেষ করবার পূর্বে আরও একটি দায়িত্ব আমাদেরকে পালন করতে হবে। এখানে বর্তমান গ্রন্থে ব্যবহৃত অনারব ভাষার শব্দাবলির প্রতিবর্ণীকরণ সম্পর্কে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

এটা জ্ঞাত সত্য যে, আমাদের উচ্চারণে যে সকল বর্ণ ব্যবহৃত হয়, যেমন পরে এর বিশদ বিবরণ আসছে, মূলত কণ্ঠনালী নিঃসৃত ধ্বনিসমূহের বিচিত্র অবস্থা মাত্র। এ ধ্বনি কণ্ঠস্থিত আল জিহ্বা, মূর্ধা, জিহ্বার বিভিন্ন পার্শ্ব, দন্তমূল, এমন কি ওষ্ঠদ্বয়ের সাথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কম্পনের মাধ্যমে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে এবং শ্রবণে বিশ্লিষ্ট হয়ে ধরা দেয়। মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্য গঠনে আমরা এ সকল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধ্বনিই ব্যবহার করি। পৃথিবীর সকল জাতি একইভাবে এ সমস্ত বর্ণ উচ্চারণ করে না। অনেক জাতির মধ্যে এমন বর্ণ বিদ্যমান, যা অন্য জাতির মধ্যে নেই। পাঠক জানেন, আরবি ভাষাভাষীরা যে বর্ণসমষ্টি উচ্চারণ করে, তার সংখ্যা মাত্র আটাশ। হিব্রু ভাষায় এমন কিছু বর্ণ আছে, যা আমাদের ভাষায় নেই এবং আমাদের ভাষায় এমন কিছু বর্ণ আছে, যা তাদের ভাষায় নেই। এমনিভাবে অনারব ফিরিঙ্গী, তুর্কি, বারবার প্রভৃতি ভাষার কথা বলা যায়।

আরবের লিপিবিশারদগণ[১১৮] তাদের উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির প্রতিটির জন্য একটি ধ্বনি প্রতীক বা বর্ণলিপির জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন, যেমন আলিফ, বে, জিম, রে, তা ইত্যাদি আটাশটি বর্ণ। এর পর তাঁদের নিকট যখন এমন শব্দ এসে উপস্থিত হত, যার বর্ণের অনুরূপ বর্ণ তাঁদের ভাষায় নেই, তখন তাঁরা তাকে লিখতে বা বর্ণনা করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। অনেক সময় অনেক লিপিকর তাকে আমাদের নিজ ভাষার অনুরূপ বা প্রায় সমোচ্চারিত বর্ণের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এতে আগত বর্ণটির স্বরূপ প্রকাশিত হয়নি; বরং তার দ্বারা বর্ণটির মূল পরিচয় বিকৃত করা হয়েছে।

যেহেতু আমাদের এ গ্রন্থে বারবার ও অন্য অনেক অনারব জাতির বিবরণ প্রদান করা হবে, সেজন্য তাদের নাম ও শব্দাবলিতে আমরা এমন সমস্ত বর্ণের সম্মুখীন হব, যা আমাদের ভাষায় নেই। আমি এক্ষেত্রে আমাদের ধ্বনিসমষ্টির জন্য নির্ধারিত বর্ণ ব্যবহার করতে চাই না, বরং আগত বর্ণটিকে যথাসম্ভব তুলে ধরতে চাই। কারণ আমরা পূর্বেই

---

১১৮. মূলে 'আহলে কিতাব' শব্দটি আছে, এর অর্থ প্রাক্-ইসলামী, ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও হতে পারে। কেননা আরবিলিপি বহিরাগত। রোজেনথালও পাদটীকায় এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

www.amarboi.org

বলেছি যে, আমাদের বর্ণ ব্যবহারে আগত বর্ণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় না। এ উদ্দেশ্যে আমরা বর্তমান গ্রন্থে অনারব বর্ণসমূহকে উপস্থাপনের একটি বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছি। তা এ যে, আমাদের ভাষা থেকে উক্ত বর্ণের সাদৃশ্যযুক্ত দুটি বর্ণ গ্রহণ করা হবে এবং উভয়ের অংশবিশেষ ব্যবহার করে এমন নির্দেশ দেয়া হবে, যাতে পাঠক উক্ত দুটি বর্ণের মাঝামাঝি উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা আগত বর্ণটির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন।[১১৯]

আমি এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে গিয়ে কোরানের ধ্বনি ও পাঠবিশারদগণের গৃহীত পদ্ধতি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। তাঁরা অস্পষ্ট ধ্বনির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন; যেমন 'সেরা' শব্দ উচ্চারণে ইমাম খলফ[১২০] এর প্রথম 'সোয়াদ' বর্ণটিকে অনারব উচ্চারণের ধাঁচে 'সোয়াদ' ও 'যে' বর্ণ দুটির মাঝামাঝি উচ্চারণ করেছেন এবং লিপিতে এ উচ্চারণের পরিচয় দিতে গিয়ে 'সোয়াদ' বর্ণটির উপর 'যে' বর্ণের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ সংযোজন করেছেন। এর দ্বারা তিনি এ কথাই বোঝাতে চান যে, উক্ত বর্ণটি 'সোয়াদ' ও 'যে'-র মাঝামাঝি উচ্চারিত হবে। আমিও অনুরূপভাবেই আমাদের ভাষার দুটি বর্ণের সাহায্যে আগত বর্ণের ধ্বনিরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছি। যেমন বারবারদের দ্বারা উচ্চারিত 'কাফ'; তা আমাদের ভাষার 'কাফ' ও 'জিম' বা 'ক্বাফ' বর্ণের মাঝামাঝি উচ্চারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ 'বুলুক্কীন' শব্দটিকে নেয়া যায়। এর 'কাফ' বর্ণের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আমি আমাদের ভাষার 'কাফ' বর্ণটির নিচে 'জিম'-এর ফোটা বা এর উপরে 'ক্বাফে'-র দুই ফোটা অথবা উভয়টিই ব্যবহার করেছি। এর দ্বারা আমি বোঝাতে চেয়েছি যে, উক্ত বর্ণটি কাফ ও জিম যা ক্বাফের মাঝামাঝি উচ্চারিত হবে। এ বর্ণটিই বারবারদের ভাষায় অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা ছাড়া অন্যান্য যে সকল বর্ণ এসেছে, তাদের জন্যও আমি পূর্বোক্তভাবে আমাদের ভাষা থেকে দুটি বর্ণের ব্যবহার করে মাঝামাঝি উচ্চারণের নিদর্শন প্রস্তুত করেছি। যাতে পাঠক তা সহজে বুঝতে পারেন এবং যথার্থভাবে উচ্চারণ করেন। আমরা মূল অনারব বর্ণটির স্বরূপ রক্ষার্থেই এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। যদি এটা না করে আমরা তাকে আমাদের ভাষারই সাদৃশ্যমুক্ত কোন একক বর্ণের দ্বারা প্রকাশ করতাম, তাহলে আগত বর্ণটির পরিচয় বিকৃত করা হত মাত্র এবং এক ধ্বনিমূল থেকে অন্য ধ্বনিমূলে ঠেলে দেয়া হত। এ তত্ত্বটি বুঝে নেয়া দরকার। আল্লাহ্‌ই তাঁর অনুগ্রহে ও দয়ায় সত্যের দিকে নিয়ে যান।

---

১১৯. ইবনে খলদুনের বর্ণনায় বর্ণ ও ধ্বনির মধ্যকার পার্থক্য সর্বদা রক্ষিত হয়নি।

১২০. খলফ ইবনে হিশাম, সাতজন কোরান পাঠবিশারদ (ক্বারী)-এর অন্যতম; মৃত্যু ২২১ (৮৪৩/৪৪ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

প্রাথমিক বক্তব্য

জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে, ইতিহাস যথার্থ অর্থে মানুষের সামাজিক জীবন তথা মানব সভ্যতার বিবরণ দান করে। এটা সেই সভ্যতার প্রকৃতি গঠনে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন উপাদান যথা, বর্বরতা ও সামাজিকতা, গোত্রচেতনা ও মানুষের পারস্পরিক প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবহিত করে। অনুরূপ প্রচেষ্টা হতে উৎপন্ন রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য এবং বিভিন্ন পদমর্যাদা সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। মানুষ এভাবে তার পরিশ্রম ও কর্মের দ্বারা যে উপার্জন, জীবিকা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা অর্জন করে থাকে এবং এভাবে সভ্যতার প্রকৃতিগত আকর্ষণে যে নতুন নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তৎসমুদয় সম্পর্কেই ইতিহাস আলোচনা করবার প্রয়াস পায়।

সম্ভবত এ কারণেই অনুরূপ বিবরণ ও আলোচনায় মিথ্যা এসে মিশ্রিত হয়। বস্তুত এমন অনেক কারণ বিদ্যমান, যদ্দরুন মিথ্যাকে পরিহার করা আয়াসসাধ্য হয়ে উঠে। তার মধ্যে একটি হল, বিশেষ মত ও পথ সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব। মানুষের বিবেক যখন সংবাদ গ্রহণে সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে, তখন সে সংবাদটি সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। কিন্তু যখন তাকে কোন মত বা পথের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আচ্ছন্ন করে রাখে, তখন তার পক্ষে বিচার-বিবেচনার অবকাশ থাকে না, তার মনোঃপুত হলেই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে। এরূপ আচ্ছন্ন ভাব ও পক্ষপাতিত্ব অবশ্যই তার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণমূলক দূরদৃষ্টির জন্য প্রতিবন্ধকস্বরূপ। সুতরাং সে এর প্রভাবে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ও বিবরণ দানে বাধ্য হয়।

মিথ্যার অন্য একটি কারণ হল বর্ণনাকারীদের উপর অকুণ্ঠ নির্ভরতা। অবশ্য এ ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করতে হলে বর্ণনাসূত্রটির বিশ্বস্ততা ও দুর্বলতা পরীক্ষা করে দেখতে হয়।[১]

অনুরূপ আরও একটি কারণ, ঘটনা ও বিবরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীনতা। অনেক বর্ণনাকারীই তার দৃষ্ট ঘটনা বা শ্রুত বিবরণের উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হন না, ফলে তার নিজের ধারণা ও বিশ্বাস অনুসারে বিবরণ দিতে গিয়ে মিথ্যার কবলে পতিত হন।

---

১. ইতিহাস রচনার প্রাচীন পদ্ধতি ছিল ব্যক্তি পরম্পরায় গৃহীত ও শ্রুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। একে 'সনদ' বা সূত্র বলা হয়ে থাকে। এটা বিভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টি, সুতরাং এর যথার্থতা বিচার করতে হলে সূত্রান্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তির চরিত্র বিচার করতে হয়। ইবনে খলদুন একেই 'জরহ ও তাদিল' বলে উল্লেখ করেছেন।

www.amarboi.org

অন্য একটি হল, অহেতুক সত্য বলে ধারণা করা এবং এর উদাহরণ প্রচুর। এটা মূলত বর্ণনাকারীদের প্রতি দ্বিধাহীন নির্ভরতা থেকেই জন্মলাভ করে।

আরও একটি, সম্ভাব্য বাস্তবতার সাথে ঘটনার সামঞ্জস্য বিধানের অজ্ঞানতা। কারণ বহু ঘটনার বিবরণ বিকৃত ও অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে। অথচ বর্ণনাকারী তার আনুপূর্বিক বিবেচনা না করেই লিখে ফেলে। কিন্তু বিবরণটি এর ফলে সত্য হয় না, পূর্বানুরূপ মিথ্যাই থাকে।

আরও এ যে, মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অধিকারী লোকদের নৈকট্য লাভের জন্য প্রশংসা ও স্তুতি প্রয়োগ করে থাকে। এর দ্বারা তারা উক্ত ব্যক্তিবর্গের অসামান্যতা ও সুখ্যাতি প্রচার করতে প্রয়াস পায়। এর ফলে প্রকৃত বিবরণ অতিরঞ্জিত হয়ে অবাস্তব প্রচারণায় পরিণত হয়। মানুষ স্বভাবতঃই প্রশংসা কাতর, তারা পৃথিবীর দিকে অতিমাত্রায় আগ্রহী এবং তার মর্যাদা ও ঐশ্বর্যের জন্য একান্তভাবে লালায়িত। তাদের অধিকাংশই সদ্‌গুণের অনুশীলনে বিমুখ এবং সৎব্যক্তিদের প্রতিও অনুরূপভাবে উদাসীন।

ইতিহাসের বিবরণে মিথ্যার অনুপ্রবেশের আরও একটি অনিবার্য ও পূর্ববর্ণিত সকল কারণ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক কারণ হল, সভ্যতার অন্তর্গত বিভিন্ন অবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা। কারণ প্রতিটি ঘটনা, তা মৌল উপাদান অথবা প্রতিক্রিয়া—যার ফলেই উৎপন্ন হোক না কেন, তার সাথে এমন একটি প্রকৃতি বিদ্যমান, যা তাকে তার মৌল উপাদান এবং ক্রিয়াশীল অবস্থার সাথে বিশ্লিষ্ট করে দেয়। সুতরাং বিবরণের শ্রোতা যদি বস্তুজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করতে পারে; একমাত্র তাহলেই, তার পক্ষে বিবরণের যথার্থতা বিবেচনা করে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভব। বিচার-বিশ্লেষণে এ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন প্রক্রিয়া অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী হয়ে থাকে।

অনেক সময় শ্রোতৃবৃন্দ এমন অনেক অবাস্তব ঘটনার বিবরণ গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং তার বর্ণনাও দিয়ে থাকেন, যা একমাত্র তার বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার জন্যই সত্য বলে মনে হয়। যেমন মাসউদী আলেকজান্ডার সম্পর্কে একটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন। সম্রাট আলেকজান্ডার কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া নগরী নির্মাণের সময় একটি সামুদ্রিক জীব[২] এসে বাধার সৃষ্টি করত। তিনি তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাষ্টনির্মিত সিন্দুকের ভিতর রক্ষিত স্ফটিকের একটি আধারে নিজেকে আবৃত করে সমুদ্রে নিমজ্জিত হন এবং তার তলদেশে উপনীত হয়ে সেই ভয়ঙ্কর জীবটিকে দেখতে পান এবং তার চিত্র এঁকে নিয়ে আসেন। অতঃপর সেই চিত্র অনুসারে জীবটির ধাতব মূর্তি প্রস্তুত করিয়ে নির্মাণ কার্যের সম্মুখভাগে স্থাপন করেন। এর ফলে সেই জীবটি ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ভয়ে পালিয়ে যায় এবং নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়।

---

২. তা একটি সর্প বা ড্রাগন।

www.amarboi.org

বিচিত্র অবাস্তব উপাদানের মিশ্রণে রচিত সে এক দীর্ঘ কাহিনী এবং নানা কারণে তা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য। বলা হয়েছে যে, সম্রাট একটি স্ফটিকের সিন্দুকে নিজেকে আবৃত করে এবং সমুদ্রের তরঙ্গমালাকে উপেক্ষা করে তাতে নিমজ্জিত হন। বস্তুত এটা কোন সম্রাটের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সম্রাটগণ অনুরূপ বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করতে কখনও এগিয়ে আসেন না। যদি কেউ এরূপ করেন, তাহলে তিনি নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনবেন, প্রজাবৃন্দকে বিদ্রোহ করতে উৎসাহ দিবেন এবং তাঁর পরিবর্তে অন্যকে সিংহাসনে আরোহণের আহ্বান জানাবেন। কেননা এভাবে নিমজ্জন তাঁর ধ্বংসেরই নামান্তর। প্রজাবৃন্দ এ ব্যাপারে এত সুনিশ্চিত যে, তারা তাদের সম্রাটের সেই বিপজ্জনক অভিযান থেকে ফিরে আসার জন্য মুহূর্তকালও অপেক্ষা করবে না।

অন্যদিকে জিন, দৈত্য, পরীদের নির্দিষ্ট কোন আকার-আকৃতি আছে বলে জানা যায় না। বরং তারা ইচ্ছামত যে-কোন আকার ধারণ করতে পারে। আর তাদের একাধিক মস্তকের কথা যা বলা হয়েছে, তার দ্বারা তাদের ভয়ঙ্করতা ও জঘন্যতাই বোঝায়, বাস্তব অবস্থা নয়।

এ সকল দিক ঘটনাটির অবাস্তবতাই প্রমাণ করে। তদুপরি তাতে জীবের অস্তিত্ব বিনষ্টকারী এমন এটি উপাদান বিদ্যমান, যা কাহিনীর অসম্ভাব্যতা পূর্বোক্ত সকল যুক্তি অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট করে তোলে। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ স্ফটিকের সিন্দুকে ঢুকে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, তাহলে সে অচিরেই স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় বায়ুর অভাববোধ করবে এবং তার আত্মা[৩] উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি তার ফুসফুস ও হৃদশক্তি পরিচালনার উপযুক্ত শীতল বায়ুর অভাবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে। এ কারণেই তপ্তজলের স্নানাগারে আবদ্ধ অবস্থায় শীতল বায়ুর অভাবে বহুলোকের মৃত্যু ঘটে থাকে। এভাবে গভীর কূপ ও গর্তাদিতে অবতরণকারী ব্যক্তিরা বিপদের সম্মুখীন হয়। সেখানকার আবদ্ধ বায়ু দুর্গন্ধে উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং বাইরের বায়ু প্রবেশ করে তাকে পরিবর্তিত করতে না পারায় সেই মুহূর্তে তাদের মৃত্যু ঘটে। অনুরূপভাবে জল থেকে বাইরে আগত মৎস্যাদির মৃত্যু হয়। কারণ স্থলভাগের উত্তপ্ত বায়ু তার ফুসফুস সহ্য করতে পারে না। জলে সে শীতল বায়ু সেবন করেছে এবং তাতেই সে অভ্যস্ত। এখন যেখানে সে এসেছে, তার উত্তপ্ত বায়ু জীবনশক্তি[৪]কে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আকস্মিক মৃত্যু ও অনুরূপ অন্যান্য মৃত্যুর মধ্যে এ সকল কারণ বিদ্যমান।

অসম্ভাব্য বিবরণের মধ্যে মাসউদী বর্ণিত আরও একটি বিবরণ হল এক প্রকার ময়না পাখির প্রতিমূর্তির গল্প। এ প্রতিমূর্তিটি রোমে অবস্থিত। বছরের নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যের সমস্ত ময়না জলপাই বহন করে তার চারদিকে সমবেত হয় এবং রোমবাসীগণ

---

৩. মূলে 'রুহ' শব্দটি আছে। কিন্তু একটু পরেই তা কখনও হৃদশক্তি; কখনও জীবশক্তিতে পরিণত হয়েছে।

৪. গ্রিক জালিনুস (গ্যালেন) ও মুসলিম চিকিৎসাশাস্ত্রবিদদের মতে তা হৃদযন্ত্রের বাম গর্ত হতে উৎপন্ন হয়।

www.amarboi.org

এ জলপাই থেকে তৈল সংগ্রহ করে। লক্ষ করুন, তৈল সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া থেকে তা কতই না অসম্ভব ও অবাস্তব!

অনুরূপ অসম্ভাব্য কাহিনীর মধ্যে আল বকরী বর্ণিত 'তোরণ নগরী'[৫]র বর্ণনাকে ধরা যায়। এটা ত্রিশ দিন ভ্রমণযোগ্য দূরত্বের তুল্য বিস্তৃত ও দশ সহস্র তোরণের অধিকারী। নগরী নির্মাণের উদ্দেশ্যে দুর্গাদির দ্বারা সুরক্ষিত অঞ্চল গড়ে তোলা, যেমন সম্মুখে এর বর্ণনা আসবে; কিন্তু উপরোক্ত নগরী এরূপ সুরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ তাকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও দুর্গাদির দ্বারা সুরক্ষিত কিছুতেই সম্ভব নয়।

অনুরূপ আরও একটি মাসউদী বর্ণিত 'তাম্র নগরী'। এটা সিজিলামাসার প্রান্তরে শুধুমাত্র তাম্র ধাতুর দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। মুসা ইবনে নুসাইর[৬] মাগরিব অভিযানে তা অধিকার করেন। উক্ত নগরীর সমস্ত তোরণ অর্গলাবদ্ধ। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবার জন্য তার সোপান অতিক্রম করে প্রাচীরে উঠে, সে হাততালি দিতে দিতে নিম্নে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর ফিরে আসে না, এটাও গল্পকারদের রূপকথা তুল্য অবিশ্বাস্য। সিজিলামাসার সমগ্র প্রান্তর পর্যটক ও পথপ্রদর্শকরা ভ্রমণ করেছেন। তাঁরা কোথাও অনুরূপ কোন নগরীর সন্ধান পাননি। তদুপরি এতে বর্ণিত সকল অবস্থাই বিরোধী এবং কোন নগরীর নির্মাণ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যবিহীন। অন্যদিকে ধাতব পদার্থের সম্ভাব্য পরিমাণ তৈজসপত্র ও গৃহাদির আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে; কিন্তু তদ্বারা কোন নগরীর সমুদয় নির্মাণকার্য সম্পন্ন করা, পাঠক নিশ্চয় লক্ষ করবেন, সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অকল্পনীয়।

এ ধরনের উদাহরণ প্রচুর। এদের বিচার-বিশ্লেষণের জন্য সভ্যতার প্রকৃতি সম্পর্কীয় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বস্তুত বিচারের ক্ষেত্রে উক্ত জ্ঞানের প্রয়োগ সর্বোত্তম ও নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া। তার দ্বারা অতি সহজে বিবরণের বিশ্লেষণ করে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণ করা যায়। বর্ণনার সূত্র বিচার অপেক্ষাও এটা কার্যকরী। কারণ, সূত্র বিচারের পূর্বেই দেখতে হবে ঘটনাটি সম্ভব কিংবা অসম্ভব। যদি অসম্ভব হয়, তাহলে সূত্রান্তর্গত ব্যক্তিচরিত্র বিচার করবার প্রয়োজন নেই। সে বিবরণের বিষয় বাহ্যিক অর্থেই অসম্ভব এবং এর তাৎপর্য বুদ্ধির অগম্য, বিশেষজ্ঞগণ তাকে সর্বদাই সন্দেহযুক্ত বলে গণ্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিবরণাদির বিশুদ্ধি নির্ণয়ে সূত্র বিচারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কারণ ধর্মের সমুদয় অংশই পালনীয় বিধিনিষেধের সমষ্টি। ধর্মপ্রবর্তক তাকে অবশ্য কর্তব্যরূপে প্রচার করেছেন। সুতরাং সূত্র বিচার করে তার সত্যতা যাচাই করে নেয়া দরকার। বর্ণনাকারীদের ন্যায়নিষ্ঠা ও গ্রহণ শক্তির ভিত্তিতেই উক্ত সত্যতা নির্ধারিত হতে পারে।

কিন্তু ঘটনাবলির বিবরণের ক্ষেত্রে তার বিষয়বস্তুর বাস্তবানুগ সত্যতা ও বিশুদ্ধতা প্রয়োজন। এ কারণে এর সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ সূত্র বিচার অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্যতা বিচারের অধিকার

৫. মাসউদীর বর্ণনায় তা একটি গ্রামের নাম। অন্যত্র 'ব্রোঞ্জ নগরী' বলেও উল্লেখিত হয়েছে।
৬. মহান সেনাপতি, যিনি মুসলমানদের পাশ্চাত্য বিজয় সমাপ্ত করেন। জীবনকাল (৬৪৩-৭১৬/১৭ খ্রি:)।

www.amarboi.org

আমাদের নেই, তার সূত্র বিচার করেই তার সত্যতা জেনে নিতে হয়। কিন্তু ঘটনাবলির বিবরণ অনুরূপ নয়, তার বাস্তবানুগ সম্ভাব্যতার দ্বারাই তার গ্রহণ বর্জন নির্ধারণ করতে হবে।

অবস্থা যদি এ হয়, তাহলে বিবরণের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতার ভিত্তিতে আমাদিগকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করতে হবে। এর জন্য মানুষের সামাজিক জীবন তথা, মানব সভ্যতার দিকে আমাদেরকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং তার সত্তাগত ও প্রকৃতিগত, সম্ভাব্য বহিরাগত ও অসম্ভাব্য অনাগত অবস্থাসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। আমরা যদি এটা করতে পারি, তাহলে বিবরণের বাস্তবতা, সম্ভাব্যতা, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণের জন্য এমন একটি স্বাভাবিক নিয়ম আমাদের আয়ত্তে এসে পড়বে, যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এর পর যখনই আমরা মানব সভ্যতার বিভিন্ন ঘটনাবলির বিবরণ শুনতে পাব, তখন যথার্থই তাদের গ্রহণ-বর্জন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমর্থ হব। আমরা এর মধ্য দিয়ে এমন একটি যথার্থ মাপকাঠি নির্ধারণ করতে সক্ষম হব, যদ্বারা ঐতিহাসিকগণ তাঁদের গৃহীত বিবরণে সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারবেন। আমাদের প্রথম গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য এটাই।

এটা যেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়। এর আলোচ্য একটি, তাহল মানব সভ্যতা ও মানুষের সামাজিক আচরণ। এর সমস্যা বহু—তাহল মানব সভ্যতার সত্তাগত ও বহিরাগত অবস্থানসমূহের পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার অবস্থাই এ, সে শাখা প্রথাগত হোক বা চিন্তাগত হোক।

জানা প্রয়োজন যে, এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত আলোচনা বিষয়ের দিক থেকে অভিন্ন, অসাধারণ ও অত্যন্ত উপকারী। এতে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের অবকাশ অতিশয় অধিক। এটা বাগ্মিতা[৭] নয়, যা যুক্তিবিদ্যার একটি শাখা মাত্র এবং যাতে অমোঘ অব্যর্থ শব্দাবলি চয়ন করে জনসাধারণের মতকে কোন বিশেষ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট অথবা বিশ্লিষ্ট করে তোলা হয়। এটা পৌরবিজ্ঞানও নয়, কারণ পৌরবিজ্ঞানের দ্বারা কোন আবাসস্থল বা নগরীর জীবনধারাকে সুশৃঙ্খল মার্জিত করে তোলা হয়। যাতে সাধারণ মানুষ এমনভাবে জীবনযাপন করতে পারে, যেন তদ্বারা তাদের অস্তিত্ব স্থিতিশীল ও সংরক্ষিত হয়। উক্ত দুটি বিষয়ের কোনটির সাথে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মিল নেই, যদিও বিষয়বস্তুর দিক থেকে অনেক সময় অনুরূপ বলে মনে হতে পারে।

নানা কারণে এটা একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। কিন্তু আমি এ বিষয়ের আলোচনা কোথাও খুঁজে পাইনি। জানিনা, এটা কি তাঁদের উদাসীনতার ফল কিংবা এ ব্যাপারে তাঁদের কোন ধারণাই ছিল না; অথবা হয়ত তারা এ বিষয় নিয়ে প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু আমাদের নিকট তা এসে পৌঁছায়নি। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়াদির সীমা পরিসীমা নেই এবং মানব সমাজে জ্ঞানীগুণীর সংখ্যাও অপরিমিত। আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে যা পেয়েছি, অপ্রাপ্তির পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক বেশি। পারসিকদের সেই জ্ঞান কোথায়, যা পারস্য বিজয়কালে হজরত উমর (রাঃ) নিশ্চিহ্ন করে দিতে বলেছিলেন।[৮]

---

৭. মূলে আছে 'ইলমুল খেতাবা'।

৮. হজরত উমরের এই নির্দেশের কথা পরে পুনরায় বর্ণিত হয়েছে।

www.amarboi.org

কোথায় কেলাদিয়ান, সিরিয়ান ও ব্যাবিলনবাসীদের জ্ঞানের ঐতিহ্য! তাদের মধ্যে তার যে নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, যে ফলশ্রুতি ঘটেছিল, তা কোথায় বিলুপ্ত হল। কোথায় গেল কিবতী ও তাদের পূর্ববর্তীদের জ্ঞানের ঐশ্বর্য! আমাদের নিকট শুধু একটি জাতির জ্ঞান-গুণই এসে পৌঁছেছে, তাঁরা হলেন গ্রিক। এটাও সম্ভব হয়েছে সম্রাট মামুনের জন্য। তিনি কষ্ট স্বীকার করে, বহু লোককে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে এবং বহুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তা সম্ভব করে তুলেছিলেন। কিন্তু এ একটি জাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতির জ্ঞানের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

যেহেতু প্রতিটি তাত্ত্বিক বিকাশ প্রকৃতির দিক থেকে নিজের সত্তার সাথে কিছু পরিমাণ বহিরাগত উপাদান বহন করে, সেই জন্য প্রতিটি বোধগম্য তত্ত্বকে আলোচ্য বিষয় হিসাবে গণ্য করা উচিত। কিন্তু জ্ঞানীগণ সম্ভবত তার ফলাফলের দিকে লক্ষ করেছেন। আর ফলাফল বলতে, পাঠক যেমন লক্ষ করেছেন, ঘটনার বিবরণ মাত্র। কারণ এর আলোচ্য সমস্যাগুলো যদিও সত্তাগত ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি তার ফলশ্রুতি যেহেতু বিবরণাদির বিশুদ্ধিকরণ মাত্র, সেজন্য তাকে দুর্বল মনে করে তাঁরা পরিত্যাগ করেছেন। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা। 'তোমাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দান করা হয়েছে।'[৯]

যে বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাতে এমন সকল সমস্যা বিদ্যমান, যা সাধারণভাবে জ্ঞানীরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট আলোচনায় প্রমাণসহ উল্লেখ করেছেন। বিষয় ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে এ সকল সমস্যার সাথে তাঁদের বর্ণিত সমস্যার মিল আছে। যেমন নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করতে গিয়ে জ্ঞানী-গুণীরা উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ যেহেতু তাদের অস্তিত্বের জন্য পরস্পরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী, সেজন্য তারা একজন বিচারক ও শৃঙ্খলা বিধায়কের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যেমন শাস্ত্রীয় আইনের সূত্র আলোচনায় ভাষার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা বলেন, মানুষ স্বভাবতঃই পরস্পরের সাহায্য প্রাপ্তি ও সমাজজীবন যাপনের জন্য নিজের মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করে এবং এর সাহায্যে তাদের জীবনযাত্রা সাবলীল হয়ে উঠে। যেমন, ধর্মশাস্ত্রবিদরা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, ব্যভিচার বংশধারা নষ্ট করে এবং মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে। অনুরূপভাবে হত্যাকাণ্ডও অস্তিত্ব বিনষ্টকারী। উৎপীড়ন সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে ও মানুষের অস্তিত্ব দুর্বল করে ফেলে। এ ধরনের আরও বহু শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের উদ্দেশ্য তাঁরা বর্ণনা করে থাকেন। এ সকল বর্ণনার প্রত্যেকটিই সভ্যতার সংরক্ষণ ও শৃঙ্খলা বিধানে নিয়োজিত হয়। এ কারণেই তার দৃষ্টি সভ্যতার ক্রিয়াশীল উপাদানের উপর নিপতিত হয়ে থাকে। এ সকল তুলনীয় সমস্যার আলোচনায় এ গ্রন্থে নিয়োজিত আমাদের বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এভাবে পৃথিবীর বিচক্ষণ জ্ঞানীদের বিচ্ছিন্ন বক্তব্য থেকেও আমরা এ সকল সমস্যার উপর আলোকপাত ঘটতে দেখি, যদিও তাঁরা তা সম্পূর্ণ করেনি। যেমন মাসউদী

৯. কোরান, ১৭, ৮৫।

www.amarboi.org

মোবেজানের[১০] বাণীর উল্লেখ করেছেন, তিনি পেচকের কাহিনীতে সম্রাট বাহ্‌রাম ইবনে বাহ্‌রামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "হে সম্রাট। যে-কোন রাজ্যের সম্মান তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন তা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে তাঁর উপাসনা ও বিধি-নিষেধের সাহায্যে পরিচালিত হয়। আবার রাজ্যের সাহায্য ব্যতীত আল্লাহ্‌র ধর্মও স্থিতি লাভ করে না। অন্যদিকে রাজ্যের সম্মান লাভও মানুষ ছাড়া হয় না। মানুষের সাহায্য পেতে হলে সম্পদের প্রয়োজন। সম্পদ সমৃদ্ধি ব্যতীত লাভ হয় না। সমৃদ্ধি ন্যায়বিচারের মুখাপেক্ষী। ন্যায় বিচার এমন একটি তুলাদণ্ড, যা স্বয়ং প্রভু মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তার জন্য একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করে দিয়েছেন—তিনিই সম্রাট।'

যেমন এরই অনুরূপ সম্রাট নওশেরোয়াঁর[১১] বাণী—'সৈনদল ছাড়া রাজ্য হয় না। সম্পদ ছাড়া সৈন্যদল গড়ে উঠে না। সম্পদের জন্য রাজস্বের প্রয়োজন আর রাজস্বের জন্য সমৃদ্ধির। সমৃদ্ধি আসে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায় কর্মচারীদের উন্নতিবিধানে। কর্মচারীদের উন্নতি মন্ত্রীদের দায়িত্ব পালনের উপর নির্ভরশীল। আবার সকল কিছু নির্ভর করে সম্রাটের স্বচক্ষে প্রজাদের অবস্থা পরিদর্শন ও তাদেরকে শিক্ষাদানের উপর। এর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে শাসন করেন, নতুবা তারা সম্রাটকে শাসন করে থাকে।'

এরিস্টটলের নামে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে পুস্তকটি সকলের মধ্যে পরিচিত,[১২] তাতে এ প্রসঙ্গে একটি ভাল আলোচনা বিদ্যমান। যদিও তিনি তাকে পূর্ণতা দেননি ও যথাযোগ্য প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত করেননি। তদুপরি তার সাথে অন্য বিষয়ও মিশ্রিত রয়েছে। তিনি উক্ত গ্রন্থে ঐ সকল বাণীর তুল্য বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা আমরা মোবেজান ও নওশেরোয়াঁ থেকে উদ্ধৃত করেছি। তিনি ঐ বক্তব্য একটি অদ্ভুত বৃত্তের মধ্যে দীর্ঘায়িত করেছেন। তাঁর বক্তব্যটি এ—'পৃথিবী একটি উদ্যান, তার বেষ্টনী রাজ্য। রাজ্য একটি শক্তি, যদ্দারা জীবনধারণ প্রণালী নির্ধারিত হয়। জীবনধারণ প্রণালী একটি শাসনব্যবস্থা, যা সম্রাট প্রবর্তন করে থাকেন। সম্রাট একটি শৃঙ্খলা, যা সৈন্যদল রক্ষা করে। সৈন্যদল একটি সহায়তা, যা সম্পদ দ্বারা অর্জিত হয়। সম্পদ একটি আহার্য, যা প্রজাকুল সঞ্চয় করে। প্রজাবৃন্দ একটি দাসত্ব, যা ন্যায়বিচার প্রতিপালন করে। ন্যায়বিচার একটি ঐক্য, যদ্দারা পৃথিবী স্থিতিশীল হয়। পৃথিবী একটি উদ্যান' ... পুনরায় শুরু থেকে বাক্যগুলো আবর্তিত হতে থাকে।

এ সেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচক্ষণতার পরিপূর্ণ আটটি বাক্য, যা পরস্পর, পরস্পরের সাথে গ্রথিত। পুচ্ছের সাথে তার শীর্ষকে মিলিয়ে এমন একটি বৃত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে, যার প্রান্তদেশ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুরূপ বক্তব্যের অব্যর্থতা ও তার ব্যাপক উপকারিতা সম্পর্কে কথক গৌরব বোধ করতে পারেন।

---

১০. শব্দটি বহুবচন, একবচন 'মোবেজ' পারসিক পুরোহিতের উপাধি।

১১. বিখ্যাত সাসানী সম্রাট প্রথম খসরু (৫৩১-৫৭৯ খ্রি:)।

১২. পুস্তকটির নাম 'সিক্রেটাম সিক্রেটোরাম।' তার তৃতীয় অধ্যায়ে ন্যায়পরায়ণতা বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত অনুচ্ছেদটি বিদ্যমান।

www.amarboi.org

পাঠক! আপনি যখন বর্তমান গ্রন্থের রাষ্ট্রশক্তি ও সাম্রাজ্য অধ্যায়ে আমাদের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দিবেন এবং যথাযোগ্য বিবেচনার সাথে বুঝতে চেষ্টা করবেন, তখন দেখতে পাবেন যে, আমরা এ বাক্যগুলোর ব্যাখ্যাই সেখানে তুলে ধরেছি। এখানে যা সংক্ষিপ্ত ছিল, তাকেই আমরা পরিপূর্ণ বিশদ বর্ণনা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির দ্বারা বিশ্লেষণ করেছি। এরিস্টটলের শিক্ষা ও মোবেজানের উপদেশ ছাড়াই আল্লাহ্ আমাদেরকে এটা দান করেছিলেন।

পাঠক! এরূপ আপনি ইবনে আল-মুকাফ্ফার[১৩] আলোচনাতেও দেখতে পাবেন। তিনি তাঁর পুস্তকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কীয় আমাদের গ্রন্থের অনুরূপ অনেক বক্তব্যই তুলে ধরেছেন। কিন্তু আমরা যেভাবে তাকে প্রমাণ সহযোগে বর্ণনা করেছি, তিনি তা করেননি। তিনি এ সকল বক্তব্যকে মনোজ্ঞ বর্ণনা ও আলংকারিক বাণীর নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

এভাবে কাজী আবু বকর আত্তারতুশী[১৪] তার 'সিরাজুলমুলক' নামক গ্রন্থেও আমাদের অনুরূপ বিষয় আলোচনা করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থকে যে সকল অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন এবং যে সকল সমস্যা আলোচনা করেছেন, তাও আমাদের গ্রন্থের সাথে তুলনীয়। কিন্তু তিনি যথার্থই এরূপ উদ্যোগের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বুঝতে পারেননি এবং সমস্যার সম্পূর্ণ বিবরণ দান ও প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠিতকরণের চেষ্টাও করেননি। একটি সমস্যার জন্য অধ্যায়ের সূচনা করেই তিনি তাতে প্রচুর পরিমাণে হাদিস ও মহাজনবাণী উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে পর্যায়ক্রমে পারসিক জ্ঞানী যেমন বরজসমেহের[১৫] মোবেজান; ভারতীয় জ্ঞানী, দানিয়াল ও হারমিশ থেকে বর্ণিত বাণী এবং পৃথিবীর অন্যান্য জ্ঞানীগুণীদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু সমস্যাটিকে বিশ্লেষণের দ্বারা পরিস্ফুট এবং স্বাভাবিক প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেননি। তা শুধুই পর্যায়ক্রমিক বিবরণ, যা ধর্মীয় উপদেশের সাথে তুলিত হতে পারে। যেন তিনি উদ্দেশ্য স্থির করেছিলেন, কিন্তু তা পূর্ণ করেননি, তাঁর ইচ্ছাকে পরিস্ফুট করেননি এবং তাঁর সমস্যাবলিকে পূর্ণতা দিতে চাননি।

কিন্তু আমরা এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্র অনুগ্রহে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাঁর অশেষ জ্ঞানের দয়ায় আলোচ্য বিষয়ের সত্যতা উদ্ঘাটন করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। যদি তার সমস্যাগুলোকে পূর্ণতা দান করে থাকতে পারি, যদি অন্যান্য শিল্পবিদ্যা থেকে তার পার্থক্যকে বিশদাকারে পরিস্ফুট করে থাকতে পারি, তাহলে তা আল্লাহ্র দান ও তাঁর পথ নির্দেশ। কিন্তু যদি তা না হয়ে আমার বিচ্যুতি ঘটে থাকে, যদি তার সমস্যাগুলো বর্ণনায় শিথিলতা ও অন্যায্যতা কিছু এসে থাকে, তবে বিচক্ষণ সমালোচকের নিকট অনুরোধ, তিনি যেন তা পরিশুদ্ধ করেন। অবশ্য তথাপি প্রথম অভিযাত্রীর গৌরব

---

১৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে আলা মুকাফ্ফা, মৃত্যু ৪১২ (৭৫৯/৬০ খ্রি:) হি:।

১৪. মুহম্মদ ইবনে আল ওলিদ। জীবনকাল ৪৫১-৫২০/২৫ (১০৫৯-১১২৬/৩১ খ্রি:) হি:।

১৫. সম্রাট নওশেরোয়াঁর মন্ত্রী।

www.amarboi.org

আমারই থাকবে, কেননা আমিই এর পথ প্রদর্শক। বস্তুত আল্লাহ্ তাঁর আলোর দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করে থাকেন।[১৬]

এখন আমরা এ গ্রন্থে মানুষের সামাজিক জীবনে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা তুলে ধরব। এর রাজ্য, উপার্জন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকর্ম প্রভৃতিকে এমনভাবে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করব, যাতে সাধারণ ও বিশেষের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠে এবং সকল প্রকার দ্বিধা সন্দেহ দূরীভূত হয়। আমাদের বক্তব্য:

মানুষ কতিপয় বিশেষ গুণের দ্বারা সমগ্র প্রাণিজগতে বিশিষ্ট হয়ে আছে। এর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা তাদের চিন্তার ফসল। এর দ্বারা তারা অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। তাদের গুণাবলির মধ্যে অন্য একটি হল একজন শৃঙ্খলা বিধায়ক ও শক্তিধর শাসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব। এটা ব্যতীত যেমন তাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ সম্ভব নয়, তেমনি এ অনুভবের সাথে অন্য কোন প্রাণীর মিল নেই। অবশ্য মধুমক্ষিকা ও পঙ্গপালের ব্যাপারে অনুরূপ গুণের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অনুরূপ হলেও তা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না মাত্র, চিন্তা ও মননের ফসল নয়। উপরোক্ত গুণাবলির মধ্যে জীবিকার অন্বেষণ এবং তা করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উপায় উপকরণের সদ্ব্যবহার করে থাকে। যেহেতু আল্লাহ্ তাদেরকে জীবনধারণ ও সংরক্ষণের জন্য আহার্যের মুখাপেক্ষী করেছেন এবং তার অন্বেষণ ও উপার্জনের পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন; সুতরাং তাঁর বাণী : আল্লাহ্ প্রতি বস্তুকে তার সৃজন স্বভাব দান করে পুনরায় পথ নির্দেশ করেছেন।[১৭] উক্ত গুণাবলির মধ্যে সভ্যতার সৃষ্টি। তার অর্থ প্রতিবেশীর সদ্ভাব ও সহযোগিতার মাধ্যমে জীবনধারণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের উদ্দেশ্যে কোন নগর বা সংরক্ষিত অঞ্চলে একত্র বসবাস করা। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই জীবিকার জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আমরা এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করব। আবার এ সভ্যতার একটি অংশ হল যাযাবরী জীবন। দূর প্রান্তদেশীয়, পার্বত্য, বালুকাময় ও দুর্গম প্রান্তরস্থ সংরক্ষিত চারণভূমি অঞ্চলে এ ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এরই অন্য একটি অংশ নাগরিক জীবন, যা নগর, গ্রাম, শহর ও পল্লীতে দুর্গাদি ও প্রাচীরবেষ্টিত হয়ে লীলায়িত হয়। যাহোক তার জন্য এ প্রতিটি অবস্থাতেই এমন কিছু বিষয় বিদ্যমান, যা সমাজবদ্ধতার দিক থেকে সত্তাগতভাবে তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এ কারণে বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়সমূহকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা দূষণীয় হবে না বলে মনে করি।

প্রথম : সামগ্রিক মানব সভ্যতা, তার বিভিন্ন অংশ ও তৎসংশ্লিষ্ট ভূ-ভাগ।
দ্বিতীয় : যাযাবরী সভ্যতা, গোত্রসমূহ ও বর্বর জাতিগুলোর বিবরণ।
তৃতীয় : সাম্রাজ্য, খেলাফত, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রশক্তির বিভিন্ন পদমর্যাদার বর্ণনা।
চতুর্থ : নাগরিক সভ্যতা, নগর ও দেশসমূহ।
পঞ্চম : শিল্পকলা, জীবিকা এবং তৎসমুদয় অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি।
ষষ্ঠ : জ্ঞান-বিজ্ঞান, তার অর্জন ও শিক্ষাদান।

---

১৬. কোরান ২৪, ৩৫।
১৭. কোরান ২০, ৫০।

www.amarboi.org

আমি যাযাবরী সভ্যতাকেই প্রথমে বর্ণনা করেছি, কারণ তাই সকলের অগ্রগামী। আমরা পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করব। অনুরূপভাবে নগর ও দেশসমূহের পূর্বে রাষ্ট্রের বর্ণনা এসেছে। অবশ্য জীবিকার বর্ণনা পূর্বে আসবার কারণ এ যে, জীবিকা স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় বিষয় এবং জ্ঞানার্জন পরিপূর্ণতা ও প্রয়োজনের সৃষ্টি। স্বাভাবিক প্রয়োজন সর্বদাই সৃষ্ট প্রয়োজন অপেক্ষা অগ্রগামী। উপার্জনের সাথে শিল্পকলাকে এনেছি এজন্য যে, তা কোন কোন দিক থেকে এবং সভ্যতার প্রয়োজনে উপার্জনের মাধ্যম। পরে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। আল্লাহ্ ঠিক পথের সহায় ও সাহায্যকারী।

www.amarboi.org

প্রথম অধ্যায়

সমগ্র মানব সভ্যতা এবং
তৎসংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রস্তাবনা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রথম প্রস্তাবনা

মানুষের জন্য সামাজিক জীবন অত্যাবশ্যকীয়। জ্ঞানীগণ এ প্রয়োজনকে লক্ষ করেই বলেছিলেন, মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক জীব। অর্থাৎ তার জন্য সমাজবদ্ধতা, যাকে তাদের পরিভাষায় নাগরিকত্ব[১] বলা হয়, তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর সভ্যতার অর্থও এটাই। এর বর্ণনা এ যে, পবিত্র আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং এমন একটি আকৃতি দান করেছেন যে, তার জীবনধারণ ও সংরক্ষণ আহার্য ব্যতীত সম্ভব নয়। আল্লাহ্ যদিও স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে উক্ত আহার্য অন্বেষণের পথ নির্দেশ এবং তা লাভ করবার শক্তি প্রদান করেছেন, তথাপি কোন একজন মানুষের পক্ষে একা তার প্রয়োজনীয় ও জীবনধারণ উপযোগী আহার্য সংগ্রহ করা একান্তই অসম্ভব। যত সামান্য আহার্যের কথাই ধরা যাক না কেন, যেমন একদিনের আহারোপযোগী গম, তাও তাকে পেষণ, মন্থন, রন্ধন প্রভৃতি একাধিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পেতে হবে। আবার উক্ত প্রত্যেকটি কার্যের জন্য নির্দিষ্ট যন্ত্রের সাহায্য নেয়া দরকার এবং এ সকল যন্ত্র কর্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার প্রমুখ শিল্পীর শিল্পকর্ম ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়। ধরে নেয়া হোক যে, ঐ ব্যক্তি উক্তরূপ প্রস্তুতি ছাড়াই শুদ্ধ গম চিবিয়ে খাবে, তবুও তাকে তা পেতে হলে উপরোক্ত কার্যাদি অপেক্ষাও অধিক কার্যের শরণাপন্ন হতে হবে। তজ্জন্য বীজ বপন, শস্যকর্তন, শীষ সংযুক্ত খোসা থেকে মর্দনের সাহায্যে গমের পৃথকীকরণ ইত্যাকার নানাবিধ কাজ এবং এ সকল কাজ করতে পূর্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রপাতি ও শিল্পকর্মের প্রয়োজন দেখা দিবে। যে-কোন একজন মানুষের পক্ষে এ সমস্ত কাজের সমুদয় বা তার কতকাংশও সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং বাধ্য হয়ে তাকে জনশক্তির সম্মিলন ঘটাতে হবে এবং তার মাধ্যমে নিজের ও অন্যানের আহার্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। পরস্পরের এরূপ সহযোগিতায় শুধু তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় আহার্যই উৎপাদন করবে না, বরং প্রাচুর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

অনুরূপভাবে প্রতিটি মানুষ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যও স্বজাতির সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। কারণ, পবিত্র আল্লাহ্ যখন প্রাণিকুলকে প্রকৃতির দ্বারা সুসজ্জিত করলেন এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনে উদ্যোগী হলেন, তখন বহু ভাষাহীন প্রাণী তাঁর নিকট থেকে মানুষ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা লাভ করল। যেমন একটি অশ্বের শক্তি

---

১. মূলে আছে 'মদিনিয়াতন'; এটা হতেই 'তামাদ্দুন' শব্দের উৎপত্তি। কারণ সভ্যতার সাথে নগরজীবনের সম্পর্ক অতি গভীর।

www.amarboi.org

মানুষের শক্তি অপেক্ষা অনেকগুণ বেশি। অনুরূপভাবে গাধা ও গরুর শক্তি। সিংহ ও হাতির শক্তির আরও বহুগুণ অধিক। জীবের মধ্যে আক্রমণ করার স্বভাব যেহেতু প্রকৃতিদত্ত, সেজন্য প্রত্যেককে আল্লাহ্ এমন একটি অঙ্গ দিয়েছেন, যদ্বারা সে অপর জীবের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। এর পরিবর্তে মানুষকে দিয়েছেন চিন্তা করবার শক্তি ও হাত। চিন্তার নির্দেশে হাত বিচিত্র শিল্পসম্ভার গড়ে তুলতে সক্ষম। আর সেই শিল্পই তাকে দিয়েছে অজস্র হাতিয়ার, যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রাণীদের আঘাতকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। ক্ষতসৃষ্টিকারী শৃঙ্গের স্থলে তীর, তীক্ষ্ণ নখরের স্থলে তরবারী, পুরু চর্মের স্থলে দুর্ভেদ্য ঢাল এ প্রকার আরও অনেক। মনীষী গ্যালেন তাঁর 'ডি ইউজু পার্টিয়াম'[২] গ্রন্থে এর অনেক কিছুই বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং যে কোন একটি মানুষের পক্ষে শক্তির সাহায্যে যে কোন একটি প্রাণী, বিশেষ করে হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। সে কিছুতেই ঐ ভাষাহীন বন্য প্রাণীর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। অন্যদিকে তাঁর চিন্তার ফসল, প্রতিরোধের হাতিয়ারও সে একা লাভ করতে পারবে না। কারণ তার সংখ্যা অনেক এবং তা প্রস্তুত করতে বিচিত্র সব শিল্পকর্মের সাহায্যের প্রয়োজন। এ কারণেই বাধ্য হয়ে তাকে স্বজাতির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। বস্তুত এভাবে পরস্পরের সহযোগিতা না হলে তার আহার্য লাভ করবার অন্য কোন পথ নেই। আর যেহেতু আল্লাহ তার জীবনধারণের জন্য তাকে আহার্যের মুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন, সেজন্য তা ব্যতীত তার জীবনও পরিপূর্ণতা লাভ করবে না। অস্ত্রব্যতীত আক্রমণ প্রতিরোধ করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে হিংস্র প্রাণীদের শিকারে পরিণত হয়ে অকালে জীবন ত্যাগ করবে। এভাবে মানব জাতি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু পরস্পরের সহযোগিতা সম্ভব হলে তার আহার্যও জুটবে, আক্রমণ প্রতিরোধের অস্ত্রও হাতে আসবে এবং মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও সমৃদ্ধি সাধনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র মহান উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করবে। এ কারণেই মানুষের জন্য এ সমাজবদ্ধ জীবন অত্যন্ত আবশ্যকীয়। অন্যথায় তাদের অস্তিত্ব পূর্ণতা লাভ করবে না এবং আল্লাহ্ তাঁর প্রতিনিধিত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাদের দ্বারা পৃথিবীর সমৃদ্ধি বিধানের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তাও বাস্তবায়িত হবে না। এটাই সভ্যতার অর্থ এবং একেই আমরা আমাদের বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়রূপে নির্বাচন করেছি।

উপরোক্ত আলোচনায় আলোচ্য বিষয়ের অস্তিত্বের এমন একটি প্রমাণ বিদ্যমান যা স্বয়ং আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত। যদিও কোন বিষয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়া আলোচকের অবশ্য কর্তব্য নয়। যেমন যুক্তিবিদ্যায় নির্ধারিত হয়েছে যে-কোন বিষয়ের আলোচনাকারীর জন্য উক্ত বিষয়ের আলোচ্যের অস্তিত্ব[৩] সপ্রমাণ করবার প্রয়োজন

---

২. মূলে আছে 'কিতাবু মানাফেউল আঘা' অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপকার সম্পর্কীয় গ্রন্থ।

৩. জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন অনেক মৌলিক উপাদান আছে, যা স্বতঃসিদ্ধ। যেমন গণিতের সংখ্যা, পদার্থবিজ্ঞানের বস্তু। ইবনে খলদুনের বিষয়টি হল সভ্যতা বা মানব সমাজ।

www.amarboi.org

নেই। অবশ্য তা নিষিদ্ধও নয়। সুতরাং তার প্রমাণ করা একান্তই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যাপার। আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে সহায় হোন।

অতঃপর মানুষ যখন সমাজ জীবনের প্রতিষ্ঠা করল, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি, সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হল, তখন তাদের জন্য এমন একজন শৃঙ্খলা বিধায়কের প্রয়োজন, যিনি সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। কারণ মানুষ স্বভাবতঃই পাশবিক আচরণ ও উৎপীড়নে অভ্যস্ত। ভাষাহীন প্রাণীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তারা যে সকল অস্ত্র নির্মাণ করেছে, তদ্বারা তাদের স্বজাতির আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব নয়। কারণ তা তাদের সকলেরই আছে। কাজেই অন্য এমন কিছু প্রয়োজনীয়, যা তাদের পরস্পরের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়। তা অবশ্যই অন্য প্রাণীদের মধ্য থেকে হওয়া সম্ভব নয়; কেননা তাদের মধ্যে মানবোচিত অনুভূতি ও অনুপ্রেরণার একান্তই অভাব। সুতরাং উক্ত শৃঙ্খলা বিধায়ক তাদের মধ্য থেকেই এমন একজনকে হতে হবে, যিনি তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার, শক্তি ও দৌর্দণ্ড প্রতাপে পরস্পরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন। এটাই রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এ আলোচনায় পাঠকের নিকট এটা অবশ্যই পরস্ফুট হয়েছে যে, এ ব্যবস্থা স্বভাবতঃই মানুষের জন্য বিশিষ্ট এবং প্রয়োজনীয়। কখনও এটা ভাষাহীন প্রাণীদের মধ্যেও পাওয়া যায়, যেমন জ্ঞানীরা মধুমক্ষিকা ও পঙ্গপাল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যেও নির্দেশ আনুগত্য ও অনুসরণের স্বভাব লক্ষ্য করা গেছে। তারা নিজেদের মধ্য থেকেই বিশেষ চরিত্র ও দেহের অধিকারী কাউকে নেতা হিসাবে মেনে থাকে। কিন্তু মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীদের মধ্যকার এ স্বভাব তাদের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না মাত্র। শুধু মানুষই একে শাসন ও চিন্তার ফসল হিসাবে গ্রহণ করেছে। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার সৃজনস্বভাব দিয়েছেন, অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন।[৪]

দার্শনিকগণ নবুয়তের অস্তিত্ব স্বপ্রমাণ করবার জন্য যুক্তিবিচারের দ্বারস্থ হয়ে উক্ত আলোচনা অপেক্ষা অধিক বর্ণনা করে থাকেন। তাঁরা বলেন, এটা স্বভাবতঃই মানুষের জন্য বিশিষ্ট। অতঃপর উপরোক্ত আলোচনার পুনরুল্লেখ করে বলেন, মানুষের জন্য একজন শৃঙ্খলা বিধায়কের অস্তিত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয়। এর পর বলেন, অবশ্য এ ব্যবস্থা ধর্মীয় নির্দেশের দ্বারা স্থিরীকৃত হবে এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন ব্যক্তিবিশেষ তা লাভ করবেন। ঐ ব্যক্তি অবশ্যই তাদের মধ্যে বিশিষ্ট হবেন। কারণ, আল্লাহ্ তাঁর মধ্যে পথ নির্দেশের এমন গুণাবলি অর্পণ করে থাকেন, যদ্বারা তিনি অতি সহজেই মান্য ও গৃহীত হতে পারেন। সুতরাং তাঁর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত মানুষ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহ্র বিধি-নিষেধকে তাঁদের জীবনে গ্রহণ করে থাকে।

পাঠক, লক্ষ করে থাকবেন, জ্ঞানীদের এ আলোচনা একান্তই যুক্তিহীন। কারণ মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন এটা ছাড়াও পরিপূর্ণতা লাভ করে থাকে। কোন প্রশাসক

---

৪. কোরান ২০, ৫০।

www.amarboi.org

নিজেই তার ব্যবস্থা করতে পারেন অথবা গোত্রচেতনার মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য করতে পারেন। বস্তুত গ্রন্থধারী নবীর অনুসারীদের সংখ্যা গ্রন্থহীন মুজসী[৫]দের অপেক্ষা অনেক কম। এ বিশ্বের অধিবাসীদের অধিকাংশই তারা। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মধ্যে শুধু জীবন নয়, সাম্রাজ্য ও ঐতিহ্যও বিদ্যমান। বর্তমানকালেও তারা অনুরূপভাবে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের শীতোষ্ণ অঞ্চলগুলোতে জীবনযাপন করছে। তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীন নৈরাজ্য বিরাজ করছে, এটা ধারণা করাও অসম্ভব।

পাঠক! এটা দ্বারা আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, নবুয়তের অনিবার্যতার জন্য তাঁরা যে যুক্তি বিচারের প্রয়োগ করেছিলেন, তা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ। বস্তুত নবুয়ত যুক্তির দ্বারা প্রমাণের বিষয় নয়। তা যথার্থই ধর্মীয় বিশ্বাসের ফসল। প্রাচীন মনীষিগণের এটাই অভিমত। আল্লাহ্‌ই সহায়তা ও পথ নির্দেশের অধিকারী।

---

৫. মজুসী বলতে সাধারণভাবে জরাস্থুপন্থীদেরকে বুঝায়। ইসলামের প্রাথমিক ধারণায় এদেরকে পৌত্তলিক মনে করা হত। কিন্তু পরে তাদের নবী আছে কিন্তু গ্রন্থ নেই—এ ধারণা পোষণ করা হয়। ইবনে খলদুন এ শব্দের দ্বারা সাধারণভাবে পৌত্তলিকদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন।

www.amarboi.org

১. দক্ষিণ	৪১. মকরান
২. পশ্চিম	৪২. কিরমান
৩. উত্তর	৪৩. ফারেস
৪. পূর্ব	৪৪. বাহ্লুস
৫. উষ্ণতার জন্য বিষুব রেখার বাইরের শূন্য ভূমি।	৪৫. আজর বাইজান
৬. বিষুব রেখা	৪৬. মরুভূমি
৭ লামলাম অঞ্চল	৪৭. খোরাসান
৮. মেগজাওয়া অঞ্চল	৪৮. খোয়ারজম
৯. কানেম	৪৯. পূর্ব ভারত
১০. বরনো	৫০. তাশখন্দ
১১. গাওগাও	৫১. সোগাদ
১২. জাগাই	৫২. চীন
১৩. তাজুইন	৫৩. তাগুজগুজ
১৪. নুবিয়া	৫৪. গাসকুনিয়া
১৫. আবিসিনিয়া	৫৫. বরতানিয়া
১৬. ঘানা	৫৬. কালব্রিয়া
১৭. লামতা	৫৭. ফ্রান্স
১৮. সুস	৫৮. ভেনিস
১৯. মরক্কো	৫৯. জার্মানি
২০. তাঞ্জিয়ার	৬০. মেসিডোনিয়া
২১. সিনহাজা	৬১. বহেমিয়া
২২. দরআ	৬২. জাসুলিয়া
২৩. আফ্রিকিয়া	৬৩. জারমানিয়া
২৪. ফেজ্জান	৬৪. বায়লাকান
২৫. জারিদ	৬৫. আর্মেনিয়া
২৬. কাওয়ার	৬৬. তাবারিস্তান
২৭. বারনিশ মরুভূমি	৬৭. আলান
২৮. মধ্য ওয়েসিস	৬৮. বশখির
২৯. উর্ধ্ব মিশর	৬৯. বুলগার
৩০. মিশর	৭০. ওয়েখনাক
৩১. বেজা	৭১. মুস্তেনা
৩২. হেজাজ	৭২. উজার ভূমি
৩৩. সিরিয়া	৭৩. মাজুজ
৩৪. ইয়ামেন	৭৪. গোজ
৩৫. ইয়ামামা	৭৫. তুরকিশ
৩৬. বসরা	৭৬. আধকিশ
৩৭. ইরাক	৭৭. খাওলক
৩৮. শিহর	৭৮. ইয়াজুজ
৩৯. উম্মান	৭৯. কিরমাক
৪০. পশ্চিম ভারত	৮০. শৈত্যের জন্য উত্তরে অবস্থিত শূন্য ভূমি।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা

[সভ্যতা অধ্যুষিত ভূভাগ এবং তন্মধ্যস্থ সমুদ্র, নদনদী ও বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে]

এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী জ্ঞানীদের গ্রন্থাবলিতে[৬] এটা গোলাকার বলে বর্ণিত হয়েছে। এটা চতুর্দিক থেকে জলীয় উপাদান দ্বারা বেষ্টিত এবং একটি আঙুরের ন্যায় জলের উপর ভাসমান।

আল্লাহ্ যখন পৃথিবীর উপর প্রাণিকুল সৃষ্টি করতে মনস্থ করলেন এবং মানব জাতিকে সমগ্র সৃষ্টির উপর তাঁর প্রতিনিধিত্ব দান করে তার সমৃদ্ধি বিধানে তৎপর হলেন, তখন পৃথিবীর অনেক অংশ থেকে জল সরিয়ে নেয়া হল। এর ফলে অনেকে ধারণা করেন যে, জল পৃথিবীর নিম্নে অবস্থান করছে; কিন্তু এটা সঠিক নয়। পৃথিবীর স্বাভাবিক নিম্ন বলতে তার অভ্যন্তরস্থ তল ও ভূগোলকের মধ্যভাগকে বোঝায়; তাই এর কেন্দ্রস্থল এবং প্রতিটি বস্তু তার ভারানুসারে তার দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। এই কেন্দ্র ব্যতীত সকল কিছুই এর প্রান্ত ভাগ। সুতরাং যে জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে, তা তার উপরিভাগে অবস্থান করছে। যদিও পৃথিবীর যে-কোন অংশকে তার বিপরীত দিকের সাথে তুলনা করেই জল তার নিম্নে আছে বলে বলা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর যে অংশ থেকে জল সরিয়ে নেয়া হয়েছে, তা ভূ-পৃষ্ঠে অর্ধাংশ জুড়ে বৃত্তাকারে অবস্থান করছে। তার চতুর্দিকে যে জলীয় উপাদান পরিবেষ্টন করে আছে, তাকে 'পরিবেষ্টনকারী সাগর' বলে অভিহিত করা হয়। একে দ্বিতীয় লামের উচ্চারণ গাঢ় করে 'লাবল্যায়া'[৭]ও বলা হয়ে থাকে। এর অন্য নাম 'উকিয়ানুস'। সকলই অনারব নাম। আবার একে বলা হয় 'সবুজ সাগর' ও 'কৃষ্ণ সাগর'।

জল নিষ্কাশিত পৃথিবীর যে অংশে মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তাতে জনবসতিপূর্ণ এলাকা অপেক্ষা জনবিরল এলাকাই অধিক। আবার এ জনবিরলতা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকেই অধিকতর দেখা যাচ্ছে। জনবসতিপূর্ণ এলাকাটি একটি সমতল বৃত্তাকারে দক্ষিণ থেকে ক্রমশ উত্তর দিকে ভূ-বিষুব রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। উত্তর দিকে

---

৬. এ প্রস্তাবনায় প্রদত্ত সমুদয় বিবরণ মুহম্মদ আল ইদরিসীর (১০৯৯/১১০০-১১৬২ খ্রি:) গ্রন্থ 'নুজহাতুল মুশতাক' হতে গৃহীত। সিসিলীর শাসক দ্বিতীয় রোজারের (১১২৯-১১৫৪ খ্রি:) জন্য এ গ্রন্থটি রচিত হয়। এজন্য ইবনে খলদুন বারবার এ গ্রন্থকে 'রোজার' গ্রন্থ নামে উল্লেখ করেছেন।

৭. এ শব্দটিকে বিকৃত বলে মনে করা হয়। এর মূল 'আল আবশ্যায়া' হতে পারে বলে অনেকের মত এবং এটা 'আটলান্টা' শব্দের বিকৃতি। কিন্তু উক্ত ধারণার সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। রোজেনথাল একে রোমান শব্দ 'আল মারে' হতে ব্যুৎপন্ন বলে ধারণা করেন।

www.amarboi.org

একটি বৃত্ত রেখার নিকট তা যেখানে শেষ হয়েছে, তার পশ্চাতে উক্ত রেখা ও বেষ্টনকারী জলীয় উপাদানের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে এক পর্বতশ্রেণী এবং তাদের মধ্যেই ইয়াজুক-মাজুজের প্রাচীর বিদ্যমান। এ পর্বতশ্রেণী ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়ে গেছে এবং তা পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে জনবসতি বেষ্টনকারী বৃত্তরেখার দুটি অংশে জলীয় উপাদানের সাথে মিলিত হয়েছে।

জ্ঞানীরা বলেন, জল নিষ্কাশিত পৃথিবীর এ অংশ ভূগোলের অর্ধেক কিংবা তদপেক্ষা কম এবং তার এক-চতুর্থাংশ মাত্র জনবসতিপূর্ণ। তা সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত। ভূ-বিষুব রেখা এ পৃথিবীকে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে দুভাগে ভাগ করেছে। তাই পৃথিবীর দৈর্ঘ্য-এ ভূগোলকের দীর্ঘতম রেখা। যেমন ক্রান্তিবৃত্ত ও খ-বিষুব বৃত্ত আকাশের দীর্ঘতম বৃত্ত। ক্রান্তিবৃত্ত তিনশ ষাটটি অংশে বিভক্ত এবং প্রতিটি অংশ পৃথিবীর দূরত্ব অনুসারে পশ্চিম ফরসং[৮] বিস্তৃত। প্রতিটি ফরসং বার হাজার হাত অর্থাৎ তিন মাইল[৯]। কেননা প্রতিটি মাইলের দৈর্ঘ্য চার হাজার হাত এবং হাতের পরিমাণ চব্বিশ অঙ্গুলি। একটি অঙ্গুলির পরিমাণ হল, ছয়টি যবের দানাকে পেট ও পিঠে পরস্পর মিলিয়ে যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়, তা।

যে খ-বিষুব রেখা আকাশকে দুইভাগে ভাগ করেছে এবং যা ভূ-বিষুব রেখার সমান্তরাল, তা থেকে মেরুদ্বয়ের প্রত্যেকটির দূরত্ব নব্বই অংশ। কিন্তু ভূ-বিষুব রেখার উত্তরদিকস্থ জনবসতি অঞ্চল মাত্র চৌষট্টি অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর অবশিষ্ট অংশ অতিরিক্ত শীত ও জড়তার জন্য জনবসতিশূন্য। যেমন তার দক্ষিণদিকস্থ অঞ্চল সম্পূর্ণটাই অতিরিক্ত উষ্ণতার জন্য জনবসতিহীন। আল্লাহ্ চাহেত আমরা এ সম্পর্কে যথাস্থানে বর্ণনা করব।

উক্ত জনঅধ্যুষিত অঞ্চল ও তার সীমা এবং তন্মধ্যস্থ গ্রাম, নগর, পর্বত, সমুদ্র, নদী, প্রান্তর ও বালুকাময় মরু সম্পর্কে টলেমী[১০] তাঁর ভূগোল গ্রন্থে ও পরবর্তীকালে 'রোজার' গ্রন্থ[১১] প্রণেতা তাঁর গ্রন্থে সংবাদ প্রদান করেছেন। তাঁরা উক্ত জনবসতিকে সাতভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগকে 'একলিম' (অঞ্চল) নামকরণ করেছেন। তাঁরা উক্ত সপ্তাঞ্চলের যে সীমা নির্ধারণ করেছেন, তা কাল্পনিক। এ অঞ্চলগুলো সমান প্রস্থ ও অসমান দৈর্ঘ্যসহ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। প্রথম অঞ্চলটির পরবর্তী অঞ্চল অপেক্ষা ও দ্বিতীয়টি তৃতীয়টি অপেক্ষা বৃহৎ এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত। সুতরাং সপ্তম অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ভু-গোলকের জল নিষ্কাশিত বৃত্তাকার ভূমি সংস্থানের জন্যই এরূপ হয়েছে। তাঁদের মতে এ অঞ্চলসমূহের প্রতিটি আবার পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বিস্তৃত পরস্পর সন্নিহিত দশটি অংশে বিভক্ত। এর প্রতিটি অংশের জন্য জনবসতি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংবাদ বিদ্যমান।

---

৮. মূলে 'ফরসখ' আছে। এর ফারসি উচ্চারণ ফরসং, আমরা এটাই গ্রহণ করলাম।

৯. ইংরেজি মাইলের সাথে এর মিল নেই। ঐ অনুপাতে প্রায় সোয়া মাইল। এক ক্রোশের অর্ধেক।

১০. সপ্ত অঞ্চলের এ বিভাগ টলেমীর গ্রন্থে নেই বা তিনিই এটা প্রথম করেননি। এটা গ্রিক মনীষার দান।

১১. ৬নং টীকা দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

সমুদ্র

তাঁরা বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবী বেষ্টনকারী সমুদ্র থেকে চতুর্থ অঞ্চলের পশ্চিম দিক দিয়ে বিখ্যাত রোম সাগর বের হয়ে এসেছে। এটা তাঞ্জিয়ার ও তারিকের মধ্যবর্তী 'যুকাক' (জিব্রাল্টার) নামক প্রায় বার মাইল প্রশস্ত প্রণালী থেকে আরম্ভ হয়ে ক্রমশ পূর্বদিকে ছয়-সাত মাইল প্রশস্ত হয়েছে এবং চতুর্থ অঞ্চলে চতুর্থ অংশের শেষ প্রান্তে এসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রারম্ভস্থল থেকে এর শেষ প্রান্তের দূরত্ব এক হাজার একশ ষাট মাইল। এখানে সিরিয়ার তীরভূমি অবস্থিত। এর দক্ষিণ দিকে মাগরিবের তীরভূমি; এর প্রথম প্রণালী তীরবর্তী 'তাঞ্জিয়ার', এর পর 'আফ্রিকিয়া', এর পর 'বুরকা' ও 'আলেকজান্দ্রিয়া'। এর উত্তরে প্রণালী তীরবর্তী 'কনস্টান্টিনপোল'। এর পরে ভেনিস, রোম, ফ্রান্স ও স্পেন—তাঞ্জিয়ারের বিপরীত জিব্রাল্টার সন্নিকটবর্তী 'তারিফ'। একে রোম ও সিরিয়া সাগর বলা হয় (ভূমধ্যসাগর)। এতে অনেকগুলো জনবসতিপূর্ণ বৃহৎ দ্বীপ বিদ্যমান। যেমন—ক্রীট, সাইপ্রাস, সিসিলী, মেজোরেশ সার্দানিয়া ও দানিয়া।[১২]

তাঁরা বলেছেন যে, উক্ত ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তর দিক দিয়ে দুটি প্রণালীর মাধ্যমে আরও দুটি সাগর বের হয়ে গেছে। উক্ত প্রণালী দুটির একটি কনস্টান্টিনপোলের বিপরীত দিকে অবস্থিত। তা উক্ত সাগর থেকে এক তীর নিক্ষেপের সমতুল্য প্রশস্ত প্রণালীর দ্বারা আরম্ভ হয়ে ক্রমশ তিনদিনের পথ অতিক্রম করেছে এবং কনস্টান্টিনপোলের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর চার মাইল প্রশস্ত হয়ে ষাট মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেছে। এর এ অংশকে কনস্টান্টিনপোল প্রণালী বলা হয়। এর পর তা ছয় মাইল প্রশস্ত একটি মুখ নিয়ে কৃষ্ণসাগর[১৩] পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তথা থেকে এ সাগর পূর্বদিকে গমন করে হিরাক্লিয়া অঞ্চলে (বিথীনিয়া) পৌঁছেছে এবং 'খাজারদের' দেশে গিয়ে শেষ হয়েছে। মুখ থেকে এ স্থানের দূরত্ব এক হাজার তিনশ মাইল। এর উভয় তীরে বাইজেন্টাইন, তুর্কি, বুলগার ও রুশ জাতির লোকেরা বাস করছে।

ভূমধ্যসাগরের প্রণালীদ্বয়ের একটি থেকে দ্বিতীয় যে সাগরটি বের হয়েছে তা ভেনিস সাগর। এটা বাইজেন্টাইন অঞ্চলের উত্তর প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং পর্বতের সন্নিকটবর্তী হয়ে পশ্চিম দিকে ভেনিস অঞ্চল অভিমুখে ফিরে গেছে। এটা 'এ্যাকুইলিয়া' অঞ্চলে গিয়ে শেষ হয়েছে। এর প্রারম্ভ স্থল থেকে শেষ প্রান্তের দূরত্ব এক হাজার একশ মাইল। এর দুই তীরে বাইজেন্টাইন, ভেনিস ও অন্যান্য জাতি বাস করে। একে ভেনিস উপসাগর বলা হয় (এ্যাড্রিয়াটিক সাগর)।

তাঁরা বলেছেন যে, উক্ত বেষ্টনকারী সাগর থেকে পূর্বদিকে এবং ভূ-বিষুব রেখার ভেতর অংশ উত্তরে এক বিরাট ও প্রশস্ত সাগর বিদ্যমান। এটা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়ে প্রথম অঞ্চলে পৌঁছেছে এবং পুনরায় পশ্চিম দিকে এসে উক্ত অঞ্চলের পঞ্চমাংশে আবিসিনিয়া ও নিগ্রোদের দেশ স্পর্শ করেছে। প্রারম্ভ স্থল থেকে বাবেল মান্দব পর্যন্ত এর দূরত্ব চার হাজার পাঁচশ ফরসং। একে চীন, ভারত ও আবিসিনিয়া সাগর (ভারত মহাসাগর) বলা হয়। এর দক্ষিণ দিকে নিগ্রো এবং বারবারদের দেশ, যার কথা

১২. দাপিয়া বলে কোন দ্বীপের অস্তিত্ব নেই। এজন্য রোজেনথালের অনুবাদে এটা বাদ পড়েছে।
১৩. মূলে আছে 'বহরু পিতাশ'।

www.amarboi.org

কবি ইমরুল কায়েস তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ বারবারগণ মাগরিব অঞ্চলের বারবার নন। অতঃপর এ সাগরের তীরে 'মগাদিশু', 'সুফালা' ও 'ওয়াক ওয়াক'[১৪] দেশ এবং অন্যান্য অনেক জাতি বর্তমান। এর পরে জনবসতিহীন প্রান্তর। উক্ত সাগরের উত্তর দিকে প্রারম্ভ স্থলে চীন, পরে ভারত, সিন্ধু (পশ্চিম ভারত) এবং এর পরে ইয়ামেনের তীরভূমিস্থ আল আহকাফ ও জবিদ প্রভৃতি শহর এর শেষের দিকে নিগ্রোদের দেশ এবং এর পরে আবিসিনিয়া অবস্থিত।[১৫]

তাঁরা বলেছেন যে, উক্ত আবিসিনিয়া সাগরের (ভারত সাগরের) বাবেল মান্দবস্থ শেষ প্রান্ত থেকে আরও একটি সাগর সংকীর্ণ আঁকারে বের হয়ে উত্তর ও কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং দ্বিতীয় অঞ্চলের পঞ্চমাংশে অবস্থিত 'আল কুলযুম' শহরে শেষ হয়েছে। প্রারম্ভ থেকে এর দূরত্ব এক হাজার চারশ মাইল। একে কুলযুম ও সুয়েজ সাগর (লোহিত সাগর) বলা হয়। এর ও মিশরের 'ফুসতাত' শহরের মধ্যকার দূরত্ব তিন দিবসের পথ। এ সাগরের পূর্ব তীরে ইয়ামেন, হেজাজ, জেদ্দা ও এর শেষ প্রান্তে মাদায়েন আয়লা ও ফারান অবস্থিত রয়েছে। এর পশ্চিম তীরে সাইদ, আয়জাব, সুয়কিন ও যায়লা এবং এর পরে প্রারম্ভ স্থলের নিকট আবিসিনিয়া ও শেষ প্রান্তে রোম সাগরের আবিশের দিকে 'কুলযুম' বর্তমান। উক্ত দুই সাগরের মধ্যকার ব্যবধান ছয় দিবসের পথ। ইসলাম ও ইসলাম পূর্ববর্তী বহু সম্রাটই এ উভয় সাগরের মধ্যবর্তী স্থলভাগকে খনন করবার ইচ্ছা পোষণ করেছেন, কিন্তু তা সমাপ্ত হয়নি।

উক্ত আবিসিনিয়া সাগর (ভারত সাগর) থেকে সিন্দুদেশ ও ইয়ামেনের আল-আহকাফের নিকটে আরও একটি সাগর বের হয়েছে; তাকে সবুজ সাগর বলা হয়। এটা ক্রমশ উত্তর ও কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে দ্বিতীয় অঞ্চলের ষষ্ঠাংশে অবস্থিত বসরার উবলাতীর ভূমিতে শেষ হয়েছে। প্রারম্ভস্থল থেকে এর শেষ প্রান্তের দূরত্ব চারশ চল্লিশ ফরসং। একে পারস্য সাগর বলা হয়। এর পূর্বতীরে সিন্ধু, মকান, কেরমান, ফারেস ও শেষপ্রান্তে উবুলা এবং এর পশ্চিম তীরে বাহরাইন, ইয়ামামা, উম্মান, আশ্‌শিহর ও তার প্রারম্ভস্থলে আল-আহকাফ অবস্থিত। উক্ত সাগর ও কুলযুম সাগরের মধ্যস্থলে আরব উপদ্বীপ বিদ্যমান। তা যেন ক্রমশ সাগরে প্রবেশ করেছে। এ কারণেই তার দক্ষিণদিকে আবিসিনিয়া সাগর, পশ্চিমে কুলযুম সাগর ও পূর্বে পারস্যসাগর বিদ্যমান। এ উপদ্বীপের অন্য প্রান্ত সিরিয়া ও বসরার মধ্যবর্তী এক হাজার পাঁচশ মাইল বিস্তৃত ভূ-ভাগে ইরাকের সাথে মিলিত হয়েছে। এ অঞ্চলেই কুফা, কাদেসিয়া, বাগদাদ, খসরুর দরবার ও হীরা অবস্থিত। এর পরবর্তী অঞ্চলে অনারব জাতি, যেমন তুর্কি, খাজার প্রভৃতির লোকেরা বাস করে। আরব উপদ্বীপের পশ্চিমাংশে হেজাজ, পূর্বাংশে ইয়ামামা, বাহরাইন, উম্মান ও দক্ষিণাংশে ইয়ামেন অবস্থিত এবং ইয়ামেনের তীরভূমি আবিসিনিয়া সাগর সংলগ্ন।

---

১৪. এর অর্থ খুব পরিষ্কার নয়; এতে আফ্রিকার সমগ্র পূর্ব উপকূল, মাদাগাস্কার, সুমাত্রা, এমনকি জাপানকেও বুঝাতে পারে।

১৫. রোজেনথাল আবিসিনিয়া স্থলে 'বেয়া'র কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে 'হাবশা' বর্তমান।

www.amarboi.org

তাঁরা বলেছেন যে, জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে দায়লাম দেশের উত্তরে অন্যান্য সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সাগর বিদ্যমান। তাকে জুরজান ও তাবারিস্তান সাগর (কাস্পিয়ান সাগর) বলা হয়। তা দৈর্ঘ্যে এক হাজার ও প্রস্থে ছয়শ মাইল বিস্তৃত। তার পশ্চিমে আজর বাইজান ও দায়লাম, পূর্বে তুরস্ক ও খোয়ারজিন, দক্ষিণে তাবারিস্তান এবং উত্তরে খাজার ও আলানদের দেশ।

এটাই ভূগোলবিদগণ কর্তৃক বর্ণিত সাগরসমূহের সমুদয় বিবরণ।

নদী

তাঁরা বলেছেন যে, এ জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বহু নদনদী বিদ্যমান। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ চারটি হল নীল, ফুরাত (ইউফ্রেটিস), দজলা (টাইগ্রিস) এবং বলখের নদী, যাকে জাইহুন (অক্সাস) নদী বলা হয়।

নীলনদ ভূ-বিষুব রেখার পশ্চাদবর্তী প্রথম অঞ্চলের চতুর্থাংশের দিকে ষোল অংশে অবস্থিত একটি বৃহৎ পর্বত থেকে বের হয়েছে। উক্ত পর্বতের নাম 'কুমার'।[১৬] পৃথিবীতে তার ন্যায় উচ্চ পর্বত আর নেই। তা থেকে প্রচুর ঝর্ণা নির্গত হয়ে কতকাংশ একটি স্থানীয় হ্রদে এবং কতকাংশ অন্য একটি হ্রদে পতিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত দুটি হ্রদ থেকে নদনদী উৎপন্ন হয়ে ভূ-বিষুব রেখার নিকটবর্তী একটি হ্রদে এসে মিশেছে। উক্ত পর্বত থেকে এ হ্রদের দূরত্ব দশ দিবসের পথ। এ হ্রদ থেকে দুটি নদী বের হয়েছে। এর একটি উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে প্রথমে নুবা এবং পরে মিশর দেশ অতিক্রম করেছে। মিশর অতিক্রম করবার সময় এটা একাধিক সন্নিহিত শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং উক্ত প্রতিটি শাখাকে 'খাল' বলা হয়ে থাকে। উক্ত সকল খালই আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে রোম সাগরে পতিত হয়েছে। এ নদকে মিশরীয় নীল বলা হয়। এর পূর্ব তীরে সাইদ ও পশ্চিম তীর ওয়েসীস। অন্য নদটি ক্রমান্বয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে বেষ্টনকারী সাগরে পতিত হয়েছে। একে সুদান নদী[১৭] বলা হয় এবং তার তীরাঞ্চলে সুদানী জাতির লোকেরা বাস করে।

ফুরাত নদী পঞ্চম অঞ্চরের ষষ্ঠাংশে অবস্থিত আর্মেনিয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে রোম (আনাতোলিয়া), মালটায়া, মানবিজ, সিফিফন, 'আর্‌রুক্কা,' কুফা অতিক্রম করত বসরা ও ওয়াসিতের মধ্যবর্তী জলাভূমিতে এসে উপনীত হয়েছে এবং সেথাস থেকে আবিসিনিয়া সাগরে এসে পড়েছে। গমনপথে বহু উপনদী এর সাথে মিলিত হয়েছে এবং তা থেকে বহু শাখানদী বের হয়ে দজলাতে পতিত হয়েছে।

দজলা নদীও আর্মেনিয়ার 'খেলাত' অঞ্চলের ঝর্ণাধারায় উৎপন্ন হয়েছে এবং গতিপথে মোশেল, আজর বাইজান, বাগদাদ ও ওয়াসিত হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এখানে উক্ত নদী বহু খালে বিভক্ত হয়ে বসরা হ্রদে পড়েছে এবং সেখান থেকে পারস্য সাগরে এসে পতিত হয়েছে। পূর্বদিকে এটা ফুরাতের ডান পার্শ্বে প্রবাহিত হয়েছে এবং চুতর্দিক থেকে বহু বৃহৎ উপনদী তার সাথে মিলিত হয়েছে। দজলা ও

১৬. টলেমী 'কমর' বলেছেন, যার অর্থ চন্দ্র।
১৭. একে সুদানীয় নীলও বলা হয়।

www.amarboi.org

ফুরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল, তার প্রারম্ভ স্থল থেকে ফুরাতের উভয় তীরস্থ সিরিয়া এবং দজলার তীরস্থ আজরবাইজানের সম্মুখ ভাগ পর্যন্ত মোশেল উপদ্বীপ নামে খ্যাত।

জাইহুন নদী তৃতীয় অঞ্চলের অষ্টমাংশে অবস্থিত বলখের একাধিক ঝর্ণার স্রোতধারা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর গতিপথে বহু বৃহৎ উপনদী এর সাথে এসে মিশেছে। এটা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে প্রথমে খোরাসান ও পরে পঞ্চম অঞ্চলের অষ্টমাংশে অবস্থিত খোয়ারজিমে উপনীত হয়েছে। সেখানে থেকে এটা জুরজান শহরের পাদদেশে অবস্থিত জুরজান (আরল) হ্রদে এসে পড়েছে। এটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একমাসের পথ সমতুল্য দূরত্বে বিস্তৃত এবং এতে তুরস্কদেশ থেকে উৎপন্ন ফরগানা ও আশ্‌শাশ (তাসখণ্ড) নদী[১৮] এসে পতিত হয়েছে। জাইহুন নদীর পশ্চিম তীরে খোরাসান ও খোয়ারজিম এবং পূর্ব তীরে বুখারা, তিরমিজ ও সমরকন্দ। এর পরবর্তী অঞ্চলে তুরস্ক, ফরসানা ও খাজরজ (খাকুল) এবং অন্যান্য অনারব জাতির বাস।

বাতলিমুস (টলেমী) তাঁর ভূগোলে ও আশ্‌শরীফ (আল-ইদরিসী) তাঁর রোজার গ্রন্থে এতদ্‌সম্পর্কে প্রচুর বর্ণনা দান করেছেন। তাঁরা জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর পর্বত, সমুদ্র ও প্রান্তরসমূহের সচিত্র ও পরিপূর্ণ ভৌগোলিক বিবরণ তুলে ধরেছেন। এদের অধিকাংশেই আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। বস্তুত আমাদের প্রয়োজন বারবারদের আবাসভূমি মাগরিব এবং আরবদের আবাসস্থল পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ্‌ই সহায়ক।

---

১৮. এর বর্তমান নাম 'শির দরিয়া'।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় প্রস্তাবনার সংযোজন

[পৃথিবীর দক্ষিণ চতুর্থাংশ অপেক্ষা উত্তর চতুর্থাংশের জনবসতির আধিক্য ও তার কারণ।]

আমরা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্বস্ত বিবরণের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে, জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টি অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বসতি বিরল। উক্ত অঞ্চলদ্বয়ে যে পরিমাণ বসতি বিদ্যমান, তাও শূন্যভূমি, প্রান্তর ও মরুভূমির দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এর পূর্বদিকে ভারত সাগর অবস্থিত। উক্ত অঞ্চলের জনসংখ্যা যেমন অল্প তেমনি তার গ্রাম ও শহরের সংখ্যাও নগণ্য। কিন্তু তৃতীয়, চতুর্থ ও তৎপরবর্তী অঞ্চলসমূহের অবস্থা অনুরূপ নয়। তাতে প্রান্তর কম এবং মরুভূমিও অনুরূপ বা নেই বললেও চলে। এখানে জাতি ও জনসংখ্যা উভয়েই সীমা অতিক্রম করেছে এবং তার গ্রাম ও নগর উভয়েই সংখ্যার দিক থেকে অগণিত। তৃতীয় অঞ্চল থেকে ষষ্ঠ অঞ্চল পর্যন্ত জনবসতির অবস্থা একই প্রকার। দক্ষিণ দিক সম্পূর্ণ প্রাণিশূন্য। জ্ঞানীগণ এর কারণ স্বরূপ বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত অঞ্চল অত্যধিক উষ্ণ এবং সূর্য অতি অল্পই তার মধ্য থেকে অপসৃত হয়ে থাকে। আমরা প্রমাণসহ এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা করব। এর ফলে উত্তরদিগস্থ তৃতীয় ও চতুর্থ অঞ্চল থেকে পঞ্চম ও সপ্তম[১৯] অঞ্চল পর্যন্ত জনবসতির প্রাচুর্যের রহস্যটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, উত্তর ও দক্ষিণ আকাশের ধ্রুবনক্ষত্র যখন দিগ্বলয়ের উপর বিরাজমান হয়, তখন সেখানে একটি বৃহৎ বৃত্তের সৃষ্টি হয়ে আকাশকে দুইভাগে ভাগ করে। বস্তুত এটা একটি বৃহত্তম বৃত্ত, যা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে আবর্তন করে থাকে এবং একে বলা হয় খ-বিষুব বৃত্ত। জ্যোতির্বিজ্ঞানে যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, ঊর্ধ্বাকাশ আহ্নিক গতিতে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে আবর্তন করবার ফলে তার সাথে তার অভ্যন্তরস্থ সমুদয় আকাশই আবর্তন করতে বাধ্য হয়। এ গতি অনুভবযোগ্য। এরূপভাবে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, সমুদয় নক্ষত্রই তাদের আকাশে (কক্ষপথে) উক্ত গতির বিপরীত পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আবর্তন করে থাকে। নক্ষত্রের গতির দ্রুততা ধীরতার জন্য তাদের আবর্তনকালের মধ্যে তারতম্য ঘটে থাকে। নক্ষত্রসমূহের স্ব স্ব আকাশমণ্ডলে আবর্তনের সমান্তরালে ঊর্ধ্বাকাশে এমন একটি বৃহৎ বৃত্ত বিদ্যমান, যা তাকে দুইভাগে ভাগ করে থাকে। এটাই ক্রান্তি বৃত্ত এবং এটা বারটি রাশিতে বিভক্ত। তা, যেমন যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে, রাশিসমূহের বিপরীত দুটি বিন্দুতে খ-বিষুব

---

১৯. ষষ্ঠ অঞ্চলের কথা সম্ভবত ভুলে বাদ পড়েছে।

www.amarboi.org

রেখাকে ছেদ করে। উক্ত বিন্দু দুটির একটি মেষরাশির আরম্ভস্থলে অবস্থিত। এভাবে খ-বিষুব রেখাও ক্রান্তি বৃত্তকে দুইভাগে ভাগ করে। এর একটি অংশ খ-বিষুব বৃত্ত থেকে উত্তর দিকে মেষরাশির আরম্ভ থেকে কন্যা রাশির শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অন্যটি এর দক্ষিণ দিকে তুলারাশির প্রারম্ভ থেকে মীনরাশির শেষাংশ পর্যন্ত প্রসারিত। যখন পৃথিবীর সর্ব প্রান্তীয় দিগ্বলয়ের উপর ধ্রুবতারকা দুটি বিরাজমান হয়, তখন ভূ-পৃষ্ঠের উপর এমন একটি রেখা কল্পিত হয়ে থাকে, যা খ-বিষুব রেখার বিপরীতে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রসারিত। একে ভূ-বিষুব রেখা বলা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধারণা করেন যে, উক্ত রেখা সপ্ত অঞ্চলের প্রথমটির প্রারম্ভ দেশের উপর দিয়ে প্রসারিত হয়ে গেছে। তার উত্তর দিকেই সমগ্র জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল।

উত্তর ধ্রুবনক্ষত্র যখন এ জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের দিগ্বলয়ে ক্রমাগত উদিত হয়ে চৌষট্টি অংশে উপনীত হয়, সেখানেই জনবসতির শেষ এবং তাই সপ্তম অঞ্চলের শেষাংশ। যখন উক্ত নক্ষত্র আরও উদিত হয়ে নব্বই অংশে উপনীত হয় এবং এটাই ধ্রুবনক্ষত্র ও খ-বিষুব রেখার মধ্যকার যথার্থ দূরত্ব, তখন ধ্রুবনক্ষত্র খ-মধ্যে ও খ-বিষুব রেখা দিগ্বলয়ে বিরাজ করে উত্তরদিগস্থ ছয়টি রাশি দিগ্বলয়ের উপরে ও দক্ষিণদিগস্থ ছয়টি রাশি দিগ্বলয়ের নিম্নে অবস্থান করতে থাকে। উপরোক্ত চৌষট্টি অংশ থেকে নব্বই অংশ পর্যন্ত স্থানে জনবসতি সম্ভব নয়। কেননা এতদুভয়ের মধ্যে সময়ের দূরত্বের জন্য শৈত্য ও উষ্ণতার মধ্যে কোন প্রকার মিশ্রণ সম্ভব হয়ে উঠে না এবং প্রাণের বিকাশও এ কারণে অসম্ভব।

সূর্য মেষ ও তুলারাশির প্রারম্ভভাগে ভূ-বিষুব রেখার উপর খ-মধ্যে অবস্থান করে। অতঃপর এটা খ-মধ্য থেকে কর্কট ও মকররাশির প্রারম্ভের দিকে নেমে যায়। খ-বিষুব রেখা থেকে সূর্যের এ আয়তনের শেষ সীমা হল চব্বিশ অংশ। এর পর যখন উত্তর ধ্রুবনক্ষত্র দিগ্বলয়ের উপরে উঠতে থাকে, তখন তার উত্থানের সমপরিমাণে খ-বিষুব রেখাও খ-মধ্য থেকে সরে যেতে থাকে। দক্ষিণ ধ্রুবনক্ষত্রও অনুরূপভাবে ত্রয়ীর[২০] গতির সমতা রক্ষা করে নিম্নগামী হয়। এটাই সময় নির্ধারকদের নিকট স্থানীয় অক্ষাংশ বলে অভিহিত হয়। খ-বিষুব রেখা যখন খ-মধ্য থেকে সরে যেতে থাকে, তখন তার কর্কটরাশির প্রারম্ভভাগে উপনীত হওয়া পর্যন্ত উত্তর রাশিসমূহ খ-মধ্যে উঠে আসে এবং দক্ষিণ রাশিসমূহ অনুরূপভাবে দিগ্বলয়ের নিচে মকর রাশির প্রারম্ভ ভাগ পর্যন্ত নেমে যায়। কারণ, আমরা যেমন পূর্বেই বলেছি যে, এ রাশিগুলো ভূ-বিষুব রেখার দিগ্বলয়ে উত্তরে ও দক্ষিণে সরে গিয়ে থাকে।

অতঃপর উত্তর দিগ্বলয় ক্রমশ উপরে উঠে উত্তর দিকের মেষ প্রান্তে খ-মধ্যে কর্কট রাশির প্রারম্ভভাগে এসে উপনীত হয়। এটাই সেই অবস্থা, যাতে আরবের হেজাজ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অক্ষাংশ চব্বিশ অংশ হয়ে থাকে। এটাই সেই অয়ন, যদ্দারা কর্কট রাশির প্রারম্ভ খ-বিষুব রেখা থেকে ভূ-বিষুব রেখার দিগ্বলয়ে উত্তর ধ্রুবনক্ষত্রের উত্থানের অনুপাতে উত্থিত হয়ে খ-মধ্যে উপনীত হয়। যখন ধ্রুবনক্ষত্র চব্বিশ অংশের অধিক উপরে উঠে আসে, তখন সূর্য খ-মধ্য থেকে সরে যায় এবং তার এ অয়ন ধ্রুবের চৌষট্টি

২০. ত্রয়ী বলতে উত্তর ধ্রুবনক্ষত্র, খ-বিষুব রেখা ও দক্ষিণ ধ্রুবনক্ষত্র বুঝাচ্ছে।

www.amarboi.org

অংশে উপনীত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। এভাবে সূর্য যতটা নিচে নামে, দক্ষিণ ধ্রুবনক্ষত্রও সেই অনুপাতে দিগ্বলয়ের নিচে অবতরণ করে। এর ফলে অত্যধিক শৈত্য ও জড়তার জন্য এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য উক্ত অবস্থার সাথে উষ্ণতার মিশ্রণ না ঘটবার ফলে প্রাণের বিকাশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

সূর্য খ-মধ্যে ও তৎসন্নিহিত অবস্থায় থাকাকালে পৃথিবীর উপর সমকোণে রশ্মি বিকিরণ করে থাকে এবং অন্যান্য অবস্থায় এ বিকিরণস্থূল ও সূক্ষ্মকৌণিক হয়ে পড়ে। সুতরাং সমকৌণিক বিকিরণের ফলে সূর্যরশ্মির তাপ ও প্রসার সূক্ষ্মকোণ ও স্থূলকোণ অপেক্ষা অধিক হয়। এর ফলে সূর্যের খ-মধ্যে ও তৎসন্নিহিত অবস্থায় থাকাকালে অন্যান্য অবস্থা অপেক্ষা উষ্ণতার আধিক্য ঘটে। কারণ এ সূর্যকিরণই তাপ ও শুষ্কতার কারণ। সূর্য ভূ-বিষুব রেখার উপরে মেষ ও তুলারাশির প্রারম্ভভাগে খ-মধ্যে বছরে দুইবার অবস্থান কলে। তা থেকে সূর্যের অয়ন খুব দূরবর্তী হয় না। তার কর্কট ও মকররাশির প্রারম্ভভাগের দিকে অয়ন ও সেখান থেকে খ-মধ্যে প্রত্যাবর্তনকালে উষ্ণতার মধ্যে কোন প্রকার সাম্য পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং সূর্যের সমকোণে বিকিরিত রশ্মিমালা দিগ্বলয়ের উপর অধিক মাত্রায় পতিত হয়ে দীর্ঘস্থায়ী অথবা চিরস্থায়ী হয়ে উঠে। এর ফলে বায়ু উষ্ণতায় জ্বলতে থাকে এবং এর আধিক্য দেখা দেয়। অনুরূপভাবে সূর্য যখন ভূ-বিষুব রেখার পরে চব্বিশ অক্ষাংশের মধ্যে দুইবার অবস্থান করে, তখনও দিগ্বলয়ে বিকিরিত সূর্যের উত্তাপ ভূ-বিষুব রেখার অবস্থানের সমতুল্য হয়ে থাকে। এর ফলে বায়ু শুষ্কতায় তীব্র হয়ে উঠে এবং প্রাণের বিকাশকে অসম্ভব করে তোলে। কারণ অত্যধিক উষ্ণতায় জল ও অন্যবিধ আর্দ্রতা শুষ্ক হয়ে যায় এবং ধাতবপদার্থ, বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুর সজীবতা নষ্ট করে দেয়। বস্তুত আর্দ্রতা ব্যতীত প্রাণের বিকাশ কখনই সম্ভব নয়।

যখন কর্কটরাশির প্রারম্ভ খ-মধ্য থেকে পঁচিশ অংশে নেমে যায় এবং ক্রমাগত নামতে থাকে, তখন সূর্য ও খ-মধ্য থেকে ঢলে পড়ে। এর ফলে উষ্ণতার মধ্যে একটা সমতা বা তদনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং প্রাণের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠে। এ অবস্থা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে সূর্যকিরণের স্বল্পতার জন্য অত্যধিক শীত দেখা দেয়। সূর্যরশ্মির স্থূলকৌণিক বিকিরণের জন্যই এরূপ ঘটে এবং এর ফলে প্রাণের বিকাশ নষ্ট হয় বা হ্রাস পায়। অবশ্য অত্যধিক উষ্ণতার ফলে প্রাণের বিনষ্টি অত্যধিক শৈত্য অপেক্ষা সর্বদাই অধিক হয়ে থাকে। কারণ উষ্ণতা শুষ্কাবস্থা সৃষ্টিতে শৈত্যজনিত জড়তা অপেক্ষা অধিক তৎপর। এর জন্যই প্রথম ও দ্বিতীয় অঞ্চলে জনবসতির স্বল্পতা এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঞ্চলে মধ্যাবস্থা। কারণ, সূর্যরশ্মির স্বল্পতার জন্য সেখানে উষ্ণতার মধ্যে একটি সাম্যাবস্থা বিরাজমান। ষষ্ঠ ও সপ্তম অঞ্চলে জনবসতি অধিক। কারণ সেখানে উষ্ণতার স্বল্পতা বর্তমান। শৈত্য প্রথমাবস্থায় উষ্ণতার তুল্য প্রাণের বিকাশকে নষ্ট করে না। কারণ তাতে শুষ্কতা নেই। অবশ্য অতিরিক্ত হওয়ার ফলে তার মধ্যেও এক প্রকার অনার্দ্রতা দেখা দেয়, যেমন সপ্তম অঞ্চলের পরে হয়ে থাকে। এ সকল কারণেই পৃথিবীর উত্তর চতুর্থাংশে জনবসতির আধিক্য ও প্রাচুর্য বিদ্যমান। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা।

www.amarboi.org

জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ সকল কারণ সম্মুখে রেখে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভূ-বিষুব রেখা ও তৎপরবর্তী অঞ্চল জনবসতিশূন্য। কিন্তু পর্যবেক্ষণ ও বিশ্বস্ত সংবাদাদি তাঁদের এ সিদ্ধান্তের বিপরীত, তাতে জনবসতি আছে বলে ধারণা জন্মায়। তাহলে তাঁরা অনুরূপ সিদ্ধান্ত কি করে গ্রহণ করলেন? প্রকাশ থাকে যে, তাঁরা সম্পূর্ণ জনবসতিশূন্যতার কথা বলতে চাননি। যুক্তি প্রমাণ তাঁদেরকে এ কথাই বলাতে চেয়েছে যে, অত্যধিক উষ্ণতার জন্য সেখানে প্রাণের বিকাশ বিঘ্নিত হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই তাতে জনবসতি অসম্ভব বা প্রায় অসম্ভব বলা যায়। অবস্থা এরূপই। ভূ-বিষূব রেখা ও তার পরবর্তী অঞ্চলে, যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, যদি জনবসতি থেকেও থাকে, তবে তা খুবই নগণ্য।

ইবনে রুশদ[২১] ধারণা পোষণ করেন যে, ভূ-বিষুব রেখাস্থ অঞ্চল সমভাবাপন্ন এবং তার পরবর্তী দক্ষিণ উত্তরাঞ্চলের ন্যায়। সুতরাং তাতে উত্তরাঞ্চলের সমতুল্য জনবসতি বিদ্যমান। তাঁর এ ধারণা প্রাণের বিকাশ বিঘ্নিত হওয়ার দিক থেকে অসম্ভব বলে মনে হয়। ভূ-বিষুব রেখার দক্ষিণ দিকে জনবসতিশূন্যতার কারণ এই যে, উক্ত অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠে জলীয় উপাদান দ্বারা আচ্ছাদিত। এটা উত্তরাঞ্চলের প্রাণের বিকাশযোগ্য ভূ-ভাগের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। যেহেতু সমভাবাপন্ন অঞ্চলেই অতিরিক্ত জল প্রাণের বিকাশকে বিঘ্নিত করে, সুতরাং অন্যান্য অঞ্চল এর অনুরূপই হবে। কারণ জনবসতি পর্যায়ক্রমিকভাবে হয়ে থাকে এবং এর পর্যায়ক্রম অস্তিত্বের সম্ভাব্যতার দিক থেকেই বিচার করা হয়, অসম্ভাব্যতার দিক থেকে নয়। ভূ-বিষুব রেখার সন্নিহিত অঞ্চলে প্রাণের বিকাশ অসম্ভব বলে তিনি যে মত পোষণ করেন, তাও বিশ্বস্ত সংবাদাদির দ্বারা খণ্ডিত হয়। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা।

উপরোক্ত আলোচনার পর আমাদের ইচ্ছা, রোজার গ্রন্থ প্রণেতার অনুরূপ একটি ভূ-চিত্র অংকন করা এবং অতঃপর তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা তুলে ধরা।[২২]

---

২১. মুহম্মদ ইবনে আহমদ ইব্নে রূশদ, জীবনকাল ৫২০-৫৯৫ (১১২৬-১১৯৮ খ্রি:) হি:।

২২ আমাদের ব্যবহৃত বৈরুত সংস্করণে এর পর 'ইলা আখিরিহি' অর্থাৎ 'এর শেষ পর্যন্ত' লেখা আছে। সুতরাং মূল গ্রন্থে এর পরও বক্তব্য ছিল এবং তার প্রমাণ মিলছে রোজেনথালের অনুবাদ হতে। তিনি উক্ত ভূ-চিত্রের প্রতিলিপি ও তার বিবরণ প্রদান করেছেন। অবশ্য তিনিও একটিমাত্র সংস্করণে এর সন্ধান পেয়েছেন। সম্ভবত তার অংকনের অসুবিধার জন্য অন্যান্য সংস্করণে পরিত্যাক্ত হয়েছে। আমরা গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্য রোজেনথালের অনুবাদ হতে এটা গ্রহণ করলাম।

www.amarboi.org

ভূ-চিত্রের বিশদ বিবরণ[২৩]

এতে প্রদত্ত বিবরণ দুই প্রকারের; একটি বিশদ বিবরণ এবং অন্যটি সাধারণ বিবরণ।

বিশদ বিবরণে পৃথিবীর জন-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর দেশ, পর্বত, সাগর ও নদ-নদীর প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হবে। এ বিবরণ পরবর্তী পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে।

সাধারণ বিবরণে পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে সাতটি ভাগে ভাগ করা, এ সকল ভাগের অক্ষাংশীয় প্রসারতা ও তাদের দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এটাই আমাদের বর্তমান পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু।

আসুন, আমরা এ সকল বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখি। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, পৃথিবী জলীয় উপাদানের উপর আঙুরের ন্যায় ভাসমান ছিল। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাণের বিকাশ ও সভ্যতার আবির্ভাবের জন্য তার একাংশ থেকে জল সরিয়ে নেয়া হল। জল নিষ্কাশিত এ অংশ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের অর্ধেক ভাগ জুড়ে আছে বলে মনে করা হয় এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকা এর এক-চতুর্থাংশ। অবশিষ্টাংশ জনবসতিহীন। কিন্তু অন্য একটি মতে জনবসতিপূর্ণ এলাকা পৃথিবীর মাত্র এক-ষষ্ঠমাংশ। জল নিষ্কাশিত ভূ-ভাগের জনবসতিহীন এ অংশ পৃথিবীর উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থিত। জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলো আকার ও ধারাবাহিকতায় পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বিস্তৃত। উক্ত দুই দিকে জনবসতিপূর্ণ এলাকা ও বেষ্টনকারী সমুদ্রের মধ্যভাগে জনবিরল অংশ নেই বললেই চলে।

তাঁরা আরও বলেছিলেন যে, জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর ঐ সমস্ত অংশে, যেখানে দুটি ধ্রুবনক্ষত্র দিগ্বলয়ে বিরাজমান, সেখানে একটি কাল্পনিক রেখা পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে খ-বিষুব রেখার বিপরীতে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। এ রেখা থেকেই সভ্যতার আরম্ভ এবং তথা থেকে তা ক্রমশ উত্তর দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে।

টলেমী বলেছেন যে,[২৪] প্রকৃতপক্ষে এ রেখার বাইরে দক্ষিণ দিকেও মানবসভ্যতা বিদ্যমান। তিনি অক্ষাংশীয় প্রসারতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেমন পরে বর্ণিত হবে।

---

২৩. এ শিরোনামটি রোজেনথালের অনুবাদ হতে গৃহীত। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে মুদ্রিত শিরোনামটি নিম্নরূপ :
'তফসিলুল কালামে আলা-বদ্‌এজ্ জুগ্রাফিয়া'; এর অর্থ তিন প্রকার হতে পারে যথা ভূগোল শাস্ত্রের আরম্ভ, ভূ-আকৃতির আরম্ভ অথবা ভূ-বিবরণের আরম্ভ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা। কিন্তু ইবনে খলদুনের স্বীকৃতি অনুসারে (৬৭ পৃষ্ঠার শেষ দ্র:) এটা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি; বরং সংশ্লিষ্ট ভূ-চিত্রের ব্যাখ্যা হিসাবেই আমরা এই বিবরণকে গ্রহণ করেছি।

২৪. পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে বিস্তৃত বিবরণ দ্র:।

www.amarboi.org

ইসহাক ইবনে আল হামান আল খাজিনী[২৫] এ মত প্রকাশ করেছেন যে, সপ্তম অঞ্চলের বাইরেও একটি সভ্যতা বিরাজমান। তিনিও অক্ষাংশীয় প্রসারতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আমরা পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করব। খাজিনী উক্ত বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ জ্ঞানী।[২৬]

এটা জ্ঞাত হোক যে, জ্ঞানীগণ পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে উত্তরে দক্ষিণে সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন তার বর্ণনা পূর্বে দেয়া হয়েছে। এ সপ্তভাগের প্রতিটিকে তাঁরা 'একলিম' বা অঞ্চল নামে অভিহিত করেছেন। পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ এলাকার সমুদয় অংশই এ সপ্তাঞ্চলে বিভক্ত এবং দৈর্ঘ্যে এরা পশ্চিম হতে পূর্বদিকে বিস্তৃত। এর প্রথম অঞ্চলটি ভূ-বিষুব রেখার সাথে তার দক্ষিণ সীমা স্পর্শ করে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে রয়েছে। এর পিছনে দক্ষিণ দিকে প্রান্তর ও মরুভূমি ব্যতীত আর কিছু নেই। যদি কোন লোকালয় আছে বলেও প্রমাণিত হয়, তবে তাকেও জনবসতি না বলাই শ্রেয়। উক্ত প্রথম অঞ্চলের সন্নিহিত উত্তর দিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঞ্চলের অবস্থান এবং অনুরূপভাবে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অঞ্চল বিন্যস্ত রয়েছে। উত্তর দিক থেকে উক্ত সপ্তম অঞ্চলই জনবসতির শেষ সীমা। উক্ত অঞ্চলের পরে প্রান্তর ও শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই। এটাও এ দিক থেকে প্রথম অঞ্চলের পশ্চাদবর্তী দক্ষিণের অনুরূপ এবং বেষ্টনকারী সাগর পর্যন্ত একই অবস্থায় বিরাজমান। অবশ্য উত্তর দিকের জনবসতিহীন অঞ্চল দক্ষিণ দিকের অনুরূপ অঞ্চল অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক ক্ষুদ্র।[২৭]

---

২৫. এ আল-খাজিনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইনি আবু জাফর আল-খাজিন নন, যার বর্ণনা পরে আসছে। যতদূর মনে হয়, তাঁর মন্তব্য পাদটীকায় সংযোজিত হয়েছিল। পরে কোন সংস্করণে তা মূল পাঠের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রোজেনথালও এরূপ উল্লেখ করেছেন।

২৬. এর পর আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থের পাঠ অনুসরণ করব। এর সাথে রোজেনথালের গৃহীত পাঠের স্থানে স্থানে কিছুটা ব্যতিক্রম বিদ্যমান। আমরা পাদটীকায় উক্ত ব্যতিক্রমধর্মী পাঠের অনুবাদ তুলে ধরব।

২৭. এর পর রোজেনথালের অনুবাদে নিম্নের অংশটি বিদ্যমান—

দিবসের দৈর্ঘ্য ও অক্ষাংশ সম্পর্কে এটা জেনে রাখা ভাল যে, আকাশের দুটি ধ্রুবনক্ষত্র ভূ-বিষুব রেখার দিকে পশ্চিমে পূর্বে দিগ্বলয়ে বিরাজমান এবং সূর্য তার খ-মধ্যে অবস্থান করছে; এ অবস্থায় আমরা যদি পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ এলাকা ক্রমশ উত্তর দিকে অতিক্রম করতে থাকি, তাতে উত্তর ধ্রুবনক্ষত্র ক্রমান্বয়ে উপরে উঠবে ও দক্ষিণ ধ্রুবনক্ষত্র নিম্নে নেমে যাবে। তদুপরি সূর্য খ-বিষুব রেখা হতে একটি সমানুপাতিক দূরত্ব অতিক্রম করে থাকে। এ তিনটি দূরত্ব পরস্পর সমান। তাদের প্রত্যেকটিকে ভৌগোলিক অক্ষাংশ বলা হয় এবং এটা সময় নির্ধারণকারীদের নিকট অতিশয় পরিচিত।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা পৃথিবীর অক্ষাংশীয় প্রসার ও অঞ্চলসমূহের অক্ষাংশীয় প্রসার সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। টলেমী বলেন যে, পৃথিবীর সমগ্র জনবসতিপূর্ণ এলাকার অক্ষাংশীয় প্রসার ৭৭$\frac{১}{২}$। ভূ-বিষুব রেখার বাইরে দক্ষিণ দিকে জনবসতিপূর্ণ এলাকার অক্ষাংশীয় প্রসার ১১°। এভাবে উক্ত রেখার উত্তরাংশে অবস্থিত জনবসতির মোট অক্ষাংশীয় প্রসার ৬৬$\frac{১}{২}$। তাঁর মতে প্রথম অঞ্চল ১৬°, দ্বিতীয় ২০°, তৃতীয় ২৭°, চতুর্থ ৩৩°, পঞ্চম ৩৮°, ষষ্ঠ ৪৩^{৮} এবং সপ্তম ৪৮° পর্যন্ত প্রসারিত। এরপর তিনি পৃথিবীর উপরিভাগের দূরত্বের পরিমাপ অনুসারে আকাশের অংশ নির্ধারণ করে তা ৬৬$\frac{২}{৩}$ মাইলে পরিণত করেন। এতে প্রথম অঞ্চল দক্ষিণে উত্তরে ১০৬৭ মাইল। দ্বিতীয় ২৩৩৩ মাইল, তৃতীয় ২৭৯০ মাইল, চতুর্থ ২১৮৫ মাইল, পঞ্চম ২`২০ মাইল, ষষ্ঠ ২৮৪০ মাইল এবং সপ্তম অঞ্চল ৩১৫০ মাইল প্রশস্ত।

www.amarboi.org

এ সকল অঞ্চলের দিনরাত্রির দৈর্ঘ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। সূর্যের খ-বিষুব রেখা থেকে অয়ন ও উত্তর ধ্রুবনক্ষত্রের দিগ্বলয়ে উত্থিত হওয়ার কারণে দিবারাত্রির বৃত্তচাপের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি হওয়ার ফলে এটা ঘটে থাকে। প্রথম অঞ্চলের শেষাংশ দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য সমপরিমাণে বিরাজ করে। সূর্যের মকর রাশির প্রারম্ভে আগমনে রাত্রি এবং কর্কট রাশির প্রারম্ভে আগমনের দিন। এ উভয়ের দৈর্ঘ্য তের ঘণ্টা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তার সন্নিহিত উত্তরের দ্বিতীয় অঞ্চলের শেষাংশেও সূর্যের কর্কট রাশির আগমনে দিবসের দৈর্ঘ্য সাড়ে তের ঘণ্টা হয়। বস্তুত তা সূর্যের গ্রীষ্মকালীন আবর্তন (উত্তরায়ন)। এরূপভাবে সূর্যের শীতকালীন আবর্তনে (দক্ষিণায়নে) মকররাশির প্রারম্ভে উপনীত হওয়ায় ঐ অঞ্চলে রাত্রির দৈর্ঘ্যও দিবসের অনুরূপ হয়। দিবারাত্রির সমুদয় সময়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাড়ে তের ঘণ্টা বাদে অবশিষ্টাংশ খর্ব দিন-রাত্রির জন্য নিরূপিত হয় এবং এতে আকাশের একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হয়। এরূপভাবে তৃতীয় অঞ্চলের শেষাংশে চৌদ্দ ঘণ্টা, চতুর্থ অঞ্চলের শেষাংশে সাড়ে চৌদ্দ ঘণ্টা, পঞ্চম অঞ্চলের শেষাংশে পনের ঘণ্টা, ষষ্ঠ অঞ্চলের শেষাংশে সাড়ে পনের ঘণ্টা এবং সপ্তম অঞ্চলের শেষাংশে দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্য ষোল ঘণ্টা হয়ে থাকে। এখানেই জনবসতির শেষ। সুতরাং এ সকল অঞ্চলে দিবারাত্রির দৈর্ঘ্যের তারতম্য প্রতিটি অঞ্চলের জন্য মাত্র অর্ধ ঘণ্টা। এটা প্রথম অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ক্রমশ দূরত্বের পর্যায় অনুসারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে শেষ অঞ্চলের উত্তর প্রান্তে এসে শেষ হয়।

[২৮] এ সকল অঞ্চলের অক্ষাংশের অর্থ হল, সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রারম্ভের বিপরীত ভূ-বিষুব রেখার প্রারম্ভের বিপরীতে অবস্থিত খ-বিষুব রেখার মধ্যকার দূরত্ব। উক্ত দূরত্বের

২৮. এর পূর্বে রোজেনথালের অনুবাদের নিম্নের অংশটি সংযোজিত হয়েছে :
ইসহাক ইবনে আল হাসান আল-খাজিনী মনে করেন যে, ভূ-বিষুব রেখার বাইরে জনবসতির অক্ষাংশীয় প্রসার ১৬°২৫″ এবং সেখানকার দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য তের ঘণ্টা। প্রথম অঞ্চলের অক্ষাংশীয় প্রসার ও দিবারাত্রিও উক্ত এলাকার অনুরূপ। দ্বিতীয় অঞ্চলের প্রসার ২৪° এবং এর প্রান্তীয় অংশের দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য সাড়ে তের ঘণ্টা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তৃতীয় অঞ্চলে ৩০° ও চৌদ্দ ঘণ্টা। চতুর্থ অঞ্চলে ৩৬° ও সাড়ে চৌদ্দ ঘণ্টা। পঞ্চম অঞ্চলে ৪১° ও পনের ঘণ্টা, ষষ্ঠ অঞ্চলে ৪৫° ও সাড়ে পনের ঘণ্টা এবং সপ্তম অঞ্চলে সাড়ে ৪৮° ও ষোল ঘণ্টা হয়ে থাকে। সপ্তম অঞ্চলের পরে অক্ষাংশীয় প্রসার ৬৩° অংশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে এবং সেখানে দিবারাত্রির সর্বাপেক্ষা দৈর্ঘ্য বিশ ঘণ্টা।
ইসহাক খাজিনী ব্যতীত এ বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তির ধারণা এই যে, ভূ-বিষুব রেখার বাইরে জনবসতির অক্ষাংশীয় প্রসার ১৬°২৭″। প্রথম অঞ্চল ২০°১৫″, দ্বিতীয় অঞ্চল ২৭°১৩″, তৃতীয় অঞ্চল ৩৩°২০″, চতুর্থ অঞ্চল ৩৮$\frac{১}{২}$, পঞ্চম অঞ্চল ৪৩°, ষষ্ঠ অঞ্চল ৪৭°৫৩″—অন্য এক মতে ৪৬°৫০″ এবং সপ্তম অঞ্চল ৫১°৫৩″ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সপ্তম অঞ্চলের পরে জনবসতি ৭৭° অংশ পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে।
আবু জাফর আল-খাজিনী এ বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ জ্ঞানী, তাঁর ধারণা এই যে, প্রথম অঞ্চলের অক্ষাংশীয় প্রসার ১° হতে ২০°১৩″, দ্বিতীয় অঞ্চলের ২৭°১৩″, তৃতীয় অঞ্চলের ৩৩°৩৯″, চতুর্থ অঞ্চলের ৩৮°২৩″, পঞ্চম অঞ্চলের ৪২°৫৮″, ষষ্ঠ অঞ্চলের ৪৭°২″ এবং সপ্তম অঞ্চলের ৫০°৪৫″ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।
বিভিন্ন অঞ্চলের মাইলে প্রদত্ত প্রস্থ অনুসারে তাদের অক্ষাংশীয় প্রসার ও দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে এটাই আমার নানাবিধ মতবাদের জ্ঞান। আল্লাহ্ সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাদের পথ নির্দেশ করেছেন।'

www.amarboi.org

অনুপাতে দক্ষিণ ধ্রুবনক্ষত্র সংশ্লিষ্ট স্থানের দিগ্বলয়ের নিম্নে নেমে যায় এবং উত্তর ধ্রুবনক্ষত্র উপরে উঠে আসে। এ তিনটি সমপরিমাণ দূরত্বের নামই অক্ষাংশ, যেমন তার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে।

ভূগোল সম্পর্কে বক্তব্য প্রদানকারী জ্ঞানীদের এ সপ্ত অঞ্চলের প্রতিটিকে পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত দৈর্ঘ্যানুযায়ী সমান দশভাগে ভাগ করেছেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অংশের নগর, গ্রাম, পর্বত, নদী ও তৎসমুদয়ের মধ্যবর্তী পথের দূরত্বের বর্ণনা করেছেন। আমরা এখন বক্তব্য সংক্ষেপ করে উক্ত প্রতিটি অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত নগর, নদী, সমুদ্র, প্রভৃতির বিবরণ দান করব। এ প্রসঙ্গে আমরা আল-উলুবী, আল-ইদরিসী, আল-হামুদী প্রণীত 'নুজহাতুল মুশতাক' নামক গ্রন্থের বিবরণকে অনুসরণ করব। তিনি সিসিলী দ্বীপের খ্রিস্টান সম্রাট রোজার ইবনে রোজারের জন্য এটা প্রণয়ন করেছিলেন। ইদরিসী পরিবার মালগার শাসনভার ত্যাগ করার পর তিনি সিসিলীতে রোজারের দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট হন। এ গ্রন্থ প্রণয়নের কাল হিজরি ষষ্ঠ (দ্বাদশ খ্রি:) শতাব্দীর মধ্যভাগ। আল-ইদরিসী উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে বহু পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন; যেমন মাসউদী ইবনে খুরদাজবিয়া[২৯], আল-হাওকলী[৩০], আল-কুদুরী[৩১], ইবনে ইসহাক আল মুনজ্জিম[৩২], বাতলিমুস (টলেমী) প্রমুখ মনীষীবৃন্দের পুস্তকাদি। আমরা এখন প্রথম অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে শেষ অঞ্চল পর্যন্ত বর্ণনা করব। আল্লাহ্ই পবিত্র এবং উন্নত, তিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

প্রথম অঞ্চল

এর পশ্চিম দিকে এমন কতকগুলো চিরকালীন দ্বীপ বিদ্যমান, যেখান থেকে টলেমী এ অঞ্চলের দ্রাঘিমা আরম্ভ করেছেন। বস্তুত এ দ্বীপগুলো উক্ত অঞ্চলের ভূখণ্ডের অন্তর্গত নয়। এগুলো বেষ্টনকারী সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। দ্বীপের সংখ্যা অনেক হলেও তন্মধ্যেও বৃহৎ মাত্র তিনটি। বলা হয় যে, এগুলো (ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ) জনবসতিপূর্ণ। আমরা জানতে পেরেছি যে,[৩৩] বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে কতকগুলো খ্রিস্টান জাহাজ এ সমস্ত দ্বীপে পৌঁছে অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা তাদের আবাসস্থল লুণ্ঠন করে, তাদেরকে বন্দী করে এবং তাদের অনেককে এনে মরক্কোতে বিক্রয় করে দেয়। তারা ক্রীতদাস হিসাবে সেখানকার শাসকের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। তারা আরবি ভাষা শিক্ষা করবার পরে তদের দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা বর্ণনা করে। তারা বলে যে, তারা শস্য উৎপাদনের জন্য শৃঙ্গের দ্বারা জমি চাষ করে। তাদের দ্বীপে লৌহের ব্যবহার নেই। তারা যবের রুটি খায় এবং গৃহপালিত পশু হিসাবে ছাগল পালন করে। তারা পিছন দিকে পাথর ছুড়ে যুদ্ধ করে। উদয়কালে তারা সূর্যের উপাসনা করে থাকে। তারা কোন ধর্মের

২৯. উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে খুরদাজবিয়া; জীবনকাল খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দির প্রথমাংশ।

৩০. আবুল কাশেম ইবনে হাওকল, খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দি।

৩১. মূল গ্রন্থে আল-কুদূরী লেখা আছে। রোজেনথাল একে আল-উদরী লিখেছেন। ইনি আহমদ ইবনে উমর আল-উদরী, জীবনকাল ৩৯৩-৪৭৮ (১০০৩-১০৮৫ খ্রি:) হি:।

৩২. তাঁর খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দির জীবনকাল যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়নি।

৩৩. উক্ত ঘটনা যতদূর সম্ভব ইবনে খলদুনের সমসাময়িক।

www.amarboi.org

কথা জানে না এবং তাদের নিকট ধর্মের কোন বাণীও পৌঁছেনি। আকস্মিকভাবে গিয়ে না পৌঁছলে ইচ্ছে করে এ সকল দ্বীপে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা সমুদ্রপথে বায়ু ও স্রোতের গতির উপর জাহাজের চলাচল নির্ভর করে। সুতরাং কোন স্থান থেকে জাহাজ চালনা করতে হলে স্রোতের গতি ও বায়ুর প্রবাহ পথ জেনে নিতে হয়। একটি নির্দিষ্ট বায়ু প্রবাহ কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাবে এবং যদি তাতে পরিবর্তন ঘটে, তাহলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার অনুকূল প্রবাহ কোথায় পাওয়া যাবে, তৎসমুদয় জানা দরকার। সমুদ্রপথে জাহাজ চালনায় অভিজ্ঞ নাবিকগণ এ বিষয়ে যে নীতি-নিয়ম নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার সাথে পরিচিত হয়েই জাহাজে পাল তুলতে হয়, যাতে তা গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারে। রোম সাগরের মধ্যভাগে ও তার তীরে যে সকল শহর বিদ্যমান, তৎসমুদয়ের অবস্থানগত ও পর্যায়ক্রমিক বিবরণ একটি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে বিভিন্ন বায়ু এবং তাদের গতিপথও লিখিত আছে। তারা এর নামকরণ করেছেন 'কম্পাস'। তারা সমুদ্রযাত্রায় এরই উপর নির্ভর করেন। বস্তুত বেষ্টনকারী সমুদ্র সম্পর্কে এ সকল জ্ঞানের একান্ত অভাব। এজন্যই জাহাজ তাতে প্রবেশ করে না। কারণ একবার সমুদ্রতীর থেকে তাতে অন্তর্হিত হলে পুনরায় তীরে ফিরে আসবার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। তদুপরি উক্ত সমুদ্রের উপরিভাগে ও তার পৃষ্ঠদেশে এমন ঘন কুয়াশা বিদ্যমান, যা জাহাজ চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে। দূরত্বের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিবিম্বিত সূর্যকিরণ তাতে প্রতিফলিত হতে পারে না এবং এজন্য তা দূরও হয় না। সুতরাং এ সকল দ্বীপের পথনির্দেশ কষ্টকর এবং তার সংবাদ সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন।

অত্র অঞ্চলের প্রথম অংশে নীলনদের অববাহিকা বিদ্যমান। এটা, যেমন পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি, কুমার পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং এটাকে সুদানী নীল বলা হয়। এটা বেষ্টনকারী সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে 'আঞ্চলিক[৩৪] দ্বীপের নিকট তাতে পতিত হয়েছে। এরই তীরে 'সীলা', 'তাকরুর' ও 'ঘানা' শহর অবস্থিত। এ সবগুলো বর্তমানে সুদানী জাতির অন্তর্গত মালির[৩৫] সম্রাটের অধীন। মরক্কোর বণিকদল তাদের এ শহরগুলোতে যাতায়াত করে থাকে।

এরই সন্নিহিত উত্তর দিকে 'লামতুনা'দের দেশ এবং অন্যান্য আবৃত বারবার গোত্র (সিনহাজা) ও তাদের বিচরণস্থল মরু অঞ্চল বিদ্যমান। এ নীলনদের দক্ষিণ দিকে সুদানীদের একদল লোক বাস করে, যাদেরকে 'লামলাম' বলা হয়। তারা ধর্মবিশ্বাসী নয়। তারা মুখমণ্ডলে ও গণ্ডদ্বয়ে দাগ দিয়ে থাকে। ঘানা ও তাকরুরবাসীরা তাদেরকে মাগরিবে নিয়ে আসে এবং সেখানে তারা সাধারণ ক্রীতদাসে পরিণত হয়। এদের পশ্চাৎভাগে দক্ষিণ দিকে এমন কোন জনবসতি নেই, যাদেরকে সভ্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। ঐ সকল লোক মানুষ অপেক্ষা জীবজন্তুর সাথে অধিকতর তুলনীয়। এরা কুঁড়ে ও গুহায় বাস করে এবং অসিদ্ধ শাকসব্জী ও শস্যাদি খেয়ে থাকে। অনেক সময় এরা নিজেরাই একে অপরকে আহার করে ফেলে। এদেরকে মানুষ বলে গণ্য করা যায় না।

৩৪. ব্যাঙ্কা অন্তরীপের নিকট অবস্থিত আরগুইন দ্বীপ।

৩৫. মান্ডিংগো জাতি। রোজেনথাল সুদানী অর্থে সর্বত্র লিখেছেন।

www.amarboi.org

সুদানের সমস্ত ফলমূল মাগরিবের সুরক্ষিত মরু গ্রাম, যেমন 'তোহাত', 'তাকদারারিন',[৩৬] 'ওরগালান' প্রভৃতি থেকে এসে থাকে। বলা হয় যে, ঘানায় উলুবীদের একটি রাজ্য ছিল। তারা বনি সালেহ হিসাবে পরিচিত। রোজার গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন যে, এদের পূর্বপুরুষ এ সালেহ, আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে হাসানের পুত্র। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাসানের বংশে সালেহ বলে কারও নাম জানা যায় না। যাহোক বর্তমানে উক্ত রাজ্য আর নেই এবং ঘানা মালির সম্রাটের অধীন।

এ এলাকার পূর্বদিকে অত্র অঞ্চলের তৃতীয়াংশে সেখানকার কোন পর্বত থেকে উৎপন্ন এক নদীর তীরে 'গাওগাও'[৩৭] নামে একটি এলাকা বিদ্যমান। উক্ত নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে অত্র অঞ্চলের দ্বিতীয়াংশের মরুভূমিতে বিলীন হয়েছে। গাওগাও এলাকার সম্রাট স্বাধীন ছিল। অতঃপর মালির সম্রাট তাকে পরাজিত করে উক্ত অঞ্চল তার অধীনে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা পুনরায় সেখানকার কিছু গোলযোগের দরুন বের হয়ে গেছে। আমরা বারবারদের ইতিহাস বর্ণনার সময় যথাস্থানে মালির সম্রাটদের বিবরণ দান প্রসঙ্গে এর আলোচনা করব। গাওগাও এলাকার দক্ষিণ দিকে এক সুদানী গোত্র 'কানিম'দের অঞ্চল। এর পর নীলের উত্তর তীরে 'ওয়াঙ্গার' অবস্থিত।

উক্ত কানিম ও ওয়াঙ্গার, এলাকার পূর্বে 'জাগাওয়া' ও 'তাজেরা'[৩৮] এলাকা রয়েছে। শেষোক্তটি অত্র অঞ্চলের চতুর্থাংশে অবস্থিত 'নোবা' ভূমির সন্নিহিত। এতে মিশরীয় নীলনদ তার ভূ-বিষুব রেখার সন্নিকটস্থ উৎসস্থল থেকে উত্তর দিকে রোম সাগরের অভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে। উক্ত নীল ভূ-বিষুব রেখার উপরে ষোল অংশে অবস্থিত 'কুমার' পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এ পর্বতের নাম হিসাবে ব্যবহৃত শব্দটি নিয়ে জ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। কেউ কেউ একে 'কাফ' ও মীরের হ্রস্ব অ-কারসহ 'কমর' উচ্চারণ করেছেন। এর অর্থ চন্দ্র। উক্ত পর্বতের শুভ্র রং ও তীব্র আভার দরুন এরূপ ধারণা করেছেন। ইয়াকুত তাঁর 'মুশতারিক' নামক গ্রন্থে 'কাফের' উ-কার ও 'মীমের' হসন্তসহ—'কুম্‌র' উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এটা ভারতীয় কোন গোত্রের নাম।[৩৯] ইবনে সাইদও[৪০] অনুরূপ উচ্চারণের পক্ষপাতী।

উক্ত পর্বত থেকে দশটি ঝর্ণা নির্গত হয়ে তার পাঁচটি একটি হ্রদে ও অবশিষ্ট পাঁচটি অন্য একটি হ্রদে পতিত হয়েছে। উক্ত দুটি হ্রদের মধ্যকার ব্যবধান ছয় মাইল। এতদুভয় থেকে তিনটি করে নদী বহির্গত হয়ে সবগুলো একটি নিম্ন প্রান্তরে একত্র হয়েছে। এর প্রান্তদেশে একটি পর্বত অবস্থিত এবং উক্ত পর্বত তার উত্তর নিম্ন প্রান্তের গতিধারাকে দুইভাগে ভাগ করেছে। এর ফলে তা থেকে দুটি নদের উৎপত্তি ঘটেছে। তার পশ্চিম দিগস্থ নদটি পশ্চিম দিকে সুদান দেশ অতিক্রম করে বেষ্টনকারী সমুদ্রে

---

৩৬. রোজেনথাল এর উচ্চারণ লিখেছেন 'তাগ্‌উরারিন'।
৩৭. মূলে আছে 'কাওকাও'।
৩৮. জাগাই; রোজেনথাল বলেছেন কোন কোন সংস্করণে, নাকি এ উচ্চারণ বিদ্যমান। 'তাজিরা' শব্দটির 'য়ে' ইবনে খলদুনের সংযোজন। ইদরিসীর বর্ণনায় তাজিয়া উচ্চারণ বিদ্যমান।
৩৯. ইয়াকুতের বর্ণনায় ভারতীয় গোত্রের কথা উল্লেখিত হয়নি। সম্ভবত এটা ইবনে খলদুনের নিজের ধারণা। তদুপরি ইয়াকুত 'কুমর দেশে'র কথা বলেছেন, পর্বতের কথা নয়।
৪০. ত্রয়োদশ শতাব্দির ঐতিহাসিক; ইবনে খলদুন বহু স্থানে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন।

www.amarboi.org

পতিত হয়েছে। পূর্বদিগস্থ নদটি উত্তর দিকে আবিসিনিয়া ও নোবা এবং তন্মধ্যস্থ ভূ-ভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মিশরের উচ্চভূমিতে উপনীত হয়ে এটা একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর তিনটি শাখা 'আলেকজান্দ্রিয়া', 'রশিদা' ও 'দিমিয়াতা'র নিকটে রোম সাগরে পতিত হয়েছে। অন্য একটি শাখা সমুদ্রে পড়বার পূর্বে অত্র অঞ্চলের মধ্যভাগে লবণহ্রদে এসে মিশেছে।

এ নীলনদের তীরে 'আবিসিনিয়া', 'নোবা' ও 'আলওয়াহাত' (ওয়েসিস)-এর বহু এলাকা 'আসোয়ান' পর্যন্ত বিস্তৃত। নোবার বর্তমান শহরের নাম দাঙ্কালা। তা নীলের পশ্চিম তীরে এবং তার পরেই 'আলোয়া'[৪১] ও বুলাক[৪২] অবস্থিত। এরপর বুলাক থেকে ছয়দিনের পথের দূরত্বে উত্তরদিকে জলপ্রপাতের পর্বত বিদ্যমান। উক্ত পর্বত মিশরের দিক থেকে উচ্চ ও নোবার দিক থেকে নিম্ন হয়ে গেছে। নীলনদ এতে প্রবেশ করে এক ভয়ানক প্রপাতের সৃষ্টি করে বহুদূর প্রবাহিত হয়েছে। এ কারণে এতে নৌ-চলাচল অসম্ভব। সুদানী নৌকার মালামাল পশুপৃষ্ঠে সেখান থেকে সাইদের রাজধানী আসোয়ানে বহন করা হয়। অনুরূপভাবে সাইদের নৌকার মালামাল জলপ্রপাতের উপর তোলা হয়। আসোয়ান ও জলপ্রপাতের মধ্যকার দূরত্ব বারদিনের পথ। আল-ওয়াহাতের পশ্চিম দিকে নীলনদের তীরভূমি অবস্থিত। ওয়াহাত ধ্বংসাবশেষ মাত্র। তাতে বহু প্রাচীন জনবসতির চিহ্ন বিদ্যমান।

প্রথম অঞ্চলের মধ্যভাগে তার পঞ্চমাংশে আবিসিনিয়া অবস্থিত। তার মধ্য দিয়ে ভূ-বিষুব রেখার অপর দিক থেকে আগত একটি নদী নোবা পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং সেখানে এটা মিশরগামী নীলনদে পতিত হয়েছে। এর উৎপত্তি সম্পর্কে বহুলোক অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে যে, তা কুমার পর্বতে উৎপন্ন নীলের অংশ। টলেমী তাঁর ভূগোলে এ নদী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এটা এ নীলনদের অংশ নয়। আলোচ্য অঞ্চলের মধ্যভাগে পঞ্চমাংশে চীনের প্রান্ত থেকে প্রবেশকারী ভারত সাগর শেষ হয়েছে। এটা অত্র অঞ্চলের পঞ্চমাংশের সমুদয় এলাকা আবৃত করে রেখেছে। এ কারণেই অভ্যন্তরস্থ দ্বীপসমূহ ব্যতীত অন্যত্র জনবসতি নেই। এ দ্বীপের সংখ্যা অনেক এবং এটা প্রায় সহস্রের নিকটবর্তী। অবশ্য উক্ত সাগরের দক্ষিণ তীরে জনবসতি বিদ্যমান এবং তাই দক্ষিণ দিকের জনবসতির শেষ সীমা। যেমন, তার উত্তর তীরে জনবসতি বিদ্যমান। এ সকল তীরভূমির মধ্যে কেবল চীনের পূর্বাংশের সামান্য এলাকাই প্রথম অঞ্চলে পড়েছে এবং ইয়ামেনের সমুদয় এলাকা আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠাংশে অবস্থিত।[৪৩]

আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠাংশে উক্ত ভারত সাগর থেকে দুটি সাগর উত্তর দিকে বের হয়ে গেছে, তাদের একটি লোহিত সাগর ও অন্যটি পারস্য সাগর। এদের মধ্যভাগে আরব উপদ্বীপ অবস্থিত। এর পূর্ব প্রান্তে ভারত সমুদ্র তীরে ইয়াসেন ও শিহর এলাকা

৪১. বর্তমান খার্তুমের নিকটবর্তী একটি প্রাচীন শহর।
৪২. এর উচ্চারণ 'বিলাক' ও বিদ্যমান।
৪৩. এখানে মূল পাঠে সম্ভবত ভুল আছে এবং শুদ্ধ পাঠ নির্ধারণের উপকরণ আমাদের সম্মুখে নেই। এস্থলে আমরা রোজেনথালের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

www.amarboi.org

বিদ্যমান। এর মধ্যস্থ হেজাজ, ইয়ামাসা ও তার সন্নিহিত এলাকা দ্বিতীয় অঞ্চলে অবস্থিত, যেমন আমরা অচিরেই এর ও পরবর্তী বিষয়ের বর্ণনা করব।

যাহোক, উক্ত ভারত সাগরের পশ্চিম তীর আবিসিনিয়ার অন্তর্গত প্রান্তীয় এলাকা 'জালা', আবিসিনিয়ার উত্তর দিগস্থ সাইদের উচ্চভূমির অন্তর্গত আল্লাকী পর্বত ও ভারত সাগর থেকে উৎপন্ন লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী 'বেজার' প্রান্তর। জালার নিম্নভাগে উত্তর দিকে এ অংশে 'বাবেল মান্দিব' প্রণালী অবস্থিত। মান্দিব পাহাড়ের ফলে এখানে সাগরের বিস্তার অনেকখানি কমে গেছে। কারণ এখানে উক্ত পাহাড়টি ভারত সাগরের মধ্যভাগের অভিমুখে ইয়ামেনের তীরভূমির সাথে তাল রেখে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে দৈর্ঘ্যে বার মাইল এগিয়ে এসেছে। এর ফলে সাগরের বিস্তার সেখানে মাত্র তিন মাইল বা তার কাছাকাছি। এর ফলে সাগরের বিস্তার সেখানে মাত্র তিন মাইল বা তার কাছাকাছি। তাকে বাবেল মান্দিব বলা হয় এবং তার মধ্য দিয়েই ইয়ামেনের জাহাজ মিশরের সন্নিকটে সুয়েজ তীরে গিয়ে উপনীত হয়। এ বাবেল মান্দিবের নিম্নভাগেই 'সুয়াকীন' ও 'দহলক' দ্বীপ বিদ্যমান এবং তার সম্মুখ ভাগে পশ্চিম দিকে বেজা নামক সুদানী গোত্র অধ্যুষিত প্রান্তর, যেমন পূর্বেই বর্ণনা করেছি। র পূর্বদিকে এ অংশেই ইয়ামেনে তেহামা এলাকা ও তারই তীরভূমিতে 'আলী ইবনে ইয়াকুব' অবস্থিত। 'জালা' এলাকার দক্ষিণ দিকে এ সমুদ্রের পশ্চিম তীর ধরে বারবার গ্রামাঞ্চল একটির পর একটি বিদ্যমান। এটা আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠাংশের শেষ সীমা পর্যন্ত ভারত সাগরের দক্ষিণ তীর ধরে অগ্রসর হয়ে গেছে।

এরই সন্নিহিত পূর্বদিক থেকে 'জঞ্জ' এলাকা আরম্ভ হয়েছে।[৪৪] এরপর উক্ত সাগরের দক্ষিণ তীরে আলোচ্য অঞ্চলের সপ্তমাংশে অবস্থিত 'সুফালা' এলাকা। এ দক্ষিণ তীরেই সুফালার পর পূর্বদিকে 'ওয়াক ওয়াক' এলাকর বিস্তার শুরু হয়েছে। এটা অনবরত অগ্রসর হয়ে বেষ্টনকারী ভারত সাগরের প্রবেশস্থলে আলোচ্য অঞ্চলের দশমাংশের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছে।

ভারত সাগরের দ্বীপের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সরন্দ্বীপ (সংহল)। এর আকৃতি গোল এবং এতে একটি বিখ্যাত পর্বত বিদ্যমান। বলা হয় যে, পৃথিবীতে তার তুল্য উচ্চ পর্বত আর নেই। এটা সুফালার বিপরীত দিকে অবস্থিত। অতঃপর কুমার দ্বীপ (জাভা)। এটা অতিশয় দীর্ঘ। এটা সুফলার বিপরীত দিক থেকে আরম্ভ করে অধিকাংশ উত্তর দিক ঘেঁষে পূর্বদিকে চীনের উচ্চ তীরভূমির নিকটে গিয়ে পৌঁছেছে। ভারত সাগরে এ দ্বীপমালার দক্ষিণ দিকে ওয়াক ওয়াক দ্বীপপুঞ্জ এবং এর পূর্বদিকে সিনান (কোরিয়া) দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য বহু দ্বীপ একে বেষ্টন করে রেখেছে। ভারত সাগরে আরও অসংখ্য দ্বীপ বিদ্যমান। এতে নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য ও মসলা পাওয়া যায়। বলা হয় যে, এগুলোতে স্বর্ণ ও মণি-মানিক্যের খনি আছে। অধিবাসীদের অধিকাংশই মজুসী[৪৫] ধর্মে দীক্ষিত। তাদের মধ্যে একাধিক রাজা বিদ্যমান। এ সকল

৪৪. এরপর রোজেনথালের অনুবাদ—মগাদিশু শহর ও তার যাযাবর অধিবাসীর কথা বলা হয়েছে। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই।

৪৫. ৫ নং টীকা দ্র: (প্রথম প্রস্তাবনা)।

www.amarboi.org

দ্বীপে মানব সভ্যতার বহু অদ্ভুত নিদর্শন বিদ্যমান। ভূগোলবিদগণ তার বিবরণ দান করেছেন।

ভারত সাগরের উত্তর তীরে প্রথম অঞ্চলের ষষ্ঠমাংশে ইয়ামেনের সমুদয় এলাকা অবস্থিত। লোহিত সাগরের দিক থেকে জাবিদ, আল-মাহজাম ও ইয়ামেনের তেহামা। এরপর জায়েদী ইমামদের আবাসভূমি 'সাআদা'। এটা দক্ষিণ দিকের ও পূর্ব দিকের সাগর থেকে বহু দূরে অবস্থিত। এতে তার পর 'এডেন' শহর এবং এরপরে উত্তর দিকে 'সান্আ' শহর বিদ্যমান। উক্ত দুটি শহর থেকে পূর্ব দিকে 'আহকাফ' ও 'জুফার' এলাকা বিস্তৃত। এরপর হাদ্রামাত এবং এরপরে দক্ষিণ সাগর ও পারস্য সাগরের মধ্যভাগে 'শিহর' এলাকা বিদ্যমান।

আলোচ্য অঞ্চলের মধ্যভাগীয় অন্যান্য অংশের মধ্যে ষষ্ঠাংশের এটাই এমন একটি ভূখণ্ড, যা সমুদ্রের দ্বারা আবৃত নয়। এরপরে সপ্তমাংশের অতি সামান্য ভূখণ্ডই সমুদ্রের বাইরে বিদ্যমান। অবশ্য দশমাংশের যে বৃহৎ ভূখণ্ড সমুদ্র সীমার বাইরে আছে, তা হল চীনের উচ্চভূমি এলাকা। তার প্রসিদ্ধ শহরগুলোর মধ্যে একটি হল 'খানকু' (ক্যানটন)। তার সম্মুখভাগে পূর্ব দিকে সিলান (কোরিয়া) দ্বীপপুঞ্জ। তার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। প্রথম অঞ্চল সম্পর্কে এটাই আমাদের শেষ কথা। আল্লাহ্ পবিত্র ও উন্নত, তিনিই তাঁর দয়ায় ও অনুগ্রহে সহায়তার অধিকারী।

দ্বিতীয় অঞ্চল

এটা উত্তর দিক থেকে প্রথম অঞ্চলের সন্নিহিত। এর পশ্চিম দিকের সম্মুখ ভাগে বেষ্টনকারী সাগরে দুটি চিরকালীন দ্বীপ বিদ্যমান, যার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। অত্র অঞ্চলের প্রথম ও দ্বিতীয়াংশের উচ্চ পার্শ্বে 'কানুরিয়া' দেশ এবং এরপরে পূর্ব দিকে ঘানার উচ্চভূমি। এরপর 'জাগাওয়া' প্রান্তর সুদানের অন্তর্গত এবং এদের নিম্ন পার্শ্বে 'নিস্তর' মরুভূমি। এটা ক্রমান্বয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বিস্তৃত। এর দীর্ঘ বিস্তৃত পথে বণিকদল মাগরিব ও সুদানের মধ্যে যাতায়াত করে থাকে। আবৃত বারবার সিনহাজাদের প্রান্তর এর মধ্যে অবস্থিত। তারা বহু শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে 'কাজ্জুলা', 'লামতুনা', 'মাসরাতা', 'লামাতা' ও 'ওরিকা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রান্তরের পূর্ব দিকে 'ফাজ্জান' দেশ এবং এরপরে বারবার গোত্র 'আযকার'দের প্রান্তর। এটা পূর্ব দিকে তৃতীয়াংশের উচ্চভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। এরপর আলোচ্য অংশের সুদানী গোত্রভুক্ত 'কাওয়ার'রেদ এলাকা। অতঃপর 'বাজুইন'দের দেশের ভূ-খণ্ড অবস্থিত। এর পর অত্র তৃতীয়াংশের নিম্নে উত্তর দিকে 'ওদ্দানে'র অবশিষ্ট ভূমি এবং তার বিপরীতে পূর্ব দিকে অবস্থিত 'সেন্তারিয়া' এলাকা, যাকে মধ্য ওয়াহাত (ওয়েসিস) বলা হয়।

আলোচ্য অঞ্চলের চতুর্থাংশের উচ্চ দিকে 'বাজুইন'দের অবশিষ্ট এলাকা বিদ্যমান। এরপর এ অংশের মধ্যভাগে 'সাইদ'[৪৬] এলাকা। তা প্রথম অঞ্চলে উৎপন্ন ও প্রবাহিত হয়ে সাগরে পতিত নীলনদের তীরভূমি ধরে অবস্থিত। উক্ত নীল এ অংশের দুই বাধা

৪৬. রোজেনথাল একে 'উচ্চ মিশর' বলে উল্লেখ করেছেন।

www.amarboi.org

সৃষ্টিকারী পর্বতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এর একটি পশ্চিম দিকে 'ওয়াহাত' পর্বত এবং অন্যটি পূর্ব দিকের 'মুকাত্তাম' পর্বত। এ অংশেরই উপরিভাগে 'আসনা' ও 'আরমানাত' এলাকা বিদ্যমান। এমনিভাবে এ তীরভূমিতে পর পর 'আসিয়ুথ' ও 'কাউস' এবং এরপরে 'সউল' অবস্থিত। এখানে এসে নীল দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর দক্ষিণ ভাগ এ অংশের 'লাহুন' এলাকায় ও এর বাম ভাগ 'দেলাস' এলাকায় এসে শেষ হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী এলাকায় মিশরের উচ্চভূমির অবস্থান।

মুকাত্তাম পর্বতের পূর্ব দিকে আলোচ্য অঞ্চলের পঞ্চমাংশের মধ্য দিয়ে সুয়েজ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত 'আইযাব' মরুভূমি। সুয়েজ সাগরকেই কুলসুম (লোহিত) সাগর বলা হয় এবং এটা ভারত সাগর থেকে দক্ষিণে উত্তরে প্রসারিত। তারই পূর্ব তীরে এ অংশে 'ইয়ালাম লাম' পর্বত থেকে 'ইয়াসরাব'[৪৭] এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হেজাজ প্রদেশ। হেজাজের মধ্যভাগে আল্লাহ্ কর্তৃক সম্মানিত নগরী মক্কা এবং সাগরতীরে অবস্থিত 'জেদ্দা' শহর। তা সাগরের পশ্চিম তীরের আইযাব এলাকার বিপরীত দিকে অবস্থিত।

আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠমাংশের পশ্চিম দিকে 'নজদ' এলাকা এবং এর দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তে 'তাবালা' ও 'জরশ' এলাকা উত্তরে 'উকাজ' পর্যন্ত বিস্তৃত। নজদের নিম্নদিকে অত্র অংশের মধ্যে হেজাজের অবশিষ্ট ভূমি বিদ্যমান। এর বিপরীত দিকে পূর্বাভিমুখে 'নজরান' ও 'খয়বর' এলাকা। এর নিম্নভাগে ইয়ামামা এলাকা এবং নজরানের বিপরীত দিকে পূর্বে 'সাবা' ও 'মারাব' ভূমি। এরপর 'শিহর' নামীয় ভূ-খণ্ড পারস্য সাগর পর্যন্ত প্রসারিত। এটা ভারত সাগর থেকে উত্তর দিকে বহির্গত দ্বিতীয় সাগর, যেমন পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। এটা এ অংশে পশ্চিমদিকে ফিরে গিয়ে এর পূর্বদিক ও অভ্যন্তর ভাগে ত্রিকোণাকার একটি ভূ-খণ্ডের সৃষ্টি করেছে, যার উপরিভাগে শিহরের তীর ভূমিতে 'কালহাত' অবস্থিত। এর নিম্নভাগে তীর ভূমিতে উম্মান এলাকা। এরপর 'বাহরাইন' এবং এর 'হাজার' এলাকা ষষ্ঠাংশের সীমান্ত।

এর সপ্তমাংশের পশ্চিম শেষ প্রান্তে পারস্য সাগরের খণ্ডবিশেষ বিদ্যমান। এটা ষষ্ঠাংশের অনুরূপ খণ্ডের সন্নিহিত। ভারত সাগর এ অংশের উপরিভাগ আবৃত করে রেখেছে। এরই তীরে এখানে 'মাকরান' পর্যন্ত বিস্তৃত সিন্ধু এলাকা এবং এর সম্মুখভাগে 'তওবরান' এলাকা সিন্ধুরই অন্তর্গত। সুতরাং এ অংশের সমগ্র পশ্চিম ভাগে সিন্ধু এলাকা বিস্তৃত রয়েছে এবং এ এলাকা ও হিন্দ ভূ-ভাগের মধ্যে প্রান্তরের ব্যবধান বিদ্যমান। এর উপর দিয়ে হিন্দ থেকে আগত একটি নদী প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিকে ভারত সাগরে পতিত হয়েছে। ভারত সাগরের তীর থেকে হিন্দ এলাকার আরম্ভ এবং এর পূর্বদিকে 'বলহারা' এলাকা বিদ্যমান। তার নিম্নভাগে তাদের পূজ্য বিরাট মূর্তির দেশ মুলতান। অতঃপর সিন্ধুর নিম্নভাগ ও এর উচ্চভাগে 'সিজিস্তান' এলাকা বিস্তৃত।

আলোচ্য অঞ্চলের অষ্টমাংশের পশ্চিম দিকে হিন্দের 'বলহারা'[৪৮] এলাকার অবশিষ্ট ভূ-ভাগ। এর পূর্বদিকে 'কান্দাহার' এবং এর পরে 'মনিবার' (মালাবার) অবস্থিত। ভারত

৪৭. বর্তমান মদিনার প্রাচীন নাম।

৪৮. এটা কি কোন রাজার নাম? 'বল্লভ রায়' শব্দের অপভ্রংশ?

www.amarboi.org

সাগরের তীরভূমির উপরের দিকে ও তার[৪৯] নিচে নিম্নের দিকে 'কাবুল' এবং এর পরে পূর্বদিকে বেষ্টনকারী সাগর পর্যন্ত 'কনৌজ' এলাকা। এটা মধ্য-কাশ্মীর ও বহিঃকাশ্মীরের মধ্য দিয়ে এ অংশের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

এর নবমাংশে পশ্চিম দিকে হিন্দের দূরপ্রান্ত এবং পূর্ব দিকে এটা দশমাংশের সাথে উপরিভাগে এসে মিশেছে। এর নিম্নভাগে চীনের সামান্য একটি ভূ-খণ্ড অবস্থিত, যাতে 'সাইগুন' শহর বিদ্যমান। দশমাংশের অন্য সব এলাকা জুড়ে বেষ্টনকারী সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত চীনদেশ। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই উত্তম জ্ঞাতা। পবিত্র তিনি, তাঁর সহায়তাই যথার্থ এবং তিনিই দয়া ও অনুগ্রহের অধিকারী।

তৃতীয় অঞ্চল

এটা উত্তর দিক থেকে দ্বিতীয় অঞ্চলের সন্নিহিত। এর প্রথমাংশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উচ্চভূমি জুড়ে 'দরন' (এটলাস) পর্বত অবস্থিত। এটা পশ্চিম দিকে বেষ্টনকারী সাগর থেকে আরম্ভ করে পূর্বদিকে উক্ত অংশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। এ পর্বতে বসবাসকারী বারবার জাতির লোকসংখ্যা শুধু তাদের স্রষ্টাই বলতে পারেন। অচিরেই এদের বর্ণনা আসছে। উক্ত পর্বত, দ্বিতীয় অঞ্চল ও বেষ্টনকারী সাগরের মধ্যবর্তী ভূ-খণ্ডের 'রারাতমাশা' অবস্থিত। এরই সন্নিহিত পূর্বদিকে 'সুস' ও 'নওল' এলাকা। ঐদিকেই এর পূর্বদিকে 'দরআ', এর পর 'সিজিলামাশা' এবং এর পর নিস্তর মরুভূমির একটি ভাগ, যার কথা দ্বিতীয় অঞ্চলে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত পর্বত এ অংশের উক্ত সমুদয় এলাকার উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এর পশ্চিম প্রান্তে গিরিপথ ও রাস্তা নেই বললেই চলে। এটা যেখানে মালবিয়া জলপ্রবাহের সাথে মিলিত হয়েছে, সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত প্রচুর গিরিপথ ও রাস্তা বিদ্যমান। এর এ প্রান্তে 'মাসমুদা' জাতির বাস। এরা ক্রমান্বয়ে হিনতাতা,' 'তায়নামলাকা' 'কাদমেওয়া,' 'শামকুরা' প্রভৃতি গোত্রে বিভক্ত এবং শেষোক্তটি মাসমুদাদের শেষ গোত্র। অতঃপর 'সিনহাকা' এবং এরাই সিনহাজা গোত্র। এ অংশের শেষ প্রান্তে কতিপয় 'জানাতী' গোত্র বাস করে। উক্ত পর্বতের মধ্যভাগে এখানে এসে 'আউরাস' পর্বত মিলিত হয়েছে। এটা কুতামার পর্বত। এর পর অন্যান্য বারবার জাতি, তাদের কথা যথাস্থানে বর্ণনা করব।

উক্ত দরন (এটলাস) পর্বত পশ্চিম দিক থেকে মরক্কোর উপর মাথা তুলেছে এবং তা তার সানুদেশে অবস্থিত। তার দক্ষিণ প্রান্তে 'মারাকেশ,' 'আগমাতা' ও 'তাদালা' এলাকা এবং বেষ্টনকারী সাগরের তীরে 'রাবাত আসফা' ও 'সালা' শহর। মারাকেশের মধ্যভাগের দিকে 'ফাস,' 'মেকনাসা,' 'তাজা' ও 'কাসরু কুতামা' এলাকা অবস্থিত। এ এলাকাকে স্থানীয় অধিবাসীরা 'দূর মাগরিব' বলে অভিহিত করে থাকে। এর বেষ্টনকারী সাগরতীরে 'আসিলা' (আরসিলা) ও 'আল-আরায়েশ' (লারসা) এলাকা বিদ্যমান। এ সকল এলাকার দিকে পূর্বে মধ্য-মাগরিবের এলাকা অবস্থিত ও তার রাজধানী

---

৪৯. এখানে 'তার' বলতে আলোচ্য অংশ বুঝাবে। রোজেনথাল এখানে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা মূলের সাথে মিলে না। আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থের অনুসরণ করলাম।

www.amarboi.org

'তেলেসমান'। এর পর রোম সাগর তীরবর্তী 'হুনাইন,' 'ওহরান,' 'আল-জাজায়ের' (আলজিরিয়া) এলাকা। কেননা এ রোম সাগর বেষ্টনকারী সাগর হতে চতুর্থাংশের পশ্চিম প্রান্তে 'তুনজা' (তাঞ্জিয়ার) প্রণালী দিয়ে বের হয়ে এসেছে এবং পূর্ব দিকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সংকীর্ণ প্রণালী দিয়ে এটা কিছুদূর আসবার পর দক্ষিণে উত্তরে বিস্তৃত হয়ে তৃতীয় ও পঞ্চম অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এ জন্যই এর তীরে তৃতীয় অঞ্চলের বহু এলাকা বিদ্যমান।[৫০] যাহোক, এর পর আলজিরিয়ার পূর্বদিকে সাগরতীরে 'বেজায়া' (বগি) এলাকা। এর পর এর পূর্বে 'কুস্তান্তিনা' (কনস্টান্টাইন)। প্রথম অংশে শেষ প্রান্তে, এ সকল এলাকার দক্ষিণে সাগর থেকে এক দিনের পথ দূরত্বে ও মধ্য-মাগরিবের দক্ষিণ দিকে উত্থিত 'আশির' এলাকা এবং এর পর 'মাসিলা' ও 'যাব' এলাকা বিদ্যমান। এর রাজধানী 'বস্করা' দরন পর্বত সন্নিহিত আওয়াসের পাদদেশে স্থাপিত। এর বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে এবং এটা উক্ত অংশের পূর্বদিগস্থ শেষ প্রান্তে অবস্থিত।

আলোচ্য অঞ্চলের দ্বিতীয়াংশ প্রায় প্রথম অংশের অনুরূপ। দরন পর্বতের দক্ষিণ দিকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এর মধ্য দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে একে দুইভাগে ভাগ করেছে। এর উত্তর দিকের একটি খণ্ড রোম সাগরের দ্বারা আবৃত। দরন পর্বতের দক্ষিণে এর যে ভূ-খণ্ডটি বিদ্যমান, তার পশ্চিমাংশ সবটুকুই প্রান্তর এবং তার পূর্বাংশে 'গাদামস' এলাকা। এরই পূর্বে ওদ্দানে ভূমিখণ্ড, যার অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। তার বর্ণনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। উক্ত দরন পর্বতের সানদেশে রোম সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এর যে ভূখণ্ড বিদ্যমান, যার পশ্চিমে আওরস পর্বত—তাতে 'তাবেস্‌সা' ও 'আল-আওবস' (লারিবাস) অবস্থিত। এর পর সাগরতীরে 'বোনা' এলাকা বিদ্যমান। এর পর এ সকল এলাকার দিকে পূর্বে 'আফ্রিকিয়া' এলাকা এবং সাগরের তীরে তিউনিস শহর অবস্থিত। এর পর 'সোসা' এবং এর পর 'আল-মাহদিয়া' এলাকা। এ সকল এলাকার দক্ষিণে দরন পর্বতের নিচে 'আল-জারিদ', 'তুযাব', 'কাফসা' ও 'নাফ্‌জাওয়া' এলাকা বিদ্যমান। এদের ও সাগরের তীরভূমির মধ্য-ভূভাগে 'কায়রোয়ান' শহর এবং 'ওসলাত' ও 'সুবাইতিলা' পর্বত। এ সকল এলাকার সবগুলোর পূর্বদিকে রোম সাগরের তীরে 'তারাবলিস' এলাকা এবং এর সম্মুখে দক্ষিণ দিকে 'হাওয়ারা' গোত্রাদির পর্বত 'দুমার' ও 'নাক্কারা', যা দরন পর্বতের সাথে সংযুক্ত ও পূর্বে উল্লেখিত দক্ষিণ ভূখণ্ডের শেষ প্রান্তের অন্তর্গত গাদামস-এর বিপরীত দিকে অবস্থিত। এ অংশের পূর্বপ্রান্তে সমুদ্রতীরে 'সুয়াইকা ইবনে মাশকুরা' এবং এর দক্ষিণ দিকে ওদ্দানের অন্তর্গত আরবদের মরু প্রান্তর।[৫১]

এ অঞ্চলের তৃতীয় অংশেও দরন পর্বত বিদ্যমান। অবশ্য এটা তার শেষ প্রান্তে উত্তর দিকে ঘুরে সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হয়ে রোম সাগরে প্রবেশ করেছে এবং তাকে 'আন' অন্তরীপ বলা হয়। রোম সাগর উত্তর দিকে এ অংশের অনেকখানি গ্রাস করেছে। এর ফলে তার ও দরন পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান সংকীর্ণ হয়ে গেছে। উক্ত পর্বতের পশ্চাতে

৫০. রোজেনথালের অনুবাদে এস্থানে—'তাঞ্জিয়ার কসরে সগীর পর্যন্ত এর পর 'বদিস' এলাকা ও 'গাদামস' অবস্থিত। আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এটা পাইনি।

৫১. এটা সম্ভবত পশ্চিম আফ্রিকায় বসবাসকারী আরবীয় গোত্রাদির বিচরণভূমি।

www.amarboi.org

দক্ষিণে ও পশ্চিমে এ অংশের যে ভূ-খণ্ড বিদ্যমান, তাতে উদ্যানের অবশিষ্ট ও আরবদের প্রান্তর রয়েছে। এর পর 'জাওয়াইলা ইবনে আল-খাত্তাব' এবং এ অংশের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত এর পর মরু প্রান্তর ও জনশূন্য ভূমি বিদ্যমান। উক্ত পর্বত ও সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে তীরভূমিতে 'সুরতা' এলাকা এবং এর পর জনবসতিহীন প্রান্তর ও মরু, যাতে আরবগণ ঘুরে বেড়ায়। এর পর 'আজদাবিয়া' পর্বতের বাঁকে 'বুরকা' ও এখানে সাগরতীরে 'তালমাসা' অবস্থিত। অতঃপর পর্বতের বাঁকের পূর্বদিকে 'হাইয়েব' ও 'রাওয়াহা' প্রান্তর এ অংশের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

আলোচ্য অঞ্চলের চুতর্থ অংশের উর্ধ্বভাগের পশ্চিম প্রান্তে 'বরকিক' মরুভূমি এবং এর নিম্নভাগে 'হাইয়েব' ও 'রাওয়াহা' এলাকা। এর পর রোম সাগর এ অংশে প্রবেশ করে এর দক্ষিণ দিকে কিছু ভূ-খণ্ড গ্রাস করে এর উর্ধ্বভাগ পর্যন্ত পৌঁছেছে। সাগর ও এ অংশের শেষ প্রান্তের মধ্যে শুধু প্রান্তর, যার মধ্যে আরবরা বিচরণ করে। এরই পূর্বদিকে 'ফাইয়ুম' এলাকা। এটা নীলনদের শাখাদ্বয়ের একটির অববাহিকায় অবস্থিত। এ শাখা দ্বিতীয় অঞ্চলের চতুর্থ অংশে অবস্থিত 'সাইদ' এলাকা থেকে 'লাহুন' এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফাইয়ুম হ্রদে এসে পড়েছে। এরই পূর্বদিকে মিশর ও তার বিখ্যাত নগরী (কায়রো) অবস্থিত। নীলনদের যে শাখাটি দ্বিতীয় অংশের 'সাইদ' এলাকা থেকে 'দেলাস'-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তারই তীরে এটা স্থাপিত। মিশরের নিম্নভাগে এসে এ শাখাটি পুনরায় 'সন্তুফ' ও 'যুপতি'র নিকটে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এর দক্ষিণ শাখাটি পুনরায় 'কুরমুত'-এর নিকট দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে এবং এ সকল শাখা প্রবাহিত হয়ে রোম সাগরে পতিত হয়েছে। এ শাখাসমূহের পশ্চিম অববাহিকায় 'আলেকজান্দ্রিয়া', মধ্য অববাহিকায় 'রশিদা' ও পূর্ব অববাহিকায় 'দিমিয়াতা' অবস্থিত। মিশর ও কায়রো এবং এ সকল সমুদ্রতীরবর্তী নিম্ন ভূ-ভাগের মধ্যে মিশরের পল্লী এলাকা বিদ্যমান। এর সমগ্র এলাকাই জনবসতি ও কৃষির দিক থেকে সমৃদ্ধ।

এ অঞ্চলের পঞ্চমাংশে সিরিয়ার অধিকাংশ, যেমন আমি বর্ণনা করব। কারণ কুলযুম সাগর তার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে সুয়েজের নিকট শেষ হয়েছে। এটা ভারত সাগর থেকে উত্তর দিকে বের হয়ে কিছুটা পশ্চিম দিকে ঘুরে গেছে। এজন্যই এর বাঁক নেয়ার ফলে এ অংশে একটি দীর্ঘ ভূ-খণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে, যার পশ্চিম প্রান্ত সুয়েজে গিয়ে পৌঁছেছে। এ ভূখণ্ডেই সুয়েজের পরে 'ফারান', তার পরে তুর পর্বত, তার পরে মাদায়েনের 'আয়লা' এবং শেষ প্রান্তে 'হাওয়ারা' অবস্থিত। এখান থেকে তা তীরভূমি ধরে মোড় নিয়ে দক্ষিণে হেজাজের দিকে ফিরেছে, যেমন দ্বিতীয় অঞ্চলের পঞ্চমাংশে বর্ণিত হয়েছে। এ অংশের উত্তর প্রান্তে রোম সাগরের একটি খণ্ড তার পশ্চিম দিকের অধিকাংশ ভূ-ভাগ গ্রাস করেছে এবং এরই উপর 'আল ফরমা' ও 'আল আরিশ'। উক্ত সাগরের শেষ প্রান্ত কুলযুম এলাকার নিকটে এসে পৌঁছেছে। এর ফলে সেখানে তাদের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ খুবই সংকীর্ণ, একটি দ্বারের তুল্য হয়ে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এ দ্বারের পশ্চিমে 'তীহ' প্রান্তর, অনুর্বর, যাতে কিছুই জন্মে না। মিশর থেকে বহির্গত হওয়ার পর সিরিয়ায় প্রবেশের পূর্বে তা চল্লিশ বছর ধরে বনি ইসরাইলের বিচরণভূমি ছিল, যেমন কোরানে বর্ণিত হয়েছে।[৫২] রোম সাগরের এ খণ্ডে এ অংশের মধ্যে 'কব্রস'

৫২. দ্র: কোরান ৫, ২৬।

www.amarboi.org

(সাইপ্রসা) দ্বীপের কিছু অংশ পড়েছে। তার বাকি অংশ চতুর্থ অঞ্চলে অবস্থিত। আমরা অচিরেই তা বর্ণনা করব। উক্ত সাগরের এ খণ্ডের তীরে সুয়েজ সাগরের দিকে একটি সংকীর্ণ ভূভাগে 'আল আরিশ' অবস্থিত। তা মিশরের শেষ প্রান্ত এবং তার সাথে 'আস্কালান' এলাকা বিদ্যমান। এদের মধ্যে উক্ত সাগরের প্রান্তভূমি এবং এর পর উক্ত সগার খণ্ড মোড় ঘুরে 'তারাবলাস' (ত্রিপলী) ও 'গাজার' নিকটে চতুর্থ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এখানে রোম সাগর তার পূর্বপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এ সাগর খণ্ডের উপরেই সিরিয়ার অধিকাংশ তীরভূমি। এর পূর্বে 'গাজা', এর পরে 'আস্কালান' এবং তা থেকে সামান্য মোড় ঘুরে উত্তর দিকে 'কায়সরিয়া' (সিজারিয়া) এলাকা অবস্থিত। এর পর এভাবে 'উকা', 'সুর' ও 'সাইদা' এলাকা বিদ্যমান। এর পর সাগর উত্তর দিকে মোড় ঘুরে চতুর্থ অঞ্চলে পৌঁছেছে।

এ অংশের এ সাগর খণ্ডের তীরবর্তী এলাকাসমূহের বিপরীতে কুলযুম সাগরের তীরবর্তী আয়লা থেকে একটি বিরাট পর্বত মাথা তুলেছে এবং তা উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে পূর্বদিকে মোড় নিয়ে এ অংশকে অতিক্রম করে গেছে। একে 'লুক্কাম' (আমানাস) পর্বত বলা হয়। তা যেন মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে প্রাচীরের আকারে দাঁড়িয়ে আছে। এরই 'আয়লার' নিকটস্থ প্রান্তে 'আল আকাবা' অবস্থিত, যা অতিক্রম করে হাজীগণ মিশর থেকে মক্কা গমন করে থাকেন। এর পর উত্তর প্রান্তে 'সারা' পর্বতে হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর সমাধিস্থল। তা উপরোক্ত লুক্কাম পর্বতের সাথে আল-আকবার উত্তরদিকে মিলিত হয়ে পূর্বদিকে চলে গেছে। এর পর সামান্য মোড় ঘুরেছে। এর পূর্বদিকে এখানে 'আল হিজর', সামুদ জাতির দেশ, তাইমা এবং হেজাজের নিম্নভাগ 'দওমাতুল জন্দল' এলাকা বিদ্যমান। তার উপরিভাগে 'রেদোয়া' পর্বত এবং দক্ষিণে 'খয়বর' দুর্গাদি। সারা পবর্ত ও কুলযুম সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে 'তবুক' মরুভূমি অবস্থিত। সারা পর্বতের উত্তর দিকে লুক্কাম পর্বতের সন্নিকটে 'কুদসী' (জেরুজালেম) শহর। এর পর 'উর্দুন' (জর্ডন) এবং এর পর 'তাবারিয়া'। এর পূর্বদিকে 'আখরিয়াত' পর্যন্ত 'গোর' এলাকা বিদ্যমান এবং এরই পূর্বদিকে হেজাজের শেষপ্রান্ত 'দওমাতুল জন্দলে' এ অংশের শেষ। এ অংশের শেষ প্রান্তে লুক্কাম পর্বতের উত্তরদিকে মোড় ঘুরবার স্থানে 'দামেস্ক' শহর অবস্থিত। এটা 'সাইদা' ও সমুদ্র তীরবর্তী বৈরুতের বিপরীত দিকে এবং এদের মধ্যবর্তী এলাকায় লুক্কাম পর্বত বিদ্যমান। দামেস্কের অভিমুখে পূর্বদিকে 'বালাবাক্কা' এর পর এ অংশের শেষ প্রান্তে উত্তর দিকে লুক্কাম পর্বতের শেষাংশে 'খেমাস' (এমেসা) শহর অবস্থিত। বালাবাক্কা ও খেমাসের পূর্বদিকে 'তাদ্দামুর (পামীরা) ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তর এ অংশের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠাংশের উপরিভাগে আরব বেদুইনদের মরুপ্রান্তর নজদ ও ইয়ামাসার নিম্নদিকে 'আল আরয' ও 'সাব্বান' পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা থেকে বাহরাইন ও পারস্য সাগরের তীরবর্তী 'হিজর' পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশের নিম্নভাগে মরু প্রান্তরের দিকে 'হীরা', 'কাদেসিয়া' ও ফুরাতের জলাভূমি এলাকা বিদ্যমান। এর পরবর্তী পূর্বদিকে 'বসরা' শহর। এ অংশেই পারস্য সাগর, এর উত্তর নিম্নভাগে 'আবদান' ও 'উবুল্লা'র নিকটে এসে শেষ হয়েছে। আবাদানের নিকটে দজলা নদী বহু খালে বিভক্ত

www.amarboi.org

হয়ে উক্ত সাগরে পতিত হয়েছে। ফুরাত নদী থেকে বহু শাখা এসে এর সাথে মিলিত হয়েছে এবং সবগুলো একত্র হয়ে আবাদানের নিকট পারস্য সাগরে পড়েছে। সাগরের এ অংশটি উপরিভাগে প্রশস্ত ও শেষ প্রান্তে পূর্বদিকে সংকীর্ণ এবং এর শেষ সীমায় ও উত্তর সীমায়ও সমানভাবে সংকীর্ণ। এর পশ্চিম তীরে বাহরাইনের নিম্নভূমি, 'হিজর' ও 'আল আহ্‌সা'। এর পশ্চিম দিকে 'আখতাব', 'সাম্মান' ও ইয়ামামা'র অবশিষ্ট ভূমি। এর পূর্বদিকে পারস্যের তীরভূমির উপরিভাগ। এটা এ অংশের পূর্ব প্রান্তের এমন একটি সংকীর্ণ ভূ-খণ্ড যা এ সাগর থেকে ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়ে গেছে। এরই পশ্চাতে এ অংশের দক্ষিণ দিকে কিরমানের অন্তর্গত 'আল কফ্‌স' পর্বত এবং হরমুজের নিম্ন সাগর তীরে 'সিরাফ' এলাকা ও 'নজিরাম' অবস্থিত। এ অংশের শেষে পূর্বদিকে ও হরমুজের নিম্নভাগে 'ফারেস' এলাকা। এর মধ্যে 'সাবুর', 'দারআবজরদ', 'নাসা', ইস্তাখার', 'শাহজান' ও 'সিরাজ' এবং এটাই এ সবগুলোর রাজধানী। ফারেস এলাকার নিম্নভাগে উত্তর দিকে সমুদ্রের নিকটে খুজিস্তান এলাকা এবং এতে 'আওয়াজ', 'তুস্তার', 'সদী', 'সাবুর',[৫৩] 'সুস', 'রামহরমুজ' ও অন্যান্য শহর বিদ্যমান। 'আরজান' ফারেস ও খুজিস্তানের মধ্যসীমায় অবস্থিত। খুজিস্তানের পূর্বদিকে 'কুর্দী' পর্বতমালা ইস্পাহান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কুর্দীরা এতে বসবাস করে এবং এর পশ্চাতে ফারেস এলাকায় বিচরণ করে থাকে। তাদেরকে 'আর্‌রসুম'[৫৪] বলা হয়।

এ অঞ্চলের সপ্তমাংশের উপরিভাগে পশ্চিম দিকে 'কফস' পর্বতের অবশিষ্ট ভাগ অবস্থিত। এ পর্বতের দক্ষিণে ও উত্তরে এর সন্নিহিত 'কিরমান' ও 'মকরান' এলাকা বিদ্যমান। এদের শহরগুলো হল 'রওদান', 'শরজান', 'জিরফ্‌ত', 'ইয়াজদাশির' ও 'বাহওয়াজ'। কিরমান এলাকার নিম্নভাগে উত্তর দিকে ইস্পাহানে সীমান্ত পর্যন্ত 'ফারেস' এলাকার অবশিষ্ট ভূমি বিদ্যমান। এ অংশের পশ্চিম উত্তর দিকের মধ্যবর্তী প্রান্তে ইস্পাহান নগরী অবস্থিত। এর পর কিরমান ও ফারেস এলাকার পূর্বদিকে 'সিজিস্তান' ও 'কুহিস্তান'। সিজিস্তান দক্ষিণে ও কুহিস্তান উত্তরে বিদ্যমান। এ অংশের মধ্যভাগে সিজিস্তান, কুহিস্তান কিরমান ও ফারেসের মধ্যবর্তী এলাকায় এক বিরাট মরুভূমি, যার মধ্যে দুর্গমতার জন্য পথ-ঘাট নেই বললেই চলে। সিজিস্তানের শহর হল 'বস্তু' ও 'তাক' এবং কুহিস্তান বস্তুত খুরাসানের অন্তর্গত। এর অন্যতম বিখ্যাত এলাকা 'সিরখস' এবং কুহিস্তান এ অংশের শেষপ্রান্ত।

এর অষ্টমাংশের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে তুর্কি জাতীয় 'জুলহা' (খালাজ)দের প্রান্তর। এটা পশ্চিম দিক থেকে সিজিস্তান ও দক্ষিণ দিক থেকে হিন্দের কাবুল এলাকার সাথে সন্নিহিত। উক্ত প্রান্তরের উত্তর দিকে 'গোর' পর্বত ও এলাকা এবং তার রাজধানী গজনী অবস্থিত। এটাই হিন্দে প্রবেশের দ্বারপথ। গোরের শেষ প্রান্তে উত্তর দিকে 'অস্তারাবাদ' এলাকা এবং এ অংশের শেষ প্রান্তে উত্তর-পশ্চিম দিকে খুরাসানের মধ্যবর্তী 'হিরাত' এলাকা বিদ্যমান। এতে 'আস্ফারায়ন', 'কাশান', 'বুশন্‌জ', 'মারবুজ্জোদ', 'তালিকান' ও

---

৫৩. মূল গ্রন্থে 'সদী ও সাবুর' বিদ্যমান। রোজেনথালে এর স্থলে 'জন্দিশাবুর' লিখা হয়েছে। এটাই ঠিক বলে মনে হয়।

৫৪. আমাদের ব্যবহৃত মূল পাঠে এইরূপ আছে। রোজেনথালে 'আজ্‌জমুম' লিখা হয়েছে।

www.amarboi.org

'জুরজান' এবং এখানে খুরাসান জাইহুন নদী (অক্সাস) পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। খুরাসানের অন্তর্গত এ নদীতীরে পশ্চিম দিকে 'বলখ' শহর ও পূর্বদিকে 'তিরমিজ' শহর অবস্থিত। এ বলখ এক সময়ে তুর্কি সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এ জাইহুন নদী হিন্দের সাথে বদখশানের সন্নিহিত এলাকা 'ওজ্জার' (ওয়াখান) থেকে এ অংশের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে পূর্বদিকে এর শেষাংশে ঘুরে গিয়ে এর মধ্যভাগে পৌঁছেছে। এখানে একে 'খরনাব' নদী বলা হয়। এখানে পুনরায় বাঁক নিয়ে উত্তর দিকে খুরাসানে গিয়ে উপনীত হয়েছে। এটা ঐদিকেই ক্রমশ অগ্রসর হয়ে পঞ্চম অঞ্চলের 'খোয়ার্জিম' (আরল) হ্রদে পতিত হয়েছে। তার বর্ণনা পরে আসছে। এ অংশের মধ্যভাগে উক্ত নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বাঁক নেবার স্থানে অন্য আরও পাঁচটি বৃহৎ নদী এর সাথে মিলিত হয়েছে। এরা পূর্বদিকের 'খুত্তাল' ও 'ওয়াঘ্শব' এবং অন্যান্য নদী পূর্বদিকের 'বুত্তাম' পর্বত ও তার মধ্য এলাকা থেকে এসে এর সাথে মিলিত হওয়ার ফলে উক্ত নদী এতদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে যে, তার তুলনা নেই বললেই চলে। এর উক্ত পাঁচটি নদীর একটি হল 'ওখশাব' নদী। এটা এ অংশের পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত তিব্বত এলাকা থেকে বের হয়ে পশ্চিম দিক থেকে উত্তর দিকে ঘুরে এ অংশের উত্তরদিগস্থ স্থান দিয়ে নবম অংশে প্রবাহিত হয়েছে। এর প্রবাহপথে একটি বিরাট পর্বত বাধা সৃষ্টি করেছে। এ পর্বত এ অংশের দক্ষিণদিকের মধ্যভাগ থেকে উত্থিত হয়ে পূর্বদিকে গিয়ে উত্তর দিকে মোড় নিয়েছে এবং এ অংশের উত্তর দিকের নিকট দিয়ে নবম অংশে বের হয়ে গেছে। এর ফলে তিব্বত এলাকার দক্ষিণ পূর্বের একটি ভূখণ্ড এ অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং উক্ত পর্বত তুর্কি ও খুত্তাল এলাকার মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। উক্ত পর্বতের এ অংশস্থিত পূর্বদিকের মধ্যভাগে অবস্থিত একটিমাত্র গিরিপথ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। ফজল ইবনে ইয়াহিয়া[৫৫] তাতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরের ন্যায় একটি প্রাচীর নির্মাণ করিয়ে তাতে একটি দ্বারের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিব্বত থেকে বহির্গত 'ওখশাব' নদী উক্ত পর্বতের নিকট পৌঁছে তার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দীর্ঘ এলাকার পরে 'ওয়াখশ' এলাকায় প্রবেশ করেছে এবং বলখের সীমান্তে জাইহুন নদীতে পতিত হয়েছে। অতঃপর এটা (জাইহুন) উত্তর দিকে 'তিরমিজ' হয়ে 'জুরজান' পর্যন্ত পৌঁছেছে। 'গোর' এলাকার পূর্বদিকে তার ও জাইহুনের মধ্যস্থলে খুরাসানের 'নাসান' এলাকা বিদ্যমান। এখানে নদীর পূর্বতীরে 'খুত্তাল' এলাকা অবস্থিত। এর অধিকাংশই পর্বতময়। এর পর 'ওয়াখশ' এলাকা। এদের উত্তর সীমায় 'বুত্তাম' পর্বত, যা খুরাসানের পশ্চিম প্রান্তে 'জাঁইহুন নদী থেকে উত্থিত হয়ে পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়েছে এবং তিব্বতের সম্মুখ ভাগের বিরাট পর্বতমালার সাথে মিলিত হয়েছে। এরই নিম্ন দিয়ে 'ওখশব'[৫৬] নদী প্রবাহিত হচ্ছে—যেমন পূর্বে বলেছি এবং এটা ফজল ইবনে ইয়াহিয়ার দ্বারের নিকট উক্ত পর্বতের সঙ্গে এসে মিশেছে। এ সকল পর্বতের মধ্যদিয়ে জাইহুন প্রবাহিত হবার কালে অন্য বহু নদী এর সাথে মিলেছে। 'ওয়াখশ' এলাকায় উৎপন্ন নদী পূর্বদিক থেকে

৫৫. ফজল ইবনে ইয়াহিয়া বরমেকী?

৫৬. এর অর্থ 'ওয়াখ্শের জলধারা', এটা আমদরিয়া জলপ্রবাহের একটি অংশ। সম্ভবত এটা হতে গ্রিকগণ 'অক্সাস' শব্দটি গ্রহণ করেছেন। জাইহুনকে অক্সাস বলা হয়।

www.amarboi.org

তিরমিজের উত্তর দিকে নিম্নভাগে এর মধ্যে পতিত হচ্ছে। বলখ নদী জুরজানের নিকট বুত্তাম পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম দিক থেকে এতে পড়েছে। এ নদীরই পশ্চিম তীরে খুরাসানের 'আমেদ' এলাকা বিদ্যমান। আবার এরই পূর্বতীরে এখানে তুর্কিদের এলাকাভুক্ত 'সোগদ' ও 'আরশোনা' অবস্থিত। এর পূর্বে এ অংশের পূর্ব প্রান্তে 'ফরানা' এলাকা এবং অন্যান্য তুর্কি এলাকা, যাকে উত্তর দিক থেকে বুত্তাম পর্বত অতিক্রম করে গেছে।

আলোচ্য অঞ্চলের নবমাংশের পশ্চিম দিকে এর মধ্যভাগ পর্যন্ত তিব্বত দেশ, এর দক্ষিণে হিন্দের এলাকা এবং এর পূর্বদিকে এ অংশের শেষ পর্যন্ত চীন দেশ অবস্থিত। এ অংশের নিম্নভাগে তিব্বত এলাকার উত্তরে তুর্কিদের 'খজলাজিয়া' (খারুক) এলাকা, যা এ অংশের পূর্ব-উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশের পূর্ব প্রান্তে এর সাথে পশ্চিম দিক থেকে ফারগানার ভূমিও এসে মিলিত হয়েছে এবং এ অংশের পূর্বদিকে তুর্কি তাগারগুরদের[৫৭] এলাকা, যা এ অংশের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

এ অঞ্চলের দশমাংশের দক্ষিণ দিকে চীনের অবশিষ্ট সমুদয় এলাকা এবং তার নিম্নভাগে উত্তর দিকে 'তাগারগুর'দের এলাকার অবশিষ্ট ভাগ বিদ্যমান। এর পর এদের পূর্বদিকে তুর্কি 'কিরগীজ'দের এলাকা যাহ। এ অংশের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কিরগীজ এলাকার উত্তর দিকে তুর্কি 'কিতমান'দের এলাকা। এরই সম্মুখে বেষ্টনকারী সাগরে 'ইয়াকুত' (পদ্মরাগ মণি) দ্বীপ অবস্থিত। তার মধ্যভাগে একটি গোলাকার পর্বত বিদ্যমান, যাতে উঠবার কোন পথঘাট নেই। বাইর থেকে এর চূড়ায় আরোহণ করা একান্তই দুঃসাধ্য। উক্ত দ্বীপ বিষধর সর্পে ও পদ্মরাগ মণির খণ্ডাদিতে পরিপূর্ণ। এ ভূখণ্ডের অধিবাসীরা এ সকল মণি-মানিক্য সংগ্রহের জন্য আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নানাবিধ কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে। খুরাসানের ও পর্বতমালার পশ্চাদ্বর্তী এ বিস্তৃত এলাকার অধিবাসীদের সকলেই তুর্কি গোত্রভুক্ত। এখানেই তারা বিচরণ করে ফিরে। তাদের সংখ্যা অগণিত। তারা যাযাবরী জীবনধারার মধ্য দিয়ে খাদ্য, বাহন ও প্রজননের জন্য উট, ছাগল, গরু-ঘোড়া প্রভৃতি পশু পালন করে থাকে। তাদের গোত্র সংখ্যার অবধি নেই, একমাত্র তাদের স্রষ্টাই তা বলতে পারেন। তাদের মধ্যে জাইহুন নদীর তীরভাগে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা মুজসী[৫৮] ধর্মাবলম্বী অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে থাকে এবং বন্দীদিগকে তাদের প্রতিবেশীদের নিকট বিক্রয় করে দেয়। তারা এ সকল ক্রীতদাসকে খুরাসান, হিন্দ ও ইরাকে পাঠায়।

চতুর্থ অঞ্চল

এটাও উত্তর দিক থেকে তৃতীয় অঞ্চলের সন্নিহিত। তার প্রথমাংশের পশ্চিম দিকে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিস্তৃত বেষ্টনকারী সাগরের একটি দীর্ঘ খণ্ড বিদ্যমান। এরই উত্তর-দক্ষিণ দিকে 'তাঞ্জা' (তাঞ্জিয়ার) শহর। তাঞ্জার নিম্নে উক্ত সাগর খণ্ড থেকে রোম সাগর পর্যন্ত

---

৫৭. রোজেনথালে 'তাগুকগুজ' লিখা হয়েছে।

৫৮. এখানেও মজুসী জরা জরাস্থু ধর্মাবলম্বী নহে, বরং সাধারণ পৌত্তলিক ও অন্য ধর্মাবলম্বী বুঝাইতেছে।

www.amarboi.org

বার মাইল প্রশস্ত একটি সংকীর্ণ প্রণালী, তার উত্তরে 'তারিফ' ও 'আলখাজরা' (আলজেসিরাস) দ্বীপ এবং এর দক্ষিণে 'কসরুল মাজাজ' ও 'সিবতা' (সিওটা) অবস্থিত। এ প্রণালী পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে অত্র অঞ্চলের পঞ্চমাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। এটা তার প্রবাহপথে ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করে অত্র অঞ্চলের প্রথম চারটি অংশ ও পঞ্চমাংশের অধিকভাগ আবৃত করেছে এবং তার দুই পার্শ্বে তৃতীয় ও পঞ্চম অঞ্চলের বেশ কিছু ঢেকে রেখেছে, যা অচিরেই আমরা বর্ণনা করব। এ সাগরকে 'সিরিয়া' সাগরও বলা হয়। এতে বহু দ্বীপ বিদ্যমান। তাদের মধ্যে পশ্চিম দিকে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 'ইয়াবেনা', 'সায়ারকা', 'মায়নরকা, 'সারদানিয়া' প্রভৃতি এর পরে এবং 'সিসিলী' এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এর পর বিলুনুস (পিলোপনিস), 'আক্রিতাস' (ক্রীট), 'কবরস' (সাইপ্রাস)। আমরা এদের সাধারণ ও বিশদ বিবরণ যথাস্থানে প্রদান করব।

আলোচ্য অঞ্চলের তৃতীয়াংশের শেষ প্রান্তে ও পঞ্চম অঞ্চলের তৃতীয়াংশের মধ্যে রোম সাগর থেকে 'বানাদেকা' (ভেনিস) প্রণালী বের হয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং অত্র অংশের মধ্যভাগে মোড় ঘুরে পশ্চিম দিকে পঞ্চম অঞ্চলের দ্বিতীয়াংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। চতুর্থ অংশের শেষ প্রান্তে পঞ্চম অঞ্চলের পূর্ব দিকে এ রোম সাগর থেকে 'কুস্তানতেনিয়া' (কনস্টান্টিনপোল) প্রণালীও বের হয়েছে। এটা এক তীর নিক্ষেপের অনুরূপ প্রশস্ত আকারে উত্তর দিকে এ অঞ্চলের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অতঃপর ষষ্ঠ অঞ্চলের চতুর্থ অংশের দিকে অগ্রসর হয়ে মোড় ঘুরে পূর্বদিকে নিতাশ (কৃষ্ণ) সাগরের মধ্য দিয়ে সমগ্র পঞ্চম অংশ ও ষষ্ঠ অঞ্চলের ষষ্ঠাংশের অর্ধেক ভাগ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে বর্ণনা করব।

রোম সাগর যেখানে বেষ্টনকারী সাগর থেকে তাঞ্জা প্রণালী দিয়ে বের হয়ে তৃতীয় অঞ্চলের দিকে প্রসারিত হয়েছে, সেখানে এ অংশের একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড বিদ্যমান, যার উপর দুই সাগর সঙ্গমে তাঞ্জা শহর অবস্থিত। অতঃপর রোম সাগরের তীরে 'সিবতা' (সেওটা) শহর, এর পর 'কাতাউন' (তিতিয়ান) ও এর পর 'বাদিস'। এর পর এ অংশের সমুদয় পূর্বভাগ রোম সাগর দ্বারা আবৃত। এর পর সাগর তৃতীয় অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। এ অংশের সমগ্র জনবসতির অধিকাংশ এর উত্তর দিকে ও প্রণালীর উত্তর দিকে বিরাজমান। এর সমুদয় অংশই পশ্চিম আন্দালুসের (স্পেনের) এলাকা এবং বেষ্টনকারী সাগর ও রোম সাগরের মধ্যবর্তী এরই অন্তর্গত প্রথম এলাকার দুই সাগর সঙ্গমে 'তারিফ'। এর পূর্বদিকে রোম সাগরের তীরে 'আলখাজরা' দ্বীপ। এর পর 'মালাকা, 'আল মানকার' ও 'আলমারিয়া'। এর নিম্ন দিকে পশ্চিম ভাগেও বেষ্টনকারী সাগরের সন্নিকটে 'শরিশ' (ডিলা ফ্রন্টেরা), 'লাবলা' (নিবলা) ও এদের সম্মুখ ভাগে 'কাদিশ' দ্বীপ। শরিশ ও লাবলার পূর্ব দিকে 'আশবেলিয়া' (সেভিলা), 'আস্তজা' (এসিজা), 'কুর্তবা' ও 'দিলা' (মার্বেলা) এবং এরপর 'গরনাতা' (গ্রানাডা), 'জিয়ান,' 'উব্বাদা,' 'ওদিয়াশ' (গতিক্স) ও 'বস্তা' (বাজা) অবস্থিত। এ সকল শহরের পশ্চিম দিকে বেষ্টনকারী সাগরের তীরে 'শান্তামারিয়া' ও 'শেলবা'। এদের পূর্বদিকে বাতলিমুস' (বাদাজজ), 'মারেদা' ও ইয়াবেরা এবং এরপর গাফিক,' 'বরঘালা; (ট্রুজিলো) ও 'কেলাতরিয়াহ' (কেলাট্রবা)। এদের নিম্নভাগে পশ্চিম দিকে বেষ্টনকারী সাগরতীরে বাজা

(তাজু) নদীর উপর আশবুনা (লিসবন) এবং উক্ত নদীর তীরে এর পূর্ব দিকে 'শান্তারিন' ও 'মুযিয়া' (কোরিয়া)। এর পর 'কান্তারাতুস্ সাইফ' (আল কান্তার) আশবুনার সম্মুখ ভাগেই পূর্ব দিকে 'শারাত' (ডিগাডাররমা) পর্বত। এটা এখানেই পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্বে এ অংশের উত্তরে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এটা অত্র অংশে মধ্যভাগ অতিক্রম করে 'সালেম' শহর (মেডিনাসেলি) পর্যন্ত গেছে। এ পর্বতের সানুদেশে 'ফেরেনা'র (কোরিয়া)[৫৯] পূর্বভাগে 'তালাবিরা'. 'তুলাইতিলা' (টলিডো), 'ওদিউল্ হেজারা' (গোয়াদাজারা) ও মদিনাতুসালেম (মেডিনাসেলি) অবস্থিত। উক্ত পর্বতের প্রথম ভাগে তার ও আশবুনার মধ্যভাগে 'কালমরিয়া' (কোয়েমব্রা) এলাকা পশ্চিম আন্দালুসের অন্তর্গত।

পূর্বে আন্দালুসের মধ্যে রোম সাগরের তীরে আল মারিয়ার পরে 'করতাজান্না,' 'লাপতা' (ঐলিকেন্টি), 'দানিয়া,' 'বেলানসিয়া' ও এ অংশের শেষ পূর্ব প্রান্তে 'তারতুশা' (ট্যারগোনা)। এদের নিম্নভাগে উত্তর দিকে 'লিউরাকা', 'শাককুরা'—পশ্চিম আন্দালুসের 'বস্তা' ও 'কেলাতুরিয়াহে'র সন্নিহিত। এরপর পূর্ব দিকে 'মসিংয়া' ও বেলানসিয়ার উত্তরে নিম্নভাগে 'শাতেবা' এবং এরপর 'শকার,' 'তারতুশা,' 'তারকুনা' এ অংশের শেষ প্রান্ত। এদের নিম্নভাগে উত্তরে 'মেঞ্জালা' ও 'রিদা' ভূভাগ পশ্চিম দিক থেকে 'শাককুরা' ও 'তুলাইতিলা'র সন্নিহিত। এর পর তারতুশার নিম্নভাগে পূর্ব ও উত্তর দিকে 'আফরাগা'। মদিনাতুসালেমের পূর্বে 'কেলাতুআইউব,' 'সারকুস্তা' ও 'লারেদা' এবং এটাই এ অংশের পূর্ব ও উত্তর দিকের শেষ প্রান্ত।

আলোচ্য অঞ্চলের দ্বিতীয়াংশে একটি ভূখণ্ড ব্যতীত অন্য সমুদয় ভূভাগ পানির নিচে আবৃত রয়েছে উক্ত ভূখণ্ড তার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এবং 'বারনাত' পর্বতের একাংশ এর অন্তর্গত। উক্ত পর্বতের নামের অর্থ হল 'পথঘাটের পর্বত'। এটা পঞ্চম অঞ্চলের প্রথম অংশের প্রান্ত থেকে এ অংশে এসেছে। এ অংশের উত্তর ও দক্ষিণ শেষ প্রান্তের বেষ্টনকারী সাগরসীমা থেকে এর আরম্ভ এবং এটা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে পূর্ব দিকে মোড় ঘুরে এ চতুর্থ অঞ্চলের প্রথম অংশ থেকে দ্বিতীয় অংশে প্রবেশ করেছে। এর ফলে উক্ত পর্বতের একটি অংশ এতে পড়েছে এবং এর সকল পথই মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত। একে 'গাসকুনিয়া' এলাকা বলা হয়। এতেই 'খরিদা' (গ্যারোনা) ও 'কারকাশোনা' শহর বিদ্যমান। এ ভূখণ্ডের রোম সাগরের তীরে 'বারশেলোনা' ও আরবোনা (নারবোনি) শহর অবস্থিত। অতঃপর ঐ সাগর খণ্ড, যা এ অংশের অন্য সমস্ত ভূভাগ গ্রাস করেছে, তাতে অনেকগুলো দ্বীপ আছে। এদের অধিকাংশই ক্ষুদ্রতার জন্য জনবসতিহীন। এর পশ্চিম দিকে 'সারদানিয়া' দ্বীপ ও এর পূর্ব দিকে দিগন্ত বিস্তৃত 'সাকিলিয়া' (সিসিলী) দ্বীপ, যার পরিধি সাতশ মাইল বলে মনে করা হয়। এতে অনেকগুলো শহর, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সারকুসা,' বালরামু', 'তারাবেগা' (ট্রেপানী) ও 'মেসেনী'। এ সকল দ্বীপ আফ্রিকিয়ার বিপরীত দিকে অবস্থিত। এদের মধ্যে 'আগদোশ' (গাজো) ও 'মালতা' দ্বীপ বিদ্যমান।

৫৯. 'ফোরেনা' ও এর পূর্বে শান্তারিনের সাথে 'মুযিয়া' এই উভয় স্থলে রোজেনথালে 'করিয়া' লিখা হয়েছে। আমরা এই ক্ষেত্রে মূল পাঠের অনুসরণ করলাম।

www.amarboi.org

এ অঞ্চলের তৃতীয়াংশও সাগরের জলে আবৃত। শুধু তার উত্তর কোণে তিনটি ভূখণ্ড বিদ্যমান। এর পশ্চিম খণ্ডটি 'কলোরিয়া', মধ্যম খণ্ডটি 'আবিকরদা' (ল্যাম্বার্দী) এবং পূর্ব খণ্ডটি 'বানাদেকা' (ভনিস) এলাকার অন্তর্গত।

এ অঞ্চলের চতুর্থ অংশও সাগরের নিচে, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। এতে অনেক দ্বীপ বিদ্যমান। কিন্তু এর অধিকাংশই তৃতীয়াংশের ন্যায়[৬০] জনবসতিহীন। জনঅধ্যুষিত দ্বীপের মধ্যে এর পশ্চিম উত্তর কোণে বিলুনুস (পিলোপনিস) অবস্থিত এবং এ অংশের মধ্য থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দীর্ঘ প্রলম্বিত দ্বীপ 'আক্রিতাস' (ক্রীট) বিদ্যমান।

আলোচ্য অঞ্চলের পঞ্চমাংশের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যবর্তী একটি বিরাট ত্রিকোণ ভূভাগ সাগর জলের দ্বারা আচ্ছাদিত। এর পশ্চিম পার্শ্বটি উত্তর দিকে অত্র অংশের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর দক্ষিণ পার্শ্বটি এ অংশের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেছে। এর ফলে এ অংশের পূর্ব পার্শ্বে প্রায় এক-তৃতীয়াংশের অনুরূপ একটি ভূখণ্ড অবশিষ্ট রয়েছে। এর উত্তর পার্শ্বটি সাগরের সাথে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে, যেমন আমরা এ সম্পর্কে বলেছি। এর দক্ষিণ অর্ধেকে সিরিয়া এলাকার নিম্নভাগ এবং এর মধ্যভাগ দিয়ে লুক্কাম পর্বত উত্তর দিকে সিরিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত গেছে। এখানে এটা মোড় ঘুরে পূর্ব-উত্তর দিকে চলে গেছে এবং মোড় ঘুরবার পরবর্তী পর্বতের এ অংশটিকে 'সেলসেলা' (শৃঙ্খল) পর্বত বলা হয়। এটা তথা থেকে পঞ্চম অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এটা মোড় ঘুরবার সময় উত্তর দিকের 'আল-জজিরা' এলাকার একটি ভূখণ্ড অতিক্রম করেছে এবং এর উক্ত মোড় ঘুরবার স্থানে পশ্চিম দিকে এমন একটি পরস্পর সন্নিবদ্ধ পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান, যার একটি প্রান্ত রোম সাগরের একটি খাঁড়ির সাথে মিলিত হয়েছে। যা এ অংশের উত্তরে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। এ সকল পর্বতের মধ্যকার গিরিপথকে বলা হয় 'দুব' এবং এরা 'আরমান' (আর্মেনিয়া) এলাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ পর্বত শ্রেণী ও 'সেলসেলা' পর্বতের মধ্যভাগে একটি ভূখণ্ড এ অংশে পড়েছে।

পূর্বে যে দক্ষিণ পার্শ্বের কথা বলা হয়েছে, যাতে 'শামের' (সিরিয়ার)[৬১] নিম্নভাগ অবস্থিত এবং যাতে লুক্কাস পর্বত এ অংশের প্রান্ত ও রোম সাগরের মধ্যে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রসারিত, সেইখানে এ অংশের প্রথম ভাগে দক্ষিণ দিকে সাগর তীরে 'আনতারতুস' এলাকা বিদ্যমান। তৃতীয় অঞ্চলের সাগর তীরে 'গাজা, ও 'তারাবলুস' (আরকা ও ত্রিপলী)-র সাথে এর সীমান্ত মিলিত হয়েছে। এর উত্তরে ক্রমাগত 'জাবালা', 'লাজেকিয়া', 'ইস্কান্দরোনা', 'সলোকিয়া' ও এর পরে উত্তরে রোম (বাইজেন্টাইন) এলাকা। এ অংশের শেষ প্রান্ত ও সাগরের মধ্য ভাগে প্রসারিত লুক্কাম পর্বত সিরিয়ায় অবস্থিত তার প্রান্ত দ্বারা এ অংশের উপরিভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের 'আলহাওয়ানী' দুর্গের সাথে মিলিত হয়েছে। এ দুর্গ ইসমাইলী হাশিশীনদের এবং বর্তমানে তাদেরকে 'কিদাবিয়া' বলা হয়। এ দুর্গটিকে 'মেসিয়াফ'ও বলা হয় এবং এটা 'আনতারতুসে'র

৬০. সম্ভবত তৃতীয় নয়, দ্বিতীয়; তাতে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

৬১. আমাদের ব্যবহৃত মূল পাঠে সর্বত্র 'শাম' শব্দটি আছে। আমরা ইতিপূর্বে একে সিরিয়া বলে উল্লেখ করেছি এবং অতঃপর 'শাম' ও 'সিরিয়া' উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে।

www.amarboi.org

বিপরীত দিকে অবস্থিত। এ দুর্গের বিপরীত দিকে পর্বতের পূর্বে 'সালামিয়া' এলাকা, এটা 'খেমাসে'র উত্তরে পড়েছে। মেসিয়াফের উত্তরে পর্বত ও সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে 'এন্তাকিয়া' এলাকা এবং এর বিপরীত পর্বতের পূর্ব দিকে 'মাআরা'। এর পূর্বে 'মারাগা' এবং এন্তাকিয়ার উত্তরে ক্রমান্বয়ে 'মাসিসা', 'আয়্না' ও শামের শেষ প্রান্তে 'তারমুস'। এন্তাকিয়ার সম্মুখ ভাগে পর্বতের পশ্চিমে 'কিন্নাসরিন' ও এর পরে 'আইনুযর্বা'। কিন্নাসরিনের বিপরীতে পর্বতের পূর্বদিকে 'হলব' এবং আইনুযরাবার বিপরীতে শামের শেষ প্রান্তে 'মিম্বাদ'। পূর্বে উল্লেখিত দুরুবের ডান দিকে তার ও রোম সাগরের মধ্যস্থলে রোম (বাইজেন্টাইন) এলাকা। এটা বর্তমানে 'তুর্কেম্যান'দের অধীনে এবং এর শাসক ইবনে উসমান।[৬২] এ এলাকার সাগর তীরে 'এন্তাকিয়া' ও 'আলিয়া' ভূভাগ বিদ্যমান। দুরুব পর্বত ও সেলসেলা পর্বতের মধ্য 'আরমান' এলাকায় ক্রমাগত 'মারআশ', 'মাল্তিয়া ও এ অংশের উত্তর প্রান্তে 'মাআর্রা।[৬৩]

পঞ্চম অংশের আরমান এলাকায় পূর্ব দিকে 'জিহান' ও 'সিহান' নামে দুটি নদী বের হয়েছে। জিহান দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে দূরে অতিক্রম করেছে এবং ক্রমান্বয়ে 'তারসুস', 'মাসিসা' হয়ে উত্তর দিকে নেমে পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে 'সলোকিয়া'র দক্ষিণে রোম সাগরে পতিত হয়েছে। সিহান নদীও জিহানের সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে 'মাআরা', 'মারআশে'র মধ্য দিয়ে দুরুব পর্বত অতিক্রম করে শাম এলকায় পৌঁছেছে। এরপর 'আইনুযরবা'র মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে 'জিহান' থেকে দূরে সরে গেছে। এরপর উত্তর-পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরে মাসিসার নিকট পশ্চিম দিকে জিহানের সাথে মিলিত হয়েছে।

লুক্কাম পর্বতের মোড় থেকে সেলসেলা পর্বত দ্বারা বেষ্টিত 'জজিরা' এলাকার দক্ষিণে ক্রমান্বয়ে 'আর্রাফেজা', 'আর্রুক্কা', 'হার্রান', 'সুরুজ', 'আর্রুহা' (এডেসা), 'নসিবিন', 'সুমিসাতা' ও সেলসেলা পর্বতের সানুদেশে 'আমোদ' এলাকা বিদ্যমান। এটা উত্তর দিক থেকে এবং পূর্ব দিক থেকেও এ অংশের শেষ প্রান্ত। পঞ্চম অঞ্চল থেকে বহির্গত ফুরাত ও দজলা নদী এ ভূখণ্ডের মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিকে আরমান এলাকায় পৌঁছে সেলসেলা পর্বত অতিক্রম করেছে। এর পর ফুরাত সুমিসাতা ও সরুজের পশ্চিম পার্শ্বে প্রবাহিত হয়ে পূর্বদিকে মোড় নিয়েছে এবং আর্রাফেজা ও আর্রক্কার নিকট দিয়ে অগ্রসর হয়ে ষষ্ঠ অংশের দিকে বের হয়ে গেছে। দজলা আমেদের পূর্ব পার্শ্বে প্রবাহিত হয়ে খুব নিকটেই পূর্বদিকে মোড় ঘুরেছে এবং এর খুব নিকটেই ষষ্ঠ অংশে গিয়ে পৌঁছেছে।

আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠাংশের পশ্চিম দিকে 'আলজজিরা' এলাকা। এর পূর্ব দিকে 'ইরাক' এলাকা ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে এ অংশের শেষ প্রান্তের নিকটে পৌঁছেছে। ইরাকের শেষ প্রান্তে এখানে এ অংশের দক্ষিণ দিক থেকে ইস্পাহান পর্বত দেখা দিয়ে পশ্চিম দিকে ঘুরে গেছে। এ পর্বত এ অংশের উপর প্রান্তের মধ্য ভাগে পৌঁছে পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে ষষ্ঠ অংশ ছাড়িয়ে গেছে এবং ঐ দিকেই অগ্রসর হয়ে পঞ্চম অংশের

৬২. তৎকালে তার শাসক ছিলেন উসমানী সম্রাট প্রথম মুরাদ ইবনে ওরকান।

৬৩. রোজেনথালে এই স্থলে 'আক্কারা' উল্লেখিত হয়েছে।

www.amarboi.org

'সেলসেলা' পর্বতের সাথে মিলিত হয়েছে। এর ফলে এ ষষ্ঠ অংশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এর একটি পশ্চিম ভাগ ও অপরটি পূর্ব ভাগ। পশ্চিম ভাগের দক্ষিণ দিকে পঞ্চম অংশ থেকে ফুরাত নদী ও এর উত্তর দিকে দজলা নদী বের হয়ে এসেছে। ফুরাত নদী ষষ্ঠাংশে প্রবেশ করে প্রথমেই 'কেরকেসিয়া' অতিক্রম করেছে। এখানে উক্ত নদী থেকে একটি শাখা উত্তর দিকে বের হয়ে আলজজিরা এলাকায় প্রবেশ করেছে এবং তার প্রান্তরে মিশে গেছে। ফুরাত কেরকেসিয়া থেকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়েছে এবং প্রবাহিত হয়ে 'রহবা'র পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে 'খাবুরে'র নিকট গিয়ে পৌঁছেছে। এখানে তা থেকে একাধিক শাখা বের হয়েছে। একটি 'সিফ্‌ফিন'কে পশ্চিমে রেখে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব দিকে মোড় নিয়েছে এবং একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এদের কতকাংশ 'কুফা' ও কতকাংশ 'কসুর ইবনে-হুবাইরা' ও 'জামে আন' (আলহিল্লা)-এর দিকে গেছে। অতঃপর এ সবগুলো এ অংশের দক্ষিণ দিক দিয়ে তৃতীয় অঞ্চলের দিকে বের হয়ে গেছে। এবং ঐস্থানে 'হীরা' ও 'কাদেসিয়া'র পূর্বভাগে মিশে গেছে। ফুরাত নদী 'রহবার নিকট পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে 'হীত'কে উত্তরে এবং 'জাব'[৬৪] ও 'আনবার'কে দক্ষিণে রেখে বাগদাদের নিকট দজলার সাথে এসে মিলিত হয়েছে।

দজলা নদী পঞ্চম অংশ থেকে এ অংশে প্রবেশ করে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং 'ইরাক' পর্বতের সাথে সন্নিহিত সেলসেম পর্বতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর দিকে 'জজিরা ইবনে উমরে' প্রবেশ করেছে। এভাবে 'মোশেশ', 'তাকরিত' হয়ে 'আল হাদিসা'য় পৌঁছেছে। এখানে 'আল হাদিসা', বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 'যাব'কে পূর্ব দিকে রেখে সে দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়েছে এবং একই দিকে কাদেসিয়াকে পশ্চিমে রেখে বাগদাদে পৌঁছে ফুরাতের সাথে মিলিত হয়েছে। তথা থেকে দক্ষিণ দিকে 'জরজরায়া' এলাকার পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এ অংশ ত্যাগ করে তৃতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এখানে তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে এবং পুনরায় একত্র হয়ে আবাদানের নিকট পারস্য সাগরে এসে পতিত হয়েছে। বাগদাদে মিলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত দজলা ও ফুরাতে মধ্যবর্তী এলকার নাম 'আল-জজিরা'। দজলা নদী বাগদাদ ত্যাগ করবার পর তার সাথে উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে প্রবাহিত একটি নদী এসে মিশেছে। এটা বাগদাদের সম্মুখ ভাগে পূর্ব দিকে 'নাহরোয়ান'-এর নিকট পৌঁছে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়েছে এবং তৃতীয় অঞ্চলে বের হয়ে যাবার পূর্বে দজলার সাথে মিলিত হয়েছে। এ নদী ও 'ইরাক' ও 'আজম'[৬৫] (কুর্দিস্তান) পর্বতের মধ্যবর্তী স্থলে শুধু 'জলুলা' এলাকা এবং এর পূর্বে পর্বতের নিকটে 'হলোয়ান' ও 'সমিরা' এলাকা বিদ্যমান।

এ অংশের পশ্চিম ভূভাগটির মধ্যদিয়ে উক্ত 'আজম' পর্বত থেকে বহির্গত একটি পর্বত পূর্ব দিকে এ অংশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছে। একে 'শহরজোর' পর্বত বলা হয় এবং এটা এ ভূভাগকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করেছে। তার একটি খণ্ডের দক্ষিণ দিকে ও

৬৪. রোজেনথাল এর অন্য একটি বিকল্প উচ্চারণ 'আর্‌বার' বলে উল্লেখ করেছেন।

৬৫. মূলে আছে 'আলআআজেম' বহুবচন। রোজেনথাল 'কুর্দীপর্বত' বলে উল্লেখ করেছেন।

www.amarboi.org

ইস্পাহানের উত্তর-পশ্চিম কোণে 'খুনজান' এলাকা এবং এ খণ্ডটিকে 'আলহালুস'দের[৬৬] দেশ বলা হয়। এর মধ্যভাগে 'নাহাওন্দ' ও তার উত্তরে দুই পর্বতের সঙ্গমস্থলে পশ্চিমে 'শহরজোর' এলাকা বিদ্যমান। এ অংশের শেষ পূর্ব প্রান্তে দায়নুর অবস্থিত। অন্য খণ্ডটিতে 'আরমিনিয়া'র একটি ভূভাগ এবং তার রাজধানী 'মারাগা'। এর বিপরীতে ইরাক পর্বতের যে অংশটি বিদ্যমান তাকে 'বারিয়া' বলা হয়। এটা কুর্দিদের আবাসভূমি। দজলার তীরবর্তী বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 'যার' এর পশ্চাতে অবস্থিত। এ খণ্ডের পূর্ব প্রান্তে 'আজরবাইজান' এলাকা এবং তারই অন্তর্গত 'তাবরিজ' ও 'বন্দাকান'। এ অংশের উত্তর-পূর্ব কোণে 'নিতাশ' সাগরের একটি খণ্ড বিদ্যমান। তাকে 'খাজার'দেশ সাগর বলা হয়।

এ অঞ্চলের সপ্তম অংশের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে 'আরহালু'দের অধিকাংশ এলাকা পড়েছে। এতেই 'হামদান' ও 'কাজবিন' অবস্থিত এবং এর অবশিষ্ট ভাগ তৃতীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। সেখানেই ইস্পাহান এলাকা। তাকে দক্ষিণ দিক থেকে একটি পর্বত বেষ্টন করেছে, যা পশ্চিম দিক থেকে বের হয়ে তৃতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। অতঃপর তার ষষ্ঠাংশে মোড় নিয়ে চতুর্থ অঞ্চলে এসেছে এবং ইরাক পর্বতের পূর্বদিকে তার সাথে মিলিত হয়েছে। এর বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এ পর্বত পূর্বদিক থেকে 'আলহালুস' এলাকাকে বেষ্টন করেছে। ইস্পাহানকে বেষ্টনকারী এ পর্বত তৃতীয় অঞ্চল থেকে উত্তরদিকে নেমেছে এবং এ সপ্তম অংশে বের হয়ে পূর্বদিক থেকে 'আলহালুস' এলাকাকে বেষ্টন করেছে। এখানে এরই সানুদেশে 'কাশান' ও এর পরে 'কুম'। এ পর্বত তার অর্ধেক পথের প্রায় মধ্যভাগে সামান্য পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে অতঃপর চক্রাকারে পূর্বদিকে ও পরে উত্তর দিকে ফিরে পঞ্চম অঞ্চলে চলে গেছে। তার এ চক্রাকারে ঘোরা ও মোড় নেওয়ার স্থলে 'রায়' এলাকা তার পূর্বদিকে অবস্থিত। এস্থল থেকে অন্য একটি পর্বত বের হয়ে এ অংশের পশ্চিমে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেছে। সেইখানে তারই দক্ষিণ দিকে 'কাজবিন'। তার উত্তর পার্শ্ব ও তার সন্নিহিত 'রায়' পর্বতের পার্শ্বে, যা পূর্ব-উত্তর দিকে অত্র অংশের মধ্য পর্যন্ত প্রসারিত ও পঞ্চম অঞ্চলে বিস্তৃত এ মধ্যস্থলে—এ পর্বতসমূহের ও তারাবিস্তান (কাস্পিয়ান) সাগরে খণ্ডের মধ্যভাগের 'তাবারিস্তান' এলাকা অবস্থিত। এ সাগর পঞ্চম অঞ্চল থেকে এ অংশের পশ্চিমে-পূর্বে বিস্তৃত প্রায় মধ্যভাগে প্রবেশ করেছে এবং রায় পর্বতের নিকট বিস্তৃত হয়েছে। এর পশ্চিমদিকে মোড় নিবার স্থলে সন্নিহিত অন্য একটি পর্বত বিদ্যমান, যা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে ঘুরেছে এবং পশ্চিম দিক থেকে অষ্টম অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। রায় পর্বত ও উক্ত পর্বতের আরম্ভ স্থলের মধ্যভাগে দুই পর্বতের সানুদেশে একমাত্র 'জুরজান' এলাকা অবস্থিত এবং তারই অন্তর্গত 'বুস্তাম'। এ পর্বতের পিছনে এ অংশের একটি ভূখণ্ড বিদ্যমান, যাতে 'ফারেস' ও 'খুরাসানের' মধ্যবর্তী প্রান্তরের অবশিষ্ট খণ্ড বিস্তৃত। এটা 'কাশানের' পূর্বে এবং এর শেষাংশে পর্বতের নিকটে 'আস্তারাবাদ' এলাকা। এ অংশের শেষপ্রান্তে উক্ত পর্বতের সানুদেশে খুরাসানের 'নিশাপুর' এলাকা। এটা পর্বতের দক্ষিণে

৬৬. এটা আলবাহলুস<আল পাহলবী শব্দের বিকৃত রূপ। প্রাচীন ভূগোলে 'আল বাহলবী' বিদ্যমান (রোজেনথাল)।

www.amarboi.org

ও উক্ত প্রান্তরের পূর্বে অবস্থিত এবং এর পর 'মার্বে শাহীজান'—এ অংশের শেষ প্রান্ত। এর উত্তরে ও জুরজানের পূর্বে যথাক্রমে 'মহরজান', 'খাজরুন' ও এ অংশের পূর্ব প্রান্তীয় 'তুস' এলাকা। এদের সবগুলোই পর্বতের নিম্নভাগে অবস্থিত। এদের উত্তরে 'নাসা' এলাকা', তাকে দুটি অংশের উত্তর-পূর্ব কোণের দিক থেকে অনুর্বর প্রান্তর ঘিরে রেখেছে।

এ অঞ্চলের অষ্টম অংশের পশ্চিম দিকে জাইহুন নদী দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এর পশ্চিম তীরে খুরাসানের 'রামু' ও 'আমুল' এবং খোয়ারজিম এলাকার 'জাহেরিরা'[৬৭] ও 'জুরজানিয়া' অবস্থিত। এর পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ 'আস্তারাবাদ' পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। এ পর্বত এর সম্মুখ ভাগে সপ্তম অংশে বিস্তৃত হয়ে পশ্চিম দিক থেকে এ অংশে প্রবেশ করেছে এবং উক্ত কোণটিকে বেষ্টন করে রেখেছে। এতে 'হিরাত' এলাকার অবশিষ্ট ভূখণ্ড বিদ্যমান। হিরাত ও জুরজানের মধ্য দিয়ে উক্ত পর্বত তৃতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে 'বুত্তাম' পর্বতের সাথে মিশেছে। যেমন যথাস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য অংশের নদীর পূর্ব-দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে 'বুখারা' ও 'সোগদ' এলাকা এবং তার রাজধানী 'সমরকন্দ'। এর পর 'আশরোশানা' এবং এর অন্তর্গত অত্র অংশের পূর্ব প্রান্তীয় 'খাজনদা' এলাকা। সমরকন্দ ও আশরোশানার উত্তরে 'ইলাক' ভূমি। ইলাকের পরে অত্র অংশের পূর্ব প্রান্তে 'শাশ' ভূমি (তাশকন্দ)। এটা নবম অংশের এমন একটি ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত, যার দক্ষিণে ফরগানার অবশিষ্ট ভূভাগ বিদ্যমান। নবম অংশের উক্ত ভূখণ্ড থেকে শাশ নদী[৬৮] বহির্গত হয়ে এ অংশে প্রবাহিত হয়েছে এবং একে ত্যাগ করে পঞ্চম অঞ্চলে যাবার স্থলে উত্তর দিকে জাইহুন নদীতে পতিত হয়েছে। ইলাকের ভূমিতে এর সাথে তৃতীয় অঞ্চলের নবম অংশে অবস্থিত তিব্বতের সীমান্ত থেকে উৎপন্ন অন্য একটি নদী এসে মিশেছে। নবম অংশ ত্যাগ করবার পূর্বে এর সাথে 'ফরগানা' নদী মিলিত হয়েছে। শাশ নদীর দিকে 'জবরাগুণ' পর্বত বিদ্যমান। এটা পঞ্চম অঞ্চল হতে আরম্ভ হয়ে পূর্ব দিকে মোড় ঘুরে, কিছুটা দক্ষিণ দিকে ফিরে 'শাশ' ভূমিকে বেষ্টন করে নবম অংশে প্রবেশ করেছে। অতঃপর নবম অংশে মোড় ঘুরে শাশ ও ফরগানাকে বেষ্টন করে দক্ষিণ দিকে এসেছে এবং তৃতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। শাশ নদী ও এ অংশের মধ্যবর্তী উক্ত পর্বতের প্রান্তে 'ফারাব' এলাকা। এর এবং বোখারা ও খোরাজিমের মধ্যে অনুর্বর প্রান্তর বিরাজ করছে। এ অংশের উত্তর-পূর্ব কোণে 'খাজন্দা' ভূমি এবং 'ইস্তাজাব্' ও 'তীরাজ' এলাকা এর মধ্যে অবস্থিত।

আলোচ্য অঞ্চলের নবম অংশ, তার পশ্চিম দিকে ফরগানা ও শাশ ভূমির পরে দক্ষিণে 'খজলাজিয়া' ও উত্তরে 'খিজিলিয়া' এলাকা এবং পূর্বে এ অংশের সমস্ত এলাকাই কিমাকদের এলাকা নামে খ্যাত। এ সবগুলো অংশের পূর্ব প্রান্তে দশম অংশের 'কাউকিয়া' পর্বতের সাথে সন্নিহিত এবং এখানে বেষ্টনকারী সাগরের একটি খণ্ডও বিরাজমান। একে ইয়াজুজ-মাজুজের পর্বত বলা হয়। এ অংশের সমুদয় লোকই তুর্কি জাতীয়।

---

৬৭. রোজেনথাল এর উচ্চারণ 'তাহেরিয়া' করেছেন। আমরা মূলের অনুসরণ করলাম।

৬৮. তাশকন্দ নদী—শিরদরিয়া।

www.amarboi.org

পঞ্চম অঞ্চল

এর প্রথম অংশের অধিকাংশ ভূভাগ জলের দ্বারা আবৃত। শুধু তার দক্ষিণ ও পূর্বদিকের কিছু খণ্ড অবশিষ্ট আছে। কারণ বেষ্টনকারী সাগর, ভূ-ভাগের পার্শ্বে চক্রাকারে অবস্থানের জন্য পশ্চিম দিক থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এর ফলে মুক্ত দক্ষিণের ভূখণ্ডটি ত্রিকোণাকৃতিবিশিষ্ট। এটা সেখানে আন্দালুসের সন্নিহিত এবং এর অবশিষ্টও তার সাথে সংযুক্ত। সাগর একে দুইদিক থেকে বেষ্টন করেছে। তা যেন দুটি বাহু, একটি ত্রিভুজের কোণকে বেষ্টন করে রেখেছে। এতে পশ্চিম আন্দালুসের অবশিষ্ট ভাগ—'সাইউর' (মন্টিমেয়র) দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এ অংশের প্রারম্ভে সমুদ্র তীরে অবস্থিত। এর পূর্বদিকে 'সালামনাকা' ও এর অভ্যন্তরে 'সাম্মুরা' এবং শেষ দক্ষিণ প্রান্তে সালামানকার পূর্বে 'আবেলা'। এর পূর্বে 'কশতালা' ভূভাগ এবং এতে 'শাকুনিয়া' শহর বিদ্যমান। এর উত্তরে 'লিউন' ও 'বরগাশতা' এলাকা এবং এর পশ্চাতে উত্তর দিকে অত্র ভূখণ্ডের কোণায় 'জালিকিয়া' অবস্থিত। এতে পশ্চিম বাহুর শেষ প্রান্তে বেষ্টনকারী সাগরের উপর 'খান্তিয়াকু' এলাকা, যার অর্থ ইয়াকুব।[৬৯] এতে এ অংশে দক্ষিণ প্রান্তের নিকট ও 'কশতালা'র পূর্ব দিকে পূর্ব আন্দালুসের শহর 'শাতিলা' বিদ্যমান এবং এর উত্তর-পূর্বদিকে 'ওয়াশকা' ও এরই উত্তর-পূর্ব দিকে 'ইয়াম্বলুনা'। ইয়াম্বলুনার পশ্চিমে যথাক্রমে কশতালা এবং এর পর 'বরগাশতা' ও এর মধ্যভাগে 'তাজিরা'। এ ভূখণ্ডের মধ্যভাগে একটি বিরাট পর্বত প্রসারিত রয়েছে। এটা সাগর ও উত্তর-পূর্ব বাহুর দিকে মুখ করে উক্ত বাহু ও সাগরের সাথে পূর্ব দিকে প্রায় এসে মিশেছে। যেমন আমরা চুতর্থ অঞ্চলের দক্ষিণ দিকে রোম সাগরের সাথে এর মিলনের কথা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এটা পূর্ব দিক থেকে আন্দালুসের জন্য প্রাচীর স্বরূপ। এর পথগুলো দ্বারতুল্য, যা ফিরিঙ্গীদের[৭০] অধীনস্থ 'গাস্‌কোনিয়া' এলাকার সাথে সংযুক্ত। এর অন্তর্গত চতুর্থ অঞ্চলে রোম সাগরের তীরে অবস্থিত 'বরশেলোনা' ও 'আরবোনা' এবং এদের পশ্চাতে উত্তর দিকে 'খরিদা' ও 'কারকাশোনা'। এর মধ্যে পঞ্চম অঞ্চলে খরিদার উত্তরে 'তালুশা'।

এ অংশের পূর্ব দিকে জলমুক্ত অন্য একটি ভূখণ্ডও ত্রিকোণাকৃতিবিশিষ্ট। এর কোণ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়ে পূর্বদিকে 'বারনাতে' প্রবেশ করেছে। এ ভূখণ্ডের শিরোভাগে, যেখানে তার সাথে বারনাত পর্বত মিলিত হয়েছে, সেখানে বেষ্টনকারী সাগরের তীরে 'নাবোনা' এলাকা অবস্থিত। এ ভূখণ্ডের শেষ প্রান্তে অত্র অংশের উত্তর-পূর্ব কোণে এর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত ফিরিঙ্গীদের অধীনস্থ 'বনতু' এলাকা। দ্বিতীয় অংশের[৭১] পশ্চিম কোণে 'গাসকোনিয়া' ভূমি এবং এর উত্তরে 'বনতু' ও 'বরাশতা' এলাকা, যেমন পূর্বে বর্ণনা করেছি। গাসকোনিয়া এলাকার পূর্ব-উত্তরে রোমসাগরের একটি খণ্ড বিদ্যমান, যা দাঁতের মতো কিঞ্চিৎ পূর্ব দিকে বেঁকে এ অংশে প্রবেশ করেছে। এর ফলে গাসকোনিয়া এলাকা, এর পশ্চিম দিকের একটি অংশ সাগরে প্রবেশ করেছে। উক্ত ভূখণ্ডের

---

৬৯. সম্ভবত সেন্টইয়াকুব>সান্তিয়াকু হয়েছে।

৭০. মূলে 'আফরঙ্গ—বহুবচন বিদ্যমান—এর অর্থ ইউরোপীয় খ্রিস্টান জাতিসমূহ।

৭১. এ অঞ্চলের দ্বিতীয় অংশের বর্ণনা এখানে আরম্ভ হয়েছে। মূলেও এরূপভাবে আছে।

www.amarboi.org

শিরোভাগে উত্তর দিকে 'জেনাওয়া' (জেনেভা) এলাকা এবং তারই উত্তরে 'নিতাজুন' (আল্পস) পর্বত অবস্থিত। এর উত্তরে ও এরই দিকে 'বরগুনা (বরগাণ্ডী) ভূমি। রোম সাগরের যে প্রান্তটি জেনাওয়ার দিকে এগিয়ে গেছে, তার পূর্বদিকে অনুরূপ একটি প্রান্ত সাগর থেকে বের হয়ে এসেছে। এতদুভয়ের মধ্য ভাগে একটি ভূখণ্ড সাগরে প্রবেশ করেছে। এর পশ্চিম ভাগে 'নিস' (নিসা) এবং পূর্ব ভাগে রোম মহানগরী। এটা ফিরিঙ্গী রাজ্যের রাজধানী ও পোপ আর্কবিশপের[৭২] বাসস্থান। এতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিরাটাকার অট্টালিকা, বিশাল বপু স্মৃতিসৌধ ও সুবৃহৎ গির্জা বিদ্যমান। এর অদ্ভুত বস্তুসমূহের মধ্যে একটি হল তার মধ্যদিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত নদী, যার নিম্নভাগ তাম্রপাত দ্বারা আচ্ছাদিত। এতে হজরত ইসা (আঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে 'বতরস' (পিটার) ও 'বুলস' (পল)-এর গির্জা বিদ্যমান, যাতে তাঁদেরকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

রোম এলাকার উত্তর দিকে অত্র অংশের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত 'আকরিন সিসা' (লম্বার্দী) এলাকা সাগরের সেই প্রান্ত, যার দক্ষিণ তীরে রোম অবস্থিত, তার পূর্ব পার্শ্বে 'নাবেল' (নেপলস) এলাকা। এটা ফিরিঙ্গীদের অন্য একটি এলাকা 'কলোরিয়ার' সাথে সন্নিহিত। এর উত্তরে 'বানাদেকা' (ভেনিস) প্রণালীর একটি খণ্ড তৃতীয় অংশ থেকে এ অংশে এসে প্রবেশ করে এ অংশের উত্তর দিকের সমান্তরালে পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়েছে এবং প্রায় এর এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছে শেষ হয়েছে। এতে বানাদেকা এলাকার বহু ভূভাগ, যা উক্ত প্রণালী খণ্ড ও বেষ্টনকারী সাগরের মধ্যভাগে অবস্থিত তা দক্ষিণ দিক থেকে এ অংশে এসে প্রবেশ করেছে। এর উত্তরে ষষ্ঠ অঞ্চলের 'আলকেলায়া' (এ্যাকুইলিয়া) এলাকা বিদ্যমান।

এ অঞ্চলের তৃতীয় অংশের পশ্চিম দিকে 'বানাদেকা' প্রণালী ও রোম সাগরের মধ্যবর্তী স্থলে 'কলোরিয়া' এলাকা অবস্থিত। রোম সাগর একে পূর্ব দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। চতুর্থ অঞ্চলের অন্তর্গত এর একটি ভূখণ্ড রোম সাগর হতে উত্তর দিকে এ অংশের দিকে বহির্গত দুটি প্রান্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কলোরিয়া (কেলাব্রিয়া) এলাকার পূর্বদিকে বানাদেকা প্রণালী ও রোম সাগরের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে 'আনকিরদা' (লম্বার্দীদের) এলাকা। এ অংশের একটি ভূভাগ উপদ্বীপ আকারে রোম সাগরে ও চতুর্থ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। রোম সাগর থেকে বহির্গত বানাদেকা প্রণালী উত্তর দিকে অগ্রসর হবার স্থলে একে পূর্বদিক থেকে বেষ্টিত করেছে এবং অতঃপর এটা পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরে এ অংশের উত্তর প্রান্তের সমান্তরালে অগ্রসর হয়েছে। চতুর্থ অঞ্চল থেকে এরই সমান্তরালে একটি বৃহৎ পর্বত এরই সাথে উত্তর দিকে এগিয়ে গেছে। অতঃপর এরই সাথে পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরে ষষ্ঠ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং আলমানী(জার্মানি)দের এলাকা আনকেলায়া (এ্যাকুইলিয়া)-তে উক্ত প্রণালীর উত্তরে বিপরীত দিকে গিয়ে শেষ হয়েছে। আমরা এ সম্পর্কে পরে বর্ণনা করব। এ প্রণালী ও উক্ত পর্বতের একসঙ্গে উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়া পর্যন্ত এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগ 'বানাদেকা' এলাকা এবং এদের মোড় ঘুরে পশ্চিম দিকে যাওয়া পর্যন্ত উভয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগ 'হাওয়ারায়'। এরপর প্রণালীর প্রান্তভাগে উক্ত আলমনীদের এলাকা বিদ্যমান।

---

৭২. রোজেনথাল এর অনুবাদ করেছেন 'আড্রিয়াটিক সাগর'। মূলে আছে 'খালিজে বানাদেকা'। কিন্তু কিছু পরেই তিনি এই শব্দের অর্থ প্রণালী করেছেন।

www.amarboi.org

আলোচ্য অঞ্চলের চতুর্থ অংশে রোম সাগরের একটি খণ্ড বিদ্যমান, যা দন্তপাটির মধ্যবর্তী ব্যবধানের আকারে চতুর্থ অঞ্চল থেকে এতে প্রবেশ করেছে। এটা উত্তর দিকে বের হয়ে এসেছে এবং প্রতি দুটি দাঁতের মধ্যে সাগরের অংশবিশেষ থাকায় তাদের মধ্যবর্তী ভূভাগ উপদ্বীপের আকার ধারণ করেছে। এ অংশের শেষ পূর্ব প্রান্তে সাগরের কতিপয় খণ্ড বিদ্যমান। এটা থেকে উত্তর দিকে কুস্তানতুনিয়া (কনস্টান্টিনপোল) প্রণালী বের হয়ে গেছে। এটা এ দক্ষিণ প্রান্ত থেকে বের হয়ে সোজা উত্তর দিকে গিয়ে ষষ্ঠ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এটা সেখানে খুব নিকটেই পূর্বদিকে মোড় ঘুরে ষষ্ঠ অঞ্চলের চতুর্থ অংশের কতকভাগ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশে অবস্থিত 'নিতাস' (কৃষ্ণ) সাগরে পৌঁছেছে, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব। এ প্রণালীর পূর্বে এ অংশের শেষ উত্তর প্রান্তে 'কুস্তানতুনিয়া' এলাকা বিদ্যমান। এটা একটি বিরাট নগরী। এককালে এটা রোম সম্রাটদের রাজধানী ছিল। এতে এমন সকল বিরাটাকার অট্টালিকা ও স্থাপত্যের নিদর্শন বিদ্যমান, যার বহু কাহিনী প্রচারিত হয়েছে। রোম সাগর ও কুস্তানতুনিয়া প্রণালীর মধ্যভাগে এ অংশে যে ভূখণ্ডটি বিদ্যমান, এতেই 'মেকদোনিয়া' এলাকা বিরাজিত। এটা এককালে ইউনানী(গ্রিক)দের ছিল এবং এখান থেকেই তাদের রাজ্য বিস্তারের আরম্ভ। উক্ত প্রণালীর পূর্ব দিকে এ অংশের শেষ প্রান্তে 'বাতুস' নামে একটি ভূখণ্ড বিদ্যমান। ধারণা করি, তা বর্তমানে তুর্কেমানদের বিচরণ ভূমি প্রান্তর। এতে ইবনে উসমান (তুর্কি)দের রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছে এবং এর রাজধানী 'বোরসা'। এটা পূর্বে রোমের অধীনে ছিল। পরে বিভিন্ন জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে তুর্কেম্যানদের হাতে এসেছে।

এ অঞ্চলের পঞ্চম অংশের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে 'বাতুস' (আনাতোলিয়া) এলাকা অবস্থিত। এর উত্তর দিকে এ অংশের শেষ প্রান্তে 'আমোরিয়া' এবং আমোরিয়ার পূর্বদিকে 'কাবাকের' (তঘমাসু) নদী, যা ফুরাত নদীতে গিয়ে পতিত হয়েছে। এটা স্থানীয় কোন পর্বতে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং ফুরাত নদী এ অংশ ত্যাগ করে পুনরায় এতে প্রবেশ[৭৩] করবার পূর্বে তার চতুর্থ অঞ্চলে গমনপথে তার সাথে মিলিত হয়েছে। এখানে এ অংশের শেষ প্রান্তে পশ্চিম দিকে যথাক্রমে সিহান নদী ও তার পশ্চিমে জিহান নদীর উৎসস্থল এবং তারা ঐদিকেই অগ্রসর হয়ে গেছে, যেমন তাদের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এখানে এর পূর্ব দিকে দজলা নদীর উৎসভূমি এবং তাও ঐদিকে এর সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে বাগদাদে এর সাথে মিলিত হয়েছে। যে পর্বত থেকে দজলা উৎপন্ন হয়েছে, তার পশ্চাতে এ অংশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 'মায়াফারেকিন' এলাকা বিদ্যমান। যে 'কাবাকেব' নদীর কথা পূর্বে বর্ণনা করেছি, তা এ অংশকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। এর একটি হল পশ্চিম দক্ষিণ ভাগ, তাতে, যেমন পূর্বে বলেছি, 'বাতুস' ভূমি অবস্থিত এবং তা নিম্নদিকে এ অংশের উত্তরে শেষ প্রান্তে ও উক্ত কাবাকের নদীর উৎস পর্বতটির পশ্চাতে, যেমন পূর্বে বলেছি 'আমোরিয়া' এলাকা বিদ্যমান। দ্বিতীয় ভাগটি পূর্ব-উত্তরে ত্রিকোণাকার, যার দক্ষিণে দজলা ও ফুরাতের

৭৩. এ স্থানে মূলে 'সানি' শব্দটি এরূপ অর্থের দিকে নিয়ে গেছে। রোজেনথালে 'পুনরায় এতে প্রবেশ' বাক্যাংশটি নেই।

www.amarboi.org

উৎসভূমি। উত্তর দিকে কাবাকেব নদীর উৎস পর্বতের পশ্চাতে আমোরিয়ার সন্নিহিত 'বায়লাকান' এলাকা। এটা বহুদূর প্রসারিত এবং এর শেষ প্রান্ত ফুরাতের উৎসস্থলের নিকটে 'খরশনা' এলাকা। এর উত্তর-পূর্ব কোণে নিতাস সাগরের একটি খণ্ড বিদ্যমান, যাতে কুস্তানতুনিয়া প্রণালী পতিত হয়েছে।

আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠ অংশের দক্ষিণ-পশ্চিমে 'আরমিনিয়া' এলাকা বিদ্যমান। এটা পূর্বদিকে এ অংশের মধ্যভাগ ছাড়িয়ে বিস্তৃত। এতে দক্ষিণ-পশ্চিমে 'উরদুন' (আরজান), উত্তরে 'তাফলিম' ও 'দূবাইল' এবং উরদুনের পূর্বে যথাক্রমে 'খিলাত' ও 'বরদাআ' শহর। এর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্বদিকে 'আরমিনিয়া' শহর অবস্থিত। এখানে এসে আরমিনিয়া চতুর্থ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং তাতে সেখানে কুর্দীদের পর্বতের পূর্বদিকে 'মারাগা' এলাকা। এ পর্বতকে 'আরমা'ও বলা হয়, যেমন এর বর্ণনা চতুর্থ অঞ্চলের ষষ্ঠ অংশে পূর্বে করা হয়েছে। এ অংশে ও চতুর্থ অঞ্চলে আরমিনিয়া এলাকা তার সম্মুখ ভাগে পূর্বদিকে 'আজরবাইজান' এলাকার দ্বারা বেষ্টিত এবং এর শেষ ভাগে এ অংশের পূর্বদিকে 'তাবারিস্তান' (কাস্পিয়ান) সাগরের একটি খণ্ডে তীরে 'আরদাবিল' এলাকা। এ সাগর খণ্ডটি সপ্তম অংশ থেকে পূর্ব কোণে এসে প্রবেশ করেছে এবং একে 'তাবারিস্তান' সাগর বলা হয়। এরই তীরে উত্তর দিকে এ অংশে 'খাজার'দের এলাকার একটি ভূখণ্ড বিদ্যমান। এরা তুর্কেম্যানদের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সাগর খণ্ডের উত্তর দিকের নিকট থেকে একটি পর্বতমালা আরম্ভ হয়ে পরস্পর সন্নিহিত অবস্থায় পশ্চিম দিকে পঞ্চম অংশে বিস্তৃত হয়েছে এবং সেখানে মোড় ঘুরে 'মায়াফারেকিন' এলাকাকে বেষ্টন করেছে। এটা আমাদের নিকট চতুর্থ অঞ্চলে অগ্রসর হয়ে শামের নিম্নভাগে সেলসেলা পর্বতের সাথে মিলিত হয়েছে এবং সেখানে লুক্কাম পর্বতের সাথেও মিলেছে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ অংশের উত্তর দিকে বিস্তৃত এ সকল পর্বতে উভয় দিক থেকে প্রবেশযোগ্য দ্বারের ন্যায় বহু গিরিপথ বিদ্যমান। এর দক্ষিণ দিকে 'আবোয়াব' (দ্বারসমূহ) এলাকা তাবারিস্তান সাগর পর্যন্ত পূর্বদিকে বিস্তৃত। এতে 'বাবুল আবোয়ার' (দ্বারসমূহের দ্বার) শহর অবস্থিত। আবোয়াব এলাকা পশ্চিমে দক্ষিণ কোণের দিক থেকে আরমিনিয়া এলাকার সাথে মিলিত হয়েছে। পূর্বদিকে এদের মধ্যবর্তীস্থল ও আজরবাইজানের দক্ষিণ এলাকার মধ্যে তাবারিস্তান সাগর পর্যন্ত প্রসারিত 'আয্যাব' (আর্‌রা)[৭৪] এলাকা বিদ্যমান। উক্ত পর্বতমালার উত্তরে এ অংশের একটি ভূখণ্ড বিদ্যমান, যার পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে 'সবির' রাজ্য বিরাজিত। এ অংশের সমুদয় ভূভাগের কোণেও নিতাশ সাগরের একটি খণ্ড রয়েছে। যার সাথে কুস্তানতুনিয়া প্রণালী মিলত হয়েছে, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ সাগরখণ্ডের সাথে 'সরির' এলাকা সংযুক্ত এবং এরই তীরে উক্ত এলাকার 'আতরাবা য়ুয়ায়দা' বিদ্যমান। সরির এলাকা 'আবোয়াব' পর্বত ও এ অংশের উত্তর পার্শ্বের মধ্যবর্তী স্থল ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়ে পূর্বদিকে এমন একটি পর্বতের সাথে মিলিত হয়েছে, যা তার ও খাজারদের ভূভাগের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। এরই শেষ প্রান্তে 'সোল' শহর। উক্ত ব্যবধান

৭৪. মূলে 'আয্যাব' শব্দটি সম্ভবত ভুল। কারণ বৃহৎ ক্ষুদ্র যাবের বর্ণনা আলজরিয়ার সঙ্গে গেছে।

www.amarboi.org

সৃষ্টিকারী পর্বতের পশ্চাতে খাজারদের একটি ভূখণ্ড এ অংশের উত্তর-পূর্ব কোণে তাবারিস্তান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এটাই এ অংশের উত্তর শেষ প্রান্ত।

এ অঞ্চলের সপ্তম অংশের সমগ্র পশ্চিম ভাগই তাবারিস্তান সাগরের তলে নিমজ্জিত। এর দক্ষিণ দিক থেকে চতুর্থ অঞ্চলে যে সাগর খণ্ডটি বের হয়ে গেছে, যেমন পূর্বে বলেছি, সেখানে তার তীর তাবারিস্তান এলাকা এবং কাজবিন পর্যন্ত বিস্তৃত দায়লাম পর্বতমালা। উক্ত খণ্ডের পশ্চিম দিকে তার সাথে চতুর্থ অঞ্চলের ষষ্ঠাংশে অবস্থিত খণ্ডটি এসে মিলেছে। এর সাথে উত্তর দিকে ষষ্ঠ অংশের সাগর খণ্ডটিও পূর্বদিক থেকে মিশেছে। এ অংশের উত্তর-পশ্চিম কোণে জলমুক্ত একটি ভূখণ্ড বিদ্যমান, যার উপর দিয়ে 'আসল' নদী (ভলগা) সাগরে এসে পড়েছে। এ অংশের পূর্ব কোণে অন্য একটি সাগরজল মুক্ত ভূখণ্ড বিদ্যমান, যা তুর্কি গোত্রভুক্ত 'গোজ'দের বিচরণ প্রান্তর। দক্ষিণ দিক থেকে এ খণ্ডটিকে একটি পর্বত বেষ্টন করে অষ্টম অংশে চলে গেছে। এ পর্বত উক্ত অংশের মধ্যভাগ পর্যন্ত গিয়ে উত্তর দিকে মোড় ঘুরে তাবারিস্তান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং তার সন্নিবেশিত অবস্থায় অগ্রসর হয়ে উক্ত পর্বতের অবশিষ্ট ভাগ ষষ্ঠ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। সেখানে পুনরায় মোড় ঘুরে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং সেখানে একে 'সিয়াহ্' পর্বত বলা হয়। এর পর উক্ত পর্বত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ষষ্ঠ অঞ্চলের ষষ্ঠ অংশে প্রবেশ করেছে এবং পুনরায় দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়ে পঞ্চম অঞ্চলের ষষ্ঠাংশে ফিরে এসেছে। এটাই তার সেই প্রান্তভাগ, যা 'সরির' ও খাজারদের ভূমির মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে রেখেছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম অংশে খাজারদের এলাকার সঙ্গে এ পর্বতের যে নিম্নভাগ মিলিত হয়েছে, তাই 'সিয়াহ' নামে খ্যাত, যেমন তার বর্ণনা আসছে।

পঞ্চম অঞ্চলের অষ্টম অংশের ভূভাগই তুর্কি গোত্রভুক্ত 'গোজ'দের বিচরণ প্রান্তর। এর দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে 'খোয়ারজিম' (আরল) হ্রদ যাতে জাইহুন (অক্সাস) নদী পতিত হচ্ছে। এর পরিধি তিনশ মাইল। এতে এ সকল প্রান্তর থেকে বহু নদী এসে পড়ছে। এর উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে 'আরউন (গোরগুন) হ্রদ অবস্থিত।[৭৫] তার পরিধি চারশ মাইল এবং তার জল সুপেয়। এ অংশের উত্তর কোণে 'মেরগার' পর্বত বিদ্যমান, যার অর্থ বরফের পর্বত। কারণ তার বরফ গলে না। এটা এ অংশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আরউন' হ্রদের দক্ষিণে নিরেট পাথরের একটি পর্বত বিদ্যমান, যাতে কোন কিছু জন্মায় না। এটা আরউন নামে খ্যাত এবং হ্রদটিও এ নামে নামাঙ্কিত। এ পর্বত ও মেরগার পর্বত থেকে অসংখ্য নদী উক্ত হ্রদের উভয় পার্শ্ব দিয়ে তাতে পতিত হচ্ছে।

এ অঞ্চলের নবম অংশে গোজদের এলাকার পশ্চিম দিকে ও 'কিমাক'দের এলাকার পূর্ব দিকে তুর্কি গোত্রভুক্ত 'আরাকসা'দের এলাকা। এ অংশের শেষ প্রান্তে পূর্বদিকে এ এলাকার সাথে 'কাউকিয়া' পর্বতের নিম্নভাগ মিলিত হয়েছে। উক্ত পর্বত ইয়াজুজ-মাজুজকে ঘিরে রেখেছে। এটা এ স্থানে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বিস্তৃত হয়ে দশম অংশে প্রবেশের প্রারম্ভে ঘুরে গেছে। এটা এ অংশের বিপরীতে অবস্থিত চতুর্থ অঞ্চলের দশম অংশের শেষ প্রান্ত দিয়ে এতে প্রবেশ করেছিল এবং এ অংশের শেষ প্রান্তে উত্তর

৭৫. এটা কি 'কারাকুম' হ্রদ।

www.amarboi.org

দিকে তার নিম্নভাগ দিয়ে বেষ্টনকারী সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরে চতুর্থ অঞ্চলের দশমাংশের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এটা তার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত কিমাকদের এলাকাকে বেষ্টন করেছে এবং অতঃপর পঞ্চম অঞ্চলের দশমাংশের দিকে বের হয়ে গেছে। তাতে এটা তার শেষ পর্যন্ত পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়েছে। এর দক্ষিণ দিকে এ অংশের পশ্চিম দিকে দীর্ঘায়িত একটি ভূখণ্ড কিমাকদের এলাকার শেষ প্রান্তের বিপরীত দিকে অবস্থিত। অতঃপর এ পর্বত নবম অংশের পূর্বদিকে ও তার উপরিভাগে অগ্রসর হয়েছে এবং খুব নিকটেই উত্তর দিকে মোড় নিয়েছে। অতঃপর ঐদিকেই ষষ্ঠ অঞ্চলের নবমাংশের দিকে এগিয়ে গেছে। এখানে এর মধ্যে সেই প্রাচীর, যা অচিরেই বর্ণনা করব। এর ঐ ভূখণ্ডটি শুধু অবশিষ্ট, যাকে এ অংশের উত্তর-পূর্ব কোণের নিকট কাউকিয়া পর্বত বেষ্টন করেছে এবং যা দক্ষিণ দিকে দীর্ঘায়িত হয়ে রয়েছে। এটাই ইয়াজুজ ও মাজুজদের এলাকা।

এ অঞ্চলের দশমাংশে ইয়াজুজ ও মাজুজদের এলাকা। এটা তার সমুদয় এলাকা ধরে ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত হয়েছে। শুধু বেষ্টনকারী সাগরের একটি খণ্ড এর পূর্বদিকে দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রসারিত রয়েছে। অবশ্য অন্য একটি সাগর খণ্ডও, যাকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে তাতে প্রবেশের দ্বারা কাউকিয়া পর্বত বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এ ছাড়া আর সমুদয় ভূভাগই ইয়াজুজ ও মাজুজদের এলাকা। আল্লাহ্ পবিত্র ও উন্নত, তিনিই সর্বজ্ঞাতা।

ষষ্ঠ অঞ্চল

এ অঞ্চলের প্রথম অংশের অর্ধেকেরও বেশি ভূভাগ সাগরের জলে আবৃত। সাগর এ অংশের উত্তর কোণের সঙ্গে পূর্বদিকে ঘুরে পুনরায় পূর্ব কোণের সাথে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে এবং দক্ষিণ কোণের নিকটে গিয়ে শেষ হয়েছে। এর ফলে এ অংশের একটি ভূখণ্ড জলমুক্ত অবস্থায় দুটি জলীয় প্রান্তের মধ্যে অবস্থিত হয়েছে এবং বেষ্টনকারী সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি উপদ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বিস্তৃত এবং এর সমুদয় ভূভাগই 'বরতানিয়া'(ব্রিটেন)র এলাকা। উক্ত দুই জলীয় প্রান্তের মধ্যে দ্বারতুল্য স্থান ও এ অংশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের মধ্যবর্তীস্থলে 'সাকিস' (সীস) এলাকা এবং এর সন্নিহিত 'বেনতু' (পর্টিও) এলাকা, যার কথা পঞ্চম অঞ্চলে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে।

এ অঞ্চলের দ্বিতীয় অংশে বেষ্টনকারী সাগর পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে প্রবেশ করেছে। এটা পশ্চিম দিকে একটি দীর্ঘায়িত সাগর খণ্ড, যা প্রথম অংশে অবস্থিত বরতানিয়া এলাকার পূর্বভাগে এর উত্তর অর্ধাংশ অপেক্ষা বৃহৎ। এর সাথে উত্তর দিকে অন্য একটি সাগর খণ্ড পশ্চিম-পূর্বে বিস্তৃত আকারে সম্মিলিত হয়েছে এবং এর পশ্চিম অর্ধাংশে কতকাকারে প্রসারিত হয়েছে। এখানে এ অংশে 'ইনকালতারা' (ইংল্যান্ড) দ্বীপের একটি খণ্ড বিদ্যমান। এটা একটি বিরাট প্রশস্ত দ্বীপ এবং এতে বহু শহর অবস্থিত। এটা একটি শক্তিশালী রাজ্য। এর অবশিষ্ট ভাগ সপ্তম অঞ্চলের অন্তর্গত। এ সকল সাগরখণ্ড ও তার দ্বীপের দক্ষিণ দিকে এ অংশের পশ্চিম অর্ধভাগে 'আরমান্দিয়া'

www.amarboi.org

(নরমাণ্ডী) এলাকা অবস্থিত এবং 'আফলাদশ' (ফ্লেন্ডার্স) এলাকা এর সন্নিহিত। অতঃপর এ অংশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'আফরানসিসা' (ফ্রান্স) এলাকা এবং এর পূর্বে 'বরগহুনিয়া' (বরগান্ডী) এলাকা। এ সবগুলোই ফিরিঙ্গী জাতির অধীনে। এ অংশের পূর্ব অর্ধভাগে আলমানী(জার্মানি)দের এলাকা। এর দক্ষিণে যথাক্রমে 'আনকেলায়া' (এ্যাকুলিয়া), উত্তরে 'বরগুনিয়া' (বরগান্ডী) এবং এর পর 'লাহ্‌ইকা' (লোরিন) ও 'শাতুনিয়া' (সেক্সনী) এলাকা। উত্তর-পূর্ব কোণের বেষ্টনকারী সাগরখণ্ডের উপরে 'আফরিরা' (ফ্রিসিয়া) এলাকা বিদ্যমান। এসবগুলো আলমানীদের অধীনে।

এ অঞ্চলের তৃতীয় অংশের পশ্চিম কোণে দক্ষিণ দিকে 'মারাতিয়া' (বোহেমিয়া) এলাকা এবং উত্তরে 'শাতুনিয়া' এলাকা। পূর্ব কোণে দক্ষিণ দিকে 'আনকুইয়া' (হাঙ্গেরী) এবং উত্তর দিকে 'বালুনিয়া' (পোল্যান্ড) এলাকা অবস্থিত। শেষোক্ত দুটির মাঝখানে চুতর্থ অংশ থেকে প্রবেশকারী 'বালুয়াথ' (কার্পেথিয়ান) পর্বত প্রসারিত এবং এটা পশ্চিম দিক হয়ে ক্রমশ উত্তর দিকে মোড় নিয়েছে ও পশ্চিম অর্ধাংশের শেষ প্রান্তে শাতুনিয়া এলাকায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে।

চতুর্থ অংশের দক্ষিণ কোণে জাসুলিয়া এলাকা এবং এর নিম্নভাগে 'রূশিয়া' (রাশিয়া) এলাকা। এদের মধ্যে এ অংশের প্রথম থেকে এর পূর্ব অর্ধভাগ পর্যন্ত প্রসারিত 'বালুয়াথ' পর্বত ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। জাসুলিয়ার পূর্বদিকে 'জারমানিয়া' এলাকা।[৭৬] দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কুস্তানতুনিয়া ভূমি এবং রোম সাগর থেকে বহির্গত প্রণালীর প্রান্তভাগে তার শহর অবস্থিত, যেখানে উক্ত প্রণালী নিতাশ সাগরের সঙ্গে মিশেছে। এর ফলে এ অংশের পূর্ব কোণের উচ্চভূমিতে উক্ত সাগরের একটি ক্ষুদ্র খণ্ড পড়েছে। এর সাথে উক্ত প্রণালীটি সংযুক্ত রয়েছে এবং তাদের মধ্যবর্তী কোণায় 'মসিনা' এলাকা বিদ্যমান।

ষষ্ঠ অঞ্চলের পঞ্চম অংশের দক্ষিণ কোণায় নিতাশ সাগর চতুর্থ অংশের শেষপ্রান্তে প্রণালীর সাথে মিলিত হয়েছে। এ সাগর ঐদিক থেকে বের হয়ে পূর্বদিকে অত্র অংশের সমুদয় ভূভাগ এবং ষষ্ঠ অংশের কতক ভাগ গ্রাস করেছে। আরম্ভ হতে এর দৈর্ঘ্য তেরশ মাইল ও প্রস্থ ছয়শ মাইল। এ সাগরের পশ্চাতে এ অংশের দক্ষিণ কোণে পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত একটি দীর্ঘ ভূখণ্ড বিদ্যমান, এর পশ্চিম ভাগে নিতাশ সাগরের তীরে ও পঞ্চম অঞ্চলের বায়লকান ভূমির সাথে সংলগ্ন 'হিরাকলিয়া' অবস্থিত। এর পূর্বে 'লামী'(এলান)দের এলাকা ও তার রাজধানী নিতাশ সাগরের তীরে সাওতলী (সিনুপ)। নিতাশ সাগরের উত্তরে এ অংশের পশ্চিম ভাগে 'তরখান' (বুরজান—বুলগার) এবং পূর্বদিকে রূশিয়া দেশ। এদের সকলই এ সাগরের তীরে অবস্থিত। রুশিয়া দেশ এ তরখান এলাকাকে এ অংশের পূর্বদিক, সপ্তম অঞ্চলের পঞ্চম অংশে উত্তর দিক এবং এ অঞ্চলের চতুর্থ অংশে পশ্চিম দিক থেকে ঘিরে রেখেছে।

ষষ্ঠ অংশের পশ্চিম ভাগে নিতাশ সাগরের অবশিষ্ট অংশ তা উত্তর দিকে সামান্য ঘুরেছে এবং সেখানে তার ও এ অংশের শেষ প্রান্তের মধ্যে উত্তর দিকে 'কুমানিয়া' এলাকা। এর দক্ষিণ দিকে উক্ত সাগর প্রসারিত হয়ে উত্তর দিকে মোড় ঘোরা অবস্থায়

৭৬. এটা পূর্বোক্ত আলমানীদের এলাকা 'জারমানি' বা 'জারমানিয়া' নয়।

www.amarboi.org

'লীনী'দের অবশিষ্ট এলাকা বিদ্যমান, যা পঞ্চম অংশে তার দক্ষিণ শেষ প্রান্ত ছিল। এ অংশের পূর্ব কোণে 'খাজার'দের ভূমি সন্নিহিত এবং তার পূর্বে 'বরতাস' ভূমি অবস্থিত। পূর্ব-উত্তর কোণে 'বুলগার' ভূমি এবং পূর্ব-দক্ষিণ কোণে 'বেলজার' (বেলানজার) ভূমি। এখানে 'সিয়াহ' পর্বতের একটি খণ্ড তার সাথে এসে একত্র হয়েছে, যা পরে 'খাজার' সাগরের সাথে ঘুরে সপ্তম অংশে প্রবেশ করেছে। উক্ত সাগরের সাথে বিচ্ছিন্ন হবার পর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে এ অংশের এ খণ্ডের মধ্যে দিয়ে পঞ্চম অঞ্চলের ষষ্ঠ অংশে গিয়ে পৌঁছেছে। সেখানে তা 'আবোয়াব' পর্বতের সাথে মিলিত হয়েছে এবং সেখানে খাজারদের এলাকার একটি কোণ বিদ্যমান।

এ অঞ্চলের সপ্তম অংশের দক্ষিণ কোণে সেই ভূভাগ বিদ্যমান, যা সিয়াহ পর্বত তাবারিস্তান সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর অতিক্রম করেছে। এটা এ অংশের শেষ পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত খাজারদের এলাকার একটি খণ্ড। এর পূর্বে তাবারিস্তান সাগরের একটি খণ্ড রয়েছে, যার পূর্বে ও উত্তর দিক দিয়ে উক্ত পর্বত অতিক্রম করেছে। সিয়াহ পর্বতের পশ্চাতে ও উত্তর কোণে 'বরতাস' ভূমি এবং এ অংশের পূর্ব কোণে 'শহরব' (বশখির) ও 'ওয়েখনাক'দের[৭৭] এলাকা। তারা তুর্কি জাতির অন্তর্ভুক্ত।

অষ্টম অংশের দক্ষিণ কোণের সমগ্র ভূভাগই তুর্কি গোত্রভুক্ত 'খওলখ'দের এবং পশ্চিম-উত্তর কোণে 'মুন্তেনা'(দুর্গন্ধযুক্ত) ভূমি। এর পূর্বভাগ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, প্রাচীর নির্মাণের পূর্বে ইয়াজুজ ও মাজুজ (গগ ও মেগগ)রা তা ধ্বংস করে ফেলেছিল। এ 'মুন্তেনা ভূমিতে পৃথিবীর বৃহৎ নদনদীর অন্যতম 'আসল' (ভলগা) নদীর উৎসস্থল। তার প্রবাহ তুর্কি এলাকায় এবং তার পতন পঞ্চম অঞ্চলের সপ্তম অংশে অবস্থিত তাবারিস্তান সাগরে। তাতে অসংখ্য বাঁক এবং তা মুন্তেনা ভূমির তিনটি স্রোতধারা একত্র হয়ে এক নদীরূপে বের হয়ে এসেছে। তা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে এ অঞ্চলের সপ্তম অংশে উপনীত হয়েছে। তা এভাবে চলে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে মধ্যভাগে সপ্তম অংশের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মোড় ঘুরে উত্তর দিকে সপ্তম অঞ্চলের সপ্তম অংশ থেকে ষষ্ঠ অংশে বের হয়ে এসেছে। এর খুবই নিকটে পশ্চিম দিকে চলে পুনরায় দ্বিতীয়বার দক্ষিণ দিকে ঘুরেছে এবং ষষ্ঠ অঞ্চলের ষষ্ঠ অংশের দিকে ফিরে গেছে। তা থেকে একটি শাখা পশ্চিম দিকে বের হয়ে ঐ অংশেরই নিতাশ সাগরে পড়েছে। মূল নদী পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যভাগে বুলগারদের একটি ভূখণ্ড অতিক্রম করে ষষ্ঠ অঞ্চলের সপ্তম অংশে বের হয়ে এসেছে। পুনরায় তা তৃতীয়বার দক্ষিণ দিকে ফিরে সিয়াহ পর্বতে প্রবেশ করেছে। খাজারদের এলাকা অতিক্রম করে পঞ্চম অঞ্চলের পঞ্চম অংশে বের হয়ে এসেছে। ঐখানে ঐ অংশের যে ভূখণ্ডটি জলমুক্ত ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে, সেখানে তাবারিস্তান সাগরে পতিত হয়েছে।

এ অঞ্চলের নবম অংশের পশ্চিম দিকে তুর্কি 'খফশাখ' গোত্রের এলাকা। তাদেরকে 'কফজাক'ও বলা হয়। তুর্কি 'সরকাশ'(তুর্গিশ)দের এলাকাও এ দিকে বিদ্যমান। এর পূর্ব দিকে ইয়াজুজদের এলাকা এবং তাদের মধ্যে বেষ্টনকারী 'কাউকিয়া' পর্বত

---

৭৭. 'পেখেনেগ' এবং এটাই পরে সপ্তম অঞ্চলের সপ্তম অংশে 'ইয়াকনাক' রূপে উচ্চারিত হয়েছে। 'শহরব' হয়েছে 'সোহরাব'।

www.amarboi.org

ব্যবধানের সৃষ্টি করে রেখেছে, যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্বত চতুর্থ অঞ্চলের পূর্ব দিকে বেষ্টনকারী সাগর হতে আরম্ভ হয়ে তার সঙ্গে উত্তর দিকে অঞ্চলের শেষ পর্যন্ত গেছে এবং তাকে ত্যাগ করে পশ্চিম দিকে ঘেষে পঞ্চম অঞ্চলের নবম অংশে প্রবেশ করেছে। অতঃপর তা তার প্রথম দিকেই ফিরে এসেছে এবং এ অঞ্চলের নবম অংশে দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে পশ্চিম ঘেঁষে প্রবেশ করেছে। এখানে তার মধ্যভাগে সেই প্রাচীরটি বিদ্যমান, যা ইসকান্দর (আলেকজান্ডার) নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর উক্ত পর্বত তার দিকে বের হয়ে সপ্তম অঞ্চলের নবম অংশে প্রবেশ করেছে এবং দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে বেষ্টনকারী সাগরের সাথে তার উত্তরে মিলিত হয়েছে। পুনরায় তার সাথে সেখান হতে মোড় নিয়ে পশ্চিম দিকে সপ্তম অঞ্চলের পঞ্চম অংশে পৌঁছেছে। এখানে বেষ্টনকারী সাগরের একটি খণ্ডের সাথে তার পশ্চিমে মিলেছে। এ নবম অংশের মধ্যভাগে সেই প্রাচীর বিদ্যমান, যা ইসকান্দর নির্মাণ করিয়েছিলেন, যেমন পূর্বে বলেছি। 'এটা ঠিক, কোরানে তার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে খুরদাজবিয়া তাঁর ভূগোল গ্রন্থে লিখেছেন, ওয়াসিক একরাত্রে স্বপ্নে দেখলেন, প্রাচীরটি যেন খুলে গেছে। তিনি ভয় পেয়ে জেগে উঠলেন এবং পথ প্রদর্শক সালামকে সংবাদ নিতে পাঠালেন। তিনি গিয়ে তা দেখলেন ও তার সংবাদ নিয়ে আসলেন। এক দীর্ঘ কাহিনীতে তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন; তা আমাদের গ্রন্থের বিষয়াদির অন্তর্গত নয়।'[৭৮]

এ অঞ্চলের দশম অংশে মাজুজদের এলাকা। এটা এ অংশের শেষপ্রান্ত বিস্তৃত হয়ে ঐখানে বেষ্টনকারী সাগরের একটি খণ্ডের সাথে মিলিত হয়েছে এবং উক্ত সাগর খণ্ড তাকে পূর্ব ও উত্তর দিকে ঘিরে রেখেছে। এ খণ্ডটি উত্তর দিকে দীর্ঘায়িত এবং পূর্ব দিকে কতকাংশে প্রশস্ত।

সপ্তম অঞ্চল

বেষ্টনকারী সাগর এর অধিকাংশ ভূভাগকে উত্তর দিকে পঞ্চম অংশের মধ্যভাগ পর্যন্ত গ্রাস করে রেখেছে। উক্ত পঞ্চম অংশে তা ইয়াজুজ ও মাজুজদের এলাকা বেষ্টনকারী কাউকিয়া পর্বতের সাথে মিলিত হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ সাগরের নিচে, শুধু 'ইনকালতারা' (ইংল্যান্ড) দ্বীপ, যার অধিকাংশ দ্বিতীয় অংশে পড়েছে। প্রথম অংশে তার একটি প্রান্ত মাত্র, যা উত্তর দিক ঘেষে ঘুরে গেছে। এর অবশিষ্ট ভাগ তার চতুর্দিকে একটি গোলাকার সাগর খণ্ডসহ ষষ্ঠ অঞ্চলের দ্বিতীয়াংশে পড়েছে, যেমন যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে মূল স্থলভাগের দিকে অতিক্রমযোগ্য জলভাগের (চ্যানেলের) বিস্তার বার মাইল। উক্ত দ্বীপের পশ্চাতে দ্বিতীয় অংশে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে দীর্ঘায়িত 'রাসালিন্দা' দ্বীপ।[৭৯]

তৃতীয় অংশ এ অঞ্চলের তার অধিকাংশ ভূভাগ জলাবৃত; শুধু দক্ষিণ দিকে একটি দীর্ঘায়িত ভূখণ্ড, যা পূর্বভাগে বিস্তৃত হয়েছে এবং এখানে তা ফালুনিয়া (পোল্যান্ড)[৮০]

---

৭৮. 'এটা ঠিক—নয়' পর্যন্ত অংশটি কোন কোন সংস্করণে নেই।

৭৯. রাসালিন্দা বলতে আইসল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের কোন অংশকে বুঝাতে পারে।

৮০. পূর্বে এটাই 'বালুনিয়া' রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

www.amarboi.org

এলাকার সাথে সন্নিহিত, যার কথা ষষ্ঠ অঞ্চলের তৃতীয় অংশে বর্ণিত হয়েছে। তা এর উত্তরে অবস্থিত এবং এ অংশের ভূভাগ গ্রাসকারী সমুদ্র খণ্ডের মধ্যে পশ্চিম পার্শ্বে বিস্তৃত চক্রাকারে বিদ্যমান। তা একটি দ্বারতুল্য ভূভাগ (যোজকের) দ্বারা মূল ভূমির সাথে সংযুক্ত, যা ফালুনিয়া এলাকার দিকে চলে গেছে। তার উত্তর দিকে 'বউকা' (নরওয়ে) দ্বীপ, উত্তর দিক পশ্চিমে পূর্বে দীর্ঘায়িত।

এ অঞ্চলের চতুর্থ অংশের উত্তর ভাগ পশ্চিমে পূর্বে বেষ্টনকারী সাগর দ্বারা আবৃত এবং তার দক্ষিণ ভাগ জলমুক্ত। তার পশ্চিম দিকে তুর্কি 'কিমাযাক' ভূমি (ফিনল্যান্ড?) এবং তার পূর্ব দিকে 'তস্ত' এলাকা। এরপর এ অংশের পূর্ব শেষ প্রান্ত পর্যন্ত 'রাসালিন্দ্র' এলাকা (এস্তোনিয়া?)। এটা সর্বদা বরফাচ্ছাদিত এবং জনবসতি খুবই সামান্য। এটা ষষ্ঠ অঞ্চলের চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে অবস্থিত রুশিয়া এলাকার সাথে সন্নিহিত।

এ অঞ্চলের পঞ্চম অংশের পশ্চিম কোণে রূশিয়া এলাকা এবং তা উত্তর দিকে বেষ্টনকারী সাগরের এমন একটি খণ্ডের নিকটে শেষ হয়েছে, যার কাউকিয়া পর্বত সংযুক্ত এবং যার কথা পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। তার পূর্বকোণে এটা ষষ্ঠ অঞ্চলের ষষ্ঠ অংশে অবস্থিত নিতাশ সাগরের তীরের 'কমানিয়া' এলাকার সাথে সংযুক্ত এবং এ অংশের 'তরমী' হ্রদে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ হ্রদের জল সুপেয় এবং উত্তর দক্ষিণের পর্বতাদি থেকে বহু নদী এসে এতে পতিত হচ্ছে। এ অংশের পূর্ব কোণের উত্তরে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত তুর্কেম্যান তাতারীদের এলাকা।

ষষ্ঠ অংশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ 'কমানিয়া' এলাকার সাথে সংযুক্ত। তার মধ্যভাগে 'আসুর' হ্রদ। এর জল সুপেয় এবং কোণের পর্বতাদি থেকে বহু নদী এতে এসে পড়েছে। এটা সর্বদাই অতিরিক্ত শীতের দরুন জমে থাকে; শুধু গ্রীষ্মকালে সামান্য গলে। 'কমানিয়া' এলাকার পূর্বে রুশিয়া এলাকা, যা ষষ্ঠ অঞ্চলের পঞ্চমাংশের পূর্ব-উত্তর কোণ থেকে আরম্ভ হয়েছে। এ অংশের পূর্ব দক্ষিণ কোণে বুলগারদের এলাকার অবশিষ্ট ভাগ, যা ষষ্ঠ অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছে—তার ষষ্ঠ অংশের পূর্ব-উত্তর কোণে এবং বলুগার ভূমির এ ভূখণ্ডের মধ্যভাগে 'আসল' (ভলগা) নদীর বাঁক অবস্থিত। প্রথম ভূখণ্ডটি দক্ষিণ দিকে, যেমন বর্ণিত হয়েছে।[৮১] এ ষষ্ঠ অংশের উত্তর শেষ প্রান্তে কাউকিয়া পর্বত পশ্চিমে-পূর্বে তার সাথে সংযুক্ত।

এ অঞ্চলের সপ্তম অংশের পশ্চিম দিকে তুর্কি গোত্রভুক্ত 'ইয়াকনাক'দের এলাকার অবশিষ্ট ভূমি। এটা পূর্বে ষষ্ঠ অংশের উত্তর-পূর্ব কোণ এবং এ অংশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে আরম্ভ হয়েছে। এ অংশের উপরিভাগ দিয়ে ষষ্ঠ অঞ্চলের দিকে বের হয়ে গেছে। এ অংশের পূর্ব কোণে 'সোহরাব' ভূমির অবশিষ্ট ভাগ এবং এর পর 'মুন্তেনা' ভূমির অবশিষ্ট ভাগ এ অংশের শেষ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশের শেষ উত্তর প্রান্তের সাথে পশ্চিমে পূর্ব বেষ্টনকারী কাউকিয়া পর্বত সংযুক্ত।

এ অঞ্চলের অষ্টম অংশের পশ্চিম দক্ষিণ দিক মুন্তেনা ভূমির সাথে সন্নিহিত। এর পূর্ব ভাগে 'মাহফুরা' (খাত) ভূমি অবস্থিত। এটা এক অদ্ভুত এলাকা। এটা পৃথিবীর এক

৮১. এখানে প্রথম ভূখণ্ডটি বলতে সম্ভবত বুলগারদের এলাকার অবশিষ্ট ভাগ বুঝিয়েছে। রোজেনথালেও এর অনুবাদ স্পষ্ট নয়।

www.amarboi.org

বিরাট ফাটল, দিগন্ত বিস্তৃত ও সুগভীর; এর তলদেশ পাওয়া যায় না। এতে দিনের বেলা ধূম্র নির্গত হতে এবং রাতের বেলা অগ্নি জ্বলতে ও নির্বাপিত হতে দেখা যায়। এর ফলে মনে হয়, এলাকাটি জনবসতিপূর্ণ। অনেক সময় তাতে একটি নদীর অস্তিত্ব দেখা যায়, যা তাকে উত্তরে দক্ষিণে দুইভাগে ভাগ করে থাকে। এ অংশের পূর্ব কোণে প্রাচীর সংলগ্ন সেই বিধ্বস্ত এলাকা এবং এর শেষ উত্তর দিকে পূর্ব-পশ্চিমে সংযুক্ত কাউকিয়া পর্বত।

এ অঞ্চলের নবম অংশের পশ্চিম পার্শ্বে 'খফশাখ'দের এলাকা। এদেরকে 'কফজাক'ও বলা হয়। এ এলাকাকে কাউকিয়া পর্বত বেষ্টনকারী সাগরের নিকটে উত্তর থেকে মোড় নিবার কালে অতিক্রম করেছে। এটা এ এলাকার মধ্যভাগে পূর্বদিকে ঘেষে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং ষষ্ঠ অঞ্চলের নবম অংশে বের হয়ে গেছে। সেখানে এটা বিস্তৃত হয়েছে এবং ঐখানে এর মধ্যভাগে ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ অংশের পূর্ব কোণে কাউকিয়া পর্বতের পশ্চাতে সাগরের তীরে ইয়াজুজ ভূমি, সামান্য প্রশস্ত, দীর্ঘায়িত—পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে এ অংশকে ঘিরে রেখেছে।[৮২]

দশম অংশের সমুদয় এলাকাই সাগর জলে আবৃত।

এটাই ভূগোল ও তার সপ্ত অঞ্চল সম্পর্কে শেষ বক্তব্য। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিবারাত্রির আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন বিদ্যমান।[৮৩]

৮২. এ স্থানে 'সামান্য প্রশস্ত দীর্ঘায়িত' বিশেষণদ্বয় সাগরখণ্ডের হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

৮৩. এটা কোরানের দুইটি আয়াতের সংমিশ্রণ। দ্র: কোরান ২, ১৬৪; ৩, ১৯০; ৪৫, ৩-৫।

www.amarboi.org

তৃতীয় প্রস্তাবনা

[নাতিশীতোষ্ণ ও শীতোষ্ণ অঞ্চলসমূহ; মানুষের গাত্রবর্ণ ও তাদের অন্যবিধ বহু অবস্থার উপর বায়ুর[৮৪] প্রভাব সম্পর্কে]

আমরা বর্ণনা করেছি যে, পৃথিবীর এ জলমুক্ত অংশে জনবসতিপূর্ণ এলাকা হল তার মধ্যভাগ। কারণ তার দক্ষিণ দিক অতিশয় উষ্ণ এবং তার উত্তর দিক অতিরিক্ত শীতপ্রধান। যেহেতু তার উভয় পার্শ্ব উত্তর ও দক্ষিণ শীত ও উষ্ণতার দিক থেকে পরস্পর বিরোধী, সেজন্য উক্ত উভয় পার্শ্ব থেকে অবস্থা পর্যায়ক্রমে হ্রাস পেয়ে মধ্যভাগ সমভাবাপন্ন হয়েছে। সুতরাং চতুর্থ অঞ্চল সর্বাপেক্ষা সমভাবাপন্ন জনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং তার সীমান্তবর্তী তৃতীয় ও পঞ্চম অঞ্চল সমভাবাপন্ন অবস্থার অধিকতর নিকটবর্তী। এদের পরবর্তী দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ অঞ্চল সমভাবাপন্ন অবস্থা থেকে দূরে এবং প্রথম ও সপ্তম অঞ্চল অধিকতর দূরে অবস্থিত। এ কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, স্থাপত্য, পরিচ্ছদ, খাদ্য, ফলমূল, এমনকি জীবজন্তু ও অন্য সকল বস্তু, যা মধ্যভাগের এ তিনটি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তৎসমুদয়ই সমভাবাপন্নতার দ্বারা বিশিষ্ট। এ সকল অঞ্চলের অধিবাসী মানবগোষ্ঠীও দেহ, বর্ণ, চরিত্র, ধর্মবোধ প্রভৃতির দিক থেকে অধিকতর সমভাবাপন্ন। এমনকি নবুয়তও; এটা শুধু এ অঞ্চলগুলোতেই অধিকতর পাওয়া যায়। আমরা দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তীয় অঞ্চলগুলোতে নবী প্রেরণের কোন সংবাদ জানতে পারিনি। এর কারণ এ যে, নবী ও রসূলগণ মানব জাতির মধ্যে দৈহিক গঠন ও চরিত্রের দিক থেকে অধিকতর পরিপূর্ণতার দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের জন্য বহির্গত হয়েছে। কারণ এর ফলে আল্লাহ্র নিকট থেকে নবীগণ যা নিয়ে আসেন, তা সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা এ সমভাবাপন্নতার অস্তিত্বের জন্য অধিকতর পরিপূর্ণতার অধিকারী।[৮৫]

এ কারণেই দেখা যায়, তারা তাদের গৃহ, পরিচ্ছদ, খাদ্য ও শিল্পকর্মে অতিশয় মধ্যপন্থী। তারা প্রস্তর নির্মিত ও শিল্পকলায় সুশোভিত সুদৃঢ় গৃহ তাদের আবাসস্থল হিসাবে গ্রহণ করে, তারা অস্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র আবিষ্কারে পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং তাতে চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করে থাকে। তাদের নিকট স্বভাবজ ধাতব পদার্থ, যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসা ও টিন পাওয়া যায় এবং তারা আদান-

---

৮৪. বায়ু বলতে ইবনে খলদুন সর্বত্র 'জলবায়ু'কে বুঝিয়েছেন।

৮৫. 'এমনকি নবুয়তও অধিকারী' পর্যন্ত অংশটি রোজেনথাল পাদটীকায় সংযোজন করেছেন। কোরানের আয়াতটির জন্য ৩, ১১০ দ্র:।

www.amarboi.org

প্রদানে দুটি উত্তম ধাতুর[৮৬] মুদ্রা ব্যবহার করে। তারা সর্বাবস্থায় অসহিষ্ণুতা থেকে দূরে থাকে। এ সকল মানবগোষ্ঠী মাগরিব, সিরিয়া, হেজাজ, ইয়ামেন, দুই ইরাক, হিন্দু, সিন্ধু ও চীনের অধিবাসী। অনুরূপভাবে আন্দালুস ও তৎসন্নিহিত ফিরিঙ্গী, জিল্লাকী, রোম, গ্রিক এবং এ সকল সমভাবাপন্ন অঞ্চলে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ও নিকটবর্তী অন্যান্য জনগোষ্ঠী। এ জন্যই সিরিয়া ও ইরাক এদের মধ্যে অধিকতর সমভাবাপন্ন। কারণ এ দুটি দেশ সর্বদিক থেকেই মধ্যভাগে অবস্থিত।

যে সকল অঞ্চল এ সমভাবাপন্ন অবস্থা থেকে দূরে অবস্থিত, যেমন প্রথম ও দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম, তাদের অধিবাসীরাও তাদের সর্বাবস্থায় সমভাব থেকে অধিকতর দূরবর্তী। তাদের গৃহ মাটি ও বাঁশের তৈরি, তাদের খাদ্য 'জুর্রা'[৮৭] ও শাক্‌সজী এবং তাদের পরিচ্ছদ গাছের পাতায় সেলাই করা পরিধেয় অথবা চামড়া। তাদের অধিকাংশেরই পরিচ্ছদহীন উলঙ্গ অবস্থা। তাদের এলাকার ফলমূল ও মসল্লাপাতি সমস্তই অদ্ভুত ধরনের এবং প্রায় চরমভাবাপন্ন। তাদের আদান-প্রদান দুটি সম্ভ্রান্ত ধাতু ছাড়াই নিষ্পন্ন হয়। তারা তামা, লোহা অথবা চামড়াকে তাদের বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের চরিত্র ভাষাহীন প্রাণীদের প্রায় সমতুল্য। এমনকি প্রথম অঞ্চলের সুদানী(নিগ্রো)দের অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা গৃহ ও ঝুপড়ীতে বাস করে, লতাপাতা খায় এবং তারা সম্প্রীতির পরিবর্তে পশুসুলভ বিচ্ছিন্নতায় বাস করে একে অপরকে আহার করে। 'সাকালী' (স্লাভ)-রাও অনুরূপ। এর কারণ এ যে, সমভাবাপন্ন অবস্থা হতে দূরে অবস্থানের ফলে তাদের মানসিকতা ও চরিত্রের গড়ন ভাষাহীন পশুদের অনুরূপ গড়নের নিকটবর্তী হয়ে থাকে এবং সেই অনুপাতে তারা মনুষ্যত্ব থেকে দূরে সরে যায়। ধর্ম সম্পর্কেও তাদের অবস্থা একইরূপ; তারা নবুয়ত কাকে বলে জানে না, কোন প্রকার ধর্মীয় বিধান তারা পালন করে না। শুধু তাদের মধ্যে যারা সমভাবাপন্ন অবস্থার নিকটবর্তী, তাদের মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়; যদিও তা খুবই কম ও নগণ্য। যেমন ইয়ামেনীদের প্রতিবেশী হাবশীরা তারা প্রাক্-ইসলাম যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকাল পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করে রয়েছে। যেমন মাগরিবের অধিবাসীদের প্রতিবেশী মালী, কাউ কাউ ও তাক্‌রের জনগোষ্ঠী, তারা বর্তমানে ইসলাম ধর্ম পালন করছে। বলা হয়, তারা সপ্তম (ত্রয়োদশ খ্রি:) শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এরূপ উত্তর দিকের সাকালী (স্লাভ), ফিরিঙ্গী ও তুর্কিদের মধ্যে যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। এদের ছাড়া উত্তরে দক্ষিণের এ অসমভাবাপন্ন অঞ্চলগুলোর অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম অজ্ঞাত, জ্ঞান-বিজ্ঞান অবলুপ্ত; তাদের সমুদয় অবস্থাই মনুষ্য সমাজ থেকে দূরে, ভাষাহীন প্রাণীদের নিকটবর্তী। তিনি এমন অনেক কিছুই সৃষ্টি করেন, যার জ্ঞান তোমাদের নেই।[৮৮]

উপরোক্ত বক্তব্যের উপর, ইয়ামেন, হাদ্রামাত, আহকাফ, হেজাজ, ইয়ামামা ও আরবের অন্যান্য সন্নিহিত এলাকার প্রথম ও দ্বিতীয় অঞ্চলে অবস্থানের জন্য কোন

৮৬. স্বর্ণ ও রৌপ্য।

৮৭. জোয়ার বা বাজরা জাতীয় খাদ্য।

৮৮. কোরান ১৬, ৮।

www.amarboi.org

প্রকার আপত্তি উত্থাপন ঠিক হবে না। কারণ আরব উপদ্বীপ তিন দিক থেকেই সাগর দ্বারা বেষ্টিত, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ জন্য সামুদ্রিক আর্দ্রতা তার বায়ুতে প্রভাব বিস্তার করে শুষ্কতা ও উত্তাপজনিত অসমভাবের হ্রাস ঘটায় এবং সামুদ্রিক আর্দ্রতার ফলেই তাতে কিছুটা সমভাবাপন্নতা দেখা দেয়।

কোন কোন বংশ তালিকাবিশারদ, যাদের সৃষ্টজগতের স্বভাবাদি সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই, তারা এমন ধারণা পোষণ করেন যে, সুদানী(নিগ্রো)রা হজরত নুহের পুত্র হামের বংশধর। হামকে তার পিতা যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তারই প্রভাবস্বরূপ তাদের গাত্রবর্ণ কাল হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ তাদের উপর দাসত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। তারা এ সম্পর্কে গল্পকারদের এক কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করে থাকেন। হজরত নুহ কর্তৃক পুত্র হামকে অভিশাপ দানের কথা তৌরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে; সেখানে কাল বর্ণের কথা নেই। তদুপরি তাঁর অভিশাপ ছিল, হামের পুত্ররা যেন তার ভাইদের বংশাবলির দাসে পরিণত হয়, অন্যদের নয়। গাত্রবর্ণ কাল হওয়ার ব্যাপারটি হামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করার মধ্যে শীত-গ্রীষ্মের প্রকৃতি এবং বায়ু ও জীবন বিকাশের উপকরণের উপর তাদের প্রভাবের প্রতি উদাসীনতাই বিরাজ করছে।

এর কারণ এ যে, গাত্রবর্ণের এ কাল রং দক্ষিণের অত্যধিক উষ্ণতাজনিত বায়ুর বিশেষ প্রভাব থেকেই প্রথম ও দ্বিতীয় অঞ্চলের আধিবাসীরা সাধারণভাবে লাভ করেছে। সূর্য বছরে দুইবার তাদের উপরে খ-মধ্যে অবস্থান করে। এ অবস্থান দুটি নিকটবর্তী হওয়ার ফলে প্রায় সর্ব ঋতুতেই খ-মধ্যে অবস্থানের কাল দীর্ঘায়িত হয়। তদ্দরুন অতিরিক্ত রশ্মিপাত ও তাঁদের উপর তীব্র তাপ বিকিরিত হয়ে উষ্ণতার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে গাত্রবর্ণ কাল হয়ে যায়। এ দুটি অঞ্চলের দৃষ্টান্ত অনুসারে তাদের বিপরীত দিকে সপ্তম ও ষষ্ঠ অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণভাবে উত্তরের অতিরিক্ত শৈত্যজনিত বায়ুর বিশেষ প্রভাবে সাদা গাত্রবর্ণের অধিকারী হয়ে থাকে। কারণ সূর্য সর্বদাই তাদের দিগন্তে দৃক্‌চক্রবাল অথবা তার নিকটে অবস্থান করে। তা কখনই খ-মধ্য বা তার নিকটবর্তী হয় না। সুতরাং সেখানে তাপ হ্রাস পায় এবং প্রায় সর্ব ঋতুতে শীতের আধিক্য হয়ে থাকে। এর ফলে তাদের গাত্রবর্ণ সাদা এবং তাদের দেহ লোমহীন হয়ে দাঁড়ায়। অত্যধিক শীতের প্রভাব অনুসরণ করেই তাদের চক্ষুর বর্ণ নীল, তাদের ত্বকে তিলের দাগ ও তাদের চুলের রং বাদামী হয়।

এ দুই বিপরীতের মধ্যভাগে তিনটি অঞ্চল—পঞ্চম, চতুর্থ ও তৃতীয় অবস্থিত। এ কারণেই এদের ভাগে মধ্যম অবস্থার বৈশিষ্ট্য সমভাবাপন্নতার একটি বিরাট অংশ পড়েছে। এদের মধ্যে আবার চতুর্থ অঞ্চল সমভাবাপন্নতার দিক থেকে সর্বাপেক্ষা চরম। কারণ এটা সর্বাপেক্ষা চূড়ান্ত মধ্যভাগে অবস্থিত, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এর অধিবাসীদের দৈহিক গঠন ও প্রকৃতিতে পরিবেশগত বায়ুর মেজাজ অনুসারেই সমভাবাপন্নতা দেখা দিয়েছে। দুই পার্শ্ব থেকে তৃতীয় ও পঞ্চম তাকে অনুসরণ করেছে; যদিও এরা চরম মধ্যম অবস্থায় পৌঁছতে পারেনি। কারণ এদের একটি উষ্ণ দক্ষিণের দিকে এবং অন্যটি শীতল উত্তরের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকে আছে। কিন্তু তথাপি এরা অসমভাবাপন্নতার দিকে পৌঁছায়নি। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট চারটি অঞ্চল

www.amarboi.org

অসমভাবাপন্ন। তাদের অধিবাসীদের দৈহিক গঠন ও প্রকৃতিও তদনুরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় তাদের উষ্ণতা ও কৃষ্ণতার জন্য এবং সপ্তম ও ষষ্ঠ তাদের শৈত্য ও শুভ্রতার জন্য।

দক্ষিণের প্রথম ও দ্বিতীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের নামকরণ করা হয়েছে হাবশী, জঞ্জ ও সুদানী(নিগ্রো)। এগুলো কৃষ্ণকায় জাতিসমূহের একার্থবাচক নাম। তথাপি হাবশী বলতে ঐসকল লোককে বোঝায়, যারা মক্কা ও ইয়ামেনের বিপরীত দিকে বাস করে এবং জঞ্জ বলতে বোঝায়, যারা ভারত সাগরের বিপরীত দিকে বাস করে। কোন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি, সে হাম বা অন্য যে কেউ হোক, তার বংশধর বলে তাদেরকে ঐ সকল নামে আখ্যায়িত করা হয়নি। আমরা দেখতে পাই, দক্ষিণের অধিবাসী সুদানীদের মধ্যে যারা সমভাবাপন্ন চতুর্থ অঞ্চলে অথবা অসমভাবাপন্ন সাদা গাত্রবর্ণের অধিকারী সপ্তম অঞ্চলে বসবাস করছে, তাদের বংশধরদের গাত্রবর্ণ কালক্রমে সাদা হয়ে উঠছে। এর বিপরীত চতুর্থ অঞ্চল অথবা উত্তর দিকের যারা দক্ষিণে বসবাস করছে, তাদের সন্তানদের দেহের বর্ণ কাল হয়ে যাচ্ছে। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, গাত্রবর্ণ বায়ুর বৈশিষ্ট্যের অনুসারী। ইবনে সীনা তাঁর চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কীয় 'রেজায' পদ্যে বলেন :[৮৯]

> জঞ্জদের দেহে উষ্ণতা পরিবর্তন এনেছে, তাদের বর্ণ কাল হয়ে গেছে;
> স্লাভগণ পেয়েছে শুভ্রতা, এমনকি তাদের ত্বক কোমল হয়ে গেছে।

উত্তর দিকের অধিবাসীরা অবশ্য গাত্রবর্ণের অনুসারে নামাঙ্কিত হয়নি। কারণ যারা ঐসকল নামের ভাষা নির্ধারণ করেছিলেন, তাঁদের গাত্রবর্ণ ছিল সাদা। এজন্য তাঁরা তার মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব পাননি, যদ্বারা তা নামকরণের জন্য বিবেচ্য হতে পারে। কারণ তা তাদের নিকট অসমঞ্জস ও অস্বাভাবিক কিছু নয়। উত্তরের অধিবাসী—তুর্কি, সাকালী (স্লাভ), 'তাগুরগুর,' 'খাজার,' লানী (এলান), ফিরিঙ্গীদের বহু গোত্র ও ইয়াজুজ-মাজুজদের মধ্যে আমরা বিভিন্ন নাম এবং অগণিত গোত্রের বিচিত্র অভিধা দেখতে পাই।

মধ্যভাগের তিনটি অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ, তারা তাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও চরিত্রে সমভাবাপন্ন। সভ্যতার সমুদয় স্বাভাবিক উপকরণ—জীবিকা, আবাস, শিল্পকলা, জ্ঞানবিজ্ঞান, নেতৃত্ব ও সাম্রাজ্য—সবকিছুই তাদের মধ্যে বিদ্যমান। এ জন্যই তাদের মধ্যে নবুয়ত, রাজ্য-সাম্রাজ্য, ধর্মীয় বিধান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নগর, গ্রাম, স্থাপত্য, বুদ্ধিমত্তা, মনোরম শিল্পকলা এবং যাবতীয় সমভাবাপন্ন অবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ সকল অঞ্চলের অধিবাসী, যাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি, তারা হল—আরব, রোম, পারস্য, বনি ইসরাইল, গ্রিস, সিন্ধু, হিন্দ ও চীন দেশে অন্তর্ভুক্ত।

বংশ তালিকাবিশারদগণ যখন এ সকল জাতির মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন অনুসারে বিভিন্নতা দেখতে পেলেন, তখন তাঁরা ভাবলেন এ সবকিছুই বংশধারার ফল। এর ফলে তাঁরা দক্ষিণের অধিবাসী সকলকেই হামের বংশধর সুদানী(নিগ্রো) বলে

৮৯. 'রেজায' আরবি কাব্যের উনিশটি ছন্দের অন্যতম।

www.amarboi.org

অভিহিত করলেন এবং তাদের গাত্রবর্ণ সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হলেন। এ কারণেই তারা এ সকল ভিত্তিহীন কাহিনী সংগ্রহের কষ্ট স্বীকার করেছেন। তারা উত্তরের অধিবাসী সকলকে কিংবা অধিকাংশকে ইয়াফতের সন্তান এবং সমভাবাপন্ন জাতি ও মধ্যভাগের অধিবাসীর অধিকাংশ, যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ধর্মসম্প্রদায়, ধর্মীয় বিধান, শাসন ব্যবস্থা ও রাজত্বের অধিকারী, তাঁদেরকে সামের সন্তান বলে নির্ধারিত করেছেন। তাঁদের এ বংশধারা নির্দেশের ধারণা হয়ত বা সত্যের অনুসারী হতে পারে, তথাপি তা যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়; বরং তা শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণ। এর অর্থ এ নয় যে, দক্ষিণের অধিবাসীদের সুদানী ও হাবশী নামকরণ কোন কৃষ্ণকায় হামের বংশধারার জন্য হয়েছে। তাদের এ প্রকার ভ্রমে পতিত হওয়ার একমাত্র কারণ, তাদের বিশ্বাস এ যে, কেবল বংশধারার ফলেই জাতিগুলোর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এরূপ নয়। কোন জাতীয় বা গোত্রীয় বৈশিষ্ট্য অনেকের মধ্যে বংশধারার জন্য হয়, যেমন আরব, বনি ইসরাইল ও পারস্যবাসীদের মধ্যে; অনেকের মধ্যে দিক ও চিহ্নের জন্য হয়, যেমন জঞ্জ, হাবশী, সাকালী ও সুদানীদের মধ্যে; অনেকের মধ্যে অভ্যাস, চালচলন ও বংশানুক্রমনের জন্য হয়, যেমন আরবদের মধ্যে এবং এতদ্ব্যতীতও বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রপূর্ণ অবস্থার জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং কোন এক কালে পূর্বপুরুষের মধ্যে প্রাপ্ত ধর্মমত, রং বা চিহ্নের নিদর্শন আবিষ্কার করে উত্তর বা দক্ষিণের মত নির্দিষ্ট কোন দিকের অধিবাসীদিগকে সেই বিখ্যাত পূর্বপুরুষের বংশধর বলে আখ্যায়িত করা এমন এক প্রকার ভুল, যা সৃষ্ট জগৎ ও ভৌগোলিক দিকের স্বভাব সম্পর্কে উদাসীনতার জন্যই সংঘটিত হয়। কারণ এর সবকিছুই বংশধারার মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অন্তত এর চিরস্থায়িত্বের কোন সম্ভাবনাই নেই।

(এটাই) আল্লাহ্‌র প্রথা তাঁর বান্দাদের মধ্যে এবং তুমি আল্লাহ্‌র প্রথার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না।[৯০] আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাঁর অদৃশ্য সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাতা ও সুদৃঢ়। তিনিই অনুগ্রহকারী বন্ধু, পরম করুণাময় দয়ালু।

৯০. দ্র: কোরান ৩৩, ৬২; ৩৫, ৪৩; ২৮, ২৩। পরের অংশটির অনুবাদ রোজেনথালে নেই।

www.amarboi.org

চতুর্থ প্রস্তাবনা

[মানব চরিত্রের উপর বায়ুর প্রভাব সম্পর্কে]

আমরা সুদানী(নিগ্রো)দের চরিত্রে প্রত্যক্ষ করেছি যে, তারা সাধারণভাবে লঘুত্ব, আবেগ ও অত্যধিক উল্লাসপ্রবণ হয়ে থাকে। যে কোন উপলক্ষে আপনি তাদেরকে নৃত্য করতে দেখতে পাবেন। এজন্য সর্বত্র তাদেরকে বোকা বলে মনে করা হয়।

এর যথার্থ কারণ এ : বিজ্ঞানের আলোচনায় এটা যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, উল্লাস ও আনন্দের স্বভাব হল সজীবতার বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি এবং বিপদের প্রকৃতি এর ঠিক বিপরীত। তাতে সজীবতা সংকুচিত ও কেন্দ্রিভূত হয়ে পড়ে। এটাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, উষ্ণতা বায়ুকে ব্যাপ্তি দান করে এবং বাষ্পকে সূক্ষ্মতা দান করে তাদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এজন্যই মদ্যপায়ী এবং এমন আনন্দ-উল্লাসের অধিকারী হয়, যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এর কারণ এ যে, মদের শক্তি তার বিশেষ মিশ্রণের দ্বারা তার সজীবতার মধ্যে যে তাপের সৃষ্টি করে, তদ্বারা সজীবতার বাষ্প অন্তঃকরণে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং সজীবতার ব্যাপ্তি ঘটে ও উল্লাসের জন্ম দেয়। এরূপ উষ্ণ স্নানাগার বিলাসীদের মধ্যে হয়ে থাকে। তারা যখন তার উষ্ণ বায়ুর মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, তখন বায়ুর উষ্ণতা তাদের সজীবতায় প্রবেশ করে তাকে ব্যাপ্তি দান করে এবং আনন্দ উৎপাদন করে। অনেক সময় তাদের অনেকেই গান গাইতে আরম্ভ করে। কারণ এ আনন্দ থেকেই গানের জন্ম।

অতএব, সুদানীরা যেহেতু উষ্ণ অঞ্চলের অধিকারী, এজন্য উষ্ণতা তাদের মানসিকতা ও গঠনের উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। তাদের দেহ ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে তাদের সজীবতায় উষ্ণতার পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে। এজন্য তাদের সজীবতায় সঞ্চিত উষ্ণতা ও তার ব্যাপ্তি চতুর্থ অঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় অত্যধিক হয় এবং এ কারণেই তারা অতিদ্রুত 'আনন্দ-উল্লাসে'র কবলে পতিত হয় ও অত্যধিক আনন্দিত হয়ে উঠে। তাদের আবেগপ্রবণতা এরই প্রভাবজাত। এ ব্যাপারে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকার অধিবাসীদের সাথে তাদের সামান্য মিল আছে। কারণ সেখানে সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রতিবিম্বিত সূর্যরশ্মি ও তার কিরণ বায়ুর মধ্যে অত্যধিক উষ্ণতার সৃষ্টি করে। এর ফলে তারা শীতল পাহাড়ী ও পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের অপেক্ষা অধিক উষ্ণতাজনিত আনন্দ ও লঘুত্বের অধিকারী হয়ে থাকে। এর কিছুটা উদাহরণ আমরা 'আলজজিরা'[৯১] এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে পেতে পারি।

---

৯১. রোজেনথাল লিখেছেন 'জরিদ'।

www.amarboi.org

তৃতীয় অঞ্চলের এ এলাকাটি সমুদ্রতীর ও পার্বত্য এলাকার দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ার ফলে তার পরিবেশ ও বায়ুতে উষ্ণতার আধিক্য বিদ্যমান। মিশরের অধিবাসীদিগকেও এ দিক থেকে বিবেচনা করা যায়। কারণ, তারাও আলজজিরা কিংবা তার নিকটবর্তী অক্ষাংশে বসবাস করে। তাদের মধ্যে আনন্দ, লঘুত্ব ও পরিণামদর্শিতার কী প্রসার! এমন কি তারা বছর বা মাসের জন্যও তাদের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করে রাখে না। অধিকাংশ খাদ্য তারা বাজার থেকে ক্রয় করে খায়। অথচ মাগরিবের ফাস (ফেজ) এলাকা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাকে চুতর্দিক থেকে শীতল পাহাড়ী এলাকা ঘিরে রাখার ফলে তা স্থলভাগের মধ্যে অবস্থিত। এ জন্য দেখা যায়, এর অধিবাসীরা যেন বিষাদের প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং পরিণামদর্শিতায় তারা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি তার দুই বছরের আহার্য গম সঞ্চয় করে রাখে। এতদ্‌সত্ত্বেও সে প্রত্যহ বাজার থেকে খাদ্য কিনে খায়, যাতে তার সঞ্চিত শস্য ব্যয় হয়ে না যায়। পাঠক, আপনি যদি বিভিন্ন অঞ্চল ও এলাকায় এভাবে মানব চরিত্র অনুসন্ধান করেন, মানব চরিত্রের উপর বায়ুর প্রভাবের বিচিত্র অবস্থা দেখতে পাবেন। আল্লাহ্‌ই সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা।[৯২]

মাসউদী সুদানীদের এ প্রকার লঘুত্ব, আবেগ ও অত্যধিক উল্লাসের কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি প্রায় কিছুই উপস্থিত করতে পারেননি। শুধু জালিনুস (গ্যালেন) ও ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আলকিন্দীর[৯৩] বরাত দিয়ে বলেছেন যে, তার একমাত্র কারণ তাদের মস্তিষ্কের দুর্বলতা এবং এর ফলেই তাদের বুদ্ধির মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। এ বক্তব্যের কোন ফলশ্রুতি নেই, কোন প্রমাণও নেই। 'আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা করেন, সরল পথ দেখিয়ে থাকেন'।[৯৪]

৯২. কোরান ১৫, ৮৬; ৩৬, ৮১।
৯৩. খ্রি: নবম শতাব্দির বিখ্যাত দার্শনিক।
৯৪. কোরান; ২, ১৪২, ২১৩।

www.amarboi.org

পঞ্চম প্রস্তাবনা

[মানব সভ্যতায় খাদ্যের প্রাচুর্য ও ক্ষুধাজনিত বিভিন্ন অবস্থা এবং মানদেহ ও চরিত্রের উপর তৎসৃষ্ট প্রভাব সম্পর্কে]

জেনে রাখুন যে, এ সকল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সর্বত্রই খাদ্যের প্রাচুর্য আছে, এমন নয়। এমনকি তাদের অধিবাসীরা সকলেই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবনযাপন করে না। বরং তাদের কোন কোন অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ উপযোগী উর্বরভূমি ও জনবসতির প্রাচুর্যের জন্যই অধিবাসীরা শস্য, মসল্লাদি, গম ও ফলমূলের প্রাচুর্য ভোগ করে থাকে। তাদের মধ্যে এমন উত্তপ্ত ভূমিও আছে যাতে কোন ফসল, ঘাস-পাতা কিছুই জন্মায় না। এ সকল স্থানের অধিবাসীরা খুবই অসচ্ছল জীবনযাপন করে থাকে। যেমন হেজাজ ও দক্ষিণ ইয়ামেনের অধিবাসীরা; যেমন বারবার ও সুদানীদের মধ্যবর্তীস্থলে মাগরিবের প্রান্তর ও মরুভূমিতে বিচরণকারী 'আবৃত' সিনহাজা গোত্রের লোকেরা। তারা শস্য বা মসল্লা কোনোটিই ভোগ করতে পারে না। তাদের পুষ্টি ও আহার্য সকল কিছুই দুগ্ধ ও মাংসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মরুপ্রান্তরচারী আরবদের অবস্থাও অনুরূপ। তারা যদিও পাহাড়ী এলাকা থেকে শস্য ও মসল্লাদি সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু এটাও সময়ে সময়ে এবং ঐ সকল এলাকা রক্ষীদের দৃষ্টির সম্মুখে। তাদের সঙ্গতির অভাবেই তারা যা সংগ্রহ করে, তার পরিমাণ খুবই সামান্য। তদ্দ্বারা তারা স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য সৃষ্টি করা ত দূরের কথা, তাদের প্রয়োজন মিটাতে তারা সমর্থ হয় না। এজন্য পাঠক, আপনি দেখতে পাবেন তারা অনেক অবস্থাতেই শুধু দুধের উপর নির্ভর করে এবং তা তাদের জন্য গমের উত্তম বিকল্প হিসাবে পরিগণিত হয়। এতদ্সত্ত্বেও দেখা যায় যে, এ সকল শস্য ও মসল্লাদি বিরহিত প্রান্তরচারীরা পাহাড়ী এলাকার প্রাচুর্য বিলাসীদের অপেক্ষা দেহ ও চরিত্রের দিক থেকে উত্তম অবস্থায় বিরাজ করছে। তাদের গাত্রবর্ণ অধিকতর পরিষ্কার, তাদের দেহ অধিকতর মার্জিত এবং তাদের আকৃতি অধিকতর সুঠাম ও সুন্দর। তাদের চরিত্র অসহিষ্ণুতা থেকে অনেক দূরবর্তী এবং তাদের মেধাজ্ঞানও অনুভূতির ক্ষেত্রে অধিকতর তীক্ষ্ণ। এটা এমন একটি বিষয়, অভিজ্ঞতা তাদের প্রতিটি গোত্রেই এর সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে। অবশ্য এ সকল বিষয় আরব ও বারবারদের মধ্যে অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। 'আবৃত' যাযাবর ও পাহাড়ীদের মধ্যেও যদি কেউ অনুসন্ধান করে দেখে, এটা পেতে পারে।

www.amarboi.org

এর কারণ, আল্লাহ্ই ভাল জানেন[৯৫] অতিরিক্ত আহার্য ও অতিরিক্ত পচনশীল মিশ্রিত খাদ্যরস দেহের মধ্যে অতিরিক্ত মেদের সৃষ্টি করে। এর ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসমঞ্জসরূপে বেড়ে উঠে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় মেদবাহুল্যতার ফলে বিবর্ণতা ও গঠনের বিকৃতি দেখা দেয়; যেমন পূর্বে বলেছি। এ অতিরিক্ত খাদ্যরস থেকে উত্থিত দূষিত বায়ু মেধা ও মননের উপর আচ্ছন্নতার সৃষ্টি করে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে নির্বুদ্ধিতা উদাসীনতা ও সমভাবাপন্নতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার স্বভাব জাগ্রত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রান্তর ও শুষ্ক এলাকার প্রাণী, যেমন হরিণ, উটপাখি, বনগরু, জিরাফ বন্যগাধা, গরু প্রভৃতির সাথে পাহাড়ী, সমুদ্র তীরবর্তী ও শ্যামল চারণভূমির অনুরূপ পশুদের তুলনা করা যায়। এর ফলে তাদের মধ্যে চামড়ার সৌন্দর্য, গঠন ও অবয়বের সৌকর্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌসাদৃশ্য এবং অনুভূতির তীব্রতার দিক থেকে প্রচুর পার্থক্য দেখা যাবে। হরিণ ছাগলের ভাই, জিরাফ উটের ভাই এবং গাধা ও গরু অন্য গাধা ও গরুর ভাই। কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে, পাঠক, নিশ্চয়ই তা লক্ষ করেছেন। এর কারণ অন্য কিছুই নয়, পাহাড়ী এলাকার প্রাচুর্য তাদের শরীরে অতিরিক্ত মেদ ও পচনশীল আর্দ্রতার সৃষ্টি করেছে এবং তাদের দেহের উপরিভাগে তারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। আর ক্ষুধা প্রান্তরের প্রাণীগুলোকে সুঠাম দেহ ও গঠন-সৌকর্য দান করেছেন। মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যায়। বস্তুত আমরা দেখতে পাই যে, শস্য, দুগ্ধ, মসল্লাদি ও ফলমূলের আধিক্যের ফলে খাদ্য প্রাচুর্যের অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা অধিকাংশ স্থলে মেদাশক্তির দুর্বলতা ও দৈহিক গঠনের স্থূলতার দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকে। এমনই অবস্থা সেই সকল বারবার গোত্রের, যারা গম ও মসল্লাদির প্রাচুর্যের মধ্যে রয়েছে। তাদে সাথে জীবন-যাপনে অসচ্ছলতার অধিকারী, শুধুমাত্র যব ও 'জুর্রা' ভক্ষণকারী বারবারদের তুলনা করা যায়। যেমন মাসমুদা বারবার গোত্র, 'গেমারা' ও সোসের অধিবাসীরা। আপনি শেষোক্তদের মধ্যে অধিকতর বুদ্ধি ও দৈহিক সৌন্দর্য দেখতে পাবেন। এরূপ মাগরিবের অধিবাসীদের অবস্থা; তারাও মসল্লাদি ও উত্তম গমের প্রাচুর্যের মধ্যে বিরাজমান। তাদের সাথে আন্দালুসবাসীদের তুলনা করা যায়। সেখানে মাখন ত পাওয়াই যায় না, শুধু জুর্রা খেয়ে তারা জীবন ধারণ করে। অথচ আন্দালুসবাসীদের মধ্যেই আপনি বুদ্ধিমত্তার প্রাচুর্য ও দৈহিক গঠনের সৌকর্য অধিকতর দেখতে পাবেন। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তাদের তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। একই অবস্থা লক্ষ করা যায় মাগরিবের প্রত্যন্ত এলাকাবাসীদের সাথে তার পল্লী ও নগরবাসীদের তুলনার ক্ষেত্রে। পল্লীবাসীরা যদিও তাদের[৯৬] মতই অতিরিক্ত মসল্লা ব্যবহার ও খাদ্যের প্রাচুর্য ভোগ করে তথাপি এটা তারা রন্ধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য বস্তুর সাথে মিশিয়ে মার্জিত করে নেয়। এর ফলে উক্ত খাদ্যের গুরুত্ব কমে যায় ও শক্তি হ্রাস পায়। তাদের সাধারণ খাদ্য হল ভেড়া ও মোরগের মাংস। তারা তাতে স্বাদহীনতার জন্য মসল্লাদির সাথে মাখন বেশি মিশায় না। এ কারণে তাদের খাদ্যদ্রব্যে

---

৯৫. রোজেনথাল এ স্থলে লিখেছেন—এর কারণ পরীক্ষামূলকভাবে নির্দেশ করা যায় যে—কিন্তু আমরা মূলে এর কোন উৎস খুঁজে পাইনি।

৯৬. এখানে 'তাদের' বলতে প্রত্যন্ত এলাকাবাসীদের বুঝতে হবে।

www.amarboi.org

আর্দ্রতা কম থাকে এবং ঐ সকল উপাদান হ্রাস পায়, যা তাদের দেহে অতিরিক্ত মেদ সৃষ্টি করতে পারত। এ কারণে পল্লীবাসীদের দৈহিক গঠন প্রান্তরবাসী কঠোর জীবন-যাপনকারীদের দেহের তুলনায় ক্ষীণ হয়ে থাকে। এভাবে অনাহারে অভ্যস্ত প্রান্তরবাসীদের দেহে গুরু বা লঘু কোন প্রকার অতিরিক্ত মেদ পাওয়া যায় না।

জেনে রাখুন যে, এরূপ প্রাচুর্যের ফলে দেহ ও তার বিভিন্ন অবস্থার উপর যে প্রভাব বিস্তারিত হয়, ধর্ম ও উপাসনার ক্ষেত্রেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এজন্য আমরা দেখতে পাই, কঠোর জীবন-যাপনের অভ্যস্ত প্রান্তরবাসী কিংবা নগরবাসী, যারা অনাহার ও উপাদেয় ভোজ্যাদি গ্রহণ না করায় অভ্যস্ত, তারাই সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য বিলাসীদের অপেক্ষা ধর্মীয় ব্যাপারে উত্তর ও উপসনাদিতে অধিকতর আগ্রহী হয়ে থাকে। বরং পল্লী ও নগরবাসীদের মধ্যে ধার্মিক লোকের সংখ্যা খুবই অল্প। কারণ অতিরিক্ত মাংস, মসল্লা ও উত্তম গম আহারের ফলে তাদের মধ্যে কাঠিন্য ও উদাসীনতা দেখা দেয়। এজন্যই আহার্যের অনটনে অভ্যস্ত প্রান্তরবাসীদের মধ্যেই বিশিষ্ট উপাসক ও সাধকের সংখ্যা বেশি। অনুরূপভাবে একই নগরীর অধিবাসীদের মধ্যেও সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের তারতম্যের ফলে অবস্থার ইতরবিশেষ ঘটে থাকে। এমনিভাবে দেখতে পাই, প্রান্তর, নগর ও পল্লীর প্রাচুর্য বিলাসী ও সমৃদ্ধিতে মগ্ন লোকেরা যখন দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়, ক্ষুধার জ্বালায় অন্যলোক অপেক্ষা অতিদ্রুত আক্রান্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেমন মাগরিবের বারবার ফাস ও মিশরের অধিবাসীদের কথা আমরা শুনে থাকি। প্রান্তর ও মরুভূমির অধিবাসী আরবরা এরূপ নয়। খেজুর উৎপাদক দেশের অধিবাসীরা, যাদের প্রধান খাদ্য খেজুর তারাও নয়। বর্তমানকালে আফ্রিকিয়ার অধিবাসী, যাদের প্রধান খাদ্য যব ও জলপাই তেল, তারাও নয়। আন্দালুসের অধিবাসীরাও নয়, যাদের প্রধান খাদ্য 'জুর্রা' ও জলপাই তেল। এদের সম্মুখে যদি দুর্ভিক্ষ ও আকাল উপস্থিত হয়, তা হলেই এরা তাদের মত বিপন্ন হয়ে পড়ে না। ক্ষুধাজনিত মৃত্যু এদের মধ্যে খুব বেশি ঘটে না; বরং খুবই বিরল।

এর কারণ, আল্লাহ্ই ভাল জানেন এ যে, বিশেষ করে প্রাচুর্যে মগ্ন ও মসল্লাদি ঘৃতে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের পাকস্থলী তার স্বাভাবিক পাচকরস অপেক্ষা অধির রসের অধিকারী হয় এমন কি অনেক সময় তা সীমা ছাড়িয়ে যায়। অতঃপর যখন খাদ্যের অভাবে তার অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে এবং মসল্লাদিও অভ্যস্ত আহার্যের অনটন দেখা দেয়, তখন অতিদ্রুত তাতে শুষ্কতা ও সংকোচন এসে পড়ে। বস্তুত পাকস্থলী অতিশয় দুর্বল একটি অঙ্গ। এর ফলে তা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং অতিদ্রুত তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণকারীদের মৃত্যু তাদের অতীতের তৃপ্তিদায়ক অভ্যাসেরই ফল, নবাগত ক্ষুধার প্রতিক্রিয়া নয়। যারা মসল্লাদি ও মাখনের পরিবর্তে দুগ্ধ পানে অভ্যস্ত, তাদের পাকস্থলীর জারকরস বৃদ্ধি না পেয়ে স্বাভাবিক অবস্থাতেই বিরাজ করে। তা স্বাভাবিক যে কোন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং খাদ্যের পরিবর্তনে তাদের পাকস্থলীতে শুষ্কতা বা অসহিষ্ণুতা দেখা দেয় না। এজন্য তারা প্রাচুর্যবিলাসী ও খাদ্যে অধিক মসল্লা গ্রহণকারীদের অপেক্ষা খুব কম বিপন্ন হয়।

এ সব কিছুর মূল উৎস হল এটা জেনে রাখা যে, খাদ্যদ্রব্য, তার গ্রহণ ও বর্জন সকলই অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি কোন একটি বিশেষ খাদ্য গ্রহণ করে, তা

www.amarboi.org

তার সহ্য হয় এবং তাতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠে; তার পক্ষে সেই অভ্যাস ত্যাগ বা পরিবর্তন করা রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়—যদি না উক্ত খাদ্য, খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়। যেমন বিষ, ক্ষার পদার্থ[৯৭] ও অন্যান্য উত্তেজক দ্রব্য। সুতরাং যার মধ্যে খাদ্যগুণ ও সহজপাচ্যতা পাওয়া যায়, তাই খাদ্য হিসাবে স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়। মানুষ যখন গমের পরিবর্তে দুধ ও সব্জী গ্রহণে উদ্যোগী হয়ে ক্রমশ তাকে অভ্যাসে পরিণত করে, তখন তাই তার আহার্য এবং তাই তাকে গম ও অন্য শস্যের প্রয়োজনীতা থেকে নিঃসন্দেহে মুক্ত করে দেয়। এরূপ অবস্থা হয় যারা ক্ষুধায় ধৈর্য ও আহার্যে অনাসক্তির দ্বারা অভ্যস্ত হয়ে উঠে, তাদেরও; যেমন যোগসাধকদের কথা শোনা যায়। আমরা তাদের ব্যাপারে এমন সব অদ্ভুত কাহিনী শুনে থাকি, অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তার সত্যতা অস্বীকার করা বিচিত্র নয়।

এ সমুদয়ের একমাত্র কারণ অভ্যাস। মানুষের জৈবিক শক্তি যখন কোন বস্তুকে প্রিয় হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তাই তার স্বভাব ও প্রকৃতির অন্তর্গত হয়ে পড়ে। বস্তুত মানব প্রকৃতি একান্তই বহুরূপী। সুতরাং সে যখন ক্রমান্বয়ে সাধনার দ্বারা অনাহারে অভ্যস্থ হয়ে উঠে তখন তাই তার অভ্যাস ও প্রকৃতি হয়ে দাঁড়ায়। চিকিৎসকরা যে ধারণা পোষণ করেন যে, ক্ষুধা মৃত্যুর কারণ ঘটায়, তা একমাত্র হঠাৎ জৈবিক শক্তির উপর অনাহার চাপিয়ে দিলে কিংবা আহার্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলে সম্ভব হয়। তখনই পাকস্থলী স্বাভাবিক কার্যকারিতা হারিয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুকে ডেকে আনে। কিন্তু যদি উক্ত ব্যাপারটি ধীরে ধীরে সাধনার দ্বারা অল্প অল্প করে খাদ্য কমিয়ে করা হয়, যেমন সূফি সাধকরা করে থাকেন; তা হলে আর মৃত্যুর ভয় থাকে না। এ পর্যায়ক্রমিক অভ্যাসটি খুবই প্রয়োজনীয়, এমন কি এ প্রকার সাধনা থেকে ফিরতে হলেও এটা করতে হবে। তা না করে যদি হঠাৎ পূর্বের আহারে ফিরে আসে, তা হলেও মৃত্যুর ভয় থাকে। এজন্য পূর্বের আহারে ফিরতে হলেও সাধনার মতই পর্যায়ক্রমে ফেরা দরকার। আমরা এমন ব্যক্তিকেও দেখেছি, যিনি একাদিক্রমে চল্লিশ দিন ও তদপেক্ষা বেশিকাল অনাহারে থেকেছেন। আমাদের উস্তাদগণ সুলতান আবুল হাসানের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে 'আলখাজরা' (আলজেসিরাস) দ্বীপ ও 'রান্দা' থেকে আগত দুটি মেয়েলোককে হাজির করা হয়, যারা দুই বছর ধরে সম্পূর্ণ আহার ত্যাগ করে বেঁচে আছে। তাদের এ বিষয়টি প্রচারিত হলে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় এবং উক্ত বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হয়। তারা এভাবে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন-যাপন করে গেছে। আমাদের সমকালীন অনেককে একমাত্র ছাগ দুগ্ধের উপর নির্ভর করতে দেখেছি। তারা দিনের কোন এক সময়ে অথবা ইফতারের সময় তা দোহন করে পান করতেন এবং এতেই তাদের আহার্যের কাজ চলত। তারা এভাবে পনের বছর পর্যন্ত জীবন কাটিয়েছেন এবং অনেকে আরও বেশি কাল। এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, অনাহার অতিরিক্ত আহার অপেক্ষা সর্বদিক থেকেই দেহের জন্য অধিকতর উপযোগী; যদি কোন ব্যক্তি তার অভ্যাস বা খাদ্য কমাতে সমর্থ

৯৭. জোলাপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মূলে 'ইয়াতু' আছে।

www.amarboi.org

হয়। কারণ এর ফলে দেহের সুস্থতা ও বুদ্ধিবৃত্তির সুষ্ঠুতার উপর অনুকূল প্রভাব পড়ে; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের দ্বারা দেহের উপর যে বিচিত্র প্রভাব পড়ে, তদ্বারাও এটা বিবেচনা করা যায়। আমরা দেখেছি যে, যারা বিরাটাকার শক্তিমান পশুর মাংস আহার করে থাকে, তাদের বংশাবলিও তেমনি হয়ে উঠে। নগরবাসী ও প্রান্তরবাসীদের মধ্যে তুলনা করলেও এটা দেখতে পাওয়া যায়। এমনিভাবে যারা উটের মাংস ও দুধ আহার করে, তাদের চরিত্রেও ধৈর্য, স্থৈর্য ও উটের ন্যায় ভার বহনের ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। তাদের পাকস্থলীও উটের পাকস্থলীর ন্যায় সুস্থতা অসুস্থতার অভ্যাস গড়ে তোলে। ফলে দুর্বলতা ও অক্ষমতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। অন্যদের ন্যায় খাদ্যের অপকারিতা তাদের পাকস্থলীকে দুর্বল করে না। তারা কোন প্রকার মিশ্রণ ছাড়াই জোলাপের জন্য ক্ষার জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করতে পারে। যেমন অপক্ব 'হাজ্জাল', 'দেরিয়াস' ও 'কার্বিউন'[৯৮] এগুলোতে তাদের পাকস্থলীর কোন ক্ষতি হয় না। এগুলো যদি কোন নগরবাসী, যার পাকস্থলী সুপাচ্য আহার্য গ্রহণের ফলে কোমল হয়ে গেছে, গ্রহণ করত, তা হলে চক্ষের পলকে তার মৃত্যু ঘটত। কারণ এসবগুলোতে বিষাক্ত পদার্থ বিদ্যমান।

দেহের উপর খাদ্যদ্রব্যের প্রভাব সম্পর্কে আরও একটি উদাহরণ, যা কৃষিবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা লক্ষ করেছেন, তা এ যে, যদি কোন মুরগিকে উটের নাদ মিশ্রিত রাঁধা শস্য খাওয়ানো যায় এবং উক্ত মুরগির ডিম তাপ দিয়ে বাচ্চা ফুটানো হয়, তা হলে বাচ্চাগুলো যথাসম্ভব বড় হবে। অনেকে মুরগিকে খাওয়ানো ও শস্য রাঁধার ঝামেলা না পোহায়ে যদি তাপ দেয় ডিমের উপর কিছু নাদ ছড়িয়ে রাখে, তা হলেও বাচ্চা বড় আকারের হয়ে থাকে। এ প্রকার আরও উদাহরণ আছে। এ সবের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দেহের উপর খাদ্যদ্রব্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সুতরাং ক্ষুধাও যে দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা দুটি পরস্পর বিরোধী সত্তা প্রভাব বিস্তার করা ও না করার ক্ষেত্রে একই পন্থা অবলম্বন করে থাকে। কাজেই অনাহার যেমন দূষিত রক্ত ও দেহমনের ক্ষতিকর জৈবিক রস থেকে দেহকে পরিষ্কার রাখে, তেমনি আহার্যও দেহের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আল্লাহ্ই সমগ্র জ্ঞানের আধার।

৯৮. বোখারী দ্র:।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ প্রস্তাবনা

[স্বাভাবিকভাবে অথবা সাধনার দ্বারা অদৃশ্য জগতকে উপলব্ধিকারী মানুষের প্রকারভেদ এবং তৎপূর্বে আলোচ্য প্রত্যাদেশ ও স্বপ্নদর্শন সম্পর্কে]

জেনে রাখুন যে, পবিত্র আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে অনেককে তাঁর বাণী বহনের মর্যাদা দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। তাঁকে জানবার জন্যই তিনি তাঁদেরকে জীবন দিয়েছেন। তাঁর ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে তাঁদেরকে গড়ে তুলেছেন। তাঁরা মানব জাতির কল্যাণ কিসে, তা জানেন; তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে উৎসাহিত করেন এবং তাঁদেরকে দোজখের অগ্নি থেকে রক্ষা করে থাকেন। এভাবে তাঁরা মানুষকে মুক্তির পথ দেখান। তিনি তাদেরকে যা অর্পণ করেছেন, তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান বিদ্যমান এবং তাঁদের ভাষার মধ্যদিয়ে তিনি অস্বাভাবিক ঘটনাবলি ও এমন এক অদৃশ্য জগতের সংবাদ প্রদান করেছেন, তাঁদের মধ্যস্থতা ব্যতীত মানুষের পক্ষে তৎসম্পর্কীয় জ্ঞানলাভ করার জন্য অন্য কোন পথ নেই। তারা কেবলমাত্র আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁদেরকে প্রদত্ত শিক্ষার মাধ্যমেই তা জানতে পারে। হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, বস্তুত আল্লাহ্ আমাকে যা জানিয়েছেন, তদ্ব্যতীত আমি আর কিছুই জানি না। জেনে রাখুন যে, এ ব্যাপারে তাঁদের প্রদত্ত তথ্যাদি স্বাভাবিকভাবে ও প্রয়োজন অনুসারে সত্য হতে বাধ্য। নবুয়তের তাৎপর্য আলোচনার সময় এটা আপনার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মানবজাতির মধ্যে এ শ্রেণীর লোকের নিদর্শন এ যে, তাঁদের উপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হবার সময় তাঁরা উপস্থিত লোকজনের মধ্যেই এক অদৃশ্য ভাবে বিভোর হয়ে পড়েন এবং তাঁদের গলায় এক ধরনের শব্দ হতে থাকে। দৃশ্যত মনে হবে তাঁরা যেন সংজ্ঞাহীন বা মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁর কোনটাই নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁদের যোগ্য উপলব্ধির মাধ্যমে আত্মিক জগতে মগ্ন হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এ উপলব্ধি সাধারণ মানুষের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। অতঃপর তাঁরা সাধারণ মানুষের উপলব্ধির জগতে ফিরে আসেন। হয় বোধগম্য কোন বাণীর রেশ শুনতে পান অথবা কোন ব্যক্তির আকারে কেউ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আনীত বাণী তাঁদের নিকট উচ্চারণ করে। এর পর তাঁদের পূর্বাবস্থা কেটে যায় এবং তাঁদের উপর অবতীর্ণ বাণী তাঁরা স্মরণ করতে পারেন। হজরত মুহম্মদ (সঃ)-কে প্রত্যাদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, কখনও এটা আমার নিকট আসে ঘণ্টাধ্বনির মত এবং এটাই অতিশয় কষ্টদায়ক। অতঃপর তা সরে যায় এবং আমি তার সমুদয় বক্তব্য স্মরণ করতে পারি। কখনও ফেরেশতা মানুষের আকারে এসে আমার নিকট উপস্থিত হয় ও কথা বলে এবং

www.amarboi.org

আমি তার বক্তব্য মনে রাখি।[৯৯] এ অবস্থায় তাঁর উপর যে চাপের সৃষ্টি হয় ও কষ্ট দেখা দেয়, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। একটি হাদিসে আছে, তিনি প্রত্যাদেশ অবতরণের যাতনা সম্পর্কে দুশ্চিন্তা পোষণ করতেন। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, অত্যন্ত শীতের দিনেও তাঁর উপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলে তা সমাপ্তির পর তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম পড়তে থাকত।[১০০] আল্লাহ্ বলেন, আমরা তোমার উপর গুরুভার বাণী অর্পণ করব।[১০১] প্রত্যাদেশ অবতরণকালীন এ প্রকার অবস্থার দরুন পৌত্তলিকরা নবীগণকে পাগল বলে দোষারোপ করত এবং তারা বলত, লোকটির কোন সহচর বা জিন অনুগামী আছে। তারা এ সকল অবস্থার বাহ্য দিকটি দেখেই এরূপ বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছিল। বস্তুত 'আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই।'[১০২]

নবীদের নিদর্শনাবলির মধ্যে এটাও যে প্রত্যাদেশ আগমনের পূর্বেই তাঁদের মধ্যে সৎচরিত্র, বুদ্ধিমত্তা এবং সর্বপ্রকার দূষণীয় কলুষ থেকে দূরে থাকবার অভ্যাস দেখা যাবে। এটাই পবিত্রতার অর্থ। দূষণীয় কাজ ও ঘৃণ্য ব্যাপার থেকে পবিত্র থাকাই যেন তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি। যেন এসকল কাজ তাঁর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। বিশুদ্ধ হাদিসে আছে, বাল্যকালে মুহম্মদ (সঃ) তাঁর চাচা আব্বাসের সাথে কাবাঘর নির্মাণের জন্য স্বীয় পরিহিত জামায় পাথর বহন করেছিলেন। এর ফলে তাঁর গুপ্তস্থান অনাবৃত হয়ে যায় এবং তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তাঁর গুপ্তস্থান আবৃত না করা পর্যন্ত তাঁর মূর্ছা ভঙ্গ হয়নি। তাঁকে এক বিবাহ মজলিসে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেখানে প্রচুর আমোদ-প্রমোদ ছিল। তিনি এমন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন যে, সূর্য না উঠা পর্যন্ত তাঁর ঘুম ভাঙ্গল না। তিনি উপস্থিত লোকদের কোন অবস্থাই জানতে পারলেন না। বরং বলা যায়, আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁকে এ সকল বিষয় থেকে মুক্ত রেখেছেন। এমন কি তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি গুণেই তিনি অপছন্দনীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকতেন। হজরত মুহম্মদ (সঃ) কখনও পিঁয়াজ-রসুন খেতেন না। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি এমন একজনের সাথে সংগোপনে কথা বলি, যার সাথে তোমরা বল না।[১০৩]

পাঠক, লক্ষ করুন, হজরত মুহম্মদ (সঃ) যখন ওহী আসার প্রথম অভিজ্ঞতা হজরত খাদিজা (রাঃ)-র নিকট বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরীক্ষা করবার জন্যই বলেছিলেন, আমাকে আপনার কাপড়ের নিচে স্থান দিন। নবী তা করবার ফলে তা দূরীভূত হল। তখন খাদিজা (রাঃ) বললেন, তা ফেরেশতাই ছিল—শয়তান নয়। অর্থাৎ তা নারীর নিকটে আসে না। তিনি নবীকে আরও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ওহী অবতরণের সময় তিনি কোন্ রঙের কাপর পড়তে ভালবাসেন। তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, সাদা ও সবুজ। এটা শুনে খাদিজা (রাঃ) বললেন, তা ফেরেশতাই। অর্থাৎ সাদা ও সবুজ রং কল্যাণ ও ফেরেশতার নিদর্শন এবং কাল অকল্যাণ ও শয়তানের। এ প্রকার আরও উদাহরণ বিদ্যমান।

---

৯৯. বোখারী দ্র:।
১০০. বোখারী দ্র:। ১০১, কোরান ৭৩, ৫।
১০১. কোরান ১৩, ৩৩; ৩৯, ২৩, ৩৬; ৪০, ৩৩।
১০২. বোখারী দ্র:।
১০৩. বোখারী দ্র:।

www.amarboi.org

তাঁদের নিদর্শনাবলির মধ্যে ধর্ম ও উপাসনা—প্রার্থনা, দান ও পবিত্রতার দিকে আহ্বান করাকে ধরা হয়। হজরত খাদিজা (রাঃ) হুজুর মুহম্মদ (সঃ)-এর সত্যতা সম্পর্কে এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেছিলেন। এরূপ হজরত আবু বকরও (রাঃ)। তাঁরা এ ব্যাপারে তাঁর অবস্থা ও চরিত্রের বাইরে কোন প্রমাণের মুখাপেক্ষী হননি। বিশুদ্ধ হাদিসে আছে, হিরাক্লিয়াস যখন ইসলাম গ্রহণের আহ্বান সংবলিত নবী (সঃ)-এর পত্র পেলেন, তখন তিনি তাঁর এলাকায় অবস্থানরত কোরায়েশ বংশীয়দের ডেকে পাঠালেন, যাতে নবী সম্পর্কে সংবাদ নিতে পরেন। সেখানে আবু সুফিয়ানও ছিলেন। হিরাক্লিয়াস যে সব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল, তোমাদেরকে কী করতে বলেন? আবু সুফিয়ান উত্তরে বললেন, নামাজ, জাকাত, আত্মীয়তা ও পবিত্রতা পালন করতে আদেশ দেন। তিনি প্রশ্নের উত্তরে আরও অনেক কিছু বলেছিলেন। পরে হিরাক্লিয়াস বললেন, তুমি যা বলছ, তা যদি সত্য হয়, তা হলে তিনি আমার এ পদদ্বয়ের নিচের ভূমি পর্যন্ত অধিকার করে নিবেন।[১০৪] যে পবিত্রতার দিকে হিরাক্লিয়াস ইঙ্গিত করেছিলেন, তাই পাপ শূন্যতা। পাঠক লক্ষ করুন, কী ভাবে হিরাক্লিয়াস এবং ধর্ম ও উপাসনার দিকে তাঁর আহ্বান থেকে তাঁর নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন! তিনি কোন অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন অনুভব করেননি। সুতরাং এর দ্বারা এগুলো যে নুবয়তের নিদর্শন, তা বোঝা যায়।

তাঁদের নিদর্শনাবলির মধ্যে এটাও একটি যে, তাঁরা তাঁদের জাতির মধ্যে মর্যাদার অধিকারী হন। বিশুদ্ধ হাদিসে আছে, আল্লাহ্ প্রত্যেক জাতির গণ্যমান্য লোকদের মধ্য থেকে নবী প্রেরণ করেছেন। অন্য একটি বর্ণনায়—ধনসম্পদের অধিকারীদের মধ্য থেকে। এটা বিশুদ্ধ দুটি হাদিস সংকলনের মধ্যে 'হাকেম'[১০৫] কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে। যেমন বিশুদ্ধ হাদিসের অন্তর্গত আবু সুফিয়ানের প্রতি হিরাক্লিয়াসের প্রশ্ন, তোমাদের মধ্যে তাঁর অবস্থা কী? আবু সুফিয়ান উত্তর দিলেন, তিনি আমাদের মধ্যে মর্যাদাশালী। হিরাক্লিয়াস এর উত্তরে মন্তব্য করলেন, নবীগণ জাতির মর্যাদাবান ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই প্রেরিত হয়ে থাকেন। এর অর্থ তাঁর জন্য অনুসারী ও মর্যাদা থাকবে, যা তাঁকে ধর্মবিরোধীদের অপকার থেকে রক্ষা করবে। যাতে তাঁর দ্বারা প্রেরিতত্বের কাজ সম্পন্ন হয় এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্য অনুসারে ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায় গঠনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ হতে পারে।

তাঁদের নিদর্শনাবলির মধ্যে তাঁদের সত্যতা নির্দেশকারী অস্বাভাবিক ঘটনাবলিও রয়েছে। এ সকল কাজ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে বলেই এদেরকে অলৌকিক বলা হয়েছে। এটা মানুষের কার্যক্ষমতার পরিধির মধ্যে নয় এবং তাদের আয়ত্তের বাইরেই তা সংঘটিত হয়ে থাকে। এ সকল ঘটনা সংঘটন ও তা দ্বারা নবীদের সত্যতা প্রমাণের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে নানাবিধ মতানৈক্য বিদ্যমান। কালামশাস্ত্রবিদগণ[১০৬]

---

১০৪. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আলহাকেম আননিসাবুরী; জীবনকাল ৩২১-৪০৫ (৯৩৩-১০১৪ খ্রি:) হি:।

১০৫. বোখারী দ্রষ্টব্য।

১০৬. 'কালাম' অর্থে ইসলামী ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্গত সৃষ্টিতত্ত্ব ও অদৃশ্য বিষয়াদির তাত্ত্বিক আলোচনা।

www.amarboi.org

'স্বেচ্ছামূলক কর্তৃত্বে'র ভিত্তিতে বলে থাকেন যে, এগুলো আল্লাহ্‌র মহিমা দ্বারা সংঘটিত হয়, নবীর কর্মের দ্বারা নয়। মুতাজিলাদের নিকট যদিও যাবতীয় ক্রিয়া বান্দার নিজস্ব, তবু অলৌকিক কার্যাদি তাদের ক্রিয়াকলাপের সমগোত্রীয় নয়। সকল কালামশাস্ত্রবিদের নিকট নবী একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারাই তাঁর সত্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম এবং তাও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়। তিনি এর দ্বারা কোন বিষয়কে সংঘটিতব্য বলে তাঁর দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন। যখন সেই বিষয়টি সংঘটিত হয়, তখন তাই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রকাশ্য ঘোষণার মত হয়ে দাঁড়ায় যে, নবী সত্যবাদী। এ সময়ে তার দ্বারা সত্যতা প্রমাণই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। বস্তুত অলৌকিক বলতে সর্বপ্রকার অস্বাভাবিক ঘটনা ও ভবিষ্যদ্বাণীকে বুঝিয়ে থাকে। এ জন্যই ভবিষ্যদ্বাণী তারই একটি অংশ। কালামশাস্ত্রবিদগণ যে তাকে 'স্বগুণে বিভূষিত' বলে থাকেন, তার অর্থ একই। কারণ তাকেই তাঁরা সত্তার অন্তর্গত বলে মনে করেন।

ভবিষ্যদ্বাণী অলৌকিকত্ব এবং বিভূতি ও ইন্দ্রজালের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকে। কারণ শেষোক্ত দুটিতে সত্যতা প্রমাণের কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণী কোন ধারাবাহিক কর্ম নয়, তা হঠাৎ সংঘটিত হয়ে থাকে। যাদের নিকট বিভূতির সম্ভাব্যতা স্বীকৃত যদি তাদের মাঝে কেউ বিভূতির সাথে ভবিষ্যদ্বাণীকে সংযুক্ত করেন এবং তা বাস্তবায়িত হয়, তা হলে তা শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাধুতাই প্রমাণ করবে আর সাধু ব্যক্তি মাত্রেই নবী নন। এ জন্যই উস্তাদ আবু ইসহাক[১০৭] ও অন্যান্য সুধী বিভূতি হিসাবে অস্বাভাবিক ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন। কারণ তাঁদের মতে যে কোন সাধু ব্যক্তির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলে তাতে নবুয়ত দাবির প্রতারণা লুক্কায়িত থাকতে পারে। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখিয়েছি যে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ ওলীর ভবিষ্যদ্বাণী ও নবীর ভবিষ্যদ্বাণী একই উদ্দেশ্যে ও বিষয়ে নিয়োজিত হয় না। কাজেই বিভ্রান্তির কোন কারণ নেই। তদুপরি উস্তাদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়। অনেক সময় এটা দ্বারা ওলীদের পক্ষে, নবীদের জন্য নির্ধারিত অস্বাভাবিক ঘটনা সম্ভব নয় বলে বুঝায়। কারণ তাদের উভয় সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বিশেষ অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ বিদ্যমান। কিন্তু মুতাজিলাদের নিকট বিভূতি অস্বীকৃতির কারণ ভিন্ন। তাঁদের মতে এটা কোন অবস্থাতেই মানুষের কর্ম নয়। কেননা মানুষের কর্ম স্বভাববদ্ধ। অতএব উভয় বক্তব্যের উদ্দেশ্য একই।

কোন মিথ্যাবাদীর দ্বারা অলৌকিকত্বের প্রতারণা সম্পাদন অসম্ভব। 'আশআরী[১০৮]গণের নিকট এর কারণ এ যে অলৌকিকত্বের মূল লক্ষ্য হল সত্যতা নির্ধারণ ও পথ প্রদর্শন। যদি এর বিপরীত কিছু হয়, তা হলে প্রমাণ সন্দেহে, পথ প্রদর্শন পথভ্রষ্টতায় এবং সত্যতা মিথ্যাচারে পরিণত হবে। এর তাৎপর্য বদলে গিয়ে এর যথার্থ লক্ষ্যই ব্যাহত হয়ে পড়বে। অন্যদিকে এরূপ অসম্ভব সম্ভব হবার কথা হয়ত ধারণা করা যায়; কিন্তু বাস্তবে তা কখনও হয় না। এ ক্ষেত্রে মুতাজিলাদের মত হল এ

১০৭. ইব্রাহিম ইবনে মুহম্মদ আল-ইসফারাইনী; মৃত্যু ৪১৮ (১০২৭ খ্রি:) হি:।
১০৮. কালামশাস্ত্রবিদদের একটি শাখা, এরা 'স্বেচ্ছামূলক কর্তৃত্বে' বিশ্বাসী। বান্দা ইচ্ছা করে আল্লাহ তা পূরণ করেন।

www.amarboi.org

যে, যেহেতু প্রমাণ সন্দেহে ও পথপ্রদর্শন পথভ্রষ্টতায় পরিবর্তিত হওয়া গর্হিত কাজ, সুতরাং তা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে হওয়া সম্ভব নয়।

দার্শনিকদের নিকট অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ নবীর নিজেরই, যদিও তার সংঘটন তাঁর ক্ষমতার বাইরে হয়ে থাকে। সত্তাগত সম্ভাব্যতার দিক থেকেই তাঁরা এ মত পোষণ করেন। ঘটনাবলি পরস্পর কার্যকারণ সাপেক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাতে আগত পরিবর্তমান শর্তাবলি সর্বদাই সর্বপ্রকার ক্রিয়াকে শেষ পর্যায়ে অবশ্যম্ভাবী সত্তাগত কর্তৃত্বের সাথে যুক্ত করে, স্বেচ্ছামূলক কর্তৃত্বের সাথে নয়। তাঁদের নিকট নবুয়তের অস্তিত্বে কতিপয় সত্তাগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তন্মধ্যে এরূপ অস্বাভাবিক কার্যাবলি সংঘটিত হওয়া এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের তৎপ্রতি অনুগত হওয়া। তাঁদের নিকট নবীর পক্ষে সৃষ্ট জগতের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ক্ষমতার বলেই তিনি তাতে বিশেষ দৃষ্টিদান ও তাকে কেন্দ্রীভূতকরণের শক্তি অর্জন করে থাকেন। তাঁদের মতে নবী ভবিষ্যদ্বাণী প্রয়োগ করেন বা না করেন, অস্বাভাবিক ঘটনা তাঁর জন্য সংঘটিত হয়েই থাকে। তা তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। কারণ নবী প্রকৃতির উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তারের দ্বারা নবুয়তের সত্তাগত বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করে তোলেন। কাজেই তা প্রকাশ্য ঘোষণার আকারে তাঁর সত্যতা প্রমাণে উপস্থিত না হলেও কিছু যায়-আসে না। এ জন্যই দার্শনিকের নিকট কালামশাস্ত্রবিদদের ন্যায় অলৌকিকত্বের প্রমাণ অকাট্য নয়। ভবিষ্যদ্বাণীও তাদের নিকট অলৌকিকত্বের অংশ নয় এবং তার ও বিভূতি ইন্দ্রজাল প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্যও যথার্থ নয়। বরং তাঁরা মনে করেন যে, নবী যেহেতু সত্তাগতভাবে কাজ করেন ও মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকেন; সুতরাং তাঁর কার্যের দ্বারা মন্দের উৎকর্ষ সাধন হতে পারে না। কিন্তু ইন্দ্রজাল এর বিপরীত, ঐন্দ্রজালিকের সমস্ত কর্মই মন্দ অথবা মন্দের উদ্দেশ্যে পরিচালিত। তাঁদের মতে বিভূতির সাথে নবুয়তের পার্থক্য এ যে, নবীর অস্বাভাবিক ঘটনাবলি নির্ধারিত, যেমন আকাশে আরোহণ নিরেট দেহাদিতে অনুপ্রবেশ, মৃতের জীবন দান, ফেরেশতাদের সাথে কথোপকথন বায়ুতে ভাসমান হওয়া। ওলীদের কাজ ভিন্ন প্রকার, যেমন অল্পকে অধিক করা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কথা বলা এবং এ ধরনের এমন অনেক কাজ, যাতে নবীর সমান প্রকৃতিকে বাধ্য করার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ নেই। নবী তাঁর সমুদয় অস্বাভাবিক ঘটনাই সংঘটিত করতে পারেন। কিন্তু ওলীর পক্ষে নবীর জন্য নির্ধারিত কোন ঘটনা ঘটান সম্ভব নয়। সুফীদের তত্ত্বগ্রন্থাদিতে এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ তথ্যাদি রয়েছে।

এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আরও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, উন্নত ও সুস্পষ্ট অলৌকিক হল আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ কোরান শরীফ। অধিকাংশ অস্বাভাবিক ঘটনাই ওহী অপেক্ষা ব্যতিক্রমধর্মী হয়ে থাকে। কারণ নবী ওহীই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে লাভ করেন এবং অলৌকিকত্ব এর সত্যতা প্রমাণের জন্য এসে উপস্থিত হয়। কোরান এ ওহীই সমষ্টি এক দাবি এবং নিজেই এক অস্বাভাবিক অলৌকিক বিষয়। তার জন্য কোন ব্যতিক্রমধর্মী, কোন ওহীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত অলৌকিক প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সে নিজেই নিজের সাক্ষী। প্রমাণ ও

www.amarboi.org

প্রামাণ্য উভয়ের একত্র হওয়ার ফলে তার আবেদন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর নিম্নলিখিত বাণীর অর্থও এটাই। তিনি বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক নবীকেই নিদর্শনাবলি দিয়েছেন, যদ্বারা মানুষ তাদেরকে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু আমি শুধু ওহীই লাভ করেছি। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা তাঁদের অপেক্ষা অনেক বেশি হবে।[১০৯] এর দ্বারা তিনি এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন যে, যখন অলৌকিকত্ব সুস্পষ্টতা ও আবেদন সৃষ্টির ক্ষেত্রে ওহীর ন্যায় প্রকাশ্য বিষয়ের উপর স্থাপিত হয়, তখন তা অধিকতর সত্য বলে প্রতীতি জন্মে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে সত্য স্বীকারকারী বিশ্বাসী তথা অনুসারী ও সম্প্রদায় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।[১১০]

---

১০৯. বোখারী দ্র:।

১১০. এর পর রোজেনথাল কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন। এটা তিনি 'রাগিবপাশা' নামাঙ্কিত একটি পাণ্ডুলিপিতে পেয়েছেন। আমরা আমাদের ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিগুলোর সংস্করণে এটা পাইনি। তথাপি পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবারণার্থে উক্ত অনুচ্ছেদগুলোর অনুবাদ নিম্নে সন্নিবেশিত করলাম।

আল্লাহ্র জন্যই সমস্ত প্রশংসা, তিনিই উত্তম জ্ঞাতা।

এ সকল বর্ণনা হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সকল অবতীর্ণ গ্রন্থের মধ্যে কোরানই একমাত্র গ্রন্থ যা আমাদের নবী ভাষা ও বাক্যাবলিসহ সরাসরি প্রাপ্ত হয়েছেন এং ঐ অবস্থাতেই তা বিদ্যমান। এদিক থেকে এটা তৌরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। নবীগণ উক্ত গ্রন্থাদিকে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির সময় ভাবের আকারে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর মানবিক উপলব্ধির জগতে প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা উক্ত ভাবকে নিজেদের সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থে অননুকরণীয়তার ঐশ্বর্য নেই। এটা শুধু কোরানেই আছে। অন্যান্য নবী যেভাবে প্রত্যাদেশ লাভ করেছেন, আমাদের নবীও অনুরূপভাবে বহু ভাববস্তু লাভ করেছেন, যা পরে তিনি আল্লাহ্র নিকট হতে প্রাপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন এবং হাদিসের আকারে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু কোরান তিনি সরাসরি তার বাক্‌বিন্যাসসহ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর এই প্রাপ্তির প্রমাণ রয়েছে আল্লাহ্র বাণীতে। তিনি বলেছেন, তা দ্রুত আয়ত্ত করবার জন্য তোমার জিহ্বাকে অতিরিক্ত সঞ্চালন করো না; কেননা আমরাই একে একত্র করব ও পাঠ করব।

এই শ্লোক অবতীর্ণ হবার উপলক্ষ এই যে, হজরত মুহাম্মদ (সঃ) আয়াতগুলো দ্রুত আয়ত্ত করবার জন্য চেষ্টা করছিলেন, যাতে তা যে ধরনের বর্ণনাসহ অবতীর্ণ হয়েছিল, তাই তাঁর স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারেন। কারণ তাঁর ভয় হচ্ছিল যে, তিনি এটা ভুলে যাবেন। আল্লাহ্ তাঁকে অভয় দিয়ে তা স্বয়ং সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, অতঃপর তা আমরা পুনরায় বর্ণনা করব এবং তা সংরক্ষণ করব। এ সংরক্ষণের ব্যাপারটি কোরানের একটি বৈশিষ্ট্য। এর অর্থ, সাধারণ মানুষ যা মনে করে তা হতে অনেক দূরে অবস্থিত।

অনেক আয়াতেই এটা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ ভাষাসহ সরাসরি এ কোরাণ অবতীর্ণ করেছেন। এর প্রতিটি অধ্যায়ই অননুকরণীয়। আমাদের নবী কোরাণ অপেক্ষা বড় অন্য কোন অলৌকিক বিষয় লাভ করেননি এবং বস্তুত এর ফলে তিনি সমগ্র আরবকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে পেরেছিলেন।

'তুমি যদি সমগ্র জগতের ধন-সম্পদ ব্যয় করতে, তথাপি তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে পারতে না, বরং আল্লাহ্ই তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছেন।'

এটা জেনে রাখা দরকার, এটা ভেবে দেখা প্রয়োজন। কেবল তা হলেই এটা আমাদের বর্ণনা অনুসারে সত্য বলে মনে হবে। এ সঙ্গে যে-কোন লোকের পক্ষে এটাও ভেবে দেখা দরকার যে, আমাদের নবী হজরত মুহম্মদ (সঃ) কোন্ গুণে অন্য সকল নবী হতে শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

www.amarboi.org

নবুয়তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

[আমরা এখন বিশেষজ্ঞদের ধারা অনুসরণ করে নবুয়তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব। অতঃপর ইন্দ্রজাল ও স্বপ্নদর্শনের তাৎপর্য এবং এর পর তত্ত্বজ্ঞানীদের অবস্থা ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের বিভিন্ন মাধ্যম বর্ণনা করব]

জেনে রাখুন, আল্লাহ্ আমাদিগকে এবং আপনাকেও সৎপথ প্রদর্শন করুন—আমরা এ পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থ সমগ্র সৃষ্টিকে একটি পর্যায়ক্রমিক ধারায় ও সুনিবদ্ধ গ্রন্থনায় দেখতে পাই। এর কার্যকারণ পরস্পর সুগ্রথিত, এর সৃজনশীলতা পরস্পর সুবিন্যস্ত। এর বস্তু নিয়ে একে অপরের মধ্যে পরিবর্তিত হচ্ছে—এর এ রহস্যলীলার বুঝি অন্ত নেই এবং এর গন্তব্যেরও বুঝি শেষ নেই! এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ নিয়েই আরম্ভ করছে এবং সর্বপ্রথম দৃশ্যমান উপাদান; তা কীভাবেই না ক্ষিতি থেকে অপে, অপ্ থেকে মরুতে, মরুৎ থেকে তেজে পরস্পর সন্নিবদ্ধ হয়ে ঊর্ধ্বে উত্থিত হচ্ছে। এদের প্রতিটি ঊর্ধ্বে বা অধে তার সন্নিহিত পরবর্তীটির মধ্যে পরিবর্তিত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে এবং কখনও বা পরিবর্তিতও হয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে উত্থীয়মানটি পূর্ববর্তীটি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর হয়ে ব্যোম পর্যন্ত পৌঁছেছে। তা সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম এবং স্তর পরম্পরায় সন্নিবদ্ধ হয়ে এমন এক অবস্থায় বিরাজ করছে, ইন্দ্রিয়ের পক্ষে যার গতি ব্যতীত অন্যকিছু উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ গতির সাহায্যেই বহুলোক তার পরিধি ও অবস্থান অবগত হয়ে থাকে। এমনকি তার পরবর্তী সত্তাসমূহের অস্তিত্ব ও উক্ত গতির উপর তাদের প্রভাব দ্বারা জানতে পারা যায়।

অতঃপর সৃষ্টি জগতের দিকে লক্ষ করুন, কীভাবে খনিজ পদার্থ থেকে আরম্ভ করে এক অপূর্ব ধারাবাহিকতায় উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যন্ত সুবিন্যস্ত রয়েছে। খনিজ পদার্থের শেষ দিক উদ্ভিদের প্রথম দিকের সাথে সংযুক্ত, যেমন ঔষধি ও বীজহীন গুল্ম; উদ্ভিদের শেষ দিক, যেমন খেজুর গাছ ও আঙুর লতা; প্রাণীর প্রথম দিকের সাথে সংযুক্ত, যেমন শামুক ও ঝিনুক—এদের কেবল স্পর্শশক্তিই বিদ্যমান। এ সৃষ্টি জগতের পরস্পর সংযুক্তির অর্থ হল তাদের যে কোন একটির শেষ দিক পরবর্তীটির প্রথম দিকে পরিবর্তিত হবার জন্য অদ্ভুতভাবে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। অতঃপর, প্রাণিজগত বিস্তৃতিলাভ করে বহু শাখায় বিভক্ত হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমিক সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে মনন ও দর্শনের অধিকারী মানুষে এসে উপনীত হয়েছে। মানুষের এ পর্যায় সেই বানর জগত[১১১] থেকে উন্নীত

১১১. আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এ স্থলে 'আলমুল কুদরত' বা 'মহিমা জগত' লিখিত রয়েছে। অথচ পাদটীকায় শব্দটি যে, 'কুদরত' নয় বরং 'কেরাদত' অন্যান্য সংস্করণে তা বিদ্যমান, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রোজেনথালের অনুবাদেও এর সমর্থন বিদ্যমান। অন্যদিকে কেরাদত বা

www.amarboi.org

হয়েছে, যে জগতে অনুভূতি ও উপলব্ধি একত্র হয়েছিল কিন্তু বাস্তব, মনন ও দর্শনে পৌঁছতে পারেনি। এর পর মানুষের প্রথম দিকের আরম্ভ এবং এটাই আমাদের অভিজ্ঞতার শেষ পর্যায়।

অতঃপর আমরা এ বহুধাবিভক্ত জগতের উপর নানাবিধ প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগতে ব্যোম ও উপাদানের গতির প্রভাব বিদ্যমান এবং সৃজনশীল জগতে বৃদ্ধির ও উপলব্ধির গতির প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এ সবগুলোই সাক্ষ্য দিচ্ছে, যে দেহাদির উপর প্রভাবশীল একটি ভিন্ন শক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান, তাই আত্মিক শক্তি। এটা সৃষ্ট বস্তুপুঞ্জের পরস্পর সংযুক্তির অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এটাই উপলব্ধি ও গতির অধিকারী জীবাত্মা। সুতরাং এর উপরে অন্য একটি শক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজন, যা তাকে গতি ও উপলব্ধি প্রদান করে থাকে এবং তার সাথে সংযুক্তও রয়েছে। এ শক্তির সত্তা শুধুমাত্র উপলব্ধি ও মনন। তাই ফেরেশতা জগৎ। সুতরাং জীবাত্মার জন্য এটা অবশ্যম্ভাবী যে, সে মানবীয় সত্তা থেকে ফেরেশতীয় সত্তায় রূপান্তরিত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে। যাতে কোন সময়ে একটি বিশেষ মুহূর্তে সে কার্যত ফেরেশতীয় সত্তায় পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। তা কার্যত তার নিজ আত্মিক সত্তার পরিপূর্ণতার পরেই সম্ভব, যেমন পরে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করব। এখন সে তার পরবর্তী দিকের সাথে সংযুক্ত থাকবে, যেমন বস্তুজগতের ধারাবহিকতায় আমরা বর্ণনা করেছি। তা উর্ধ্ব ও অধঃ দুই দিক থেকেই সংযুক্তি লাভ করতে পারে। তা অধের দিকে দেহের সাথে সংযুক্ত এবং এর মাধ্যমে সে ইন্দ্রিয়ানুভূতির এমন একটি পর্যায় লাভ করেছে যা কার্যত তাকে মনন শক্তির অধিকারী করছে। অন্যদিকে সে উর্ধ্বের দিক থেকে ফেরেশতীয় দিকের সাথে সংযুক্ত এবং তার দ্বারা সে জ্ঞান অর্জন ও অদৃশ্য উপলব্ধির পর্যায় লাভ করছে। বস্তুত এ ফেরেশতীয় মননের মধ্যে পরিবর্তমান জগতের সমুদয় কিছু কালগত পরিধি ব্যতীতই বর্তমান। এটাই আমাদের পূর্ব বর্ণিত সত্তাগত সংযুক্তির মাধ্যমে অস্তিত্বের সুদৃঢ় ধারাবাহিকতা, যা তৎসৃষ্ট শক্তিসমূহকেও পরস্পর গ্রথিত করছে।

অতঃপর, মানবীয় জীবাত্মা চর্মচক্ষে দৃশ্যমান নয়, কিন্তু তার প্রভাব দেহের উপর আমরা দেখতে পাই। তা যেন তার একীভূত ও বিক্ষিপ্ত সমুদয় অংশসহ জীবাত্মা ও তার শক্তিসমূহের অস্ত্রস্বরূপ। তার মধ্যে কতকাংশ কর্তৃবাচক, যেমন হাতের ধরা, পায়ের চলা, জিহ্বার বলা এবং প্রতিরোধে সমগ্র দেহের গতি চঞ্চল হয়ে উঠা। এর কতকাংশ উপলব্ধিকারক, যদিও উপলব্ধির এ শক্তিগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে তার উর্ধ্বস্থিত শক্তি ও মননশীল শক্তি, যাকে যুক্তিবাদী শক্তি বলা হয়, তার দিকে উত্থিত হচ্ছে, তথাপি প্রকাশ ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমাদির সাহায্যেই তা উপলব্ধি করে থাকে। যেমন কর্ণ, চক্ষু এবং অন্য সমুদয় ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি অভ্যন্তরীণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এর প্রথম স্তর মিশ্র অনুভূতি। তা এমন একটি শক্তি, যা অনুভূতি বিষয়াদিকে দর্শন, শ্রবণ স্পর্শন ইত্যাদির সাহায্যে একক অবস্থায় সংগ্রহ করে এবং এর ফলে প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে পৃথক

বানর না হলে ইবনে খলদুনের সমুদয় বক্তব্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। এজন্য আমরা 'বানর জগতের' পাঠ গ্রহণ করলাম। ৫৩৩ পৃষ্ঠার ১৫২ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অনুভূত বিষয়াদি একই সময়ে তার উপর চেপে বসে না। ফলে এ মিশ্রশক্তি অনুভূতিকে ধারণায় পরিণত করে। এ ধারণা এমন এক শক্তি, যা অনুভূত বিষয়টিকে তার বাহ্যিক উপাদানের বাইরে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় মূর্ত করে তোলে। উক্ত দুটি শক্তি মস্তিষ্কের প্রথমভাগে তাদের তৎপরতা চালিয়ে থাকে। এর প্রথমটির জন্য সম্মুখ ভাগ ও দ্বিতীয়টির জন্য পশ্চাৎভাগ নির্ধারিত। অতঃপর, ধারণা-কল্পনা ও স্মৃতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কল্পনা শক্তি ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাৎপর্যাদি উপলব্ধি করে, যেমন জায়েদের শক্রতা উমরের সত্যবাদিতা, পিতার স্নেহ, নেকড়ের ভয় ইত্যাদি। স্মৃতিশক্তি ধারণার অন্তর্গত ও ধারণাতীত সমুদয় উপলব্ধ বিষয়কে সংরক্ষণ করে। তা যেন ভাণ্ডারের মত তৎসমুদয়কে গচ্ছিত রাখে এবং প্রয়োজনের সময় ফিরিয়ে দেয়। এ দুটি শক্তি তাদের অস্ত্র হিসাবে মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগকে ব্যবহার করে। প্রথমটির জন্য সম্মুখভাগ এবং দ্বিতীয়টির জন্য তার পশ্চাৎভাগ নির্ধারিত। অতঃপর এ সমুদয় শক্তিই মনন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং তার অস্ত্র হল মস্তিষ্কের মধ্য ভাগ। এটা এমনই একটি শক্তি, যার সাহায্যে পর্যবেক্ষণ ও চিন্তনে গতি সঞ্চারিত হয় এবং এর দ্বারা জীবাত্মা সদা গতিময় হয়ে উঠে। কেননা জীবাত্মা সর্বদাই এ মানবীয় শক্তি ও যোগ্যতার উপলব্ধি থেকে মুক্তির জন্য সচেষ্ট রয়েছে এবং সেই জন্য সে তার ক্রিয়ার মধ্যে সেই ঊর্ধ্ব আত্মিক স্তরের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করে চলে। এর ফলে সে আত্মিক পর্যায়াদির প্রথম দিকে উপস্থিত হয়ে দৈহিক ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যম ব্যতীতই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। সে অনবরত সেই দিকেই গতিময় ও সেই অভিমুখেই স্পন্দমান থাকে। কখনও সে সম্পূর্ণভাবে তার মানবীয় গণ্ডি ও তার আত্মিক পরিধি অতিক্রম করে ঊর্ধ্ব স্তরের ফেরেশতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ অবস্থান্তরের জন্য তার কোন বাহ্যিক মাধ্যমের সহায়তার প্রয়োজন হয় না, বরং আল্লাহ্ তাঁর প্রকৃতি ও প্রথম স্বভাবে যে গতির সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তারই আকর্ষণে সে অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

মানবীয় জীবাত্মার প্রকারভেদ

মানবীয় জীবাত্মা তিন প্রকার। এক প্রকার প্রকৃতিগতভাবেই আত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে দুর্বল। সুতরাং তার সমস্ত প্রচেষ্টা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধি ও তজ্জনিত ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করে। সে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় স্মৃতিশক্তি ও কল্পনা শক্তির নিকট থেকে তাৎপর্যাদি গ্রহণ করতে পারে এবং একটা বিশেষ ধারাবাহিকতায় দৈহিক মননজনিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানলাভ করে উপকৃত হতে পারে। কিন্তু এর সবকিছুই ধারণাজাত পরিধিতে সীমাবদ্ধ। কারণ এটা আরম্ভ থেকে প্রাথমিক স্তরগুলো পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, কিন্তু তাকে অতিক্রম করতে পারে না। যদি ভ্রষ্ট হয়, তা হলে তার পরবর্তী সব কিছুই ভ্রষ্টতা দোষে দুষ্ট হয়ে উঠে। অধিকাংশ স্থলে এটাই মানুষের দৈহিক উপলব্ধির পরিধি। এখানেই জ্ঞানীদের উপলব্ধির শেষ এবং এর উপরেই তাঁরা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

www.amarboi.org

অন্য এক প্রকার, যাঁরা ঐ দৈহিক মননজনিত গতিকেই আত্মিক উপলব্ধির দিকে ধাবিত করেন এবং এমন এক উপলব্ধির অধিকারী হন যাতে দৈহিক মাধ্যমগুলোর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; কারণ তাতেই এ উপলব্ধি গ্রহণের প্রস্তুতি বিদ্যমান। এর ফলে তাঁদের উপলব্ধির পরিধি প্রাথমিক স্তরগুলোকে অতিক্রম করে বিস্তৃত হয় এবং এভাবে মানবীয় উপলব্ধির প্রথম পরিধি ব্যাপ্ত হয়ে তাদেরকে অন্তর-পর্যবেক্ষণের প্রান্তরে উপনীত করে। এর সমস্তই স্বজ্ঞান; আরম্ভ থেকেও এর কোন পরিধি নেই, শেষ থেকেও তথৈবচ—এটাই ওলী-আল্লাহ্‌দের আধ্যাত্মবাদী স্বর্গীয় জ্ঞানের অধিকারীদের উপলব্ধির জগৎ। মৃত্যুর পরে 'আলমে বরযখে'[১২২] পুণ্যবানরা এ উপলব্ধির অধিকারী হন।

অন্য এক প্রকার, যাঁরা দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকেই সম্পূর্ণভাবে ঊর্ধ্বস্তরের ফেরেশতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হবার জন্মগত যোগ্যতা রাখেন, তাঁদের জন্য এ কারণেই কোন এক বিশেষ মুহূর্তে কার্যত ফেরেশতা হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাদের চেতনার দিগন্তেই তাঁরা ঊর্ধ্বস্তরের শক্তিসমূহকে অবলোকন ও আত্মিকবাণী শ্রবণ এবং বিশেষ মুহূর্তে তাঁরা আল্লাহ্‌র বক্তব্যও শুনতে পারেন।

ওহী

তাঁরাই আল্লাহ্‌র নবী—তাঁদের উপর আল্লাহ্‌র দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ তাঁদেরকে এ বিশেষ মুহূর্তে মানবীয় গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবার ক্ষমতা দিয়েছেন। এ মুহূর্তটিই ওহী অবতরণের সময়। এ অবস্থা তাঁদের স্বভাব, যার উপর আল্লাহ্ তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে এ প্রবৃত্তিকে মূর্তিমান করে তুলেছেন। তিনি তাঁদেরকে, মানবীয় দেহ ধারণের ফলে যে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন তাঁরা হতে পারেন, তা থেকেও মুক্তি দিয়েছেন। তিনি তাঁদের প্রকৃতির মধ্যেই এমন ইচ্ছা ও নিষ্ঠার দৃঢ়তা গ্রথিত করেছেন যদ্বারা তাঁরা সেই গন্তব্যের দিকে প্রধাবিত হতে পারেন। তাঁদের অভ্যাসের মধ্যে তিনি উপাসনার প্রতি এমন এক আগ্রহ কেন্দ্রীভূত করেছেন, যা তাঁদেরকে সর্বদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র সেই বিশেষ দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে উদ্যোগী করে। এ জন্য তাঁরা যখন ইচ্ছা করেন, সেই ফেরেশতীয় দিকে রূপান্তরিত হয়ে যান। এভাবে রূপান্তর লাভের ক্ষমতা তাদের জন্মগত স্বভাবের অন্তর্গত। বস্তুত এটা তাদের পরিশ্রম বা সাধনার ফসল নয়।

এভাবে তাঁরা যখন একাগ্র হয়ে মানবীয় গণ্ডি অতিক্রম করেন, তখনই ঊর্ধ্বস্তর থেকে যা কিছু শিখবার শিখে ফেলেন এবং পুনরায় সমুদয় শক্তিসহ মানবীয় গণ্ডিতে ফিরে আসেন যাতে তাঁদের দ্বারা লব্ধ বাণী প্রচারের কাজ সম্পন্ন হতে পারে। তাঁদের কেহ কখনও শব্দের রেশ শুনতে পান, যেন ইঙ্গিতময় কোন ভাষা; তা থেকেই তাঁর উপর অবতীর্ণ বাণীর স্বরূপ ধরতে চেষ্টা করেন এবং সেই রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই সকলই সংগ্রহ হয়ে যায় ও বোধগম্যও হয়ে উঠে। কখনও যে ফেরেশতা বাণী বহন করে আসেন, তিনি কোন ব্যক্তির আকারে তাঁর সাথে কথা বলেন এবং নবী তাঁর

১২২. মৃত্যু পরবর্তী কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত আত্মজগৎ। তুলনীয় প্রেতপুরী।

www.amarboi.org

উপর অবতীর্ণ বাণী সঞ্চয় করে নেন। ফেরেশতার শিক্ষাদান, মানবীয় গণ্ডিতে নবীর প্রত্যাবর্তন এবং অবতীর্ণ বাণী হৃদয়ঙ্গমকরণ—এ সকলই যেন এক মুহূর্তের কাজ, এমন কি প্রায় চক্ষের পলকে সংঘটিত হয়ে থাকে কেননা এটা কোনকালে বিস্তৃত হয় না, বরং সমগ্রটাই একসঙ্গে নেমে আসে। এজন্যই তা এত দ্রুত বলে মনে হয়। এ কারণেই এর নামকরণ হয়েছে ওহী। কারণ অভিধানে ওহীর অর্থই হল দ্রুততা।

জেনে রাখুন, প্রথমটি অর্থাৎ শব্দের রেশ শোনার যে অবস্থা, তা বিশেষজ্ঞদের মতে নবীদের পর্যায়, রসূলদের নয়।[১১৩] দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ফেরেশতার মানুষের আকারে এসে কথা বলা, এটাই রসূলদের পর্যায়। এজন্যই এটা পূর্বটি অপেক্ষা পূর্ণতর। এটাই সেই হাদিসের মর্মার্থ, যার মধ্যে হজরত মুহম্মদ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হয়ে ওহীর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। হারেস ইবনে হিশাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কীভাবে আপনার নিকট ওহী আসে? উত্তরে তিনি বললেন, অনেক সময় তা আমার নিকট আসে ঘণ্টাধ্বনির মতো এবং এটাই অতিশয় কষ্টদায়ক। অতঃপর তা শেষ হয় এমন অবস্থায় যে, আমি সমস্ত বক্তব্য স্মরণ করে ফেলেছি। অনেক সময় ফেরেশতা মানুষের আকার ধারণ করে আমার নিকট আসে ও কথা বলে এবং আমি সকল কথাই স্মরণ করতে পারি।

প্রথম অবস্থাটি এজন্যই অতিশয় কষ্টদায়ক যে, এটা সেই সংযুক্তির পথে শক্তি থেকে ক্রিয়ায় অবতরণের প্রথম পর্যায়। সুতরাং কতকাংশে কষ্টদায়ক বৈকি! আর এ কারণেই তিনি যখন মানবীয় উপলব্ধিতে ফিরে আসলেন, তখন দেখা গেল একমাত্র শ্রুতিশক্তিই মাধ্যম হয়েছে। এটা ছাড়া অন্যগুলো সম্ভব নয়নি। আবার যখন বারবার ওহী আসতে লাগল, শিক্ষার পরিমাণ বাড়ল, তখন ঊর্ধ্বস্তরের সাথে সংযুক্তি সহজ হয়ে উঠল। অতঃপর নবী যখন মানবীয় উপলব্ধিতে ফিরে আসলেন তখন দেখা গেল সমস্ত মাধ্যমেই বিশেষ করে সর্বাপেক্ষা স্পষ্টতম মাধ্যম দৃষ্টির সম্মুখে তা এসে উপস্থিত হয়েছে।

উপরোক্ত হাদিসের প্রথম অবস্থায় 'আমি স্মরণ করে ফেলেছি' অতীত ক্রিয়াপদ এবং দ্বিতীয় অবস্থায় 'আমি স্মরণ করতে পারি' বর্তমান ক্রিয়াপদ প্রয়োগের বিষয়টি অলংকারশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বস্তুত হাদিসের বক্তব্য ওহীর দুটি অবস্থার দৃষ্টান্ত হিসাবে এসেছে। প্রথমটিতে অবস্থার স্বরূপ হল শব্দের রেশ, যাকে পরিচিত নিয়মে বক্তব্য বলা যায় না। এজন্যই জানানো হল যে, হৃদয়ঙ্গম ও স্মরণ করা তার শেষ হতে না হতেই অস্তিত্বে এসেছে। সুতরাং উক্ত অবস্থার শেষ হবার চিত্রটির সাথে সঙ্গতি রাখেই অতীত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে সমাপ্তি ও বিযুক্তিকেই নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টিতে অবস্থার স্বরূপ হল মানুষের আকারে এসে কথা বলছে। এখানে বক্তব্য ও স্মরণ উভয়েই সমান্তরালে অবস্থান করছে। এজন্যই তার সাথে সঙ্গতি রেখে বর্তমান ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বস্তুত পুনঃ পুনঃ নবায়নের ইঙ্গিত বহন করে।

জেনে রাখুন, এ স্মরণ করার অবস্থাটি সম্পূর্ণ কষ্টকর ও কষ্টদায়ক। কোরান এর দিকেই ইঙ্গিত করেছে। আল্লাহ্ বলেন, আমরা অচিরেই তোমার উপর গুরুভার বাণী

---

১১৩. নবী অর্থ বার্তাবাহী এবং রসূল অর্থ প্রেরিত পুরুষ। এই প্রেরিতত্বের দিক হতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

www.amarboi.org

অর্পণ করব। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, তিনি ওহী অবতরণের কষ্টের জন্য দুশ্চিন্তা পোষণ করতেন। তিনি আরও বলেছেন, অত্যন্ত শীতের দিনে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হত এবং অতঃপর এমন অবস্থায় শেষ হত যে, তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম পড়তে থাকত।[১১৪] এ জন্যই উক্ত অবস্থায় তাঁর মধ্যে বিভোরতা ও তাঁর কণ্ঠে অতি পরিচিত শব্দ শোনা যেত। এর কারণ, যেমন আমরা পূর্বে স্থির করেছি, ওহী হল মানবীয় গণ্ডি পরিত্যাগ করে ফেরেশতীয় গণ্ডিতে অতিক্রম ও আত্মিক বাণী শ্রবণ। এতে নিজের সত্তার এ স্বস্থান থেকে বিচ্যুতি ও নিজের দিক থেকে অন্যের দিকে গমনের মধ্যে কষ্ট রয়েছে। এটাই সেই চাপের অর্থ, যা ওহী অবতরণের প্রাথমিক অবস্থায় বর্ণিত হয়েছে। হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, ফেরেশতা আমার উপর চাপের সৃষ্টি করলেন, এতে আমি শ্রান্তি অনুভব করলাম। অতঃপর আমাকে মুক্ত করে বললেন, পাঠ কর। আমি বললাম, আমি পাঠ করতে জানি না। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার, যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

এ অবস্থা ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে বিষয়টি যখন অভ্যস্ত হয়ে উঠে, তখন পূর্বের তুলনায় তাতে সহজভাব দেখা দেয়। এ কারণেই তাঁর মক্কায় অবস্থানকালে কোরানের যে সকল আয়াত, সূরা ও শ্লোক অবতীর্ণ হয়েছে, তা মদিনায় অবতীর্ণ অনুরূপগুলো থেকে সংক্ষিপ্ত। লক্ষ করুন, তবুকের যুদ্ধে অবতীর্ণ সূরা 'বারাআত' সম্পর্কে বলা হয়েছে, উক্ত সূরার সম্পর্কে অথবা অধিকাংশটাই সেখানে একসঙ্গে অবতীর্ণ হয় অথচ হজরত মুহম্মদ (সঃ) অত্যন্ত সহজভাবেই তাঁর উটনীর উপর বসেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বে মক্কায় সংক্ষিপ্ত সূরাগুলোও কিছু অংশ এক সময়ে ও অবশিষ্ট অংশ অন্য সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এভাবে মদিনায় অবতীর্ণ শেষ সূরা, যাতে 'ধর্মের আয়াত' বিদ্যমান[১১৫] তা খুবই দীর্ঘ। এর পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলো, যেমন, 'আররহমান' 'সারিয়াত, 'মুদাস্সির', 'দোহা', 'ফলক'[১১৬] ও অনুরূপ অন্যান্যের সাথে তুলনীয়। এর দ্বারা আপনি মক্কা ও মদিনায় অবতীর্ণ সূরা ও আয়াতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। আল্লাহ্ই সঠিক পথ নির্দেশকারী।

এটাই আমাদের নবুয়ত সম্পর্কীয় আলোচনার ফল।

ইন্দ্রজাল

এখন ইন্দ্রজাল; এটাও মানবীয় জীবাত্মার একটি বৈশিষ্ট্য। এর বর্ণনা, যেমন পূর্বে আমাদের আলোচনায় দেখা গেছে, মানবীয় জীবাত্মার মধ্যে তার মানবীয় গণ্ডি পরিত্যাগ করে উর্ধ্বস্থিত আত্মিক জগতের সাথে সংযোগ স্থাপনের সঙ্গতি বিদ্যমান। এটা নবীদের জন্য চক্ষের পলকে সঙ্ঘটিত হয়ে থাকে। কেননা মানবীয় গণ্ডিতেই জন্মগতভাবে তাঁদের এ যোগ্যতা রয়েছে। এর মধ্যে একথাও স্থিরীকৃত হয়েছে যে, তাঁরা এ প্রকার অবস্থা, কোন সাধনা, ইন্দ্রিয় মাধ্যম, পরোক্ষ জ্ঞান দৈহিক ক্রিয়া যেমন বাক্য, গতি এবং

১১৪. ৯৯, ১০০, ১০১ টীকা দ্র:।
১১৫. কোরান ৫, ৩।
১১৬. ৫৫, ৫১, ৭৪, ৯৮, ৯৬ ইত্যাদি সংখ্যক সূরা দ্র:।

www.amarboi.org

অন্য যে কোন ধরনের বিষয়ের সাহায্য-সহায়তা ব্যাতিরেকেই লাভ করে থাকেন। এটা শুধুই মানবীয় গণ্ডি থেকে ফেরেশতীয় গণ্ডিতে মুহূর্তে বা প্রায় চক্ষের পলকে রূপান্তরিত হওয়া।

অবস্থা যখন এ যে, এ যোগ্যতা মানবীয় প্রকৃতিতে বিদ্যমান, তখন এর বুদ্ধিগ্রাহ্য বিভাগও সম্ভব। এর ফলে এখানে এমন একশ্রেণীর মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যারা প্রথম শ্রেণীর তুলনায় একান্তই অসম্পূর্ণ। এ অসম্পূর্ণতা পরিপূর্ণতার বিপরীতে অবস্থিত। সেইখানের সাহায্যহীনতার বিপরীতে এখানে সাহায্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান। বস্তুত এতদুভয়ের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য রয়েছে। এজন্য এ অপর শ্রেণীর মানুষ, যাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, যখন তাদের প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি তার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মননশক্তিকে গতিময় করে তোলে, তখন তা উর্ধ্বাস্থিত শক্তির সাথে সংযোগ স্থাপনে স্বভাবগত কারণেই অসম্পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এ কারণেই তার স্বভাবগত দুর্বলতা তাকে একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও শুধু অনুভূতিসজ্জাত অথবা ধারণালব্ধ আংশিক বিষয়ের অধিকারী করে থাকে। যেমন, স্বচ্ছদেহ পশুর অস্থি, ছন্দোবদ্ধ বাক্য ও পশুপাখির গতিবিধি তাদের এ অনুভূতি বা ধারণা তাদেরকে আত্মিক শক্তিতে রূপান্তরণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে; বরং তা যেন তাদের অনুসারী হয়ে উঠে। তাদের উপলব্ধির প্রারম্ভে এ যে শক্তিক্রিয়াশীল হয়ে দেখা দেয়, তাকেই ইন্দ্রজাল বলা হয়।

এ সকল জীবাত্মা জন্মগতভাবে অসম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতার অভাবজনিত ত্রুটিতে বিদ্যমান বলে তারা সার্বিক অপেক্ষা অধিকাংশ আংশিক বিষয়াদিই উপলব্ধি করতে পারে। এ জন্যই তাদের ধারণা শক্তি অত্যন্ত ক্ষমতাবান; কেননা এটা আংশিক উপলব্ধিরই হাতিয়ার। সুতরাং নিদ্রায় অথবা জাগরণে তারা এ ধারণা শক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যেতে পারে। এর ফলে তখন তাদের মধ্যে এমন একটি চেতনা অস্তিত্ববান হয়ে উঠে, যা উদ্দিষ্ট বিষয়কে এনে উপস্থিত করে। তা যেন একটি দর্পণের ন্যায়। তাতে তারা সর্বদা দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও ঐন্দ্রজালিক বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়াদির সার্বিক উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়। কারণ তাদের অন্তর প্রেরণা একান্তই শয়তানী কর্ম।

এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যারা ছন্দোবদ্ধ ও সমিল বাক্যাদি—মন্ত্রের সাহায্য নিয়ে থাকে, তাদের অবস্থাই উন্নততর। এ মন্ত্রের সাহায্যে তারা অনুভূতির মাধ্যম অতিক্রম করে আত্মিক যোগাযোগের অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টায় কিছুটা শক্তি সঞ্চার করতে পারে। এর ফলে তাদের অন্তরে যে গতি অনুভূত হয় এবং বহিরাগত যে শক্তি তাকে সহায়তা করে, তাদের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায়—তাদের জিহ্বায় কিছু বক্তব্য এসে উপস্থিত হয়। তা অনেক সময় সত্য ও বাস্তবের অনুসারী হয় এবং অনেক সময় মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তারা নিজেদের উপলব্ধিগত ত্রুটিকে বহিরাগত ভিন্নধর্মী ও অশোভন এক শক্তির সাহায্যে অতিক্রম করতে চায়। এজন্য তাদের উপলব্ধিতে সত্যমিথ্যা একসঙ্গে এসে দেখা দেয় এবং তা তাদের বিশ্বস্ততা কমিয়ে দেয়। অনেক সময় তারা ধারণার বশবর্তী হয়ে কল্পনা ও অনুমানের সাহায্যে সত্যোপলব্ধির দিকে এগিয়ে যায় এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদেরকে প্রতারিত করে থাকে।

www.amarboi.org

এ মন্ত্রশক্তির অধিকারী ব্যক্তিদেরকেই বিশেষভাবে 'কাহেন' বা মন্ত্রসিদ্ধা বলা হয়ে থাকে। ঐন্দ্রজালিক শ্রেণীর মধ্যে এরাই উন্নততর অবস্থার অধিকারী। এদের প্রতি লক্ষ করেই হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "এটা মন্ত্রসিদ্ধার ছন্দোবদ্ধ কথা।" এতে তিনি মন্ত্রকে সম্বন্ধ কারকের সাহায্যে তাদের জন্য বিশিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি ইবনে সাইয়াদকেও তার অবস্থা জানবার জন্য বলেছিলেন, "এ বিষয় তোমার নিকট কীভাবে আসে?" সে বলল, "এটা আমার নিকট সত্য ও মিথ্যা দুই রূপেই আসে।" এর উত্তরে তিনি বললেন, "বিষয়টি তোমার মধ্যে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে।"[১১৭] অর্থাৎ নবুয়তের বৈশিষ্ট্যই হল সত্য, কোন অবস্থাতেই তার মধ্যে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটতে পারে না। কারণ, তা নবীর মানবীয় সত্তার উর্ধ্ব জগতের সাথে কোন প্রকার অনুসারী ও বহিরাগত সহায়তা ছাড়াই সংযোগ স্থাপন। কিন্তু ঐন্দ্রজালিকেরা যেহেতু তাদের উপলব্ধির ক্ষেত্রে বহিরাগত পরোক্ষ জ্ঞানের সহায়তা লাভ করে, সেজন্য তাদের উপলব্ধিতেও তারা অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং তাদের উদ্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে নিয়োজিত উপলব্ধিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এভাবেই তা মিশ্রিত হয়ে উঠে এবং মিথ্যার বাহন হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই তা নবুয়ত হতে পারে না।

আমরা যে এ ছন্দোবদ্ধ বাক্যাদি তথা মন্ত্রকে ঐন্দ্রজালিকদের উন্নততর অবস্থার পরিচায়ক বলে মন্তব্য করেছি; কারণ এ মন্ত্র, দর্শনের ও শ্রবণের অতীত সমস্ত অদৃশ্য মাধ্যম থেকে অধিকতর লঘু এবং এর লঘুত্বই আত্মিক উপলব্ধি ও সংযোগের ক্ষেত্রে নৈকট্যের প্রমাণ বহন করে। এতে নানাবিধ দুর্বলতা থেকে মুক্তির ইঙ্গিতও বিদ্যমান।

অনেক লোকের ধারণা, নবুয়তের সময় থেকে এ ইন্দ্রজাল শেষ হয়ে গেছে। হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের সময় শয়তানদেরকে আকাশস্থ সংবাদাদি সংগ্রহ থেকে বিরত রাখবার জন্য তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপের যে ঘটনা কোরানে বর্ণিত হয়েছে[১১৮] তা থেকেই এ ধারণা পোষণ করা হচ্ছে। কারণ ঐন্দ্রজালিকগণ একমাত্র শয়তানের নিকট থেকেই আকাশের সংবাদ জানতে পারে। সুতরাং ঐ সময় থেকেই ঐন্দ্রজাল বিনষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এ ধারণার জন্য উক্ত প্রমাণ খুব দৃঢ় নয়। কারণ ইন্দ্রজালিকদের এ বিদ্যাটি যেমন শয়তানের নিকট থেকে অর্জন করা হয়, তেমনি তাদের নিজ আত্মশক্তিতেও তা সম্ভব, যেমন আমরা পূর্বে স্থির করেছি। সুতরাং কোরানের আয়াতটি আকাশ থেকে সংগ্রহযোগ্য এক প্রকার সংবাদ থেকে তাদেরকে বিরত রাখার দিক নির্দেশ করছে। তা নবী প্রেরণের সংবাদ সম্পর্কীয়। অন্যান্য সংবাদ থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়নি। তদুপরি যদি সার্বিক অর্থেও হয় তথাপি এটা কেবল নবুয়তের সমসাময়িককালেই ছিল। পরে এটা পুনরায় নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে। এটাই বাস্তব অবস্থা। কারণ এ সকল মাধ্যমের সবগুলো নবুয়তের সময় ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল, যেমন সূর্যের আবির্ভাবে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র ও দীপাবলি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কারণ নবুয়ত স্বয়ং এমন এক প্রোজ্জ্বল জ্যোতি, যার প্রভাবে সকল জ্যোতি নিষ্প্রভ অথবা বিলীন হয়ে যায়।

---

১১৭. বোখারী ২য় দ্র:। ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মনে হয় ইনি ইসলাম গ্রহণ করে ৬৩ (৬৮২) হিজরিতে মারা যান।

১১৮. কোরান।

www.amarboi.org

দার্শনিকদের অনেকের ধারণা, এ ইন্দ্রজাল শুধু নবুয়তের পূর্বাহ্নেই অস্তিত্ববান ছিল। এর পর তা নষ্ট হয়ে গেছে। এরূপ অবস্থা প্রত্যেক নবুয়তের প্রাক্কালেই সংঘটিত হয়েছে। কারণ নবুয়তের অস্তিত্বের জন্য নক্ষত্রবলয়ের বিশেষ প্রভাবের প্রয়োজন। এ বলয়ের সম্পূর্ণতার দ্বারা তার প্রভাবে নবুয়তও সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। যদি এ বলয় অসম্পূর্ণ থাকে, তা হলে যে প্রভাব সে বিস্তার করতে চায়, তার অসম্পূর্ণতার দরুন কিছু সংখ্যক অসম্পূর্ণ সত্তার আবির্ভাব ঘটে। এটাই ঐন্দ্রজালিকের তাৎপর্য, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এ বলয় সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বহু অসম্পূর্ণ বলয়ের প্রভাব দেখা দেয়। এর ফলে এক বা একাধিক ঐন্দ্রজালিকের অস্তিত্ব মূর্তিমান হয়ে উঠে। অতঃপর যখন এ বলয় সম্পূর্ণ হয়, নবীর অস্তিত্বও পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং পূর্বের অসম্পূর্ণ বলয়গুলোর প্রভাবজাত সত্তারও পরিসমাপ্তি ঘটে, তাদের বিন্দুমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ যুক্তির ভিত্তি হল এই যে, কোন কোন নক্ষত্রবলয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এটা গৃহীত যুক্তি নয়। হতে পারে উক্ত বলয় কোন বিশেষ অবস্থায় উক্ত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।-তা যদি অসম্পূর্ণ থাকে, তা হলে সেই বিশেষ অবস্থাটি সৃষ্টি না হওয়ার ফলে বিশেষ প্রভাবও দেখা দিবে না। সুতরাং দার্শনিকের বক্তব্য অনুসারে যা বোঝায় যে, তা অসম্পূর্ণ অবস্থায়ও প্রভাব বিস্তার করে, তা ঠিক নয়।

অতঃপর ঐ সকল ঐন্দ্রজালিক, যারা নবুয়তের সমসাময়িককালে জীবিত ছিল, তারা নবীর সত্যতা ও তাঁর অলৌকিকত্বের তাৎপর্য বুঝত। কারণ তাদের মধ্যেও নবুয়ত সাদৃশ্য স্বজ্ঞানের কিছু অংশ বিদ্যমান ছিল, যেমন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিদ্রার বিষয়টি আছে। এ তুলনার বুদ্ধিগ্রাহ্য দিকটি নিদ্রিতের অপেক্ষা ঐন্দ্রজালিকের সত্তায় অধিকতর দেদীপ্যমান। এটা যেমন তাদের একান্ত প্রাপ্য তেমনি এটাই তাদেরকে নবুয়তের লোভে মিথ্যাচারের দিকে নিয়ে গেছে। এ কারণেই তার হিংসার বশবর্তী হয়েছে। যেমন উমাইয়া ইবনে আবিস্ সেলত,[১১৯] তারও নবী হওয়ার লোভ ছিল। এমনি অবস্থা হয়েছিল ইবনে সাইয়াদ, মুসাইলেমা[১২০] ও অন্যান্য ব্যক্তিদের। অতঃপর যখন তাদের বিশ্বাসের অবস্থা প্রাধান্য পেয়েছে তখন হিংসা ত্যাগ করে বিশ্বাস করবার মতই বিশ্বাস করেছে। যেমন তুলাইহা আল-আসাদী ও সওয়াদ ইবনে কারেবের অবস্থা। তাঁরা ইসলামী আমলে যুদ্ধজয়ে যে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন, তার মধ্যেই তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় বিদ্যমান।

স্বপ্ন দর্শন

স্বপ্ন দর্শনের তাৎপর্য হল যুক্তিবাদী আত্মার তার আত্মিকসত্তার মধ্যে ক্ষণিকের জন্য ঘটনাবলির কোন আকৃতি প্রত্যক্ষ করা। যদি এ দর্শন আত্মিক হয়, তা হলে তাতে দৃষ্ট ঘটনাবলির আকৃতি বাস্তবেও অস্তিত্ববান হবে। যেমন প্রতিটি আত্মিক সত্তারই এ অবস্থা হয়ে থাকে। এটা দৈহিক উপাদান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধি থেকে মুক্ত হয়েই আত্মিক হয়। কখনও নিদ্রায় থাকার দরুন মুহূর্তের জন্য তার প্রাপ্তি ঘটে থাকে, যেমন আমরা

১১৯. হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সমসাময়িক বিখ্যাত আরবি কবি।

১২০. এদের প্রায় সকলেই অল্প বেশি মিথ্যা নবুয়তের দাবি করেছিল।

www.amarboi.org

পরে বর্ণনা করব। এর ফলে আত্মা তার উদ্দিষ্ট সম্ভঘটিতব্য ঘটনাবলির জ্ঞানলাভ করে এবং তা সহ উপলব্ধির জগতে ফিরে আসে। এমতাবস্থায় তার এ জ্ঞান যদি দুর্বল হয়, কোন কাহিনী, দৃষ্টান্ত ও ধারণার সংমিশ্রণে যদি অস্পষ্ট হয়, তা হলে এ কাহিনী ইত্যাদির জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়। অবশ্য কোন সময় এ জ্ঞান কোন কাহিনীর মিশ্রণ ছাড়াই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে লাভ হয়। তখন দৃষ্টান্ত বা ধারণার অনুপস্থিতির দরুন কোন প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

আত্মার জন্য এরূপ মুহূর্ত লাভের কারণ এই যে তা শক্তির দিক থেকে আত্মিক সত্তার অধিকারী এবং এ সত্তা তার দেহ ও তৎসংশ্লিষ্ট উপলব্ধির মাধ্যমগুলোর সাহায্যে পরিপূর্ণতা লাভের প্রয়াসী। আবার এ পরিপূর্ণতার প্রয়াসই তাকে দৈহিক বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়,[১২১] এমনকি সে একান্তই বুদ্ধিগ্রাহ্য শুদ্ধ সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে যায় আর তখনই কার্যত তার সত্তা সম্পূর্ণ হয়ে উঠে। তখন সে এমন এক উপলব্ধিশীল আত্মিক সত্তায় পরিণত হয়, যা দৈহিক কোন মাধ্যম ছাড়াই ক্রিয়া করতে সমর্থ হয়। অবশ্য এ ধরনের আত্মিক শক্তি এতদ্‌সত্ত্বেও উর্ধ্বস্তরের ফেরেশতাদের সমকক্ষ নয়। কারণ তারা এর মত দৈহিক বা অন্য মাধ্যমের সাহায্যে সত্তার পরিপূর্ণতা বিধান করে না। অন্যদিকে দেহের মধ্যে অবস্থানকাল পর্যন্ত আত্মার এ যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। এ যোগ্যতার একটি বিশেষ রূপ আছে, তা ওলী আল্লাহ্‌দের জন্য এবং এর সাধারণ রূপটি সর্বসাধারণের জন্য। এটাই স্বপ্ন দর্শনের ব্যাপার।

আর যে রূপটি নবীদের জন্য, তা হল মানবীয় গণ্ডি থেকে আত্মিক সর্বোচ্চস্তর শুদ্ধ—ফেরেশতীয় গণ্ডিতে অতিক্রমণ করা। ওহী অবতরণের সময় তাদের এ যোগ্যতা বারবার প্রকাশিত হয়ে থাকে। তা যখন দৈহিক উপলব্ধি থেকে উর্ধ্বে উত্থিত হয়, তখন তাতে এমন একটি উপলব্ধিগত অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাকে প্রকাশ্যভাবে নিদ্রার সাথে তুলনা করা যায়; যদিও নিদ্রা তা অপেক্ষা খুবই নিম্নস্তরের। তবুও এ তুলনার জন্যই ধর্মপ্রবর্তক স্বপ্নদর্শনকে নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ বলে বর্ণনা করেছেন[১২২]। অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে তেতাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। অন্য একটিতে বলা হয়েছে, সত্তর ভাগের এক ভাগ। এখানে সর্বত্র সংখ্যাটির যথার্থতা প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। এর দ্বারা এ প্রকার অবস্থার বহুবিধ পর্যায়ের কথাই বোঝান হয়েছে। এর প্রমাণ এই যে, কোন কোন হাদিসে সত্তরের কথা এসেছে এবং এ সংখ্যাটি আরবদের নিকট আধিক্যের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেকে ধারণা করেন যে, হাদিসে ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ বলা হয়েছে, তাই যথার্থ। কারণ প্রথম দিকে ওহী আরম্ভ হয়েছিল ছয়মাস ব্যাপী স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে। এটা এক বছরের অর্ধেক। মক্কা ও মদিনার সমস্ত সময় মিলিয়ে নবুয়তের কালপরিধি হল তেইশ বছর। সুতরাং অর্ধেক বছর তার ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু এ ধারণা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ উক্ত স্বপ্নদর্শন আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্যই ঘটেছে। কাজেই তাকে কি করে আমরা অন্যান্য নবীর ক্ষেত্রে

---

১২১. মূল গ্রন্থে এ স্থানে অসুবিধা থাকায় এ বাক্যটি যোগ করতে হয়েছে। অবশ্য বৈরুত সংস্করণের মূল পাদটীকায় এর স্বীকৃতি আছে।

১২২. বোখারী (৪র্থ) দ্র:।

www.amarboi.org

প্রয়োগ করে সাধারণভাবে বলি! অন্যদিকে তার এ কাল পরিধি নবুয়তের সময় থেকে দেয়া হয়েছে, অথচ স্বপ্ন দর্শনকে মর্যাদা দেয়া হয়নি।

আমাদের পূর্ব বর্ণনায় এ বিষয়টি যদি পরিষ্কার হয়ে থাকে, তা হলে পাঠক, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, এর অর্থ হল, সাধারণ মানুষের সংযুক্তিগত যোগ্যতার সাথে নবীদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ জন্মগত যোগ্যতার তুলনা—আল্লাহ্‌র শান্তি তাঁদের উপর বর্ষিত হোক। বস্তুত সাধারণ যোগ্যতা তা সকল মানুষের জন্য যতই সাধারণ হোক, তদ্রুপ ঘনিষ্ঠ নয়। তদুপরি তা কার্যকরী হবার পথে প্রচুর বাধা-বিপত্তি বিদ্যমান। এর সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হল প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ানভূতি। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের এ বাধা দূর করবার জন্য তাদের মধ্যে নিদ্রার সৃষ্টি করেছেন। তা তাদের প্রকৃতিগত। সুতরাং উক্ত নিদ্রার সাহায্যে বাধা অপসারিত হলে আত্মা তার উদ্দিষ্ট সত্য জগতের জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। কোন সময় ক্ষণিকের জন্য সে এমন উপলব্ধির অধিকারী হয়, যাতে উদ্দিষ্ট সফল হয়ে উঠে। এ জন্যই ধর্মপ্রবর্তক তাকে সুসংবাদের পর্যায়ে ফেলে বলেছেন, নবুয়তের মধ্যে সুসংবাদ ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সুসংবাদ কী? তিনি বললেন, "তা সৎ স্বপ্ন, কোন সৎ ব্যক্তি তা দেখে অথবা তাকে দেখানো হয়।"[১২৩]

নিদ্রার সাহায্যে এ বাধা অপসারিত হওয়ার কারণ, যা আমরা এখন বর্ণনা করছি, তা এই যে, যুক্তিবাদী আত্মার সমুদয় উপলব্ধি ও কার্য দৈহিক জীবশক্তির সাহায্যেই সঙ্ঘটিত হয়। তা এক প্রকার সূক্ষ্ম বাষ্প। তার কেন্দ্রস্থল হৃদপিণ্ডের বামপার্শ্বস্থিত গহ্বর, যেমন জালিনুস ও অন্যান্যের শারীরবিদ্যা গ্রন্থে বিদ্যমান। এটা রক্তের সাথে শিরা ও ধমনীসমূহে প্রসারিত হয় এবং দেহের মধ্যে অনুভূতি, গতি ও সমুদয় ক্রিয়ার শক্তি প্রদান করে। এর সূক্ষ্মতর অংশটি মস্তিষ্কে উপনীত হয়, সেখানে মস্তিষ্কের শৈত্যে সমতা লাভ করে এবং তার অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের ক্রিয়াদিকে পূর্ণতা দান করে। যুক্তিবাদী আত্মা এ বাষ্পশক্তির সাহায্যেই উপলব্ধি ও মননশীল হয়ে থাকে। সৃষ্টিবিধানের ইচ্ছা অনুযায়ী এ আত্মা তার সাথে সম্পর্কিত। কারণ সেই অনুসারে কোন সূক্ষ্ম বস্তুই স্থূল বস্তুর উপ প্রভাব বিস্তার করে না। অতএব যখন এ জীবশক্তি দৈহিক উপাদানের মধ্যে সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে, তখন তা এমন এক সত্তার প্রভাবস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা দৈহিক দিক থেকে ভিন্ন এবং এটাই যুক্তিবাদী আত্মা। এ জীবশক্তির মাধ্যমেই যুক্তিবাদী আত্মার প্রভাব দেহের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এর এ উপলব্ধি দুই প্রকার। একটি প্রকাশ্য উপলব্ধি, তা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংঘটিত হয় এবং অন্যটি গোপন উপলব্ধি, তা মস্তিষ্ক শক্তির সহায়তায় অস্তিত্বে আসে। এ উপলব্ধি তাকে তার পূর্ববর্তী উপলব্ধি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে তার উপরিস্থিত আত্মিক সত্তাসমূহের সাথে মিলিত করে। কেননা তা জন্মগতভাবেই এ যোগ্যতার অধিকারী। যেহেতু প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি দৈহিক, সেজন্য তা শ্রান্তি ও অবসাদের দরুন দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়ে এবং অতিরিক্ত

---

১২৩. বোখারী (৪র্থ) দ্র:।

www.amarboi.org

তৎপরতার সাহায্যে আত্মশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ কারণে আল্লাহ্ তার স্বভাবের মধ্যে বিশ্রাম লাভের স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন, যাতে উপলব্ধি পুনরায় নবতর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এটা শুধু তখনই হতে পারে, যখন জীবশক্তি প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি সকল বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে গোপন অনুভূতির দিকে ফিরে আসে। এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য রাত্রিকালীন দেহের উপর পতিত শৈত্যানুভূতি প্রভৃত সাহায্য করে থাকে। এর ফলে দেহের স্বাভাবিক তাপ তার গভীরে প্রবেশ করে এবং বহির্দেশ থেকে অন্তর্দেশে এগিয়ে যায়। তা এভাবে তার বাহন জীবশক্তিকে অন্তর্দেশে পরিচালিত করে। এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাত্রিকালেই মানুষ নিদ্রাভিভূত হয়।

এভাবে আত্মশক্তি যখন প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির বন্ধনমুক্ত হয়ে তার অন্তর্শক্তিগুলোর নিকট ফিরে আসে এবং জীবাত্মার উপর অনুভূতির প্রভাব ও বাধাগুলো শিথিল হয়ে পড়ে, তখন তা স্মৃতিশক্তির নিকট ফিরে এসে সেখান থেকে মিশ্রণ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে কাল্পনিক চিত্রাদির অস্তিত্বকে সম্ভব করে তোলে। এ সকল চিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভ্যস্ত চিত্র মাত্র। কারণ আত্মশক্তি অতি অল্পকাল পূর্বেই চিরাচরিত উপলব্ধি থেকে সরে এসেছে। অতঃপর উক্ত শক্তি এ চিত্রগুলোকে প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতিজাত মিশ্র অনুভূতির সম্মুখে প্রেরণ করে, যাতে এগুলো প্রকাশ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ানুভূতির ধারায় উপলব্ধ হতে পারে। কখনও জীবশক্তি তার অন্তর্শক্তিগুলোর সাথে সমতা রক্ষা করে তার আত্মিক শক্তির দিকে ধাবিত হয় এবং আত্মিক উপলব্ধির সাহায্যে তাকে উপলব্ধি করে। কেননা এটাই তার জন্মগত স্বভাব। এর ফলে সে তৎকালে তার সত্তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির চিত্র চয়ন করে নেয়। অতঃপর ধারণা শক্তি এ সকল উপলব্ধ চিত্রকে যথার্থ অথবা রূপক হিসাবে চিরাচরিত কাঠামোতে রূপ দেয়। এর মধ্যে রূপকগুলোর জন্যই ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আত্মার এ প্রকার উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হবার পূর্বেই যে সকল চিত্র মিশ্রণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্মৃতিশক্তির দ্বারস্থ হয়, তাই 'বিশৃঙ্খল স্বপ্ন' নামে আখ্যাত।[১২৪]

বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, নবী (সঃ) বলেছেন, স্বপ্ন তিন প্রকার। আল্লাহ্‌র নিকট থেকে স্বপ্ন, ফেরেশতার নিকট থেকে স্বপ্ন এবং শয়তানের নিকট থেকে স্বপ্ন।[১২৫] এ তিন প্রকার স্বপ্নের বিবরণ আমাদের পূর্ব বর্ণনার সাথে মিলে। সুস্পষ্ট স্বপ্ন আল্লাহ্‌র দান, ব্যাখ্যাযোগ্য রূপকগুলো ফেরেশতাদের এবং বিশৃঙ্খল যা কিছু সকলই শয়তানের কাজ। কারণ, এগুলোর কোন অর্থ নেই এবং শয়তান অর্থহীনতার উৎস।

এটাই স্বপ্নদর্শনের তাৎপর্য এবং একে কার্যকারণ সংবলিত ও সাহায্য করে নিদ্রা। এটা এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাদের এমন কেউ নেই, যাকে এ থেকে মুক্ত বলা যেতে পারে। বরং প্রতিটি মানুষই একবার নয়, একাধিকবার নিদ্রার মধ্যে এমন কিছু দেখেছে, যা জাগরণে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ থেকে তার এ ধারণাই যথার্থভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, জীবশক্তি নিদ্রায় অদৃশ্যকে উপলব্ধি করতে পারে এবং এটা তার প্রয়োজনীয়ও। সুতরাং নিদ্রায় যদি এ অবস্থার সত্যতা

১২৪. মূল শব্দটি 'আযগামু' আহলামীন্; কোরান ১২, ৪৪; ২১, ৫।
১২৫. কিন্তু বোখারীতে দুই প্রকার।

www.amarboi.org

স্বীকার করে নেয়া যায়, তা হলে অন্যান্য অবস্থাতেও এটা হতে পারে। কারণ উপলব্ধিবান সত্তা একটিই এবং তার বৈশিষ্ট্য সর্বাবস্থায় সাধারণ। আল্লাহ্ তাঁর দয়ায় ও অনুগ্রহে সত্যের দিকে পথপ্রদর্শনকারী।

অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান

এ ব্যাপারে মানুষ সাধারণভাবে যে সকল ঘটনার সম্মুখীন হয়ে থাকে, তা তাদের স্বেচ্ছাজনিত নয়। কারণ স্বপ্নদর্শনের উপর মানুষের কোন হাত নেই। হয়ত জীবাত্মার মধ্যে এরূপ কোন বিষয়ের প্রতি উৎসুক্য সৃষ্টি হয়ে থাকতে পরে, তার কারণেই সে সেই ক্ষণিক সংযুক্তির মাধ্যমে নিদ্রায় তা লাভ করে থাকে। এটা উক্ত ঘটনা দেখবার জন্য তার স্বেচ্ছাপ্রণোদনের ফল নয়। আলগায়াত[১২৬] ও যোগসাধনাকারীদের অন্যান্য গ্রন্থে এমন কিছু নামের (মন্ত্রের) উল্লেখ আছে, যা নিদ্রার সময় উচ্চারণ করলে স্বপ্নে উৎসুক্য অনুযায়ী বিষয়াদি দেখা যায়। তারা এ নামগুলোকে (মন্ত্রকে) 'স্বপ্নদর্শন মন্ত্র' নামকরণ করেছেন। তা থেকে 'মাসলামা' আল-গায়াত নামক পুস্তকে একটি স্বপ্নদর্শন মন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যার নাম দিয়েছেন তিনি 'পূর্ণ প্রকৃতির স্বপ্নদর্শন মন্ত্র।' তার কোন ব্যক্তির চিন্তামুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে নিদ্রার সময় এ কয়টি অনারব শব্দ উচ্চারণ করা— 'তামাগস্‌বাদা আন্ ইয়াস্‌ওয়ান্দা ওয়া গাদাস্ নওফানা গাদিস্।'[১২৭] সে তখন তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে, তা হলে নিদ্রায় সে যা চায়, তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি কয়েক রাত্রি আহার্যের ব্যাপারে কৃচ্ছ্র সাধনার পর এটা উচ্চারণ করেছিল। অতঃপর তার সম্মুখে একটি মানুষের আকৃতি উপস্থিত হয়ে বলল, "আমি তোমার পূর্ণ প্রকৃতি।" তখন সে তাকে তার উদ্দিষ্ট জিজ্ঞাসা করলে সে তার উৎসুক্য পূরণ করেছিল। বহুবার আমি (ইবনে খলদুন) এ মন্ত্র থেকে অদ্ভুত ফল পেয়েছি এবং ব্যক্তিগত অবস্থার এমন অনেক কিছু জানতে পেরেছি, যার প্রতি আমার উৎসুক্য ছিল। কিন্তু এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, ইচ্ছাই স্বপ্ন দর্শন সংঘটিত করতে পারে। এ স্বপ্নদর্শন মন্ত্রগুলো জীবাত্মাকে স্বপ্ন দর্শনের জন্য প্রস্তুত করতে পারে মাত্র। সুতরাং প্রস্তুতি যখন সুসম্পন্ন হয়, তখন প্রস্তুতির উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ ঘটে থাকে। যে কোন ব্যক্তি তার প্রস্তুতির জন্য পছন্দমত অনেক কিছুই গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এতে তার উদ্দিষ্ট বিষয় সংঘটিত হবেই এমন কোন প্রমাণ নেই। প্রস্তুতির ক্ষমতা কোন প্রকারেই কোন বিষয় সংঘটিত করবার ক্ষমতার নামান্তর হতে পারে না। এটা ভাল করে জেনে রাখুন এবং অনুরূপ বিষয় বা ঘটনা আপনার সম্মুখে আসলে তৎসম্পর্কে বিবেচনা করুন। আল্লাহ্ই বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ।[১২৮]

ভবিষ্যদ্বক্তা

অতঃপর আমরা মানব সমাজে এমন অনেক লোকের দেখা পাই, যাঁরা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই বহু ঘটনার কথা বলতে পারেন। তাঁদের বিশেষ প্রকৃতিই তাঁদেরকে মানুষের

---

১২৬. স্পেনের দার্শনিক মাসলামা ইবনে আহমদ আলমাজরিতীর গ্রন্থ 'আলগায়াতুল হাকিম।'

১২৭. সম্ভবত আরমেয়িক ভাষা; অর্থ—কথোপকথনে তুমি কুহক উচ্চারণ কর আর নিদ্রায় তাই ঘটে (?)।

১২৮. কোরান ৬, ১৮, ৭৩; ৩৪, ১।

www.amarboi.org

মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী বলে চিহ্নিত করে। এরূপ করতে তাঁরা কোন প্রকার সাধনা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাব বিচার কিংবা অন্য কোন মাধ্যমের দ্বারস্থ হন না। তাঁরা জন্মগতভাবেই বিশেষ প্রকৃতির সহায়তায় এ সকল উপলব্ধি প্রকাশ করে থাকেন বলেই আমরা দেখতে পাই। এঁদের মধ্যে দৈবজ্ঞরা, যারা স্বচ্ছ বস্তু যেমন দর্পণ, জলপূর্ণ পাত্র এবং জীবজন্তুর হৃদপিণ্ড, যকৃৎ ও অস্থির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপের সহায়তা গ্রহণ করেন। অনেকে পশু-পাখির ডাক ও গতিবিধি বিবেচনা করেন। অনেক নুড়ি পাথর, গমের দানা ও খেজুরের আঁটি চালনা করেন। এ সকল কিছুই মানব সমাজে বিদ্যমান; এগুলোকে অস্বীকার বা তুচ্ছ করবার সাধ্য কারও নেই। এরূপ ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাদের জিহ্বার উপর শব্দাবলি নিক্ষিপ্ত হয় ও তারা সংবাদ প্রদান করেন। এরূপ ঘুমন্ত ও মৃত ব্যক্তিরা নিদ্রার প্রারম্ভে ও মুমূর্ষু অবস্থায় অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে থাকে। এরূপ সুফীদের মধ্যকার যোগসাধকদের অদৃশ্য তথ্য উপলব্ধির বিভূতি সর্বত্র পরিচিত।

আমরা এখন এ সকল উপলব্ধির উপর কথা বলব। আমরা প্রথমে ইন্দ্রজাল সম্পর্কে আলোচনা করব। পরে একের পর এক শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করব। এর পূর্বে মানুষের জীবাত্মা কীভাবে আমাদের পূর্ব বর্ণিত বিষয়সমূহে উপলব্ধির যোগ্যতা অর্জন করে, তৎসম্পর্কে একটি ভূমিকা দেয়া প্রয়োজন। তা এই যে, জীবাত্মা একটি আত্মিক শক্তি হিসাবে অন্যান্য আত্মিক শক্তির মধ্যে বিরাজমান, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সে শক্তি থেকে দেহ ও তার বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমেই বাস্তবে আগমন করে। এ বিষয়টি প্রত্যেকেরই উপলব্ধিযোগ্য। এখন যে বস্তু শক্তিতে অস্তিত্ববান, তার জন্য অবশ্যই একটি গঠন ও উপাদান বিদ্যমান। এ জীবাত্মার সেই গঠন, যা দ্বারা তা পরিপূর্ণতা লাভ করে, তা হল উপলব্ধি ও মননের নামান্তর মাত্র। তা প্রথমে এমন একটি শক্তি হিসাবে বিরাজ করে, যা উপলব্ধি গ্রহণে এবং বিষয়াদির সার্বিক ও আংশিক চিত্র অনুধাবনে সক্ষম। এরপর তা দেহের সান্নিধ্যে এসে কার্যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অস্তিত্ববান হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। এখানে সে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে বাস্তব উপলব্ধিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে এবং উক্ত উপলব্ধিসমূহ হতে একের পর এক আগত সার্বিক ধারণার সাহায্যে আকারাদি মননের শক্তি অর্জন করে। এভাবে তার বাস্তব উপলব্ধি ও মনন তার সত্তাকে পরিপূর্ণ করে তোলে। তখন জীবাত্মার অবস্থা হয় একটি আধারের ন্যায়, যার উপর উপলব্ধির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে একের পর এক আকারাদি প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এজন্য শিশুকে তার জাত অবস্থায় তার সহজাত উপলব্ধিতে অক্ষম দেখা যায়। সে নিদ্রা, দিব্যদৃষ্টি বা অন্য কোন উপায়ে উপলব্ধি অর্জন করতে পারে না। কারণ তার যে গঠন অমিশ্র উপলব্ধি ও মননের সত্তা হিসাবে বিরাজমান, কখনও তা সার্বিকতার ধারণা অর্জনে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি। অতঃপর তার সত্তা যখন বাস্তবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, তখন দেহের মধ্যে অবস্থান পর্যন্ত তার দুই প্রকারের উপলব্ধি লাভ হয়ে থাকে। একটি উপলব্ধি সম্পূর্ণ দেহজাত, দেহযন্ত্রের সাহায্যেই সে তার সাথে পরিচিত হয় এবং অন্যটি একান্তই সত্তাজাত, তাতে কোন মাধ্যমের অবকাশ নেই। বরং দেহ ও তার পঞ্চেন্দ্রীয়, তাদের তৎপরতার দ্বারা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কারণ ইন্দ্রিয়গুলো তাদের প্রকৃতিগত স্বভাবের জন্য সর্বদা তাকে প্রকাশ্য দেহজ উপলব্ধির দিকেই আকর্ষণ করতে থাকে।

www.amarboi.org

কখনও সে বহির্দেশ থেকে অন্তর্দেশের দিকে মগ্ন হয় আর তখনই ক্ষণিকের জন্য দেহের আবরণ ছিন্ন হয়ে যায়। কখনও এটা হয় মানুষের সর্বসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিদ্রার মাধ্যমে আবার কখনও কতক লোকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যাদু চালনা বা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সূফী সাধাকদের সাধনার মাধ্যমে এ সময় জীবাত্মা তার উর্ধ্বস্তরস্থিত সত্তাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সমর্থ হয়। কারণ, আমরা যেমন পূর্বে বলেছি, উক্ত জীবাত্মা ও উর্ধ্বস্তরের দিকের মধ্যে সংযুক্তি বিদ্যমান। এ সকল সত্তা একান্তই আত্মিক। তারা অমিশ্র উপলব্ধি ও বাস্তব মনন। তাদের মধ্যেই বাস্তব জগতের আকারাদি ও তাৎপর্যাদি বর্তমান, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং জীবাত্মা সেখান থেকে ঐসকল আকারাদির কোন কিছু অবলোকন করে এবং তৎসম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে ফেলে। কখনও এ সকল উপলব্ধ আকৃতিকে ধারণা শক্তির উপর ন্যস্ত করা হয় এবং সে তাকে একটা অভ্যস্ত কাঠামোতে রূপ দেয়। অতঃপর অনুভূতি এ উপলব্ধ বিষয়কে নিয়ে ফিরে আসে—কখনও বিমূর্ত আবার কখনও বা সমূর্ত এবং তার সংবাদ প্রদান করে। এটাই জীবাত্মার সেই অদৃশ্য সংবাদ প্রদানের যোগ্যতার বিশ্লেষণ। এখন আমরা আমাদের পূর্ণদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এর বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে বর্ণনা দানে ফিরে আসছি।

এদের মধ্যে যারা স্বচ্ছ পদার্থ যেমন দর্পণ, জলপূর্ণ পাত্র, কিংবা জীবজন্তুর হৃদপিণ্ড, যকৃৎ, অস্থিতে দৃষ্টিপাত করে কিংবা নুড়ি ও আঁটি চালনা করে, তারা সকলেই ঐন্দ্রজালিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এরা জন্মগত দিক দিয়ে এ ব্যাপারে নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। কারণ যথার্থ ঐন্দ্রজালিকের অনুভূতির আবরণ ছিন্ন করতে খুব একটা সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। অথচ এরা সমগ্র দেহজ অনুভূতিকে একটি মাত্র অংশের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করার সাহায্য গ্রহণ করে এবং এর মধ্যে দৃষ্টিশক্তিই তাদের বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। সে এর সাহায্যেই গভীর দৃষ্টিতে নিমগ্ন হয়, যতক্ষণ না তার উদ্দিষ্ট উপলব্ধি দেখা দেয় এবং সে তার সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করতে পারে। অনেক সময় ধারণা করা হয় যে, এ সকল ঐন্দ্রজালিক যা দেখতে পায়, তা বুঝি দর্পণের মধ্যে দৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু বিষয়টি তদ্রূপ নয়। বরং তারা অনবরত দৃষ্টিপাত করতে করতে দর্পণ দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। দর্পণও তাদের মধ্যে তখন সাদা মেঘের ন্যায় একটি আস্তরণ দেখা দেয়, যার উপরে তাদের উদ্দিষ্ট উপলব্ধিগুলো আকার ধারণ করে, এগুলোই তাদের উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে হ্যাঁ বা না বোধক ইঙ্গিত প্রদান করে থাকে। অতঃপর তারা তাদের উপলব্ধির অবস্থা অনুসারে সংবাদ প্রদান করে। এ দর্পণ এবং তার উপরে যে আকৃতি দেখা দেয়, তাকে তারা সেই অবস্থাতেই উপলব্ধি করে না। বরং এর দ্বারা তারা অন্য একটি উপলব্ধির মধ্যে নীত হয়। তা একান্তই জীবাত্মা সম্পর্কীয়, দৃষ্টিশক্তিজাত নয়। বরং তা থেকেই জীবাত্মীয় উপলব্ধি অনুভূতিকে রূপ দেয়, যেমন তা সর্বজন পরিচিত। এমনিভাবে যারা জীবজন্তুর হৃদপিণ্ড বা যকৃতের উপর দৃষ্টি দেয়, কিংবা যারা জলে বা জলপূর্ণ পাত্রে দৃষ্টিপাত করে, কিংবা এ ধরনের অন্য যা কিছু আছে, তাদের সকলের একই অবস্থা। এদের মধ্যে অনেককে দেখেছি, যারা ধোঁয়ার সাহায্যে অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে পুনরায় প্রস্তুতির জন্য ইচ্ছা শক্তিকে ব্যবহার করে এবং উপলব্ধি অনুযায়ী সংবাদ প্রদান করে। তাদের ধারণা, তারা বায়ুর মধ্যে এমন সব

www.amarboi.org

আকৃতি দেখতে পায়, যেগুলো দৃষ্টান্ত ও ইঙ্গিতের সাহায্যে তাদের উদ্দিষ্ট উপলব্ধির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে। এদের বাহ্য অনুভূতি থেকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যাপারটি পূর্বোক্ত অন্যান্যের তুলনায় অনেকটা লঘু প্রকৃতির। এ পৃথিবী সকল প্রকার অদ্ভুত ব্যাপারের জনক।

পশুপাখির গতিবিধি সম্পর্কীয় শাকুনবিদ্যা এমন একটি উপলব্ধি যা কোন বিশেষ পাখি বা পশুর আগমনে হঠাৎ কোন কোন লোকের মধ্যে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রদানের শক্তি জাগ্রত করে এবং সংশ্লিষ্ট পশু বা পাখির অন্তর্ধানের পর এ সম্পর্কে চিন্তা এনে দেয়। বস্তুত এটা জীবাত্মারই এমন একটি শক্তি, যা আগ্রহ ও চিন্তার মাধ্যমে শ্রুত বা দৃষ্ট কোন শাকুন চরিত্র বিচারের ফলে আলোড়িত হয়ে উঠে। আমরা যেমন পূর্বে বলেছি, এদের কল্পনা শক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে থাকে। সুতরাং এরা এদের দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ের প্রতি এ শক্তিকে নিয়োজিত করে। এটা তাকে সেই উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দেয়, যা নিদ্রায় কল্পনা শক্তি করে থাকে। নিদ্রায় যখন ইন্দ্রিয়গুলো অভিভূত, তখন কল্পনা শক্তি জাগ্রত অবস্থায় অনুভূত—দৃষ্ট বিষয়গুলোকে মাধ্যম করে এমন একটি বোধগম্য অবস্থার সৃষ্টি করে, যার ফলে স্বপ্ন দর্শন বাস্তব হয়ে উঠে।

ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিষয়টি এই যে, তাদের দেহের সাথে যুক্তিবাদী আত্মার সম্পর্ক খুবই দুর্বল। কারণ তাদের দেহস্থ সজীবতা বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদের এ দৈহিক ত্রুটি ও রোগগ্রস্ততার যাতনার জন্য জীবাত্মা ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে নিবিষ্ট বা মগ্ন হতে পারে না। অনেক সময় এর সূত্র ধরে তার উপর অন্য কোন দুষ্ট আত্মা এসে ভর করে বসে এবং দুর্বলতার জন্য তা সে প্রতিরোধ করতে পারে না। ফলে সে ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বস্তুত এভাবে তার সত্তার দুর্বলতার জন্য দেহের সজীবতা নষ্ট হওয়ার ফলে কিংবা তার দুর্বলতার সুযোগে অন্য কোন দুষ্ট আত্মা এসে ভর করায় যখন সে ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন সে অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যায়। এ সময় তার উপলব্ধি আত্মিক জগতে ধাবিত হয়, সেখান থেকে কিছু আকৃতি বহন করে আনে এবং কল্পনা শক্তি তাকে কাজে লাগায়। কখনও এ অবস্থায় তার ইচ্ছা না থাকলেও কেউ যেন তার জিহ্বা দিয়ে কথা বলে যায়।

এ সকল শ্রেণীর লোকের উপলব্ধিতে সত্যের সাথে মিথ্যা মিশ্রিত থাকে। কারণ অনুভূতির অতীত হয়েও তারা বহিরাগত পরোক্ষ শক্তির সাহায্য ব্যতীত আত্মিক সংযোগ ঘটাতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ঐ উৎস থেকেই তাদের উপলব্ধিতে মিথ্যা এসে উপস্থিত হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। দৈবজ্ঞরাও এ উপলব্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত, তারাও সেই আত্মিক সংযোগের অধিকারী নয়। তারা উদ্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তা শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে অনুমান ও ধারণার বশবর্তী হয় এবং একেই সংযোগ ও উপলব্ধির প্রাথমিক অবস্থা বলে মনে করে। এর ফলে তারা অদৃশ্য জগতের জ্ঞানের দাবিদার হয়ে উঠে। কিন্তু যথার্থ অবস্থা এর বিপরীত।

এটাই এ সকল বিষয়ের ফলশ্রুতি। মাসউদী তাঁর 'মরুজুজ জাহাব' (বিগলিত স্বর্গ) গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি যথার্থ বিশ্লেষণ উপস্থিত করতে

www.amarboi.org

পারেননি। তাঁর বক্তব্য দৃষ্টে মনে হয়, এসকল তত্ত্বকথায় তাঁর তেমন গভীরতা ছিল না। এ কারণেই তিনি যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে সকলের নিকট থেকেই এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

যে সকল উপলব্ধির কথা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, তার প্রত্যেকটিই মানব সমাজের মধ্যে বিদ্যমান। আরবীয়রা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জানবার জন্য ঐন্দ্রজালিকদের দ্বারস্থ হত এবং তাদের যুদ্ধবিগ্রহে সত্য কোন পক্ষে, তা জানবার জন্য তাদের অদৃশ্য জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করত। সাহিত্যিকদের রচনায় এর ভুরিভুরি প্রমাণ বিদ্যমান। এদের মধ্যে প্রাক ইসলামী যুগে শিক্ক ইবনে আনমার ইবনে নজার এবং সাতিহ ইবনে মাজেন ইবনে গাস্সান[১২৯]—এ দুইজন খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। শেষোক্ত জনের দেহকে কাপড়ের ন্যায় ভাঁজ করা যেত; কেননা তার দেহে মাথার খুলি ব্যতীত অন্য কোন হাড় ছিল না। এদের প্রসিদ্ধ কাহিনীর মধ্যে রবিয়া ইবনে মুজারের স্বপ্ন ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। এরা তাকে হাবশীদের ইয়ামেন দখল, তাদের পরে মুজার গোত্রের রাজ্যলাভ এবং কোরায়শ গোত্রে মোহাম্মদী নবুয়তের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কেও সংবাদ দিয়েছিল। সাতিহ মোবেজানের স্বপ্নেরও ব্যাখ্যা দিয়েছিল। পারস্য সম্রাট আব্দুল মসিহকে এ উদ্দেশ্যে তার নিকট পাঠালে, সে নবীর আবির্ভাব ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিনাশের কথা বলেছিল। এ সকল সংবাদ খুবই সুপরিচিত। এভাবে আরবে দৈবজ্ঞের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। তাদের কাব্যে এদের কথা বর্ণিত হয়েছে। কবি বলেন,[১৩০]।

> আমি ইয়ামামার দৈবজ্ঞকে বললাম, আমাকে আরোগ্য কর,
> যদি আমাকে আরোগ্য করতে পার, তা হলে তুমি যথার্থই একজন চিকিৎসক।

অন্য এক কবি বলেন,

> আমি ইয়ামামার দৈবজ্ঞকে তার ইচ্ছামত দিবার কথা বলেছি
> এবং নজদের দৈবজ্ঞকেও যদি তারা আমাকে নিরোগ করতে পারে।
> তারা বলল, আল্লাহ্ তোমাকে নিরোগ করুন, আল্লাহ্র কসম! আমাদের
> সাধ্য নেই তুমি তোমার দেহের মধ্যে স্বেচ্ছায় যে রোগ বহন করছে।
> ইয়ামামার দৈবজ্ঞ রাবাহ ইবনে ইজলা এবং নজদের দৈবজ্ঞ আল আবলক
> আল আসাদী।

এরূপ অদৃশ্যের সংবাদ উপলব্ধির একটি হল, অনেক লোকের জাগরণ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ার সময় বাক্স্ফূর্তি হওয়া। তাদের যে বিষয়ে ঔৎসুক্য থাকে এবং যা জানতে ইচ্ছা করে, এ সময়ে সেই অদৃশ্য চমকিত হয়ে উঠে। এটা ঘুমের প্রারম্ভে জাগরণ থেকে বিচ্যুত হওয়া ও বাক্শক্তি লোপ পাওয়ার মুহূর্ত ছাড়া সংঘটিত হয় না। তখন সে কথা বলতে থাকে, যেন সে কথা বলতে বাধ্য এবং তা এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, তা শোনা ও বোঝা যায়। এমনিভাবে হন্যমান ব্যক্তিদের দেহ থেকে

---

১২৯. শিক্ক ও সাতিহের এ গোত্র পরিচয় সন্দেহমুক্ত নয়। ইবনে খলদুন মাসউদীর নিকট হতে এটা বর্ণনা করেছেন।

১৩০. কবির নাম—উরুয়া ইবনে হিজাম আল উদরী। পরের কবিও তিনিই।

www.amarboi.org

মস্তক বিচ্যুত হওয়ার সময় তাদের বাক্‌স্ফূর্তি ঘটে। অনেক নিষ্ঠুর অত্যাচারীদের কথা জানতে পেরেছি, তারা বন্দীদের মধ্যে অনেককে এজন্যই হত্যা করত, যাতে হননের সময় তাদের বক্তব্য হতে নিজেদের ব্যক্তিগত পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু তা সন্তোষজনক হত না। মাসলামা তাঁর 'আল গায়াত' নামক গ্রন্থে অনুরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। যদি কোন ব্যক্তিকে তিল তৈলপূর্ণ একটি পিপায় আবদ্ধ করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুধুমাত্র ডুমুর ও বাদাম খেতে দেয়া হয়, তা হলে তার দেহের ধমনী ও করোটি ছাড়া সমুদয় মাংস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তাকে তেল থেকে উঠিয়ে বাতাসের সংস্পর্শে শুষ্ক হতে দিলে এবং এ সময় তার নিকট বিশেষ সাধারণ সর্ববিষয়ের পরিণাম জিজ্ঞাসা করলে সে তার সংবাদ দিতে সমর্থ হবে। এটা যাদু সম্পর্কীয় একটি গর্হিত প্রক্রিয়া, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, মানব সমাজে কত অদ্ভুত বিষয়েরই না অস্তিত্ব রয়েছে।

অনেক লোক সাধনার জন্য এ অদৃশ্য উপলব্ধি লাভের প্রয়াস পেয়ে থাকে। তারা প্রচেষ্টার দ্বারা দৈহিক সমস্ত শক্তিকে নিশ্চল করে কৃত্রিম মৃত্যুর সৃষ্টি করে এবং জীবাত্মা যদ্দারা প্রভাবিত হতে পারে, এমন সমুদয় বিষয় নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অতঃপর জীবাত্মাকে শুধু তপজপের সাহায্যে তার শক্তি বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করা হয়। এ শক্তি কেন্দ্রীভূত চিন্তা ও দীর্ঘস্থায়ী অনাহারের ফলে ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। এটা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত যে, দেহে যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন অনুভূতি ও তজ্জনিত আবরণ ছিন্ন হয়ে যায় এবং জীবাত্মা তার সত্তা ও জগৎ সম্পর্কে অবহিতি লাভ করে। এজন্য তারা সাধনার দ্বারা সেই অবস্থার সৃষ্টি করে, যাতে মৃত্যুর পরে তারা যা লাভ করত, তা যেন মৃত্যুর পূর্বেই লাভ করতে পারে। এর ফলে জীবাত্মা অদৃশ্যের জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। এদের মধ্যে একশ্রেণীর যাদু সাধক রয়েছে, যারা উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় সাধনা করে অদৃশ্যের সংবাদ জ্ঞাপন এবং সৃষ্টি জগতের উপর প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা চালায়। এদের অধিকাংশই উত্তরে দক্ষিণের অসমভাবাপন্ন অঞ্চলগুলোতে বিদ্যমান। বিশেষ করে এরা হিন্দের অধিবাসী। সেখানে এদেরকে 'যোগী' বলে ডাকা হয়। এই সাধনার রীতি-নীতি সংকলিত তাদের বহুগ্রন্থ বিদ্যমান এবং তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কীয় সংবাদাদি যথার্থই অদ্ভুত।

অবশ্য সুফী সাধকদের সাধনা মূলত ধর্মীয় এবং এ সকল অপবিত্র উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত। তাঁরা তাঁদের সকল আগ্রহ ও ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত ও নিয়োজিত করেন। যাতে তা দ্বারা তাঁরা অধ্যাত্মা ও একত্ববাদীদের রহস্য পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেন। তাঁদের সাধনার মধ্যে একাগ্রতা ও অনাহারের মাধ্যমে নামজপের পরিমাণকে বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং এভাবেই তাঁদের সাধনার উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে। কারণ জীবাত্মা নামজপের আহার্য পেয়ে বেড়ে উঠলে, অতি সহজেই আল্লাহ্‌তত্ত্বের নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু এ সাধনাকেই নামজপ থেকে বিচ্যুত করলে তা শয়তানী কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। অদৃশ্যের সংবাদ জানা ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করার যে সকল শক্তি সুফী সাধকদের মধ্যে দেখা যায়, তা একান্তই আকস্মিক। কারণ সাধনার

www.amarboi.org

প্রারম্ভে এরূপ কোন শক্তি লাভের উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। যদি এরূপ কোন উদ্দেশ্যে তাঁদের সাধনা নিয়োজিত হয়, তবে তা ত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হল না। বরং তা প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার ও অদৃশ্যের উপর অবহিতি লাভের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত। এরূপ হলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এরূপ করা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থাপনের মতই গর্হিত। কোন এক সুফী সাধক বলেছেন, "যে তত্ত্বজ্ঞানের জন্যই তত্ত্বজ্ঞানের সাধনা করে, সে দ্বিতীয় কোন কিছুর কথাই বলে। কারণ তাদের সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য উপাস্য, অন্য কিছু নয়। সুতরাং এ সাধনার পথে আকস্মিকভাবে যদি কিছু তাঁদের লাভ হয়, তা আকস্মিক লভ্যই, মূল উদ্দেশ্যগত নয়। তাঁদের অনেকেই এ আকস্মিক লভ্য থেকে দূরে সরে থাকেন এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি দেন না। তাঁরা আল্লাহ্‌কেই চান, অন্য কিছু নয়। অবশ্য তাঁদের এ আকস্মিক লব্ধশক্তি সকলের নিকট পরিচিত। এরূপ অদৃশ্য বিষয় ও মনের গোপন কথা বলবার শক্তিকে তাঁরা 'মনোজ্ঞান' ও 'দিব্যজ্ঞান' বলে থাকেন এবং প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাকে বলেন 'বিভূতি'। এগুলোর কোনটাই তাঁদের জন্য অন্যায্য নয়। উস্তাদ আবু ইসহাক আল ইসফারায়নী ও আবু মুহম্মদ ইবনে আবু জায়েদ আল মালেকী।[১৩১] অন্যান্যের মধ্যে এ সকল শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চেয়েছেন। তাঁরা অলৌকিকত্বের সাথে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ভয়েই এরূপ করেছেন। কিন্তু কালাম শাস্ত্রবিদদের বিশ্লেষণে ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা তাদের মধ্যে যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাই যথেষ্ট। বিশুদ্ধ হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে যে, হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে দিব্য কথক বিদ্যমান, উমর তাদেরই একজন।" সাহাবীদের মধ্যে অনুরূপ পরিচিত বহু ঘটনা ঘটেছে, যদ্দারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন হজরত উমর (রাঃ)-এর বাক্য—"হে সারিয়া, পাহাড়।" ইনি সারিয়া ইবনে যুনাইম, বিজয়াভিযানকালে ইরাক যুদ্ধরত এক মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পৌত্তলিকদের সাথে এ যুদ্ধে পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি পশ্চাদপসারণের কথা চিন্তা করছিলেন। তাঁর নিকটেই একটি পাহাড়, সেইদিকে যাওয়াই তাঁর ইচ্ছে; এমন সময় বিষয়টি হজরত উমর (রাঃ)-এর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি তখন মদিনায় মিম্বরের উপরে দাঁড়িয়ে খোতবা পাঠ করছিলেন, জোরে চিৎকার করে বললেন, "হে সারিয়া, পাহাড়!" সারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে থেকেই তা শুনতে পেলেন এবং হজরত উমর (রাঃ)-কেও দেখতে পেলেন। এ কাহিনী সর্বজন পরিচিত।

অনুরূপ একটি ব্যাপার হজরত আবু বকরের তৎকন্যা হজরত আয়েশা (রাঃ)-কে অন্তিম উপদেশ দানের সময় ঘটেছিল। তিনি আয়েশাকে তাঁর খেজুরের বাগান থেকে কয়েক ওসক[১৩২] পরিমাণ খেজুর দান করেছিলেন। পুনরায় এ অংশ অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অপেক্ষা বিশিষ্ট হওয়ায় তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "তারা তোমারই দুইভাই ও দুইবোন"। আয়েশা বললেন, বোন ত শুধু আসমা, অপরটি কে? তিনি বললেন, "বিনতে খারেজার গর্ভে যে শিশুটি রয়েছে, তাকে আমি কন্যা রূপেই দেখছি।" পরে কন্যাই হয়েছিল।

---

১৩১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু জায়েদ' জন্মকাল ৩১৬-৩৮৬ (৯২৮-৯৯৬ খ্রি:) হি:।

১৩২. একটি পরিমাণ। এক 'ওসক'=ষাট 'সা' এবং এক সা = ২৩৪ তোলা।

www.amarboi.org

এরূপ ঘটনা তাঁদের মধ্যে আরও বহু ঘটেছে, এমনকি তাঁদের পরবর্তী পুণ্যাত্মা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা গেছে। অবশ্য সুফী সাধকগণ বলে থাকেন যে, নবুয়তের সময় এরূপ ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। কারণ নবীর উপস্থিতিতে সাধকদের দিব্য অবস্থা অবশিষ্ট থাকে না। এমনকি, তাঁরা বলেন, কোন সাধক যদি নবীর মদিনায় আসেন, তা হলে সেখান থেকে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর দিব্য অবস্থা অন্তর্হিত থাকে। আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ দান করুন এবং সত্যের দিকে আমাদেরকে পরিচালিত করুন।

বাহলুল গোষ্ঠী

এসকল অধ্যাত্মবাদী সুফী সাধকদের মধ্যে 'বাহলুল' নামে পরিচিত একটি গোষ্ঠী বিদ্যমান। তাঁরা অনেকটা নির্বোধ প্রকৃতির, বুদ্ধিমানদের অপেক্ষা ভূতগ্রস্তদের সাথেই তাদের মিল অধিক। এতদ্সত্ত্বেও তাঁদের জন্য ওলীর মর্যাদা ও সত্য সাধকের অবস্থা নিশ্চিত বলে বিবেচনা করা হয়। এ ব্যাপারে অধ্যাত্মপন্থীদের মধ্যে যাঁরা তাদের অবস্থা বুঝেন, তাঁরাই এ ধারণা পোষণ করে থাকেন। কিন্তু তথাপি এ বাহলুলপন্থীরা ধর্মীয় বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত নন। তাঁরা অদৃশ্যের ব্যাপারে অদ্ভুত সংবাদ পরিবেশন করে থাকেন। কারণ তাঁরা কোন বিষয়ে বাধ্যবাধকতার অন্তর্ভুক্ত নন। এজন্য তাঁরা এ ব্যাপারে যথেচ্ছা কথা বলেন এবং অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অনেক সময় ধর্মশাস্ত্রবিদরা তাঁদের আধ্যাত্ম মর্যাদা সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞান করেন। কেননা তাঁরা ধর্মীয় বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত নন। কারণ যথাবিহিত উপাসনা ব্যতীত ওলী হওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁরা ধারণা করেন। বস্তুত এরূপ ধারণা করা ভুল। কারণ, 'আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন।'[১৩৩] এজন্য ওলী হওয়া উপাসনা বা অন্যকোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। যখন মানবীয় জীবাত্মা অস্তিত্ববান, তখন আল্লাহ্ তাকে যে-কোন অনুগ্রহের দ্বারা বিশিষ্ট করে তুলতে পারেন। এ বাহলুল গোষ্ঠীর যুক্তিবাদী আত্মা ভূতগ্রস্তদের মত বিনষ্ট বা বিকৃত হয়নি। শুধু তাদের মধ্যে সেই বুদ্ধি নেই, যদ্বারা তাঁরা ধর্মীয় বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত হতে পারেন। এটা জীবাত্মার একটি বিশেষ গুণ। বস্তুত এ বুদ্ধি কতিপয় প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বাহন; যদ্বারা মানুষের দৃষ্টি গভীর হয়, তার জীবিকার অবস্থাগুলো সে বুঝতে পারে এবং সংসারধর্ম পালন করতে সক্ষম হয়ে উঠে। কাজেই যখন সে তার জীবিকা অন্বেষণে পার্থক্য বিবেচনা করতে এবং সংসারধর্ম পালন করতে সক্ষম হয়, তখন তার পক্ষে ধর্মীয় বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত থেকে আপত্তি উত্থাপনের কোন অবকাশই থাকে না। কারণ, এ ব্যাপারে তাকে পরকালের দায়িত্বমুক্ত হতেই হবে। কেননা, সে ত এমন ব্যক্তি নন, যার এ বিশেষ গুণ কোন কারণে রহিত হয়েছে, অথচ তার জীবাত্মাগত অস্তিত্ব বিদ্যমান।

১৩৩. কোরান ৫, ৫৪; ৫৭, ২১; ৬২, ৪।

www.amarboi.org

সুতরাং পূর্বোক্ত বাহলুলের অবস্থা হল এই যে, তাঁর জীবাত্মাগত অস্তিত্ব বিদ্যমান, কিন্তু সেই বুদ্ধি নেই, যদ্বারা তিনি ধর্মীয় বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত হতে পারেন অর্থাৎ তাঁর সংসারী হয়ে জীবিকা অর্জনের জ্ঞান নেই। এমন হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকেও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ পালনের বিবেচনার উপর নির্ভর করে অধ্যাত্মশক্তি দান করেন না। যদি এ বক্তব্য শুদ্ধ হয়, তা হলে জেনে রাখুন, অনেক সময় তাঁদেরকে ভূতগ্রস্ত বলে ভুল করা হয়; অথচ তাঁরা তা নন। কারণ ভূতগ্রস্তদের যুক্তিবাদী আত্মা বিনষ্ট হয়ে তাদেরকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। আপনার জন্য তাদের পার্থক্য বিবেচনার কতিপয় নিদর্শন বিদ্যমান। একটি হল, এ বাহলুলরা একটি উদ্দেশ্য পোষণ করেন এবং তাঁরা নামজপ ও উপাসনা থেকে বিরত নন। অবশ্য তাঁদের এ উপাসনায় ধর্মীয় শর্তাদির কোন স্থান নেই। কারণ তাঁরা ধর্মীয় বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত নন, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। কিন্তু ভূতগ্রস্তদের মোটেও কোন উদ্দেশ্য নেই। অন্য একটি হল, তাঁরা জন্মগতভাবেই নির্বোধ হয়ে এসেছেন। কিন্তু ভূতগ্রস্তদের মধ্যে সুস্থ অবস্থায় জীবনের একটা অংশ কাটাবার পর সম্পূর্ণ দৈহিক ও প্রকৃতিগত কারণে ভূতগ্রস্ততা দেখা দিয়েছে এবং এর ফলে তাঁদের যুক্তিবাদী আত্মা বিনষ্ট হয়ে তাঁরা উন্মাদ হয়ে গেছে। অন্য একটি হল, এ বাহলুলরা মানুষের ভাল-মন্দের ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়ে থাকেন। কারণ তাঁরা ধর্মীয় বিধি-নিষেধের অধীন নন বলে এ ব্যাপারে তাঁদের কোন অনুমতি প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভূতগ্রস্তদের এরূপ কোন তৎপরতা নেই। এ পরিচ্ছেদে আমাদের বক্তব্য এখানেই শেষ হল। আল্লাহ্ সঠিক পথ দেখান।

বালুকা লিখন

অনেক লোকের ধারণা, অনুভূতি বিরহিত না হয়েও অদৃশ্য উপলব্ধি করা সম্ভব। তাদের মধ্যে জ্যোতিষীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা বলে থাকেন। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের ইচ্ছা, উপাদানের উপর তাদের প্রভাব, তাদের পরস্পর দৃষ্টিপাতের ফলে প্রকৃতিসমূহের মধ্যকার প্রতিক্রিয়া এবং তজ্জনিত বায়ুর বিশেষ অবস্থা প্রভৃতি বিচারের ফলে তা সম্ভব হয়ে উঠে। এ সকল জ্যোতিষী প্রকৃত প্রস্তাবে অদৃশ্যের কোন কিছু জানেন না। তাদের কার্যটি মূলত নক্ষত্রের প্রভাব ও তজ্জনিত বায়ুর বিশেষ অবস্থার উপর বিশেষ ধারণা ও প্রকাশ্য অনুমানপ্রসূত। এরই উপর বিশেষ বিবেচনা প্রয়োগ করে জ্যোতিষিগণ জগতের বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর বিস্তারিত সংবাদ প্রদান করে থাকেন, যেমন বাতলিমুস (টলেমী) এ সম্পর্কে বলেছেন। আমরা আল্লাহ্ চাহে ত যথাস্থানে এর অন্যায্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করব। যদি এর ন্যায্যতা প্রমাণও হয়, তথাপি এটা ধারণা ও অনুমান মাত্র, আমাদের পূর্ব বর্ণিত বিষয়াদির কোন কিছু নয়।

এদের মধ্যে সাধারণ একদল লোক আছেন, যাঁরা বিশেষ প্রক্রিয়ায় অদৃশ্যের সংবাদ জ্ঞাপন ও সৃষ্টিজগতের রহস্য বিশ্লেষণ করে থাকেন। তাঁরা তার নাম দিয়েছেন

www.amarboi.org

'বালুকা লিখন'। তাঁদের কার্যধারার সাথে তুলনা করেই এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার মর্ম হল এই যে, তাঁরা বিন্দুর সাহায্যে চারস্তরবিশিষ্ট কতিপয় ছক নির্মাণ করেছেন, যেগুলো বিন্দু সংখ্যার এককত্ব, যুগ্মত্ব ও এতদুভয়ের মধ্যে সমত্বের দরুন বিভিন্ন হয়ে থাকে।

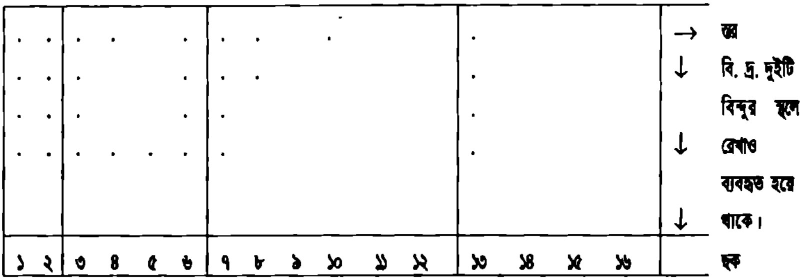

এভাবে ষোলটি ছক গঠিত হয়[১৩৪]। কেননা এদের মধ্যে সবগুলো একক বিন্দু হতে পারে অথবা যুগ্ম বিন্দু হতে পারে। এর ফলে দুটি ছক পাওয়া যায়। যদি এদের মধ্যে একটি স্তরে মাত্র একক বিন্দু থাকে তা হলে চারটি ছক পাওয়া যায়। যদি দুটি স্তরে একক বিন্দু হয়, তবে ছয়টি ছক পাওয়া যেতে পারে। যদি তিনটি স্তরে একক বিন্দু হয়, তা হলেই আরও চারটি ছক লাভ হয়। এভাবে ষোলটি ছক নির্মাণ করে তারা এদের প্রতিটির পৃথক নামকরণ এবং শুভাশুভের দিক থেকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করেছেন। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কেও তাঁরা তাঁদের ধারণামত ষোলটি স্বাভাবিক ঘর নির্ধারণ করেছেন। তারা যেন কক্ষস্থিত বারটি রাশি ও চারটি দিক। তাঁরা প্রতিটি ছকের জন্য একটি ঘর, কিছু রেখা এবং জাগতিক মৌল উপাদানগুলোর উপর তাদের বিশেষ নির্দেশের ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে তাঁরা এমন একটি বিদ্যা গড়ে তুলেছেন, যাকে তাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুরূপ বিচার-বিবেচনার অধিকারী বলে মনে করেন। কিন্তু বাতলিমুসের ধারণা অনুসারে জ্যোতিষশাস্ত্র নক্ষত্রবলয়ের বিশেষ প্রভাবজাত। অথচ বালুকা লিখন বিশারদদের শাস্ত্রটি একান্তই প্রথাগত গঠন ও আকস্মিক ধারণানির্ভর। এর সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই।[১৩৫]

---

১৩৪. এ ছকসমূহের নকশাটি রোজেনথাল হতে দেয়া হল। তিনি বালুকা লিখনকে 'জিউমেনসী' বলে উল্লেখ করেছেন।

১৩৫. এর পর ইবনে খলদুনের সংযোজন বলে স্থিরীকৃত কয়েকটি অনুচ্ছেদের অনুবাদ রোজেনথালে বিদ্যমান। আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এটা পাইনি। তথাপি বিষয়ের অনুরোধে ও সম্পূর্ণতার তাগিদে এর অনুবাদ নিম্নে তুলে দিলাম।
"অবশ্য বাতলিমুস শুধু জন্ম ও সংকট সংক্রান্ত বিষয়াদিই আলোচনা করেছেন, যা তাঁর মতে পৃথিবীর মৌল উপাদানের উপর নক্ষত্র ও নক্ষত্রবলয়ের প্রভাবের ফলে সংঘটিত হয়। পরবর্তী জ্যোতিষশাস্ত্রীরা যদিও বহুবিধ সমস্যার কথা আলোচনা করেছেন, তাঁরা এর গভীরে প্রবেশ করে প্রতিটি প্রভাবকে নির্দিষ্ট নক্ষত্র বলয়ের সাথে বিশ্লিষ্ট করেছেন এবং তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন। এর ফলে তাঁরা যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তা ফলাফলের দিক হতে বাতলিমুসের নির্দেশের অনুরূপ।

www.amarboi.org

বালুকা লিখনবিদরা ধারণা করেন যে, এ শাস্ত্র জগতের প্রাচীনকালীন নবুয়তের অন্তর্গত। কখনও তাঁরা একে হজরত দানিয়াল (আঃ) ও হজরত ইদরিস[১৩৬] (আঃ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন, যেমন প্রতিটি শিল্পকর্ম সম্পর্কে করা হয়ে থাকে। কখনও একে ধর্মানুমোদিত বলে দাবি করে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর এ বাক্য প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করেন। তিনি বলেছিলেন, কোন এক নবী লিখতেন যার লিখন তার সাথে মিলবে, তা তাই। এ হাদিসে বালুকা লিখন সম্পর্কে কোন ধর্মীয় বিধান নেই; যারা এ বিষয়ে অজ্ঞ তারাই এরূপ প্রমাণের উপর বিশ্বাস করে থাকে। কারণ হাদিসটির অর্থ হল, কোন এক নবী লিখতেন, অতঃপর তাঁর লিখনের সময় ওহী এসে উপস্থিত হত। এটা অসম্ভব নয় যে, কোন কোন নবীর ওহী অবতরণকালীন সময়ের এরূপ অভ্যাস ছিল। সুতরাং যার লিখন ওই নবীর সাথে মিলবে, তা তাই হবে। অর্থাৎ এটা শুদ্ধ হবে, যদি লিখনের সাথে ওহী এসে তার শক্তি বৃদ্ধি করে। কারণ ঐ নবীরও এরূপই অভ্যাস ছিল, লিখনের সময় তাঁর নিকট ওহী এসে উপস্থিত হত। কিন্তু ওহী থেকে বিচ্যুত করে শুধু লিখনকে গ্রহণ করলে তা হতে পারে না। এটাই হাদিসের অর্থ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

যখন[১৩৭] তাদের ধারণামত তারা অদৃশ্যের সংবাদ জানার জন্য আগ্রহী হয়, তখন কোন কাগজখণ্ড, বালুকা বা আটা নিয়ে তাতে চারটি স্তর অনুসারে সারিবদ্ধভাবে

এটা জেনে রাখুন যে, জীবাত্মা সম্পর্কীয় গুহ্যতত্ত্ব জাগতিক উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। সুতরাং উক্ত জীবাত্মা কোন প্রকার নক্ষত্র বা নক্ষত্রবলয়ের প্রভাবাধীন নয় এবং তারাও এর সম্পর্কে কোন প্রকার ইঙ্গিত প্রদান করে না। নক্ষত্র ও নক্ষত্রবলয় সম্পর্কীয় সমস্যাদি জ্যোতিষশাস্ত্রে এজন্যই আলোচিত হয়েছিল, যাতে তা হতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ব্যাপার এই যে, তারা তাদের যথাস্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

এরপর বালুকা লিখনিবন্ধুদের আবির্ভাব ঘটল। কিন্তু তাঁরা নক্ষত্র ও নক্ষত্রবলয়ের প্রভাব বিচারের ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে পারলেন না। কারণ তা করতে গেলে তাঁদেরকে যন্ত্রাদির দ্বারা নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করতে হয় এবং অংক করে তার প্রভাবের হ্রাস-বৃদ্ধি সংযোজন করে নিতে হয়। এটা খুবই কঠিন কাজ। সেইজন্য তাঁরা এ বিন্দু সংখ্যার ছক আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা ধারণা করেন যার রাশি ও দিক চতুষ্টয় মিলিয়ে ষোলটি ঘর বিদ্যমান এবং তাঁরা এগুলোকে শুভ, অশুভ ও গ্রহাদির ন্যায় মিশ্রিত অবস্থা বিশিষ্ট বলে ভাগ করেছেন। তাঁরা এগুলো জন্মসংক্রান্ত ব্যাপারেই ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা এখানে বিন্দু সংখ্যার ছক মিলিয়ে বিবেচনা করেন, যেমন অন্যত্র সমস্যাদির নির্দেশ অনুসরণ করে বিচার করা হয়। কিন্তু এ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার্য উপাদানগুলো স্বাভাবিক নয়, যেমন পূর্বে আমরা এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছি।

বহু নগরবাসী, যাদের কোন কাজ নেই, তারা জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসাবে বালুকা লিখনবিদ্যার অভ্যাস করে থাকেন। তাদের দ্বারাই বালুকা লিখন বিদ্যার ভিত্তি ও তার রীতি-নীতি সম্পর্কে বহু পুস্তক লিখিত হয়েছে। আবু আবদুল্লা মুহম্মদ (ইবনে উসামন?) আজ জানাতী ও অন্যরা এ বিষয়ে কাজ করেছেন।

অনেক বালুকা লিখনবিদ তাঁদের নির্মিত ছকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অতি মানবিক উপলব্ধি লাভের চেষ্টা করেছেন। এর ফলে তাঁরা তেমনি ধরনের কিছুটা সঙ্গতি অর্জন করেছেন, যেমন সঙ্গতি অধ্যাত্ম উপলব্ধির জন্য জন্মগতভাবে অনেকের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করব। এ সকল লোক বালুকা লিখনবিদদের মধ্যে অনেকখানি উন্নত অবস্থার অধিকারী।

১৩৬. দানিয়াল বাইবেলে উল্লেখিত পুণ্যবান ব্যক্তি। হজরত ইদরিস কোরানে নবী হিসাবে উল্লেখিত হয়েছেন। তিনি খুব সম্ভব বাইবেলে উল্লেখিত ইনোস (?)।

১৩৭. এর পূর্বে রোজেনথাল পূর্বের অনুচ্ছেদটির সাথে মিশ্রিতভাবে আরও কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন। আমরা ব্যতিক্রমী অংশের অনুবাদ নিম্নে সন্নিবেশিত করছি।

www.amarboi.org

'আল্লাহ্ বলেন, আমরা আমাদের প্রেরিত পুরুষদেরকে একে অপরের উপর বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছি। কারণ, তাঁদের মধ্যে অনেকের নিকট কোন প্রকার ইচ্ছা বা আগ্রহ ব্যতিরেকেই প্রত্যাদেশসহ ফেরেশতা এসে কথা বলেছে। অন্য অনেকের মধ্যে একটা মানবিক স্পৃহা ছিল; তাঁরা মানব সমাজে বিচরণ করবার সময় অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, অনেক বাধ্যবাধকতা দেখা দিয়েছে। সুতরাং তাঁদের অন্তরসত্তা এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য অলৌকিক সত্তার প্রতি উন্মুখ হয়েছে এবং আল্লাহ্ তাঁদেরকে প্রত্যাদেশের অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন। সুতরাং এ দিক হতে বিষয়টিকে ভাগ করা যায়, তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা প্রত্যাদেশের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, অথচ তাঁদের নিকট প্রত্যাদেশ এসেছে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আবার অনেকে প্রস্তুতি নিবার পর তাঁদের নিকট প্রত্যাদেশ এসে পৌঁছেছে। ইসরাইলীদের কাহিনীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন নবী প্রত্যাদেশের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সুস্বর শোনার অভ্যাস করতেন। যদিও বিবরণটি প্রমাণসিদ্ধ নয়, তথাপি তার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। কারণ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বিশেষ গুণের দ্বারা নবুয়তের অনুগ্রহ প্রদান করে থাকেন। এক বিখ্যাত সুফী সাধকের কথা আমরা জানতে পেরেছি, যিনি আত্মিকভাবে বিভোর হওয়ার জন্য সঙ্গীত শ্রবণ করতেন। এর ফলে তিনি তাঁর আত্মিক জগৎ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পড়েন। কারণ তিনি যে পর্যায়ে অবস্থান করছিলেন, তা নবুয়ত অপেক্ষা অনেকখানি নিম্ন মর্যাদার এবং আমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই, যার জন্য একটি নির্দিষ্ট অবস্থান নেই।

যদি এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, কিছু সংখ্যক বালুকা লিখনবিদ তাদের বিন্দু সংখ্যার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত অদৃশ্য উপলব্ধির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তা হলে তারা হয়ত বা অনুভূতির জগৎ বিচ্যুত হয়ে আত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে পৌঁছতেও পারে। এর মাধ্যমে তারা দৈহিক অনুভূতিসীমা অতিক্রম করতে পারে, যেমন পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। এ ক্ষেত্রে একে ইন্দ্রজালের একটি অংশ মনে করতে হবে এবং এর তুলনা হবে অদৃশ্য উপলব্ধির জন্য অস্থি, জল, দর্পণ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ন্যায়। এর ফলে বালুকা লিখনবিদরা সেই সকল লোক হতে পৃথক হয়ে পড়বে, যারা বাহ্যানুভূতি বিলুপ্তি ব্যতীতই শুধু অনুমান ও চিন্তার দ্বারা অদৃশ্য উপলব্ধির চেষ্টা করে থাকে।

নবীদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত এ লিখনের মাধ্যমে আত্মিক যোগ স্থাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকতে পারেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও অনেকে বাহ্যানুভূতি রহিত হওয়ার জন্য উক্ত প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হতে পারে। কিন্তু এর ফলে যে ফলাফল লাভ হবে, তাতেও পার্থক্য থেকে যাবে। বালুকা লিখনবিদরা এ আত্মিক সংযোগের মাধ্যমে যা লাভ করবে, তা আত্মিক সংবাদ মাত্র। কিন্তু নবীরা তার মাধ্যমেই ফেরেশতার আগমন ও প্রত্যাদেশ লাভে ধন্য হবেন।

বালুকা লিখনবিদদের প্রক্রিয়ার সাথে কোন নবীর কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এরূপ ধারণা ও চিন্তাপ্রসূত কার্যের দ্বারা তাঁর কোন সহায়তা হবে না। সুতরাং এরূপ কার্যাদিকে তিনি কখনও ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন না। এটাও বলতে পারেন না যে, সর্বসাধারণ যে কেহ উক্ত প্রক্রিয়া গ্রহণ করলে আত্মিক সংযোগ লাভ করতে পারবে। হাদিসের বর্ণনায় যেমন আছে, যার লিখন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, তা তাই; এর অর্থ এই যে, তার লিখন তখনই শুদ্ধ হবে, যখন তার সাথে নবীর অনুরূপ প্রত্যাদেশ এসে যুক্ত হবে। কারণ উক্ত নবী, তাঁর এ লিখন প্রক্রিয়ার সময়ই তাঁর নিকট প্রত্যাদেশ এসে উপস্থিত হবে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, উক্ত নবী এই প্রকার বালুকা লিখন পদ্ধতির মাধ্যমেই এমন এক আত্মিক স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, যদ্দারা এ প্রক্রিয়ার বাহ্যিক ব্যবহার ছাড়াই এমন সকল সংবাদ প্রদান করতেন, যা প্রদান করবার জন্য বালুকা লিখনবিদরা চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু নবীসুলভ প্রত্যাদেশের সংযুক্তি হতে শুধু লিখন পদ্ধতিকে বিচ্যুত করে নিলে, তার মধ্যে সেই যথার্থতা অবশিষ্ট থাকে না। এটাই হাদিসটির অর্থ। আল্লাহ্ই অধিকতর উত্তম জ্ঞাতা।

www.amarboi.org

বিন্দুগুলো সাজায়। পুনরায় তাকে চারবার পর পর সাজালে ষোলটি সারি দেখা দেয়। অতঃপর তারা যুগ্ম বিন্দুগুলোকে ছড়িয়ে দেয় এবং প্রত্যেক সারি থেকে যুগ্ম-অযুগ্ম যা কিছুই অবশিষ্ট থাকে, তা স্তরানুসারে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে রাখে। এর ফলে চারটি ছক দেখা দেয় এবং তাদেরকে পর পর আগত সারিতে বিন্যস্ত করে। পরে এগুলো থেকে পূর্বের ছকগুলোর পার্শ্বে প্রতিটি স্তর, বিপরীতমুখী ছকের অবস্থান ও তদন্তর্গত যুগ্ম-অযুগ্ম বিন্দুর বিবেচনায় আরও চারটি ছকের জন্ম দেয়। এভাবে এক সারিতে আটটি ছক সজ্জিত হয়ে উঠে। অতঃপর এ ছকগুলো থেকে প্রতি দুটির নিচে উক্ত ছকদ্বয়ের প্রতিটি স্তরের যুগ্ম-অযুগ্ম বিন্দুর অনুপাতে একটি করে ছক বিন্যস্ত করে এবং এভাবে পূর্বোক্ত আটটি ছকের আরও চারটি ছকের জন্ম হয়। পুনরায় তারা শেষোক্ত চারটির প্রতি দুটির নিচে অনুরূপভাবে আরও দুটি ছক বিন্যাস্ত করে এবং শেষোক্ত দুটির নিচে আরও একটি ছকের জন্ম দেয়। পুনরায় এ পঞ্চদশ ছকটি থেকে প্রথম ছকটির সাথে আরও একটি ছক তৈরি করে ষোলটি ছক পূর্ণ করে।[১৩৮] অতঃপর তারা উক্ত ছকগুলোর লিখন অনুসারে তাদের আকৃতিগত শুভাশুভের প্রকৃতি বিচার করে এবং সৃষ্ট জগতের বিভিন্ন বস্তুর উপর তাদের দৃষ্টি, অনুপ্রবেশ, মিশ্রণ ও ইঙ্গিতের ধারা নির্ধারণ করে। সে এক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ।

মানব সমাজে এ বিদ্যার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। এ সম্পর্কে নানা প্রকার পুস্তক লিখা হয়েছে এবং পূর্ব ও উত্তরসূরিদের মধ্যে বহু জ্ঞানী ব্যক্তি এ বিদ্যায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। পাঠক আপনি যেমন দেখেছেন, এটা নির্দেশনা ও কপোল কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যথার্থ কথা হল, যে বিষয়টি আপনার চিন্তায় সর্বদা জাগরূক থাকা প্রয়োজন, তা এ যে, অদৃশ্যের সংবাদ কোন প্রকার বিদ্যার দ্বারা কখনই জানা যায় না।

হাদিসে উক্ত বালুকা লিখন পদ্ধতির ধর্মানুমোদিত হওয়ারও কোন ইঙ্গিত নেই। কিংবা এটাও নেই যে, এ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হলে আত্মিক সংযোগ স্থাপন সম্ভবপর, যেমন নগরবাসী কিছু সংখ্যক বালুকা লিখনবিদ করে থাকে। অনেকে এ হাদিসের মর্মানুসারে এ ধারণা পোষণ করতে পারে যে, যেহেতু হাদিসে তা নবীর কার্য বলে উল্লেখিত হয়েছে, সুতরাং তা ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য। কেননা শাস্ত্রবিদদের অনেকেই এ মত পোষণ করেন যে, পরবর্তীদের ধর্মীয় বিধি-বিধান উত্তরাধিকাররূপে আমাদের পালনীয়রূপে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এ মতকেও এখানে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ পূর্ববর্তী নিয়মাবলি তখনই গৃহীত হয়ে থাকে, যখন প্রত্যেক জাতির মধ্যে আবির্ভূত নবীগণ তাকে গ্রহণীয় বলে মত প্রকাশ করেন। এই হাদিসে এ ধরনের কোন বক্তব্য নেই, এতে যা আছে, তা মোটের উপর এই যে, লিখন প্রণালীটি কোন নবীর অভ্যাস মাত্র ছিল। কিন্তু তা যে উক্ত নবীর সময়ে ধর্মীয় বিধানে পরিণত হয়েছিল, এমন কোন কিছু নেই। সুতরাং একে না ঐ নবীর অনুসারীদের জন্য ধর্মীয় বিধান বলে মনে করা যায়, না তাকে সর্বসাধারণের জন্য পরবর্তীকালেও পালনীয় বলে গৃহীত হতে পারে। হাদিসের অর্থ এই যে, এ বিশেষ প্রণালীটি উক্ত নবীর সময়ে একটি অভ্যাস হিসাবে হয়ত অস্তিত্ববান, কিন্তু তজ্জন্যই এটা সমগ্র মানব সমাজের জন্য পালনীয় বিধান বলে গণ্য হতে পারে না। এটাই আমাদের সমুদয় বক্তব্য, যা আমার এ উপলক্ষে বিষয়টি পরিষ্কার করবার জন্য তুলে ধরলাম। আল্লাহ্‌ই যথার্থ অনুপ্রেরণা প্রদান করেন।

১৩৮. এ ছকগুলোর একটি নকশা আমরা রোজেনথাল হতে নিম্নে প্রদান করছি।

www.amarboi.org

এটা জানবার একমাত্র উপায় হল, ঐ সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়া, যাঁরা জন্মগতভাবে অনুভূতির জগৎ থেকে আত্মিক জগতের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। এ জন্যই জ্যোতিষশাস্ত্রবিদরা এ দলের সকলকেই 'শুক্রপন্থী' বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ তাদের ধারণামতে শুক্রগ্রহের প্রভাবজাত বলে এ সকল ব্যক্তি অদৃশ্য সংবাদ জানবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। সুতরাং এ বিদ্যার লিখন ও অন্য যা কিছু আছে, যদি তাতে দৃষ্টিপাতকারী ঐ বিশেষ স্বভাবের হয় এবং এ সকল বিষয় তথা বিন্দু, অস্থি কিংবা অন্য কিছুকে অনুভূতির জগৎ থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য ব্যবহার করে জীবাত্মাকে যে কোন প্রকার আত্মিক সংযোগের দ্বারস্থ করতে পারে, তা হলে তা নুড়ি চালনা, পশুর হৃদপিণ্ড, দর্পণ ইত্যাদি স্বচ্ছ পদার্থের প্রতি দৃষ্টি স্থাপনের সাথে তুলনীয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। যদি এরূপ কোন কিছু না হয়, বরং সে এটা দ্বারা অদৃশ্য সংবাদ জানতে ইচ্ছা করে এবং ভাবে যে, তা তাকে উপকৃত করবে, তা হলে এরূপ কথা ও কার্য থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন।[১৩৯]

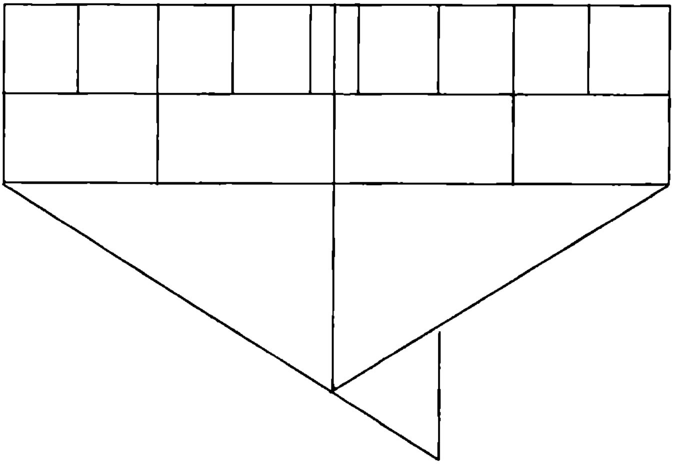

যাঁরা জন্মগতভাবে অদৃশ্য উপলব্ধি প্রকৃতিতে সুসজ্জিত, তাঁরা যখন বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য জানতে আগ্রহী হন, তখন তাঁদের মধ্যে সাধারণ অবস্থা থেকে দূরে সরে যাওয়ার চিহ্নাদি প্রকাশ পায়; যেমন তাঁরা হাই তোলেন, হাত-পা ছড়িয়ে দেন এবং অনুভূতির জগতে বের হয়ে যান। এ বিষয়ে তাঁদের শক্তি ও দুর্বলতা অনুসারে উক্ত অবস্থাদির তারতম্য ঘটে থাকে। যার মধ্যে এ অবস্থার কোন কিছু পাওয়া যায় না, তার সাথে অদৃশ্য উপলব্ধির কোন সম্পর্ক নেই। সে শুধু তার নিজের মিথ্যাকে সম্প্রসারিত করতে সচেষ্ট রয়েছে।

১৩৯. কোরান ২, ১৪২, ২১৩।

www.amarboi.org

নীম গণনা

এদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা অদৃশ্য উপলব্ধির জন্য এমন সকল নিয়ম নীতি নির্ধারণ করেছেন, যার সাথে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় জীবাত্মার আত্মিক উপলব্ধির কোন সঙ্গতি নেই। কিংবা বাতলিমুসের ধারণা অনুযায়ী নক্ষত্রের প্রভাবাদির উপর নির্ভরশীল কোন অনুমানচিন্তার ব্যাপারও নয়; এমনকি দৈবজ্ঞরা যে ধরনের কল্পনা ও অনুমানের উপর নির্ভর করেন, এগুলো তাও নয়; বস্তুত ঐ সকল নিয়ম-নীতি কতকগুলো অলীক কল্পনা মাত্র, যদ্বারা দুর্বল বুদ্ধির লোকদেরকে ফাঁদে ফেলা হয়। আমি এ সকল বিষয়ের ততটুকুই বর্ণনা করব, যা গ্রন্থকারগণ লিখেছেন এবং বিশিষ্ট লোকেরা তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

এ সকল নিয়ম-নীতির মধ্যে একটি হল এক বিশেষ গণনারীতি, যাকে তারা 'নীম গণনা' আখ্যা দিয়েছেন। এটা আরস্তু (এ্যারিস্টটল)-এর নামে প্রচলিত 'কিতাবুস্ সিয়াসতে'র[১৪০] শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে। এটা দ্বারা যুদ্ধরত রাজন্যবর্গের মধ্যে বিজয়ী ও বিজিতের সংবাদ জানা যায়। এটা গণনার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়ের নামের বর্ণগুলোর সংখ্যা মান 'আবজদ' হিসাবের[১৪১] নির্ধারিত সূত্র অনুযায়ী বের করতে হয়। এ সূত্রে একক, দশক, শতক, সহস্র এবং এক থেকে সহস্র পর্যন্ত বর্ণভিত্তিক সংখ্যা দেয়া আছে। এভাবে একজনের নামের বর্ণগুলোর সংখ্যা বের করে যোগ করতে হবে এবং অন্যজনেরও অনুরূপ যোগফল বের করে যে মোট দুটি সংখ্যা হবে, তা থেকেই পৃথকভাবে নয় নয় করে বাদ দিতে হবে। এর পর উভয় সংখ্যার অবশিষ্ট যা থাকে, তার মধ্যে পৃথকভাবে লক্ষ করে দেখতে হবে। এতে যদি উভয় সংখ্যা বিভিন্ন হয় এবং এটা সত্ত্বেও উভয়েই যুগ্ম হয় অথবা উভয়েই অযুগ্ম হয়, তা হলেই কম মানের সংখ্যার অধিকারী বিজয়ী হবে। আর যদি তার একটি সংখ্যা যুগ্ম এবং অন্যটি অযুগ্ম হয়, তা হলে অধিক মানের সংখ্যার অধিকারী বিজয়ী হবে। অন্যদিকে যদি উভয় সংখ্যা সমান হয় এবং যুগ্ম হয়, তা হলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বিজয়ী হবে। অন্যথায় উভয় সংখ্যা অযুগ্ম হলে জিজ্ঞাসাকারী বিজয়ী হবে। এ ব্যাপারে দুই ছত্র পদ্য উল্লেখ করা হয়, যা মানুষের মধ্যে বহুল প্রচারিত। ছত্র দুটি নিম্নরূপ :

> যদি দেখি যুগ্ম ও অযুগ্ম সমান, তা হলে অল্পমান
> ও বেশি মান বিভিন্নতায় বিজয়ী হবে।
> জিজ্ঞাসিত জয়ী যদি যুগ্ম সমান হয়,
> এবং অযুগ্ম সমান হলে জিজ্ঞাসাকারী বিজয়ী হবে।

---

১৪০. 'সেক্রেটাম সেক্রেটোরাম' নামীয় গ্রন্থটি এ্যারিস্টটলের বলে ধারণা করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কীয় এ গ্রন্থে এ বিষয়টি বর্তমান। অবশ্য আব্দুর রহমান বদবী কর্তৃক এর আরবি সংস্করণে এবং রোজার বেকনের ইংরেজি অনুবাদে নীম গণনার কোন উল্লেখ নেই।

১৪১. 'আবজদ' শব্দটি আরবি বর্ণমালার প্রথম দিকের চারটি বর্ণের সমষ্টি। উক্ত বর্ণমালার প্রতিটির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যামান নির্ধারিত রয়েছে। তাকেই সাধারণভাবে আবজদ হিসাব বলে উল্লেখ করা হয় (পরবর্তী টীকা দ্র:)।

www.amarboi.org

অতঃপর তারা নয় দ্বারা বিভক্ত হওয়ার পর অবশিষ্ট সংখ্যার বর্ণগুলোর অবস্থা জানার জন্য একটি বিশেষ নিয়মের প্রবর্তন করেছেন, যা 'নয় বাদ' নামে তাদের নিকট পরিচিত। এর রূপ এ যে, তারা সমস্ত একক সংখ্যাকে চারটি স্তরে স্থাপন করেছেন। যেমন—'আলিফ' (আ) একক বোঝাবে, 'ইয়া' (ই) দশক বোঝাবে ও এটা দশকাদির স্তরে একক, 'ক্বাফ' (ক) শতক বোঝাবে ও এটা শতকাদির স্তর একক এবং 'শিন' (শ) সহস্র বোঝাবে ও এটা সহস্রাদির স্তরে একক। সহস্রের পরে সংখ্যা বোঝাবার জন্য আর কোন বর্ণ নেই। কারণ 'শিন'ই—'আবজদ' হিসাবের শেষ বর্ণ। অতঃপর তাঁরা উক্ত চারটি বর্ণকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়েছেন; এর ফলে চার বর্ণবিশিষ্ট একটি শব্দ তৈরি হয়েছে। তা হল 'আইক্কশ'। পুনরায় তাঁরা এভাবে দুই সংখ্যা নির্দেশকারী বর্ণগুলোকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন এবং সহস্রের স্তরটি ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ সহস্রবোধক বর্ণটিই আবজদের শেষ বর্ণ। এর ফলে তিন স্তরের দুই বোধক বর্ণের সংখ্যা মোট তিনটি। তারা হল, 'বে' (ব) এককের স্তরে দুই বোধক, 'কাফ' (ক) দশকের স্তরে দুই বোধক অর্থা বিশ এবং 'রে' (র) শতকের স্তরে দুই বোধক অর্থাৎ দুইশ। এ তিনটি বর্ণ পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে তাঁরা 'বকর' তৈরি করেছেন। এভাবে তাঁরা তিন বোধক শব্দ সাজিয়ে 'জলস' করেছেন এবং এভাবে আবজদের শেষ বর্ণটি পর্যন্ত সাজিয়ে মোট নয়টি শব্দ তৈরি হয়েছে, যদ্বারা সমস্ত একক সংখ্যা শেষ হয়েছে। এ শব্দগুলো হল, আইক্কশ, বকর, জলস, দমত, হনছ, ওসখ, ঝআদ, হ্বফয ও ত্বদ্বগ[১৪২]। এরা সংখ্যার ক্রমানুসারে সজ্জিত। প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক বর্ণগুলো একই স্তরের সংখ্যাবোধক। যেমন একের জন্য আইক্কশ, দুইয়ের জন্য বকর, তিনের জন্য জলস এবং এভাবে নয়ের জন্য 'ত্বদ্বগ' ও এর স্তরও নয়। তাঁরা যখন নামের বর্ণ সংখ্যা অনুসন্ধান করেন তখন দেখেন উক্ত বর্ণটি এ সকল শব্দের মধ্যে কোনটিতে পড়ে; সুতরাং সেই শব্দের মান অনুযায়ী সংখ্যা গ্রহণ করে সমুদয় সংখ্যাকে নামের পরিবর্তে একত্র করেন। এতে যদি নয়ের অপেক্ষা বেশি হয়, তা হলে নয়ের অতিরিক্ত অবশিষ্ট সংখ্যাটি গ্রহণ করেন। নতুবা যেমন আছে তেমনই। অতঃপর অন্য নামটির জন্য অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ

---

১৪২. আবজদ হিসাবের মধ্যে অঞ্চল বিশেষে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। যেমন :

১ নং হিসাব—এটা ইবনে খলদুন কর্তৃক উল্লেখিত মাগরিব অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। এটা নিম্নরূপ—

আলিফ, বে, জিম, দাল, হে, ওয়াও, ঝে, হ্বে, ত্বয়, ইয়া, কাফ, লাম, মিম, নুন, ষোয়াদ,

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০

আইন, ফে, দ্বোয়াদ, কফ, রে, সিন, তে, ছে, খে, যাল, য্বয়, গাইন, শিন।

৭০ ৮০ ৯০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ ৫০০ ৬০০ ৭০০ ৮০০ ৯০০ ১০০

২ নং হিসাব—এটা পূর্বাঞ্চল মিশর, ইরাক সিরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচলিত। এটা নিম্নরূপ :

আলিফ, বে, জি, দাল, হে, ওয়াও, ঝে, হ্বে, ত্বয়, ইয়া, কাফ, লাম, মিম, নুন, সিন,

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০

'আইন, ফে, যোয়াদ, কাফ, রে, শিন তে, ছে, খে, যাল, দ্বোয়াদ, য্বয়, গাইন।

৭০ ৮০ ৯০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ ৫০০ ৬০০ ৭০০ ৮০০ ৯০০ ১০০০

উপরোক্ত উভয় হিসাব জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ ও ঐতিহাসিকরাও ঘটনাবলি ও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ বর্ণনায় ব্যবহার করে থাকেন। এতে তারিখের সংখ্যা হতে স্মরণযোগ্য শব্দ তৈরি হয়। যেমন ইবনে খলদুনের জন্ম তারিখ হল 'শলব' (শসলব)।

www.amarboi.org

করেন এবং আমরা পূর্বে যেমন বলেছি, তেমনিভাবে নয়ের অবশিষ্ট সংখ্যা দুটিকে মিলিয়ে দেখেন।

এ নিয়মের রহস্য খুবই সাধারণ। তা এ যে, ক্রমানুপাতে সজ্জিত শব্দগুলোর বর্তমান নয়ের দ্বারা বিভক্ত হবার পর ক্রমানুসারে একই হয়। এটা যেন স্তরানুসারে দশের গুণিতকের জন্যই বিশেষভাবে নিয়োজিত। এর ফল এ দাঁড়ায় যে, এ দুই, বিশ, দুইশ ও দুই হাজারের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কারণ প্রতিটির ভাগ শেষ দুই। এভাবে তিন, ত্রিশ, তিনশ ও তিন হাজার—এদের প্রত্যেকটির ভাগাবশেষ তিন। পরপর এ শব্দগুলো সাজাবার উদ্দেশ্যই হল দশের গুণিতককে প্রকাশ করা, অন্য কিছু নয়। এভাবে তাঁর প্রতি শব্দের বর্ণগুলোকে পর্যায়ক্রমে একক, দশক, শতক ও সহস্রের জন্য নির্ধারিত করেছেন। পরবর্তী শব্দের বর্ণগুলো অনুরূপভাবে একক, দশক, শতক যাই হোক না কেন পরবর্তী সংখ্যা নির্দেশ করবে। এভাবে নামের বর্ণগুলোর পরিবর্তে সংখ্যা গ্রহণ করে তাকে একত্র করেন, যেমন পূর্বে বলেছি।

এটাই সেই প্রক্রিয়া, যা বহু প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। আমাদের উস্তাদদের মধ্যে অনেককে দেখেছি, তাঁরা মনে করেন, অনুরূপভাবে সাজানো অন্য আরও নয়টি শব্দ আছে, যা অধিকতর শব্দ। সেখানে অনুরূপভাবে মোট সংখ্যা থেকে নয়কে বারবার বাদ দেয়া হয়। ঐগুলো হল, আরব ইসক্বক, জঝলত্ব, মদওষ, হফ, তহ্বযন, আশ, খগ ও তদ্বয্—সংখ্যার অনুপাতে সাজানো নয়টি শব্দ। এদের প্রতিটি শব্দ তার পর্যায় অনুসারে সংখ্যার অধিকারী। এদের মধ্যে তিন বর্ণ, চারবর্ণ ও দুইবর্ণবিশিষ্ট শব্দ বিদ্যমান। এতে দেখা যায়, এগুলো কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মের অধীন নয়। কিন্তু আমাদের উস্তাদগণ এটা মাগরিবের বিশিষ্ট গণনাশাস্ত্রবিদ, বর্ণতত্ত্ব বিশারদ ও জ্যোতিষশাস্ত্রী আবুল আব্বাস ইবনে বান্নার।[১৪৩] নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বরাত দিয়ে বলেছেন যে, নীম গণনায় এ সকল শব্দ 'আইকশ' ইত্যাদি থেকে অধিকতর শুদ্ধ ফল দেয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন, কী করে তা সম্ভব হয়।

এদের এ সবগুলোই অদৃশ্য উপলব্ধির জন্য ব্যবহৃত ভিত্তিহীন ও তাৎপর্যহীন প্রক্রিয়া মাত্র। যে গ্রন্থটিতে নীম গণনা পাওয়া গেছে, তাকে আরস্তুর (এ্যারিস্টটল) সাথে সম্পর্কযুক্ত করা—যথার্থ নয়। কারণ তাতে এমন বিষয় আছে, যা যথার্থতা বা প্রমাণ কোনটিরই অনুসারী নয়। পাঠক যদি কিছুটা দৃঢ় চিত্তের অধিকারী হন, তা হলে উক্ত গ্রন্থের বিষয় বিচার করে দেখলেই উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ পাবেন।

অদৃশ্য উপলব্ধির জন্য ব্যবহৃত এ সকল নিয়মনীতি সংবলিত বিদ্যার মধ্যে অন্য একটি হল, যায়েরজা,[১৪৪] যাকে পৃথিবীর যায়েরজা বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটা মাগরিবের শ্রদ্ধেয় সুফী সাধক আবুল আব্বাস আহমদ আস্ সবতীর[১৪৫] নামের সাথে

---

১৪৩. আহমদ ইবনে মুহম্মদ; জীবনকাল (১২৮৫-১৩২১ খ্রি:)। ইবনে খলদুন অন্যত্র তাঁকে গণিতবিদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

১৪৪. এর মূল সম্ভবত ফারসি 'যায়েচা' যার অর্থ কোষ্ঠী; 'র'টি বর্ণাগম বলে মনে করা হয়।

১৪৫. তাঁর নামের সাথে 'সিদি' যোগ করে সিদি আহমদও বলা হয়। অবশ্য এতে আহমদ ইবনে জাফর (৫৪০-৬০১ হিজরির) এর সাথে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

www.amarboi.org

সংযুক্ত। তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে আল-মোহেদ সম্রাট আবু ইয়াকুব আল-মনসুরের শাসন আমলে মারাকেশে জীবিত ছিলেন। এ প্রক্রিয়াটি শিল্পকর্ম হিসাবে অদ্ভুত। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তার হেঁয়ালীপূর্ণ সুপরিচিত পদ্ধতির সাহায্যে রহস্য উদ্‌ঘাটনে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এর ফলে তাঁরা এ পদ্ধতির রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত ও গুহ্যতত্ত্বকে উন্মোচন করবার জন্য অত্যধিক উৎসাহবোধ করেন।

যে প্রক্রিয়ায় তাঁরা এতে নিয়োজিত হন, তার গঠন প্রকৃতি হল এই যে, এতে একটি বৃহদাকার বৃত্তের অন্তর্গত সমদূরত্বে অবস্থিত আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত থাকে। এগুলো কক্ষপথ, মৌল উপাদান, বস্তুজগৎ, আত্মাজগৎ এবং সৃষ্টিজগতের অন্যান্য বিষয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি বৃত্ত তার কক্ষের বিভাগ অনুসারে হয় রাশিচক্র নয় মৌল উপাদান ও অন্যান্য বিষয়ের দিক থেকে বিভক্ত। এদের প্রতিটি ভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখাকেন্দ্রের দিকে গমন করছে, এগুলোকে তাঁরা 'তন্তু' নামে আখ্যায়িত করেন। প্রতিটি তন্তুর উপর পর্যায়ক্রমিক বর্ণাদি নির্ধারিত রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বর্তমানকালে মাগরিবে গণনা ও পুথিপত্র সংরক্ষকদের কার্যে ব্যবহৃত সংখ্যার আকৃতি, যাকে 'রসুমুয যিমাম' বলা হয়ে থাকে এবং কিছু সংখ্যক যায়েরজার ভিতরে 'রুসমুল গুবার' নামে সুপরিচিত হয়।[১৪৬] এ বৃত্তগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাম ও সৃষ্ট বস্তুর স্থান লিপিবদ্ধ থাকে। এ সকল বৃত্তের অপর পৃষ্ঠায় একটি নকশা বিদ্যমান, যাতে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পরস্পর সংলগ্ন বিভক্ত বহু ঘর রয়েছে। এগুলো প্রস্থের দিক থেকে সংখ্যায় পঞ্চান্ন এবং দৈর্ঘ্যের দিক থেকে একশ একত্রিশ। এ নকশার পার্শ্বস্থিত ঘরগুলো কোথাও বিভিন্ন সংখ্যা, আবার কোথাও বিভিন্ন বর্ণের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং কোথাও বা ঘরগুলো শূন্য। এ সকল সংখ্যার বিশেষ স্থানে অবস্থান এবং এ সকল পূর্ণ ঘর ও শূন্যঘরের জন্য নির্দিষ্ট অংশাদি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। যায়েরজার নিম্নভাগে আকারবিশিষ্ট 'লামে'র অন্ত্যমিলে রচিত কিছু সংখ্যক পদ্যছত্র বিদ্যমান যাতে উক্ত যায়েরজা থেকে উদ্দিষ্ট বিষয় বের করবার নির্দেশাদি রয়েছে। কিন্তু এর সবগুলোই স্পষ্টতা ও সরলতার পরিবর্তে হেঁয়ালীতে পরিপূর্ণ। যায়েরজার কোন কোন কোণে মাগরিবের বিশিষ্ট ভবিষ্যবিশারদদের নামযুক্ত কবিতার ছত্র বিদ্যমান। যেমন লামতুনা সাম্রাজ্যকালীন সেভিলার বিশিষ্ট জ্ঞানী মারেক ইবনে ওয়াহিবের[১৪৭] পদ্যাংশ। তা নিম্নরূপ :

> একটি বিরাটকার তোমার মধ্যে বহন করছে, অতএব সংরক্ষণ কর
> উত্থাপিত সমুদয় সন্দেহ, যা শুধু অধ্যবসায়ই সহজ করতে পারে।

এ যায়েরজা ও অনুরূপ অন্যান্য প্রক্রিয়ায় প্রশ্নের উত্তর বের করতে এ পদ্যাংশটি তাদের মধ্যে খুবই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাঁরা যখন জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলির মধ্য থেকে কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হন, তখন তাঁরা উক্ত প্রশ্নটিকে লিখে তার বর্ণ

---

১৪৬. রসুমূল গুবার—ভারতীয় গাণিতিক প্রতীক।
১৪৭. জীবনকাল ৪৫৩-৫২৫ (১০৬১-১১৩১ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

বিশ্লেষণ করেন। এর পর উক্ত সময়ে উদীয়মান রাশি ও তার অবস্থান নির্ণয় করেন। অতঃপর যায়েরজার অন্তর্গত উক্ত উদীয়মান রাশির সন্নিহিত তন্তু, যা তার প্রারম্ভ থেকে কেন্দ্রের দিকে গেছে, তা খুঁজে বের করেন। এর পর উক্ত উদীয়মান রাশির সম্মুখভাগস্থ বেষ্টনকারী বৃত্ত দেখেন। পরে উক্ত তন্তুর উপর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণাদি এবং তন্তু ও বৃত্তের মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলো গ্রহণ করেন। এর সবগুলোকে আবজদের হিসাব অনুসারে বর্ণাদিতে পরিণত করে থাকেন। কখনও তাতে একককে দশকে ও দশককে শতকে এবং তার বিপরীত প্রক্রিয়ায় যেমনভাবে তাদের নিয়মাবলি অনুমোদন করে, তেমনভাবে পরিবর্তিত করেন। এভাবে সংগৃহীত বর্ণাদিকে প্রশ্নের বর্ণের সাথে স্থাপন করে তার সাথে উদীয়মান রাশির দিক থেকে পর্যায়ক্রমে তৃতীয় রাশির সন্নিহিত তন্তুর উপরে লিখিত সমুদয় বর্ণ ও সংখ্যা যোগ করেন এবং এ যোগের ক্ষেত্রে উক্ত তন্তুকেই আরম্ভ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়, তার সম্মুখস্থ বেষ্টনকারী বৃত্তকে নয়। এ স্থানেও পূর্বানুরূপ সংখ্যাগুলোকে আবজদের হিসাবে বর্ণে পরিণত করা হয় এবং অপর বর্ণগুলোর সাথে এগুলোকে যোগ করা হয়। অতঃপর তাদের প্রক্রিয়ার ভিত্তি ও নিয়ম সংবলিত সেই পদ্যাংশটির বর্ণগুলোকে বিশ্লেষণ করে বের করেন। এটা পূর্বোল্লেখিত মালেক ইবনে ওয়াহিবের পদ্য। এভাবে বিশ্লেষিত বর্ণগুলোকে এক পার্শ্বে রাখেন। অতঃপর উদীয়মান রাশির অবস্থানের সংখ্যাটির সাথে তার ভিত্তি সংখ্যাকে গুণ করেন। এখানে ভিত্তি বলতে তাদের নিকট অবস্থান স্তরের শেষ থেকে রাশির দূরত্বকে বোঝায়। কিন্তু এটা গণনাবিদদের শাস্ত্রে উক্ত ধারণার বিপরীত অবস্থান স্তরের আরম্ভ থেকে ধরা হয়। যাহোক, উক্ত গণিত সংখ্যাকে পুনরায় অন্য একটি সংখ্যার দ্বারা গুণ করা হয়, তাকে তারা বৃহৎ ভিত্তি ও মূলচক্র বলে অভিহিত করে থাকেন। এর পর এভাবে গুণের দ্বারা সংগৃহীত সংখ্যা সমষ্টিকে তাঁরা নির্দিষ্ট নিয়মে, উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় ও নির্ধারিত চক্রে, যা তাদের নিকট সুপরিচিত, উক্ত নকশার ঘরগুলোতে অনুপ্রবিষ্ট করান এবং তা থেকে কিছু সংখ্যকের বর্ণ বের করেন ও অন্য কিছু সংখ্যক পরিত্যাগ করেন। অতঃপর সংগৃহীত বর্ণগুলোকে তাদের নিকট রক্ষিত পদ্যাংশের বর্ণগুলোর সাথে তুলনা করেন এবং তথা থেকে একটি নির্দিষ্ট বর্ণ সংখ্যাকে প্রশ্নের ও তার সংশ্লিষ্ট বর্ণাদির সাথে মিশ্রিত করেন। এর পর একটি নির্দিষ্ট বর্ণ সংখ্যার দ্বারা, যাকে তাঁরা চক্র বলে থাকেন, উক্ত বর্ণগুলোকে ভাগ করেন এবং প্রতিটি চক্র যে বর্ণের নিকট শেষ হয়, তাকে বের করে আনেন। এভাবে তাঁদের নিকট নির্ধারিত চক্র সংখ্যার দ্বারা একে বার বার আবর্তিত করা হয়। এ প্রক্রিয়ার শেষ কতকগুলো বিভিন্ন বর্ণ বের হয়ে আসে এবং এগুলো পর পর সাজিয়ে কিছু সংখ্যক শব্দ একটি পয়ারে রূপান্তরিত হয়, যা ছন্দ ও অন্ত্যমিলের দিক থেকে পূর্বোক্ত মালেক ইবনে ওয়াহিবের পদ্যাংশের সাথে তুলনীয়। আমরা এর অবশিষ্ট বিশদ বর্ণনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যায়ে 'যায়েরজা' অনুশীলনের তথ্যাদি পরিবেশনের সময় প্রদান করব।

আমরা এমন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখেছি, যাঁরা অদৃশ্য সংবাদ সংগ্রহের জন্য উপরোক্ত প্রক্রিয়ার উপর ব্যগ্রতার সাথে ঝুঁকে পড়েন এবং তাঁরা মনে করেন যে, প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে বর্ণনার দিক থেকে যে সামঞ্জস্য দেখা যায়, তা যথার্থই বাস্তবের সাথে

www.amarboi.org

সামঞ্জস্যের নামান্তর। কিন্তু তা ঠিক নয়। কেননা, পাঠক, আপনি লক্ষ করেছেন যে, কোন প্রকার শিল্পকৌশল দ্বারা অদৃশ্যকে উপলব্ধি করা যায় না। এর মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তরের ক্ষেত্রে যে সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়, তা উভয়ের বর্ণনার মধ্যকার সামঞ্জস্য ও বোধগম্যতা মাত্র, যার ফলে উত্তর প্রশ্নের ধারা অনুসারে সরল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এটাও এ শিল্পকর্মের মধ্যে প্রশ্ন ও তত্ত্বর অন্তর্গত বর্ণসমূহের বিশ্লেষণ, কাল্পনিক সংখ্যাগুলোর গুণফলকে নকশার ঘরসমূহে সংস্থাপন, ঘরগুলো থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যা বের করা ও ভাগ করা, নির্দিষ্ট সংখ্যক চক্রের সাহায্যে তাকে বারবার আবর্তিত করা এবং লব্ধ সমুদয় বর্ণকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে পদ্যাংশের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ার সততা সম্পর্কে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অনেক সময় অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনুরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান করে অনেক অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হতে পারেন। এস্থলে অজ্ঞাতকে জানার জন্য জ্ঞাত বিষয়াদির নিজের মধ্যেই তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তুলনা বিদ্যমান থাকে এবং তাকে লাভ করবার পথও সেই তুলনামূলক অনুপাত থেকে বের হয়ে আসে। বিশেষভাবে সাধনাকারীদের পন্থার উল্লেখ করা যায়। তাতে বুদ্ধিকে অনুমান গ্রহণের জন্য শক্তিশালী করা হয় এবং চিন্তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ বিষয়ের বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে বহুবার এসেছে।

সম্ভবত এ কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ যায়েরজা সম্পর্কীয় ব্যাপারটিকে সাধকদের সাথে সংযুক্ত করা হয়। যেমন আস্সবতীর কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এর অন্য একটি রূপও দেখতে পেয়েছি, যা সহল ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত।[১৪৮] আমার জীবনের শপথ, এটা কি আশ্চর্য প্রক্রিয়া, কি অদ্ভুত হেঁয়ালী! এতে নির্গলিত উত্তরের মধ্যে তাকে পদ্যাকারে উপস্থিত করার রহস্যটির মধ্যেই বুঝতে পেরেছি, তা উক্ত পদ্যাংশের বর্ণাদির সাথে তুলনা করার প্রচেষ্টা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। এ জন্যই উক্ত পদ্যটি প্রক্রিয়ার পদ্যাংশের অনুরূপ ছন্দ ও অন্ত্যমিলে গঠিত হয়। আমরা তাদের মধ্যে প্রচলিত আরও একটি প্রক্রিয়ার কথা জানি, যাতে উক্ত পদ্যাংশের সাথে উত্তরকে তুলনা করা হয় না, সে কারণেই তা পদ্যও হয় না। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আমাদের বর্ণনা পাঠক দেখতে পাবেন।

বহুলোক এ প্রক্রিয়ার সত্যতা ও তার উদ্দিষ্ট বিষয়ের সংবাদ দানের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন, এগুলো অশুদ্ধ ব্যাপার এবং একান্তই স্বকপোল কল্পনা ও ধারণার সমষ্টি মাত্র। কারণ প্রক্রিয়ায় রত ব্যক্তি প্রশ্ন ও তত্ত্বর মধ্যকার বর্ণগুলোর সাহায্যে নিজের ইচ্ছা মতই পদ্য তৈরি করে থাকে এবং এরূপ প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কোন প্রকার অনুপাত ও নিয়ম সুনির্দিষ্ট নেই। সে এভাবে পদ্য তৈরি করে মনে করে বিষয়টি যথার্থই সুদৃঢ় পন্থায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। অথচ এ মনে করা একান্তই একটা বিকৃত ধারণামাত্র। সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে তুলনামূলক জ্ঞানের অভাবই অনুরূপ ধারণার জন্ম দেয় এবং উপলব্ধি ও বুদ্ধির মধ্যকার পার্থক্যের অভাবও

১৪৮. সহল ইবনে আব্দুল্লাহ্ আওস্তরী—খ্রিস্টীয় নবম শতকের একজন বিখ্যাত সুফীসাধক।

www.amarboi.org

এর সাথে যুক্ত হয়। কেননা উপলব্ধির যে কোন মাধ্যম যদি উপলব্ধির দিক থেকে ফলপ্রসূ না হয়, তা হলে তাকে অস্বীকার করাই বিধেয়। এ প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার জন্য আমাদেরকে এর অন্তর্গত শিল্পকর্মটি বিচার করে দেখলেই চলবে। এটা একটি অকাট্য অনুমান; এর কার্যপ্রণালী সুদৃঢ় ও নির্দিষ্ট নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত; এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যে কোন ব্যক্তি, যিনি এ প্রক্রিয়া অনুশীলন করবেন তার মধ্যে যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণ মেধা ও অনুমান শক্তি থাকে, তা হলে তার পক্ষে এ বক্তব্য অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কারণ এমন অনেক সংখ্যাগত হেঁয়ালী আছে, যাদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক বহু বিস্তৃত ও গুপ্ত হওয়ার জন্য অত্যন্ত সহজ হয়েও উপলব্ধির ক্ষেত্রে আয়াসসাধ্য হয়ে উঠে। সুতরাং, পাঠক! এ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত অনুপাতের গোপনীয়তা এবং এর অদ্ভুত অবস্থিতি সম্পর্কে আপনি সহজেই ধারণা করতে পারেন বিষয়টি কি!

আমরা এ প্রসঙ্গে এমন একটি সংখ্যাগত ধাঁধাঁ ব্যাখ্যা করব, যাতে আপনার নিকট আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তা হল, যদি আপনাকে বলা হয়, কিছু দিরহাম নিন, তার প্রতিটি দিরহামের বিপরীতে তিনটি করে 'ফলস্'[১৪৯] রাখুন; পুনরায় ফলস্গুলো একত্র করে একটি পাখি কিনুন এবং দিরহামগুলোর দ্বারা প্রথম পাখিটির মূল্যানুযায়ী আরও কয়েকটি পাখি কিনুন—এখন মোট পাখির সংখ্যা কত? এর উত্তর হবে নয়টি। কারণ আপনি জানেন যে, এক দিরহামে ফলসের পরিমাণ হল চব্বিশ। তিন তার এক-অষ্টমাংশ। সুতরা এ অষ্টমাংশের ধারা অনুসরণ করে সমুদয় অষ্টমাংশ একত্রে যোগ করলে আটটি পাখির মূল্য বের হয়ে আসবে। এর সাথে ফলসের দ্বারা কেনা একটি পাখি যোগ করুন, তা হলেই নয়টি পাখি হবে। কারণ আপনি পূর্বে যে ফলসগুলোর দ্বারা একটি পাখি ক্রয় করেছিলেন, তার পরিমাণ এক দিরহাম। এ ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পেরেছেন, কেমনভাবে হেঁয়ালীটির অন্তর্গত সংখ্যার অনুপাত আপনাকে তার উত্তর বলে দিয়ে সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে। আপনার ধারণায় কি একে বা অনুরূপ অন্যান্য হেঁয়ালীকে প্রথম দর্শনে এক রহস্যময় দুর্বোধ্য ব্যাপার বলে বোধ জন্মায় না? এর দ্বারা এ কথাই স্পষ্ট হয়েছে যে, একটি বিষয়ের অন্তর্গত অনুপাত বিচারই জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের সন্ধান দিয়ে থাকে। কিন্তু এটা শুধুমাত্র বস্তুপুঞ্জ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ের মধ্যেই সম্ভব।

কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতের ঘটনাবলি, যার কার্যকারণ আপনার জানা নেই, যার সম্পর্কে কোন সত্য সংবাদও এসে পৌঁছেনি, তা একান্তই অদৃশ্য ব্যাপার। এভাবে আপনি তাকে উপলব্ধি করতে পারবেন না। এ বিষয়টি যদি আপনি ভাল করে বুঝে থাকেন, তা হলে যায়েরজার প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ করুন, তা প্রশ্নের শব্দাবলি অনুসারে উত্তর বের করা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আপনি পূর্বে দেখেছেন যে, তাতে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় বর্ণাবলি বের করে পর্যায়ক্রমিকভাবে উপরোক্ত হেঁয়ালীর মতই সুসজ্জিত করা

১৪৯. মুদ্রা বিশেষ; দিরহাম, সিকি ও ফলস্, পয়সার সাথে তুলনীয়।

www.amarboi.org

হয়। সুতরাং তার রহস্য হয় তার মধ্যকার অনুপাত, যাতে কতকাংশের দ্বারা অপর কতকাংশের জ্ঞান জন্মে। সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত অনুপাতটি জানতে পারবে তার পক্ষে ঐ সকল নিয়ম-নীতির দ্বারা উত্তর বের করে নেয়া সহজ হয়ে উঠবে। অবশ্য এ উত্তর অন্যত্র এর অন্তর্গত শব্দাবলির বিন্যাস ও পর্যায় অনুসারে প্রশ্নের হ্যাঁ বা না'র যে কোন একটি দিকের ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু এটা আমাদের পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার নয়। বরং তাতে বাক্‌বিন্যাসের বাহ্য দিকের সাথে তুলনা করা হয়। বস্তুত এর দ্বারা অদৃশ্য জানবার কোন উপায় নেই। কারণ মানুষের জ্ঞান এ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ্‌ই তাকে তাঁর জ্ঞানের দ্বারা আয়ত্ত করে রেখেছেন। আল্লাহ্‌ই জানেন, তোমরা জান না।[১৫০]

---

১৫০. কোরান ২, ২, ৬, ২৩২; ৩, ৬৬; ২৪, ১৯।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাযাবরী জীবন, বর্বর জাতি ও উপজাতি, তাদের জীবনান্তর্গত বিভিন্ন অবস্থা এবং এতদসম্পর্কীয় কতিপয় পরিচ্ছেদ ও বিশদ বিবরণ

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রথম পরিচ্ছেদ

[যাযাবরী ও নাগরিক জীবন উভয়েই স্বাভাবিক]

জেনে রাখুন, জীবিকা অর্জনে বিচিত্র পন্থা অবলম্বনের জন্য মানবজাতির জীবন-যাপন প্রণালী বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের একত্র বসবাস এ জীবিকা অর্জনে পরস্পরের সহায়তার নিমিত্তই সম্ভব হয়েছে। তারা একান্ত প্রয়োজনীয় হতে আরম্ভ করেছে এবং ক্রমশ সুবিধাজনক ও পরিপূর্ণতা বিধায়ক অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই কৃষিকর্মকে গ্রহণ করে শাকসব্জী ও শস্য উৎপাদন করছে; অনেকেই ভেড়া, গুরু, ছাগল প্রভৃতি পশু ও মৌমাছি, রেশম কীট প্রভৃতি প্রাণী পালন করে তাদের বংশ বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের উপর নির্ভর করছে। এ কৃষিকর্ম ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রয়োজন। কেননা সেখানেই তাদের স্থান সংকুলান হতে পারে। তাদের কৃষিক্ষেত্র প্রশস্ত মাঠ ও পশুর চারণভূমি কোন নগর পরিবেশের মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের জন্য প্রান্তরবাসী হওয়ার ব্যাপারটি একান্তই প্রয়োজনীয়। এ সময়ে তাদের একত্রবাস, তাদের প্রয়োজন, জীবিকা ও অবস্থানের জন্য পরস্পরের সহযোগিতা তাদেরকে আহার্য, বাসস্থান ও পরিচ্ছদ সংগ্রহের এমন একটি পর্যায়ে রাখে, সেখানে শুধু জীবন রক্ষা ও জীবন ধারণই সম্ভব। তাদের দুর্বলতার জন্য তারা এর অধিক কিছু সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় না।

অতঃপর যখন এ সকল জীবিকা অর্জনকারীর অবস্থা কিছুটা সচ্ছল হয়ে উঠে এবং তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ও সুযোগ হস্তগত করে, তখন তারা স্থায়ীভাবে বাস করতে চায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাচুর্যের জন্য পরস্পরের সহযোগিতায় তৎপর হয়। তারা অধিক আহার্য ও পরিচ্ছদ উৎপাদন করে এবং এগুলোতে পরিমার্জনার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। তারা বাসস্থান প্রশস্ত করে এবং পল্লী ও নগর গড়ে তোলে। অতঃপর তাদের দৃষ্টি বিলাসব্যসনের দিকে আকৃষ্ট হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত বিলাসিতার অভ্যাস দেখা দেয়। তারা খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীতে নব নব প্রক্রিয়া যোগ করে এবং পোশাক-পরিচ্ছদে রেশম, গরদ ইত্যাদি ব্যবহার করে উন্নতমানের সমুন্নত রুচির পরিচয় দেয়। তারা সুউচ্চ গৃহ ও স্তম্ভাদি নির্মাণ, তাদের ভিত্তি সুদৃঢ় ও পাকাপোক্ত করা এবং বিভিন্ন শিল্পকর্মের চরমরূপ তুলে ধরার জন্য সম্ভাব্য শক্তিকে বাস্তবায়িত করায় সচেষ্ট হয়। সুতরাং তারা প্রাসাদ ও অট্টালিকা তৈরি করে, তাতে ফোয়ারা প্রবাহিত করে এবং তাদের গম্বুজাদি উন্নত করতে ও তাদের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করতে এগিয়ে আসে। তারা তাদের নিত্যব্যবহার্য পরিচ্ছদ, বিছানাপত্র, বাসন-কোসন

www.amarboi.org

ও আসবাবপত্রের নতুন নতুন সংস্কার সাধন করতে থাকে। এদেরকেই বলা হয় নাগরিক, যার অর্থ নগরে স্থায়ী বসবাসকারী। তারাই পল্লী ও শহর অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

তাদের মধ্যে অনেকেই শিল্পকর্মকে তাদের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে এবং অনেকে ব্যবসায়কে। তাদের উপার্জন প্রান্তরবাসীদের অপেক্ষা পরিমাণে ও আরাম-আয়েশে অধিক হয়ে থাকে। কারণ তাদের অবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয় স্তর অতিক্রম করে এসেছে এবং জীবিকা নির্বাহের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণেই, আমরা পূর্বে যেমন বলেছি যাযাবরী ও নাগরিক জীবন উভয়েই স্বাভাবিক। এদের কোনটিকেই ত্যাগ করবার উপায় নেই।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[আরব[১] বেদুইন জীবন সৃষ্টির দিক থেকে স্বাভাবিক]

আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি যে, প্রান্তরবাসী যাযাবররা তাদের জীবিকার জন্য স্বাভাবিকভাবে কৃষি ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীল। তারা তাদের আহার্য, বাসস্থান ও পরিচ্ছদের ব্যাপারে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধীন। তাদের অন্যান্য অবস্থা ও অভ্যাস সম্পর্কেও তারা কখনই প্রয়োজনের অতিরিক্ত অভাব বা পরিপূর্ণতার দিকে আকৃষ্ট হয় না। তারা পশুলোম, পশম, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদির দ্বারা অপক্ক বাসস্থান নির্মাণ করে। এটা দ্বারা শুধু ছায়া ও আশ্রয়ই তাদের উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নয়। কখনও তারা পাহাড়ের গুহা ও গহ্বরেও আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের আহার্যও খুব সহজেই তারা রন্ধন অথবা বিনা রন্ধনে শুধু অগ্নি স্পর্শ করে গ্রহণ করে থাকে। এদের মধ্যে যারা শস্য উৎপাদন ও কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল, তারা ভ্রাম্যমাণদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল অবস্থার অধিকারী। এরা ক্ষুদ্র বস্তি জনপদ ও পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করে। এ শ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিকাংশ বারবার অনারব জাতি বিদ্যমান।

এদের মধ্যে যারা পালিত পশু যেমন ভেড়া, গরু ইত্যাদি পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের পশুর চারণভূমি ও পানীয় জলের জন্য ভ্রাম্যমাণ। কারণ তাদের বিচরণ করে ফিরাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। তাদেরকে পশুজীবী বলা হয়; এর অর্থ তারা ছাগল-গরুর উপর জীবন ধারণ করে। এর তৃণশূন্য প্রান্তরাদিতে উত্তম চারণ ভূমির অভাবে বেশি দূর অগ্রসর হয় না। এরা যেমন বারবার, তুর্কি ও তাদের সমগোত্রীয় তুর্কেম্যান ও সাকালী (স্লাভ)। অবশ্য যারা কেবল উট পালন করে জীবন-যাপন করে, তারা তৃণশূন্য প্রান্তরে অধিকতর দূর পর্যন্ত বিচরণ করে ফিরে। কারণ পাহাড়ী এলাকার গাছপালা উটের প্রয়োজনীয় আহার্য যোগাতে সক্ষম হয় না। এজন্য তাকে প্রান্তরের গুল্মাদি ও লবণাক্ত পানীয় জলের দিকে নিয়ে যেতে হয়। শীতকালেও অত্যধিক শীতের যাতনা থেকে দূরে থাকবার জন্য প্রান্তরের উত্তপ্ত পরিবেশ উটের জন্য প্রয়োজন। সেখানে সে ঐ তপ্ত বালুর উপর বাচ্চা প্রসব করে। কারণ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে উটের প্রসব অত্যধিক কষ্টদায়ক এবং এ জন্যই তার তপ্ত পরিবেশের প্রয়োজন সর্বাধিক। এ কারণে উটের উপর নির্ভরশীল বেদুইনরা প্রান্তরের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত বিচরণ করে ফিরে। অনেক সময় রক্ষীরা তাদেরকে পাহাড়ী এলাকা থেকে

---

১. আরব বলতে ইবনে খলদুন সর্বত্র বেদুইন বুঝিয়েছেন। আমরা উভয় শব্দ একত্র করে ব্যবহার করলাম। যেমন আছে—'এর চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন'।

www.amarboi.org

তাড়িয়েও দেয়। সুতরাং এরা এ অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রান্তরের গভীর অঞ্চলে বসবাস করে। এসব কারণেই এরা মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বন্য প্রকৃতির। নগরবাসীদের সাথে তুলনা করলে এদেরকে এমন বন্য হিংস্র ও ভাষাহীন পশু বলে বোধ হবে যাদেরকে বশীভূত করা অসম্ভব। এরাই আরব-বেদুইন। এদেরই সমগোত্রীয় বারবার ও জানাতাদের ভ্রাম্যমাণ অংশ মাগরিবে এবং কুর্দি, তুর্কি ও তুর্কেম্যানরা পূর্বাঞ্চলে বিদ্যমান। অবশ্য শেষোক্তদের তুলনায় আরব বেদুইনরা অধিকতর দূর প্রান্তরবাসী ও প্রান্তরীয় চরিত্রের অধিকারী। কারণ এরা শুধু উটের উপর নির্ভরশীল। অন্যরা উটের সাথে ছাগল, গরু ইত্যাদিও পালন করে।

এ বর্ণনায় এ বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আরব-বেদুইন জীবন একান্তই স্বাভাবিক। মানব সভ্যতার জন্য এরও প্রয়োজন আছে। আল্লাহ্ পবিত্র ও উন্নত, সর্বাপেক্ষা উত্তর জ্ঞাতা।

www.amarboi.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[যাযাবরী জীবন নাগরিক জীবন অপেক্ষা প্রাচীন ও পূর্ববর্তী এবং প্রান্তর সভ্যতা ও জনপদের ভিত্তি ও সঞ্চয়াগার]

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, প্রান্তরবাসীরা তাদের জীবন-যাপনের একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপরই নির্ভর করে। এর অতিরিক্ত কোন কিছু সংগ্রহ করা তাদের সাধ্যাতীত। অন্যদিকে নগরবাসীরা তাদের জীবন-যাপনে বিলাসব্যসন ও পরিপূর্ণতার জন্য পরস্পর সহায়তা এবং অভ্যাস গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন সর্বদাই অতিরিক্ত অভাব ও পরিপূর্ণতা অপেক্ষা প্রাচীন ও তার পূর্ববর্তী। কারণ একান্ত প্রয়োজনই হল ভিত্তি এবং পরিপূর্ণতা তা থেকে উৎপন্ন বিশেষ অবস্থা মাত্র। এ জন্যই যাযাবরী জীবন নাগরিক ও শাহরিক জীবনের ভিত্তি এবং তার পূর্ববর্তী। কারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রথম উদ্দেশ্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তা সংগ্রহ হয়ে গেলেই সে বিলাসব্যসন ও পরিপূর্ণতার দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। সুতরাং যাযাবরী স্থূলতা নাগরিক শালীনতার পূর্বে দেখা দিয়ে থাকে। এ জন্যই আমরা সভ্যতার প্রথম ভিত্তি বেদুইন জীবনের মধ্যে দেখতে পাই এবং তা থেকে এটা প্রবাহিত হয়। শেষ পর্যন্ত প্রচেষ্টার মধ্যে তা থেকে দূরে সরে আসে। এভাবে যখন মানুষের জন্য প্রাচুর্য লাভ ঘটে ও এর ফলে বিলাসব্যসনে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠে, তখন স্থায়ী বসবাসের প্রশ্ন দেখা দেয় এবং নাগরিক জীবনের নিগড়ে সে বাঁধা পড়ে। এটাই প্রান্তরবাসী সকল গোত্রের অবস্থা। অথচ নগরবাসীরা একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে কিংবা নাগরিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে না পড়লে, কখনও তারা যাযাবরী জীবন গ্রহণে অগ্রসর হয় না।

যে সকল বিষয় আমাদেরকে এ জ্ঞান দেয় যে, যাযাবরী জীবন নাগরিক জীবন অপেক্ষা পূর্বগামী তার মধ্যে একটি এ যে, আমরা যখন কোন জনপদের অধিবাসীদের পূর্বাবস্থায় অনুসন্ধান করি, তখন দেখতে পাই, তাদের অধিকাংশই এক সময়ে প্রান্তরবাসী ছিল এবং তাদের সমগোত্রীয়রা এখনও ঐ জনপদের কোথাও কোন বস্তিতে জীবন-যাপন করছে। তাদের অবস্থা সচ্ছল হবার পরই তারা জনপদে স্থায়ী বসবাসে প্রবেশ করেছে এবং নাগরিক জীবনের বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত হয়ে অবস্থার পরিবর্তন করেছে। এ বিষয়টি এরই প্রমাণ যে, নাগরিকত্বের অবস্থা যাযাবরত্ব থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং তাই এর ভিত্তি। এ অবস্থাটি উত্তমরূপে বুঝে নেয়া দরকার।

অতঃপর এ নগর ও প্রান্তর জীবনের প্রত্যেকটির মধ্যেই অবস্থার বিভিন্নতা আছে। বহু মানবগোষ্ঠীই অন্য মানবগোষ্ঠী থেকে, বহু গোত্রই অন্য গোত্র থেকে বৃহৎ এবং বহু

www.amarboi.org

পল্লীই অন্য পল্লী থেকে ও বহু নগরই অন্য নগর থেকে জনবসতির দিক দিয়ে বিস্তৃততর। এরও কারণ একটিই, যা আমাদের বর্ণনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যাযাবরী জীবন থেকে ক্রমবিচ্যুতির ফলেই এরূপ বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। কেননা তাই এ বিস্তৃতির ভিত্তি। নগর ও পল্লী জীবনের বিলাসব্যসন ও স্থায়ী বসবাসের অভ্যাস তখনই সম্ভব, যখন মানুষ তার একান্ত প্রয়োজনের সামগ্রীর মধ্যে প্রাচুর্যের সৃষ্টি করতে পেরেছে। এজন্য নাগরিক অভ্যাস যাযাবরী অভ্যাসের পরে আবির্ভূত হয়েছে। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা।

www.amarboi.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[প্রান্তরবাসীরা নগরবাসীদের অপেক্ষা সততায় অধিকতর নিকটবর্তী]

এর কারণ এ যে, জীবাত্মা তার জন্মগত প্রথম প্রকৃতিতে অবস্থানকালে তার উপর আপতিত বিষয় এবং ভাল-মন্দের প্রবৃত্তি গ্রহণে অধিকতর সক্রিয় থাকে। হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, প্রতিটি সন্তান তার স্বাভাবিক প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে; অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি বানায়, খ্রিস্টান বানায় এবং মজুসী হিসাবে গড়ে তোলে।[২] এভাবে যতই সে একটি প্রকৃতির নিকটবর্তী হয়, সেই পরিমাণে অন্যটি থেকে দূরে সরে যায় এবং তাতে পুনরায় অভ্যস্ত হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সৎ ব্যক্তি যখন সদভ্যাসাদির দ্বারা জীবাত্মার মধ্যে সততার প্রবৃত্তি গড়ে তোলে, তখন সে অসৎ থেকে দূরে সরে যায় ও তার পথ তার নিকট দুর্গম হয়ে উঠে। এরূপ অসৎ ব্যক্তিও; যখন তার জীবাত্মা অসততার মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

নাগরিকগণ সর্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদ, বিলাসব্যসন, পার্থিব উন্নতি লাভের আশা ও তাকে ভোগ করবার স্পৃহার দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এর ফলে তাদের জীবাত্মা অসৎ চরিত্র ও অন্যায় প্রসঙ্গের মধ্যে কলুষিত হয়ে উঠে। এভাবে তারা যতই তাতে নিমজ্জিত হয়, ততই সৎ পথ ও ন্যায় পন্থা থেকে দূরে সরে যায়। এমনকি এর ফলে তাদের মধ্যকার সংযমের আচার-আচরণও তাদের অবস্থাগুলোতে দুর্নিরীক্ষ হয়ে উঠে। তাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যারা সভা-সমিতিতে বয়োবৃদ্ধ ও গুরুজনদের সম্মুখেই অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে। এ ব্যাপারে তাদের সংযম কোন কাজেই আসে না। কারণ, তারা কথায় ও কাজে মন্দকে প্রকাশ করতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রান্তরবাসীরাও যদি পার্থিব জীবনের প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠে, তা হলে তাদের তুল্যই ব্যবহার করে। অবশ্য তা একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহেই। নগরবাসীদের ন্যায় আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-সম্ভোগের উপকরণের মধ্যে নয়। সুতরাং মন্দের ব্যাপারে তাদের অভ্যাস তাদের পরিবেশ ও সম্মতি অনুসারেই নগরবাসীদের তুলনায় একান্তই নগণ্য হয়ে থাকে। বস্তুত প্রান্তরবাসীরা জন্মগত প্রাথমিক স্বভাবেরই অধিকতর নিকটবর্তী এবং জীবাত্মার উপর অধিকতর বদভ্যাস ও কদাচারের যে কলুষ কালিমা আপতিত হয়, তা থেকে দূরে অবস্থিত। সুতরাং নগরবাসীদের অপেক্ষা তাদের সংশোধন অধিকতর সহজ এ সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। পরবর্তী বর্ণনা থেকে এটাও প্রকাশ পাবে যে, নগর জীবনই সভ্যতার শেষ পর্যায়, এর পর তাতে বিকৃতি দেখা দিবে এবং সৎ থেকে দূরে ও

---

২. বোখারী (১ম) দ্র:।

www.amarboi.org

অসতের চরম সীমায় পৌঁছবে। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে প্রান্তরবাসীরা নগরবাসীদের অপেক্ষা সততার অধিকতর নিকটবর্তী। 'আল্লাহ্ ধর্মভীরুদেরকে ভালবাসেন।'[৩]

সহি বোখারীর নিম্নলিখিত হাদিস দ্বারা উপরোক্ত বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা সম্ভব নয়। উক্ত হাদিসে হাজ্জাজ সলমা ইবনে আকুকে, শেষোক্তের প্রান্তরবাসী হওয়ার জন্য বলেছিলেন, তুমি কি পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্তন করেছ? বেদুইন হয়ে গেছ? তদুত্তরে সলমা বলেছিলেন, না, বরং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যাযাবর জীবনের অনুমতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম দিকে মক্কাবাসীদের জন্য হিজরত অবশ্য কর্তব্য বলে নির্ধারিত ছিল। যাতে তারা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে সর্বস্থানে উপস্থিত থেকে তাঁকে সাহায্য, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও তাঁকে রক্ষা করতে পারে। হিজরত বেদুইনদের উপর অবশ্য কর্তব্য ছিল না। কারণ মক্কাবাসীরাই নবী (সঃ)-এর সাথে গোত্রপ্রীতিতে সম্পর্কযুক্ত ছিল। সুতরাং তাঁর সাহায্য ও সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রান্তরবাসী বেদুইনদের অপেক্ষা তাদেরই দায়িত্ব ছিল অধিক। এ জন্যই মোহাজেরগণ অনেক সময় বেদুইন জীবন থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। কারণ বেদুইন জীবনে হিজরত অবশ্য কর্তব্য ছিল না।

হজরত মুহম্মদ (সঃ) সাদ ইবনে আবু ওক্কাস বর্ণিত একটি হাদিসে, শেষোক্তের মক্কায় অসুস্থতা উপলক্ষে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্, আমার সাহাবীদের হিজরত সফল হতে দাও, তাদেরকে পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্তন করিও না।[৪] এর অর্থ, তারা যেন সর্বদা মদিনায় থাকতে পারে এবং তথা থেকে অন্য কোথাও না যায়। যাতে তারা যে হিজরত আরম্ভ করেছে, তা থেকে প্রত্যাবর্তন না করে। কারণ এরূপ করা কোন না কোন দিক থেকে আবার পশ্চাদ্বর্তী হওয়ারই নামান্তর। অনেকে বলেন যে, এ অবস্থা মক্কা বিজয়ের পূর্বকালেই বিশেষভাবে বিরাজমান ছিল। কারণ তখন মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্প থাকায় হিজরতের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তারা শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে তাঁর নবীর সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করলেন, তখন হিজরতের কর্তব্য আর রইল না। কেননা হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। অনেকে বলেন, মক্কা বিজয়ের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, হাদিসের নির্দেশ অনুসারে তাদের হিজরতের দায়িত্ব রহিত হয়েছে। অনেকে বলেন, এর দ্বারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত করেছে, তাদের কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে বোঝায়। যাহোক, এ সকল কিছুরই নির্গলিতার্থ হল হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর তিরোধানের পর হিজরতের দায়িত্ব রহিত হয়েছে। কারণ তখন থেকেই সাহাবীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে চুতর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং মদিনায় একমাত্র হিজরত করে যাওয়ার পুণ্য ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি।

সুতরাং সালমা ইবনে আকু'র প্রান্তরবাসী হওয়ার ফলে হাজ্জাজের সেই মন্তব্য— তুমি কি পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্তন করেছ ও বেদুইন হয়ে গেছ? তা মদিনাবাস ত্যাগ করার প্রতি ভর্ৎসনা মাত্র। কারণ এখানে সর্বদা থেকে হিজরতকে সুসম্পন্ন করবার জন্য হজরত

৩. কোরান, ৭৬; ৯, ৪, ৭।
৪. বোখারী (১ম) দ্রঃ।

www.amarboi.org

মুহম্মদ (সঃ) প্রার্থনা করেছিলেন, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তা তাঁর সেই বাক্য—'তাদেরকে পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্তন করিও না।' হাজ্জাজের মন্তব্য—'বেদুইন হয়ে গেছ', এরই ইঙ্গিত কর যে, তুমি কি সেই বেদুইনদের দলে মিশেছ, যারা হিজরত করে না। কাজেই সলমা উক্ত দুটি অভিযোগ অস্বীকার করে উত্তর দিয়েছেন যে, নবী (সঃ) তাকে প্রান্তরবাসী হতে অনুমতি দিয়েছেন। এটা তার জন্যই বিশেষ নির্দেশ। যেমন খুজাইমার বিশেষ সাক্ষ্য দেয়া ও আবু বুরদার ছাগলছানা কোরবানী করা।[৫] এ জন্যই বলা যায়, হাজ্জাজ তাকে শুধু মদিনাবাস ত্যাগ করার জন্য ভর্ৎসনা করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর তিরোধানের পর হিজরতের দায়িত্ব রহিত হয়েছে। সালমাও তাঁকে সেই উত্তর দিয়েছেন যে, তার এ সুযোগ নবীর অনুমতির ফলেই ঘটেছে। যাহোক, এ হাদিসের উপরোক্ত অর্থ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও ভাল। কারণ হাজ্জাজ নগরজীবনকে প্রাধান্য দেননি বা তাকে বিশ্লিষ্টও করেননি; বরং তিনি যা জানতেন, সেই অনুসারেই কথা বলেছেন। যে কোন দিক থেকে দেখা যাক না কেন, তাঁর ঐ বক্তব্য—'বেদুইন হয়ে গিয়েছ'-এর মধ্যে বেদুইন জীবনের প্রতি কোন প্রকার কটূক্তি নেই। কারণ পাঠক যেমন দেখেছেন, হিজরতের ব্যাপারটি নবীর সাহায্য ও সংরক্ষণের জন্যই প্রবর্তিত হয়েছিল, বেদুইন জীবনকে মন্দ বলবার জন্য নয়। সুতরাং হাজ্জাজের ভর্ৎসনার মধ্যে হিজরত ত্যাগ করে বেদুইন জীবন গ্রহণের প্রতি কটাক্ষ আছে বটে, কিন্তু তা এজন্য নয় যে, বেদুইন জীবন মন্দ। আল্লাহ্ পবিত্র, তিনিই সর্বজ্ঞ এবং তাঁরই সাহায্য কাম্য।

---

৫. হজরত মুহম্মদ (সঃ) খুজাইমার সাক্ষ্যকে দুজনের সাক্ষ্যের সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং আবু বুরদার এক বছরের কম বয়স্ক ছাগল কোরবানী তিনি অনুমোদন করেছিলেন। এই উভয়ই বিশেষ অনুমতি।

www.amarboi.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[নগরবাসিগণ থেকে প্রান্তরবাসীরা শৌর্যবীর্যে অধিকতর নিকটবর্তী]

এর কারণ এ যে, নগরবাসিগণ সুখ-সম্ভোগের শয্যায় শায়িত থেকে প্রাচুর্য ও বিলাস-ব্যসনের মধ্যে কালাতিপাত করছে। তারা তাদের নিজেদের ও তাদের ধনসম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব সহায়কদের উপর ন্যস্ত করেছে। নগরীর শাসনকর্তা এ ব্যাপারে রক্ষীবাহিনীর দ্বারা তাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছেন। তদুপরি তাদের চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এবং তাদের সম্মুখে প্রহরী নিয়োজিত। সুতরাং তারা সর্ব বিষয়ে নিরাপত্তা বোধ করে সুখনিদ্রায় শায়িত হয়। বাইরের কোন কোলাহল এর ব্যাঘাত ঘটায় না এবং ভাগ্যশিকারীও তাদেরকে ভয় দেখায় না। তারা পরিতৃপ্ত, শান্ত। তারা অস্ত্রশস্ত্রের বোঝা ত্যাগ করেছে। বংশানুক্রমে এভাবে চলে এসেছে। এর ফলে তারা বাড়ির কর্তার উপর নির্ভরশীল শিশু ও স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়ে গেছে। এমন কি এটা তাদের এমন চরিত্র হিসাবে গড়ে উঠেছে, যাকে প্রকৃতি বলে অভিহিত করা যায়।

অথচ প্রান্তরবাসীরা, তারা সমাজবদ্ধ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, দূর-দূরান্তে বন্য প্রাণীর ন্যায় ভ্রমণ করাতে, রক্ষীদলের অত্যাচার থেকে দূরে সরে যাওয়াতে এবং সর্বোপরি প্রাচীর ও দ্বারাদির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়াতে নিজেদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিজেরাই করে থাকে। এর ভার তারা অন্য কারও উপর ন্যস্ত করে না; বরং বলা যায়, অন্য কাউকেও এ ব্যাপারে বিশ্বাস করে না। ফলে তারা সর্বদাই অস্ত্রশস্ত্র বহন করে থাকে এবং পথ চলতে চতুর্দিকে সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। একমাত্র দলবদ্ধ অবস্থায়, লোক সমাবেশে এবং বাহনের পৃষ্ঠদেশে কিছুটা নিরাপত্তা বোধ করতে পারে। তথাপি তাদেরকে প্রতিটি অস্পষ্ট শব্দ ও কোলাহল অনুসন্ধান করে দেখতে হয়। তারা প্রান্তর ও নির্জন ভূমিতে একাকী বিচরণ করে এবং প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কাকাতর হয়েও দুর্যোগের আশঙ্কা তাদের চরিত্র হয়ে উঠেছে ও বীরত্ব তাদের গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখনই এ ব্যাপারে কোন আহ্বানকারী আহ্বান জানায়, কোন চিৎকারকারী তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, তারা বিনা দ্বিধায় অগ্রসর হয়ে যায়। নগরবাসীরা যখন তাদের সাথে প্রান্তরে মিলিত হয় কিংবা তাদের সাথে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয় তারা প্রান্তরবাসীদের উপরই নির্ভর করে এবং নিজেদের নিরাপত্তার কোন বিষয়ই নিজেদের হাতে রাখে না। এটা একান্ত বাস্তবদৃষ্ট অবস্থা। এমন কি দিক ও দিশা জানতে, পানীয় জলের সংবাদ নিতে এবং রাস্তাঘাটের বিবরণ সংগ্রহ করতে তারা প্রান্তরবাসীদের উপর নির্ভর করে থাকে। এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। এর মূল ভিত্তি হল মানুষ

www.amarboi.org

অভ্যাসের, তার প্রিয় প্রবৃত্তির দাস; এক্ষেত্রে তার প্রকৃতি, তার মানসিকতা কোন কাজেই লাগে না। সুতরাং সে বিভিন্ন অবস্থায় যে বিষয়কে প্রিয়া করে তোলে, তাই তার চরিত্র, শক্তি, অভ্যাস, এমন কি আরও গভীরভাবে তার প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পাঠক, আপনি যদি মানুষের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত খুঁজতে যান, দেখতে পাবেন, এটা কত সত্য! আল্লাহ্ অনেক কিছুই ইচ্ছামত সৃষ্টি করেন।[৬]

৬. কোরান ৩, ৪৭; ৫, ১৭; ২৪, ৪৫; ২৮, ৬৮; ৩০, ৫৪; ৩৯, ৪; ৪২, ৪৯।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[নীতিনিয়মের সহায়তা নগরবাসীদের সংগ্রামমুখিতা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বিলোপ করে]

এটা এ যে, মানুষের মধ্যে সকলেই নিজের ব্যাপারে সর্বেসর্বা নয়। তাদের মধ্যে সর্দার, আমীর ও প্রভুদের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় অল্প। সুতরাং সাধারণভাবে মানুষ অন্যের অধীনে বসবাস করে এবং এটা তাদের জন্য প্রয়োজনীয়। যদি এ প্রকার প্রভুত্ব বন্ধুভাবাপন্ন ও স্বাভাবিক হয়, যদি তার আদেশ-নিষেধ ও বাধা-বিপত্তির কঠোরতা না থাকে, তা হলে তার অধীনস্থ মানুষ নিজেদের রুচি অনুসারেই বীরত্ব বা কাপুরুষতা অবলম্বন করে থাকে। তারা বিধি-নিষেধের প্রবর্তনার প্রতি নিঃসংকোচ হয়ে এমনভাবে আত্মনির্ভরশীলতার অনুশীলন করে যে, তা তাদের প্রকৃতি হয়ে দাঁড়ায় এবং এটা ব্যতীত অন্য কিছু তারা বুঝে না।

কিন্তু প্রভুত্বটি না যদি এমন হয় যে তার বিধিনিষেধের মধ্যে কঠোরতা, প্রতাপ ও ভয় প্রদর্শনের ভাব থাকে, তখন মানুষের সংগ্রামী চেতনা বিনষ্ট হয় এবং তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পেয়ে থাকে। কারণ অত্যধিক নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা জীবাত্মার মধ্যে এক প্রকার শৈথিল্য দেখা দেয়, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব। হজরত উমর 'সাদ'কে অনুরূপ কঠোর হতে নিষেধ করেছিলেন। যহরা ইবনে জাবিয়া যখন জালেনুসের পরিত্যক্ত সামগ্রী গ্রহণ করেছিলেন, তখন এ ঘটনা ঘটেছিল। মূল ঘটনাটি হল, যহরা কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন জালেনুসের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে হত্যা করে তার পরিত্যক্ত সামগ্রী ছিনিয়ে নেন। এর মূল্য ছিল পঁচাত্তর হাজার স্বর্ণমুদ্রা। সেনাপতি সাদ ইবনে আবু ওক্কাস উক্ত লুণ্ঠিত সামগ্রী তার নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন, তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে তুমি আমার অনুমতির অপেক্ষা করলে না কেন? অতঃপর এ ব্যাপারে হজরত উমরের অনুমতি প্রার্থনা করে সাদ তাঁর নিকট পত্র লিখলেন। উত্তরে হজরত উমর লিখেছিলেন, "তুমি কি যহরা সম্পর্কে এ করতে চাও; অথচ সে যতটুকু জ্বলবার জ্বলেছে আর তোমারও যুদ্ধের যতটুকু বাকি রইবার রয়েছে। তার সাহস নষ্ট করে ফেলবে, তার অন্তর বিকৃত করে ফেলবে।" হজরত উমর তার লুণ্ঠিত সামগ্রী তাকে দিয়ে দিতে বললেন।

যদি বিধি-নিষেধগুলো শাস্তির আকারে দেখা দেয়, তা হলে সংগ্রামী চেতনা সমূলে নষ্ট হয়ে যায়। কারণ এ শাস্তি এমন ব্যক্তির উপর পতিত হচ্ছে, যার তা ফিরাবার ক্ষমতা নেই। এর ফলে তার মনে যে অপমান বোধ জন্ম নিবে, তাতে সংগ্রামী চেতনার

www.amarboi.org

ধ্বংস অনিবার্য এবং সুনিশ্চিত। অন্যদিকে যদি বিধি-নিষেধসমূহ পরিমার্জনা ও শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বাল্যকাল থেকেই তা প্রয়োগ করা হয়, তথাপি কিছুদূর পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত হয়ে থাকে; যার ফলে সংশ্লিষ্ট বালক এক প্রকার ভীতি ও আনুগত্যের মধ্যে বেড়ে উঠে এবং তার সংগ্রামী চেতনা বিকশিত হয় না। এ জন্যই প্রান্তরবাসী বন্যপ্রকৃতির বেদুইনদেরকে দেখতে পাই, তারা বিধি-নিষেধের অধীন মানুষগুলো অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় সংগ্রামী চেতনার অধিকারী। আমরা তাদেরকেও দেখতে পাই, যারা বিধিনিষেধের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং চরিত্র গঠন, শিক্ষা, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন ও ধার্মিকতা অনুশীলনে তার ছত্রচ্ছায়ায় অবস্থান করেন; এটা তাদের সংগ্রামী চেতনার অনেকখানিই নষ্ট করে ফেলে। ফলে তারা যে-কোন প্রকারে তাদের উপর আপতিত বিপদ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হন। এ অবস্থা হয় বিদ্যার্থীদের, যারা 'কেরাত' শিক্ষা করে, উস্তাদ ও ইমামদের নিকট থেকে পাঠ গ্রহণ করে এবং যারা চরিত্র গঠন ও শিক্ষার জন্য গাম্ভীর্য ও মর্যাদাপূর্ণ সমাবেশে অবস্থান করে। চিন্তা করবার ব্যাপার, এ সকল অবস্থা কীভাবে তাদের প্রতিরোধ শক্তি ও সংগ্রামী চেতনা বিলোপ করে দেয়!

অবশ্য সাহাবীদের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও ধর্মচেতনা গ্রহণের মধ্যে এ ধরনের কোন বিকৃত প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এতে তাদের সংগ্রামী চেতনার কোন ক্ষতি হয়নি; বরং তাঁরা অন্য মানুষ অপেক্ষা অধিকতর তীব্র সংগ্রামী চেতনার অধিকারী ছিলেন। কারণ ধর্ম প্রবর্তক (আল্লাহ্ তাঁর কল্যাণ করুন), যাঁর নিকট থেকে সরাসরি ধর্মমত গ্রহণ করে তাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন এবং তাঁদের মধ্যেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর সেই শিক্ষা ছিল আকর্ষণ ও ভয় প্রদর্শনের ব্যাপার। তা কোন প্রকারেই শিল্পমূলক শিক্ষা ও শিক্ষামূলক চরিত্র গঠন ছিল না। বরং তা ছিল ধর্মের নির্দেশ ও পালনীয় দীক্ষার বিবরণ। যা অনুসারীরা স্বেচ্ছায় তাঁদের বিশ্বাস ও সত্যোপলব্ধির আকর্ষণে গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্যই তাঁদের সংগ্রামী চেতনা সর্বদাই সুদৃঢ় ছিল। তাঁদের এ দৃঢ়তার মধ্যে চরিত্র গঠন প্রক্রিয়া ও নির্দেশ নখরাঘাত করতে সক্ষম হয়নি। হজরত উমর (রাঃ) বলেছেন, যাকে ধর্ম চরিত্রবান করতে পারেনি তাকে আল্লাহ্ও তার চরিত্র দান করেন না। তিনি এ বক্তব্যে এ আগ্রহই প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রত্যেকেই নিজের আকর্ষণেই নিজকে সুগঠিত করে নিবে। কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল, ধর্মপ্রবর্তক অবশ্যই অনুসারীদের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে উত্তম জ্ঞাতা। এর পর যখন মানুষের মধ্যে ধর্মবোধে শৈথিল্য দেখা দিল এবং তারা দমনমূলক নির্দেশাদি প্রবর্তন করতে লাগল, তখন ধর্ম এমন একটি শাস্ত্র ও শিল্পকর্মে পরিণত হল যে, তা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। অন্যদিকে মানুষ তখন নগরজীবনে প্রবেশ করেছে এবং তাদের আনুগত্যের জন্য বিধি-নিষেধের নিগড় গড়ে তোলা হয়েছে। এ সব কিছু মিলিয়ে তাদের মধ্যকার সংগ্রামী চেতনাও ততদিনে ধ্বংস হয়ে গেছে।

এ কথা অবশ্যই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, রাজকীয় নির্দেশ ও শিক্ষামূলক নিয়ম-নীতি সংগ্রামী চেতনাকে বিকৃত করে দেয়। কারণ এস্থলে নিবর্তনমূলক বিষয়াদি সম্পূর্ণ বহিরাগত। কিন্তু ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অনুরূপ নয়; কারণ সেখানে নিবর্তন একান্তই

www.amarboi.org

সত্তার সাথে জড়িত। এ জন্যই এ সকল রাজকীয় নির্দেশ ও শিক্ষামূলক নিয়মনীতি নগরবাসীদের সত্তাগত দুর্বলতা ও শৌর্যবীর্য বিনষ্টের এক অন্যতম কারণ। কেননা তারা শিশুকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তারই ছত্রচ্ছায়ায় বসবাস করছে। কিন্তু প্রান্তরবাসীরা এ থেকে অনেক দূরে। কারণ তারা রাজকীয় নির্দেশ, শিক্ষাদান ও চরিত্র গঠনের নিয়ম-নীতি থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে। এজন্যই মুহম্মদ ইবনে আবু জায়েদ তাঁর গ্রন্থের 'শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রতি' নির্দেশাবলিতে বলেছেন, কোন শিক্ষকের জন্য তাঁর বালক শিক্ষার্থীকে তিনবারের অধিক বেত্রাঘাত করা উচিত নয়। তিনি তা কাজী শুরাইহের[৭] নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে অনেকে প্রমাণ উপস্থিত করতে গিয়ে ওহী অবতরণের প্রথম দিকে চাপ দেয়ার যে বর্ণনা হাদিসে বিদ্যমান, তার কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ তাও তিনবারই ছিল। কিন্তু এ মতটি দুর্বল। কারণ চাপের ব্যাপারটি দিয়ে এ ধরনের প্রমাণ তৈরি করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা তা পরিচিত শিক্ষাপ্রণালী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। আল্লাহ্ বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ।[৮]

---

৭. তিনি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে জীবিত ছিলেন। হজরত উমর কর্তৃক কুফার কাজী নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে কথিত হয়।

৮ কোরান ৬, ১৮, ৭৩; ৩৪, ১।

www.amarboi.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[একমাত্র গোত্রপ্রীতির অধিকারী গোত্রগুলোই প্রান্তরে বসবাস করতে সক্ষম]

জেনে রাখুন, পবিত্র আল্লাহ্ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে ভাল এবং মন্দ উভয়কেই গেঁথে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, "এবং আমরা তাদেরকে দুটি পথ দেখিয়েছি'"[৯] তিনি আরও বলেছেন, "তিনি তাদের মধ্যে অসংযম ও সংযম উভয়ের অনুপ্রেরণা দান করেছেন।"[১০] মন্দই মানুষের চরিত্রের অধিকতর নিকটবর্তী যদি সে অবাধে তাতে বিচরণ করবার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং কোন প্রকার ধর্মবোধের অনুসরণ দ্বারা তাকে মার্জিত না করে। এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপরই অধিকাংশ লোকের অবস্থান। একমাত্র আল্লাহ্ যাঁদেরকে শক্তি দান করেছেন, তাঁরাই এ থেকে বেঁচে থাকতে পারেন।

মানুষের চরিত্রের মধ্যে অত্যাচার ও পরস্পর উৎপীড়ন অত্যন্ত বেশি মাত্রায় বিদ্যমান। যে ব্যক্তি তার ভ্রাতার সম্পদের প্রতি লোভ করল এবং তাকে ছিনিয়ে নিবার জন্য হাত বাড়াল, তা থেকে তাঁকে একমাত্র সংযমবোধই রক্ষা করতে পারে, যেমন কবি বলেছেন।[১১]

নগর ও পল্লীগুলোতে একে অপরকে উৎপীড়ন করা থেকে শাসক ও রাজ্যের ধারাই রক্ষা করে থাকে। কারণ তারা তাদের অধীনস্থ সমুদয় হস্তকেই অপরের প্রতি প্রসারিত হওয়া থেকে বিতর রাখে এবং উৎপীড়িত হতে দেয় না। এভাবে নগরবাসীরা কঠোর নির্দেশ ও প্রতাপের লাগামডোরে আবদ্ধ হয়ে একে অপরের উৎপীড়ন শিকারে পরিণত হয় না। অবশ্য স্বয়ং শাসক যদি উৎপীড়ন করে, তবে স্বতন্ত্র কথা। অন্যদিকে নগরের বাইরে থেকে যে সকল উৎপীড়ন এসে উপস্থিত হয়, তা নগর প্রাকারই অনেকাংশে প্রতিরোধ করে। এগুলো, রক্ষা ব্যবস্থার প্রতি উদাসীনতা, রাত্রিকালীন হঠাৎ আক্রমণ কিংবা দিবাভাগেই অক্ষমতার জন্য পশ্চাদপসারণের দরুন ঘটে থাকে। তদুপরি এ সকল বিপদ প্রতিরোধের জন্য রাজ্যের সহায়তাকারী এবং বিপদের সম্মুখীন হবার মত যোগ্যতাসম্পন্ন সৈন্যদলও বিদ্যমান।

কিন্তু প্রান্তরবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ প্রকার উৎপীড়ন প্রতিরোধের জন্য অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রতিটি গোত্রের সর্দার ও বয়োবৃদ্ধদের প্রতি সাধারণ মানুষের যে সমীহ ও শ্রদ্ধাবোধ আছে, তাই তাদের মধ্যে সংযমের সৃষ্টি করে এবং বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের

---

৯. কোরান ৯০, ১০।

১০. কোরান ৯১, ৮।

১১. আব্বাসীয় যুগের কবি আল মুতানবেবী।

www.amarboi.org

জন্য গোত্রান্তর্গত বীর্যবত্তায় খ্যাতিমান যুবকদেরকে সমবায়ে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়। তাদের এ প্রকার সংগঠন ও তদ্দ্বারা কাম্য প্রতিরোধ তখনই সাফল্যলাভ করে, যখন তা গোত্রপ্রীতি ও বংশধারার সম্পর্কের উপর স্থাপিত হয়। কারণ একমাত্র এর মাধ্যমেই তাদের শৌর্য সুদৃঢ় হতে পারে এবং অপরের মনে তা সমীহের ভাব উদ্রেক করতে পারে। কেননা গোত্রপ্রীতি ও বংশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই গভীর আকর্ষণ বিদ্যমান। কারণ আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষের অন্তরেই এমন কিছু প্রীতি ও মমতা প্রদান করেছেন, যা তাদের বংশ ও স্বজনের প্রতি গভীর আকর্ষণ হিসাবে প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। এর দ্বারাই পরস্পরের সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমেই শত্রুর মনে ভীতির উদ্রেক করা সম্ভব। হজরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের উক্তি হিসাবে কোরানে যা বর্ণিত হয়েছে, এ বক্তব্যের আলোকে তাকে বিবেচনা করুন। তারা তাদের পিতাকে বলেছিল, "যদি তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে, অথচ আমরা একটি গোত্র, তা হলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হব।"[১২] এর অর্থ এ যে, তারা সকলে এক গোত্রের হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে কারও উপর অবিচার অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

কিন্তু যারা বংশধারার ক্ষেত্রে একত্র সত্তার অধিকারী, তাদের মধ্যে সাথীদের প্রতি আকর্ষণ খুব অল্প মাত্রাতেই বিরাজ করে। সুতরাং যুদ্ধের যেদিনে শূন্যপ্রান্তর অকল্যাণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, তখন তারা চুপিসারে আত্মরক্ষার জন্য এবং একাকী অপদস্থ হবার ভয়ে সরে পড়ে। এজন্যই এ শ্রেণীর লোকের পক্ষে প্রান্তরে বসবাস করা সম্ভব হয়। কারণ তারা যে-কোন মুহূর্তে অন্য কোন দলের সহজ শিকারে পরিণত হতে পারে।

পাঠক, বসবাসের ব্যাপারে যখন এ বিষয়টি আপনার নিকট পরিস্ফুট হল যে এর জন্য প্রতিরোধ ও সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয়, তখন একে মানুষের অন্যান্য কর্তব্য, যেমন নবুয়ত প্রচার, রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও মতবাদের প্রসারের ক্ষেত্রেও আপনি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন। কারণ এ সকল বিষয়ের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীত কিছুতেই পূর্ণতা লাভ করে না। কেননা মানুষ স্বভাবতঃই প্রতিরোধকামী। এ জন্যই যুদ্ধবিগ্রহে গোত্রপ্রীতির প্রশ্নটি অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়, যেমন একটু পূর্বেই এ সম্পর্কে আমরা বর্ণনা করেছি। সুতরাং পাঠক, আপনি একে মুখ্য প্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করে আমাদের পরবর্তী আলোচনায় প্রবেশ করবেন। আল্লাহ্ই সত্যের জন্য সহায়তাকারী।

১২. কোরান ১২, ১৪।

www.amarboi.org

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[গোত্রপ্রীতি একমাত্র রক্তসম্পর্ক ও তার সমস্থানীয় সম্বন্ধ থেকেই অস্তিত্বে আসতে পারে।]

এর কারণ এ যে, খুব কম সংখ্যক লোক ব্যতীত মানুষের স্বভাবে রক্ত সম্পর্কের আকর্ষণ বিদ্যমান। এ আকর্ষণের অন্যতম ফলশ্রুতি হল স্বজন ও ঘনিষ্ঠের উপর যাতে কোন বিপদ আপতিত ও অবিচার অনুষ্ঠিত হতে না পারে, তাই কামনা করা। কারণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের উপর কোন প্রকার আক্রমণ ও অত্যাচার হলে মানুষ স্বভাবতঃই বিক্ষুব্ধ হয়। এজন্য তারা ঐসকল বিপদ ও অত্যাচার এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। এটা এমন একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ, যা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান।

সুতরাং পরস্পর সাহায্যকারী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যদি এ বংশধারার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হয় তা হলে তা থেকে যে ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা জন্মলাভ করে, তাকে প্রকাশ্য সম্পর্ক বলা যেতে পারে। এর ফলে তার একক প্রভাব ও স্পষ্টতার জন্য ঐক্য সম্ভব হয়ে উঠে। কিন্তু যদি বংশ পরিচয় অনেকটা অঘনিষ্ঠ হয়, যেমন অনেক সময় তার কিছু অংশ বিস্মৃত ও কিছু অংশ মাত্র স্মৃতিতে বিরাজমান থাকে, তা হলে মানুষ এ ভেবেই এরূপ আত্মীয়কে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়, যাতে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির উপর অত্যাচার হতে দেখে নিশ্চুপ থাকার লজ্জা সে দূর করতে পারে। এরূপভাবে আশ্রিত পোষ্য ও চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের ব্যাপারেও মানুষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। কারণ এ ক্ষেত্রেও মানুষ সেই আকর্ষণ ও ঘনিষ্ঠতাই অনুভব করে থাকে, যার জন্য সে তার কোন প্রকারের আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীর স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হয়। বস্তুত আশ্রিত পোষ্যের সাথে তার যে সম্পর্ক গড়ে উঠে, তা প্রায় বংশধারা বা তার তুল্যই। এ থেকেই হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর নিম্নলিখিত বাণীর তাৎপর্য বোঝা যায়। তিনি বলেন, "তোমাদের বংশধারা সম্পর্কে ঐ জ্ঞান লাভ কর, যা তোমাদের রক্তসম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে পারে।" এর অর্থ এ যে, বংশধারা সম্পর্কীয় জ্ঞানের একমাত্র উপকার হল, তা দ্বারা রক্ত সম্পর্ককে সুদৃঢ় করা যায় এবং তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ঐক্য ও সহায়তার ভিত্তি গড়ে তোলা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য যা কিছু সকলই অতিরিক্ত। কারণ বংশধারা একটি কাল্পনিক বিষয় মাত্র, তার যথার্থতা বিশেষ কিছুই নেই। তার একমাত্র উপকার এ ঘনিষ্ঠতা ও ঐক্য সৃষ্টির মধ্যে নিহিত। সুতরাং এটা যদি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হয়, তা হলে তা মানুষকে তার প্রকৃতিগত আকর্ষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন পূর্বে আমরা বলেছি। আর

www.amarboi.org

যদি তা এমন হয় যে, একমাত্র বহুদূরে অবস্থিত সংবাদ থেকে জানা যায়, তা হলে তার সম্পর্কে মানুষের কল্পনাশক্তি দুর্বলতা অনুভব করে এবং তার উপকারিতাও সেইসঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন তা এমন একটি বিষয়, যার মধ্যে তৎপর হওয়া অর্থহীন এবং নিষিদ্ধ খেলার ন্যায়ই তা পরিত্যাজ্য। এদিক থেকে বিচার করলে অনেকের সেই কথার অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠে, যাতে তারা বলেন, "বংশধারা এমন একটি বিদ্যা, যা উপকার করে না এবং তা না জানাতে কোন ক্ষতি হয় না।" এর অর্থ এ যে, বংশধারা যখন অস্পষ্ট হয়ে উঠে, তখন তা শাস্ত্র বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু মানুষের উপর তার প্রভাবে যে ধারণার সৃষ্টি হওয়া দরকার, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়। তার মধ্যে সেই আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে না। যদ্বারা গোত্রপ্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং এ অবস্থায় এতে কি লাভ! আল্লাহ্ই পবিত্র, উন্নত ও সর্বজ্ঞ।

www.amarboi.org

নবম পরিচ্ছেদ

[সুস্পষ্ট বংশধারা কেবল তৃণশূন্য প্রান্তরবাসী বন্যপ্রকৃতির আরব-বেদুইন এবং তাদের সমস্থানীয় অন্যান্যের মধ্যে পাওয়া যায়]

এর কারণ, আরব বেদুইনরা তাদের জীবন-যাপনের দীনতা, অবস্থার কঠোরতা ও বাসস্থানের দুর্গমতার জন্য বিশিষ্ট। কেননা একটি প্রয়োজনই তাদেরকে এরূপ অবস্থার সম্মুখীন করেছে এবং তার নিকট তারা এর অধিক কিছু প্রত্যাশাও করতে পারে না। আর তা হল এ যে, তারা উট পালন ও তার বংশবৃদ্ধির জন্য চারণভূমি সংস্থানের মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ উট তাদেরকে মরুপ্রান্তরের বন্যজীবনের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। কারণ সেখানেই উটের আহার্য গুল্মাদি বিদ্যমান এবং তার বালুকার উপরেই উট তার বাচ্চা প্রসব করে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মরুপ্রান্তর প্রকৃতির দিক থেকে কঠোর এবং আহার্যসামগ্রীর দিক থেকে নিঃস্ব। অথচ এ স্থানই তাদের জন্য প্রিয় ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এবং তাতেই তারা বংশপরম্পরায় লালিত হচ্ছে। এমনকি এ জীবন-যাপন তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে পড়েছে। বাইর থেকে কেউ তাদের এ স্বভাবজাত দুরবস্থায় অংশগ্রহণ করতে যায় না এবং অন্য কোন গোত্রও তাদের সাথে সম্প্রীতি স্থাপনে অগ্রসর হয় না। বরং তাদের মধ্যে কেউ যদি এ দুরবস্থা থেকে পলায়ন করতে চায় ও তা তার পক্ষে সম্ভব হয়, তা হলেও দেখা যাবে, সে অন্যত্রও এ মরুস্বভাব ত্যাগ করতে পারছে না। সুতরাং এ সকল কারণেই তাদের বংশধারা সর্বদা অমিশ্র ও অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে বলে বিশ্বাস করা যায়। পাঠক, এ বক্তব্যের সাথে কোরায়েশের মুজার, কেনানা, ছকিফ, বনি আসাদ, হুজাইল ও তাদের প্রতিবেশী খুজাআ গোত্রসমূহের অবস্থা বিবেচনা করুন। এরা সকলেই কঠোর জীবনের অধিকারী ও শস্য ও দুগ্ধহীন প্রান্তরের অধিবাসী ছিল। সিরিয়া ও ইরাকের শস্য ও মসল্লাদির খনি সবুজ অঞ্চল থেকে বহু দূরে ছিল এদের অবস্থান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের বংশধারার প্রতি লক্ষ করুন, তা কত সুস্পষ্ট এবং মিশ্রণ হতে কত সুরক্ষিত! তাতে বিন্দুমাত্রও মিশ্রণের পরিচয় নেই।

অথচ যে সকল আরব-বেদুইন পাহাড়ী এলাকার জীবন ও চারণভূমির প্রাচুর্যের মধ্যে ছিল, যেমন হিমিয়ার ও কাহলানের লুখাম, জুযাম, গাস্ সান, তাই, কুজাআ ও ইয়াদ, তাদের বংশধারা মিশ্রিত হয়ে এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে গেছে। তাদের প্রতি গৃহেই এ বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান, যা মানুষের নিকট সুপরিচিত। তাদের এ মিশ্রণ অনারব গোত্রগুলোর সাথে মেলামেশা থেকেই এসেছে। তারা তাদের গৃহ ও

www.amarboi.org

গোত্রশাখায় বংশধারা সংরক্ষণের ব্যাপারটিকে আদৌ গুরুত্ব দেয় না। ফলে এটা শুধু আরব বেদুইনদের জন্যই অবশিষ্ট রয়েছে। হজরত উমর (রাঃ) বলেছেন, "বংশধারার জ্ঞান আহরণ কর এবং গ্রামাঞ্চলের নবতীদের মত হইও না; তাদের কাউকেও জিজ্ঞাসা করলে যে, তার পরিচয় কি, সে বলে আমি অমুক বস্তির অধিবাসী।"

এটাই সেই অবস্থা, যা সবুজ প্রান্তরবাসী বেদুইনদের ভাগ্যে জুটেছে। তারা খাদ্য ও চারণভূমির প্রাচুর্যের মধ্যে উত্তম এলাকায় বাস করে মানুষের সাথে মিশে গেছে। তার ফলে তাদের মধ্যে অধিক মিশ্রণ ও বংশধারার জটিলতা দেখা দিয়েছে। ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম দিকেও মানুষ পরিচয় দিবার সময় বাসস্থানের নাম উল্লেখ করত। যেমন বলা হত কিন্নাসরিনের দল, দামেশ্‌কের দল, আলআওয়াসেমের দল ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এ রীতি স্পেনেও এসে পৌঁছায়। বাসস্থানের নামে এ পরিচয় দান এজন্য হয়নি যে, আরব বেদুইনরা তাদের বংশধারার ব্যাপারটি ত্যাগ করেছিল, বরং বিজয়ের পরে তারা স্থায়ী বসবাসের স্থান পেয়েছিল এবং তার দ্বারা পরিচয়ের সুবিধা লাভ করেছিল। এর ফলে উক্ত পরিচয় তাদের বংশ পরিচয়ের অতিরিক্ত একটি চিহ্ন হিসাবে সর্দারদের নিকট গৃহীত হত। কিন্তু এর পর নগরগুলোতে অনারব ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে বংশধারার অবাধ মিশ্রণ দেখা দিল এবং বংশধারা সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হয়ে গেল। এর ফলে বংশধারার ফলশ্রুতি গোত্রপ্রীতি বিনষ্ট হওয়ায় তা পরিত্যক্ত হল এবং ক্রমে গোত্রগুলোর অস্তিত্ব লোপ ও তাদের সঙ্গে গোত্রপ্রীতিরও সমাধি রচিত হল। কিন্তু প্রান্তরে তা পূর্ববৎ অবশিষ্ট রয়েছে। আল্লাহ্ পৃথিবীর ও তদন্তর্গত সমুদয়ের অধীশ্বর।

www.amarboi.org

দশম পরিচ্ছেদ

[বংশধারায় মিশ্রণ কীভাবে ঘটে]

জেনে রাখুন, এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, কখনও কোন বংশের কেউ অপর বংশের সাথে নানা কারণে সংযুক্ত হয়ে যায়। এ সংযুক্তি আত্মীয়তা, চুক্তি, আশ্রিত, পোষ্যপ্রথা অথবা সংশ্লিষ্ট গোত্র কোন অপকর্ম করে পলায়নের দরুন হতে পারে। এর ফলে যে সংযুক্ত গোত্রের বংশধারা দাবি করে এবং গোত্রগত অন্যান্য ফলাফল, যেমন প্রীতি, রক্তমূল্য ও তৎসম্পর্কিত দায়িত্ব বহন এবং অন্য সকল অবস্থায় তাদের একজন বলে গণ্য হয়। সুতরাং সে যখন সংশ্লিষ্ট গোত্রের সমুদয় অধিকার ভোগ করতে পারে তখন তাদের একজন হওয়ার মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না। কারণ কোন ব্যক্তির এ গোত্রের অথবা ঐ গোত্রের হওয়ার অর্থ একটিই, তা হল সে তাদের সমুদয় নির্দেশের অনুসারী এবং সমুদয় অবস্থার অধিকারী হবে। সে যেন তাদের সাথে একীভূত হয়ে গেছে। এর পর সময়ের ব্যবধানের জন্য তার পূর্ববংশের কথা সকলেই ভুলে যায় এবং যারা এটা জানত, তারাও তিরোহিত হয়। এভাবে তা অধিকাংশ স্থলে গুপ্ত হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবেই এক বংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অনবরত নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে এবং প্রাক্ ইসলাম, ইসলাম, আরব ও অনারব আমলেও এক জাতি অন্য জাতির সাথে মিশ্রিত হয়েছে। পাঠক, আল মুনযির বংশ ও অন্যান্য গোত্র সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মতানৈক্যের বিষয়টি লক্ষ করুন তা হলে উপরোক্ত বক্তব্যের অনেকখানি আপনার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে বাজিলা গোত্রের উদাহরণ দেয়া যায়। হজরত উমর যখন আরফাজা ইবনে হারসামাকে তাদের উপর শাসক নিযুক্ত করলেন, তখন তারা এ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করল এবং বলল, সে আমাদের মধ্যে বহিরাগত অর্থাৎ সে আমাদের মধ্যে বাইরে থেকে এসে নিজেকে সংযুক্ত করেছে। তারা জরিরকে তাদের শাসক নিযুক্ত করবার জন্য হজরত উমরের নিকট আবেদন জানাল। তিনি আরফাজাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, "হে বিশ্বাসীদের নেতা, তারা সত্যই বলেছে; আমি মূলত আজদ গোত্রের লোক। আমার নিজ বংশে আমি একটি খুন করে ফেলি এবং তার ফলে এদের সাথে এসে সংযুক্ত হই।" পাঠক, লক্ষ করুন, কীভাবে আরফাজা বাজিলা গোত্রে মিশে গিয়ে তাদের পরিচয় গ্রহণ করেছিল এবং উক্ত বংশধারার দাবি নিয়ে শাসক নিযুক্ত হতে অগ্রসর হয়েছিল। যদি বাজিলা গোত্রের অনেকের মধ্যে এর জ্ঞান না থাকত, যদি তারা

www.amarboi.org

এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রকাশ করত এবং সময়ের ব্যবধান বেড়ে যেত, তা হলে সকলেই তা বিস্মৃত হত ও আরফাজা মত পথ সকল দিক থেকে তাদের একজন বলে গণ্য হত।

এ বিষয়টি বুঝে নিন এবং সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র রহস্যকে অনুধাবন করুন। এ প্রকার ঘটনা বর্তমান যুগে এবং এর পূর্ববর্তী অন্যান্য যুগে প্রচুর সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর দয়ায়, অনুগ্রহে ও করুণায় সত্যের দিকে নিয়ে যান।

www.amarboi.org

একাদশ পরিচ্ছেদ

[নেতৃত্ব সর্বদা গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন বংশের একটি বিশেষ অংশেই বিরাজ করে]

জেনে রাখুন, গোত্রগুলোর প্রতিটি শাখা ও প্রশাখা যদিও সাধারণ বংশধারার দিক থেকে একই গোত্রচেতনার অধীন, তথাপি তাদের মধ্যে বিশেষ বংশসম্পর্কের দরুন গোত্রপ্রীতির বিভিন্নতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত গোত্রপ্রীতিই সাধারণ বংশধারা চেতনা অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় ঐক্যের জন্মদাত্রী। যেমন একটি পরিবার, একটি ঘর অথবা এক পিতার সন্তান। এদের সাথে ঘনিষ্ঠ বা অঘনিষ্ঠ চাচাতো ভাইদের তুলনা হয় না। কারণ পূর্বোক্তরা তাদের বংশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা অন্যান্য অনেকের সাথে সাধারণ বংশধারাগত গোত্রচেতনার অংশীদার। বংশধারার এ বিশেষ সম্পর্ক ও সাধারণ সম্পর্ক উভয়ের প্রতিই মানুষের আকর্ষণ আছে। তথাপি তা এ বিশেষ বংশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতার জন্য অধিকতর তীব্র হয়ে থাকে।

নেতৃত্ব যদি কোন বংশের হস্তগত হয়, তা হলে তা বংশের বিশেষ একটি অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সমগ্রের মধ্যে নয়। আর নেতৃত্ব যেহেতু প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপার, সেজন্য উক্ত বিশেষ অংশটির গোত্রপ্রীতি অন্য সকল অংশ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হতে হবে। যাতে তদ্দ্বারা প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব হয় এবং নেতৃত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করে। তারা যদি এ বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, তা হলে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, নেতৃত্ব সর্বদাই এ বিশেষ অংশের মধ্যে তাদের প্রাধান্য বিস্তারের ফলে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি এটা বের হয়েও যায় এবং অন্য কোন গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন এমন গোষ্ঠীর হাতে পড়ে, যারা প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে পূর্বোক্তদের অপেক্ষা হীন, তা হলে তাদের নেতৃত্ব পূর্ণতা লাভ করবে না। সুতরাং নেতৃত্ব ঐ বিশেষ অংশেই সর্বদা বিরাজ করে তাদের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বিস্তৃত হবে এবং এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাখাটিই তা লাভ করবে। এর কারণও আমাদের পূর্বকথিত সেই প্রাধান্য বিস্তার। কেননা মানব সমাজ ও গোত্রপ্রীতির ব্যাপারটিকে সৃষ্টির অভ্যন্তরীণ মিশ্রণের সাথে তুলনা করা যায়। উক্ত মিশ্রণ কখনই সুসম্পন্ন হয় না, যদি সম্মিলিত উপাদানগুলো সমশক্তির অধিকারী হয়। তাদের মধ্যে যে কোন একটির প্রাধান্য বিস্তার অবশ্যম্ভাবী; নতুবা সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করবে না। গোত্রপ্রীতির মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারের শর্ত আরোপের রহস্য এটাই এবং এ থেকেই উক্ত বিশেষ অংশে নেতৃত্বের স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত হয়ে থাকে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

www.amarboi.org

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন অংশের নেতৃত্ব তাদের বংশ ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়]

এর কারণ এ যে, নেতৃত্ব প্রাধান্য বিস্তার ব্যতীত সম্ভব নয় এবং প্রাধান্য বিস্তার গোত্রপ্রীতি ছাড়া সম্ভব হয়ে উঠে না, যেমন পূর্বে বর্ণনা করেছি। কোন জাতির উপর নেতৃত্ব করতে হলে এমন একটি গোত্রপ্রীতির অধিকারী হতে হবে, যা তদন্তর্গত সমুদয় গোত্রপ্রীতির উপর একের পর এক প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। কারণ প্রতিটি গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী যখন সর্দারের গোত্রপ্রীতির প্রাধান্যের কথা বুঝতে পারবে, তখনই তারা অনুগত ও বাধ্য হয়ে উঠবে। যে ব্যক্তি অন্য বংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে, তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট বংশান্তর্গত গোত্রপ্রীতির সহায়তা লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ সে সংযুক্ত ও বহিরাগত। তার গোত্রত্ব আশ্রিত পোষ্য ও চুক্তির পর্যায়ে উপনীত হতে পারে; কিন্তু তাতে তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। যদি ধরে নেয়া যায় যে, সে তাদের সাথে এক হয়ে মিশে গেছে, তার সংযুক্তির সেই প্রাথমিক সময়ের কথা সকলে বিস্মৃত হয়েছে এবং তাদের গোত্রপরিচয় গ্রহণ করে সে তার দাবি করছে, তা হলেও এ একীভূত হওয়ার পূর্বে তার জন্য বা তার কোন পূর্বপুরুষের জন্য কি করে নেতৃত্ব লাভ করা সম্ভব! অথচ নেতৃত্ব কোন জাতির মধ্যে একটি উৎস থেকেই উৎসারিত হয়, যে উৎসের জন্য গোত্রপ্রীতির সাহায্যে প্রাধান্য বিস্তার নিশ্চিত হয়ে আছে। সুতরাং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এ সংযুক্তি ব্যক্তিটির প্রাচীনত্বের দাবি এমন একটি সময়ে তা সংঘটিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে, যখন তার সংযুক্তির পরিচয়ের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল না এবং নিয়ম অনুসারে এ সংযুক্তি তখন তার নেতৃত্বের পথে অবশ্যই বাধার সৃষ্টি করেছিল। কাজেই সেই সংযুক্তির অবস্থায় কী করে নেতৃত্ব বংশানুক্রমিকভাবে আবর্তিত হতে পারে? কারণ নেতৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে একমাত্র গোত্রপ্রীতির অধিকারী যোগ্য পূর্বপুরুষ থেকেই লাভ করা যায়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

অথচ এতদসত্ত্বেও বহু গোত্রসর্দার ও গোত্রপ্রীতির অধিকারী ব্যক্তিরা এমন সব বংশধারার প্রতি নিজেদের রক্ত সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হন, যাতে কোন এক সময়ে বীরত্ব, দানশীলতা, সুখ্যাতি ইত্যাদির একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তারা এ বিশেষ গোত্রের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করেন এবং তার একটি শাখা হিসাবে পরিচয় তুলে ধরে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। অথচ তারা জানেন না যে, এর ফলে তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র, তাদের নেতৃত্ব ও তাদের কৌলীন্যের উপর কিরূপ আঘাত আসে! বর্তমান যুগে

www.amarboi.org

বহুলোকের মধ্যেই এ অভ্যাস দেখা যায়। এরই একটি উদাহরণ, সমগ্র জানাতা গোত্রই নিজেদেরকে আরব বেদুইন বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে 'যুগাবা'র একটি শাখা বনি আমেরের অন্তর্গত রাব্বাবের বংশধররা, যারা হেজাজী বলে পরিচিত, তারা দাবি করে যে, তারা বনি সুলাইম তথা শরিদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের পূর্বপুরুষ বনি আমেরের সাথে শবাধার তৈরিকারক—সূত্রধর হিসাবে সংযুক্ত হয়েছিল। এভাবে তাদের সাথে একীভূত হয়ে তাদের গোত্র পরিচয় গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত তাদের সর্দার হয়ে উঠেছিল। তারা তাকে 'হেজাজী' বলে ডাকত। এরূপ বনি আব্দুল কাবি ইবনে আল আব্বাস ইবনে তওজীনের দাবি যে, তারা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর। উক্ত মহান বংশের সাথে তাদের নাম যুক্ত করবার লোভে তারা আব্দুল কাবির পিতা আব্বাস ইবনে আতিয়ার নামের মধ্যে এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। অথচ কোন আব্বাস বংশীয়ের মাগরিবে প্রবেশের কথা কখনও জানা যায়নি। কারণ মাগরিব অঞ্চল আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রথম থেকেই তাদের শত্রু আলী বংশীয় উবাইদী ও ইদরিসীদের করতলগত ছিল। এ দিক থেকে একজন আব্বাসীর পক্ষে আলী বংশীয়দের অনুসারী হওয়ার কথা কী করে ধারণা করা যায়?

অনুরূপভাবে বনি আব্দুল ওয়াহেদের অন্তর্গত যাইয়ানের বংশধর—তালিমিসানের রাজন্যবর্গ দাবি করেন যে, তাঁরা কাসেম ইবনে ইদরিসের বংশধর। এর উৎস এ যে, তাঁদের বংশ পরিচয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, তাঁরা কাসেমের বংশধর। সুতরাং তাঁরা তাদের জানাতী ভাষায় বলে, 'আন্তেল কাশেম' অর্থাৎ বনি কাশেম। এর পর তারা পরিচয় তুলে ধরে যে, এ কাসেম কাসেম ইবনে ইদরিস অথবা কাসেম ইবনে মুহম্মদ ইবনে ইদরিস। যদি এটা সত্যও হয়, তথাপি উক্ত কাসেমের চরম পর্যায় এ হতে পারে যে, তিনি তাঁর রাজ্য থেকে পলায়ন করে তাদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন মাত্র। এমতাবস্থায় ঐ প্রান্তরে তাদের মধ্যে তাঁর পক্ষে নেতৃত্ব লাভ করা কী করে সম্ভব হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এটা কাসেম নামেরই একটি বিভ্রান্তি। কারণ এ নাম ইদরিসীদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এতেই তাদের ধারণা জন্মেছে যে, তাদের কাসেমও এ বংশেরই অন্তর্গত। অথচ যাঁরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁদের আদৌ এতে প্রয়োজন নেই। তাঁরা রাজ্য ও সম্মান উভয়ই লাভ করেন তাঁদের গোত্রপ্রীতির জোরে; এতে উলূবী, আব্বাসী বা অন্য কোন বংশধারার কোন কৃতিত্ব নেই। এটা একান্তভাবে রাজন্যবর্গের নৈকট্যপ্রয়াসী ব্যক্তিদের কলহ-বিবাদ ও ধর্মমতের ফল। তাদের দ্বারাই এ বংশ পরিচয় প্রকাশিত হয় এবং ক্রমশ প্রচারিত হয়ে প্রতিবাদের সীমা অতিক্রম করে যায়। আমি যাইয়ানী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াগমারাসিন ইবনে যাইয়ান থেকে শুনেছি, তাঁর নিকট এ বংশ পরিচয়ের ব্যাপারটি উত্থাপিত হলে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর জানাতী ভাষায় এ মন্তব্যই করেছিলেন যার অর্থ হল, 'পার্থিব সম্পদ ও রাজ্যত আমরা তরবারীর সাহায্যেই লাভ করেছি, এতে বংশধারার কোন হাত নেই। অবশ্য বংশধারার জন্য যদি পরকালে কোন উপকার পাওয়া যায়, তা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে।' এভাবে তিনি উক্ত বংশ পরিচয়ের নৈকট্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে যগবার অন্তর্গত বনি ইয়াজিদের সর্দার বনি সাদ দাবি করেন যে, তাঁরা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর বংশধর, তওজীনের অন্তর্গত বনি

www.amarboi.org

ইয়াদলালতুনের সর্দার বনি সালামার দাবি, তাঁরা সুলাইম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং রিয়াহের সর্দার যাবেদীগণের দাবি, তাঁরা বারামেকীদের অধস্তন পুরুষ। এমনিভাবে আমরা জানতে পেরেছি যে, পূর্বাঞ্চলে তাই গোত্রের সর্দার বনি মাহনাও বারামেকীদের বংশধর বলে দাবি করছে। এ প্রকার উদাহরণ প্রচুর। তাঁদের নিজ জাতির মধ্যে তাঁদের নেতৃত্ব এ সকল দাবির অসারতা প্রতিপন্ন করে; এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। বরং তাঁদের এ নেতৃত্ব এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, তাঁরা সংশ্লিষ্ট জাতিরই অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের গোত্রপ্রীতির শক্তিশালী অংশীদার। পাঠক, এ বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং বিভ্রান্তি থেকে দূরে সরে থাকুন। আলমোহেদদের অন্তর্গত মেহেদীর আলী বংশের দাবিকে এ পর্যায়ে ফেলবেন না। কারণ আল মেহেদী তাঁর নিজ জাতি হারসামার নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন না। তিনি তাঁর জ্ঞানগুণ ও ধর্মমত প্রকাশ পাবার পরই তাদের নেতৃত্বে বরিত হয়েছেন এবং এর ফলেই তাঁর ডাকে মাসমুদা গোত্র সাড়া দিয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও গোত্রগত অবস্থানের দিক থেকে তাঁর পরিবার মধ্যম শ্রেণীর নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ অদৃশ্য ও দৃশমান সকল কিছুই জানেন।

www.amarboi.org

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[গোত্রপ্রীতির অধিকারীদের জন্যই বাস্তব কৌলীন্য ও যথার্থ বংশমর্যাদার অবকাশ আছে এবং অন্যদের বেলায় তার স্বরূপ আলংকারিক ও রূপক]

এর কারণ, বস্তুত কৌলীন্য ও বংশমর্যাদা ব্যক্তি চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। কৌলীন্যের অর্থ কোন ব্যক্তি এমন কুলে জন্মগ্রহণ করা, যাতে পূর্বপুরুষগণ মর্যাদা ও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। এর ফলে সে তাদের সন্তান হিসাবে ও বংশধারা উত্তরাধিকারী হওয়ার গৌরবে সমসাময়িক অন্যদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। কারণ মানুষ তার পূর্বপুরুষদের সৎচরিত্র ও পুণ্য মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার জীবন-যাপনে ও বংশধারা সংরক্ষণে সম্ভাবনাময়। হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছিলেন, "মানুষ সম্ভাবনার খনি। যারা জাহেলী যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল, তারা ইসলামী যুগেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে—যদি তারা বুদ্ধিমান হয়।"

বংশমর্যাদার ব্যাপারটি বংশের সাথে যুক্ত। আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, বংশধারার ফসল ও তার উপকারিতা একমাত্র পরস্পর আকর্ষণ ও সাহায্যের নিমিত্ত গোত্রপ্রীতি সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত। সুতরাং যেখানে গোত্রপ্রীতি শ্রদ্ধেয় ও সম্ভ্রমপূর্ণ এবং তার উৎস যেখানে পবিত্র ও সুরক্ষিত, সেখানেই বংশধারার সর্বাধিক স্পষ্টতা ও তার ফলশ্রুতির সারবত্তা বিদ্যমান। পিতৃপুরুষদের মধ্যকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা গণনা সেই ক্ষেত্রেই শুধু সোনার উপর সোহাগা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। সুতরাং কৌলীন্য ও বংশমর্যাদা মূলত বংশধারার ফলশ্রুতি গোত্রপ্রীতির সাথে সংযুক্ত এবং এর পার্থক্যের দরুন পরিবারে পরিবারে বংশমর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দিয়ে থাকে। কেননা এ মর্যাদা বস্তুত গোত্রপ্রীতিরই মহিমা।

এ দিক থেকে বিচার করলে পল্লীর অধিবাসী একক ব্যক্তিবর্গের জন্য কৌলীণ্য শুধু আলংকারিক অর্থেই সত্য হতে পারে। যদি তারা কৌলীন্যের কোন ধারণা পোষণ করেন, তবে তা জাঁকজমকপূর্ণ দাবি বলেই মনে করতে হবে। পাঠক, আপনি যদি বংশমর্যাদার দিক থেকে পল্লীবাসীদেরকে বিবেচনা করতে বসেন, তা হলে দেখতে পাবেন, তাদের এ দাবির অর্থ হল—তাদের প্রত্যেকেই নিজের পূর্বপুরুষকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী, চরিত্রবানদের সাহচার্য অবস্থানকরী এবং যতদূর সম্ভব সততার প্রতীক বলে মনে করে থাকে। এটা বংশধারার ফলশ্রুতি, গোত্রপ্রীতির মহিমার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং পূর্বপুরুষদের সংখ্যা গণনার নামান্তর মাত্র। এ জন্যই একে কৌলীন্য ও বংশমর্যাদা বলা একান্তই আলঙ্কারিকভাবে সত্য। কেননা এতে এ সত্যটি প্রকটিত হয়

www.amarboi.org

যে, পূর্বপুরুষদের অনেকেই পর্যায়ক্রমে একই সততার ধারা ও পথ অতিক্রম করে গেছেন। কিন্তু এটা যথার্থ অর্থে ও সাধারণভাবে বংশমর্যাদা নয়। যদি এরূপ প্রমাণ উপস্থিত করা হয় যে, বংশমর্যাদা উক্ত উভয় দিক থেকেই আভিধানিক অর্থে যথার্থ, তা হলেই তা এমন একটি সংশয়াচ্ছন্ন বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, যা অনেক ক্ষেত্রে উত্তম বলে বিবেচিত হয়।[১৩]

কখনও কোন পরিবারের জন্য গোত্রপ্রীতি ও চরিত্র মাহাত্ম্যের বলে প্রথম দিকে কৌলীন্য লাভ হতে পারে। কিন্তু এর পর তার নগরবাসী হওয়ার ফলে তা থেকে দূরে সরে গেছে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে তারা গোত্রহীন সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গেলেও তাদের হৃদয়ে বংশমর্যাদার একটি আপাত মধুর স্মৃতি বিদ্যমান এবং এর কল্যাণেই তারা নিজেদেরকে গোত্রপ্রীতির অধিকারী সম্ভ্রান্ত ঘরানার সদস্য বলে মনে করে। অথচ এ গোত্রপ্রীতি সার্বিকভাবেই তাদের এ প্রকার ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব। পল্লীবাসীদের মধ্যে এমন অনেক পরিবারই আছে, যারা তাদের প্রাথমিক যুগে আরব অথবা অনারব বংশাবলির মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিল, তারাই নিজেদেরকে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত করতে তৎপর হয়।

এ ক্ষেত্রে বনি ইসরাইলের মধ্যেই উক্ত আপাত মধুর ধারণার অধিকতর দৃঢ়তা দেখা যায়। উৎসের দিক থেকে তাদের কৌলীন্য একদা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কৌলীন্যসমূহের অন্যতম ছিল। প্রথমত তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে হজরত ইব্রাহীম থেকে আরম্ভ করে তাদের ধর্মের প্রবর্তক ও জাতির সংগঠন হজরত মুসা পর্যন্ত বহু নবীরসূলের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং দ্বিতীয়ত তাদের সেই গোত্রপ্রীতি, যার কল্যাণে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুত সাম্রাজ্যের অধিকারী করেছিলেন। এর পর তারা তা থেকে সম্পূর্ণ সরে এসেছে এবং ফলস্বরূপ তাদের ভাগ্যে জুটেছে অপমান ও দারিদ্র্য। তারা পৃথিবীর সকল স্থান থেকে বিতারিত হয়েছে এবং হাজার হাজার বছর ধরে বিধর্মীদের দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও উপরোক্ত আপাত মধুর ধারণা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেনি। এখনও তাদেরকে বলতে শোনা যায়—ইনি হারুন বংশীয়, ইনি ইউশার বংশধর, ইনি কালেবের সন্তান, ইনি যিহুদার অধস্তন পুরুষ। অথচ বাস্তব অবস্থা হল, সুদীর্ঘকাল ধরে তাদের মধ্যে গোত্রপ্রীতির অস্তিত্ব নেই এবং অপমান ও অসম্মান তাদের অবিচলিত ভাগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পল্লীবাসী ও অন্যান্য অঞ্চলের অনেকেই যাদের বংশধারায় গোত্রপ্রীতির কোন বালাই নেই, তারাও এমনি ধরনের অসার কথাবার্তা বলে থাকে।

আবুল ওলীদ ইবনে রুশদ এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে ভুল করেছেন। তিনি 'প্রথম শিক্ষক'[১৪] নামাঙ্কিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বাগ্মিতা অধ্যায়ে বংশমর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, বংশমর্যাদা হল কোন জাতির কোন নগরীতে বসবাস করার প্রাচীনত্ববোধক একটি বিষয়। তিনি, আমরা যে সকল বিষয় বর্ণনা করেছি, তার উল্লেখও করেননি। আক্ষেপ এ যে, যদি ঐ জাতির মধ্যে এমন কোন

১৩. যেমন সন্দেহযুক্ত পানি ছাড়া অন্য পানি না পাওয়া গেলে তা দ্বারাই অজু করা বিধেয়।
১৪. আরবীয় জ্ঞানীদের প্রদত্ত এ্যারিস্টটলের উপাধি। তাঁদের মতে ফারাবী দ্বিতীয় শিক্ষক।

www.amarboi.org

প্রীতিবন্ধন না থাকে, যদ্বারা তাদের প্রতি সমীহের ভাব উদ্রেক হয় এবং অন্যরা তাদের প্রভাবকে স্বীকার করে, তা হলে নগরবাসের এ প্রাচীনত্ব তাদের কোন্ উপকারে লাগবে? তিনি যেন বংশমর্যাদাকে শুধুমাত্র পিতৃপুরুষের সংখ্যা গণনার মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ বাগ্মিতা এমন একটি বিষয়, যদ্বারা একমাত্র দণ্ডমুণ্ডের কর্তাগণই মানুষের ভাবধারাকে প্রভাবিত করতে পারেন। যাদের এ প্রকার কোন ক্ষমতা নেই, তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। তারা যেমন অন্যকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয় না, তেমনি তাদের সে সুযোগও দেয়া হয় না। নগর জীবনের অধিকারী বিভিন্ন পল্লীবাসীর অবস্থা এর সাথে তুলনীয়। অবশ্য ইবনে রুশদ এমন এক গোত্রে ও অঞ্চলে প্রতিপালিত হয়েছেন, যেখানে গোত্রপ্রীতিকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয় না এবং তার অবস্থার সাথেও তারা পরিচিত নয়। সুতরাং তাদের নিকট তা অতি সাধারণভাবে পরিচিত পিতৃপুরুষের সংখ্যা গণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কৌলীন্য ও বংশমর্যাদার ক্ষেত্রে গোত্রপ্রীতির তাৎপর্যকে তারা সৃষ্টি জগতের সাথে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেননি। আল্লাহ্ সকল বিষয়েই অবগত।[১৫]

---

১৫. কোরান ২, ২৯।

www.amarboi.org

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[আশ্রিত পোষ্য ও অনুগতদের কৌলীন্য ও মর্যাদা তাদের প্রভুদের অনুরূপ বিষয়াদি অনুসারেই হয়ে থাকে; তাদের নিজেদের বংশধারা অনুসারে নয়]

এর কারণ, আমরা যেমন পূর্বে বলেছি, মর্যাদা বাস্তব বংশধারার এবং যথার্থভাবে গোত্রপ্রীতিসম্পন্নদেরই প্রাপ্য। সুতরাং যখন এরূপ গোত্রপ্রীতির অধিকারী কোন জনগোষ্ঠী অপর কোন বংশের লোককে অনুসারী করে নেয় অথবা দাস ও আশ্রিত পোষ্যদেরকে গ্রহণ করে নিজেদের সাথে একীভূত করে নেয়, তখন আমরা যেমন বলেছি, এ সকল আশ্রিত পোষ্য ও অনুসারীরা তাদের বংশান্তর্গত গোত্রপ্রীতির সাথে জড়িত বলে গণ্য হয় এবং তাদের পরিচয়েই পরিচিত হয়ে থাকে। তারা যেন তাদেরই গোত্রন্তর্ভুক্ত এবং তাদের বংশের গোত্রপ্রীতির ধারা অনুসরণ করেই তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে। যেমন হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "কোন জাতির পোষ্য, তাদের অন্তর্ভুক্ত।"[১৬] সে পোষ্যতা দাসত্বের কারণে অথবা কর্মে নিয়োগ ও চুক্তির কারণেও হতে পারে। কিন্তু যে কারণেই হোক, পোষ্যের জন্মবংশ এ গোত্রপ্রীতির ক্ষেত্রে কোন উপকারেই আসে না। কারণ এটা ঐ বংশধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। যেহেতু এ পোষ্য তার বংশ ছেড়ে অন্য একটি বংশে এসে মিশ্রিত হয়েছে, সুতরাং সেই সঙ্গে তার বংশের মহিমা গোত্রপ্রীতিও নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং নিজের গোত্রপ্রীতির আশ্রয় ত্যাগ করে সে সংশ্লিষ্ট বংশের একজন ও তাদের অন্তর্গত বলে গণ্য হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে যখন এ শেষোক্ত বংশের পিতৃপুরুষের গণনা আসবে, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের আশ্রয় ও অনুসরণের অনুপাতেই এর কৌলীন্য ও মর্যাদালাভ করবে। কিছুতেই তা আশ্রিত বা অনুসারীদের জন্য অতিক্রমণীয় হতে পারে না; বরং তারা সর্বাবস্থায় এ বংশের অন্যদের অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়েই অবস্থান করবে।

যে কোন রাজ্যে আশ্রিত ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এটাই সাধারণ অবস্থা। তাদের যা কিছু মর্যাদা, তা তাদের আশ্রয় ও কর্তব্যের দৃঢ়তার সাথে জড়িত এবং এ ব্যাপারে নিয়োজিত পিতৃপুরুষদের সংখ্যা গণনার মাধ্যমেই তারা এ দৃঢ়তার পরিমাপ করে থাকে। পাঠক, আব্বাসী সাম্রাজ্যে তুর্কি আশ্রিতদের অবস্থা বিবেচনা করতে পারেন। এদের পূর্বে বারমেকীরাও ছিল। নওবখত বংশীয়দেরও একই অবস্থা। এরা সকলেই সংশ্লিষ্ট বংশের মধ্যে নিজেদের আশ্রয়ের দৃঢ়তা ও কর্তব্যকর্মের প্রতি নিষ্ঠার অনুপাতেই মর্যাদা ও কৌলীন্য লাভ করেছে। এজন্যই জাফর ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে

---

১৬. বোখারী (৪র্থ) দ্র:।

www.amarboi.org

খালিদ সেই সম্রাট হারুনুর রশীদের আশ্রয় ও তাঁর বংশের পোষ্যতা অনুসারে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে মর্যাদা ও কৌলীন্যের অধিকারী হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাদের পারস্য বংশের আভিজাত্য কোন কাজেই আসেনি। এরূপ প্রতিটি রাজ্যের আশ্রিত পোষ্যদের এবং কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবস্থা। তাদের জন্য কৌলীন্য ও মর্যাদা সবকিছুই তাদের আশ্রয় সম্পর্কের দৃঢ়তা এবং তাদের কর্তব্যনিষ্ঠার যথার্থতা থেকে লাভ হয়ে থাকে। এ কারণেই তাদের পূর্ববর্তী বংশ সম্পর্ক প্রায় বিস্মৃত হয়ে উঠে এবং বর্তমান বংশধারার কতৃত্বাধীনে তাদের অবস্থার বাস্তবতা ও পর্যায় নির্ধারণে তাকে মোটেও গণ্য করা হয় না। এতে একমাত্র তার পোষ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠাকেই বিচার করা হয়; কারণ এগুলোর মধ্যেই গোত্রপ্রীতির সেই মহিমা বিদ্যমান, যদ্বারা, কৌলীন্য ও বংশমর্যাদা অর্জিত হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের মর্যাদা তাদের আশ্রয়দাতাদের মর্যাদা থেকে উৎসারিত এবং তাদের ভিত্তির উপরেই তার ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। তাদের জন্ম বংশ কোন কাজেই আসে না। একমাত্র সাম্রাজ্যের অধিকারী বংশের আশ্রয়, তাদের নিকটতর কর্তব্য সম্পাদন ও শিক্ষা গ্রহণই এ সকল লোকের মর্যাদা বাড়িয়ে থাকে। কখও হয়ত তাদের বংশ সম্পর্ক গোত্রপ্রীতি ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু এর পর চলে যাওয়ায় এবং তারা আশ্রিত ও কর্মে নিয়োজিত হয়ে অন্য বংশে চলে আসায়, পূর্বের সেই গোত্রপ্রীতিহীন বংশমর্যাদা কোন কাজেই আসে না; বরং তারা বর্তমান বংশের গোত্রপ্রীতির দ্বারাই উপকৃত হয়ে থাকে। বারমেকীদের অবস্থা ঠিক এমনই। শোনা যায়, তারা এক সময়ে পারস্যের অগ্নিমন্দিরগুলোর পুরোহিত হিসাবে কৌলীন্যের অধিকারী ছিল। কিন্তু তারা আব্বাসী সাম্রাজ্যের আশ্রিত হয়ে পড়লে সেই পূর্ব মর্যাদা একান্তই নগণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের যা কিছু মর্যাদা লাভ হয়েছে, তা একমাত্র উক্ত সাম্রাজ্যে তাদের আশ্রিত হিসাবে অবস্থান এবং কর্তব্যনিষ্ঠার ফলেই সম্ভব হয়েছে। এটা ব্যতীত আর যা কিছু, সকলই ধারণা মাত্র, যার আপাতঃমধুর আকর্ষণে অপরিশীলিত জীবাত্মারাই চঞ্চল হয়ে উঠে; এ চাঞ্চল্য অর্থহীন। বরং বাস্তব অবস্থা তাই, যা আমরা বলেছি। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিকতর মর্যাদাবান, যে অধিকতর ধর্মভীরু।[১৭] আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিকতর অবগত আছেন।

১৭ কোরান ৪৯, ১৩।

www.amarboi.org

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[একই বংশধারায় বংশ মর্যাদার স্থায়িত্ব মাত্র চার পুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়]

জেনে রাখুন, এ পৃথিবীর মৌল উপাদানের জগতে অবিরাম সৃষ্টি ও ধ্বংস চলছে। এটা যেমন বস্তুসত্তার জন্য সত্য, তেমনই তার আপতিত অবস্থানসমূহের জন্যও সত্য। পাঠক, আপনি লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন খনিজদ্রব্য, বৃক্ষলতা, সমস্ত প্রাণী, এমনকি মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এ সৃজন ও ধ্বংসের লীলা বিস্তৃত রয়েছে। এরূপ সত্তার উপর আপতিত অবস্থাসমূহও; বিশেষ করে মনুষ্যত্ব। জ্ঞান-বিজ্ঞানও বিকাশ পায়, লুপ্ত হয়; এমনিভাবে শিল্পকর্ম ও অন্যান্য বিষয়। বংশমর্যাদাও মানুষের বিশেষ একটি অবস্থা; সুতরাং এটাও সৃষ্টি ও ধ্বংসের অধীন, সন্দেহ নেই। পৃথিবীর মানব সমাজে এমন কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই, যার বংশমর্যাদা হজরত আদম (আঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে পূর্বপুরুষদের মধ্যে দিয়ে অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলে এসেছে। অবশ্য হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর কথা স্বতন্ত্র। কারণ তা তাঁর জন্য বিশেষ মর্যাদা ও এর মধ্যেই তাঁর নবুয়ত ও চরিত্র মাহাত্ম্যের রহস্য নিহিত। যেমন বলা হয়, প্রতিটি বংশমর্যাদার প্রাথমিক অবস্থা এর বিপরীত। এ বৈপরিত্ব হল নেতৃত্ব ও মর্যাদার অভাবহীনতা, অসম্মান ও অসম্ভ্রম। এর নির্গলিতার্থ হল, প্রতিটি বংশমর্যাদা ও কৌলীন্যের পূর্ববর্তী অবস্থা তার অস্তিত্বহীনতা। প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর এটাই চরিত্র।

অতঃপর একে চারিপুরুষে সীমাবদ্ধ করবার কারণ এ যে, মর্যাদার প্রতিষ্ঠাতা অবশ্যই জানেন কিসের সাহায্যে তিনি এর প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার সম্ভাবনার উপকরণ ও স্থায়িত্বের উপাদানগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে সেজন্য যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর পুত্র তাঁর পরে এসে তাতে অংশীদার হয় এবং তাঁর নিকট থেকে শ্রুতির সাহায্যে উক্ত সবকিছু গ্রহণ করে। এর ফলে পুত্রের শক্তিতে কিছুটা ত্রুটি দেখা দেয়। এ ত্রুটি শ্রুতি ও চাক্ষুষ দর্শনের পার্থক্যজাত। এর পর পৌত্র এসে শুধুমাত্র অনুসরণ ও অনুকরণের দায়িত্ব পালন করে। এর ফলে আরও ত্রুটি দেখা দেয়। বস্তুত এ ত্রুটি গবেষণাকারী ও অনুসরণকারীর মধ্যকার পার্থক্যের মতোই ব্যাপক। অতঃপর প্রপৌত্র এসে সম্পূর্ণভাবে ত্রুটির মধ্যেই পতিত হয় এবং তাদের বংশমর্যাদার সংরক্ষণকারী বৈশিষ্ট্যগুলোকে সম্পূর্ণ হারিয়ে বসে ও তাকে হেয় করে তোলে। তারা ধারণা করে যে, এ বংশমর্যাদার ব্যাপারটি কোন প্রকার প্রচেষ্টা ও কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই আজন্মকাল ধরে তাদের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এর জন্য কোন প্রকার গোত্রপ্রীতি বা চরিত্র গঠনের প্রয়োজন নেই। মানুষের উপরে তার প্রভাবটুকুই তাদের

www.amarboi.org

দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এ প্রভাব কীভাবে কখন সৃষ্টি হয়েছিল, তার কোন কথাই তারা জানে না। এ কারণেই তারা মনে করে, তা বংশধারারই গুণ, অন্য কিছু নয়। এর ফলে তারা গোত্র সম্পর্কের কোন তোয়াক্কাই করে না; বরং স্ববংশীয়দের তাদের প্রতি আনুগত্যকে তারা দৃঢ়ভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণজাত বলে ভাবতে থাকে। তারা চিন্তাও করে না যে, কোন্ চরিত্রগুণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য এ প্রকার আনুগত্য লাভে একসময় সক্রিয় হয়েছিল এবং অপরের অন্তর জয় করতে পেরেছিল। ফলে তারা স্ববংশীয়দেরকে তুচ্ছ ভাবতে থাকে। এর ফল স্বরূপ তারা এহেন বংশ কৌলীন্যের অধিকারীদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। প্রতিশোধ হিসাবে তাদেরকেও হেয় করে দেয় এবং এ বংশধারারই অন্য কোন অংশকে ক্ষমতা লাভে সাহায্য করে। এ উদ্যোগে তারা সাধারণভাবে বংশের শাখা-প্রশাখাগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকে। এর কারণও আমাদের সেই পূর্ব কথিত গোত্রপ্রীতির প্রতি অনুগত থাকার ফল। অবশ্য এ পরিবর্তন করতে গিয়ে তারা ক্ষমতায় উদীয়মান গোত্রটির মধ্যে তাদের প্রিয় চরিত্রগুলোকেই অনুসন্ধান করে এবং এটা লাভ করবার পর এ নতুন শাখাটির শক্তি বৃদ্ধি পায় ও পূর্ব শাখাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের বংশমর্যাদাজনিত প্রতাপের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। এটা অবশ্য রাজন্যবর্গের ব্যাপার। কিন্তু বেদুইন গোত্র, তার আমীরদের মর্যাদা ও সাধারণ গোত্রপ্রীতির ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। পল্লীবাসীদিগের মধ্যে এটা লক্ষ করা যায় যে, সেখানে একটি ঘরানার পতন ঘটলে সেই বংশেরই অন্য ঘরানার শক্তি বৃদ্ধি পায়। 'তিনি যদি চান তোমাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারেন এবং নতুন সৃষ্টির অভ্যুদয়ও তাঁর ইচ্ছাধীন। এ প্রকার কিছু করা আল্লাহ্র জন্য কঠিন নয়।[১৮]

বংশমর্যাদার আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্যে চারপুরুষের এ সীমাবদ্ধতা আরোপ, তা অধিকাংশের অবস্থা লক্ষ করেই করা হয়েছে। নতুবা অনেক ক্ষেত্রে এর অপেক্ষা কম পুরুষেও বংশমর্যাদা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার কখনও তা পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষে এসেও চলতে থাকে। অবশ্য তখন বংশমর্যাদা একান্তই পতনোন্মুখ ও ক্ষীয়মান। অন্যদিকে চারপুরুষের এ সীমা নির্দেশ চারটি বাস্তবতার পরিচায়ক—প্রতিষ্ঠাতা, তার সমসাময়িক অংশীদার, অন্ধ অনুসারী ও বিনষ্টকারী। বাস্তবতার ক্ষেত্রে এ সংখ্যাটিই সর্বাপেক্ষা কম বলে মনে করা যায়। প্রশংসার ক্ষেত্রেও অনেক সময় এরূপ চারপুরুষের কথা উল্লেখ করা হয়। যেমন হজরত মুহম্মদ (সঃ) বংশমর্যাদার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "অবশ্যই সম্ভ্রান্তের পুত্র সম্ভ্রান্ত—ইব্রাহিমের পুত্র ইসহাকের পুত্র ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ (আঃ)"।[১৯] বংশমর্যাদার একটা চরম সীমার কথাই তিনি এখানে ইঙ্গিত করেছেন। তৌরাতে যেমন আছে, যার অর্থ হল—আমি আল্লাহ্ তোমার প্রভু, ক্ষমতাবান, প্রতিহিংসুক এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত পিতৃপুরুষের পাপ সন্তান-সন্ততির মধ্যে সংক্রমণের অনুসন্ধানকারী। এ স্থলেও এ কথারই প্রমাণ বিদ্যমান যে, বংশমর্যাদার সীমা অধস্তন চারপুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে।

---

১৮. কোরান ১৪, ১৯।

১৯. বোখারী (২য়) দ্র:।

www.amarboi.org

'কিতাবুল আগানী'র 'উজায়েফুল গাওয়ানী'র[২০] সংবাদে বর্ণিত হয়েছে যে, খসু নুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আরবেও কি এক গোত্র অন্য গোত্র থেকে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী?" এর উত্তরে নুমান বললেন, হ্যাঁ। খসুর বললেন, কোন্ দিক থেকে? উত্তরে নুমান বললেন, যার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে পর্যায়ক্রমে তিনজন নেতৃস্থানীয় লোক বিদ্যমান এবং এর পর চতুর্থ পুরুষের গুণপনা এর সাথে যুক্ত হয়। এ অবস্থায় বংশমর্যাদা বলতে যা বোঝায়, তা এ গোত্রের জন্যই। খসরু এর অনুসন্ধান করলে মাত্র কতিপয় গোত্রের মধ্যে এরূপ যোগাযোগ পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে ফয়েস গোত্রের অন্তর্গত হুজাইফা ইবনে বদর আল-ফেজায়ীর পরিবার, শায়বান গোত্রের যুলজেদ্দাইনের পরিবার, কান্দার আল আস্ আছ ইবনে কয়েসের পরিবার এবং বনি তমীমের হাজেব ইবনে যুরারার পরিবার ও কয়েস ইবনে আসিম আল মুনকারীর পরিবার। এ সকল পরিবারকে তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীসহ একত্র করা হল এবং খসরুর দরবারে বিচারক ও শাস্ত্রবিদদের সম্মুখে উপস্থিত করা হল। সেখানে হুজাইফা ইবনে বদর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পর আল আস্ আছ ইবনে কয়েস—কেননা তাঁর সাথে নুমানের আত্মীয়তা ছিল। তাঁর পর বিস্তাম ইবনে কয়েস ইবনে শায়বান; তাঁর পর হাজেব ইবনে যুরারা এবং তাঁর পর কয়েস ইবনে আসিম। তাঁরা সকলেই বক্তৃতা করলেন। সমস্ত শুনে খসরু বললেন, এদের প্রত্যেকেই স্ব-স্ব স্থানের যোগ্য সর্দার। এ পরিবারগুলো বনি হাশেমের পরেই আরবের সর্বত্র খুবই জনপ্রিয় ছিল। এদের সঙ্গে বনি যূবিয়ানের বনি হারেস ইবনে কাব আল ইয়ামেনীকে যোগ করা যায়। এসব বিবরণ এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, বংশমর্যাদার সীমা পুরুষানুক্রমে চার পুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা।

২০. রোজেনথালে এর উচ্চারণ 'আওয়ায়েফুল কাওয়াফী' করা হয়েছে।

www.amarboi.org

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

[বর্বর জাতিগুলোই প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবান]

জেনে রাখুন, প্রান্তরে বসবাস করা যেহেতু শৌর্যবীর্যের কারণ, যেমন আমরা তৃতীয় প্রস্তাবনায়[২১] বলেছি, সুতরাং বর্বর গোত্রগুলোর অন্যান্য গোত্র অপেক্ষা অধিকতর শৌর্যের অধিকারী হওয়া অন্যায্য কিছু নয়। তারা প্রাধান্য বিস্তারে অধিকতর ক্ষমতাশালী এবং অন্যদের নিকট যা কিছু আছে, তা ছিনিয়ে নিতে অধিকতর পারঙ্গম। বরঞ্চ এ সকল গোত্রের অবস্থাও সময়ের ব্যবধানে বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে। যখনই তারা সবুজ প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হয়, প্রাচুর্যের সাথে পরিচিত হয় এবং স্বচ্ছলতার মধ্যে জীবনের ভোগ সম্ভোগে লিপ্ত হয়, তখনই তাদের প্রান্তর বাস ও বন্য প্রকৃতি হ্রাস পাওয়ার অনুপাতে তাদের শৌর্যবীর্যও হ্রাস পেয়ে থাকে। পাঠক, আপনি একে ভাষাহীন প্রাণীদের মধ্যেও বিবেচনা করে দেখতে পারেন। যেমন মরু প্রান্তরের হরিণ, বন্য গরু ও গাধা; যখন মানুষের সাথে মেলামেশার ফলে এদের বন্যতা দূর হয়ে যায় ও আহারে প্রাচুর্য আসে তখন কীভাবে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে! তাদের ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতায়, এমনকি তাদের চলার ও চামড়ার সৌন্দর্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বন্য মানুষও প্রায় অনুরূপভাবে পোষ ও বশ মানলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অধীন হয়। এর কারণ এ যে, মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতি গঠনের ক্ষেত্রে প্রিয় বস্তু ও অভ্যাস যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। জাতিসমূহের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপারটি যেহেতু ক্ষিপ্রতা ও দুঃসাহসের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং এদের মধ্যে যারা প্রান্তর চারিতা ও বন্যতার দিক থেকে অধিকতর দৃঢ়, তারাই প্রাধান্য বিস্তার শক্তির অধিকতর নিকটবর্তী। এদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংখ্যা, শক্তি ও গোত্রপ্রীতির সমতা দেখা দিলেও অধিকতর বন্যরাই জয়ী হয়ে থাকে।

পাঠক, এ দিক থেকে মুজার গোত্রের প্রতি লক্ষ করুন। এদের সাথে পূর্ববর্তী রাজ্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী হিমিয়ার ও কাহলানদের অবস্থা এবং ইরাকের সবুজ প্রান্তর ও প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাসকারী রাবিয়া গোত্রের অবস্থার তুলনা করুন। দেখতে পাবেন, মুজার যখন প্রান্তরে কৃচ্ছ্রতা সাধন করছে, তখন অন্যরা তাদেরকে ছাড়িয়ে জীবনের প্রাচুর্য ও বিলাসব্যসনের সম্ভোগের মধ্যে এগিয়ে গেছে। অথচ এ প্রান্তর বাস তাদের

২১. তৃতীয় প্রস্তাবনায় এই সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই; বরং দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ বিদ্যমান।

www.amarboi.org

শক্তিকে প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে কী প্রচণ্ডই না করে তুলেছে। তারা তার ফলে অন্যাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার কি করে তাদের করতলগত সকল কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। এটাই তাদের পরবর্তীকালে বনি তাই, বনি আমের ইবনে সাআসাআ ও বনি সুলাইম ইবনে মনসুরের অবস্থা। যেহেতু তারাও সমস্ত মুজার ও ইয়ামেনী গোত্রগুলো অপেক্ষা দীর্ঘদিন প্রান্তরে বসবাস করেছে এবং পার্থিব প্রাচুর্যের দিকে ফিরেও তাকায়নি। সেই জন্য কী প্রচণ্ডভাবেই না এ প্রান্তর বাস তাদের গোত্রপ্রীতির শক্তিকে বৃদ্ধি করেছে এবং ভোগ সম্ভোগের প্রাচুর্য থেকে দূরে রেখেছে। এর ফলে এ সকল গোত্রই পরবর্তীকালে প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্য সকলকে অতিক্রম করে গেছে। এমনিভাবে আরব বেদুইনদের প্রতিটি গোত্র, যারা যতবেশি সম্পদ, প্রাচুর্য ও বিলাসব্যসনের অধিকারী হয়েছে, তারা সেই পরিমাণে অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে হীন হয়ে পড়েছে। যদিও তারা সংখ্যায় ও শক্তিতে সমান হয়, তথাপি প্রান্তরবাসী গোত্রগুলোই প্রাধান্য ও ক্ষমতা বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রণী হবে। এটাই সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রথা।

www.amarboi.org

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[গোত্রপ্রীতির শেষ লক্ষ হল রাজ্য প্রতিষ্ঠা]

এর কারণ হল, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, গোত্রপ্রীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহায্য, প্রতিরোধ ও পরস্পর চাহিদা পূরণ এবং এর ফল সবকিছুর সম্মিলিত একটি ঐক্য। আমরা এটাও বর্ণনা করেছি যে, মানুষ যে কোন সমাজবদ্ধ জীবনে স্বভাবতঃই একজন শাসকের প্রত্যাশী, যিনি তাদের মধ্যে একটি সংযত শৃঙ্খলাবোধের সৃষ্টি করবেন। এরূপ একজন শাসকের জন্য গোত্রপ্রীতির মাধ্যমে প্রাধান্য বিস্তার একান্ত প্রয়োজনীয়, নতুবা তার পক্ষে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা লাভ করা সম্ভব নয়। এ প্রাধান্য বিস্তারই হল রাজ্য, এটা নেতৃত্বের অতিরিক্ত একটি বিষয়। কারণ নেতৃত্ব শুধু অনুসরণীয় হওয়ার একটি মর্যাদা, যার ফলে মানুষ নেতাকে মান্য করে থাকে। কিন্তু নেতার নেতৃত্বে তাদের উপর বিধি-নিষেধের কোন প্রতাপ থাকে না। রাজ্য এরূপ নয়, সেখানে রাজ্যাধিকারীকে প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে বিধি-নিষেধের প্রতাপকে সক্রিয় করে তুলতে হয়। গোত্রপ্রীতি ধন্য কোন ব্যক্তি যখন কোন একটি বিশেষ মর্যাদালাভ করেন, তখন তিনি অন্য একটির জন্য ইচ্ছুক হন। সুতরাং তার জন্য যখন নেতৃত্ব ও অনুসরণীয় হওয়ায় সৌভাগ্যলাভ হয়, তখনই তিনি ক্ষমতার প্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা প্রতাপশালী হয়ে উঠেন। এটা তাঁর পক্ষে ত্যাগ কা সম্ভব নয়; কেননা জীবাত্মার ধর্মই এ। এক্ষেত্রে এরূপ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ভিত্তি হল গোত্রপ্রীতি, যার জন্য সেই ব্যক্তি প্রথমে অনুসরণীয় হয়েছিলেন। কাজেই, পাঠক, আপনি লক্ষ করেছেন যে, গোত্রপ্রীতির শেষ লক্ষ হল রাজ্য ক্ষমতা লাভ।

অতঃপর কোন গোত্রে যদি একাধিক পরিবার ও একাধিক গোত্রপ্রীতির উৎস থাকে, তা হলে তাদের মধ্যে যে কোন একটির গোত্রপ্রীতি এমন সুদৃঢ় হবে, যাতে অপর সবগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে সকলকে নিজের বাধ্য করে নিতে পারে। এভাবে সে সকলের গোত্রপ্রীতিকে গ্রাস করে একটি সর্ববৃহৎ গোত্রপ্রীতিতে পরিণত হবে। অন্যথায়, তাদের মধ্যে কলহ ও মতানৈক্যের জন্য বিচ্ছিন্নতা দেখা দিতে বাধ্য। 'আল্লাহ্ যদি মানব সমাজের কতকাংশকে দিয়ে অপর কতকাংশকে দমন না করতেন, তা হলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।[২২]

এভাবে এ বৃহৎ গোত্রপ্রীতির সাহায্যে যখন স্বীয় জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারের কাজ সমাপ্ত হল, তখন এ ক্ষমতাবান স্বাভাবিক গতিতেই দূরস্থিত অপর গোত্রাদির উপর

---

২২. কোরান : ২, ২৫১।

www.amarboi.org

প্রাধান্য বিস্তারে অগ্রসর হন। ঐ সকল গোত্র ক্ষমতায় সমান হলে বা বাধা দিলে যুদ্ধ ও কলহ অনিবার্য হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে যে দল স্বীয় জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারে অধিকতর দৃঢ় ও সর্বজনীন, তারাই জয়ী হবে। এটাই পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন গোত্র ও দলের অবস্থা। এভাবে যে দল জয়ী হবে, বিজিত দল তাদের অনুগত ও তাদের সাথে একীভূত হয়ে নতুন শক্তি বৃদ্ধি করবে। এ নব উত্থিত শক্তি প্রাধান্য বিস্তারের পথ ধরে আরও বৃহত্তর শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকবে এবং পূর্বাপেক্ষা আরও বহুগুণ বিস্তৃত জনসমাজের উপর নিজেদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবে। অনুরূপভাবে সর্বদা অগ্রসর হয়ে তা সাম্রাজ্যের সমতুল্য শক্তির অধিকারী হয়ে উঠবে। এর পর যদি সে দেখে যে, কোন সাম্রাজ্য তার অন্তিম দশায় উপস্থিত হয়েছে এবং তার সাহায্যকারীদের মধ্যে এমন শক্তি নেই যে যোগ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, তা হলে এ নবোত্থিত শক্তি তার উপর চড়ে বসবে এবং তার সমুদয় ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবে। এভাবে সকল রাজ্যই তার কুক্ষিগত হয়ে পড়বে।

অবশ্য পূর্বোক্ত সেই সাম্রাজ্য তার অন্তিম দশায় নাও পৌঁছতে পারে, বরং তা তার শক্তির শেষ সীমায় উপনীত হয়েছে মাত্র। এমতাবস্থায় তার মধ্যে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, তা হল গোত্রপ্রীতিগত ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ এবং এর অভাবেই তারা আশ্রিত সাহায্যকারীদের হাতে রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছে। বস্তুত গোত্রপ্রীতির সাহায্যে প্রাথমিক যুগে সাম্রাজ্যের অধীশ্বররা যা করেছে, এখন অন্যদের সাহায্যে সেই উদ্দেশ্যই তারা পূরণ করতে থাকে। এটাও এক ধরনের ক্ষমতা লাভের ব্যাপার; কিন্তু এতে পূর্বোক্ত সেই সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়ার ব্যাপারটি নেই। যেমন আব্বাসী সাম্রাজ্যে তুর্কি সেনাপতিদের অবস্থা, যেমন কুতামাদের মধ্যে সিনহাজা ও জানাতাদের ক্ষমতা লাভ এবং যেমন আব্বাসী ও উলুবী শিয়া রাজন্যবর্গের উপরে প্রভাব বিস্তারকারী বনি হামদানের শাসন পরিচালনা।

সুতরাং এটা প্রতিষ্ঠিত হল যে, গোত্রপ্রীতির শেষ লক্ষ রাজ্য প্রতিষ্ঠা। এটা যখন তার চরম সীমায় পৌঁছে, তখনই একটি গোত্রের জন্য একটি রাজ্যের জন্ম হয়। কখনও অপরের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়া, আবার কখনও অপরের উপর প্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করা—স্থান-কাল ও সুযোগ-সুবিধা অনুসারে তা সংঘটিত হয়ে থাকে। এভাবে ক্ষমতা লাভের পথে যদি বাধা-বিপত্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব, তা হলে তা চরম রূপ ধারণ না করে মাঝপথেই থেমে যায় এবং সেইখানেই আল্লাহ্ তার সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশ না করা পর্যন্ত অবস্থান করে।

www.amarboi.org

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধাসমূহের অন্যতম হল কোন গোত্রের বিলাসব্যসন ও প্রাচুর্যের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া]

এর কারণ এ যে, কোন গোত্র যখন গোত্রপ্রীতির সাহায্যে কিছুদূর পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়, তখন তারা সেই অনুপাতে প্রাচুর্যেরও অধিকারী হয়ে থাকে এবং প্রাচুর্যবিলাসীদের সাথে মিলিত হয়ে তারাও প্রাচুর্য ও বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। অবশ্য এক্ষেত্রে তারা ততটুকুরই অধিকারী, যতটুকু কোন সাম্রাজ্যের উপর তাদের প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তারে অনুমতি দেয়। সাম্রাজ্য যদি এ পরিমাণ শক্তিশালী হয় যে, তার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবার বা তার অংশীদার হবার সুযোগ কাকেও না দেয়, তা হলে উক্ত প্রভাবশালী গোত্র, তার আশ্রিত হওয়ার, তার প্রাচুর্যে তৃপ্তিলাভ করার এবং ধনসম্পদে অংশীদার হয়ে থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তার আকাঙ্ক্ষা কখনও ক্ষমতা হস্তগত করবার বা তার কারণসমূহ উদ্ভাবন করবার দিকে পরিচালিত হয় না। বরং তাদের একমাত্র উচ্চাভিলাষ হল সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে প্রাচুর্যের অনুসন্ধান করা। এমনিভাবে তারা ধন-সম্পদ, জীবিকার প্রাচুর্য, উপার্জন, আরাম-আয়েশ, রাজন্যবর্গ, সুলভ গৃহ, পরিচ্ছদ, তার প্রাচুর্য ও অলংকরণ এবং সেই অনুপাতে যোগ্য বিলাসব্যসন ও তার আনুষঙ্গিক কর্তব্যাদিতে ব্যাপৃত হয়ে থাকে। এর ফলে তাদের প্রান্তরবাসের দৃঢ়তা দূর হয়ে যায় এবং গোত্রপ্রীতি ও সাহসিকতা দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাচুর্যকে নিজেদের ক্ষমতার শেষসীমা মনে করে। তাদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধররাও সাম্রাজ্যের আনুগত্য থেকে উচ্চ পদ লাভের আকাঙ্ক্ষাকেই উন্নতির চরম সীমা বলে ভাবে। এভাবে তারা গোত্রপ্রীতির সমুদয় প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোকে নষ্ট করে ফেলে। অবশেষে এরূপ প্রাচুর্য বিলাসিতাই তাদের চরিত্র ও প্রকৃতিতে পরিণত হয় এবং তাই তাদের গোত্রপ্রীতির ধারাকে, তাদের সাহসিকতার ঐতিহ্যকে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে মূল্যহীন করে তোলে। ফলে এক সময় তাদের ইচ্ছাতেই গোত্রপ্রীতি সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়। এভাবে যতই তারা বিলাসব্যসনে ও প্রাচুর্যে জড়িয়ে পড়ে, ততই তাদের শক্তি ক্ষয় পেতে থাকে; তখন রাজ্য প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা তাদের অস্তিত্বই বিনাশের সম্মুখীন হয়। কারণ তারা প্রাচুর্যের মধ্যে তৃপ্তিলাভ করে ও বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত হয়ে প্রাধান্য বিস্তারের মূল শক্তি গোত্রপ্রীতিকেই হারিয়ে বসেছে। সুতরাং কোন গোত্রের যদি এ অবস্থা হয়, তা হলে তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে ও প্রতিরোধ করতেই সমর্থ হয় না, তাদের পক্ষে কোন কিছু দাবি করা তো অসম্ভব। পরিণামে তারা অপরের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। এতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, বিলাসব্যসন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধাস্বরূপ। 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজ্য দান করে থাকেন।'[২৩]

---

২৩. কোরান ২, ২৪৭।

www.amarboi.org

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধাসমূহের অন্যতম কোন গোত্রের হীনমন্যতা ও অপরের প্রতি আনুগত্য]

এর কারণ, হীনমন্যতা ও আনুগত্য গোত্রপ্রীতির তীব্রতা ও তার ব্যাপকতা বিনষ্ট করে। কারণ যে কোন গোত্রের হীনমন্যতা ও আনুগত্যই প্রমাণ করে যে, তাদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি অস্তিত্বহীন। যারা হীনমন্যতাকে লালন করে, তাদের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং যারা প্রতিরোধ শক্তিতে অক্ষম, তারা যে স্বনির্ভরতা ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে দুর্বল হবে, তাতে আর বিচিত্রতা কী!

এর একটি সুন্দর উদাহরণ বনি ইসরাইলের কাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান। হজরত মুসা (আঃ) যখন তাদেরকে ইরাকের দিকে আহ্বান করলেন এবং এমনও বললেন যে, আল্লাহ্ তাদের জন্য সেখানে রাজ্য নির্ধারিত করে রেখেছেন, তখন তারা কী শোচনীয়ভাবেই না সাড়া দিতে ব্যর্থ হল। প্রত্যুত্তরে তারা বলল, "ঐ স্থানে উৎপীড়ক একটি জাতি বিদ্যমান, তারা বের হয়ে না গেলে আমরা কিছুতেই সেইখানে প্রবেশ করব না।"[২৪] অর্থাৎ আমাদের গোত্রপ্রীতিগত শক্তির সাহায্যে নয়, বরং আল্লাহ্ তাঁর মহিমার দ্বারা তাদেরকে সেখান হতে বের করে দিন, যাতে তা তোমার জন্য একটি অলৌকিক বিষয় হতে পারে, হে মুসা! তিনি যখন তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন, তখন তারা আরও ভেঙে পড়ল এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে বলল, "যাও, তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ কর।"[২৫] এর একমাত্র কারণ যেমন পূর্বোক্ত কোরানের আয়াতে বোঝা যায় এবং বিশ্লেষণ করলেও বের হয়ে পড়ে, তারা তাদের মধ্যে শক্তি ও আকাঙ্ক্ষার কোন উদ্দেশ্যই খুঁজে পায়নি। কারণ তারা দীর্ঘকাল ধরে কিবতীদের অনুগত থেকে একান্তই হীনমন্য হয়ে পড়েছিল। এর ফলে গোত্রপ্রীতি তাদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। অন্যদিকে তারা এ কথা যথার্থভাবে বিশ্বাস করতে পারে নি যে, মুসা কথিত ইরাক সত্যই তাদের অধিকারে আসবে এবং আরিহা(জেরিকো)য় অবস্থানরত আমালেকীরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মতই তাদের বশীভূত হবে। এ জন্যই তারা আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এ অক্ষমতাকে তাদের অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষাহীনতা ও চারিত্রিক হীনমন্যতার ফসল বলে মনে করেছে। আর এরই ফলশ্রুতি হিসাবে তাদের নবীর প্রদত্ত সুসংবাদেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি এবং তাঁর আদেশ অমান্য

---

২৪. কোরান ৫, ২২।
২৫. কোরান ৫, ২৪।

www.amarboi.org

করতেও দ্বিধা করেনি। সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকে তীহ প্রান্তরে অবস্থানের শাস্তি দিলেন।[২৬] অর্থাৎ তারা ইরাক ও মিসরের মধ্যবর্তী মরু প্রান্তরে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে। এ সময়ে তারা কোন জনবসতির আশ্রয় পায়নি, কোন জনপদে যায়নি এবং অন্যকোন মানবগোষ্ঠীর সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেনি। কোরানে তা বর্ণিত হয়েছে। এ সময়ে ইরাকে ছিল আমালেকীরা এবং মিসরে ছিল কিবতীরা। এরা উভয়ে ছিল শক্তিমান, অন্তত তাদের ধারণামতে এ উভয় শক্তিকে অতিক্রম করার কোন ক্ষমতাই তাদের মধ্যে ছিল না।

কোরানের বর্ণনাধারায় ও তার তাৎপর্য থেকে এটাই মনে হয় যে, ঐ তীহ প্রান্তরে অবস্থানের রহস্যটি হল, বনি ইসরাইলের যে জনগোষ্ঠী হীনমন্যতা, উৎপীড়ন ও শক্তির প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়ে এখানে এসেছিল, তাদের তিরোধান। কেননা তারা দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে তাদের গোত্রপ্রীতিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেছিল। সুতরাং তাদের দ্বারা নয়, বরং তাদের মধ্যেই অন্য এক পুরুষ জন্ম নিবে, যারা এ সকল বিধি-নিষেধ, উৎপীড়ন ও হীনমন্যতার কথা জানেন না, কেবল তাদের দ্বারাই সেই হৃত গোত্রপ্রীতি উদ্ধার করা সম্ভব। এর ফলে এ নবীন পুরুষের মধ্যে গোত্রপ্রীতির সেই শক্তি জাগ্রত হবে, যদ্বারা প্রাধান্য বিস্তার ও ক্ষমতা লাভ সম্ভব হবে। এতে এ কথাটিও আপনার জন্য পরিষ্কার হয়ে উঠবে, হে পাঠক, যে, একটি পুরুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে অন্য একটি নবীন পুরুষের অভ্যুদয়ের জন্য চল্লিশ বছরের প্রয়োজন। পবিত্র তিনি, অতিশয় বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ।'

এ ঘটনাতে গোত্রপ্রীতির মহিমার সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। তাই সেই শক্তি, যদ্বারা প্রতিরোধ, স্বনির্ভরতা, সহায়তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়ে থাকে। যে জাতি তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তার পক্ষে এ সকল গুণের কোনটিই লাভ করা সম্ভব নয়।

এ পরিচ্ছেদের বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে মাথট ও কার প্রদানের বিষয়টিও এসে পড়ে। এটাও যে কোন গোত্রের পক্ষে হীনমন্যতার পরিচায়ক। কারণ কোন গোত্রই হীনমন্যতা স্বীকার না করে মাথট প্রদান করতে পারে না। বস্তুত এ মাথট ও কর প্রদানের মধ্যে এমন একটি অপমানজনক অবস্থা বিদ্যমান, যা যে কোন আত্মনির্ভরশীল গোত্রের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। একমাত্র হত্যা ও ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা তাকে পর্যুদস্ত করতে পারলেই তার পক্ষে এ মেনে নেয়া সম্ভব হতে পারে। কারণ তখন তার গোত্রপ্রীতি খুবই দুর্বল থাকে; তার পক্ষে সাহায্য বা প্রতিরোধ কোনটাই তখন সম্ভব নয়। সুতরাং যার গোত্রপ্রীতি তাকে অপমান থেকেই বাঁচাতে পারে না, তার জন্য স্বনির্ভর ও স্বাধিকারের প্রশ্ন তো বাতুলতা মাত্র। সুতরাং হীনমন্যতা ব্যতীত তার অন্যকোন পথ নেই এবং হীনমন্যতা একটি বিরাট বাধা, যেমন পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

এ প্রসঙ্গে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর একটি বাণী উদ্ধৃত করা যায়। তিনি আনসারদের কারও ঘরে লাঙ্গলের ফলা দেখে বলেছিলেন, "এটা যাদের ঘরে প্রবেশ করেছে, সেখানে হীনমন্যতাও প্রবেশ করেছে।" কৃষি সম্পর্কীয় এ উক্তিতে এ কথারই প্রমাণ বিদ্যমান যে, মাথট প্রদানকারীর জন্য হীনমন্যতা অবশ্যম্ভাবী। এর সঙ্গে এ প্রকার

২৬. কোরান ৫, ২৬।

www.amarboi.org

কর ও মাথট প্রদানকারীদের মধ্যে ধোঁকা ও প্রতারণার যে চরিত্র গড়ে উঠে, তাও উল্লেখযোগ্য।[২৭] কারণ দাপটের অত্যাচারেই তারা এরূপ করতে বাধ্য হয়। কাজেই পাঠক, আপনি যখন এমন কোন জাতিকে দেখতে পাবেন, যারা কর ও মাথট প্রদানের মাধ্যমে হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তা হলে এটা নিশ্চিত ধরে নিতে পারেন যে, তাদের জন্য কোন কালেই কোন রাজ্য লাভ সম্ভব নয়।

এ থেকেই আপনার জন্য এ ভুল ধারণাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যা অনেকেই পোষণ করে থাকে যে, জানাতারা পূর্বে মাথট প্রদানকারী পশুজীবী ছিল এবং তারা এর মাধ্যমে তৎকালীন রাজন্যবর্গের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এটা যে একান্তই ভুল, তা আপনি অবশ্যই লক্ষ করেছেন। যদি এটা বাস্তব হত, তা হলে তাদের পক্ষে কোন প্রকার রাজ্য লাভ ও সাম্রাজ্য বিস্তার সম্ভব হত না। লক্ষ করুন, 'বাব' (দরবন্দ) এর রাজা শহর বেজার আব্দুর রহমান ইবনে রাবিয়াকে কীভাবে এ সম্পর্কে বলেছিলেন। আব্দুর রহমান যখন তাঁর উপর জয়ী হলেন, তখন তিনি অনুগত থাকবার প্রতিশ্রুতিতে নিরাপত্তা চেয়ে বলেছিলেন, "অদ্য আমি আপনাদেরই একজন, আমার হাত আপনাদের হাতে ন্যস্ত— আমার অন্তর আপনাদের সাথে জড়িত। সুতরাং আপনাদেরকে স্বাগত জানাই, আল্লাহ্ আমাদেরকে ও আপনাদের সকলকে কল্যাণ দান করুন। আমাদের উপর আপনাদের বিজয়ই আমাদের মাথট প্রদান তুল্য। আপনারা যা ভাল মনে করেন, করতে পারেন; শুধু আমাদেরকে মাথট প্রদানে বাধ্য করে হীনমন্য করে তুলবেন না। তা হলে আমরা আপনাদের শত্রুদের চক্ষে হেয় বলে প্রতিপন্ন হব।" পাঠক, আপনি এ উক্তিকে আমাদের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে দেখুন। যথার্থই এটা যথেষ্ট।

---

২৭. এ স্থলে রোজেনথাল একটি হাদিসের উল্লেখ করেছেন—হজরত মুহাম্মদ (সঃ) কর প্রদান পছন্দ করতেন না। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন, কর প্রদানকারী কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এটা নেই।

www.amarboi.org

বিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজ্যশক্তির নিদর্শনসমূহের মধ্যে সৎ চরিত্রের প্রতিযোগিতা অন্যতম এবং এর বিপরীত অবস্থা]

যেহেতু রাজ্য প্রতিষ্ঠা মানুষের স্বভাবগত ব্যাপার, কেননা সমাজবদ্ধ জীবন তার স্বভাবের অন্তর্গত, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, সুতরাং সে জন্মগত স্বভাবের তাড়নায় ও চিন্তাশীল বিবেচনা শক্তির কল্যাণে অসৎ চরিত্র থেকে সৎ চরিত্রের অধিকতর নিকটবর্তী হয়ে থাকে। কারণ অসৎ চরিত্র মূলত তার মধ্যকার পাশবিক শক্তিগুলো থেকে আবির্ভূত হয়। কিন্তু মানুষ হিসাবে সে সৎ চরিত্রের নিকটবর্তী হতে বাধ্য। রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা উভয়েই তার মনুষ্যত্বের অবদান। কারণ এ অবদান একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব, পশুর পক্ষে নয়। সুতরাং তার মধ্যকার একমাত্র সৎ চরিত্রই শাসন ব্যবস্থা ও রাজ্যের অনুকূল। বস্তুত সৎ চরিত্রই একমাত্র সুশাসনের উপযোগী।

আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, মর্যাদার একটি ভিত্তি বিদ্যমান, যার উপরে তা সংস্থাপিত হয় এবং যদ্বারা তার অস্তিত্ব বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তা হলে গোত্রপ্রীতি ও পরিবারবর্গ। মর্যাদার কিছু শাখা-প্রশাখাও রয়েছে, তার সাহায্যেই তা স্থিতিশীল হয় ও পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তা হল চরিত্র। গোত্রপ্রীতির লক্ষ যদি রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়, তা হলে তার শাখা-প্রশাখা ও পরিপূর্ণতার উপকরণও তার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাকেই চরিত্র বলা যেতে পারে। কারণ তার পরিপূর্ণতা বিধায়ক উপকরণসমূহ ব্যতীত তার অস্তিত্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তিত কোন ব্যক্তির তুল্য অথবা জনসমাবেশে উলঙ্গ হয়ে কোন ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের মতোই বিসদৃশ। যদি কোন পারিবারিক ঐতিহ্যে ও বংশ মর্যাদায় সৎ চরিত্রের অনুশীলনহীন গোত্রপ্রীতি দূষণীয় বলে বিবেচিত হয়, তা হলে রাজ্যাধিপতিদের সম্পর্কে, পাঠক, আপনার কী ধারণা! তা ত সকল গৌরবের চরম পর্যায় এবং সকল বংশমর্যাদার গন্তব্যস্থল!

তদুপরি রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা উভয়েই সৃষ্টির প্রতিপালন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে তাঁর বিধি-নিষেধ প্রবর্তনের জন্য তাঁর প্রতিনিধিত্ব। সৃষ্টির মধ্যে ও মানব সমাজে আল্লাহ্‌র সমুদয় বিধি-নিষেধ হল কল্যাণধর্মী ও যোগ্যতার অনুসারী, যেমন তৎসম্পর্কে সকল ধর্মমতই সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। অন্যদিকে মানুষের[২৮] বিধি-বিধান একান্তই মূর্খতা ও শয়তানের কাজ। কারণ তাতে আল্লাহ্‌র মহিমা ও তাঁর সত্যাসত্য নির্ধারণের

---

২৮. রোজেনথাল লিখেছেন, 'অসৎ বিধি-বিধান'; একটি পাঠে এটা বিদ্যমান।

www.amarboi.org

বিরোধিতাই প্রকট। বস্তুত আল্লাহ্ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সৎ ও অসৎ উভয়কেই ক্রিয়াশীল করেছেন। কারণ তিনি ব্যতীত আর কোন কর্তা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাগ্যে আল্লাহ্র মহিমায় প্রতিপালনধর্মী গোত্রপ্রীতির মর্যাদা জুটল এবং যার চরিত্রে মানব সমাজে আল্লাহ্র বিধি-বিধান প্রবর্তনের উপযোগী কল্যাণধর্মী সততা দেখা দিল, বুঝতে হবে, সেই যথার্থ প্রতিনিধিত্ব ও প্রজা পালনের যোগ্য এবং তার মধ্যেই এদের উপযুক্ত সঙ্গতি বিদ্যমান।

এ যুক্তি-প্রমাণ পূর্ববর্তীটি অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় ও শুদ্ধতর ভিত্তির উপর স্থাপিত। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তির গোত্রপ্রীতি লাভ হয়েছে, তার মধ্যে সৎ চরিত্র দেখা গেল, তা রাজ্যের অস্তিত্বেরই দ্যোতক বলে বুঝতে হবে। এদিক থেকে আমরা যখন গোত্রপ্রীতিধন্য জাতিগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি এবং চুতর্দিকে বিভিন্ন জাতির উপর তাদের প্রাধান্য বিস্তারের রহস্য অনুসন্ধান করতে বসি, দেখতে পাই তারা সততা ও সৎচরিত্রের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তাদের মধ্যে ভদ্রতা, ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি ক্ষমা, দুর্বলের প্রতি সহনশীলতা, অতিথি বাৎসল্য, দুস্থের সেবা, নিঃস্বের জীবিকা দান, বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ, প্রতিশ্রুতি পালন, সম্ভ্রম রক্ষার্থে অর্থব্যয়, ধর্মের প্রতি সমীহ ভাব, ধর্মীয় জ্ঞানীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁদের নির্ধারিত বিধি-নিষেধের প্রতি আস্থা স্থাপন, তাঁদের প্রতি সৎ ধারণা পোষণ, ধর্মীয় নেতাদের প্রতি বিশ্বাস, তাঁদের পুণ্য সাহচর্য কামনা, তাঁদের আশীর্বাদের প্রতি আগ্রহ, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উস্তাদগণের সম্মুখে লজ্জা, তাঁদের প্রতি সমীহ ও সম্মানের ভাব, সত্য ও তৎপ্রতি আহ্বানকারীর প্রতি আনুগত্য, অক্ষমের প্রতি সুবিচার, তাদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন, তাদের অধিকারের স্বীকৃতিদান ও তাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন; অভিযোগকারীদের অভিযোগ শ্রবণ, ধর্মের বিধি-নিষেধ পালন ও উপাসনাদিতে অংশগ্রহণ, ধর্ম ও তার উপকরণাদিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ, বিশ্বাসঘাতকতা—চক্রান্ত-প্রতারণা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ইত্যাকার অন্যান্য বিষয় থেকে দূরে অবস্থান প্রভৃতির ন্যায় গুণাবলি বিদ্যমান। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, এ সকলই শাসন-ব্যবস্থার অপরিহার্য গুণাবলি, যা তারা অর্জন করেছেন এবং এর মাধ্যমেই তাদের অধীনস্থ প্রজাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তা সর্বজনীন আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এটাই সেই কল্যাণধর্মিতা, যা আল্লাহ্ তাদের গোত্রপ্রীতি ও প্রাধান্য বিস্তারের উপযোগী করে তাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। এ সকল গুণাবলি তাদের মধ্যে অহেতুক বা অনর্থক নয়। বস্তুত এরই কল্যাণে রাজ্য তাদের গোত্রপ্রীতির জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা ও কল্যাণের আকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই জন্য বুঝতে পারি, সত্যই আল্লাহ তাদেরকে রাজ্য পরিচালনার অনুমতি দিয়েছেন এবং তার দায়িত্বভার তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

অন্যদিকে এর বিপরীত কিছু দেখা গেলে বুঝতে পারি, আল্লাহ্ যখন কোন জাতির নিকট থেকে রাজ্য কেড়ে নিতে মনস্থ করেন, তখন তাদের মধ্যে দুষ্কর্ম, মন্দ স্বভাব ও বিপথগমনের ব্যবস্থা করে দেন। ফলে তাদের মধ্য থেকে শাসন ব্যবস্থার উপযোগী গুণাবলি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। এভাবে রাজ্য ও অনবরত বিচ্যুতির পথে চলে একসময়ে সম্পূর্ণভাবে তাদের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তাদের স্থলে অন্যরা এসে উপস্থিত হয় এবং আল্লাহ্ এক সময়ে তাদের হাতে যে রাজ্যশক্তি ও কল্যাণধর্মিতা তুলে দিয়েছিলেন, তা ছিনিয়ে নিতে তাদেরকে শিক্ষা দেন। 'আমরা যখন কোন জনবসতিকে ধ্বংস করে

www.amarboi.org

দিতে ইচ্ছা করি, তখন তদন্তর্গত প্রাচুর্য বিলাসীদেরকে আদেশ করে, তারা সেখানে অপকর্মে লিপ্ত হয়। অতঃপর সেই কথাই সত্য হয় এবং আমরা তাকে সমূলে বিনষ্ট করে ফেলি।'[২৯] পাঠক, এটা গভীরভাবে অনুধাবন করুন এবং প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে এর অনুসন্ধান করুন; আমরা যেরূপ বলেছি ও বর্ণনা করেছি, তার প্রচুর নিদর্শন সেখানে দেখতে পাবেন। বস্তুত আল্লাহ্ যা ইচ্ছা হয়, সৃষ্টি করেন এবং নির্বাচনও করেন।[৩০]

জেনে রাখুন, যে সকল পরিপূর্ণতা বিধায়ক চরিত্র নিয়ে গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীগুলো প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং যা তাদের রাজ্য ক্ষমতা লাভের সাক্ষ্য বহন করে, তা হল জ্ঞানী, পুণ্যবান, সম্ভ্রান্ত, কুলীন, ব্যবসায়ী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সর্বশ্রেণীর মানুষকে তার যোগ্য মর্যাদা দান। কেননা নিজ গোত্র, গোত্রপ্রীতিতে অংশীদার ব্যক্তিবর্গ, পরিবার—যারা কৌলীন্যে তাদের প্রতিযোগী, গোত্রপ্রীতি ও পারিবারিক ঐতিহ্যে তাদের সমধর্মী এবং গৌরব অর্জনে তাদের অংশীদার, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। গৌরবের অত্যধিক আকর্ষণ, সম্মানিত লোকদের সম্পর্কে ভীতিভাব অথবা তাদের নিকট থেকে অনুরূপ মনোভাবের কামনাই এ স্বভাবকে সক্রিয় করে থাকে। কিন্তু পূর্বোক্ত ঐ সকল ব্যক্তি, যাদের সাথে ভীতিপ্রদ গোত্রপ্রীতিগত কোন সম্পর্ক নেই এবং আশাপ্রদ গৌরবজনিত কোন সংযোগ নেই, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে এ আকাঙ্ক্ষাই বলবতী হয়ে উঠে যে, সংশ্লিষ্ট রাজন্যবর্গ যথার্থই মর্যাদা অর্জনে, চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানে ও সামগ্রিকভাবে শাসন ব্যবস্থার সৌকর্ষ সাধনে তৎপর রয়েছেন। কারণ শাসনব্যবস্থার বিশেষ পরিধিতে সমশ্রেণীর গোত্র ও তুল্য ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে তেমনি বহিরাগত বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সাধারণ শাসনব্যবস্থার পূর্ণতা বিধায়ক। এ জন্যই ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদির প্রতিষ্ঠাদানের উদ্দেশ্যে পুণ্যাত্মা ও জ্ঞানীদের প্রতি সমীহ ভাব প্রদর্শন সম্পদের প্রাচুর্য ও উপকারিতার জন্য ব্যবসায়ীদেরকে উৎসাহ দান এবং বহিরাগত অতিথিদের প্রতি যোগ্য সদাচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে প্রতিটি লোককে তার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার নামই সদ্ব্যবহার, যার অন্য নাম ন্যায়পরায়ণতা। এ সকল গুণ কোন গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা গেলে বুঝতে হবে তারা সাধারণ শাসন ব্যবস্থার উপযোগী হয়েছে এবং এরই নাম রাজ্য। আল্লাহ্ এ ব্যাপারে তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, কারণ তার নিদর্শনগুলো তাদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে, এ কারণেই তিনি যখন কোন রাজ্যাধিপতি জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবার ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমেই উপরিউক্ত জনসমাজের প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শনের ধারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পাঠক, আপনি যখন কোন জাতির মধ্যে এ বিলুপ্তির লক্ষণ দেখতে পাবেন, তখন বুঝবেন তাদের গৌরব অস্তমিত হওয়ার পথে। আপনি অচিরেই তাদের রাজ্য বিনাশের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। 'যখন আল্লাহ্ কোন জাতির অকল্যাণ কামনা করেন, তখন তার প্রতিরোধের কোন উপায়ই থাকে না।'[৩১] আল্লাহ্ উন্নত ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।

২৯. কোরান ১৭, ১৬।
৩০. কোরান ২৮, ৬৮।
৩১. কোরান ১৩, ১১।

www.amarboi.org

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[বর্বর জাতিগুলোর সাম্রাজ্য সীমাই অধিকতর বিস্তৃত হয়ে থাকে]

এর কারণ, তারা প্রাধান্য বিস্তার ও আগ্রাসনে অধিকতর সক্ষম, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। তারা বিভিন্ন গোত্রকে তাদের যুদ্ধ ক্ষমতার সাহায্যে পদানত করতে অধিকতর সক্রিয় হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের অগ্রাভিযান হিংস্র ভাষাহীন পশুদের আক্রমণের মতোই ভয়ঙ্কর। এরা আরব-বেদুইন, জানাতা এবং তাদের সমশ্রেণীর কুর্দী, তুর্কেম্যান ও আবৃত বেদুইন সিনহাজা গোত্র। এদের ভয়ঙ্করত্বের অন্য একটি কারণ, তারা প্রায় বন্য প্রকৃতির, নির্দিষ্ট কোন আবাসস্থল নেই—যেখানে স্বস্তি লাভ করতে পারে, কোন অঞ্চল নেই—যেখানে আশ্রয় নিতে পারে; সুতরাং যে কোন দিক, যে কোন দেশ হোক না কেন, সকলই তাদের নিকট সমান। এ কারণেই তারা নির্দিষ্ট কোন আবাসভূমি ও তার চুতস্পার্শ্বস্থ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে না, যে কোন অঞ্চলের দিগন্ত পার হয়ে থমকে দাঁড়ায় না; বরং দূরদূরান্তের দেশ জয় করে ও বিচিত্র জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে অগ্রসর হয়। পাঠক, এ ব্যাপারে হজরত উমর (রাঃ)-র একটি উক্তি প্রণিধান করুন। তিনি খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর ইরাক বিজয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবার মানসে বলেছিলেন, "হেজাজ তোমাদের বিচরণ ভূমি ছাড়া স্থায়ী কোন আবাস নয়। এখানে বিচরণ করে তোমাদের শক্তি অর্জনের কোন পথ নেই। হিজরতকারীদের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিশ্রুত সেই আবাসভূমি কোথায়? তোমরা পৃথিবীতে সেই ভূমির অনুসন্ধান কর, আল্লাহ্ যার উত্তরাধিকার তোমাদেরকে অর্পণ করবেন বলে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যাতে এ ধর্মমত সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে, যদিও পৌত্তলিকরা তা পছন্দ করে না।[৩২]

পাঠক, এ বিষয়টি প্রাচীন আরব গোত্রগুলোর সম্পর্কেও বিবেচনা করতে পারেন। যেমন তুব্বা ও হিমিয়ার। কী অদ্ভুতভাবে তারা কখনও ইয়ামেন থেকে মাগরিব পর্যন্ত, কখনও ইরাকের দিকে, আবার কখনও হিন্দে অভিযান চালিয়েছে। আরব-বেদুইন ব্যতীত অন্য কোন জাতির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। মাগরিবের আবৃত বেদুইন গোত্রগুলোরও একই অবস্থা। তারা যখন রাজ্য শক্তিতে উঠে দাঁড়াল, প্রথম অঞ্চলের সমুদয় অংশ, সুদানের পার্শ্ববর্তী তাদের বিচরণভূমি প্রভৃতি অতিক্রম করে চুতর্থ ও পঞ্চম অঞ্চলের আন্দালুস পর্যন্ত কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়াই এগিয়ে গেল। এটাই এ সকল বর্বর জাতির অবস্থা এবং এ জন্যই এদের সাম্রাজ্য ধারাবাহিকতায় বিস্তৃততর হয়ে দেখা দেয়। তাদের কেন্দ্রভূমি থেকে বহু দূর-দূরান্তে ছাড়িয়ে যায়। 'আল্লাহ্ রাত্রি দিনকে নির্ধারিত করেন।'[৩৩] তিনি একক, পরাক্রান্ত ও তাঁর কোন অংশীদার নেই।

---

৩২. কোরান ৯, ৩৩; ৬১, ৯।

৩৩. কোরান ৭৩, ২০।

www.amarboi.org

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

[কোন বংশের মধ্যে গোত্রপ্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকলে তার একটি শাখা থেকে রাজ্য চলে গেলেও পুনরায় অন্য একটি শাখায় ফিরে আসবে]

এর কারণ এ যে, প্রাধান্য বিস্তারের শক্তি অর্জন ও অন্যান্য সকল জাতির আনুগত্য লাভের মাধ্যমেই তাদের রাজ্য বিস্তার সম্ভব হয়ে থাকে। এ উদ্যোগ-আয়োজনে সকলে অংশগ্রহণ করলেও কিছু সংখ্যক লোকের জন্য বিষয়টির বাস্তবায়ন ও রাজ্য পরিচালনের দায়িত্ব নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। কারণ সকলের জন্য এটা সম্ভব নয়। কেননা সকলেই এতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে স্থান সংকুলান হবে না। তদুপরি সিংহাসন আরোহণের মর্যাদা লাভের ব্যাপারটিতে শক্তিমানের প্রাধান্যের দ্বারা অন্য অনেকেরই আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত থাকে। এভাবে যখন কিছু সংখ্যক লোকের জন্য এ দায়িত্ব নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন তারা সাম্রাজ্যের অধিপতি হিসাবে ঐশ্বর্যের দ্বারা বেষ্টিত এবং বিলাসব্যসন ও প্রাচুর্যের সাগরে নিমজ্জিত হয়। এর ফলে তারা বংশান্তর্গত অন্যান্য শাখাকে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করে এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন ও পরিচালনের ভার তাদের হাতে ন্যস্ত করে। অথচ ঐ সকল লোক যারা একসময় সিংহাসনের দায়িত্ব পালন থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং এক বংশধারার অন্তর্গত হয়েও সাম্রাজ্যের অংশীদার হিসাবে শুধু তার ছত্রচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হচ্ছিল, তারা কিন্তু বিলাসব্যসন ও তার উপকরণাদি থেকে দূরে থাকায় কোন প্রকার অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয় না। অন্যদিকে সময় তখন পূর্ববর্তী ক্ষমতাবানদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে, তাদের সবুজ রং ধূসর হয়ে উঠছে, সাম্রাজ্য তাদেরকে পরিপাক করে ফেলছে এবং কালচক্রের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া তাদেরকে আহার্য ও পানীয় হিসাবে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছে। কেননা ঐশ্বর্যের পরিমার্জনা তাদেরকে কোমল করে ফেলেছে এবং বিলাসব্যসনের অমোঘ প্রতিক্রিয়া তাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। তারা মনুষ্য স্বভাবের শেষ পর্যায় নাগরিকত্ব ও শাসন ব্যবস্থার প্রাধান্য বিস্তারের তুঙ্গে আরোহণ করছে। কবি বলেন :[৩৪]

তারা রেশম পোকার মত গুটি নির্মাণ করে, অতঃপর
সেই গুটির অভ্যন্তর ভাগেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

অথচ এরা নিঃশেষ হলেও অন্যান্যের গোত্রপ্রীতি তখনও পরিপূর্ণ, প্রাধান্য বিস্তারের তেজবীর্য অটুট এবং তাদের নিদর্শনাবলি বিজয়ের পরিচয়বাহী। সুতরাং এক সময়ে তাদেরই গোত্রপ্রীতিধন্য যাদের প্রাধান্যের ফলে তারা বিশেষ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত

৩৪. এ কবির নাম সম্ভবত আবুল ফতেহ আলবুস্তী।

www.amarboi.org

হয়েছিল, এখন তা লাভ করবার জন্য তাদের বাসনা চঞ্চল হয়ে উঠে। কলহ এসে তাদের জয়ের পথকে সুগম করে দেয় এবং তারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে পড়ে। এভাবে রাজ্য তাদের হাতে চলে আসে। পুনরায় অনুরূপভাবে তারাও জাতির অন্যান্য অংশ যারা বিশেষ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রয়েছে, তাদের নিকট পরাজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করে। এমনি করে অনবরত রাজ্যশক্তি এ জাতির এক অংশ থেকে অন্য অংশে হস্তান্তরিত হতে থাকে—যতক্ষণ না তাদের গোত্রপ্রীতি সমূলে বিনষ্ট হয় এবং জাতির সকল অংশ বিনাশ হয়ে যায়। এটাই পার্থিব জীবনে আল্লাহ্‌র বিধান। 'তোমার প্রভুর নিকট পারলৌকিক কল্যাণ একমাত্র ধর্মভীরুদের জন্য।'[৩৫]

পাঠক আরব দেশের ঘটনাবলির সাথে একে বিবেচনা করুন। আদবংশীয়দের রাজ্যক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে তাদের ভ্রাতা সামুদদের হাতে আসল। তাদের পরে দেখা দিল তাদেরই সমগোত্রীয় আমালেকীরা। তাদের পরে তাদেরই ভ্রাতৃতুল্য হিমিয়াররা ক্ষমতা দখল করল। তাদের পরে এ হিমিয়ার তুব্বা রাজন্যবর্গের কাল এবং তাদের পরে 'আজওয়া'দের সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করেছিল। অতঃপর মুজার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করল। পারস্যের অবস্থা একই। কায়ানীদের পতনের পর সামানীরা আবির্ভূত হল এবং এর পর তাদের সকল কিছু আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে ইসলামের অধীনস্থ হল। গ্রিকদের অবস্থাও অনুরূপ; তাদের পতনের পর রাজ্য রোমের করায়ত্ত হল। মাগরিবের বারবারদের মধ্যেও একই অবস্থা দেখা যায়। যখন তাদের প্রাথমিক শাসকবৃন্দ 'মেগরাওয়া' ও 'কুতমাদের' পতন ঘটল, তখন রাজ্যশক্তি আসল সিনহাজাদের হাতে। অতঃপর আবৃত বেদুইন ও তাদের পরে মাসমুদাদের নিকট এবং তাদের পরে জানাতাদের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায়। মানব সমাজ ও সৃষ্টি জগতে আল্লাহ্‌র নিয়ম এমনি।

এ সকল কিছুর মূল হল এ যে, এটা একমাত্র গোত্রপ্রীতির মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে এবং এ গোত্রপ্রীতি গোত্র বিশেষে বিভিন্ন হয়ে দেখা দেয়। রাজ্যশক্তিকে বিলাসব্যসনই দুর্বল করে এবং নিশ্চিহ্ন করে ফেলে, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব।[৩৬] সুতরাং কোন সাম্রাজ্য যখন পতনের সম্মুখীন হয়, তখন তাকে তারাই গ্রহণ করতে সক্ষম, যাদের গোত্রপ্রীতি উক্ত সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সর্বত্র তার প্রতি মান্যতা ও আনুগত্য বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে অন্যদের গোত্রপ্রীতির উপর তাদের অবশ্যই প্রাধান্য থাকতে হবে এবং একমাত্র বংশধারার নিকটবর্তী অংশের দ্বারাই এটা সম্ভব। কারণ গোত্রপ্রীতির মধ্যে বংশ সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ও অঘনিষ্ঠতার অনুপাতে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। রাজ্য হস্তান্তরের এ ধারাটি এভাবেই চলতে থাকে, যতক্ষণ না পৃথিবীতে কোন ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন কোন জাতির আমূলে পরিবর্তন কিংবা কোন জনবসতির বিলুপ্তি অথবা আল্লাহ্ তাঁর মহিমায় যা কিছু ঘটান, তেমন কিছু ঘটনা। এমনি অবস্থায় রাজ্যশক্তি এ জাতি থেকে বের হয়ে এমন এক জাতির করায়ত্ত হবে, যাকে আল্লাহ্ এ পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। যেমন মুজারের জন্য ঘটেছিল। তারা সমুদয় জাতির ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য জয় করে পৃথিবীর উপর তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। অথচ এর পূর্বে তারা সুদীর্ঘকালব্যাপী এ ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল।

৩৫. কোরান ৪৩, ৩৫।

৩৬. এটা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে।

www.amarboi.org

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

[বিজিত সর্বদাই বিজয়ীর বৈশিষ্ট্য, পরিচ্ছদ, পেশা এবং অন্যান্য যাবতীয় অবস্থা ও অভ্যাসের অনুসরণ করে থাকে]

এর কারণ এ যে, জীবাত্মা সর্বদাই তার উপর প্রাধান্য বিস্তারকারীর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে বিশ্বাস করে এবং তার অনুসরণ করে থাকে। এ ব্যাপারে হয় সে স্বভাবত পূর্ণতার গুণাবলির জন্য তার মধ্যে যে সমীহের ভাব আছে, তার অথবা সে ভুল করে বিজয়ীর প্রতি তার আনুগত্যকে স্বাভাবিক প্রাধান্য বিস্তারের ফল নয়, রবং বিজয়ীর পূর্ণতর গুণের আকর্ষণ—এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়। সুতরাং এ শেষোক্ত ভুলটি যখন সে করে বসে ও তার সাথে মিলিত হয়, তখন তা তার বিশ্বাসে পরিণত হয়ে বিজয়ীর সমস্ত মত ও পথ গ্রহণে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। এটাই অনুসরণ নামে খ্যাত। অথবা এমনও হতে পারে, আল্লাহ্ই ভাল জানেন, সে দেখতে পায়, বিজয়ীর প্রাধান্য বিস্তার কোন গোত্রপ্রীতি ও সংগ্রাম শক্তির ফল নয়, বরং এটা একান্তই তার অভ্যাস ও ধর্মীয় বিশ্বাসাদির কারণে সংঘটিত হয়েছে; তখন প্রাধান্য বিস্তার সম্পর্কে আবারও ভুল করে এবং এ ভুল তার পূর্বোক্ত প্রথম ধারণার দিকেই ফিরে যায়। পাঠক, সম্ভবত এ কারণেই আপনি দেখতে পান যে, বিজিত সর্বদাই বিজয়ীর অনুকরণ করে থাকে। এ অনুকরণ পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতির নির্মাণ ও আকৃতির মধ্যে, এমনকি সামগ্রিক অবস্থার মধ্যে লক্ষ করা যায়। এটা আপনি সন্তান-সন্ততির মধ্যে পিতৃপুরুষের প্রতি তাদের আনুগত্যেও লক্ষ করতে পারেন। তারা কী অদ্ভুতভাবেই না সর্বদা তাঁদের অনুরকণ করে থাকে। এটা একমাত্র ঐ পিতৃপুরুষগণের পূর্ণতার ধারণাজাত। পৃথিবীর যে কোন দিকে তাকিয়ে দেখুন না কেন, দেখতে পাবেন, তাদের উপর রক্ষীদলের পোশাক পরিচ্ছদ ও সৈন্যদলের আচার-আচরণ কী দারুণ প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। কারণ তারাই সেখানে বিজয়ী। এমনকি কোন জাতি যখন অন্য জাতির প্রতিবেশী হয়ে বাস করে এবং তাদের উপর শেষোক্তদের প্রাধান্য বিস্তারের কোন কারণ থাকে, তখন দেখা যায় তাদের মধ্যে অনুকরণ ও অনুসরণের একটা বিরাট অংশ সংক্রমিত হয়েছে। যেমন বর্তমানকালে আন্দালূসবাসীদের মধ্যে আপনি এটা দেখতে পাবেন। তারা তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, এমনকি অধিকাংশ অভ্যাস ও অবস্থায় প্রতিবেশী জেল্লাকীদের অনুকরণ করে থাকে। এ অনুকরণ বিস্তৃত হয়ে তাদের প্রাচীরগাত্রে, শিল্পকর্মে ও গৃহাদির চিত্রাংকনে পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করেছে। যে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি এটা বিশ্লেষণ করে দেখেন, তা হলে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হবেন যে, এটা প্রাধান্য

www.amarboi.org

বিস্তার ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্র হাতে।[৩৭] এখানে আপনি সেই প্রবচনটির কথা চিন্তা করতে পারেন, সেখানে বলা হয়েছে সাধারণ মানুষ শাসকের ধর্মই অনুসরণ করে। এটাও সেই পর্যায়েই পড়ে। কারণ শাসক তার অধীনস্থদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী। প্রজাসাধারণ সর্বদাই তার পূর্ণতর গুণাবলির বিশ্বাসে, পুত্র যেমন পিতাকে, শিক্ষার্থী যেমন শিক্ষককে অনুসরণ করে, তেমনিভাবে অনুসরণ করে থাকে। আল্লাহ্ যথার্থই সর্বজ্ঞ ও বিচক্ষণ। তিনিই পবিত্র ও উন্নত এবং তিনিই সহায়ক।

৩৭. কোরান ১৩, ৩১; ৩০, ৪; ৮২, ১৯।

www.amarboi.org

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

[কোন জাতি পরাজিত হয়ে অন্যের অধীনস্থ হলে তার বিলুপ্তি দ্রুততর হয়]

এর কারণ এ যে, আল্লাহই ভাল জানেন যখন তাদের উপর অন্যরা আধিপত্য বিস্তার করে, তারা অন্যদের দাসত্ব স্বীকার করে ক্রীড়নকে পরিণত এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে এক প্রকার শৈথিল্য দেখা দেয়, যাতে তাদের বাসনা-কামনার হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে এবং বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দেয়। জীবনের বিকাশ একান্তভাবে বাসনার উপর নির্ভরশীল এবং এ কামনা-বাসনা থেকে জীবনী শক্তিগুলোর সজীবতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সুতরাং সেই কামনাই যদি শৈথিল্যের ফলে হ্রস্ব হয়ে যায়, তা হলে তজ্জনিত অন্যান্য অবস্থাও সেই অনুপাতে হ্রাস পেয়ে থাকে। অপরের প্রাধান্য বিস্তারের ফলে তাদের গোত্রপ্রীতি পূর্বেই লুপ্ত হয়েছে; এখন তাদের জীবন বিকাশের আকাঙ্ক্ষা কমতে থাকে, তাদের জীবিকা অর্জন ও অন্যবিধ প্রচেষ্টা বিলুপ্ত হতে আরম্ভ হয়। তারা প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে বসে। কারণ অপরের প্রাধান্য তাদের শৌর্যশক্তি বিনষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং তারা এখন প্রতিটি প্রভাবেরই অনুগত এবং প্রতিটি আগ্রাসনেরই শিকারে পরিণত হয়। তাদের উপর রাজ্যশক্তি পরিপূর্ণরূপে বিস্তৃত হোক বা না হোক, এটাই তাদের ভাগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এক্ষেত্রে, আল্লাহই ভাল জানেন, আরও একটি রহস্য বিদ্যমান। তা এ যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের যে গুণ বর্তমান, তাতে সে নিজেই একজন নেতা। সুতরাং এ নেতা যখন অপরের অধীনস্থ হয়ে পড়ে ও তার আত্মনির্ভরের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়, তখন একান্তই নিরাশ হয়ে পড়ে এমন কি ক্ষুধা-তৃষ্ণাও তার নিকট বাহুল্য মনে হয়। মানুষের এটাই স্বভাব। অনেক সময় এরই দৃষ্টান্ত দেখা যায় হিংস্র প্রাণীদের মধ্যে। তারা মানুষের হাতে বন্দী অবস্থায় যৌন মিলনের কথাও বিস্মৃত হয়ে যায়। অন্যের অধীনস্থ গোত্রগুলোরও প্রায় একই অবস্থা, তারাও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে এক সময়ে বিলুপ্ত হয়। স্থায়িত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই।

এ বিষয়টি পারসিকদের অবস্থা দিয়ে, পাঠক, বিচার করতে পারেন। এক সময়ে তারা সংখ্যাধিক্যের জোরে সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত স্থিত। আরবদের অধীনস্থ হওয়ায় যখন তাদের আত্মরক্ষার শক্তি বিলুপ্তি হল, তখনও তাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর অপেক্ষাও প্রচুর। কথিত হয়, সাদ[৩৮] মাদায়েনের অপর দিকে তাদের সংখ্যা গণনা করেছিলেন।

---

৩৮. সাদ ইবনে আবু ওক্কাস।

www.amarboi.org

তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার এবং তন্মধ্যে সাঁইত্রিশ হাজার ছিল পরিবারের কর্তা। অতঃপর তাদের উপর আরব আধিপত্য যখন দৃঢ় হল এবং নানাভাবে তার প্রতাপ বৃদ্ধি পেল, তখন তাদের সংখ্যা হ্রাস পেল এবং বিলুপ্ত হয়ে এমন অবস্থায় দাঁড়াল যে, যেন কোন কালে তাদের অস্তিত্ব ছিল না। কোনক্রমেই এ কথা ভাববার কারণ নেই যে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল কিংবা তারা কোন আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছিল। কারণ, পাঠক, ইসলামী শাসনের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে আপনি অবশ্যই অবগত আছেন। বরং এটা মানুষের সেই চিরন্তন চরিত্র—সে যখন অপরের অধীন হয় আত্মমর্যাদা হারিয়ে অপরের ক্রীড়নকে পরিণত হয় তখন হ্রাস পেয়ে থাকে। এ কারণেই তাদের মনুষ্যত্বের ত্রুটির জন্য সুদানীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাসত্ব স্বীকার করে নেয়। কারণ তারা এদিক থেকে ভাষাহীন পশুদের নিকটবর্তী, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। অথবা এমনও হয় যে অনেকে এ দাসত্ব স্বীকার করে কোন প্রকার মর্যাদা, সম্পদ অথবা শক্তি লাভের কামনা করে। যেমন পূর্বাঞ্চলে তুর্কিরা এবং আন্দালুসে জেল্লাজী পৌত্তলিক ও ফিরিঙ্গীরা। এ প্রকার লোকেরা নিজেদেরকে সাম্রাজ্যের অংশ বলে মনে করে। এ কারণেই তারা দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে না। কারণ তাদের ধারণা অনুগত থাকলে সাম্রাজ্য তাদেরকে উচ্চপদ ও মর্যাদা দান করবে। আল্লাহ্ মহান, পবিত্র ও সর্বজ্ঞ এবং তিনিই সহায়।

www.amarboi.org

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

[আরব-বেদুইনরা কেবল প্রান্তরীয় অঞ্চলগুলোতেই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে]

তা এ যে, তাদের বন্য প্রকৃতির দরুন, তারা কেবল লুটপাট ও ধ্বংস করতেই সক্ষম। তারা কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তার বা বিপদের ঝুঁকি নিবার চেষ্টা না করে সুযোগ মতো যথেষ্ট লুটপাট করে নিয়ে যায়। তারা যা পায় তা নিয়ে নিজেদের প্রান্তরীয় বিচরণ ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে। একান্ত বাধ্য না হলে তারা সংঘর্ষ বা যুদ্ধের সম্মুখীন হয় না। তারা প্রতিটি দুরূহ ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে এড়িয়ে সহজের অনুসন্ধান করতেই অভ্যস্ত। তেমন অসুবিধাজনক কিছু দেখলে তারা ফিরেও তাকায় না। যে সকল জাতি পর্বতবেষ্টিত অবস্থায় বিদ্যমান, তারা আরব-বেদুইনদের ধ্বংস ও লুটপাট থেকে সুরক্ষিত কারণ তারা পার্বত্য এলাকায় কোন প্রকার অভিযান পরিচালনা করে না। কারণ সেখানে আক্রমণ করলে যে পরিমাণ বিপদের ঝুঁকি ও কষ্ট স্বীকার করা প্রয়োজন, তাতে তারা অভ্যস্ত নয়। অবশ্য প্রান্তরীয় সমতল অঞ্চল, যেখানে রক্ষীদলের কোন ঝামেলা নেই কিংবা কোন সাম্রাজ্য যার অন্তিম দশা উপস্থিত হয়েছে, ঐগুলোই তাদের সহজ শিকার ও লুটতরাজের বস্তুতে পরিণত হয়। এগুলোর উপরই তারা বারংবার আক্রমণ করে, লুট করে ও ধ্বংস করে। কারণ এগুলোই তাদের পক্ষে সহজসাধ্য। এভাবে উপর্যুপরি আক্রমণের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলসমূহের অধিবাসীরা তাদের বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তারা তৎপর থাকে। অতঃপর উক্ত জনগোষ্ঠীকে তাদের নেতৃত্বের মতানৈক্যে ও শাসন-ব্যবস্থার অসমভাবাপন্নতায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ক্রমান্বয়ে উক্ত জনগোষ্ঠী বিলুপ্ত হতে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান। তিনি একক ও পরাক্রান্ত তিনি ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই।

www.amarboi.org

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

[আরব-বেদুইনরা যে জনপদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তার বিনষ্টি দ্রুততর হয়]

এর কারণ এ যে, এরা জাতি হিসাবে বন্য প্রকৃতির। বন্যতার অভ্যাস ও তার উপকরণগুলো এদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত থাকায় এগুলো তাদের চরিত্র ও প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। এ জন্য এদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু হল যে কোন প্রকার আদেশের বা নিষেধের অধীনতা অস্বীকার করা এবং শাসন ব্যবস্থার আনুগত্য থেকে বিরত থাকা। এ প্রকার চরিত্র সভ্যতার বিরোধী এবং তার উন্নতির পরিপন্থী। তাদের সমুদয় অবস্থার চরম পর্যায় হল বিচরণ ও প্রাধান্য বিস্তার। বস্তুত এ অবস্থা স্থিরতা তথা সভ্যতার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অবস্থানের জন্য ক্ষতিকারক ও বিরোধী। যেমন ধরা যাক পাথর, তা তাদের ডেকচি বসাবার ইঁটের জন্য প্রয়োজন; সুতরাং গৃহের গাঁথুনি থেকে খসাইয়া হলেও তা তারা ঐ কাজে ব্যবহার করবে। যেমন কাঠ, তা তাদের তাঁবু টানাবার ও ঘরের খুঁটি বানাবার জন্য দরকার; সুতরাং ছাদ নষ্ট করেও তারা এটা সংগ্রহ করবে। এজন্য তাদের এ প্রকার চরিত্র স্থাপত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী, অথচ এটা ছাড়া সভ্যতার বিকাশ সম্ভব নয়। এমনিই তাদের সাধারণ অবস্থা।

তদুপরি, তাদের চরিত্র হল মানুষের নিকট যা কিছু আছে, ছিনিয়ে নেয়া। কারণ তাদের জীবিকা বর্শার ছায়ায় লুক্কায়িত। মানুষের সম্পদ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে তাদের নিকট পরিচিত এমন কোন সীমারেখা নেই, যেখানে তারা থামতে পারে। বরং যখনই তাদের চোখে কোন সম্পদ, আসবাবপত্র ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু ভাল লাগে, তারা ছিনিয়ে নেয়। সুতরাং যখন তাদের প্রাধান্য বিস্তারের ফলে কোন রাজ্যের শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে আসে, তখন জনগণের সম্পদ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার ব্যাপারে তা একেবারেই ভেঙে পড়ে এবং সভ্যতার বিনাশ সাধিত হয়।

এ ছাড়াও তারা শিল্পী ও কর্মীদের কাজের ক্ষতি করে থাকে। তারা এদের দ্বারা কাজ করায়, কিন্তু কোন প্রকার পারিশ্রমিক বা মূল্য দিবার চেষ্টাও করে না। পরিশ্রম, যেমন আমরা অচিরেই বর্ণনা করব, জীবিকার ভিত্তি ও তার সত্তা। যখন এ পরিশ্রম মূল্যহীন ও অনর্থক হয়ে দাঁড়ায়, তখন মানুষ পরিশ্রম করবার এবং তদ্দ্বারা জীবিকা অর্জনের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। কাজের হাত শিথিল হয়ে আসে। হাতের পিছনের ব্যক্তিটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর মধ্য দিয়ে সভ্যতার বিনাশ সাধিত হয়।

এ ছাড়াও এ বেদুইনরা আদেশ-নিষেধের কোন পরোয়া করে না মানুষকে ধমক দিয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত করা বা একের অত্যাচার থেকে অপরকে রক্ষা করার ধারে

www.amarboi.org

কাছেও তারা যায় না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল লুট করে বা করধার্য করে সম্পদ সংগ্রহ করা। সুতরাং তারা এর সুযোগ পেলে এবং তদ্দারা সম্পদ লাভ হলে অন্যদিকে ফিরেও দেখে না। কিসে মানুষের সচ্ছলতা আসবে, কিসে তাদের উপকার হবে এবং একে অপরকে অত্যাচার করা থেকেই বা কী করে বিরত করা যাবে, তৎসম্পর্কে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। অনেক সময় তারা মানুষকে শাস্তি দিয়ে থাকে; কিন্তু এর উদ্দেশ্যও একটিই, তাদের নিকট থেকে অন্যায় সুবিধা লাভ ও তাদের ধনভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ করা। এ ব্যাপারে তারা বাড়াবাড়িও করে থাকে, যেমন তাদের স্বভাব। কিন্তু এ শাস্তিবিধান দুষ্কর্ম দূরীকরণে বা দুষ্কৃতিকারীর লোভ দমনে কোন সাহায্যই করে না। বরং এটা তাদের দুষ্কর্মকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কারণ তারা অত্যধিক করের বোঝা লাঘব করার জন্য দুষ্কর্ম করে বেড়ায়। সুতরাং তাদের শাসন ব্যবস্থায় প্রজারা অরাজকতার শিকারে পরিণত হয়। এ অরাজক অবস্থা মনুষ্যত্বের জন্য ক্ষতিকর এবং সভ্যতার সর্বনাশকারী। যেহেতু আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, রাজ্য ব্যবস্থার উদ্ভব মানুষের বিশেষ স্বভাবের ফলেই হয়েছে, সুতরাং তাদের অস্তিত্ব, তাদের সমাজ তার স্থায়িত্ব ব্যতীত সম্ভব নয়। আমরা প্রাথমিক পরিচ্ছেদগুলোতে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছি।

এতদ্ব্যতীত আরও একটি কারণ এ যে, আরব-বেদুইনরা নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় উন্মাদ। তারা খুব কমই একে অপরের নির্দেশ মেনে থাকে। সে নির্দেশকারী তার পিতা, ভাই বা পরিবারের বয়োবৃদ্ধ যে কেউই হোক না কেন। যদি কখনও মেনেও নেয়, তাও একান্ত অনিচ্ছায় ও চক্ষুলজ্জায় এবং এ প্রকার ঘটনা খুবই বিরল। সুতরাং তাদের মধ্যে শাসক ও নেতৃবৃন্দের ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে এবং প্রজাদের উপর নির্দেশ প্রদান ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের কাজটিও বিভিন্ন হাতের দ্বারা সাধিত হতে থাকে। সুতরাং সভ্যতার বিকৃতি দেখা দেয় ও হ্রাস পায়।

সম্রাট আব্দুল মালেকের দরবারে এক আরব-বেদুইন প্রতিনিধি উপস্থিত হলে সম্রাট তাকে হাজ্জাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন বেদুইন হয়ত হাজ্জাজের সভ্যতা ও শাসনের কথা উল্লেখ করে প্রশংসা করবে। কিন্তু উত্তরে সে বলল, "মানুষের উপর অত্যাচার করবার জন্য আমি তাকে একাই রেখে এসেছি।"

পাঠক, আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, তারা যে সকল স্থান দখল ও যে সকল জনপদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, কীভাবে তার সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং জনপদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তা যেন ভিন্ন এক পৃথিবী। ইয়ামেন, তাদের বসতিস্থল, কিছু সংখ্যক পল্লী ছাড়া সমুদয়ই বিনষ্ট হয়েছে। ইরাকে আরবের একই অবস্থা, সেখানে পারসিকদের যে সভ্যতা ছিল, তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে সিরিয়ার অবস্থাও তথৈবচ। আফ্রিকিয়া ও মাগরিবেও বনি হেলাল ও বনি সুলাইম পঞ্চম শতাব্দী(একাদশ)র প্রথম দিকে এসে প্রবেশ করেছে এবং তদবধি সাড়ে তিনশ বছর ধরে তারা এ অঞ্চলে জীবন যাপন করছে। ইতিমধ্যে তার সমতল অঞ্চলগুলোর প্রায় সমুদয় অংশই উজাড় হয়ে গেছে। অথচ একসময়ে সুদান ও রোম সাগরের মধ্যবর্তী এ বিরাট এলাকার সমুদয় অংশই জনবসতিপূর্ণ ছিল। এ সম্পর্কে তথাকার নিদর্শনাবলি, স্থাপত্যের চিহ্নাদি, গ্রাম ও বস্তির রেখাসমূহ প্রচুর প্রমাণ উপস্থিত করে থাকে। 'আল্লাহ্ এ পৃথিবী ও তদুপরি সমুদয় মানব গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম'।[৩৯]

---

৩৯. কোরান ২১, ৮৯।

www.amarboi.org

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

[সাধারণভাবে আরব-বেদুইনরা কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য যেমন নবী বা পুণ্যাত্মার স্মৃতি অথবা মহান ধর্মীয় ঐতিহ্যের মাধ্যম ব্যতীত রাজ্য লাভে সক্ষম হয় না]

এর কারণ এ যে, তাদের মধ্যে যে বন্য প্রকৃতি বিদ্যমান, তা আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে রয়েছে। স্থূলবুদ্ধি, হিংসা, অনুদারতা, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা প্রভৃতির জন্য তারা একে অন্যের আনুগত্য স্বীকার করতে পারে না এবং তাদের বাসনা-কামনা খুব কমই ঐক্যবদ্ধ হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে যদি কোন নবী বা ওলীর মাধ্যমে ধর্মীয় বোধ জাগ্রত হয়, তা হলে একটা সংযমের মনোভাব তাদের নিজেদের মধ্যেই জন্ম নেয় এবং অহংকার ও প্রতিযোগিতা দূর হয়ে তাদের আনুগত্য ও একত্রীভবন সহজ হয়ে উঠে। কারণ ধর্ম তার আদর্শের দ্বারা তাদের মধ্য থেকে স্থূলতা ও হিংসা দূর করে এবং তাদের প্রতিহিংসা ও প্রতিযোগিতার মধ্যে সংযমের ভাব আনতে সক্ষম হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে যদি কোন নবী বা ওলী থাকেন, তা হলে তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করবার জন্য উৎসাহিত করতে পারেন। এর ফলে তাদের মধ্যকার দূষণীয় চরিত্র দূর হয়ে সৎ চরিত্র দেখা দেয় এবং তারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য তৎপর হয়ে উঠে। এভাবে তাদের ঐক্য পূর্ণতা লাভ করে এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য বিস্তার তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকে।

এতদ্‌সত্ত্বেও সত্য ও সৎপথ গ্রহণে তারা সর্বাপেক্ষা দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম। কেননা সাধারণত তাদের স্বভাবে বক্রতার পরিমাণ কম এবং অসততা থেকে তারা প্রায় মুক্ত। শুধু বন্যতাই যা কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকে। তবে একে বাগে আনা যায় এবং কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব। কারণ এদের এ বন্যতা প্রাথমিক স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত এবং জীবাত্মার উপরে যে সকল দুষ্ট অভ্যাস ও মন্দ প্রবৃত্তি শিকড় গেড়ে বসে, তা থেকে মুক্ত। কেননা 'প্রত্যেক সন্তানই তার স্বভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে'—যেমন হাদিসে এসেছে এবং পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।[৪০]

---

৪০. চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্র:।

www.amarboi.org

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

[আরব-বেদুইনরা রাজ্য শাসনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুপযুক্ত]

এর কারণ এ যে, এরা সকল জাতি অপেক্ষা অধিক প্রান্তরপ্রিয় এবং মরুভূমির অধিকতর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিচরণকারী। তাদের জীবন-যাপনে কৃচ্ছ্রতা ও স্থূলতার আধিক্য থাকায় পাহাড়ী এলাকা ও তার শস্যাদি সম্পর্কে উদাসীন। এজন্য তারা অন্যলোকের মুখাপেক্ষী নয় এবং এরূপ স্বাবলম্বন তাদের প্রিয় হওয়ায় ও বন্যতার আধিক্য থাকায় তারা একে অপরের আনুগত্য স্বীকার করতে পারে না। সুতরাং তাদের সর্দার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ শক্তির উৎস গোত্রপ্রীতির জন্য তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একই কারণে তাদেরকে কঠোর শাসনে রাখতে অপারগ হয় এবং সর্বদা তাদের বিরোধিতাকে সতর্কভাবে এড়িয়ে চলে। কারণ অনুরূপ কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে গোত্রপ্রীতি নষ্ট হয়ে যাবে এবং সর্দার ও গোত্র উভয়েই ধ্বংস হবে। অথচ কোন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ও প্রতাপ সর্বদাই এটা কামনা করে যে, তার শাসক কঠোরতার সাথে শৃঙ্খলা বিধান করবে। অন্যথায় উক্ত শাসন ব্যবস্থা কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

এটা ছাড়াও তাদের চরিত্রের মধ্যে মানুষের সম্পদ ছিনিয়ে নিবার প্রবৃত্তি বিদ্যমান, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি এবং এটা ব্যতীত তাদের মধ্যে অন্য কোন প্রকার বিধি-নিষেধ প্রবর্তন ও একে অপরের উপর অত্যাচার-নিবর্তন থেকে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। সুতরাং তারা যখন কোন জাতির শাসনভার লাভ করে, তখন তাদের একমাত্র কর্তব্য হয় তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া এবং তাদেরকে কোন প্রকার বিধি-নিষেধের অধীন না করে অরাজক অবস্থায় ছেড়ে দেয়া। অনেক সময় তারা রাজকোষের অর্থ সংগ্রহ ও অন্যবিধ সুবিধা লাভের জন্য তাদেরকে অন্যায়ভাবে শাস্তিদান করে। কিন্তু এ শাস্তিদান কোন প্রকার শৃঙ্খলার সৃষ্টি ত করেই না, উপরন্তু এতে মানুষের দুষ্কর্মের মনোভাবকে আরও জাগিয়ে দেয়া হয় এবং তারা এ প্রকার শাস্তির অপমান থেকে আত্মরক্ষার জন্য আরও বহুবিধ দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে দুষ্কৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরিণামে সভ্যতার সর্বনাশ ঘটে। বস্তুত তাদের শাসন-ব্যবস্থা মানুষকে একে অপরের উপর উৎপীড়নরত এক অরাজক অবস্থায় নিক্ষেপ করে। এতে সভ্যতার কখনও কোন উন্নতি হয় না। কারণ অরাজক অবস্থা অতিদ্রুত সর্বনাশ ডেকে আনে, যেমন আমরা পূর্বে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছি।

এ সকল কারণেই আরব-বেদুইনদের স্বভাবের মধ্যে রাজ্যশাসন ব্যবস্থার যোগ্যতার অভাব। তারা একমাত্র এ স্বভাবের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমেই তাতে প্রবেশ

www.amarboi.org

করতে পারে। এ পরিবর্তনের জন্য যে কোন একটি ধর্মমতের প্রয়োজন, যাতে তার সাহায্যে তাদের নিজেদের মধ্যেই শৃঙ্খলাবোধের জন্ম সম্ভব হয় এবং মানুষের মধ্যে একে অপরকে উৎপীড়ন করা থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে তারা উৎসাহী হয়ে উঠে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। পাঠক, আপনি এ বক্তব্যকে তাদের ধর্মাশ্রিত সাম্রাজ্যের সাথে মিলিয়ে দেখুন। যখন ধর্ম তাদেরকে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণধর্মী শাসন-ব্যবস্থা প্রদান করল, তখনই এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। একের পর এক খলিফা আবির্ভূত হলেন এবং সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করল ও শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। রুস্তম মুসলমানদেরকে নামাজের জন্য সমবেত হতে দেখে বলে উঠেছিল, হায়, উমর আমার কলিজা ছিঁড়ে ফেলেছে, সে এ কুকুরগুলোকেও সদাচার শিক্ষা দিয়েছে।[৪১]

অতঃপর তাদের মধ্যে বহু পুরুষ যাবত সাম্রাজ্য শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। তারা ধর্মকে ত্যাগ করে শাসনক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং পুনরায় তাদের শূন্য প্রান্তরে ফিরে এসেছে। তারা গোত্রপ্রীতির মহিমা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে এবং আনুগত্যহীন ও করহীন তাদের অবস্থা কোন প্রকার রাজ্যশাসনের কথা আর স্মরণ করায় না। তারা তাদের সেই পূর্বের বন্য প্রকৃতির অধীন হয়ে পড়েছে এবং তাদের মধ্যে রাজ্যশাসন ক্ষমতার কোন চিহ্নই নেই; কেবল এ একটি পরিচয়ই আছে যে, তারা এককালীন খলিফাদের বংশধর ও গোত্রের লোক। কারণ সেই খেলাফতের কোন চিহ্নই তাদের মধ্যে নেই এবং সেই ক্ষমতার কোন অংশই তারা ধরে রাখতে পারেনি। ফলে তাদের সকল কিছুর উপর অনারব জনগোষ্ঠী প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তারা সকল কিছু থেকে বিচ্যুত হয়ে তাদের সেই শূন্য প্রান্তরে বসবাস করছে। তারা আর রাজ্য বা শাসন ব্যবস্থার কোন ধার ধারে না, বরং তাদের অধিকাংশের এ জ্ঞানও নেই যে, এক সময়ে তারা রাজ্যক্ষতার অধিকারী ছিল। তারা জানে না যে, প্রাচীনকালে তাদের পূর্বপুরুষদের তুল্য রাজ্য আর কোন জাতির ছিল না। আদ, সামুদ, আমালেকা, হিমিয়ার, তুব্বা রাজন্যবর্গের সাম্রাজ্য বিস্তার এর সাক্ষ্য বহন করছে। অতঃপর ইসলামের আবির্ভাবের পর মুজারের ক্ষমতা বিস্তার এবং বনি উমাইয়া ও বনি আব্বাসের শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তাদের সেই শাসন ক্ষমতার স্মৃতি বর্তমানে সুদূর অতীতের ব্যাপার এবং ইতিমধ্যে তারা ধর্মকে ভুলে পুনরায় তাদের সেই শূন্য প্রান্তরে ফিরে আসছে। এতদসত্ত্বেও কখনও কখনও তারা দুর্বল রাজ্যগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়, যেমন বর্তমানে মাগরিবে ঘটছে। কিন্তু এ প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্য ও পরিণতি একটিই, সেই সম্পদ ছিনিয়ে অরাজকতার সৃষ্টি করে ধ্বংস সাধন করা, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজ্য দান করেন।[৪২]

৪১. রুস্তম, পারস্য সেনাপতি এবং উমর, হজরত উমর (রাঃ)। ঘটনাটি কাদেসিয়ার যুদ্ধের।

৪২. কোরান ২, ২৪৭।

www.amarboi.org

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[প্রান্তরবাসী গোত্র ও সম্প্রদায়গুলোর জীবন পল্লীবাসীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে]

আমরা পূর্বে বলেছি যে, প্রান্তরীয় জীবনধারা নগর ও পল্লী অপেক্ষা সর্বদাই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। নগর ও পল্লীতে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যে সকল বিষয় বিদ্যমান, তার প্রায় কোনটিই প্রান্তরে পাওয়া যায় না। একমাত্র তাদের মধ্যে কৃষিব্যবস্থাই দেখা যায়; কিন্তু তারও উপকরণের অভাব। বিশেষ করে তৎসম্পর্কিত শিল্পকর্ম তাদের নিকট নেই বললেই চলে। যেমন সূত্রধর, দরজী, লোহার প্রভৃতি শ্রেণীর লোক, যাদের পরিশ্রমের দ্বারা সাধারণ জীবনের ও কৃষিকর্মের বহু প্রয়োজনীয় অভাব দূর হয়ে থাকে। এমনিভাবে দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহামও (রৌপ্যমুদ্রা) তাদের নিকট নেই। তাদের নিকট এ সকল মুদ্রার বিনিময়ে লভ্য শস্য, পশু এবং তা থেকে উৎপন্ন দুধ, পশম, লোম, চামড়া ইত্যাদিই কেবলমাত্র বিদ্যমান। পল্লীবাসীরা দিনার ও দিরহামের বিনিময়ে ঐগুলো তাদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে থাকে। অবশ্য প্রান্তরবাসীরা একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে পল্লীবাসীদের নিকট আসতে বাধ্য হয়; কিন্তু সেই তুলনায় পল্লীবাসীদের তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার প্রয়োজন একান্তই সাচ্ছন্দ্য ও পরিপূর্ণতা বিধায়ক। এ জন্যই বলা যায়, তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বাভাবিক তাগিদেই পল্লীবাসীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে বাধ্য।

এভাবে তারা যতদিন প্রান্তরে বাস করে, পল্লীবাসীদের উপর তাদের রাজ্যক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের কোন সুযোগই ঘটে না। বরং তারাই নিজেদের প্রয়োজনে পল্লীবাসীদের নিকট গমন করে, তাদের কাজকর্ম করে দেয় এবং প্রয়োজনের সময় তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। যদি পল্লীতে কোন শাসক থাকে, তা হলে তাদের আনুগত্য ও মান্যতা সেই শাসককে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। যদি সেখানে শাসক না থাকে, তবে এমন কোন নেতৃত্ব বা প্রতাপ নিশ্চয়ই আছে, যা না থাকলে জীবনধারণই অসম্ভব হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় সেই সর্দারই তাদেরকে তাঁর প্রয়োজনে ও প্রচেষ্টায় ব্যবহার করে থাকে। কখনও অর্থের বিনিময়ে এবং এর ফলে তারা অর্থের বিনিময়ে পল্লী থেকে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে সচ্ছলতা আনতে পারে। আবার কখনও বাধ্য করে যদি এটা সেই সর্দারের পক্ষে সম্ভব হয়। এজন্য প্রয়োজন হলে সে প্রান্তরবাসীদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। এর ফলে একটি পক্ষের সহায়তায় অন্য পক্ষটিকে আয়ত্তে রাখতে সুবিধা হয় এবং পরিণামে জীবনের সাচ্ছন্দ্যের জন্য তারা সকলেই সর্দারের বাধ্য হয়ে

www.amarboi.org

উঠে। কারণ খুব কমই প্রান্তরবাসীরা বিশেষ অঞ্চল ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। কেননা যে দিকেই যেতে চাক না কেন, সেখানে পূর্ব থেকেই অন্য প্রান্তরবাসীরা বিদ্যমান, তারা উক্ত স্থান দখল করে অন্যদের অনুপ্রবেশের পথে বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে। সুতরাং এদের পক্ষে অন্যত্র আশ্রয়লাভ সম্ভব নয় বলে পরিণামে পল্লীবাসীদের বশ্যতা স্বকারে ফিরে আসে। অতএব প্রান্তরবাসীরা একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই পল্লীবাসীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। 'আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর পরাক্রান্ত'[৪৩] এবং তিনি এক, একক ও মহা পরাক্রমশালী।

৪৩. কোরান ৬, ১৮; ৬১।

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়

সাধারণ সাম্রাজ্য, রাষ্ট্রশক্তি, খেলাফত ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় বিভিন্ন পদমর্যাদা এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিচিত্র অবস্থা এখানে নীতিমালা ও পরিপূরক গুণাবলি সম্পর্কীয় আলোচনা বিদ্যমান

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রথম পরিচ্ছেদ

[সাধারণ সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তি একমাত্র গোত্রশক্তি ও গোত্রপ্রীতির সাহায্যেই লাভ হয়ে থাকে]

কারণ আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে[১] বর্ণনা করেছি যে, প্রাধান্যবিস্তার ও প্রতিরোধ ক্ষমতা একমাত্র গোত্রপ্রীতির সাহায্যেই লাভ হয়ে থাকে। কারণ তার মধ্যেই আকর্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও একের জন্য অন্যের মৃত্যুবরণের মতো মনোভাব বিদ্যমান। অতঃপর রাজ্যশক্তি এমন একটি উন্নত ও আকর্ষণীয় পদমর্যাদা, যাতে পার্থিব কল্যাণ, দৈহিক ভোগেচ্ছা ও আত্মিক সম্ভোগ বাসনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ জন্যই এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে কেউ কারও প্রাধান্য মেনে নিতে চায় না। এর ফলে কলহের সূত্রপাত হয় এবং তা ক্রমশ যুদ্ধবিগ্রহে পরিণত হয়ে প্রাধান্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে। এ সমস্ত ব্যাপারের কোনটিই গোত্রপ্রীতি ব্যতীত সম্ভব নয়, যেমন আমরা পূর্বেই বলেছি।

অথচ সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারটি কিছুতেই বুঝতে চায় না এবং বুঝলেও ভুলে যায়। কারণ তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রাথমিক অবস্থার কথা ভুলে বসে। তাদের নগর জীবনের কাল দীর্ঘ হওয়ার ফলে এবং পুরুষাণুক্রমে এখানে বসবাস করবার জন্য তারা জানতে পারে না যে, সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে আল্লাহ্‌র সাহায্যে কি ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল। তারা জানে যে, তারাই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর; তাদের বিশিষ্টতা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাদের প্রতি আনুগত্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এ জন্যই তাদের ক্ষমতা প্রকাশের জন্য আর গোত্রপ্রীতির প্রয়োজন নেই। সুতরাং সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে কি অবস্থা ছিল এবং প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাকারী এজন্য কি বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন—এর কিছুই তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

বিশেষভাবে আন্দালুসবাসীদের অবস্থা এ উপলক্ষে স্মরণীয়। তারা দীর্ঘদিন ধরে এ গোত্রপ্রীতির কথা ও তার নিদর্শনাদি ভুলে গেছে। কারণ তারা নিজ জন্মভূমি ও গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে গোত্রপ্রীতিতে তাদের আর কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌ সকল কিছুর উপরই শক্তিধর এবং তিনি সকল বিষয় সম্পর্কেই উত্তম জ্ঞাতা। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম সহায়ক।

---

১. প্রথম পরিচ্ছেদ বলতে সম্ভবত পূর্বের পরিচ্ছেদসমূহ বুঝিয়েছেন।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[যখন কোন সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত হয়, তখন গোত্রপ্রীতির প্রয়োজনীয়তা ফুরায়]

এর কারণ এ যে, সাধারণ সাম্রাজ্যগুলো প্রতিষ্ঠার সময় এর অভিনবত্বের জন্যই মানুষের পক্ষে তাকে মেনে নেয়া বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তার জন্য যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। কারণ মানুষ তার শাসনের সাথে পরিচিত নয় এবং তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। অতঃপর যখন প্রতিষ্ঠাতা বংশের একটি বিশেষ অংশে সাম্রাজ্যের আধিপত্যগত নেতৃত্ব নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং একের পর এক অনেকেই তার উত্তরাধিকার লাভ করে পর্যায়ক্রমিক সাম্রাজ্যের একটি দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলে, তখন প্রাথমিক অবস্থার কথা আর মানুষের স্মরণ থাকে না। তখন ঐ অংশের জন্য নেতৃত্বের বিশিষ্টতা সুদৃঢ় হয়ে গেছে এবং মানুষের হৃদয়ে তাদের আনুগত্য ও মান্যতার ব্যাপারটি অঙ্কিত হয়ে গেছে। তারা এ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরদের জন্য বহু অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃঢ় আস্থা নিয়ে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। এমতাবস্থায় তাদের আর খুব বেশি নিজেদের গোত্রগত ঐক্যের উপর নির্ভর করতে হয় না। বরং মনে হয় তাদের প্রতি আনুগত্য যেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত, যার কোন পরিবর্তন নেই, বিরুদ্ধাচরণ নেই। এ ব্যাপারে আমরা, আমাদের আলোচনার শেষের দিকে ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্গত 'ইমামত' সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছি। এ বিশ্বাসকেও ঐ পর্যায়ে ফেলা যায়। এরূপ অবস্থায় সাম্রাজ্যের অধীশ্বরগণ অন্যদের দ্বারাই তাদের বিশিষ্ট ক্ষমতা ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন। এ জন্যই তারা তাদের আশ্রিত ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, যারা গোত্রপ্রীতি ও অন্যান্য সম্প্রীতির আয়ত্তে লালিত হয়েছে কিংবা তাদের গোত্র বা বংশের বাইরে থেকে এসে তাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, তাদেরকে ব্যবহার করে থাকেন।

বনি আব্বাসের ব্যাপারে অনুরূপ ঘটনাই দেখা গেছে। তাদের গোত্রপ্রীতি আলমুতাসিম ও তৎপুত্র ওয়াসিকের সময় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তৎকালে তাদের ক্ষমতা বহিঃপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম ছিল অনারব আশ্রিত ব্যক্তিরা। এরা তুর্কি, দায়লম, সলজুক প্রভৃতি জাতির অন্তর্গত। অতঃপর এ অনারব প্রাদেশিক শাসকরাই বিভিন্ন দিকে প্রাধান্য বিস্তার করে সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়া থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। তখন তারা আর বাগদাদের কর্মচারী বলে অভিহিত হত না। এমনকি এক সময়ে দায়লমগণ বাগদাদেও প্রাধান্য বিস্তার করে তা দখল করে ফেলেছিল এবং মানুষ তাদের শাসন

www.amarboi.org

মেনে নিয়েছিল। এরপর তাদের ক্ষমতার অবসান ঘটলে সলজুকীদের অভ্যুদয় ঘটে এবং শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে চলে যায়। অতঃপর তারাও ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং শেষের দিকে তাতায়রা এসে খলিফাকে হত্যা করে ও সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা মিটিয়ে ফেলে।

মাগরিবের সিনহাজাদেরও একই অবস্থা। তাদের গোত্রপ্রীতিও পঞ্চম শতাব্দী (একদাশ) কিংবা তারও পূর্ব থেকে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবু তারা কর্তিত ছত্রচ্ছায়া হিসাবে 'মাহদিয়া', 'বেজা' (বগি), 'কেলআ'[২] ও আফ্রিকিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে তাদের সাম্রাজ্য ধারণ করেছিল। অনেক সময় এ সকল সীমান্ত এলাকায় রাজ্যপিপাসু প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তথাপি তাদের সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়নি। এমনি অবস্থায় চলবার পর আল্লাহ্ তাদের সাম্রাজ্য বিনাশের ইঙ্গিত দিলেন এবং মাসমুদাদের গোত্রপ্রীতিতে সমৃদ্ধ আলমোহেদরা প্রচণ্ড শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল।

আন্দালুসে বনি উমাইয়াদের সাম্রাজ্যের অবস্থাও অনুরূপ। তাদের আরবীয় গোত্রপ্রীতি বিনষ্ট হবার পর ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ তাদের ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের সমুদয় অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এভাবে তারা সমস্ত সাম্রাজ্যই খণ্ড খণ্ড করে তাদের অধীনস্থ অঞ্চলের অধীশ্বর হয়ে বসে। আব্বাসী সাম্রাজ্যে অনারবদের প্রাধান্য বিস্তারের সংবাদ তারা পেয়েছিল। সতুরাং তারা নিজেদেরকে রাজ্যাধিপতিসুলভ উপাধিতে ভূষিত করে যোগ্য পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করল। কেউ তাদের এ অবস্থার পরিবর্তন করবে কিংবা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবে, এমন আশঙ্কাও তাদের হৃদয়ে ছিল না। কারণ আন্দালুস গোত্র বা গোত্রপ্রীতির দেশ নয়, যেমন অচিরেই আমরা বর্ণনা করব। সুতরা তাদের এ অবস্থা স্থায়ী হয়ে উঠল। ইবনে মরফ[৩] বলেছেন,

আন্দালুসে মুতাসিম ও মুতাজিদ নাম নিতে আমার করুণা হয়,
অস্থানে অধীশ্বরের উপাধি, বিড়াল ফুলে যেন বাঘ হয়ে গেছে।

তারা তাদের সাম্রাজ্য ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য আশ্রিত, কর্মে নিয়োজিত এবং বহিরাগত জনশক্তির সাহায্য গ্রহণ করল। এ সকল লোক সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের বারবার জানাতা প্রভৃতি গোত্রগুলো থেকে আন্দালুসে এসেছিল। এটা করতে গিয়ে তারা উমাইয়া সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় তাদেরকে ব্যবহার করার সেই আদর্শই গ্রহণ করেছিল। যখন আরবীয় গোত্রপ্রীতি দুবর্ল হয়ে পড়ল এবং ইবনে আবু আমের সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার করল, তখন এ অবস্থাই ঘটেছিল। আগন্তুকরা আন্দালুসের একেকটি দিকে বিরাট বিরাট রাজ্য গড়ে তুলল এবং তাদের অধীনস্থ অংশ তৎকর্তৃক বিভক্ত সাম্রাজ্যের অনুরূপ অংশ অপেক্ষা বৃহৎ ছিল। এভাবে তারা তাদের শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছিল। অবশেষে তাদের উপর লামতুনাদের গোত্রপ্রীতি সমৃদ্ধ শক্তিমান মোরাবী জনসমুদ্র এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, স্ব স্ব কেন্দ্র

২. মাসিলার উত্তর-পূর্ব কোণে বনি হাম্মাদের প্রাচীন রাজধানী।
৩. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ, মৃত্যু ৪৬০ (১০৬৭/৬৮ খ্রি:) বি:। অবশ্য কাব্য ছত্রটি ইবনে রশিকের।

www.amarboi.org

থেকে নবাগতদের দ্বারা তারা বিতাড়িত হল এবং পরিণামে তাদের আর কোন চিহ্নই রইল না। তারা গোত্রপ্রীতির অভাবে নবাগতদের সম্মুখে দাঁড়াতেই পারল না।

এটাই সেই গোত্রপ্রীতি, যদ্দারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তার সহায়ক শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। অথচ আত্তারতুশীর ধারণা এ যে, সাম্রাজ্যের সহায়ক শক্তি হল নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে গঠিত যোগ্য সৈন্যদল। তিনি তাঁর 'সিরাজুল মুলূক' নামীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তাঁর বক্তব্য সাধারণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ সম্পর্কে নীরব। তা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, তার পরিচালনার দায়িত্বে গোত্রবিশেষের স্থায়িত্ব এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সুদৃঢ় হওয়ার পর শেষ অবস্থা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ঐ ব্যক্তি (আত্তারতুশী) উক্ত সাম্রাজ্যকে তার অন্তিম দশাতেই দেখেছেন। তখন তার সঞ্জীবতা নষ্ট হয়ে গেছে এবং তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ তখন আশ্রিত ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারাই হচ্ছে। এর পর তাদের পিছনে আগত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রতিরোধের জন্য নিয়োজিত সেবকদলের হাতে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে। বস্তুত তিনি ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের রাজ্যগুলোই দেখতে পেয়েছেন। তা উমাইয়া সাম্রাজ্য পতনের মুখে যাবার পরই আবির্ভূত হয়েছিল। তখন তার আরবীয় গোত্রপ্রীতি নষ্ট হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক আমীর তার একেকটি অংশ দখল করে নিয়েছে। তিনি সারকুস্তার শাসক আলমুস্তাইন ইবনে হুদ ও তৎপুত্র আল-মুজাফফরের সময়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তখন তাদের মধ্যে গোত্রপ্রীতির কোন চিহ্ন নেই। কারণ আরব গোত্রগুলোর উপর সুদীর্ঘ তিনশ বছর ধরে বিলাসব্যসনের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং তিনি গোত্রচ্যুত জবরদখলকারী শাসকদেরকেই দেখেছেন। এ জবরদখল উমাইয়া সাম্রাজ্যের সময় থেকে গোত্রপ্রীতির কতকাংশ অবশিষ্ট থাকতেই আরম্ভ হয়েছিল। এজন্যই তাদের এ ক্ষমতা দখলকে বাঁধা দিবার কেউ ছিল না। সুতরাং এ সকল ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ তাদের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োজিত পেশাধারীদের উপরই নির্ভর করত। আত্তারতুশী তাঁর দৃষ্ট এ অবস্থাকেই সাধারণভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ সম্পর্কে কোন চিন্তা করেননি। কিন্তু পাঠক, আপনাকে সেই সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র মহিমাকে উপলব্ধি করতে হবে। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে রাজ্য দান করেন।[৪]

---

৪. কোরান ২, ২৪৭।

www.amarboi.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত গোত্রের কোন অংশের পক্ষে গোত্রপ্রীতি ব্যতীতই সাম্রাজ্য স্থাপন কখনও কখনও সম্ভব হয়ে উঠে]

এটা এ যে, কোন গোত্রপ্রীতি যখন বহু জাতি ও গোত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, তখন এর বাহক হিসাবে দূর-দূরান্তের মানুষও সক্রিয় হয়ে উঠে এবং সাম্রাজ্যের অনুগত ও বাধ্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় উক্ত প্রভাবশালী গোত্রের কেউ যদি নিজ শক্তির কেন্দ্র ও মর্যাদার উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথকভাবে কিছু করতে চায়, তখন সাধারণ মানুষ তার এ বিষয়টিকে নতুন উদ্যোগ হিসাবে গ্রহণ করে তার প্রতিষ্ঠানের জন্য তৎপর হয়। তারা তাকে সাহায্য করে এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এতে তাকে তার পিতৃপুরুষের বৃহৎ প্রভাববলয় থেকে দূরে সরিয়ে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসার একটি প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাও কাজ করে। কারণ এর পরিবর্তে তারা কামনা করে যে, এ নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের সাহায্যের জন্য তাদেরকে মন্ত্রী, সেনাপতি অথবা সীমান্তের প্রদেশপাল হিসাবে উচ্চ রাজকীয় পদে নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তার রাজ্যক্ষমতায় কোন প্রকার অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এটা তাদের সেই মৌল গোত্রপ্রীতি এবং পৃথিবীব্যাপী তার সুদৃঢ় প্রভাবেরই ফলশ্রুতি। এটাই অনুসারীদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদের আনুগত্যকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই তারা যদি এর ব্যতিক্রম করে শক্তিতে অংশগ্রহণ বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নকরণের কাজে লিপ্ত হত, 'তা হলে পৃথিবী তার সমগ্র সম্ভাবনাসহ কেঁপে উঠত।'[৫]

উপরোক্ত বক্তব্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে দূর মাগরিবে ইদরিসীদের অবস্থা এবং আফ্রিকিয়া ও মিশরে উবাইদীদের অবস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। আবু তালেবের বংশধারা যখন এ দূরান্তে এসে উপস্থিত হল এবং খেলাফতের প্রভাবাধীন এলাকা এড়িয়ে বনি আব্বাসের নিকট থেকে এ দূরান্ত অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করতে মনস্থ করল, তখন অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছিল। ইতিপূর্বে আবদে মন্নাফের বংশধরদের প্রভাব সুদৃঢ় হয়ে গেছে। প্রথমে বনি উমাইয়াদের মধ্য দিয়ে এবং তাদের পরে বনি হাশেমের উত্থানের ফলে তা দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়েছে। আবু তালেবের বংশধররা এরই সূত্র ধরে মাগরিবের এ দূরপ্রান্তে এসে উপস্থিত হল এবং নিজেদের পার্থক্যের দাবি উত্থাপন করল। বারবার গোত্রগুলো একাধিকবার তাদের এ দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হল।

---

৫. কোরান ৯৯, ১।

www.amarboi.org

আউরুবা ও মগিলা গোত্র ইদরিসীদের জন্য এবং কুতামা, মিনহাজা ও হাওআরা গোত্র উবাইদীদের জন্য উঠে দাঁড়াল এবং তাদের গোত্রপ্রীতির সাহায্যে পূর্বোক্তদের দাবির প্রাধান্য ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তুলল। এমনিভাবে সমগ্র মাগরিব আব্বাসী সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং এর পরে আফ্রিকিয়াও উক্ত পথ অনুসরণ করল। এভাবে আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রভাব অনবরত হ্রাস পাচ্ছিল এবং উবাইদীদের প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছিল। এমনকি এক সময়ে তারা মিশর, সিরিয়া ও হেজাজ দখল করে ইসলামী সাম্রাজ্যকে দুইভাগে ভাগ করে ফেলেছিল। এ সকল বিজয়াভিযানের সর্বত্র এ বারবার গোত্রগুলোই প্রাধান্য বিস্তার করেছে; কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও উবাইদীদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ও তাদের প্রতি আনুগত্যে অপূর্ব নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। তারা বনি হাশেমের এ সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে মেনে নিয়ে শুধুমাত্র পদমর্যাদার জন্য প্রতিযোগিতা করেছে। কারণ কোরায়েশ ও মুজার গোত্রগুলোর প্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা এ প্রভাব সকল জাতির মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই আরবীয় সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের বংশধরদের মধ্যেই তার ধারাবাহিকতা বিরাজ করছে। 'আল্লাহ্ নির্দেশ দেন এবং তাঁর নির্দেশ অমান্যকারী কেউ নেই।'[৬]

৬. কোরান ১৩, ৪১।

www.amarboi.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও বৃহৎ শাসন ক্ষমতার ভিত্তি হল নবুয়ত অথবা
সত্য প্রচারজনিত ধর্মমত ।]

এটা এ যে, রাজ্য একমাত্র প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে এবং এ প্রাধান্য বিস্তারের জন্য গোত্রপ্রীতি ও মতামতের ঐক্যের মাধ্যমে উদ্দীপনার প্রয়োজন। সকল অন্তরকে একত্র করে এক সূত্রে গাঁথা একমাত্র ধর্মমত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌ বলেন, "তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় কিছু ব্যয় কর, তথাপি তাদের অন্তঃকরণ এক সূত্রে গাঁথতে পারবে না।"[৭] এর গূঢ়ার্থ এ যে, মানুষের অন্তরকে যখন অন্যান্য প্রবৃত্তির দিকে ও পার্থিব উন্নতির প্রতি আকর্ষণ করা হয়, তখন তার মধ্যে প্রতিযোগিতা ও মতানৈক্যের ভাব জেগে উঠে। কিন্তু এটার পরিবর্তে যদি পার্থিব উন্নতি ও মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে সত্যের দিকে আকর্ষণ করা যায়, তা হলে তা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়ে উঠে। এর ফলে প্রতিযোগিতা, মতানৈক্য কমে গিয়ে উত্তম সহায়তা ও সহযোগিতা দেখা দেয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠে এবং সাম্রাজ্য আকৃতিতে বিস্তার লাভ করে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা পরে এ সম্পর্কে আপনাদের অবগতির জন্য বর্ণনা করব। তিনিই আমাদের সহায় এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নেই।

৭. কোরান ৮, ৬৩।

www.amarboi.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের প্রাথমিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মমত তার জনসংখ্যার অনুপাতে লব্ধ গোত্রপ্রীতিকে এক নতুন শক্তি দান করে থাকে]

এর কারণ, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য গোত্রপ্রীতির মধ্যকার প্রতিযোগিতা ও প্রতিহিংসাকে দূরীভূত করে এবং সত্যের প্রতি সকলের উদ্দেশ্যকে একত্র করে। তাদের কর্তব্যে এ চেতনার সঞ্চার করে যে, এতে বিরোধের কিছু নেই; যেহেতু উদ্দেশ্য এক এবং প্রাপ্যও একই, সুতরাং তারা তাদের কর্তব্য সাধনে মৃত্যুবরণ করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। তারা যে সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, যদিও সেই সাম্রাজের জনসংখ্যা তাদের অপেক্ষা অনেক বেশি, তথাপি তাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। একদল সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিতে উৎসাহী আর অন্যদল মিথ্যার মোহে মৃত্যুভয়ে হীনমন্য। এ জন্য সংখ্যায় অধিক হলেও তাদের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। বরং ঐ নতুন শক্তিই বিজয়ী হয় এবং অন্যরা তাদের বিলাসব্যসন ও হীনমন্যতাসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইসলামের প্রাথমিক দিকে আরবদের জন্য অনুরূপ অবস্থাই দেখা দিয়েছিল। কাদেসিয়া ও ইয়ারমুকের প্রতিটি যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজারের কিছু বেশি ছিল এবং পারস্যের সৈন্যদল কাদেসিয়ায় ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার ও হিরাক্লিয়াসের সৈন্যদল ওয়াকেদীর বক্তব্য অনুসারে ছিল চার লক্ষ।[৮] কিন্তু কোন পক্ষই আরবদের সাথে পেরে উঠেনি। তারা সকলকেই পরাজিত করে তাদের সমুদয় বিষয়বস্তুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

এ বিষয়টি লামতুনা ও আলমোহেদদের সাম্রাজ্য বিস্তারেও বিবেচনা করা যায়। মাগরিবে এমন বহু গোত্রই বিদ্যমান ছিল, যারা গোত্রপ্রীতি ও সংখ্যার দিক থেকে তাদের বিরোধী হতে পারত এবং তাদেরকে পরাভূতও করতে পারত। কিন্তু ধর্মীয় ঐক্য লামতুনা ও আলমোহেদদের গোত্রপ্রীতির শক্তিকে দ্বিগুণিত করে তুলেছিল এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মৃত্যুকেও তুচ্ছজ্ঞান করতে শিখিয়েছিল। সুতরাং তাদের পথে কোন কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি।

পাঠক, বিষয়টিকে অন্যভাবেও বিবেচনা করুন। যখন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য শিথিল ও বিকৃত হয়ে পড়ে তখন শক্তির গুরুত্ব কমে যায়। তখন একমাত্র গোত্রপ্রীতির অনুপাতেই বিজয়লাভ ও প্রাধান্য বিস্তার হয়ে থাকে। এজন্যই দেখা যায় যে, একই

৮. 'ফতুহুশ্‌শাম' গ্রন্থে এ সংখ্যার নিকটবর্তী হয় এমন একটি বর্ণনা বিদ্যমান।

www.amarboi.org

সাম্রাজ্যের সমঅংশীদার যে গোত্র এরই ছত্রচ্ছায়ায় বসবাস করছিল, তারাই গোত্রপ্রীতির সমশক্তি বা অধিক শক্তির অধিকারী হয়ে সাম্রাজ্য শাসনে প্রাধান্য বিস্তার করে বসে। অথচ এরাই এক সময়ে গোত্রপ্রীতি ও প্রান্তর চরিত্রের অধিকারী অধিকতর শক্তিশালী দলকে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগত বিশেষ শক্তির সাহায্যে পরাভূত করতে পেরেছিল।

জানাতা গোত্রের সাথে আলমোহেদদের সংঘর্ষের মধ্যে এটা লক্ষ করা যায়। জানাতীরা মাসমুদা গোত্র অপেক্ষাও অধিক প্রান্তরীয় ও বন্য চরিত্রের অধিকারী ছিল। অন্যদিকে মাসমুদাদের ছিল সত্য প্রচারের শক্তি। তারা আল-মেহেদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐ বিশেষ ধর্মমতে দীক্ষিত হয়েছিল এবং এক নতুন শক্তিতে তাদের গোত্রপ্রীতিকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। এর ফলে তারা প্রথম দিকে জানাতীদের উপর বিজয়ী হতে সমর্থ হয়। যদিও জানাতীরা তাদের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক প্রান্তরীয় চরিত্র ও গোত্রপ্রীতির অধিকারী ছিল। কিন্তু পরে যখন মাসমুদারা এ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করল, তখন চতুর্দিক থেকে তাদের উপর জানাতীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদেরকে পরাজিত করল এবং তাদের সবকিছু ছিনিয়ে নিল। 'আল্লাহ্ সকল বিষয়ে বিজয়ী'।[৯]

৯. কোরান ১২, ২১।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[ধর্মমত প্রচার ও গোত্রপ্রীতির সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না]

তা, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, যে কোনো বিষয়ে সর্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে গোত্রপ্রীতির সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। যেমন বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ্ প্রত্যেক নবীকেই তাঁর জাতির প্রতিরোধ শক্তিসম্পন্ন গোত্রের মধ্যে প্রেরণ করেছেন। যদি নবীদের জন্যই এ ব্যাপার হয়, অথচ তাঁরা অস্বাভাবিক কর্ম সংঘটনে মানুষের মধ্যে যোগ্যতম, তা হলে, পাঠক, অন্যদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কী! তাঁরা কি গোত্রপ্রীতির সহায়তা ছাড়াই অসম্ভব সম্ভব করে তুলতে পারবে!

সুফি সম্প্রদায়ের উস্তাদ ও 'খলউন্ নালাইন' নামীয় সুফীতত্ত্বের গ্রন্থপ্রণেতা ইবনে কেসী[১০] সম্পর্কে এ প্রকার একটি ঘটনা বিদ্যমান। তিনি আল মেহেদীর ধর্মমত প্রচারের কিছুকাল পূর্বে আন্দালুসে সত্য প্রচারকরূপে আবির্ভূত হন। তাঁর অনুসারীদিগকে 'মোরাবিতী' বলে ডাকা হত। কিন্তু তাঁর প্রচার খুব ভাল জমল না। কারণ লামতুনা গোত্র তখন আলমোহেদ আন্দোলনে ব্যতিব্যস্ত ছিল। সেখানে এমন কোনো গোত্র বা গোত্রপ্রীতির ধারক জনগোষ্ঠী ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে। সুতরাং পরিশেষে তিনি, আলমোহেদরা মাগরিবের উপর আধিপত্য বিস্তার করলে তাদের দলে ঢুকে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করলেন। তিনি তাঁর আস্তানা 'আরকশ' (ডি লা ফ্রন্টেরা) দুর্গ থেকে বের হয়ে তাদের অনুসরণ করলেন এবং তার সীমান্ত অঞ্চল তাদের হাতে ছেড়ে দিলেন। তিনিই আলমোহেদদের পক্ষ থেকে আন্দালুসে প্রথম সত্য প্রচারকারী। তাঁর অভিযানকে মোরাবিতীদের অভিযান বলা হয়।

এরূপভাবে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে দুষ্কৃতি উচ্ছেদে আত্মোৎসর্গকারী কর্মী ও ধর্মশাস্ত্রবিদদের কথাও এখানে আলোচনা করা যায়। বহু ধার্মিক ও অধ্যাত্মপন্থী সাধক অত্যাচারী আমীরদের উপর প্রভাব বিস্তার করে অসৎ কর্ম উচ্ছেদের অভিযান পরিচালনা করেন। মানুষের মধ্যে সৎকর্মে লিপ্ত ও অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রচার করে তাঁরা আল্লাহ্র নিকট তৎপরিবর্তে পুণ্যের আশা করেন। ক্রমশ তাঁদের অনুসারীর দল বেড়ে ওঠে এবং যুগপ্রিয় ফেরেববাজ লোকেরা তাঁদের অনুকরণে অগ্রসর হয়। এর ফলে তাঁরা নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েন এবং তাদের অধিকাংশই এভাবে ধ্বংস হয়ে যান। পরিণামে তাঁদের কাঁধে নানাবিধ দুষ্কর্মের বোঝাই চাপতে দেখা যায়, পুণ্যের বোঝা নয়। কারণ পবিত্র আল্লাহ্ তাঁদের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য করেননি।

---

১০. আহমদ ইবনে কেসী, মৃত্যু ৫৪৬ (১১৫১ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

বরং সম্ভাব্য স্থানেই এরূপ শক্তি প্রয়োগের কথা তিনি বলেছেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অন্যায় হতে দেখে, তা হলে সে যেন হাতের দ্বারা তা বন্ধ করে। যদি এতে সমর্থ না হয়, তা হলে জিহ্বার দ্বারা এবং যদি এতেও শক্তি না পায়, তা হলে অন্তরের দ্বারা।" বস্তুত শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যগুলোর অবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ় শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাকে আন্দোলিত করতে বা ধ্বংস করতে হলে এমন সংঘবদ্ধ শক্তির আক্রমণ প্রয়োজন, যার পশ্চাতে গোত্রপ্রীতি ও পারিবারিক সম্প্রীতি ও সহায়তা বিদ্যমান, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

নবীদের অবস্থা এ প্রকারই ছিল, আল্লাহ্ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। তাঁরা গোত্র ও পরিবারের শক্তি নিয়েই আল্লাহ্র পথে আহ্বান করতেন। অথচ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ ছাড়াও তাঁদেরকে সর্বপ্রকার কার্য সম্পাদনের শক্তি দিতে পারতেন। কিন্তু স্বভাব অনুযায়ী সমস্ত বিষয় সংঘটিত করবার জন্য এরূপ করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ অতিশয় বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ।

সুতরাং কোনো সাধারণ মানুষ যদি এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে যায় এবং সে সত্যবাদী হয় তা হলেও গোত্রপ্রীতির অভাব তার এ প্রচেষ্টাকে খর্ব করে তুলবে এবং পরিণামে সে ধ্বংসের আবর্তে পতিত হবে। আর যদি এর ছদ্মবেশে সে নেতৃত্ব লাভের ইচ্ছা পোষণ করে, তা হলেও তার পথে বাধার সীমা নেই এবং পরিণামে তাঁর ধ্বংসপ্রাপ্তি অনিবার্য। কারণ এটা আল্লাহ্র ব্যাপার, তাঁর সন্তুষ্টি ও সাহায্য ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না। এ বিষয়ে অগ্রসর হলে সদিচ্ছা পোষণ করতে হবে এবং মুসলমানদের কল্যাণ কামনাই হবে এর লক্ষ্য। কোনো মুসলমানই এতে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না এবং কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তিই এতে দ্বিমতের অধিকারী হতে পারে না।

বাগদাদের জনসমাজে এ ধরনের আন্দোলন প্রথম শুরু হয় তাহেরের গোলযোগের সময়। তখন আমীন নিহত হন এবং মামুন খোরাসান থেকে ইরাকে আসতে দেরি করতে থাকেন। অতঃপর হজরত হোসাইনের বংশধর আলী ইবনে মুসা আয়রেজাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এর ফলে বনি আব্বাস তাঁর প্রতি বিরক্ত হয় এবং এর প্রতিরোধ করার জন্য মামুনের আনুগত্য ত্যাগ করে পরিবর্তন কামনা করে। তারা ইব্রাহিম ইবনে আলমাহদীকে সিংহাসনে বসায়। এর ফলে বাগদাদে ভীষণ গোলযোগ দেখা দেয়। সৎ ও নিরীহ নাগরিক বা খুনী লুটেরাদের শিকারে পরিণত হয়। পথেঘাটে ছিনতাই আরম্ভ হয়। এরা লুণ্ঠিত ধনসম্পদে বাড়িঘর পূর্ণ করে ফেলে এবং প্রকাশ্য বাজারে তারা লুটের মাল বিক্রয় করতে আরম্ভ করে। বাগদাদের নাগরিকরা শাসকদের নিকট আবেদন জানিয়েও কোনো সাড়া পায়নি। কেউ এর প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেনি। অতঃপর ধার্মিক ও পুণ্যবান ব্যক্তিরা দুষ্কৃতিকারীদেরকে প্রতিরোধ করার এবং তাদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময় খালেদ আদ্‌দুরীয়ুস নামে এক ব্যক্তি সাধারণ নাগরিকবৃন্দকে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আহ্বান জানান। মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। ফলে খালেদ তাদেরকে পিটিয়ে ও নানাবিধ শাস্তি দিয়ে দমন করতে সক্ষম হন।

www.amarboi.org

তার পর বাগদাদের গ্রামাঞ্চল থেকে সহল ইবনে সালামা আল আনসারী নামে পরিচিত অন্য এক ব্যক্তি আবির্ভূত হন, তাঁর ডাক নাম ছিল আবু হাতেম। তিনি গলায় কোরান ঝুলিয়ে মানুষকে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধের দিকে এবং আল্লাহ্‌র কেতাব ও নবীর সুন্নত পালনের প্রতি আহ্বান করেন। তাঁর ডাকে সম্ভ্রান্ত ও ইতর নির্বিশেষে বনি হাশেম থেকে নিম্নস্তরের লোক পর্যন্ত সকলেই সাড়া দেয়। তিনি তাহের প্রাসাদে উপনীত হয়ে দরবার বসান এবং বাগদাদের পথে পথে ঘুরে বেড়ান। তিনি রাস্তাঘাটের নিরাপত্তায় বিঘ্নসৃষ্টিকারীদিগকে বের করে দেন এবং লুটেরাদের অত্যাচারের পথ বন্ধ করতে সক্ষম হন। খালেদ আদ্‌দুরীয়ুস তাঁকে বলেন যে, তিনি সম্রাটের কোনো দোষ দেখেন না। কিন্তু এর উত্তরে সহল তাঁকে বললেন যে, তিনি এমন যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, যে আল্লাহ্‌র কেতাব ও রসূলের সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণ করবে; সে যে কোনো স্তরের লোক হোক না কেন। সুতরাং ইব্রাহিম ইবনে আল মাহদী তার বিরুদ্ধে সৈন্যদল সুসজ্জিত করলেন এবং তাঁকে পরাজিত করে বন্দী করলেন। অচিরেই তাঁর প্রভাব হ্রাস পেল এবং তিনি পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচলেন।

অতঃপর এ ব্যাপারে আরও বহু ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা মনের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠার একটা অসার ধারণাই পোষণ করতেন; অথচ তাকে বাস্তবায়িত করতে হলে যে গোত্রপ্রীতির প্রয়োজন, তার সম্পর্কে কোনো খোঁজই রাখতেন না। তাঁরা তাদের কাজের বাধাবিপত্তি দূর করা এবং তাদের বাস্তব উদ্দেশ্যের কোনো খেয়ালই করতেন না। এঁদের সম্পর্কে যে বিষয় অবলম্বন করা দরকার, তা হল চিকিৎসা, যদি তারা পাগল হয়ে থাকেন; নতুবা শাস্তি আর পিটুনি, যদি তারা গোলযোগ সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হন। অথবা এসব কিছু না করে তাদেরকে ভাঁড় মনে করে তাদের সমুদয় বক্তব্য হাসি তামাশায় উড়িয়ে দেয়া উচিত।

কখনো কেউ কেউ নিজেকে 'অপেক্ষিত ফাতেমী' বলে পরিচয় দেন, কখনও তাঁর প্রতি আহ্বানকারী হিসাবে নিজের দাবি উপস্থিত করেন। অথচ তারা ফাতেমীর ব্যাপারে বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানেন না, এমনকি তিনি কে, তাও নয়। পাঠক, এ ব্যাপারে উদ্যোগীদের অধিকাংশকে আপনি দেখতে পাবেন, হয় তারা অসার কল্পনার বশীভূত, নয় বদ্ধ উন্মাদ অথবা তারা তাঁর ধর্মমত প্রচারে সাহায্য গ্রহণ করে ছদ্মবেশে নেতৃত্বলাভের প্রয়াসী। এ নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, অথচ স্বাভাবিক পন্থায় তা লাভ করার শক্তি তাদের নেই। কাজেই তারা ধারণা করে, তাদের ঈপ্সিত বিষয় লাভ করার এটাই যথার্থ মাধ্যম। কিন্তু একবারও ভেবে দেখে না যে, এতে কি মহাবিপদের সম্মুখীন তারা হতে পারে। সুতরাং গোলযোগ সৃষ্টির জন্য অতিদ্রুত তারা নিহত হয় এবং তাদের প্রতারণার অশুভ পরিণাম লাভ করে।

এ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'আত্তুবজরী' নামে এক সুফীসাধক 'সুস'-এ আবির্ভূত হন। তিনি মাসার সমুদ্রতীরবর্তী মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে স্থানীয় জনসাধারণকে প্রতারণা করে নিজেকে অপেক্ষিত ফাতেমী বলে পরিচয় দেন। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ফাতেমীর আগমন এবং উক্ত মসজিদ থেকে ধর্মমত প্রচারের যে ধারণা বিদ্যমান, তারই সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন। ফলে সাধারণ বারবারদের কয়েকটি দল তাঁর উপর

www.amarboi.org

পতঙ্গের ন্যায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বারবার সর্দারগণ এদের এ আচরণে গোলযোগের সম্ভাবনায় ভীত হয়ে উঠেন। সুতরাং তৎকালীন মাসমূদা গোত্রপ্রধান উমর আস্‌সিকসিবী গোপনে একজন লোককে পাঠিয়ে দেন, যে তাঁকে শায়িত অবস্থায় হত্যা করে।

এমনভাবে এ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'গোমারা'তেও আব্বাস নামে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হয়। সেও পূর্বানুরূপ দাবি উত্থাপন করেছিল। উক্ত অঞ্চলে গোত্রগুলোর কিছু সংখ্যক নির্বোধ নিম্ন শ্রেণীর লোক তার একান্ত অনুসারী হয়ে পড়ে। সে দলবলসহ গেমারার অন্যতম শহর 'বাদিসে' জোরপূর্বক প্রবেশ করে। কিন্তু তার দাবি প্রকাশের চল্লিশ দিন পরে সে নিহত হয় এবং পূর্ববর্তী এভাবে নিহতদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

এ ধরনের উদাহরণ প্রচুর। এ সব ঘটনার মধ্যকার মারাত্মক ভুলের দিকটি হল এ যে, এরা এ ব্যাপারে গোত্রপ্রীতির কথা আদৌ বিবেচনা করে না। অন্যদিকে ব্যাপারটি যদি প্রতারণা হয়, তা হলে এরূপ ব্যক্তির সাফল্য লাভ কিছুতেই উচিত নয় বরং তাকে তার পাপের শাস্তি ভোগ করতে দেয়া উচিত, এটাই অত্যাচারীদের প্রতিদান।[১১] আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান সকল কিছুই অবগত। তিনিই সহায়, তিনি ব্যতীত অন্যকোনো প্রভু নেই এবং তিনি ব্যতীত অন্যকোনো উপাস্য নেই।

---

১১. কোরান ৫, ২৯ : ৫৯, ১৭।

www.amarboi.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[প্রতিটি সাম্রাজ্যের জন্যই অঞ্চল ও স্থানের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, এটা অপেক্ষা বেশি হয় না]

এর কারণ এ যে, প্রতিটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ও তার বিন্যাস ব্যবস্থায় জাতির যে জনশক্তি নিয়োজিত হয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য ক্ষমতা অনুসারেই উক্ত সাম্রাজ্য বিভিন্ন অঞ্চল ও সীমান্ত এলাকায় বিভক্ত হওয়া প্রয়োজন। যাতে তারা তার উপর প্রভাব বিস্তার করে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করতে, এতে সাম্রাজ্যের আইন-কানুন প্রবর্তন করতে এবং খাজনাপত্র আদায়, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ও অন্যবিধ কার্যাদি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। এভাবে গোত্রশক্তি যখন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ও সীমান্ত এলাকায় নিয়োজিত হয়ে যায় তখন অবশ্যই তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট হওয়া দরকার। এ সময়ে সাম্রাজ্য এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে, যাকে সীমান্তসহ বিভিন্ন অঞ্চলের কেন্দ্রের সাথে সুগ্রথিত ও সুবিন্যস্ত অবস্থা বলা যায়। সাম্রাজ্য এর পর যদি তার আয়ত্তাধীন অঞ্চল অপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি লাভের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়, তা হলে তার অধিকৃত অতিরিক্ত অঞ্চল অসংরক্ষিত এবং শত্রু ও প্রতিবেশীর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়াবে। এর পরিণাম সাম্রাজ্যের জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। কারণ এতে একদিকে যেমন শত্রুদের উৎসাহ বাড়বে, অন্যদিকে তেমনি সাম্রাজ্য শক্তির ভীতির প্রভাবকে ধ্বংস করে ফেলবে।

যদি গোত্রশক্তি আরো পরিপূর্ণ হয় এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ও সীমান্তে বিভক্তির অনুপাতে তা নিঃশেষ হয়ে না যায়, তা হলে সাম্রাজ্যের মধ্যে তার আপাত আয়ত্তাধীন সীমা ছাড়িয়েও বিস্তৃতি লাভের শক্তি বিদ্যমান থাকে এবং তা আরো বিস্তৃত হয়ে তার সীমায় পৌঁছতে পারে। এতে স্বাভাবিক কার্যকারণের উৎস হল গোত্রপ্রীতি যা স্বাভাবিক শক্তিসমূহের মধ্যে এর জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয়। প্রতিটি শক্তি থেকেই বিশেষ একটি কার্যের উদ্ভব ঘটে এবং তার মধ্যেই উক্ত শক্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এ দিক থেকে সাম্রাজ্য তার প্রান্ত ও বিন্যস্ত অঞ্চল অপেক্ষা কেন্দ্রেই অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে। সুতরাং বিন্যাসের ধারা অনুসরণ করে তার কেন্দ্রস্থিত শক্তি যখন একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে, তখন অধিক অগ্রসর হবার আর ক্ষমতা থাকে না। যেমন কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত আলো ও কিরণের ব্যাপ্তি এবং জলের উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপের ফলে উত্থিত তরঙ্গবৃত্তের প্রসার। এর পর যখন সাম্রাজ্যে ক্ষয় ও দুর্বলতা দেখা দেয়, তখন তা তার প্রান্তগুলো থেকেই আরম্ভ হয় এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশে সমগ্র সাম্রাজ্য ধসে না পড়া

www.amarboi.org

পর্যন্ত তা কেন্দ্রস্থলে সুরক্ষিত থাকে। সর্বশেষেই কেন্দ্রের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু এর বিপরীতে যদি কেন্দ্রই পরাজিত হয়ে পড়ে, তা হলে তার বিন্যস্ত অঞ্চল ও সীমান্ত তাকে রক্ষা করতে পারে না, সমুদয় এক সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়। এ কেন্দ্রটি মানবদেহের হৃদপিণ্ডের মতোই, যা থেকে আত্মশক্তি সমগ্র দেহে বিস্তৃত হয়। সুতরাং এ হৃদপিণ্ড আক্রান্ত বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অসাড় হয়ে পড়ে।

পাঠক, পারস্য সাম্রাজ্যে এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন। তার কেন্দ্র ছিল মাদায়েন। সুতরাং মুসলমানরা যখন তা অধিকার করে নিল, সমস্ত পারস্য সাম্রাজ্যই ধসে পড়ল। ফলে ইয়াজদার্গিদের আয়ত্তাধীন অন্যান্য অবশিষ্ট অঞ্চল কোনো কাজেই আসল না। এর বিপরীতে রোম সাম্রাজ্যের অধীন সিরিয়ার অবস্থা। যেহেতু তাদের কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনপোল, সুতরাং মুসলমানরা সিরিয়া অধিকার করে নিলে তারা কেন্দ্রে সমবেত হল এবং তাদের ক্ষমতা থেকে সিরিয়ার বিচ্যুতিকে তারা প্রায় কোনো ক্ষতি বলেই মনে করল না। কেন্দ্রে তাদের এ সাম্রাজ্য শক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশে বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বহুদিন টিকে ছিল। পাঠক, এ ব্যাপারে আপনি ইসলামের প্রথম যুগের আরবীয় শক্তির প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেন। তখন তাদের গোত্রশক্তি পরিপূর্ণ। সেই কারণেই তারা কত দ্রুত তাদের প্রতিবেশী অঞ্চল সিরিয়া, ইরাক ও মিশরকে অধিকার করে নিয়েছিল। এর পর তারা উক্ত সীমা অতিক্রম করে সিন্ধু, আবিসিনিয়া, আফ্রিকিয়া, মাগরিব ও পরে আন্দালুস জয় করেছে। এভাবে যখন তাদের গোত্রশক্তি বিভিন্ন অঞ্চল ও সীমান্তের সংরক্ষণে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং এ সকল অংশ অনুপাতে তাদের শক্তি নিঃশেষ হল, তখন তাদের পক্ষে আর অধিক বিজয় লাভ সম্ভব হয়নি। ইসলামের শক্তির এখানেই শেষ। সে এ সীমা আর অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি; এবং ক্রমশ কেন্দ্রের দিকেই ফিরে এসে আল্লাহ্‌র নির্দেশে শেষ হয়ে গেছে।

পরবর্তীকালের অন্যান্য সাম্রাজ্যের একই অবস্থা। প্রত্যেকটিই তার অন্তর্গত জনশক্তির সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্পতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন এ জনশক্তি অঞ্চল ও সীমান্তের শৃঙ্খলাবিধানে নিঃশেষিত হয়ে যায়, তখন আর তাদের পক্ষে বিজয় লাভ ও প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব হয় না। সৃষ্টির মধ্যে এটাই আল্লাহ্‌র প্রথা।

www.amarboi.org

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[যে কোনো সাম্রাজ্যের আয়তন, বিস্তার ও স্থায়িত্ব তার জনশক্তির স্বল্পতা ও আধিক্যের অনুপাতে হয়ে থাকে]

এর কারণ এ যে, রাজ্য একমাত্র গোত্রপ্রীতির সাহায্যেই স্থাপিত হয়। গোত্রের অন্তর্গত জনশক্তিই বিভিন্ন দিকে ও অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং তার দায়দায়িত্বকে ভাগ করে নেয়। সুতরাং কোনো রাজ্যের এ জনশক্তি ও গোত্রশক্তি যদি অধিক হয়, তা হলে তা সেই অনুসারে অধিক শক্তিশালী, অধিক অঞ্চল ও স্থানের অধিকারী এবং অধিক বিস্তৃতি লাভ করে থাকে।

পাঠক, ইসলামী সাম্রাজ্য সম্পর্কে এ বিষয়টি বিবেচনা করুন। আল্লাহ্ যখন ইসলামের ঐক্যসূত্রে আরব জাতিকে একত্র করলেন তখন হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর শেষ যুদ্ধ তবুকের ময়দানে মুসলমান সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ দশ হাজার। এ সংখ্যা মুজার ও কাহতানের পদাতিক ও অশ্বারোহীর সাথে হজরতের তিরোধান পর্যন্ত তবুক পরবর্তী ইসলাম গ্রহণকারী জনসংখ্যা মিলে আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। এজন্য তারা যখন অন্যান্য জাতির আয়ত্তাধীন রাজ্য অধিকার করতে ইচ্ছুক হল, তখন তাদের সম্মুখে সৈন্য বা দুর্গের কোনো বাধাই স্থায়ী হয়নি। এর ফলে তৎকালীন পৃথিবীর দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্য পারস্য ও রোম তাদের পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। পূর্বদিকে তুর্কিরা, পশ্চিম দিকে মাগরিবে ফিরিঙ্গী ও বারবাররা এবং আন্দালুসে গহরা তাদের অধিকারে আসল। হেজাজ থেকে সুদূর 'সুস' ও ইয়ামেন থেকে তুর্কি অঞ্চলের সুদূর উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত তারা সপ্তাঞ্চলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করল।

এর পর পাঠক, সিনহাজা, আলমোহেদ ও তাদের পূর্বের উবাইদীদের সাম্রাজ্যের ব্যাপারগুলো লক্ষ করুন। যেহেতু উবাইদীদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কুতামাদের সংখ্যা সিনহাজা ও মাসমুদাদের অপেক্ষা অধিক ছিল, সেজন্য তাদের সাম্রাজ্যের পরিধিও বিস্তৃততর হয়েছিল। তারা আফ্রিকিয়া, মাগরিব, সিরিয়া, শির ও হেজাজ দখল করেছিল। এর পর, পাঠক, জানাতীদের সাম্রাজ্যের দিকে লক্ষ করুন। তাদের সংখ্যা যেহেতু মাসমুদাদের অপেক্ষা কম ছিল, এজন্য তাদের সাম্রাজ্যও ক্ষুদ্রতর হয়েছিল। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় মাসমুদাদের অপেক্ষা কম থাকায় আলমোহেদ সাম্রাজ্য থেকে তাদের সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র হয়। এর পর, পাঠক, বর্তমান সময়ে জানাতীদের দুটি সাম্রাজ্যের কথা বিবেচনা করুন। এর একটি বনি মারীনের ও অন্যটি বনি আবদেল ওয়াদের। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় যেহেতু বনি মারীনের জনশক্তি বনি আবদেল ওয়াদের অপেক্ষা

www.amarboi.org

বেশি ছিল, এজন্য তাদের সাম্রাজ্যটি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ও বিস্তৃততর বিন্যাসের অধিকারী। এজন্য মারিনীরা বারবার তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বলা হয় যে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় মারিনীদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার এবং বনি আবদেল ওয়াদের ছিল মাত্র একহাজার। অবশ্য পরে তারা সাম্রাজ্যে অন্তর্গত সহজ জীবন যাপন ও প্রচুর অনুসারীদের কল্যাণে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলেছে।

এভাবে অনুপাত বিচার করলে দেখা যায়, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে জনশক্তি অনুসারেই তার শক্তি ও বিস্তৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। এমন কি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বও এ অনুপাত অনুযায়ীই দেখা দেয়। যে কোনো নবীন সৃষ্টির স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার উপাদানের মিশ্রণ শক্তির উপর এবং সাম্রাজ্যের মিশ্রণ শক্তি হল গোত্রপ্রীতি। সুতরাং গোত্রপ্রীতি শক্তিশালী হলে মিশ্রণ শক্তি তার অনুগামী হয় এবং তার জীবনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর গোত্রপ্রীতির শক্তি সংখ্যার আধিক্য ও পরিপূর্ণতার দ্বারাই সম্ভব, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। এর যথার্থ কারণ এ যে, যে কোনো সাম্রাজ্যের ক্ষয় সাধারণত তার প্রান্তগুলো থেকেই আরম্ভ হয়। কাজেই তার অঞ্চল যদি অধিক হয়, তা হলে সেগুলো কেন্দ্র থেকে অনেকখানি দূরে দূরে অবস্থিত হবে। এভাবে বিস্তৃত অঞ্চলে ক্ষয় দেখা দেয়ার জন্য সময়ের প্রয়োজন। কাজেই অঞ্চল বেশি হওয়ার জন্য ক্ষয়ের সময়ও বেশি হবে। এভাবে প্রতিটি অঞ্চলে ক্ষয় ও তজ্জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের অনুপাত হিসাব করলে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব দীর্ঘই হয়ে দাঁড়াবে।

পাঠক, এ বিষয়টি আরবের ইসলামী সাম্রাজ্যের মধ্যে লক্ষ করুন। কীভাবে তাদের মধ্যকার কেন্দ্রের অধিকারী বনি আব্বাস এবং আন্দালুস বিজয়ী বনি উমাইয়াদের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকাল অন্যান্য সকল সাম্রাজ্য থেকে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পরে ছাড়া কারো সাম্রাজ্যে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দেয়নি। উবাইদীদের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকাল প্রায় দুইশ আশি বছর। সিনহাজাদের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকাল তাদের অপেক্ষা কম। এর আরম্ভ মুয়েজ্জুদৌলা কর্তৃক বুলুক্কীন ইবনে যিরীর উপর তিনশ আটান্ন হিজরিতে আফ্রিকিয়ার শাসনভার ন্যস্ত করা হত এবং পাঁচশ সাতান্ন হিজরিতে আলমোহেদগণ কর্তৃক 'কেলআ' ও 'বেজা' অধিকার করা পর্যন্ত এর শেষ। বর্তমানকালে আলমোহেদ সাম্রাজ্য প্রায় দুইশ সত্তর বছর স্থায়ী হয়েছে। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের ব্যাপারটি এভাবেই তার প্রতিষ্ঠাকারীদের সংখ্যা অনুপাতে হয়ে থাকে। এটাই আল্লাহ্‌র প্রথা, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।[১২]

---

১২. কোরান ৪০, ৮৫।

www.amarboi.org

নবম পরিচ্ছেদ

[অধিক গোত্র ও গোত্রশক্তিবিশিষ্ট অঞ্চলগুলোতে সাম্রাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা খুব কমই হয়ে থাকে]

এর কারণ হল মত ও প্রবৃত্তির বিভিন্নতা এবং প্রতিটি মত ও প্রবৃত্তির পশ্চাতে গোত্রপ্রীতির এমন একটি শক্তি বিদ্যমান, যা অন্যটিকে বাধা প্রদান করে। সুতরাং সাম্রাজ্য গোত্রপ্রীতির অধিকারী হলেও তদন্তগত প্রতিটি গোত্রপ্রীতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠীই ধারণা করে যে, শক্তি ও প্রতিরোধে তারাও কম নয়, এর ফলে গোলযোগের আধিক্য ঘটে এবং সময়ে সময়ে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

পাঠক, আফ্রিকিয়া ও মাগরিবে এ ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যা ঘটেছে তৎপ্রতি লক্ষ করুন। এ সকল স্থানের বারবাররা বিভিন্ন গোত্র ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত। এর ফলে তাদের মধ্যে ইবনে আবিসরার প্রাথমিক প্রাধান্য বিস্তার কোনো কাজে আসেনি। বারবার ও ফিরিঙ্গীরা এর পর বারংবার উত্থান ও প্রতিরোধের দিকে অগ্রসর হয়েছে। মুসলমানরা তাদের উপর হত্যার তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে, তথাপি তারা বিশেষ কোনো ধর্মমত প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বারংবার উত্থান ও বিদ্রোহের দারস্থ হয়েছে এবং বিদ্রোহীদের ধর্মমত গ্রহণ করেছে। ইবনে আবি যায়েদ বলেছেন, মাগরিবের বারবাররা দ্বাদশ বার ধর্ম ত্যাগ করেছে। মুসা ইবনে নুসাইর ও তাঁর পরবর্তীকাল ছাড়া তাদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের বাণী দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেনি। হজরত উমর থেকে যা বর্ণনা করা হয়, তার অর্থ এটাই। তিনি বলেছেন, আফ্রিকিয়া তার অধিবাসীদের অন্তঃকরণ বিচ্ছিন্নকারী। এতে তার বিচিত্র গোত্রপ্রীতি ও গোত্রশক্তির আনুগত্যহীনতা ও অবাধ্যতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তৎকালে ইরাক ও সিরিয়ার অবস্থা তদ্রূপ ছিল না। কারণ এ স্থানগুলোর সংরক্ষণকারী প্রায় সকলে ছিল পারসিক ও রোমীয় এবং তারা নির্বিশেষে পল্লী ও শহরের অধিবাসী। সুতরাং মুসলমানরা যখন তাদের উপর জয়ী হয়ে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিল, তখন সেখানে আর বাধাদানকারী ও বিরোধী কেউ ছিল না। কিন্তু মাগরিবে বারবারদের অবস্থা এর বিপরীত, তাদের গোত্রসংখ্যা অগণিত। আবার এদের প্রতিটিই প্রান্তরবাসী একাধিক গোত্রপ্রীতি ও পরিবার সম্পন্ন। সুতরাং যখনই এদের একটি ধ্বংস হয়েছে, তৎক্ষণাৎ অন্য একটি এর স্থান গ্রহণ করে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। এ জন্যই আরবীয়দের পক্ষে মাগরিব ও আফ্রিকিয়ায় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে।

www.amarboi.org

বনি ইসরাইলের সময়ে শিরিয়ার অবস্থাও অনুরূপ ছিল। সেখানে একাধিক ফিলিস্তিনী কেনানী, বনি ইসু, বনি মদিয়ান, বনি লুত, রোমীয়, গ্রিক, আমালেকী, আক্রিকশ, নবতী প্রভৃতি এবং জজিরা ও মোশেলের দিকে প্রায় অগণিত গোত্র ও বিচিত্র গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই বনি ইসরাইলের জন্য সাম্রাজ্য স্থাপন ও শাসনব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের ব্যাপারটি কঠিন হয়ে পড়ে এবং বারংবার তাদের রাজ্যে শক্তি রূপ বদলাতে বাধ্য হয়। এ মতানৈক্য তাদের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল; ফলে তাদের রাষ্ট্রশক্তি বারবার আন্দোলন ও বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছে। বস্তুত তারা তাদের সমগ্র শাসনকালব্যাপী কোনো সুসংবদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এমনিভাবে চলে তারা পারসিকদের নিকট, পুনরায় গ্রিকদের নিকট, আবার রোমীয়দের নিকট পরাজিত হয়ে শেষ পর্যায়ে বিতাড়িত হয়েছে। 'আল্লাহ্ তার ব্যাপারে সর্বজয়ী।'[১৩]

এর বিপরীত দিকে যে সকল স্থান একাধিক গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী মুক্ত, তাতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সহজ এবং শাসনব্যবস্থাও গোলযোগ ও মতবিরোধের অভাবে অধিকতর সুশৃঙ্খল হয়ে থাকে। সেখানে সাম্রাজ্য খুব একটা গোত্রপ্রীতিজনিত শক্তিরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। যেমন বর্তমানকালে মিশর ও সিরিয়ার অবস্থা। কারণ উক্ত স্থানগুলোতে গোত্র বা গোত্রপ্রীতির আধিক্য নেই, এমনকি কোনকালে সেখানে যে এগুলোর অস্তিত্ব ছিল, এও বলা যায় না, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। মিশর রাজ্য শান্তিপূর্ণ ও সুদৃঢ়; কারণ সেখানে বিদ্রোহী ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর সংখ্যাল্পতা। তাতে শুধুই সম্রাট ও প্রজা এবং তাদের রাজ্যব্যবস্থা তুর্কি শাসক ও তাদের গোত্রশক্তির দ্বারা একের পর এক পরিচালিত হচ্ছে। তাদের ক্ষমতা একই পরিধির মধ্যে এক উৎস থেকে অন্য উৎসে সংক্রমিত হচ্ছে মাত্র। খেলাফত নামে মাত্র আব্বাসী বংশধারার সাথে সংযুক্ত রয়েছে।

বর্তমানকালে আন্দালুসের অবস্থাও একই। তার বর্তমান সম্রাট ইবনুল আহমারের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালীন গোত্রপ্রীতির শক্তি খুব বেশি ছিল না, এমন কি তা পর্যায়ক্রমিকভাবে সুদৃঢ়ও নয়। এটা শুধু আরবীয় একটি ঘরানার ও উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত জনশক্তির একটি সামান্য অংশ। এর ব্যাপারটি এ যে, যখন আন্দালুসবাসীদের উপর থেকে আরবীর সাম্রাজ্যের প্রভাব অপসৃত হল এবং বারবারদের লামতুনা আলমোহেদেরা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করল তখন তাদের নিকট তা খারাপ লাগত এবং তারা আনুগত্য স্বীকার করতে অসুবিধার সম্মুখীন হল। এর ফলে তাদের মনে প্রতিহিংসাপরায়ণতা জেগে উঠতে লাগল। আলমোহেদ নেতৃবৃন্দ তাদের শাসন আমলের শেষদিকে মারাকেশ নগরী অধিকারে আনার জন্য এবং ঐ সকল বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তারের নিমিত্ত তাদের হাতে অনেকগুলো দুর্গ ছেড়ে দিলেন। এর ফলে সেখানে অবশিষ্ট আরবীয় ঘরানার গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীগুলো একত্র হতে সংযোগ পেল। এ জনগোষ্ঠী কিছুকাল পর্যন্ত নগর ও পল্লী জীবন থেকে

১৩. কোরান ১২, ২১।

www.amarboi.org

সম্পূর্ণ দূরেই অবস্থান করছিল এবং গোত্রপ্রীতির মধ্যে তাদের একটা দৃঢ়তা বর্তমান ছিল। যেমন ইবনে হুদ, ইবনুল আহমার, ইবনে মর্দানীশ প্রমুখ ও অন্যান্য ব্যক্তি। সুতরাং ইবনে হুদ এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন এবং পূর্বাঞ্চলে আব্বাসী সাম্রাজ্যের নামে মানুষের প্রতি আহ্বান জানালেন। এর ফলে সাধারণ মানুষ আলমোহেদদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং তাদের আনুগত্য ত্যাগ করে তাদেরকে বের করে দিল। এভাবে ইবনে হুদ আন্দালুসে স্বাধীন শাসক হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর পর ইবনুল আহমার এ ব্যাপারে উঠে দাঁড়ালেন এবং ইবনে হুদের বিরোধিতা করে আফ্রিকিয়ার আলমাহেদ নৃপতি ইবনে আবি হেফসের নামে লোকজনকে ডাক দিলেন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর কিছু সংখ্যক আত্মীয়, যাদেরকে 'সর্দার' নামে ডাকা হত, তাদের সহায়তায় সাফল্যলাভ করলেন। প্রাধান্য বিস্তারের জন্য খুব বেশি সংখ্যার প্রয়োজন হত না। কারণ আন্দালুসে গোত্রপ্রীতির শক্তি খুব বেশি কিছু ছিল না। তাঁদের অবস্থা ছিল সম্রাট ও প্রজার। অতঃপর ইবনুল আহমার সাগরের অপর পার হতে আগত জানাতী বিদ্রোহীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চেষ্টা করলেন। এর ফলে তারা তাঁর অনুসারী হয়ে সীমান্ত অঞ্চল ও রাজ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় যোগ দিল। এমন সময় মাগরিবের জানাতী শাসকদের মধ্যে আন্দালুস বিজয়ের ইচ্ছা জেগে উঠলে পূর্বোক্ত জানাতীরা ইবনুল আহমারের পক্ষ হয়ে তাতে বাধাপ্রদান করল। এর ফল এ দাঁড়াল যে, ইবনুল আহমারের ভিত্তি দৃঢ় হল এবং মানুষ তাঁর প্রতি সদয় হয়ে উঠল। সুতরাং অন্য কারো পক্ষে তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাবনা রইল না এবং এ জন্য বর্তমানকালেও তাঁর সন্তান-সন্ততিরা উক্ত সাম্রাজ্যের অধিকার ভোগ করছে। পাঠক, তাই বলে মনে করবেন না যে, এর পশ্চাতে গোত্রশক্তির কোনো দান নেই; বরং তাও আছে। যত কমই হোক না কেন, এ সাম্রাজ্যের প্রারম্ভে গোত্রশক্তির প্রভাব বিদ্যমান। কারণ আন্দালুসে গোত্রশক্তি ও গোত্রপ্রীতির স্বল্পতা থাকায় অল্প সংখ্যার দ্বারা প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব হয় এবং গোত্রপ্রীতি খুব একটা ব্যাপক না হলেও চলে। 'আল্লাহ্‌র সমগ্র পৃথিবীতেও কোনো প্রয়োজন নেই।'[১৪]

---

১৪. কোরান ৩, ৯৭।

www.amarboi.org

দশম পরিচ্ছেদ[১৫]

[রাজ্যশক্তির স্বভাব হল যাবতীয় গৌরব নিজের জন্য কুক্ষিগত করা]

এটা এ যে, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, রাজ্যশক্তি গোত্রপ্রীতির মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে এবং একই বংশের মধ্যে বহু গোত্রপ্রীতি পরস্পর মিলিত অবস্থায় বর্তমান থাকে। এদের মধ্যে যে কোনো একটি অন্য সবগুলো হতে শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। যাতে তা অন্যগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে, বিজয়ী হয়ে অন্য সবগুলোকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে একক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। বস্তুত এ শক্তির সাহায্যেই মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে ওঠে।

এর অন্তর্নিহিত রহস্য এ যে, কোনো গোত্রের সাধারণ গোত্রপ্রীতি কোনো বস্তুর উপাদানগত মিশ্রণের সাথে তুলনীয়। এ মিশ্রণ উপাদানেরই সমষ্টি। যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, উপাদানগুলো যদি সমধর্মী হয় তা হলে মিশ্রণ আদৌ সংঘটিত হয় না। বরং তাদের মধ্যে একটি উপাদান প্রাধান্য বিস্তার করে অন্য সকলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে মিলিয়ে একটি মাত্র গোত্রশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে। অন্য সকল শক্তি তার অধীনে তারই মধ্যে বিরাজ করবে। এরূপ বৃহৎ গোত্রপ্রীতি যে-কোনো জাতির একটিমাত্র পরিবার ও নেতৃত্বের মধ্যেই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে যে কোনো এক ব্যক্তি সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী নেতৃস্থানীয় হবে। এর মধ্যে গোত্রশক্তির সমগ্র উৎসের নেতৃত্ব বিরাজ করে। যখন এভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য নেতৃত্ব নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন জীব চরিত্রের অমোঘ বিধানে তার মধ্যে অহংকার ও আত্মশ্লাঘার ভাব জন্ম নেয়। এর ফলে সে তার অনুসারীদের সাথে আচার-আচরণে নিজের এ গৌরবের কোনো অংশ দিতে বা তাদেরকে শাসন ত্রাসনে সম অংশীদার ভাবতে অপমান মনে করে। এ সময়ে তার মধ্যে মানুষের স্বভাবগত একাধিপত্যের ভাব এসে শাসকের এককতার সাথে মিশে যায়। কারণ শাসক একক শক্তিসম্পন্ন না হলে সকল কিছুই নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। 'যদি তাদের মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু থাকত, তা হলে তারা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেত'।[১৬]

এর ফলেই অন্যান্য গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উচ্চাশাকে দমন করা হয় এবং রাজ্য পরিচালনার একক গৌরবের মধ্যে অন্য কারো অংশীদারিত্বের চেষ্টাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। ফলে তাদের মধ্যকার গোত্রপ্রীতি অনুরূপ আশা পোষণ করতে বিরত

১৫. রোজেনথাল এ একটি পরিচ্ছেদেই একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদের বর্ণনা একত্র করেছেন।
১৬. কোরান ২১, ২২।

www.amarboi.org

থাকে। শাসক যতদূর সম্ভব সমুদয় শক্তি নিজের মধ্যে সংহত করে, সকল কিছু কুক্ষিগত করে নেয় এবং তাদের জন্য একটি উট বা উটনীও ছেড়ে দেয় না। এভাবে সে রাজ্যশক্তির সমস্ত গৌরব নিজের মধ্যে বহন করে এবং অন্যকে এর মধ্যে অংশগ্রহণে বাধা দেয়। কখনো এ অবস্থা সাম্রাজ্যের প্রথম শাসকের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করে, আবার কখনও বা গোত্রশক্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তির তারতম্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শাসকের জন্য সম্ভব হয়। অবশ্য এটা এমন একটি বিষয়, সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য যার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। এটাই আল্লাহ্‌র প্রথা, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। আল্লাহ্ উন্নত ও সর্ববিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী।

www.amarboi.org

একাদশ পরিচ্ছেদ

[রাজ্যশক্তির স্বভাব হল বিলাসব্যসনে লিপ্ত হওয়া]

এটা এ যে, কোনো জাতি যখন অন্য জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের অধীনস্থ সমুদয়ের উপর অধিকার লাভ করে, তখন তাদের ভোগ ও আরাম-আয়েশ বৃদ্ধি পেয়ে কিছু অভ্যাসের সৃষ্টি করে। তারা জীবনের প্রয়োজনীয় একান্ত ও স্থূল উপকরণ থেকে অপ্রয়োজনীয়, সুরুচিপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত উপকরণের দিকে অগ্রসর হয়। তারা এ ব্যাপারে পূর্বসূরিদের অবস্থা ও অভ্যাসের অনুকরণ করে থাকে। ফলে এ সকল অপ্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও ভোগ করতে কিছু সংখ্যক অভ্যাস গড়ে তুলতে হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আহার্য, পরিচ্ছদ, শয্যা, বাসনকুশন প্রভৃতির সূক্ষ্মতা ও কোমলতা সৃষ্টি করে অহংকার প্রকাশ করতে অভ্যস্ত হয়। তারা অন্যান্য জাতির এ সকল বিষয়ে উত্তম আহার্য, চমৎকার পরিচ্ছদ, দুর্লভ বাহন প্রভৃতিতে অহংকার প্রকাশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তাদের পরবর্তী বংশধররাও সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে পূর্বসূরিদের ধারা অনুসরণ করে। অবশ্য তাদের এ সকল ভোগসম্ভোগ রাজ্যশক্তির অনুপাতেই হয়ে থাকে। এভাবে তাদের বিলাসব্যসন সাম্রাজ্যের শক্তি অনুযায়ী শেষ সীমায় উপনীত হয়। তারা তাদের সামর্থানুসারে এ ব্যাপারে পূর্বসূরিদের অভ্যাসগুলো আত্মস্থ করে থাকে। এটাই বান্দাদের মধ্যে তাদের আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ উন্নত ও সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ।

www.amarboi.org

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[রাজ্যশক্তির স্বভাব হল স্থিরতা ও শান্তি কামনা]

এটা এ যে, যে কোনো জাতির পক্ষে অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা ব্যতীত রাজ্য লাভ হয় না এবং এ প্রচেষ্টার শেষ পর্যায় হল প্রাধান্যবিস্তার ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা। সুতরাং যে কোনো ব্যাপার শেষ পর্যায়ে পৌঁছলে তার জন্য সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস পায়। কবি বলেন,[১৭]

আমার ও তার মধ্যে সময়ের দ্রুততায় বিস্মিত হয়েছি;
অথচ আমাদের সম্পর্ক যখন চুকিল, সময়ও শান্ত হল।

সুতরাং যখন তারা রাজ্য লাভ করে, তখন তার জন্য এক সময়ে তারা যে কষ্ট স্বীকার করেছিল, তা আর করতে চায় না। বরং তার পরিবর্তে শান্তি, স্বস্তি ও স্থিরতাকে প্রাধান্য দেয় এবং রাজ্যাধিপতি হওয়ার ফল ভোগের জন্য সৌধ, বাসগৃহ ও পরিচ্ছদাদি তৈরিতে মনোনিবেশ করে। তারা প্রাসাদ তৈরি করে, জলের ফোয়ারা বহায়, উদ্যান রচনা করে এবং পার্থিব জীবনের সম্ভোগে লিপ্ত হয়। এভাবে পরিশ্রমের উপর বিশ্রামকে প্রাধান্য দিয়ে যথাসম্ভব পরিচ্ছদ, আহার্য, আসবাবপত্র ইত্যাদির ব্যাপারে পরিমার্জনায় প্রয়াসী হয়। তাদের উত্তরসূরিরাও এ অবস্থাকেই প্রিয় বলে মনে করে এ প্রাধান্য দেয়। এভাবে এটা তাদের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। বস্তুত তিনি যথার্থই উত্তম নির্দেশ প্রদানকারী। আল্লাহ্ই উন্নত ও সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা।

---

১৭. কবি সপ্তম শতাব্দির আবু শকর আবদুল্লাহ্ ইবনে সলম আল হুজালী।

www.amarboi.org

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[যখন রাজ্যশক্তির স্বভাব একক গৌরব, বিলাসব্যসন ও স্থিরতায় সুদৃঢ় হয়, তখনই সাম্রাজ্যে ক্ষয় দেখা দেয়]

এর বর্ণনায় কতিপয় কারণের উল্লেখ করা যায়।

প্রথম কারণ, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, রাজ্যশক্তি একক গৌরবের অধিকারী হয়। অথচ এ গৌরব সমগ্র গোত্রশক্তিরই সম্পদ ছিল এবং তা অর্জন করতে তারা এক হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তারে ও অপরের আক্রমণ থেকে স্বার্থ সংরক্ষণে তারা আদর্শায়িত সংগ্রাম ও সংঘবদ্ধ শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। তাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল গৌরব লাভ। তারা এ গৌরবের ভিত্তি স্থাপনে মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে এবং তাকে নষ্ট হতে দেয়া অপেক্ষা নিজেদের ধ্বংস কামনা করেছে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে কেউ একজন যদি গৌরবের দাবিদার হয়ে বসে, তা হলে তাদের গোত্রপ্রীতি নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং তাদের শক্তি খর্ব হয়ে যায়। তদুপরি ঐ একক গৌরবের অধিকারী যখন সমস্ত সম্পদ নিজের কুক্ষিগত করে নেয়, তখন তারা যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণের শক্তি হারিয়ে ফেলে, তাদের উৎসাহ কমে যায় এবং তারা হীনমন্যতা ও দীনতার ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে। তাদের পর দ্বিতীয় পুরুষও অনুরূপ মনোভাবেরই অধিকারী হয়। সম্রাটের দিক থেকে প্রদত্ত দানাদিকে তারা তাদের সাহায্য-সহায়তার পারিশ্রমিক বলে মনে করে। কারণ তাদের বুদ্ধিতে এর অধিক কিছু আসে না। এজন্য তাদের মধ্যে খুব অল্পই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে সম্মত হয়। এ অবস্থা সাম্রাজ্যের জন্য নৈরাশ্য ও এর বীর্যবত্তার অভাবের প্রতিই ইঙ্গিত করে। এর ফলে তা ধীরে ধীরে দুর্বলতা ও ক্ষয়ের অধীন হতে থাকে এবং তার গোত্রপ্রীতি নষ্ট হওয়ার দরুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোত্রশক্তি থেকে সংগ্রামের মনোভাব দূর হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, রাজ্যশক্তি স্বভাতত বিলাসব্যাসনে লিপ্ত হয়ে থাকে। এর ফলে তাদের অভ্যাস বৃদ্ধি পায় এবং তাদের আয় থেকে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে ওঠে। তারা যা পায়, তাতে তাদের কুলায় না, তাদের মধ্যে যারা নিঃস্ব, তারা মৃত্যুর সম্মুখীন হয় এবং যারা সম্পদশালী, তারা বিলাসব্যসনে তাদের প্রাচুর্য ব্যয় করে। তাদের পরবর্তী পুরুষগুলোতে এ অভ্যাস আরো বৃদ্ধি পায়, এমন কি এক সময়ে তারা সমগ্র আয়কেই বিলাসব্যসনের জন্য ব্যয় করে বসে। এমনি অবস্থায় যখন প্রয়োজন দেখা দেয়, তাদের সাম্রাজ্য যখন আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয়ভার বহন

www.amarboi.org

করতে তাদেরকে আহ্বান জানায়, তখন আর তারা পথ খুঁজে পায় না। তখনই তাদের মনে অত্যধিক করারোপের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা জেগে ওঠে। তারা অধিকাংশের নিকট থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তা ভোগ করার ব্যাপারে নিজেদেরকে কিংবা নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও সাম্রাজ্যের কর্মীদিগকে প্রাধান্য দেয়। এভাবে তারা সাধারণ মানুষকে জীবনযাপনে দুর্বল করে ফেলে এবং পরিণামে তাদের দুর্বলতা সাম্রাজ্যের শক্তিকেই দুর্বল করে তোলে।

তদুপরি যখন কোনো সামাজ্যে বিলাসব্যসনের পরিমাণ বেড়ে যায়, তখন তাদের আয় অপেক্ষা ব্যয় ও খরচাদি অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যের অধিপতি তথা সম্রাট অতিরিক্ত আয়ের পথ খুঁজতে বের হয়, যাতে তাঁর প্রয়োজন মিটে এবং অস্বাভাবিক চাহিদা পূরণ হয়। অথচ প্রতিটি সাম্রাজ্যের করাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট, তা বাড়েও না, কমেও না। যদি নতুন কর ধার্য করে একে বাড়িয়েও দেয়া যায়, তথাপি এ বৃদ্ধিসহও তার একটা সীমা নির্ধারিত রয়েছে। এভাবে করাদির দ্বারা রাজকোষের অবস্থা বৃদ্ধি পেয়ে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য কর্মচারীদের আর্থিক চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। কারণ তাদের জীবনেও বিলাসব্যসনজনিত খরচাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং তারা প্রয়োজনমত তা না পেলে বিরূপ হয়ে ওঠে এবং করারোপের পূর্বকালীন সহায়তা থেকে তারা দূরে সরে যায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিলাসব্যসন বাড়ে এবং করারোপের পরিমাণও বাড়তে থাকে। এর প্রতিক্রিয়া সহায়ক শক্তি করতে থাকে। এভাবে তৃতীয় বার, চতুর্থ বার কমে সাম্রাজ্যের সৈন্যদল স্বল্পসংখ্যক হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রতিরক্ষা শক্তি ভেঙে পড়ে। সাম্রাজ্যের এ শক্তি হ্রাসের ফলে প্রতিবেশী অন্যান্য রাজ্য এর উপর চড়াও হয়ে বসে কিংবা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন গোত্রশক্তি ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় তৎপর হয়। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির জন্য ধ্বংসের যে বিধান রেখেছেন, তা এ সাম্রাজ্যের জন্যও সত্য হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে বিলাসব্যসন চরিত্রের মধ্যে নানাপ্রকার দোষ, শৈথিল্য ও বদভ্যাসের জন্ম দেয়; যেমন নগর সংস্কৃতি সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদে এর বর্ণনা আসবে। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে সেই সচ্চরিত্র অন্তর্হিত হয়, যা একসময়ে তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য গুণ ও নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। তা ত্যাগ করে তারা যখন অসৎচরিত্রে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে, তখন স্বভাবতই ক্ষয় ও দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আল্লাহ্র সৃষ্টিতে এ নিয়মই বিদ্যমান। ফলে সাম্রাজ্যে ধ্বংসের প্রারম্ভ সূচিত হয়ে তার অবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে ক্ষয়ের সেই সুপ্রাচীন ব্যধি দেখা দেয়, যাতে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

তৃতীয় কারণ, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি সাম্রাজ্যের স্বভাব হল স্থিরতা। যখন তারা শান্তি ও স্বস্তিকে প্রিয় চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তা তাদের স্বভাব ও প্রকৃতির অন্তর্গত হয়ে পড়ে। সকল অভ্যাস ও প্রিয় বস্তুর এটাই পরিণাম। তাদের পরবর্তী অন্যান্য পুরুষ বংশধরও জীবনের প্রাচুর্য ও বিলাসের শান্তিময় শয্যায় শায়িত হয়ে বেড়ে ওঠে। তারা তাদের সেই বন্য জীবন, সেই প্রান্তরীয় অভ্যাসের অমোঘ সংগ্রামী শক্তি, যার কল্যাণে রাজ্যলাভ হয়েছিল, তাতে পরিবর্তন ঘটায় ও ভুলে যায়। সেই হিংস্রতার অভ্যাস, সেই দিগন্তহীন বিচরণ, সেই নির্জনতার গন্তব্য অন্বেষণ—সকল

www.amarboi.org

কিছুই তাদের স্মৃতি থেকে অপসারিত হয়। তাদের মধ্যে আর নগরবাসী জনসাধারণের মধ্যে বৈভব ও ভূষণাদি ব্যতীত অন্য কোনো প্রভেদ থাকে না। এভাবে তাদের সহায়ক শক্তি দুর্বল হয়, সংগ্রামী চেতনা বিনষ্ট হয় এবং তাদের শৌর্য ধ্বংস হয়ে যায়। এর সমস্ত প্রতিক্রিয়াই সাম্রাজ্যের উপর পতিত হয়ে তাকে ক্ষয় করে আনতে থাকে। অথচ এ অবস্থাতেও তাদের বিলাসব্যসন, নগর জীবনের অভ্যাস, শান্তি, স্বস্তি এবং সামগ্রিক অবস্থায় সূক্ষ্ম রুচিবোধের কারুকার্য সৃষ্টির নিবৃত্তি হয় না। তারা এতেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে প্রান্তরীয় জীবনের স্থূলতা ও সারল্য থেকে দূরে সরে যায়। তারা সেই বীর্যবত্তার কথা ভুলে যায়, যা দিয়ে এক সময়ে সহায়তা ও প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছিল। এ পর্যায়ে তারা সম্ভব হলে অন্যদের সাহায্য-সহায়তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পাঠক, আপনার পঠিত গ্রন্থাদিতে যে সকল সাম্রাজ্যের বিবরণ বিদ্যমান, তার সাথে আমাদের বক্তব্য মিলিয়ে দেখুন। আশাকরি নিঃসন্দেহে এটা সত্য বলে অনুভব করবেন।

অনেক সাম্রাজ্যেই এরূপ ঘটে যে, বিলাসব্যাসন ও স্বস্তির ফলে তার মধ্যে যখন ক্ষয় দেখা দেয়, তখন সাম্রাজ্যের অধিপতি অন্যজাতির লোকদের মধ্য থেকে সাহায্যকারী ও অনুসারী গ্রহণ করেন। তারা স্বভাবতই কঠোর জীবনের অধিকারী হয়। তাদেরকে সৈন্য হিসাবে নিয়োগ করলে যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্য এবং বিপদ-আপদ ও অনাহারে অধিকতর স্থৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। এ ব্যবস্থা, আল্লাহ্‌র অন্যরূপ ইচ্ছা না হলে সাম্রাজ্যের উপর আপতিত ক্ষয়রোধের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ চিকিৎসার মতোই সুফল প্রসব করে। পূর্বাঞ্চলের তুর্কি সাম্রাজ্যে এটাই ঘটেছে। তাদের সৈন্যদলের অধিকাংশই তুর্কি আশ্রিত জনগোষ্ঠী। সুতরাং সম্রাটগণ ঐসকল ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য গ্রহণ করেছেন, যাদেরকে নানাভাবে তাঁদের নিকট আনা হয়েছে। ফলে এরা যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকতর ধৈর্য ও বিপদে-আপদে অধিকতর স্থৈর্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। এদের পূর্বে উক্ত কাজে নিয়োজিত সম্রাটদের বংশধরেরা, যারা প্রাচুর্য ও সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে এ গুণাবলি লোপ পেয়েছিল। আফ্রিকিয়ার আলমোহেদ সাম্রাজ্যের অবস্থাও অনুরূপ। সেখানেও সম্রাটগণ জানাতী ও আরব-বেদুইনদের মধ্য থেকে অধিকতর সৈন্য সংগ্রহ করে থাকেন এবং সাম্রাজ্যের অধিবাসীদিগকে তাদের বিলাসব্যসনের অভ্যাসের জন্য এ কার্যে নিয়োগ করা হতে বিরত থাকেন। এর ফলে সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্ষয়রোধক নতুন জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়। আল্লাহ্ পৃথিবী এবং তার উপরিস্থিত সমুদয় কিছুর উত্তরাধিকারী।

www.amarboi.org

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যও ব্যক্তির ন্যায় স্বাভাবিক জীবনকালের অধীন]

জেনে রাখুন, চিকিৎসাবিদ ও জ্যোতিষীদের ধারণা অনুসারে মানুষের স্বাভাবিক জীবনকাল একশ বিশ বছর। এ সময় পরিধি জ্যোতিষীদের নিকট বৃহৎ চান্দ্র বছর বলে পরিচিত। মানব বংশধারার প্রতি পুরুষেই যুগসন্ধিক্ষণের অনুপাতে জীবনকালের তারতম্য ঘটে থাকে। এর ফলে উপরোক্ত সময় থেকে অধিকও হয়, আবার কমও হয়ে থাকে। কোনো কোনো যুগসন্ধিক্ষণে জীবনযাপনকারীদের বয়ঃসীমা একশ বছর, কারো পঞ্চাশ কারো আশি অথবা সত্তর বছর হয়। যুগসন্ধিক্ষণের প্রমাণাদি বিচার করে যে কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি এ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এ জাতির বয়ঃসীমা ষাট থেকে সত্তর বছর, যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। স্বাভাবিক জীবনকাল একশ বিশ বছরের অধিক খুবই বিরল। বিশেষ ক্ষেত্রে নক্ষত্রবলয়ের বিশেষ প্রভাবের ফলেই এ প্রকার ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হয়, যেমন হজরত নূহের ব্যাপারে হয়েছিল এবং আদ ও সামুদ জাতির খুব কম লোকের মধ্যেই এ ব্যতিক্রম লক্ষ করা গিয়েছিল।

কোনো সাম্রাজ্যের জীবনকালও একই। যদিও তাতে যুগসন্ধিক্ষণের অনুপাতে তারতম্য ঘটে থাকে, তথাপি তা সাধারণভাবে তিন পুরুষের অধিক স্থায়ী হয় না। এক পুরুষের জীবনকাল যে কোনো ব্যক্তির মাঝারি বয়ঃসীমার অনুরূপ। তা তার দৈহিক বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতার শেষ সীমা চল্লিশ বছর। আল্লাহ্ বলেন, যতক্ষণ না সে যথার্থভাবে শক্তিমান হয়ে ওঠে এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছে।[১৮] এ জন্যই আমরা এক পুরুষের জীবনকাল এক ব্যক্তির বয়ঃসীমা বলে ধরেছি। এ ব্যাপারে তীহ্ প্রান্তরে বনি ইসরাইলের অবস্থান সম্পর্কে আমরা যে যৌক্তিকতা তুলে ধরেছি, তাতে কিছুটা সাহায্য পাওয়া যাবে। সেখানে চল্লিশ বছর অবস্থানের কারণ ছিল জীবিত একটি পুরুষের তিরোধন এবং তাদের স্থলে নতুন একটি পুরুষের আবির্ভাব, যারা হীনমন্যতা থেকে দূরে অবস্থিত ও তৎসম্পর্কে অনভিজ্ঞ। এর ফলেই আমাদের একব্যক্তির জীবনকাল হিসাবে একটি পুরুষের জীবনসীমা নির্ধারণ এর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয়েছে।

আমরা যে বলেছি কোনো সাম্রাজ্যের জীবনকাল তিন পুরুষের অধিক স্থায়ী হয় না, এর কারণ এ যে, প্রথম পুরুষ তাদের প্রান্তরীয় জীবনের স্থূলতা, বন্যতা, কঠোরতা, সাহসিকতা ও হিংস্রতার অভ্যাস পুরোপুরি ত্যাগ করতে সমর্থ হয় না এবং রাজ্যশক্তির গৌরবের মধ্যেও সকলের অংশীদারিত্বের পর্যায় তখনও কিছুটা অবশিষ্ট থাকে। এর

---

১৮. কোরান ৪৬, ১৫।

www.amarboi.org

ফলে তাদের গোত্রপ্রীতির তেজবীর্য অটুট থাকে এবং তাদের ধার তীক্ষ্ণ, তাদের ভার ভীতিপ্রদ ও মানুষ সহজে তাদের বাধ্য হয়ে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষে এ অবস্থা পরিবর্তিত হয়। সেখানে রাজ্যশক্তি ও আরাম-আয়েশ তাদেরকে প্রান্তরীয়তা থেকে নাগরিকতায়, কঠোরতা থেকে বিলাস ও প্রাচুর্যে এবং গৌরবের অংশীদারিত্ব থেকে একক মর্যাদার দিকে নিয়ে যায়। অন্যরা এ ব্যাপারে উদাসীন হয়ে ওঠে, ফলে তারা সম্মানের দীর্ঘতা থেকে হীনমন্যতার হ্রস্বতায় নেমে যেতে থাকে। এর ফলে তাদের গোত্রপ্রীতি কিছুটা হ্রাস পায় এবং তাদের মধ্যে হীনতা ও দীনতা প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। অবশ্য এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পূর্বাবস্থার অনেক কিছুই বাকি থাকে। কারণ তারা প্রথম পুরুষের নিকটবর্তী হওয়ায় তাদের গৌরব অর্জনের প্রচেষ্টা, তাদের কষ্ট স্বীকার, তাদের সহায়তা ও প্রতিরোধের অনেক কিছুই স্বচক্ষে দেখেছে। সুতরাং তাদের পক্ষে পূর্বাবস্থা সম্পূর্ণ ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। অবশ্য যা যাওয়ার, তা যায়ই। বরং তারা মনে মনে পূর্বপুরুষের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং অনেক সময় তারা সেই অবস্থায় আছে বলেও ধারণা করে। কিন্তু তৃতীয় পুরুষ, তারা সেই প্রান্তরীয় জীবনের স্থূলতা এমনভাবে ভুলে যায়, যেন তা কোনো কালে তাদের মধ্যে ছিল না। তারা গোত্রপ্রীতি ও আত্মমর্যাদার মধ্যে যে দাপটের ভাব বিদ্যমান, তার স্বাদ হারিয়ে ফেলে। প্রাচুর্য ও আরাম-আয়েশের মধ্যে অতিরিক্ত জড়িয়ে থাকার ফলে বিলাসব্যসন তাদের মধ্যে চরম সীমায় উপনীত হয়। তারা সাম্রাজ্যের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং নারী ও শিশুদের ন্যায় তার আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে। গোত্রপ্রীতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। তারা পরস্পর সহায়তা, প্রতিরোধ ও অধিকারের কথা আর স্মরণ করতে পারে না। তারা মানুষের মধ্যে রাজকীয় বৈভব, পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি ও অশ্বারোহণের ছদ্মবেশ ধারণ করে ঘুরে বেড়ায় মাত্র; অথচ যথার্থ অর্থে তাদের অধিকাংশই ভীরুতায় স্ত্রীলোকেরও অধম। যখন তাদের নিকট অধিকারের দাবি এসে উপস্থিত হয়, তা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয় না। এমনি অবস্থাতেই সাম্রাজ্যাধিপতিরা তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য নবাগতদের দ্বারস্থ হয়। তারা আশ্রিতের সন্ধান করে এবং এমন জনগোষ্ঠীকে কর্মে নিয়োজিত করে যারা অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে তার শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। এভাবেই একদিন আল্লাহ্‌র নির্দেশে তার অন্তিমকাল এসে উপস্থিত হয় এবং সাম্রাজ্য তার সমস্ত বোঝাসহ ডুবে যায়। পাঠক, এ হল সেই তিন পুরুষ, যাদের মধ্যদিয়ে সাম্রাজ্য জীবন নিঃশেষ হয়, আপনি অবশ্যই লক্ষ করেছেন।

উপরোক্ত কারণেই বংশমর্যাদাও চতুর্থ পুরুষে এসে শেষ হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, বংশগৌরব ও মর্যাদা চারপুরুষেই সীমাবদ্ধ থাকে। পাঠক, এ ব্যাপারে আমরা স্বাভাবিক, যথেষ্ট, সুস্পষ্ট এবং আমাদের পূর্ববর্তী প্রস্তাবনাসমূহের বর্ণনার প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থিত করেছি। আপনি যদি ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী হয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই সত্যকে স্বীকার ও তৎসম্পর্কে চিন্তা করবেন।

এটাই সেই তিন পুরুষ, যাদের বয়সের সমষ্টি একশ বিশ বছর, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সাম্রাজ্য এ বয়ঃসীমার সামান্য অগ্র-পশ্চাৎ ব্যতীত একে খুব একটা অতিক্রম করে না; যদি না তাতে অধিকার চেতনার অভাবজনিত অন্য কোনো প্রভাব এসে পতিত

www.amarboi.org

হয়। তখন তার ক্ষয় বাইরে হতে এসে তার উপর চড়ে বসে কেউ তাকে ডেকে আনে না। এমন কি যদি কেউ তা নিয়ে উপস্থিতও হয়, তা হলেও সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনো প্রতিরোধকারী খুঁজে পাবে না। যখন তাদের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসে, তখন এক ঘণ্টাও অগ্র-পশ্চাৎ করার শক্তি কারও থাকে না।[১৯]

এটাই ব্যক্তির বয়ঃসীমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাম্রাজ্যের জীবনকাল। এটা বৃদ্ধি পায়, স্থিতি লাভ করে এবং পুনরায় কমতে থাকে। এজন্য মানুষের মধ্যে এ একটি কথা অত্যন্ত সুপরিচিত যে, সাম্রাজ্যের বয়স এক শতাব্দী। এর একই অর্থ। পাঠক, একে বিবেচনা করুন এবং এটা থেকে একটি নিয়ম গড়ে তুলুন, যা দিয়ে আপনি যে কোনো বংশতালিকার ত্রুটি সংশোধন করতে পারেন। যদি কোনো বংশতালিকায় পুরুষের সংখ্যা নিয়ে আপনি সন্দেহে পতিত হয়ে থাকেন কিংবা তার মাধ্যমে অতীতের কোনো কাল পরিধিকে জানতে চান, তা হলে বংশের আরম্ভকাল থেকে প্রতি শতাব্দীর জন্য তিন পুরুষ হিসাবে গণনা করুন। যদি বর্তমানকাল পর্যন্ত এভাবে পুরুষের কাল বণ্টনে সমস্ত পুরুষ নিঃশেষ হয়ে যায়, তা হলে বুঝতে হবে তালিকাটি শুদ্ধ। আর যদি এক পুরুষ কম হয়, তা হলে বুঝতে হবে বংশ তালিকাটিতে ভুলে এক পুরুষ বাড়ান হয়েছে। অন্যদিকে যদি অনুরূপভাবে অধিক হয়, তা হলে এক পুরুষ পরে গেছে। এভাবে তাদের হিসাব থেকে আপনার পক্ষে বছরের হিসাবও বের করা সম্ভব হবে, যদি মোটামুটি তার পরিধি জানা থাকে। সুতরাং এভাবে বিবেচনা করে দেখুন, মনে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুদ্ধ ফল পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ দিবা-রাত্রির নির্ধারণ করে থাকেন।[২০]

---

১৯. কোরান।
২০. কোরান ৭৩, ২০।

www.amarboi.org

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের প্রান্তরীয় অভ্যাস থেকে নাগরিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া]

জেনে রাখুন, এ সকল পর্যায়ে যে-কোনো সাম্রাজ্যের জন্য স্বাভাবিক। যে প্রাধান্য বিস্তারের ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়, তা একমাত্র গোত্রপ্রীতির মাধ্যমেই সম্ভব। কেননা তার মধ্যেই তীব্র সংগ্রামী চেতনা ও অভ্যস্ত হিংস্রতার অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং তার জন্য সাধারণভাবে প্রান্তরীয় জীবনের প্রয়োজন। এজন্যই সাম্রাজ্যের প্রাথমিক অবস্থা প্রান্তরীয় জীবন সংলগ্ন। অতঃপর যখন রাজ্যশক্তি স্থাপিত হয়, তখন তাকে অনুসরণ করে শান্তি ও সচ্ছলতা এসে দেখা দেবে। বস্তুত নাগরিক সংস্কৃতি বলতে বিলাসব্যসনের বৈচিত্র্য সম্পাদনকেই বোঝায়। তাতে নানা প্রয়োজনে, পথ ও মতের আকর্ষণে রন্ধন, পরিচ্ছদ, গৃহ, শয্যা, নির্মাণকার্য এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য প্রথা ও অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিল্পকর্মের উন্নতি বিধান করা হয়। অন্যদিকে তাদের প্রতিটির মধ্যে নতুনত্ব সৃষ্টি ও সূক্ষ্মতা বিধানের জন্য এমন অনেক শিল্প বিদ্যমান, যা পর্যায়ক্রমে একের পর এক এসে উপস্থিত হয়ে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি, রুচি ও বিলাসব্যসনের সম্ভোগের ক্ষেত্রে বিভিন্নতার জন্য এগুলো ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং তৎসম্পর্কিত বিচিত্র অভ্যাসেরও জন্ম দেয়। এজন্যই সাম্রাজ্যে প্রান্তরীয় জীবনের সাথে সাথে নাগরিক সংস্কৃতির সূচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ রাজ্যশক্তির জন্য শান্তি ও স্বস্তির অবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

সাম্রাজ্যের অধিকারীরা এ নাগরিক সংস্কৃতির ব্যাপারে সর্বদা পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের অবস্থা-ব্যবস্থার অনুসরণ করে থাকে। তাদের অবস্থা এরই সাক্ষ্য প্রদান করে এবং এটা এ যে, পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে গ্রহণ করে। আরবীয়দের জন্য এটাই ঘটেছিল। তারা যখন জয়ের পর জয়ের মাধ্যমে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের অধিকারী হল এবং তাদের নারী-পুরুষকে নিজেদের অধীনস্থ করে নিল, তখনো তাদের মধ্যে নগর সংস্কৃতির কোনো বোধ জন্মায়নি। বর্ণিত হয় যে, তাদের সম্মুখে মিহি রুটি উপস্থিত করা হলে তারা তাকে ন্যাকড়া বলে ভেবেছিল এবং খসরুর রাজভাণ্ডারে কর্পূর পেয়ে তারা তাকে লবণ হিসাবে রুটির মধ্যে ব্যবহার করেছিল। এ প্রকার বহু উদাহরণ বিদ্যমান।

অতঃপর যখন তারা তাদের পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর অধিবাসীদিগকে নিজেদের দাসে পরিণত করল এবং তাদের ঘরদ্বারে তাদেরকে কর্মে নিয়োজিত করল, তখন তাদের মধ্য থেকে নগর সংস্কৃতিতে অভিজ্ঞরা তাদের কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যদিয়ে

www.amarboi.org

তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলল। সুতরাং তারা ঐ সকল অভ্যাসে, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্যাসে নিজেদের সচ্ছল অবস্থার সাথে মিলিয়ে বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করল। এক সময়ে তারাও এ সকল ব্যাপারে চরম সীমায় উপনীত হল। তারাও নগর সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বিলাসব্যসনের চূড়ান্ত অবস্থাকে আয়ত্ত করে নিয়েছিল। নতুন নতুন আহার্য, পানীয়, পরিধেয়, নির্মাণকার্য, অস্ত্রশস্ত্র, শয্যা, বাসনপত্র এবং গৃহস্থালীর অন্য যাবতীয় তৈজসপত্র সৃষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এমনিভাবে উৎসবের দিনে, বিবাহ মজলিসে ও বাসর রাত্রে তাদের বিলাসিতা আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্যে বিকশিত হয়ে উঠত। এ ব্যাপারে তারাও সীমা অতিক্রম করেছিল।

পাঠক, আলহাসান ইবনে সহলের কন্যা বুরানের সাথে সম্রাট আল মামুনের বিবাহ সম্পর্কে মাসউদী ও তাবারী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ যে বর্ণনা দান করেছেন, তৎপ্রতি লক্ষ করুন। মামুন যখন নৌকায় করে সভাসদসহ বুরানের পিত্রালয়ে 'ফামুসসুলহ' নামক স্থানে বিবাহের প্রস্তাব জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন আলহাসান তাদের জন্য কি পরিমাণ ব্যয় করেছিলেন। বুরানের বিবাহের সময়ইবা কত কি খরচ হয়েছিল এবং মামুনই বা তাকে কি দান করেছিলেন ও বাসররাত্রে কি দিয়েছিলেন। এ সব কিছু জানলে আপনি নিঃসন্দেহে বিস্মিত হবেন। তন্মধ্যে বিবাহের দিন আলহাসান ইবনে সহল মামুনের সভাসদদের জন্য একটি ভোজের ব্যবস্থা করেন। তাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে উদ্যান ও সম্পত্তির দানপত্রে মিশক আম্বরের টুকরা জড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের ভাগ্য অনুসারে যার হাতে যা পতিত হয়েছিল তারই তিনি মালিক হয়েছিলেন। আলহাসান দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে দিনারের তোড়া বিতরণ করেছিলেন। তার প্রত্যেকটিতে দশ হাজার করে দিনার ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অনুরূপ দিরহামের তোড়া বিলিয়ে দেন। তদুপরি মামুন তাঁর গৃহে অবস্থানকাল পর্যন্ত তিনি এটা অপেক্ষাও বহুগুণ বেশি ব্যয় করেছিলেন।

ঐ বর্ণনায় আছে যে, মামুন বুরানকে বিবাহের যৌতুক হিসাবে বাসর রাত্রে একহাজার পদ্মরাগ মণি দিয়েছিলেন এবং আম্বারের যে মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে বাসর আলোকিত করেছিলেন, তাদের প্রতিটির ওজন ছিল একশ মণ। একমণ এক সমস্ত তিনভাগের দুই রিতলের[২১] সমান। তাকে এমন একটি শয্যা দিয়েছিলেন, যার আচ্ছাদনে স্বর্ণসূত্রের বুনট এবং মোতি ও চুনির কারুকার্য ছিল। মামুন তা দেখে বলেছিলেন, আল্লাহ্ আবু নাওয়াসকে ধ্বংস করুন। সে কি এ শয্যা দেখেই মদের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছিল!

তার ক্ষুদ্র বৃহৎ বুদ্বুদগুলো যেন, সোনার জমিনে ছড়ানো মুক্তমালা।

মামুন বিবাহ রাত্রির ভোজের জন্য যে পরিমাণ লাকড়ি রন্ধনশালায় সংগ্রহ করেছিলেন, তা মোট একশ চল্লিশটি খচ্চর পূর্ণ একটি বছর ধরে দিনে তিন বার বহন করে এনেছিল। এ সমুদয় লাকড়ি দুই রাত্রিতে শেষ হয়ে যায়। শেষে খেজুর শাখায় তেল ঢেলে রন্ধন করতে হয়েছিল। বাগদাদ থেকে বিশেষ অতিথিদিগকে যাতে দজলা

২১. একরিতল আধা সেরের সমান।

www.amarboi.org

নদী পার করে আলমামুন নগরে সম্রাটের প্রাসাদে ভোজসভায় পৌঁছান যায়, তজ্জন্য মাঝিমাল্লাদিগকে নৌকা প্রস্তুত রাখতে আদেশ দেয়া হয়েছিল। এর ফলে নৌকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ত্রিশ হাজার। এ সকল নৌকা সারাদিন ধরে লোক পারাপার করেছিল। এরূপ আরও বহু কাহিনী বিদ্যমান। তলিতেলার (টলেডো) আলমামুন ইবনে সিনুনের কাহিনীও অনুরূপ। ইবনে বাসসাম[২২] তাঁর 'আলযখিরা' নামক গ্রন্থে এবং ইবনে হেব্বান উক্ত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অথচ এরা সকলেই প্রান্তরীয় জীবনের প্রথম পর্যায়ে এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অপারগ ছিল। কারণ তাদের জীবন যাপনের বিশেষ কৃচ্ছ্রতা ও সারল্যের অবস্থায় এ সকল উপকরণ এবং তৎসম্পর্কীয় শিল্পকর্মের কোনো অবকাশ ছিল না।

বর্ণিত আছে যে, হাজ্জাজ তাঁর কোনো সন্তানের খাৎনা করানোর সময় একটি ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে কিছু গ্রাম্য সর্দার উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তাদেরকে পারস্যবাসীদের ভোজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, পারস্যের একটি বিরাট ভোজে উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। তখন সেই গ্রাম্য সর্দারদের একজন বলল, হ্যাঁ, হে সর্দার! আমি খসরুর প্রাদেশিক শাসকদের কোনো কোনো ভোজে উপস্থিত হয়েছি। তারা পারস্যবাসীদের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করে সেখানে রৌপ্যনির্মিত দস্তরখানে স্বর্ণের বাসনে খাদ্য পরিবেশন করত। তাদের প্রত্যেকটিতে চারটি করে বাসন থাকত এবং চারজন পরিচারিকা তা বহন করে আনত। তাতে চারজন করে মেহমান অংশগ্রহণ করতেন এবং আহারের শেষে প্রত্যেকেই নিজ ব্যবহৃত বাসন ও পরিচারিকাসহ বিদায় হতেন। এটা শুনে হাজ্জাজ বললেন, হে বান্দা! গুটিকয় উট জবেহ করে ফেল এবং লোকজনকে খাওয়াও। এতে এ কথাই জানা গেল যে, তার পক্ষে অনুরূপ বিলাসিতা সম্ভব নয় এবং অবস্থা তাই ছিল।

এ প্রসঙ্গে বনি উমাইয়াদের দান ধ্যানাদির কথা উল্লেখ করা যায়। তারা আরবের ও প্রান্তরীয় জীবনের প্রথা অনুসরণ করে উটই ব্যবহার করতেন। অতঃপর বনি আব্বাস ও উবাইদী সম্রাটদের সময়, যেমন পাঠক জানতে পেরেছেন, প্রচুর ধনসম্পদ, পোশাকাদি এবং জিনিপোষসহ অশ্বাদি দান করা হত। আফ্রিকিয়ায় আগলাবীদের সাথে কুমাতাদেরও অনুরূপ অবস্থা ছিল। মিশরের বনি তুগাজের, আন্দালুসে ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সাথে লামতুনাদের ও আলমোহেদদের এবং অনুরূপভাবে আলমোহেদদের সাথে জানাতীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। একই অবস্থায় আরও অনেকের।

বস্তুত এভাবেই নগর সংস্কৃতি পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলো থেকে পরবর্তীগুলোতে সংক্রমিত হয়ে থাকে। পারস্যের সংস্কৃতি আরবীয় বনি উমাইয়া ও বনি আব্বাসের মধ্যে এবং আন্দালুসের বনি উমাইয়াদের সংস্কৃতি এ যুগে মাগরিবের আলমোহেদ ও জানাতীদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। বনি আব্বাসের সংস্কৃতি দায়লামীদের মধ্যে, তুর্কিদের মধ্যে, সলজুকীদের মধ্যে, মিশরের তুর্কি মামলুকদের মধ্যে এবং দুই ইরাকের তাতারীদের মধ্যে অনুসৃত হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের আয়তন অনুসারেই এ

---

২২. আলী ইবনে বাস্সাম, মৃত্যুকাল ৫৪২ (১১৪৭/৪৮ খ্রি.) হি.।

www.amarboi.org

সাংস্কৃতিক উপাদানের বিকাশ সাধিত হয়ে থাকে। কারণ নগর সংস্কৃতি বিলাসব্যসনকে অনুসরণ করেই গড়ে ওঠে এবং বিলাসিতার জন্য সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রয়োজন। সম্পদ ও প্রাচুর্য রাজ্য ছাড়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সম্রাটদের আধিপত্যের পরিধিই বৈশিষ্ট্যের নিয়ামক। কারণ এর অনুপাতেই সবকিছু ঘটে থাকে। পাঠক, এটা বিবেচনা করুন; চিন্তা করে দেখুন, সভ্যতায় এর উদাহরণ সত্য বলেই পাবেন। আল্লাহ্ পৃথিবী এবং তার সমুদয় কিছুর উত্তরাধিকারী এবং তিনিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।

www.amarboi.org

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের প্রথমদিকে বিলাসব্যসন তাতে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করে থাকে]

এর কারণ এ যে, যে কোনো গোত্রের জন্য যখন রাজ্যশক্তি ও বিলাসব্যসনের উপকরণ হস্তগত হয়, তখন তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক, সন্তানাদি ও সাধারণ অবস্থা বেড়ে যায়। এর ফলে গোত্রশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত অনুসারীদের সংখ্যাও বহুগুণিত হয়। তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন গোত্র শান্তি ও বিলাসের পরিবেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তাদের শক্তিতে নতুন শক্তির সঞ্চার করে। কেননা এ সময়ে গোত্রশক্তির অন্তর্গত জনসংখ্যার অনুপাতেই শক্তির পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। অতঃপর যখন প্রথম পুরুষ ও দ্বিতীয় পুরুষ অতিবাহিত হয় এবং অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যের শক্তিতে ক্ষয় দেখা দেয়, তখন এ সকল আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা কিছুতেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ ও সংস্থাপনের দিকটি রক্ষা করতে পারে না। কারণ এ ব্যাপারে তাদের কোনো হাত নেই। তারা একমাত্র সেই ভিত্তির উপর নির্ভরশীল সাহায্যকারী হিসাবেই এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। সুতরাং ভিত্তিই যখন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে, তখন তার শাখা-প্রশাখায় সেই দুর্বলতা সংক্রমিত হয় এবং ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। সাম্রাজ্যের পূর্বশক্তি অটুট থাকে না।

পাঠক, আরবের ইসলামী সম্রাজ্যের ঘটনাবলির সাথে এ বক্তব্য বিবেচনা করুন। নবুয়ত ও খেলাফতের সময়, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, মুজার ও কাইতানের সম্মিলিত আরবের জনসংখ্যা ছিল একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার বা তার প্রায় নিকটবর্তী। অতঃপর যখন তাদের সাম্রাজ্যে বিলাসব্যসন চরম সীমায় পৌঁছল, তখন জনসংখ্যার বৃদ্ধিও তার অনুপাতেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এর সঙ্গে সম্রাটগণ আশ্রিত, পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন। ফলে এ সংখ্যা আরো বহুগুণিত হয়ে দেখা দিল। বলা হয়, সম্রাট আলমুতাসিম আমুরিয়া বিজয় করে সেখানে প্রবেশকালে তাঁর সাথে জনসংখ্যা ছিল নয় লক্ষ। তাঁদের সাম্রাজ্যের নিকট ও দূরের সীমান্তে অবস্থানরত, রাজধানী রক্ষার কাজে ব্যাপৃত এবং আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর হিসাব ধরলে এ সংখ্যা অসম্ভব বলে মনে হয় না। মাসউদী বলেন, সম্রাট মামুনের সময় মতামতের ঐক্যের প্রয়োজনে বনি আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরদের সংখ্যা গণনা করা হয়েছিল। তারা নারী-পুরুষ মিলিয়ে ত্রিশ হাজার হয়েছিল। পাঠক, লক্ষ করুন, দুইশ বছরের কম সময়ে তারা এ সংখ্যায় পৌঁছেছিল এবং জেনে রাখুন, এর কারণ সাম্রাজ্য লাভের ফলে তাদের মধ্যে যে প্রাচুর্য ও আরাম আয়েশ দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে পুরুষ পরম্পরায় লালিত হয়ে এরূপ বেড়ে উঠেছিল। তা না হলে বিজয়াদির প্রথম দিকে আরবীয়দের সংখ্যা এরূপ ত নয়ই, এমনকি এর ধারে-কাছেও ছিল না। আল্লাহ্ই সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা।[২৩]

---

২৩. কোরান ৯৫, ৮৬; ৩৬, ৮১।

www.amarboi.org

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের বিভিন্ন পর্যায় ও তার অবস্থাসমূহের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন পর্যায়ে অধিবাসীদের চরিত্রগত পরিবর্তন]

জেনে রাখুন, যে কোন সাম্রাজ্য বিভিন্ন পর্যায় ও নব নব অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবনকাল অতিক্রম করে। তার অধিবাসীরা প্রত্যেক পর্যায়ে সেই পর্যায়ের অবস্থা অনুসারে বিশেষ চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে এবং অন্য কোনো পর্যায়ের সাথে এর কোনো মিল থাকে না। কারণ চরিত্র সর্বদাই অবস্থা বিশেষের মেজাজ অনুসারে নিজের স্বভাব গড়ে তোলে। সাধারণভাবে যে কোনো সাম্রাজ্যের পর্যায় ও অবস্থাসমূহ পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায়, বিদ্রোহের দ্বারা বিজয়। সমস্ত প্রতিরোধ-প্রতিবন্ধকের উপর প্রভাব বিস্তার করে রাজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন এবং পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের সমুদয় কিছুর অধিকার নিজেদের কুক্ষিগত করা। এ পর্যায়ে রাজ্যাধিপতি তাঁর গোত্রের আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত হন। কেননা তাঁরাই নেতৃত্বে তাদের জন্য গৌরব, ধনভাণ্ডার, প্রতিরোধ ও সহায়তার একটি বিশেষ অবস্থা লাভ হয়েছে। এ পর্যায়ে গোত্রপ্রীতির অমোঘ আকর্ষণে সকলেই এ বোধের অংশীদার হয়। সম্রাটও এর অন্যথা করেন না। কারণ এ গোত্রপ্রীতির সাহায্যেই বিজয় সম্ভব হয়েছে। এ পর্যায়ে গোত্রপ্রীতির জমজমাট অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্রাট স্বগোত্রীয়দের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এককভাবে সাম্রাজ্য গৌরবের অধিকারী হতে চান এবং অন্যদেরকে তার সমভাগিত্ব ও অংশীদারিত্ব থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। এ পর্যায়ে সম্রাট আশ্রিতপোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সহায়তা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন এবং তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে স্বগোত্রীয়দের প্রাধান্য বিস্তারের পথ, বংশ গৌরবের অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা ও রাজ্যশক্তিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা রুদ্ধ করেন। তিনি তাদেরকে বৈষয়িক ব্যাপারে বাধা দেন, সুযোগ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত করেন এবং তাদেরকে তাঁর প্রতি আনুগত্যের বিষয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হন। ফলে সাম্রাজ্যের সকল গৌরব তাঁর পরিবারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাঁকেই এ গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়। এর ফল এ দাঁড়ায় যে, সম্রাট স্বগোত্রীয়দের প্রতিরোধ করতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালীন শক্তি অপেক্ষাও অধিক শক্তি ব্যয় করে থাকেন। কারণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে তাঁর পূর্বসূরিরা একত্র হয়ে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তখন সমস্ত গোত্রের সহায়তা তাদের পশ্চাতে ছিল। আর

www.amarboi.org

ইনি স্বীয় গোত্র ও নিকট আত্মীয়দেরকেই প্রতিরোধ করেন এবং তাঁর পশ্চাতে দূরাগত কিছু সংখ্যক লোক সহায়ক হিসাবে দাঁড়ায়। সুতরাং এ ব্যাপারটি অতিশয় কঠিন হয়ে দেখা দেয়।

তৃতীয় পর্যায় শান্তি ও সচ্ছলতার যুগ। কারণ সাম্রাজ্যের ফসল তখন উঠতে আরম্ভ করেছে এবং মানব-প্রকৃতির অমোঘ বিধানে সম্পদ সংগ্রহ ও তার নিদর্শন স্থাপনের কাল আরম্ভ হয়েছে। রাজ্যশক্তির কথা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, ধনভাণ্ডারে প্রশস্ততা দেখা দিয়েছে, আয়-ব্যয়ের যথার্থতা সংরক্ষিত হচ্ছে এবং ব্যয়ের পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখনই বৃহৎ দরবারকক্ষ, বিরাট অট্টালিকা, প্রশস্ত নগরী ও বিপুলায়তন স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সময়। এ সময়ে বিভিন্ন জাতি থেকে আগত সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দকে উপঢৌকন এবং গোত্রপতিদেরকে দান ধ্যান করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সৎ ব্যক্তিদেরকে উৎসাহ দান, কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি ও সভাসদদেরকে ধন-সম্পদ ও সম্মান-সৌভাগ্যের অধিকারী করা এবং সৈন্যদলকে যথানিয়মে দেখাশোনা ও তাদের রুজি বৃদ্ধি করার দরকার হয়। এভাবে তাদের সকলের প্রতি মাসে যথানিয়মে বেতনাদি প্রদান করায় উক্ত সম্পদের নিদর্শন তাদের আচার-আচরণ ও পোশাকাদিতে ফুটে ওঠে। বিশেষ করে উৎসবের দিনে তাদের এ প্রদর্শনী শান্তিপ্রিয় অন্যান্য সাম্রাজ্যের মনে হিংসার উদ্রেক এবং যুদ্ধপ্রিয় সাম্রাজ্যের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। অবশ্য সম্রাটের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার এটাই শেষ পর্যায়। কারণ এ পর্যায়ের সমস্তকাল জুড়েই সম্রাটগণ নিরঙ্কুশ মতামত প্রকাশ, গৌরব বৃদ্ধি ও পরবর্তীদের জন্য আদর্শ স্থাপনের সুযোগ লাভ করে থাকেন।

চতুর্থ পর্যায় সন্তুষ্টি ও স্বস্তির কাল। কারণ এ পর্যায়ে সম্রাট তাঁর পূর্বসূরিরা তাঁর জন্য যে গৌরবের অবদান রেখে গেছেন, তৎপ্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ এবং তাঁর প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের সমীহভাবের ফলে একটা স্বস্তির মনোভাব পোষণ করেন। এর ফলেই এ পর্যায়ে পূর্বসূরিদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন কাজে সম্রাট যথাযথভাবে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকেন। এরূপ করতে গিয়ে তাঁদের প্রদর্শিত পথকে সৎপথ এবং তার অন্যথাকে সাম্রাজ্যের হানিকর বলে ধারণা করেন। কারণ, সম্রাট ভাবেন, যারা এ গৌরবের প্রতিষ্ঠা করেছেন; তাঁরা অবশ্যই তার শুভাশুভ বিবেচনা করেছেন।

পঞ্চম পর্যায় অপচয় ও অপব্যয়ের কাল। এ পর্যায়ে সম্রাট তাঁর পূর্বসূরিদের সঞ্চিত সম্পদ প্রবৃত্তির তাড়নায়, আপাত মধুর প্রলোভনে, অনুগত ও সভাসদদের মধ্যে দান-ধ্যানে এবং উচ্ছৃঙ্খল ও অসৎচরিত্র বন্ধু-বান্ধবের আকর্ষণে অমিতব্যয়ের অনুসারী হয়ে ওঠেন। এ পর্যায়ে সম্রাটগণ এমন বিরাট বিরাট কাজে হাত দেন, যার ব্যয় বহন করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এরূপ কাজে তাঁদের কি লাভ বা ক্ষতি হবে, সেই বোধও তাঁরা হারিয়ে ফেলেন। এর ফলে তাঁদের সহায়ক বয়োবৃদ্ধরা বিরক্ত হন ও নিষ্ঠাবান কর্মীরা ত্যাক্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা সম্রাটগণকে ঘৃণা করতে থাকেন এবং তাদের সহায়তা করতে তাঁরা লজ্জাবোধ করেন। এর ফলে সৈন্যদলের নিয়মিত বেতন প্রদান না করার ফলে তাদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দেয়। কারণ সম্রাট নিজ খেয়ালখুশি চরিতার্থ করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, তদ্দরুন প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকোচ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং

www.amarboi.org

কর্মী ও সৈন্যদলের নিকট মুখ রক্ষা করার মত অবস্থা আর থাকে না। এমনভাবে সম্রাট তাদের সাহচর্য হারান এবং পূর্বসূরিরা যে ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন, তা ধ্বংস করতে থাকেন ও সমগ্র সৌধই ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ পর্যায়েই সাম্রাজ্যের ক্ষয় দেখা দেয় এবং তাতে সেই প্রাচীন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, যা থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই। কারণ তা ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকে এবং এক সময়ে সমূলে ধ্বংস ডেকে আনে। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এর সাথে সংশ্লিষ্ট অবস্থাদি বর্ণনার সময় এ সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহ্ই উত্তম উত্তরাধিকারী।[২৪]

---

২৪. কোরান, ২১, ৮৯।

www.amarboi.org

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[প্রতিটি সাম্রাজ্যের মৌল শক্তির অনুপাতেই স্মৃতি নিদর্শন স্থাপিত হয়ে থাকে]

এর কারণ এ যে, স্মৃতি নিদর্শন শক্তির অনুপাতেই হয় এবং যে শক্তির দ্বারা সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল, তাই এ অনুপাতের নিয়ামক। এ থেকেই সাম্রাজ্যের বিরাট অট্টালিকা এবং বিপুলায়তন সৌধাদি নির্মিত হয়ে থাকে এবং তার আকৃতিই সাম্রাজ্যের মৌল শক্তির পরিচয় বহন করে। কারণ এ প্রকার নির্মাণ কাজে অধিক সংখ্যক কর্মী অত্যোধিক সহায়তা ও সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং সাম্রাজ্য যদি সুবিস্তৃত হয়, বহু দেশ ও অঞ্চল থাকে, তা হলে তাতে কর্মীর সংখ্যাও অধিক হয়ে থাকে। তারা চতুর্দিক থেকে এসে সমবেত হয় এবং একযোগে বৃহৎ নির্মাণাদির কাজ সুসম্পন্ন করে তালে।

পাঠক, আপনি কি আদ ও সামুদ জাতির নির্মাণ কাজ দেখতে পান না? কোরান তাদের কথা বর্ণনা করেছে। খসরুর দরবার গৃহের প্রতি লক্ষ করুন, পারস্যবাসীরা তার মধ্যে কী দর্শনীয়ভাবেই না তাদের শক্তির পরিচয় রেখে গেছে! এমনকি সম্রাট হারুনুর রশীদ তা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি তা নিশ্চিহ্ন করার কাজ আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু দুর্বলতা এসে তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া ইবনে খালিদের সাথে তাঁর পরামর্শের কাহিনী সকলেরই জানা আছে। কীভাবে একজাতি যা নির্মাণ করেছিল, অন্যজাতির পক্ষে তা ভেঙে ফেলাও সম্ভব হল না। অথচ নির্মাণ করা থেকে ধ্বংস করা যে সহজতর, তা অবধারিত সত্য এবং এ থেকেই দুটি সাম্রাজ্যের পার্থক্যও দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। পাঠক, দামেশকে অবস্থিত ওলিদের প্রাসাদ; কর্ডোভায় অবস্থিত বনি উমাইয়াদের জামে মসজিদ ও তার নদীর উপরিস্থিত সেতু; এরূপ কার্থেজে জল সরবরাহের জন্য নির্মিত স্তম্ভাদিসহ পয়ঃপ্রণালী; মাগরিবের 'শেরশাল' (চার্চিল) স্মৃতিচিহ্নসমূহ এবং মিশরের পিরামিডের প্রতি লক্ষ করুন। এরূপ আরো বহু নিদর্শন বিদ্যমান, যা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে থাকে। আপনি তা থেকে যে-কোনো সাম্রাজ্যের শক্তি ও দুর্বলতার পরিচয় লাভ করতে পারবেন।

জেনে রাখুন, প্রাচীনকালের এ সকল কীর্তি একমাত্র স্থাপত্যকৌশল, কর্মীর সম্মিলন ও অত্যধিক শ্রমের বিনিময়েই সম্ভব হয়েছে। এভাবেই তারা এ সকল বিরাট সৌধ ও অট্টালিকা গড়ে তুলেছেন। আপনি কখনই অনুরূপ ধারণা পোষণ করবেন না, যেমন সাধারণ মানুষ পোষণ করে থাকে যে, তাঁদের দেহের আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বিরাট হওয়ার জন্যই তাঁরা এ সকল কর্ম সম্পাদন করতে পেরেছেন। অট্টালিকা ও সৌধাদির স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে যে ধরনের পার্থক্য দেখা যায়, মানুষের দৈহিক আকৃতিতে অনুরূপ

www.amarboi.org

কোনো বিরাট পার্থক্য নেই। একমাত্র গল্পকাররাই এ ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহ দেখিয়ে অতিরঞ্জনের প্রয়াস পেয়েছে। তারা আদ, সামুদ ও আমালেকীদের সম্পর্কে এ ব্যাপারে জঘন্য মিথ্যার বর্ণনাদান করেছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত হল উজ ইবনে উনাকের বর্ণনা। এ ব্যক্তি আমালেকীদেরই একজন, যাদেরকে বনি ইসরাইলরা সিরিয়াতে হত্যা করেছিলেন। তাদের ধারণা, এ উজ এত দীর্ঘ ছিল যে, সে সমুদ্র থেকে মাছ ধরে সূর্যের দিকে তা বাড়িয়ে ধরে তার তাপ থেকে ভেজে নিত। এতে তারা মানুষের অবস্থা সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মূর্খতা বিদ্যমান, তাকেই গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থা সম্পর্কে তাদের মূর্খতার সাথে মিলিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে মাত্র। তাদের ধারণা, সূর্যের উত্তাপ আছে এবং তার যত নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই উত্তাপ বাড়ে। তারা জানে না যে, সূর্যের উত্তাপ হল তার কিরণ এবং এ কিরণ পৃথিবীর উপর পতিত হয়ে প্রতিবিম্বিত হওয়ার ফলেই উত্তাপ দেয়। কিন্তু শুধু কিরণ এরূপ নয়। বরং যতই পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়, ততই প্রতিবিম্বনের জন্য উত্তাপ বহুগুণিত হয়ে ওঠে। যখন এ কিরণমালা প্রতিবিম্বহীন অবস্থায় বিকিরিত হয়, তখন সেখানে কোনো উত্তাপ থাকে না; বরং শৈত্য দেখা দেয়। এ জন্য সেখানে মেঘমালা ঘুরে বেড়াতে পারে। বস্তুত সূর্য নিজে উত্তপ্তও নয়, শীতলও নয়; বরং অমিশ্র জ্যোতির্ময় বস্তুপুঞ্জ মাত্র, যাতে কোনো মিশ্রণের প্রভাব নেই।

অনুরূপভাবে উজ ইবনে উনাক সম্পর্কে তারা যে বর্ণনা দিয়েছে যে, সে আমালেকী অথবা কেনানীদের অন্তর্গত ছিল, যারা বনি ইসরাইলের শিকারে পরিণত হয়। অথচ বনি ইসরাইলের দীর্ঘতম ব্যক্তি ও তাদের দৈহিক গঠন সেকালে আমাদেরই অনুরূপ ছিল। এ ব্যাপারে বয়তুল মুকাদ্দসের প্রবেশদ্বারগুলোই সাক্ষ্য দেয়। এগুলো যদিও বহুবার নষ্ট হয়েছে এবং পুনরায় নির্মাণ করা হয়েছে, তথাপি তা তাদের পূর্ব গঠন ও পরিমাপ অনুযায়ীই করা হয়েছে। সুতরাং উজ ও তার সমসাময়িক লোকদের মধ্যে এতদূর বিরাট পার্থক্য কি করে সৃষ্টি হতে পারে! এ ব্যাপারে তাদের ভুল হবার একমাত্র কারণ, তারা প্রাচীনকালের কর্মটিকেই বিরাট বলে ভেবেছে, কিন্তু তা সম্পন্ন করতে সাম্রাজ্য শক্তির যে সম্মিলন ও সহায়তা ক্রিয়াশীল ছিল, তৎসম্পর্কে মোটেও চিন্তা করেনি। তদুপরি তাতে যে স্থাপত্য কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে, যার ফলে এমন বিরাট কর্ম সুগঠিতভাবে শেষ হয়েছে, তাও ভাবেনি। সুতরাং তারা সবকিছু দৈহিক বিরাটত্ব ও তার শক্তির প্রাচুর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। অথচ প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত।

মাসউদীও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে দার্শনিকদের মত উল্লেখ করেছেন। তাতে শুধু একটা ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে, যার কোনো ভিত্তি নেই; বরং তা একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত মাত্র। তা এ যে, যে সকল স্বাভাবিক উপাদান দৈহিক গঠনে ক্রিয়াশীল, যখন আল্লাহ্ সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করেছিলেন, তখন তারা পূর্ণস্থিতি ও শক্তিতে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই তৎকালীন জীবনকাল দীর্ঘতম এবং দেহাদি এ স্বভাবের কারণেই অত্যন্ত সুগঠিত ছিল। কারণ মৃত্যু হল এ সকল স্বাভাবিক শক্তির শৈথিল্যের প্রতিক্রিয়া। সুতরাং এ সকল উপাদান যদি শক্তিশালী হয়, তা হলে জীবনকালও দীর্ঘ হবে। কাজেই পৃথিবী তার প্রথম সৃষ্টিকালে পূর্ণজীবন ও পরিপূর্ণ দেহের অধিকারী ছিল। অতঃপর এ সকল

www.amarboi.org

উপাদানের শক্তি হ্রাসের ফলে ক্রমাগত কমে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে একদিন তা পৃথিবীর সাথে বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

এটা এমন একটি মত, পাঠক, নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, যার কোনো কারণ নেই; বরং তা একটি সাধারণ ধারণা মাত্র। এর কোনো স্বাভাবিক কার্যকারণ নেই, কোনো প্রামাণ্য হেতু নেই। আমরা প্রাচীন জনসমাজের নির্মিত অট্টালিকা, সৌধ, বসতি ও আবাসস্থলে তাদের বসবাসের স্থান, দ্বার ও পথ দেখতে পাই; যেমন পর্বতের নিরেট পাথর কেটে তৈরি সামুদ জাতির আবাসস্থল, তার গৃহগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং প্রবেশদ্বার সংকীর্ণ। হজরত মুহম্মদ (সঃ) এগুলোকেই তাদের আবাসস্থল বলে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি তার পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং ঐ পানির দ্বারা যে আটা গোলা হয়েছিল, তা ফেলে দিতে বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, যারা স্বীয় আত্মার প্রতি অবিচার করেছে, তোমরা তাদের ঘরের দ্বারে প্রবেশ করো না।[২৫] অবশ্য অশ্রুপাত করতে করতে যেতে পার, যেন তাদের উপরে আপতিত বিপদ তোমাদের উপরে না আসে। এরূপ আদ, মিশর, সিরিয়া এবং পূর্ব-পশ্চিমে সমগ্র পৃথিবীর অবস্থা। সত্য তাই, যা আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি।

সাম্রাজ্যের নিদর্শনাবলির মধ্যে বিবাহ ও উৎসবাদিতে তাদের ব্যয়ও ধরা যায়। যেমন আমরা বোরানের বিবাহ ভোজ, হাজ্জাজের উৎসব ও ইবনে যুন্নুনের কথা বলেছি। এ সকলের বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে।

এ নিদর্শনাবলির মধ্যে দান-ধ্যানাদিও বর্তমান এবং তা সাম্রাজ্যের শক্তির অনুপাতেই হয়ে থাকে। তাতে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিলেও এ ব্যাপারে তাদের শক্তির চিহ্ন প্রকাশ পায়। কারণ সম্রাটদের ইচ্ছাগুলো তাদের সাম্রাজ্য শক্তি ও মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তারের অনুপাতেই হয়ে থাকে এবং এ বাসনা-কামনা সাম্রাজ্যের অন্তিমকাল পর্যন্ত তাদের সঙ্গী হয়। পাঠক, এ ব্যাপারে কোরায়েশ প্রতিনিধিদলের প্রতি প্রদত্ত ইবনে যি ইয়ামেনের উপঢৌকনাদির কথা বিবেচনা করতে পারেন। কেমন করে তিনি তাদের প্রত্যেককে দশ রিতল স্বর্ণ, রৌপ্য এবং দশটি করে দাস ও দাসী দান করেছিলেন। তদুপরি প্রত্যেককে একপাত্র করে মিশকে আম্বর দেন। আব্দুল মুত্তালিবকে এর দশগুণ অতিরিক্ত প্রতিটি বস্তুই দান করেছিলেন। অথচ তাঁর রাজ্যটি তখন শুধু ইয়ামেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। এ কাজে তাঁর নিজের সাহসই তাঁকে পথ দেখিয়েছে। কারণ তাঁর জাতি তুব্বাদের একসময়ে পৃথিবীর উপর আধিপত্য এবং দুই ইরাক, হিন্দ ও মাগরিবের বিভিন্ন জাতির উপর প্রভুত্ব ছিল। আফ্রিকিয়াতে সিনহাজাদের অবস্থাও এরূপ তারাও তাদের নিকট আগত জানাতী সর্দারদের প্রতিনিধিদলকে বোঝা বোঝা ধনসম্পদ, পেটরাভর্তি পোশাকাদি ও উত্তম জাতের অনেকগুলো ঘোড়া দান করেছিলেন। ইবনে রফীকের ইতিহাসে এ সম্পর্কে বহু ঘটনা বিদ্যমান। এরূপ বারমেকীদের দানধ্যান ও ব্যয়াদি সম্পর্কে বলা যায়। তারা যখন কোনো নিঃস্বকে দান করতেন, তার অর্থ একদিনে বা অর্ধদিনে ব্যয় হয়ে যায় এরূপ সম্পদ নয়; বরং তাদেরকে এমন সম্পদ ও প্রাচুর্য দান করতেন, যা জীবনের শেষ পর্যন্ত

---

২৫. বোখারী (২য়) দ্র:।

www.amarboi.org

থাকত। এ ব্যাপারে তাঁদের বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং সাম্রাজ্যের শক্তি অনুপাতেই তা সংঘটিত হয়েছে। এ ব্যাপারে, জওহর আস্‌সকলী আলকাতেব উবাইদী সৈন্যদলের সেনাপতি যখন মিশর বিজয়ে বহির্গত হলেন, তখন কায়রোয়ান থেকে হাজার বোঝা ধনসম্পদ নিয়ে এসেছিলেন, যা অদ্যাবধিও নিঃশেষ হয়নি।

সম্রাট মামুনের সময় বাগদাদের রাজকোষে আগত সম্পদের পরিমাণ।[২৬]

---

২৬. এ পরিমাণ বর্ণনায় রোজেনথালের অনুবাদে কিছুটা ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আমরা পাঠকরা কৌতূহল নিবারণার্থে তার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। প্রকাশ থাকে যে, আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল পাঠের অনুসরণ করেছি বলেই, অনুবাদে কিঞ্চিৎ আড়ষ্টতা ও দ্বিরুক্তি দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এই আড়ষ্টতা সহজেই অতিক্রম করা সম্ভব। 'দুইবার' ও 'একবার' শব্দ দুইটি মূলের 'আলফ' (সহস্র) শব্দটির অবস্থান অথবা কিস্তিও বোঝাতে পারে। কারণ অনেক স্থলে এগুলো অনুপস্থিত।

'সওয়াদ' (দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া)	শস্য : ২৭,৭৮০,০০০ দিরহাম।
	অন্যান্য রাজস্ব : ১৪,৮০০,০০০ দিরহাম।
	নাজরানী জোব্বা : ২০০।
	মোহরাঙ্কনের মাটি : ২৪০ পাউন্ড।
'কসকর'	১১,৬০০,০০০ দিরহাম।
'দজলা অঞ্চল'	২০,৮০০,০০০ দিরহাম।
'হলুয়ান'	৪,৮০০,০০০ দিরহাম।
'আল আহওয়াজ'	২৫,০০০ দিরহাম।
	চিনি : ৩০,০০০ পাউন্ড।
'ফারুস'	২০,০০০,০০০ দিরহাম।
	গোলাপ জল : ৩০,০০০ বোতল।
	কাল মুনাক্কা : ২০,০০০ পাউন্ড।
'কিরমান'	৪,২০০,০০০ দিরহাম।
	ইয়ামেনী কাপড় : ৫০০।
	খুরমা : ২০,০০০ পাউন্ড।
	জিরা : ১,০০০ পাউন্ড।
'মকরান'	৪,০০,০০০ দিরহাম।
পশ্চিম ভারত (সিন্ধু) এবং সন্নিহিত অঞ্চল	১১,৫০০,০০০ দিরহাম।
	সুগন্ধী কাষ্ঠ : ১৫০ পাউন্ড।
'সিজিস্তান'	৪,০০০,০০০ দিরহাম।
	চেক বস্ত্রাদি : ৩০০।
	মিশ্রি খণ্ড : ২০,০০০ পাউন্ড।
'খোরাসান'	২৮,০০০,০০০ দিরহাম।
	রৌপ খণ্ড : ,০০০।
	ভারবাহী পশু : ৪,০০০।
	দাসদাসী : ১,০০০ জন।
	পোশাক : ২৭,০০০।
	হরিতকী-বয়ড়া-আমলকী : ৩০,০০০ পাউন্ড।
'জুরজান'	১২,০০০,০০০ দিরহাম।
	রেশম : ১,০০০ খণ্ড।
'কুমিস'	১,৫০০,০০০ দিরহাম।
	রৌপ্য খণ্ড : ১, ০০০ খণ্ড

www.amarboi.org

'তাবারিস্তান, আররুইয়ান ও নিহাওন্দ'	৬,৩০০,০০০ দিরহাম।
	তাবারী গালিচা : ৬০০ খণ্ড।
	জোব্বা : ২০০
	পোশাক : ৫০০
	রুমাল : ৩০০
	পানপাত্র : ৩০০
'আর্‌রায়'	১২,০০০,০০০ দিরহাম।
	মধু : ২০,০০০ পাউন্ড।
'হামদান'	১১,৮০০,০০০ দিরহাম।
	দাড়িম্ব জারক : ১,০০০ পাউন্ড।
	মধু : ১২,০০০ পাউন্ড।
'কুফা ও বসরার (!) মধ্যবর্তী অঞ্চল'	১০,৭০০,০০০ দিরহাম।
'মাসাবাধান ও আর্‌রায়ান'	৪,০০০,০০০ দিরহাম।
'শহরজোর'	৬,০০০,০০০ দিরহাম।
মোশেল ও সন্নিহিত অঞ্চল	২৪,০০০,০০০ দিরহাম।
	সাদা মধু : ২০,০০০ পাউন্ড।
'আজরবাইজান'	৪,০০০,০০০ দিরহাম।
'আল জজিরা ও সন্নিহিত ফুরাত অঞ্চল'	৩৪,০০০,০০০ দিরহাম।
'খারাজ'	৩০০,০০০ দিরহাম।
'জিলান'	৫,০০০,০০০ দিরহাম।
	দাসদাসী : ১,০০০ জন।
	মধু : ১২,০০০ থলি।
	বাজপাখি : ১০।
	পোশাক : ২০।
'আর্মেনিয়া'	১৩,০০০,০০০ দিরহাম।
	নকশাদার গালিচা : ২০।
	নানাবিধ কাপড় : ৫৮০ পাউন্ড।
	লবণাক্ত সুরমাহী মাছ : ১০,০০০ পাউন্ড।
	হেরিং মাছ : ১০,০০০ পাউন্ড।
	খচ্চর : ২০০।
	বাজ পাখি : ৩০।
'কিন্নাসরিন'	৪০০,০০০ দিনার।
	মুনাক্কা : ১,০০০ বোঝা।
'দামেশক'	৪২০,০০০ দিনার।
'জর্ডন'	৯৬,০০০ দিনার।
'প্যালেস্টাইন'	৩১০,০০০ দিনার।
	মুনাক্কা : ৩০০,০০০ পাউন্ড।
'মিশর'	১,৯২০,০০০ দিনার।
'বরকা'	১,০০০,০০০ দিরহাম।
'ইফ্রিকিয়া'	১৩,০০০,০০০ দিরহাম।
	গালিচা : ১২০।
'ইয়ামেন'	৩৭০,০০০ দিনার, বস্ত্রাদি ছাড়া।
'হেজাজ'	৩০০,০০০ দিনার। (তালিকা শেষ)।

www.amarboi.org

এরূপভাবে আহমদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে আব্দুল হামিদের কলমে মামুনের সময়কালীন বাগদাদের রাজকোষে বিভিন্ন দিক থেকে আগত সম্পদের একটি তালিকা পাওয়া যায়। আমি তা 'জেরাবুদ্দৌলত' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করলাম।

'শস্যপূর্ণ গ্রামাঞ্চল' থেকে দুই কোটি সত্তর লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং আট লক্ষ দিরহাম। নাজরানী কাপড় দুইশ থান এবং মোহরাঙ্কিত করার মাটি দুইশ চল্লিশ রিতল।

'কিনকর' থেকে এক কোটি দশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং ছয় লক্ষ দিরহাম।

'দজলা নদী অঞ্চল' থেকে দুই কোটি দিরহাম ও আটশ দিরহাম।

'হুল্‌য়ান' থেকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং আট লক্ষ দিরহাম।

'আহ্‌ওয়াজ' থেকে পঁচিশ হাজার দিরহাম (একবার)। চিনি ত্রিশ হাজার রিতল।

'পারস্য' থেকে দুই কোটি সত্তর লক্ষ দিরহাম। গোলাপ জল ত্রিশ হাজার রিতল। কাল তেল বিশ হাজার রিতল।

'কেরমান' থেকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং দুই লক্ষ দিরহাম। ইয়ামেনী বস্ত্র পাঁচশ সংখ্যা। শুষ্ক খেজুর বিশ হাজার রিতল।

'মকরান' থেকে আট লক্ষ দিরহাম (একবার)।

'সিন্ধু ও সন্নিহিত অঞ্চল' থেকে এক কোটি দশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং পাঁচ লক্ষ দিরহাম। হিন্দী ধূপকাঠি একশ পঞ্চাশ রিতল।

'সিজিস্তান' থেকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। চক্করদার কাপড় তিনশ সংখ্যা এবং 'ফানিদ' মিষ্টি বিশ রিতল।

'খোরাসান' হতে দুই কোটি আশি লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। এক হাজার রৌপ্য ধাতু পিণ্ড। ভারবাহী পশু চার হাজার। ক্রীতদাস এক হাজার। বস্ত্রাদি বিশ হাজার। 'ইহলিলাজ' ফল ত্রিশ হাজার রিতল।

'জুরজান' থেকে এক কোটি বিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। রেশম বস্ত্র এক হাজার খণ্ড।

'কোমাস' থেকে দশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। পাঁচলক্ষ রৌপ্য ধাতুপিণ্ড।

'তাবারিস্তান, রূবান ও নাহাওন্দ' থেকে ষাট লক্ষ (দুইবার) এবং তিন লক্ষ। তাবারী গালিচা ছয়শ খণ্ড। পোশাক দুইশত। বস্ত্রাদি পাঁচশ। রুমাল তিনশ। পানপাত্র তিনশ।

'রায়' থেকে এক কোটি বিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। মধু বিশ হাজার রিতল।

'হামদান' থেকে এক কোটি দশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং তিন লক্ষ। দাড়িম্ব জারক এক হাজার রিতল। মধু বার হাজার রিতল।

'বসরা ও কুফার মধ্যবর্তী অঞ্চল' থেকে এক কোটি দিরহাম (দুইবার) এবং সাত লক্ষ দিরহাম।

'মাসেবজান ও দায়নার' থেকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)।

'শহরজুর' থেকে ষাট লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং সাত লক্ষ দিরহাম।

'মোশেল ও সন্নিহিত অঞ্চল' থেকে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং সাদা মধু দুই কোটি রিতল।

www.amarboi.org

'আজরবায়জান' থেকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)।

'আলজজিরা ও সন্নিহিত ফুরাত এলাকা' থেকে তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। এক হাজার ক্রীতদাস। মধু বার হাজার থলি। বাজপাখি দশ। পোশাক বিশ।

'আর্মেনিয়া' থেকে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। ঔষধি কাঠ বিশ। 'যুকাম' চূর্ণ পাঁচশ ত্রিশ রিতল। সুরমা মালিশ দশ হাজার রিতল। সামুদ্রিক শুঁটকি মাছ দশ হাজার রিতল। খচ্চর দুইশ। অশ্বশাবক ত্রিশ।

'কিন্নাসরিন' থেকে চার লক্ষ দিনার। জলপাই তেল এক হাজার বোঝাই।

'দামেশক' থেকে চার লক্ষ দিনার ও বিশ হাজার দিনার।

'জর্ডন' থেকে সাতানব্বই হাজার দিনার।

'ফিলিস্তিন' থেকে তিন লক্ষ দিনার ও দশ হাজার দিনার। জলপাই তেল তিন লক্ষ রিতল।

'মিশর' থেকে এক কোটি দিনার, নয় লক্ষ দিনার ও বিশ হাজার দিনার।

'বরকা' থেকে এক কোটি দিরহাম (দুইবার)।

'আফ্রিকিয়া' থেকে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। গালিচা একশ বিশ।

'ইয়ামেন' থেকে বস্ত্রাদি ছাড়াই তিন লক্ষ দিনার ও সত্তর হাজার দিনার।

'হেজাজ' থেকে তিন লক্ষ দিনার।

আন্দালুস সম্পর্কে বিশ্বস্ত ইতিহাসবিদ ব্যক্তিরা যা বলেছেন, তা এ যে, আব্দুর রহমান আন্‌নাসের তাঁর মৃত্যুকালে রাজকোষে—সহস্র শব্দটিকে তিনবার ব্যবহার করে—পাঁচ সহস্র সহস্র সহস্র—অর্থাৎ পাঁচ হাজার কোটি দিনার রেখে গিয়েছিলেন।। তার সমগ্রের পরিমাণ কেন্তারের ওজনে পাঁচ লক্ষ কেন্তার ছিল। সম্রাট হারুনুর রশীদ সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাসে দেখেছি, তাঁর সময়ে রাজকোষে প্রতি বছর সাত হাজার কেন্তার পাঁচশ কেন্তার পরিমাণ সম্পদ জড় হত।[২৭]

---

২৭. এর পর রোজেনথালের অনুবাদে সংযোজন বিদ্যমান। তা তিনি দুই-তিনটি পাণ্ডুলিপিতে পেয়েছেন। সম্পূর্ণতার জন্য আমরা তার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করলাম।

উবাইদী সাম্রাজ্যের বর্ণনায় আমি ইবনে-খল্লিকনের ইতিহাসে পাঠ করেছি যে, সেনাপতি আফজল ইবনে বদর আল জামিলী যিনি মিশরে উবাইদী সম্রাটদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার নিহত হওয়ার পর রাজকোষে ৬০০,০০০ দিনার এবং ২৫০ তোড়া দিরহাম পাওয়া গিয়েছিল। এর সাথে বহু মূল্যবান আংটিতে ব্যবহারযোগ্য পাথর, মুক্তা, পোশাক, গৃহস্থালী আসবাবপত্র এবং আরোহণের অশ্ব ও মালবাহী পশু ছিল।

আমাদের সমসাময়িক সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মিশরীয় তুর্কি সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য তুর্কি শাসক আল নাসির মোহাম্মদ ইবনে কুলাউল-এর সময়ে প্রাধান্য বিস্তার করতে আরম্ভ করে। তাঁর শাসনের প্রথম দিকে দুইজন তুর্কি আমীর—ভাইবার ও সাল্লার তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে। অল্পকাল পরেই আল নাসির ক্ষমতা ফিরে পেল। তিনি বাইবার ও সাল্লারকে অপসারিত করে তাদের সমুদয় সম্পদ ছিনিয়ে নেন। আমি উক্ত সম্পদের একটি তালিকা পেয়েছি এবং তা হতে নিম্নের বস্তুগুলোর নাম উদ্ধৃত করেছি :

হলুদ শম্বুক মণি ও পদ্মরাগ মণি $১\frac{১}{২}$ পাউন্ড। মরকত মণি ১৯ পাউন্ড। হীরক ও আংটিতে ব্যবহারযোগ্য বিড়ালচক্ষু পাথর ৩০৮০ বৃহৎ খণ্ড। বাঝাই করা আংটির পাথর ২ পাউন্ড। গোলাকার মোতি এক মিসকাল ($১\frac{১}{২}$ দিরহাম) হতে এক দিরহাম পর্যন্ত ওজনবিশিষ্ট ১,১৫০ খণ্ড।

www.amarboi.org

পাঠক, এর দ্বারা এক সাম্রাজ্যের সাথে অন্য সাম্রাজ্যকে বিবেচনা করুন। যে ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা নেই কিংবা যা আপনার যুগে দেখা যায় না, তেমন বিষয় সরাসরি অস্বীকার করবেন না। তা হলে সম্ভাব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অহেতুক আপনি অনুদার বলে বিবেচিত হবেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর এ প্রকার সংবাদ শোনা মাত্রই অস্বীকার করে বসেন। এরূপ করা আদৌ সমীচীন নয়। কারণ সৃষ্টি জগৎ ও মানব সভ্যতার অবস্থার মধ্যে বৈচিত্র্য বিদ্যমান। যে ব্যক্তি তার নিম্নস্তর বা মধ্যস্তরে অবস্থান করছে, তার পক্ষে উপলব্ধি শক্তিকে সেখানেই সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। আমরা যখন আব্বাসী, উমাইয়া ও উবাইদী সাম্রাজ্য সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করতে বসি এবং তন্মধ্যে যা সঠিক ও সন্দেহাতীত, তার সাথে বর্তমানকালের তদপেক্ষা ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যগুলোর অবস্থার তুলনা করি, তখনই তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাই। এর কারণ এ যে, তার মধ্যে মৌল শক্তি ও বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত সভ্যতার তারতম্য বিদ্যমান। কেননা, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, সাম্রাজ্যের মৌল প্রতিষ্ঠা শক্তি থেকেই তার নিদর্শনাদি উৎসারিত হয়ে থাকে। এ কারণেই আমাদের পক্ষে এ সকল সংবাদ অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কেননা এ সকল অবস্থার অধিকাংশই অত্যন্ত সুপরিচিত ও সুস্পষ্ট। বরং তাদের মধ্যে এমনও আছে, যা অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সমৃদ্ধ এবং তাদের স্থাপত্য ও অন্যান্য নিদর্শন লোকচক্ষুর গোচরীভূত ও অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। সুতরাং, পাঠক, বর্ণিত অবস্থাসমূহ থেকে আপনি সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যের শক্তি ও দুর্বলতা, বিরাটত্ব ও ক্ষুদ্রতা বিচার করতে পারেন। আমরা নিম্নে যে সরস কাহিনীটি আপনার সম্মুখে উপস্থিত করছি, তা থেকেও বিবেচনাযোগ্য জ্ঞান আহরণ করতে পারেন।

স্বর্ণমুদ্রা ১,৪০০,০০০ দিনার। খাঁটি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি গর্ত। দুইটি প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে ভরা থলি—তার সংখ্যা গণনা করা হয় নি। দিরহাম ২,০৭১,০০০। স্বর্ণালংকার ৪ শ ওজন। এর সঙ্গে বহু মূল্যবান পোশাক, গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, অশ্বযান, ভারবাহী পশু, শস্যাদি, গরু, দাসদাসী এবং খামার।

এর পরেও আমরা মরক্কোতে মারিনী সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাঁদের রাজকোষ সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী হাসান ইবনে বাওয়াক লিখিত একটি তালিকা আমি দেখেছি। সম্রাট আবু সাইদ রাজকোষে যে অর্থ রেখে গিয়েছিলেন, তার পরিমাণ ৭০০ শ ওজনের স্বর্ণ মুদ্রা। এ অনুপাতে তার অন্যান্য সম্পদও প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী সম্রাট আবুল হাসান এটা অপেক্ষা অধিক সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন 'তেল মেকন' অধিকার করেন, তখন তার সম্রাট আবদুল ওলাদীদ আবু তশফীনের রাজকোষে ৩০০ শ ওজন বিশিষ্ট স্বর্ণ মুদ্রা ও অলংকার এবং এ অনুপাতে অন্যান্য সম্পদ লাভ করেছিলেন।

আফ্রিকিয়ার আলমোহেদ (হাফসাইড) সাম্রাজ্যের নবম শাসক আবু বকরের সময়ে আমি ছিলাম। তিনি মুহম্মদ ইবনে আল হাকিম নামীয় তার এক সেনাপতিকে অপসারিত করে তাঁর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। সেখানে তিনি চল্লিশ শ ওজনের দিনার স্বর্ণমুদ্রা এবং একটি বড় থাল পূর্ণ আংটির মূল্যবান পাথর ও মুক্তা লাভ করেন। উক্ত সেনাপতির গৃহের গালিচার অভ্যন্তর হতে অনুরূপ সম্পদ প্রাপ্ত হন এবং এর অনুপাতে অন্যান্য সম্পত্তি ও আসবাবপত্র পেয়েছিলেন।

আমি মিশরের শাসক মালাক আজ্জহীর আবু সাইদ বারকুকের সময় সেখানে ছিলাম। তিনি 'কুলাউন' পরিবারের নিকট হতে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং এ সময় তিনি তাঁর অভ্যন্তরীণ বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রী আমির মাহমুদকে গ্রেপ্তার করে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এ বাজেয়াপ্তকরণের সাথে জড়িত ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, এর ফলে রাজকোষে ১,৬০০,০০০ দিনার যোগ হয়। সেখানে এর সমানুপাতে পোশাকাদি, অশ্বতরী, ভারবাহী পশু, শস্যাদি ও পালিত পশু ছিল।

www.amarboi.org

তা এ যে, মারিনী সম্রাট আবু ইনানের সময়ে মাগরিবে তাজ্জার উস্তাদস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ইবনে বতুতা[২৮] নামে পরিচিত এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইনি ইতিপূর্বে বিশ বছর পূর্বাঞ্চলে কাটিয়েছেন এবং ইরাক, ইয়ামেন ও হিন্দে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি হিন্দের প্রধান নগর দিল্লীতেও গেছেন। তখন সেখানকার সম্রাট ছিলেন মুহম্মদ শাহ[২৯] এবং বর্তমানে ঐ রাজ্যের অধিপতি ফিরুজজুহ (শাহ?)। ইবনে বতুতা সম্রাটের নিকট স্থান লাভ করেন এবং সম্রাট তাঁকে মালেকী মজহাব অনুসারে কাজীর পদে নিয়োগ করেন। অতঃপর তিনি মাগরিবে এসে সম্রাট আবু ইনানের আশ্রয় লাভ করেন। ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করতেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর দৃষ্ট অদ্ভুত অবস্থাদির কথা বলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় হিন্দাধিপতির রাজ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতেন এবং এমন সকল বিষয় বর্ণনা করতেন, যা শ্রোতাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হত। যেমন হিন্দের অধিপতি যখন কোথাও ভ্রমণে বের হতে মনস্থ করতেন, তখন তাঁর নগরীর আবাল বৃদ্ধ বনিতার হিসাব করে তাদেরকে ছয় মাসের আহার্য দিয়ে যেতেন এবং তাঁর নিজ সম্পদ থেকে তাদের প্রয়োজন মিটাবার নির্দেশ দিতেন। ভ্রমণ থেকে তাঁর ফেরার দিন বিরাট উৎসব হত। সমস্ত লোক ময়দানে সমবেত হয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করত। সম্রাটের দরবারের সম্মুখে ভারবাহী পশুর পৃষ্ঠে ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করা হত এবং সম্রাট দরবার থেকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত ঐ ক্ষেপণাস্ত্র থেকে দিরহাম ও দিনারের থলে উপস্থিত জনতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হত। এ ধরনের নানা কাহিনী। মানুষ এটা শুনে মিথ্যা বলে কানাঘুষা করত।

এ সময়ে আমি একদিন সম্রাটের বিখ্যাত উজির ফারেস ইবনে ওয়ারদার সাক্ষাৎ পেয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং মানুষের মধ্যে প্রচলিত এ সকল সংবাদের মিথ্যা হওয়ার ধারণার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। উজির তদুত্তরে আমাকে বললেন, সাবধান, যে সকল সাম্রাজ্যের অবস্থা তুমি স্বচক্ষে দেখনি, তা অস্বীকার করতে যেও না। তা হলে সেই উজির পুত্রের মতো হবে, যে কারাগারে লালিত হয়েছিল। ঘটনাটি এ, কোনো সম্রাট তাঁর উজিড়কে কারাবাসে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে তাঁর পুত্রও তাঁর সাথে ঐ কারাগারে লালিতপালিত হয়েছিল। বোঝার মতো বয়সে পৌঁছে একদিন উজির পুত্র পিতাকে আহার্য মাংস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। উজির বললেন, এটা ছাগ মাংস। পুত্র বলল, ছাগ কি? উজির তখন সবিস্তারে পুত্রের জন্য ছাগলের ছাগলত্ব বর্ণনা করলেন। সব শুনে পুত্র বলল, বুঝেছি পিতা, আপনি ইঁদুরের কথা বলছেন। পিতা অস্বীকার করে বললেন, না, না; কোথায় ছাগল আর কোথায় ইঁদুর! এভাবে উট ও গরুর মাংস সম্পর্কেও সে মন্তব্য করেছিল। কারণ তার জীবনে সে এক ইঁদুর ছাড়া অন্যকোনো প্রাণী দেখেনি। সুতরাং সে সকল প্রাণীকেই ইঁদুরের বংশধর বলে ভেবেছে।

এভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবাদাদি সম্পর্কে মানুষ অনুমান করে থাকে। যেমন অন্যদিকে যে কোনো সংবাদকে অতিরঞ্জিত করে অদ্ভুত করে তোলার স্বভাবও তাদের

২৮. মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্', জীবনকাল ৭০৩-৭৭৯ (১৩০৪-১৩৭৭ খ্রি:) হি:।
২৯. শাসনকাল ১৩২৫-৫১ খ্রি:।

www.amarboi.org

মধ্যে বিদ্যমান। আমরা এ সম্পর্কে পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং মানুষের উচিত যথার্থ নিয়মের দ্বারস্থ হওয়া। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁকে তার নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সম্ভব অসম্ভবের ব্যাপারে যথার্থ বুদ্ধি ও স্বাভাবিক বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে, যা সম্ভব বলে বোধ হবে, তা গ্রহণ করবে এবং যা বাইরে থাকবে, তাকে বর্জন করবে। এক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য একান্ত মননগ্রাহ্য—সম্ভাব্যতা নয়। কারণ তা অত্যন্ত ব্যাপক ব্যাপার; তাতে ঘটনাবলির সীমারেখা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল প্রতিটি বস্তুর উপাদানগত সম্ভাব্যতা। আমরা যখন কোনো বস্তুর মৌল গোত্র, প্রকার, আকৃতির বিরাটত্ব ও শক্তি বিচার করতে সমর্থ হই, তখন সেই অনুপাতে তার বিচিত্র অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। এ ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য সীমা থেকে যদি তা বের হয়ে যায়, তা হলে, অবশ্যই তাকে অসম্ভব বলে নির্দেশ করতে পারি। 'বল, হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর এবং তুমি সকল দয়ালু অপেক্ষা অধিক দয়ালু'।[৩০] আল্লাহ্ পবিত্র, উন্নত এবং সর্বজ্ঞ।

---

৩০. কোরান ২০, ১১৪।

www.amarboi.org

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের অধিকারী আশ্রিতপোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহায্যে স্বীয় জাতি ও গোত্রপ্রীতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর উপর ক্ষমতা বিস্তার করে থাকে]

জেনে রাখুন, সাম্রাজ্যের অধিকারী ব্যক্তির প্রতিষ্ঠালাভ, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, একমাত্র তাঁর জাতির দ্বারাই সম্ভব হয়। তারাই তাঁর গোত্রশক্তি এবং প্রয়োজনে তারাই তাঁর পশ্চাতে এসে দাঁড়ায়। তাদের সাহায্যেই বহিঃশত্রুর হাত থেকে সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হয়। তারাই তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে, মন্ত্রিত্বে, রাজকোষ রক্ষায় এগিয়ে আসে। কারণ সাধারণত তারাই তাঁর সাহায্যকারী। তাঁর দায়িত্বে অংশগ্রহণ করে এবং সকল প্রয়োজনীয় কার্যে তাঁর সমভাগী হয়ে তারা সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে তোলে। এটাই সম্রাজ্যের প্রথম পর্যায়, যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হলে সাম্রাজ্যের অধিকারীরা স্বগোত্রীয়দের কবলমুক্ত হতে চেষ্টা করেন এবং সাম্রাজ্যগৌরব এককভাবে ভোগ করতে উদ্যোগী হন। তাঁরা তখন নিজেদের লোকদেরকে প্রতিরোধ করতে থাকেন এবং এর ফলে তারা তাঁদের শত্রু হয়ে ওঠে। সুতরাং এ জ্ঞাতিশত্রুতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা ভিন্নজাতি ও গোত্রের লোকদেরকে সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করেন। এদের সহায়তায় একদিকে যেমন জ্ঞাতিদেরকে সাম্রাজ্যগৌরবের অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত করেন, অন্যদিকে তেমনি তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। এ জন্যই এ বহিরাগতরা সম্রাটের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ সভাসদে পরিণত হয়। তারাই সম্রাটের নৈকট্যে ও কার্যে নিয়োজিত থাকে, তাঁর জন্য স্বার্থত্যাগে ও গৌরব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং যে সহায়তা একসময়ে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কর্তব্য ছিল, তাকেই প্রতিরোধ করতে তারা মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। ফলে যে সাম্রাজ্যগৌরব সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, তা সম্রাটের একক মর্যাদায় পরিণত হয়। সুতরাং সম্রাটকেও ঐ সকল বহিরাগত সাহায্যকারীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। তাদেরকে অধিকতর সম্মান ও প্রতিপত্তির সুযোগ দিতে হয় এবং যা মূলত তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রাপ্য ছিল, তাই বহিরাগতরা লাভ করে। তারাই গুরুত্বপূর্ণ পদ, অঞ্চল শাসন, মন্ত্রিত্ব, সৈনাপত্য, রাজকোষ, এমনকি সম্রাটের প্রতিনিধিত্বের বিশিষ্ট গৌরব অর্জন করে। তাদেরকেই এমন সকল মর্যাদাপূর্ণ উপাধি দান করা হয়, যা জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের জন্য হওয়া উচিত ছিল। অথচ সম্রাট তখন তা দিতে বাধ্য; কারণ তখন তারাই তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও একান্ত পরামর্শদাতা।

সাম্রাজ্যের এ অবস্থা বস্তুত তার দুর্বলতার পরিচয় বহন করে এবং তার মধ্যে সেই প্রাচীন ব্যধির উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা জন্মায়। কারণ, প্রাধান্য বিস্তারের সেই অমোঘ

www.amarboi.org

শক্তি গোত্রপ্রীতির বিনাশের ফলেই এরূপ অবস্থা দেখা দেয়। ফলে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে যে শত্রুতার বীজ উপ্ত হয়েছিল, তা ক্রমশ শাখাপল্লবে বিস্তৃত হতে থাকে। একটা অন্তর্গত তীব্র ঘৃণায় তারা সম্রাটের পতনের সম্ভাব্য পরিস্থিতি উদ্ভাবনের অপেক্ষা করতে থাকে। এর অশুভ প্রভাব সাম্রাজ্যের উপর এসে পড়ে এবং সম্রাটের পক্ষে এ রোগ থেকে মুক্তি লাভের কোনো পথ থাকে না, কারণ যা একবার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তা ক্রমশ পুরুষাণুক্রমে দূর থেকে দূরে সরে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

পাঠক, এ বিষয়টি বনি উমাইয়াদের সাম্রাজ্য পরিচালনায় বিবেচনা করুন। তারা কী দর্শনীয়ভাবেই না তাদের যুদ্ধবিগ্রহে ও আঞ্চলিক শাসনে আরবের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণ করেছিল! যেমন উমর ইবনে সাদ ইবনে আবি ওক্কাস, উবাইদুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ, ইবনে আবি সুফিয়ান, আল হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, আলমুহাল্লার ইবনে আবি সফরা, খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ আলকসরী, ইবনে হুবাইরা, মুসা ইবনে সুনাইর, বেলাল ইবনে আবি বুরদা ইবনে আবু মুসা আল আশআরী, নসর ইবনে সাইয়ার প্রমুখ বিশিষ্ট আরবীয় ব্যক্তিবর্গ। প্রথম দিকে বনি আব্বাসের অবস্থাও এরূপ ছিল, তারাও আরবীয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে ক্ষমতা বিস্তার করেছিল। অতঃপর যখন সম্রাট সাম্রাজ্য গৌরবকে নিজের কুক্ষিগত করতে চেষ্টা করলেন, তখন আরবীয় জ্ঞাতিত্বের শক্তি খর্ব করা হল এবং সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বভার অনারবদের হস্তে ন্যস্ত হল। আঞ্চলিক শাসন ও মন্ত্রিত্ব বারামেকী, বনি সহল ইবনে নওবখত, বনি তাহের, বনি বুইয়া, আশ্রিত তুর্কি সেনাপতি ওয়াসীফ ও বুগা, আতামেশ ও বাকনাক, ইবনে তুলুন ও তার সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য অনারব পোষ্য আশ্রিতদের কবলে পতিত হল। এভাবে সাম্রাজ্য গৌরব তাদের কুক্ষিগত হল, যারা এর প্রতিষ্ঠা করেনি এবং পদমর্যাদা তাদের অধিকারে গেল, যারা তার জন্ম দেয়নি। এটাই বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত আল্লাহ্র নিয়ম। আল্লাহ্ যথার্থই উন্নত ও সর্বজ্ঞ।

www.amarboi.org

বিংশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যে আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবস্থা]

জেনে রাখুন, সাম্রাজ্যের কর্মাদিতে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের প্রাচীনত্ব ও নবীনত্ব অনুসারে সম্রাটের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। এর কারণ এ যে, গোত্রপ্রীতির উদ্দেশ্য প্রতিরোধ ও প্রাধান্য বিস্তার একমাত্র বংশ সম্পর্কের সাহায্যেই সম্ভব হয়। কেননা রক্ত সম্পর্কীয় জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক সহায়তার আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে। এজন্যই বহিরাগত ও দূর সম্পর্কীয়দেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে তারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। চুক্তি বা দাসত্বের কারণে আশ্রয়লাভ ও সাহচর্য প্রাপ্তি অনেক ক্ষেত্রেই এ বংশ সম্পর্কের ধারায় উন্নীত হতে পারে। কেননা বংশ সম্পর্কের ব্যাপারটি যদিও স্বাভাবিক, তবুও তা কাল্পনিক বাস্তবতা সমন্বিত। এর একমাত্র উদ্দেশ্য পরস্পর সম্মিলন। এর মাধ্যমে গোত্রত্ব, প্রতিরোধ, দীর্ঘ সহ অবস্থান, সাহচর্য, সহমর্মিতা এবং জীবন ও মৃত্যুর সকল অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে তা মূল্যহীন। কিন্তু উক্ত বিষয়াদির মাধ্যমে সম্মিলিত হতে পারলেই গোত্র চেতনা ও সহানুভূতির জন্ম হয়। এটা মানব জীবনের সর্বত্র দর্শনযোগ্য। এ বিষয়টিকে, পাঠক, কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করুন। কর্তা ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির মধ্যে অনুরূপভাবে একটি সৌহার্দ গড়ে ওঠে, যা উপরোক্ত ঐক্য ও আত্মীয়তার পর্যায়ে উন্নীত হয়। এটা বংশ সম্পর্ক না হলেও তার ফলাফল এ ক্ষেত্রে লব্ধ হয়। সুতরাং এ সম্পর্ক যদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বেই স্থাপিত হয়ে থাকে, তা হলে তার স্থায়িত্বের গভীরতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সম্পর্কের সুস্পষ্টতা দেখা দেয়। এর দুটি কারণ বিদ্যমান। একটি এ যে, রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে স্থাপিত সম্পর্কের অধীন ব্যক্তিরা কর্তার সাথে একই পথের পথিক। তখন সাহায্যের প্রয়োজনে খুবই কম পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়; অনেক ক্ষেত্রে আদৌ সে প্রশ্ন উত্থিত হয় না। ফলে তারা এক বংশ ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রাজ্যলাভ করার পরে কর্মে নিয়োগ করার সম্পর্ক স্থাপিত হলে, তখন প্রভুর সম্রাট হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে ও নিয়োগকর্তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা দেয় এবং ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও আশ্রিত ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্যও দর্শনীয় হয়ে থাকে। কারণ সাম্রাজ্যের মর্যাদা সর্বদাই তার অধীনস্থ সর্বপ্রকার মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য বিচার করে থাকে। এ কারণেই এ নবাগত আশ্রিতদের অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তারা বহিরাগতই থেকে যায়। এর ফলে নিয়োগকর্তার সাথে তাদের সম্পর্ক দুর্বল এবং সহায়তার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে থাকে। সাম্রাজ্য পূর্ব সম্পর্ক অপেক্ষা এ সম্পর্ক খুবই দুর্বল।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় কারণ এ যে, সাম্রাজ্যের পূর্বে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগকর্তার সাথে সংযুক্ত থাকার ফলে, তার এ সংযুক্তির মূল ভিত্তির কথা মানুষ ভুলে যায় এবং তাকে ঐ বংশের লোক বলেই গণ্য করে। তার ফলে তার গোত্রপ্রীতির শক্তি দৃঢ়তর হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যের পরের সম্পর্ক সকলের নিকট সুপরিচিত; সুতরাং সংযুক্তির কারণ ও বংশধারা থেকে তার পৃথকীকরণ সম্পর্কে সকলেই তৎপর থাকে। এর ফলে সাম্রাজ্যপূর্ব সম্পর্কের তুলনায় এতে গোত্রপ্রীতির শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। পাঠক, যে কোনো সাম্রাজ্য ও নেতৃত্বের ব্যাপারে অনুসন্ধান করলে আপনি এ পার্থক্যটি দেখতে পাবেন। দেখবেন যারা সাম্রাজ্য লাভের পূর্বে কর্মে নিয়োজিত হয়েছে, তারা নিয়োগকর্তার সাথে কত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ এবং কত ঘনিষ্ঠভাবেই না নিকটতর। যেন তারা তাঁর পুত্র, ভাই ও অন্যান্য রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তুল্য। অথচ সাম্রাজ্য লাভের পরে যারা এসেছে, তারা নিয়োগকর্তার সাথে পূর্ববর্তীদের ন্যায় এতটা ঘনিষ্ঠ ও সংযুক্ত নয়। এটা চাক্ষুষদৃষ্ট বিষয়। এমনকি সাম্রাজ্য তার শেষ দিকে যাদেরকে বাইরে থেকে নিজ ক্রোড়ে আশ্রয় দেয় ও কর্মে নিয়োজিত করে, তাদের জন্য পূর্ববর্তীদের সমান মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধাও দিতে পারে না। কারণ পূর্ববর্তীদের ঘনিষ্ঠতা সাম্রাজ্যের সুদিনে অনেক কিছুই লাভ করেছে; কিন্তু এ দুর্দিনে যারা এসে তার হাল ধরেছে, তাদেরকে দিবার মতো আর কিছু নেই। সুতরাং সাম্রাজ্যের দুর্গতির সঙ্গে সঙ্গে তারাও দুর্গতির শিকারে পরিণত হয়। কেননা সম্রাট এ পরবর্তীদেরকে শুধুমাত্র পূর্ববর্তীদের প্রভাবমুক্ত হবার জন্যই কর্মে নিয়োজিত করে থাকেন। সুতরাং ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই যথেষ্ট মনে করেন, তাদেরকে মর্যাদা দানের চিন্তা তাঁর মাথায় আসে না। কারণ তাঁর মাথায় তখন পূর্ববর্তীদের চিন্তা জট পাকাতে থাকে। যারা একসময়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের সাথে মিশে সাম্রাজ্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছিল, যারা তাঁকে দীর্ঘদিন থেকে জানে, যারা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মতোই তাঁকে দেখে, যারা তাঁর সম্পর্কে খুব একটা সমীহের ভাব পোষণ করে না এবং যাদের বিভিন্ন আচার আচরণ ক্রমশ একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে, তাদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতেই সম্রাট পরবর্তীদেরকে কর্মে নিয়োজিত করেন। সুতরাং পূর্ববর্তীদের কবল হতে মুক্তিলাভ ও পরবর্তীদের নিয়োগের কাল খুবই নিকটবর্তী। এজন্যই নবাগতদের পক্ষে কোনোপ্রকার মর্যাদা লাভের সুযোগ ঘটে না। বরং তারা বহিরাগত হিসাবেই থেকে যায়। সকল সাম্রাজ্যেই শেষের দিকে এ অবস্থা দেখা দেয়। এজন্য কর্মী ও সহায়ক বলতে পূর্ববর্তীদেরকেই সাধারণভাবে বোঝানো হয়। আর এ নবাগতরা শুধুমাত্র সেবক ও উদ্ধারকারী। আল্লাহ্ই বিশ্বাসীদের যথার্থ সহায়ক।[৩১] তিনি সকল বিষয়ে একমাত্র নির্ভরযোগ্য।

৩১. কোরান ৩, ৬৮।

www.amarboi.org

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যে অনেক সময় সম্রাটকে রাজকীয় ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত রাখা এবং তাঁর উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের ঘটনা দেখা যায়]

সাম্রাজ্য যখন কোনো বংশের একটি বিশেষ অংশের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং প্রতিষ্ঠাতা গোত্রের একটি উৎস তার শক্তির কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়, তখন সংশ্লিষ্ট অংশ বা কেন্দ্র সমুদয় গোত্রকে বঞ্চিত করে নিজেরা এককভাবে গৌরবের অধিকারী হয়ে ওঠে। অতঃপর তাদের বংশধররা পর্যায়ক্রমে একের পর এক মনোনয়নের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করতে থাকে। এ অবস্থায় অনেক সময় তাঁদের উজির ও সভাসদরা সম্রাটের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কারণ রাজশক্তির উৎস কর্তৃক মনোনীত বালক বা দুর্বল সম্রাটের অভিভাবক নিযুক্ত হওয়া। অনেক সময় পিতাই এভাবে পুত্রকে মনোনয়ন করেন আবার অনেক সময় কোনো দল ও সেবকরা তাকে অনুরূপভাবে সিংহাসনে বসায়। উভয় ক্ষেত্রে এটাই প্রকাশ পায় যে, সম্রাট রাজ্য পরিচালনার যোগ্য নয়। সুতরাং তাঁর অভিভাবক হিসাবে পিতার উজির, সভাসদ, আশ্রিত পোষ্য অথবা গোত্রীয় কোনো ব্যক্তি রাজ্য পরিচালনায় তাঁকে সাহায্য করে এবং এভাবেই অন্যায্য প্রভাবের পথ সুগম হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এ অবস্থাকেই রাজ্য পরিচালনার একটা মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। বালক সম্রাটকে তাঁর প্রজাদের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় এবং তাঁকে জীবনের ভোগ সম্ভোগে অভ্যস্ত হতে দেয়া হয়। এভাবে যতদূর সম্ভব তাঁকে বিলাসব্যসন ও ভোগবাসনার উচ্চমার্গে বিচরণ করার সুযোগ করে দেয়া হয় এবং ক্রমশ তিনি রাজকার্যাদির দায়িত্ব পালনের কথা ভুলে গিয়ে অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দান করেন। তিনি এ প্রকার অভ্যাসে জড়িত হয়ে ভাবতে থাকেন যে, সম্রাটের কর্তব্য হল একমাত্র সিংহাসনে উপবেশন করা, পুরস্কার দেয়া, সভাসদদের সম্মুখে গম্ভীর স্বরে বক্তব্য রাখা এবং অবশিষ্ট সময় হারেমের অভ্যন্তরে স্ত্রীলোকের সাথে সময় কাটানো। এতদ্ব্যতীত সমস্যা সমাধান, প্রস্তুতি গ্রহণ, আদেশ-নিষেধ, রাজকার্যের বিভিন্ন দিক অবলোকন এবং সৈন্যদল, রাজকোষ ও সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণে দৃষ্টিদান—এ সমুদয়ই উজিরের কর্তব্য। এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে সম্রাট এ সকল দায়িত্ব উজিরের উপর এমনভাবে ন্যস্ত করেন, যাতে নেতৃত্ব ও অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ঘটে এবং উজির কৌশলে সাম্রাজ্য শক্তিকে কুক্ষিগত করে স্বীয় পরিবার ও বংশপরম্পরায় তা ভোগ করতে থাকে। যেমন পূর্বাঞ্চলে বনি বুইয়া, তুর্কি আমীর, কাফুর আল ইখসিদী ও অন্যান্যের বেলায় হয়েছে। আন্দালুসে মনসুর ইবনে আবু আমেরের জন্য অনুরূপ অবস্থা দেখা গেছে।

www.amarboi.org

কখনও এরূপ ক্ষমতা বিচ্যুত প্রভাবাধীন সম্রাট নিজের দুরবস্থা বুঝতে পারেন এবং এ আচ্ছন্ন অবস্থা ও অন্যায্য প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে থাকেন। তিনি সাম্রাজ্যশক্তিকে যথার্থ বংশধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য কখনো হত্যার দ্বারা আবার কখনো শুধুমাত্র পদচ্যুতির সাহায্যে অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারীদের গর্ব খর্ব করে থাকেন। অবশ্য এ প্রকার ঘটনা খুবই বিরল। কারণ সাম্রাজ্য কোনোপ্রকারে উজির ও সহায়কদের অন্যায্য প্রভাবের অধীনে একবার চলে গেলে তা ক্রমশ স্থায়ী রূপ লাভ করে এবং খুব অল্প সংখ্যকের পক্ষেই উক্ত প্রভাব থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব হয়। কারণ এরূপ অবস্থায় সম্রাটদের অধিকাংশকে এবং তাঁদের বংশাবলিকে বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত থাকতেই দেখা যায়। তাঁরা পৌরুষের কথা ভুলে গিয়ে স্তন্যদাত্রী-ধাত্রীদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে এবং এর মধ্যে লালিতপালিত হতে থাকে। সুতরাং নেতৃত্বের প্রতি তাদের কোনোপ্রকার ঔৎসুক্য থাকে না এবং অন্যান্য প্রভাবের কুফলও তারা বুঝতে পারে না। তাদের একমাত্র চিন্তা ও সাধনা, কি করে আরো অধিক চাকচিক্য, অধিক ভোগসম্ভোগ এবং বিচিত্র বিলাসব্যসনের সৃষ্টি করা যায়।

আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারাও অনুরূপ অন্যায্য প্রভাব বিস্তৃত হয়। তা সাম্রাজ্যের অধিকারী গোত্র কর্তৃক বংশের অন্য সকলকে বঞ্চিত করে একক মর্যাদা লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে থাকে। এ অবস্থা প্রতিটি সাম্রাজ্যের জন্যই অবশ্যম্ভাবী, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ দুটি রোগ এমন সংক্রামক যে, তা থেকে খুব কম সাম্রাজ্যই রক্ষা পেয়ে থাকে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজ্য দান করে থাকেন।[৩২] তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

---

৩২. কোরান ২, ২৪৭।

www.amarboi.org

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

[সম্রাটের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারীরা তাঁর রাজকীয় উপাধিতে হস্তক্ষেপ করে না]

এটা এ যে, রাজ্য ও শাসনক্ষমতা প্রথম প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য প্রথম দিকেই গোত্রপ্রীতির কল্যাণে লাভ হয়ে থাকে এবং এটা একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত তাদেরকে অনুসরণ করে; ফলে প্রতিষ্ঠাতা ও তদীয় জাতির জন্য রাজ্য ও প্রাধান্য বিস্তারের একটি বৈশিষ্ট্য দৃঢ়ত্ব লাভ করে। এ বৈশিষ্ট্য সর্বদা অক্ষুণ্ন থাকে এবং এটাই সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের সহায়ক হয়। সুতরাং এ অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারী যদি সম্রাটের গোত্রভুক্ত হয়, অথবা আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কেউ হয়, তা হলে তার গোত্রপ্রীতি সম্রাটের অনুসারী ও তদন্তর্গত প্রভাবের অধীন হয়ে থাকে। তার মধ্যে রাজশক্তির কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না। এ কারণেই সে তার অন্যান্য প্রভাব বিস্তারে কখনো প্রকাশ্যে রাজশক্তি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে না। শুধুমাত্র তার আদেশ-নিষেধ, সমাধান-সংযোগ ও সৃজন-বিনাশের ক্ষমতাজনিত ফলাফলের প্রতিই তার লক্ষ থাকে। এর ফলে সম্রাটের মনে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করে যে, সে এ সকল কাজ তাঁর পক্ষ থেকেই করছে এবং পর্দার অন্তরাল হতে প্রদত্ত সম্রাটের নির্দেশ অনুসারেই তা নির্বাহ হচ্ছে। সুতরাং সে সর্বদাই সম্রাটের নিদর্শন, পরিচ্ছদ ও উপাধি গ্রহণ থেকে দূরে থাকে এবং তার উপর এরূপ কোনো সন্দেহ আরোপিত হোক, এটা সে কখনো কামনা করে না। কারণ তার অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের রহস্যই হচ্ছে এ যে, সে একে গোপন করে রাখতে পেরেছে এবং এর জন্য সম্রাট স্বয়ং ও সাম্রাজ্যের পূর্বসূরিরা তাঁদের উপর স্থাপিত আবরণ দ্বারা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাকে অভিভাবক নিযুক্ত করায় তা আরো বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি এ অন্যায্য প্রভাবশালী ব্যক্তি যদি এর অতিরিক্ত কিছু করতে যায়, তা হলে সম্রাটের গোত্র ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী তাকে এটা করতে বাধা দিবে এবং তার বিরুদ্ধে সম্রাটের আনুগত্যকেই প্রাধান্য দিবে। কারণ তার জন্য রাজশক্তি লাভের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, যা দিয়ে সে তাদের আনুগত্য ও সমর্থন লাভ করতে পারে। সুতরাং এরূপ চেষ্টার প্রথম স্তরেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আবদুর রহমান ইবনে নাসের[৩৩] ইবনে মনসুর ইবনে আবু আমের এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। সে সম্রাট হিশামের সাম্রাজ্যের অংশীদার হতে চেয়েছিল। তার পিতা

৩৩. রোজেনথালে 'ইবনে নাসের' নেই, পাদটীকায় তা উপাধি হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে; মৃত্যুকাল ৩৯৯ (১০০৯ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

ও ভ্রাতা সাম্রাজ্যের সর্ববিধ কার্য পরিচালনার যে ক্ষমতা লাভে সন্তুষ্ট ছিল, সে সেই পদাংক অনুসরণ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। সে সম্রাটের নিকট সিংহাসনের দাবি করে তাকে ভাবী উত্তরাধিকারী নিযুক্তির চাপ সৃষ্টি করেছিল; সুতরাং তা যদি মারোয়ান ও সমগ্র কোরায়েশ গোত্রের নিকট অসহ্য মনে হল। তারা সম্রাট হিশামের চাচাতো ভাই মুহম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার ইবনে আন্ নাসেরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। এর ফলে ইবনে আমেরীদের সাম্রাজ্যের পতন ঘটল এবং তাদের সম্রাট হিশাম আল মুয়াইয়াদ নিহত হন। তারা তাঁর স্থলে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বংশের কোনো না কোনো ব্যক্তিকে তার শেষ পর্যন্ত স্থলাভিষিক্ত করল এবং সাম্রাজ্যের রীতি রক্ষায় তৎপর হল। আল্লাহ, সর্বাপেক্ষা উত্তম উত্তরাধিকারী।

www.amarboi.org

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজশক্তির তাৎপর্য ও প্রকার বৈচিত্র্য]

রাজশক্তি একটি স্বাভাবিক মানবীয় সংগঠন। কারণ, আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, মানুষের পক্ষে সমাজবদ্ধভাবে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতায় আহার্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ ব্যতীত আত্মরক্ষা ও জীবন-যাপন সম্ভবপর নয়। সুতরাং তাদের সমাজবদ্ধ অবস্থায় পরস্পরের প্রতি ব্যবহার ও অভাব পূরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাদের প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ করে। কারণ প্রাণীর প্রকৃতিই হল পরস্পর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মানবীয় প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অনুসারেই অপরকে প্রতিহত করে থাকে। এভাবে কলহের সূত্রপাত হয়ে যুদ্ধবিগ্রহে পরিণত হয়। এর ফলে অসুবিধা, রক্তপাত ও প্রাণহানি দেখা দেয় এবং পরিণামে মানবজাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অথচ পবিত্র সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে বেঁচে থাকতেই সৃষ্টি করেছেন। এ জন্যই তাদের পরস্পরকে অত্যাচারের কবল থেকে রক্ষাকারী একজন শাসক ব্যতীত অরাজক অবস্থায় তাদের জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ অনিবার্য কারণেই তারা একজন শৃঙ্খলা বিধায়কের মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে এবং ইনিই তাদের শাসক। মানুষের স্বভাবের প্রয়োজনেই শাসককে কঠোর ও নির্দেশকারী হতে হয়।

রাজশক্তির এ রূপ পরিগ্রহের জন্য গোত্রপ্রীতি অপরিহার্য, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। কারণ অধিকার আদায় ও প্রতিরোধ কোনোটাই গোত্রপ্রীতি ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না। পাঠক, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, এ রাজশক্তি একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ পদ। সুতরাং তার জন্য দাবির যেমন অন্ত নেই, তেমনি তাকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রতিরোধেরও প্রয়োজন। অথচ এদের কোনোটিই গোত্রপ্রীতির সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। গোত্রপ্রীতি আবার এক প্রকার নয়। প্রতিটি গোত্রপ্রীতিরই তার বংশ ও জাতির অন্তর্গত অন্যান্য গোত্রপ্রীতির উপর প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব লাভের বেশি থাকে। সুতরাং রাজশক্তি প্রত্যেকটি গোত্রপ্রীতির করায়ত্ত হয় না। বস্তুত রাজশক্তি তারই ভাগ্যে জোটে, যার প্রজাদের উপর প্রভাব বিস্তার, সম্পদ সংগ্রহ, অভিযান প্রেরণ ও সীমান্ত সংরক্ষণের ক্ষমতা আছে এবং যার উপরে অন্য কারো ক্ষমতার হস্ত প্রসারিত নেই। এটাই রাজশক্তির প্রকৃত অর্থ ও সুপরিচিত তাৎপর্য। এ ক্ষেত্রে যদি কারো গোত্রপ্রীতি উপরোক্ত বিষয়ের কতকাংশ পূরণ করতে অক্ষম হয়, যেমন সীমান্ত সংরক্ষণ, রাজকোষ সংগঠন অথবা অভিযান প্রেরণ, তা হলে তার রাজশক্তি যথার্থ অর্থে পূর্ণতা লাভ করেনি।

www.amarboi.org

এ প্রকার অপূর্ণ রাজশক্তি লাভের বহু ঘটনা আগলাবী সম্রাজ্যে কায়রোয়ানের বারবারদের মধ্যে এবং আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে অনারব রাজন্যবর্গের মধ্যে দেখা গেছে।

অনুরূপভাবে যার গোত্রপ্রীতি অন্যান্য গোত্রপ্রীতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে এবং সকল হস্তকে সংকুচিত করতে সমর্থ নয়; বরং তার উপর অন্যের কর্তৃত্ব বিদ্যমান, তেমন রাজশক্তিও অপূর্ণ ও অবিকশিত। এদের উদাহরণ দূরাঞ্চলের আমীর ও সীমান্তের বিভিন্ন সর্দার, যাদেরকে কোনো এক সাম্রাজ্য ছত্রচ্ছায়া দান করে থাকে। বহুদূর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের এরূপ অপূর্ণ রাজশক্তির বাহুল্য দেখা যায়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে দূরাঞ্চলের এ ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে নিজ নিজ জাতির উপর শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন। অধীনে ও অন্যবার উবাইদী সম্রাটদের অধীনে জানাতী গোত্র। বনি আব্বাসদের সাম্রাজ্যে অনারব উবাইদী রাজন্যবর্গও এরূপ এবং ইসলাম পূর্বকালে ফিরিঙ্গী সম্রাটদের অধীনে বারবার আমীর ও রাজন্যবর্গের অবস্থাও তাদের সাথে তুলনীয়। যেমন আলেকজান্ডার ও গ্রিক জাতির অধীনে পারস্যরাজদের অবস্থা। এরূপ আরো বহু উদাহরণ বিদ্যমান। পাঠক, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করলেই তা লাভ করতে পারেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর প্রতাপশালী।[৩৪]

---

৩৪. কোরান ৬, ১৮; ৬১।

www.amarboi.org

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

[অতিরিক্ত কঠোরতা রাজশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর এবং অনেক সময় তার বিলুপ্তির কারণ হয়ে থাকে]

জেনে রাখুন, প্রজাদের কল্যাণ সম্রাটের সত্তা ও দেহের মধ্যে নয়; তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য, মুখচ্ছবির লাবণ্য, বিরাট আকৃতি, ব্যাপক কর্মক্ষমতা, সুন্দর হস্তাক্ষর বা অসাধারণ মেধা কোনোটাই তাদের মনোহরণ করে না। বরং তারা চায় সম্রাট তাদেরই একজন হবেন। কারণ রাজশক্তি ও শাসন ক্ষমতার ব্যাপারটিই এ সম্পর্কজনিত। তা দুটি সম্পর্কীয় পর্যায়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। যথার্থ শাসন ক্ষমতার অর্থ হল সম্রাট প্রজাদের শাসক এবং তাদের সর্ববিধ কার্যের নিয়ামক। সম্রাট তিনিই যাঁর প্রজা আছে এবং প্রজা তারাই যাদের সম্রাট আছেন। বস্তুত প্রজাদের আপনজন হবার এই যে গুণ একেই রাজকীয় ক্ষমতা বলা হয়ে থাকে। এর দ্বারা সম্রাট তাদের শাসক হয়ে ওঠেন। সুতরাং এ ক্ষমতা ও তার অনুসারী গুণাবলি যদি সৎ হয়, তা হলে রাজকীয় শক্তি সর্বতোভাবে সার্থকতা লাভ করে। কারণ এ ক্ষমতা যত সুন্দর ও সৎ ততই প্রজাসাধারণের কল্যাণ। অন্যদিকে এটা অসৎ ও সংকীর্ণ হলে প্রজাদের সমূহ অনিষ্ট ও সর্বনাশ।

রাজকীয় শক্তির সৌন্দর্য হল সহানুভূতি। সম্রাট যদি কঠোরতা ও প্রতাপের অধিকারী হন; মানুষকে শাস্তি দিতে, তাদের গোপনীয়তা নষ্ট করতে এবং তাদের পাপাচারকে খুঁজে দেখতে তৎপর হন, তা হলে তারা ভীত ও অপমানিত হতে থাকে। এর ফলে তারা সম্রাটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মিথ্যা, কৌশল ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এভাবে তাদের বিবেচনা শক্তি ও চরিত্র নষ্ট হয়। অনেক সময় যুদ্ধ ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে। ফলে ইচ্ছাশক্তির অভাবে সহায়তার কাজে বিঘ্ন ঘটে। অনেক সময় তারা একত্র হয়ে সম্রাটকে হত্যার পরিকল্পনা করে। এর ফলে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি সম্রাটের এ প্রকার ব্যবহার ও কঠোরতা স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে গোত্রপ্রীতি সমূলে বিনষ্ট হয়, যেমন পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি এবং পরিণামে সহায়তার অভাবে সাম্রাজ্যের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে যদি সম্রাট তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন, তা হলে তারা তাকে বিশ্বাস করে, তাঁর আশ্রয়ে নিরাপদ বোধ করে, তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপণে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে সর্বদিক দিয়েই সাম্রাজ্য একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়।

www.amarboi.org

রাজকীয় ক্ষমতার অনুসারী গুণাবলির মধ্যে প্রজাদের কল্যাণ কামনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য দিয়েই রাজকীয় শক্তি যথার্থ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর তাদের কল্যাণ কামনা ও তাদের প্রতি সদাচার অর্থে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং তাদের জীবন-যাপনে দৃষ্টি দেয়া বোঝায়। বস্তুত প্রজাদের প্রীতি বর্ধনে এটা একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। পাঠক, জেনে রাখুন, সচেতন ও অতিরিক্ত ধূর্ত শাসকদের মধ্যে সহৃদয়তার প্রবৃত্তি খুব কমই থাকে। এটা অধিকাংশ পাওয়া যায় উদাসীন ও ভাবুক প্রকৃতির শাসকের মধ্যে। সচেতন ব্যক্তিদের সহৃদয়তা কম হওয়ার কারণ এই যে, তাঁরা প্রজাসাধারণ থেকে অধিকতর দূরদর্শী হওয়ার ফলে তাদের উপর এমন বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেন, যা তাদের বোধগম্য নয়। শাসক নিজে কার্যের আরম্ভেই তার পরিণাম জানতে সক্ষম হলেও প্রজাদের উপর তার এ প্রকার দূরদর্শিতা বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং অনেক সময় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্যই হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যকার দুর্বলদের অনুপাতে পদচারণা করো।" এ দিক থেকেই ধর্মপ্রবর্তক শাসকের জন্য অধিক ধূর্ততার পরিচয় দিতে নিষেধ করেছেন। যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ানের[৩৫] ঘটনায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হজরত উমর (রাঃ) তাকে ইরাকের শাসকপদ থেকে বরখাস্ত করলে সে বলেছিল, হে বিশ্বাসীদের নেতা, আপনি কেন আমাকে পদচ্যুত করেছেন? এটা কি কোনোপ্রকার দুর্বলতা অথবা অসততার জন্য? এর উত্তরে উমর বলেছিলেন, আমি তোমাকে এর কোনোটির জন্যই পদচ্যুত করিনি; বরং সাধারণ মানুষের উপর তোমার বুদ্ধির দৌরাত্ম্য আমার ভাল লাগেনি। এটা থেকে এ শিক্ষাই গ্রহণ করা যায় যে, শাসকের পক্ষে যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান ও আমর ইবনে আসের মতো অতিরিক্ত ধূর্ত ও বুদ্ধিমান হওয়া ঠিক নয়। কেননা এতে তার চরিত্রে উৎপীড়ন ও অন্যায্যতার জন্ম হয় এবং এমন অনেক কিছুই অস্তিত্বে আসে যা স্বাভাবিক নয়। গ্রন্থের শেষ দিকে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা উত্তম শাসক।

এ আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হল যে, ধূর্ততা ও বুদ্ধিমত্তা শাসকের জন্য দোষের কারণ। কারণ এতে চিন্তাশক্তির আধিক্য প্রমাণ করে, যেমন নির্বুদ্ধিতা জড়তার ইঙ্গিত দেয়। মানবীয় গুণাবলিতে এ দুটি দিকই দূষণীয়। একমাত্র মধ্য পন্থাই শোভন। যেমন দানের ক্ষেত্রে একদিকে কার্পণ্য অন্যদিকে অপব্যয়। যেমন বীরত্বের ক্ষেত্রে একদিকে দুঃসাহস, অন্যদিকে কাপুরুষতা। এ প্রকার অন্যান্য মানবীয় গুণ। এজন্য অধিক বুদ্ধিমত্তাকে শয়তানের গুণ বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন বলা হয়, সে একজন শয়তান অথবা হবু শয়তান এবং এ প্রকার অনেক কিছু। আল্লাহ্ ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি করেন।[৩৬] তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।

৩৫. ইনি সম্রাট মাবিয়ার সময় কুফার শাসনকর্তা ছিলেন; জীবনকাল ১-৫৩ হি:।

৩৬. কোরান ৩, ৪৭।

www.amarboi.org

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

[খেলাফত ও ইমামতের অর্থ]

যেহেতু রাজশক্তির তাৎপর্য হল মানবজাতির অত্যাবশ্যকীয় সমাজবদ্ধ অবস্থা এবং তার উদ্দেশ্য হল প্রাধান্য বিস্তার ও প্রতাপের প্রতিষ্ঠা, সেজন্য এ দুটি বিষয় অনেক সময় সমাজের জন্য অভিশাপ ও পাশবিকতার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায় এবং সম্রাটের বিধি-নিষেধ সত্য থেকে দূরে সরে যায়। তিনি তাঁর অধীনস্থ লোকদের পার্থিব বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাদের উপর এমন সব উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চাপিয়ে দেন, যা তাদের আনুগত্যের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হওয়ায় তাদের সৃষ্ট অবস্থাও বিচিত্র হয়ে থাকে এবং সর্বসাকুল্য আনুগত্যকে কঠিন করে তোলে। সুতরাং গোত্রপ্রীতির অমোঘ তাড়নায় গোলযোগ ও হত্যাকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে অনিবার্য করুণ পরিণতিকে রোধ করার জন্য এমন কিছু সংখ্যক শাসনবিধি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যকীয়, যা সকলের অনুমোদন লাভ করতে সমর্থ হয় এবং তার প্রতি সর্বজনীন আনুগত্য লাভ সহজ হয়ে ওঠে। যেমন পারসিক ও অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচলিত শাসনবিধি। বস্তুত যখন কোনো সাম্রাজ্য অনুরূপ বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত হয়, তখন তার কার্যাদি সুশৃঙ্খল হয় না এবং তার প্রাধান্য বিস্তারিত পরিপূর্ণতা লাভ করে না। এটাই পূর্বগামীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বিধান।[৩৭]

এ সকল বিধি-নিষেধ যদি বিবেকবান বুদ্ধিমান সাম্রাজ্য প্রধানদের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তা হলে তাকে বিবেকপ্রসূত শাসনবিধি বলা হয় এবং তা যদি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোনো ধর্মপ্রবর্তকের দ্বারা নির্ধারিত ও প্রচলিত হয়, তা হলে তাকে ধর্ম নির্ধারিত শাসনবিধি বলা হয়ে থাকে। বস্তুত এ শেষোক্তটি মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় ক্ষেত্রেই উপকারী হয়ে থাকে। কেননা সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাদের পার্থিব জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ তা হলে সমগ্র ব্যাপারটাই অনর্থক মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এর শেষ পরিণতি শুধু ধ্বংস ও মৃত্যু। এ জন্যই আল্লাহ্‌ বলেন, তোমরা কি এ ধারণা করেছ যে, তোমাদিগকে শুধুই অহেতুক সৃষ্টি করেছি![৩৮] সুতরাং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন পার্থিব জীবনের সৃষ্টি করা, যা তাদের পারলৌকিক মঙ্গল বিধানে সক্ষম হয়। এটাই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথ।[৩৯] এজন্যই ধর্ম মানুষকে তাদের

---

৩৭. কোরান ৩৮, ৩৮; ৬২।

৩৮. কোরান ২৩, ১৫।

৩৯. কোরান ৪২, ৫৩।

www.amarboi.org

ব্যবহারিক ও উপাসনাগত কার্যাদিকে এ পথে পরিচালিত করার জন্য বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করে থাকে। এমন কি মানুষের স্বাভাবিক সমাজবদ্ধ জীবন তথা রাজশক্তিও এর আওতাভুক্ত হয়। যাতে সকল কার্যই ধর্মের পথে পরিচালিত হয়ে পরম শৃঙ্খলা বিধায়কের আয়ত্তাধীনে থাকে।

পূর্বোক্ত শাসনবিধির মধ্যে যা শুধু প্রাধান্য বিস্তার, প্রতাপের প্রতিষ্ঠা ও গোত্রপ্রীতির শক্তিকে যথেচ্ছা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রচিত হয়, তা অত্যাচার ও উৎপীড়নের নামান্তর এবং বিধাতার দৃষ্টিতে ও শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের দিক থেকেও দূষণীয়। অন্যদিকে শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত বিধি-নিষেধও দূষণীয়; কেননা তাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশনার আলোক নেই এবং আল্লাহ্ যাকে কোনো আলোক দেননি, তার আলোক থাকে না।[৪০] কারণ ধর্মপ্রবর্তক তাদের সর্ববিধ বিষয়ে অধিকতর কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞাত। এমনকি তাদের অদৃশ্য পারলৌকিক জীবন সম্পর্কেও। কারণ মানুষের সর্ববিধ কার্য, তা রাজশক্তি বা অন্য যে কোনো বিষয় সংক্রান্ত হোক না কেন, সকলই পরলোকে তাদের নিকট ফিরে আসবে। হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "এটা শুধুই তোমাদের কার্যাবলি, যা তোমাদের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হবে।" অথচ শাসন সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ শুধু পার্থিব জীবনের কল্যাণ বিধানেই সীমিত। তারা শুধু প্রকাশ্য ইহলৌকিক জীবনকেই জানে।[৪১] এজন্য ধর্মপ্রবর্তকের উদ্দেশ্য হল মানুষের পারলৌকিক মঙ্গলবিধান করা এবং এ উদ্দেশ্যেই সকল মানুষকে ধর্মীয় বিধিনিষেধের মাধ্যমে পার্থিব ও অপার্থিব সর্ববিধ কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। এ পরিচালনার দায়িত্ব নবীদের উপর অর্পিত হয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে যাঁরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, তাঁরাই খলিফা বা প্রতিনিধি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পাঠকের নিকট খেলাফতের অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতএব স্বাভাবিক রাজশক্তির উদ্দেশ্য হল সকল মানুষকে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির বিশেষ তাড়নায় পরিচালিত করা, শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বিধিনিষেধের লক্ষ হল সকলকে বিবেকসম্মত পথে পরিচালিত করে পার্থিব জীবনের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করা এবং ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব তথা খেলাফতের উদ্দেশ্য হল মানুষকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সমুদয় পারলৌকিক মঙ্গল ও ইহলৌকিক কল্যাণের দিক দর্শন করা। কারণ তাদের পার্থিব জীবনের সকল কার্যই পরলোকে তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। এজন্য ধর্মপ্রবর্তক সেই পারলৌকিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ রেখেই সমুদয় পার্থিব কার্য নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। সুতরাং খেলাফতের যথার্থ তাৎপর্য হল ধর্মপ্রবর্তকের প্রাতনিধিত্ব করে ধর্মের বিধি-নিষেধ সংরক্ষণ এবং পার্থিব শাসনের প্রতিষ্ঠা করা। পাঠক এ বিষয়টি বুঝে নিন এবং আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত আমাদের পরবর্তী আলোচনায় একে বিবেচনা করুন। আল্লাহ্ যথার্থই বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ।

---

৪০. কোরান ২৪, ৪০।

৪১. কোরান ৩০, ৭।

www.amarboi.org

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

[খেলাফতের পদমর্যাদা ও শতাব্দী সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রচলিত মতপার্থক্য]

ইতিপূর্বে আমরা এ পদমর্যাদার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছি। তা এ যে, ধর্মপ্রবর্তকের প্রতিনিধি হয়ে ধর্মীয় বিধানকে সংরক্ষণ এবং তদনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা। একেই খেলাফত বা ইমামত বলা হয় এবং যিনি এ কার্য সম্পাদন করেন তাঁকে বলা হয় খলিফা বা ইমাম। অবশ্য ইমাম বলতে নামাজের জন্য প্রচলিত ইমামের সঙ্গেই তুলনীয় এবং তাঁর জন্য নির্ধারিত অনুসরণ ও আনুগত্য এস্থলে কাম্য বলে বোঝান হয়। এজন্যই তাঁকে বলা হয় 'মহান ইমাম'[৪২] খলিফা বলতে জাতির জন্য নবীর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধিকে বোঝায়। এটা অনেক সময় শুধু খলিফা এবং রসূলুল্লাহ্‌র খলিফা বলে উল্লেখ হয়। একে আল্লাহ্‌র খলিফা বলার ক্ষেত্রে মতভেদ বিদ্যমান। অনেকের নিকট এটা বৈধ; কেননা সকল মানুষই আল্লাহ্‌র খলিফা। যেমন আল্লাহ্‌তালার বাণীতে আছে, অবশ্যই আমি পৃথিবীর বুকে প্রতিনিধি স্থাপন করতে যাচ্ছি। অন্যত্র তাঁর বাণী, তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন[৪৩] কিন্তু অধিকাংশের মতে এটা ঠিক নয়। কারণ কোরানের শ্লোকের অর্থ অনুরূপ নয়। এজন্যই হজরত আবুবকর (রাঃ)-কে এরূপ সম্বোধন করায় তিনি অস্বীকার করে বলেছিলেন, আমি আল্লাহ্‌র খলিফা নই; বরং রসূলুল্লাহ্‌র খলিফা। তদুপরি প্রতিনিধিত্ব একমাত্র অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে করা যায়। কিন্তু যিনি উপস্থিত আছেন, তাঁর পক্ষ থেকে নয়।

অতঃপর ইমাম বা নেতা নির্ধারণ অবশ্য পালনীয়। কারণ তা সাহাবী ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য করণীয় বলে গৃহীত হয়েছে। এজন্যই হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর তিরোধানের পর তাঁর অনুসারীরা দ্রুত হজরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁদের সর্ববিধ কার্যে দৃষ্টিদানের ক্ষমতা মেনে নিয়েছিলেন। এর পর প্রত্যেক যুগেই এটা সংঘটিত হয়েছে এবং কোনোকালেই মানুষ অশাসক অবস্থায় থাকেনি। এটা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নেতৃত্ব নির্ধারণ সর্বসম্মতিক্রমেই অবশ্য পালনীয়। অনেকে অবশ্য এ মত পোষণ করেন যে, নেতৃত্বের অবশ্যকতার এ ব্যাপারটি বুদ্ধিপ্রসূত এবং এ বিষয়ে সর্বসম্মতি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত মাত্র। তাঁরা বলেন, মানুষের

---

৪২. এর পর নিম্নের এ অনুচ্ছেদটি রোজেনথালে বিদ্যমান।
পরবর্তীকালে ইমামকেই সুলতান বলা হয়। একে ত ইমামতের প্রার্থী অনেক, তদুপরি সময়ের দূরত্বও ব্যাপক। এক্ষেত্রে মানুষও ইমামতির শর্তাদি পালন করে না এবং যে কেউ ক্ষমতা দখল করে মানুষকে অনুগত হতে বাধ্য করে।

৪৩. কোরান ২, ৩০; ৩৬, ১৬৫; ৩৫, ৩৯।

www.amarboi.org

সমাজবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তার জন্যই বুদ্ধি একে অবশ্য পালনীয় করে তুলেছে। কারণ তা ব্যতীত এককভাবে মানুষের পক্ষে সকল প্রয়োজন পূরণ করে জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। আবার এ সমাজবদ্ধতাই মানুষের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়ে থাকে। সুতরাং তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবিধায়ক কোনো শাসকের অস্তিত্ব না থাকলে তারা এ সংঘাত ধ্বংসের সম্মুখীন হবে এবং মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অথচ ধর্মীয় বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতির পরিবর্ধন।

দার্শনিকগণ নবুয়তের আবশ্যকতা সম্পর্কেও উক্তরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে এরূপ যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করেছি। তাঁদের বক্তব্যের একটি দিক এ যে, শৃঙ্খলা বিধান একমাত্র আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই সম্ভব এবং সকলকেই তা বিনাদ্বিধায় বিশ্বাস করতে ও মেনে নিতে হবে এটা ঠিক নয়। কারণ শৃঙ্খলা বিধান রাজশক্তির দাপটে ও ক্ষমতাবানদের প্রতাপের ফলেও সম্ভব হয়ে থাকে; সেখানে ধর্ম অনুপস্থিত। যেমন মজুসী ও অন্যান্য জাতি, যাদের মধ্যে কোনো গ্রন্থ নেই বা যাদের নিকট ধর্মীয় আহ্বান পৌঁছেনি। অথবা বিষয়টি এভাবেও বলতে পারি যে, তাদের মধ্যে বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে কলহের জনক অত্যাচারকে নিষিদ্ধ করে শৃঙ্খলা বিধান করা সম্ভব। সুতরাং তাঁদের ঐ দাবি যে, একমাত্র ধর্মের উপস্থিতিই তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করবে এবং তার দ্বারাই নেতৃত্বের নির্ধারণ সম্ভব হবে, তা ঠিক নয়। বরং তা যেমন ইমামের দ্বারা হতে পারে, তেমনি ক্ষমতাবান আমীরদের দ্বারা অথবা মানুষের পরস্পর সম্মতিক্রমে অন্যায়-অবিচারের মূলোৎপাটন করেও হওয়া সম্ভব। কাজেই এ বক্তব্যে তাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। অতএব সিদ্ধান্ত এটাই যে, নেতৃত্ব নির্ধারণের অবশ্য করণীয় ধর্মের দ্বারাই উপলব্ধ এবং তার উপরেই সর্বসম্মতি বিদ্যমান, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

অবশ্য খুব অল্প সংখ্যক অনেকের এও মত যে, এ নেতৃত্ব নির্ধারণের আদৌ আবশ্যকতা নেই; বুদ্ধির দিক থেকেও নয়, ধর্মের দিক থেকেও নয়। মুতায়িলা সম্প্রদায়ের আল আসম,[৪৪] খারিজী সম্প্রদায়ের অনেকে এবং অন্য অনেক ব্যক্তি উপরোক্ত মত পোষণ করেন। কারণ অবশ্য করণীয় বলতে তাঁরা ধর্মীয় বিধানের প্রবর্তনকে মনে করেন। সুতরাং জাতি যদি ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ প্রবর্তনে ঐকমত্য পোষণ করতে সমর্থ হয়, তা হলে ইমামের প্রয়োজন হয় না এবং তার নির্ধারণও অবশ্যকরণীয় নয়। অবশ্য তাদের এ মত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থিত নয়। রাজশক্তির বিচিত্র অভ্যাস যথা দীর্ঘসূত্রিতা, অন্যায্য প্রভাব, পার্থিব সম্ভোগেচ্ছা প্রভৃতিই তাঁদেরকে অনুরূপ মত পোষণে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কারণ তাঁরা দেখেছেন যে, ধর্মীয় বিধানে এ সকল বিষয়ের সমালোচনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি ভর্ৎসনা বিদ্যমান। সুতরাং তাদের সমুদয়কেই ত্যাগ করার প্রবৃত্তি তাঁদের মধ্যে জেগে উঠেছে।

জেনে রাখুন যে, ধর্ম রাজশক্তির সত্তাকে দূষণীয় এবং তার প্রতিষ্ঠাকে অবাঞ্ছিত মনে করে না। একমাত্র তা থেকে উৎপন্ন অনিষ্টকর প্রতাপ, অবিচার ও বিলাসব্যসনকেই

৪৪. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রথম যুগের বিশিষ্ট জ্ঞানী; জীবনকাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দি।

www.amarboi.org

দূষণীয় বলে জানে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ সকল অনিষ্টকর বিষয় নিন্দনীয় এবং তা রাজশক্তির একান্ত অনুসারী। যেমন ন্যায়পরায়ণতা, সাধুতা, ধর্মের নিদর্শনাদি প্রবর্তন ও তার পথের বাধা অপসারণ প্রভৃতি সম্পর্কে ধর্ম প্রশংসা করেছে এবং তাদের জন্য পুণ্যের ব্যবস্থাও রেখেছে। বস্তুত এগুলোও রাজশক্তির অনুসারী। সুতরাং রাজশক্তির একটি বিশেষ অবস্থার ব্যাপারেই ধর্মীয় নিন্দা রয়েছে সর্বাবস্থার জন্য নয়। এজন্য তার সত্তাকে নিন্দা করেনি এবং তাকে ত্যাগ করতেও বলেনি। যেমন ধর্ম প্রবৃত্তি ও ক্রোধের নিন্দা করেছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে। কারণ তাদেরও প্রয়োজন আছে। বরং এ নিন্দার উদ্দেশ্য এ যে, মানুষ যেন এ দুটি বিষয়কে সত্যের অনুসারী করে তোলে।

হযরত দাউদ ও সালোয়মান (আঃ) এমন বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, যা অন্যদের ছিল না। অথচ তাঁরা উভয়েই নবী এবং আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত ব্যক্তি। অতঃপর তাঁদের উদ্দেশ্যে বলি, আপনাদের এরূপ রাজশক্তি ও ইমাম নির্ধারণের আবশ্যকতা থেকে পলায়ন কোনো কাজেই আসবে না। কারণ আপনারা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ প্রবর্তনের পক্ষপাতী এবং উক্ত ব্যাপারটি কিছুতেই গোত্রপ্রীতি ও প্রতাপ ব্যতীত সম্ভব নয়। আর গোত্রপ্রীতি তার স্বাভাবিক পরিণতিতে রাজশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং ইমাম নির্ধারণ না করলেও রাজ্য প্রতিষ্ঠা অনিবার্য এবং বিষয়টি পরিণামে তাই হল, যা থেকে আপনারা পলায়ন করেছিলেন।

কাজেই এটা যখন প্রমাণিত হল যে, সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম নির্ধারণ অবশ্য পালনীয়, তখন তাকে সামাজিক কর্তব্য[৪৫] বলে গণ্য করতে হবে এবং তার দায়িত্ব সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপর বর্তাবে। তাঁরা ইমাম নির্ধারণ করবেন এবং সাধারণ মানুষ তাঁকে অবশ্য কর্তব্য হিসাবে অনুসরণ করবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে, তাঁর রসূলকে এবং তোমাদের মধ্যে কর্তাব্যক্তিকে অনুসরণ কর।[৪৬]

---

৪৫. মূলে আছে 'ফরজে কেফায়া' অর্থাৎ এমন কর্তব্য যা কিছু সংখ্যক লোক পালন করলে সকলে দায়িত্বমুক্ত হয় এবং না করলে সকলে পাপী হয়।

৪৬. কোরান ৪, ৫৯। এর পর রোজেনথালে কয়েকটি অনুচ্ছেদ বিদ্যমান, যা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে নেই। সম্পূর্ণতার প্রয়োজনে আমরা নিম্নে তার অনুবাদ সন্নিবেশিত করলাম।

অবশ্য একই সময়ে দুইজন ইমামের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন সম্ভব নয়। ধর্মবিদ জ্ঞানীরা হাদিসে উল্লেখিত কতিপয় নির্দেশের ধারা অনুসরণ করে উপরোক্ত মত পোষণ করেন। হাদিসগুলো মুসলিম শরীফের 'কিতাবুল ইমারা' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তাতে এ প্রকার নির্দেশ আছে বলে মনে হয়।

অন্য অনেকের মতে এই নিষেধাজ্ঞা শুধু একই অঞ্চলে দুইজন ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁরা উভয়ে একত্রে অবস্থান করলেও এরূপ হতে পারে। কিন্তু যদি তাঁদের অধীনস্থ অঞ্চলের মধ্যে অত্যধিক দূরত্ব থাকে কিংবা একজনের পক্ষে এত বিস্তৃত অঞ্চল শাসন করা সম্ভব না হয়, তা হলে দুইজনে কোনো অসুবিধা নেই; বরং প্রজাসাধারণের সুবিধার জন্য আরো একজনকে ইমাম হিসাবে নিযুক্ত করা প্রয়োজন।

জ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা উপরোক্ত মত পোষণ করেন, তাঁদের মধ্যে আবু ইসহাক আল ইসফারায়নী, প্রসিদ্ধ ইলমে কালামবিদ এবং 'ইমামুল হারামাইন' আবুল মাআলী আব্দুল মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ্ আল জুয়ায়নী—'কিতাবুল ইরশাদ' নামক গ্রন্থ রচয়িতার নাম উল্লেখযোগ্য আন্দালুস ও মাগরিবের জ্ঞানীদের বক্তব্যেও এটা প্রকাশ পায় যে, তাঁরা এ মত পোষণ করেন। আন্দালুসের বহু সংখ্যক ধর্মজ্ঞানী উমাইয়া সম্রাটদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং উমাইয়া সম্রাট আবদুর রহমান

www.amarboi.org

এ পদমর্যাদার শর্ত হল চারটি। জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা, যোগ্যতা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সম্পূর্ণতা যাতে কর্ম সম্পাদনে ও মতামত প্রদানে প্রভাবশালী হতে পারে। পঞ্চম একটি শর্ত সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। তা হল কোরায়েশ বংশীয় হওয়া।

জ্ঞানের শর্তটিত খুবই সুস্পষ্ট ব্যাপার। একমাত্র জ্ঞানীর পক্ষেই আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করা সম্ভব। যে তা জানে না, তার জন্য এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া ঠিক নয়। তদুপরি শুধু জ্ঞানী হলেই চলবে না, তাকে গবেষক হতে হবে। কারণ এ ব্যাপারে অন্যের অনুসরণ করা ক্রটির ব্যাপার। অথচ ইমামতের দাবি হল সর্বাবস্থা ও সর্বগুণের পরিপূর্ণতা।

ন্যায়পরায়ণতার শর্ত এ কারণে যে এ পদমর্যাদাটি ধর্মীয় ব্যাপার এবং যেহেতু অন্যান্য পদমর্যাদাতেও এ গুণটিকে শর্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়, সুতরাং ধর্মীয় ব্যাপারে তা অধিকতর প্রযোজ্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম ও অনুরূপ বিষয়াদি সম্পাদন দ্বারা এ গুণে নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কোনোপ্রকার মতভেদ নেই। অবশ্য অভিনব মতবাদ পোষণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য বিদ্যমান।

যোগ্যতার শর্তটি এ জন্য যে, ইমাম শাস্তিবিধানে পারঙ্গম, যুদ্ধাদি পরিচালনায় সক্ষম ও তৎসম্পর্কে দূরদর্শিতার অধিকারী এবং মানুষকে এ ব্যাপারে নিয়োজিত করতে দায়িত্বশীল হবেন। গোত্রপ্রীতি সম্পর্কে অবহিত ও তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তন সম্বন্ধে অনুভবকারী এবং শাসন পরিচালনায় তার সাহায্য গ্রহণে সমর্থ হবেন যাতে তার সহায়তায় তিনি ধর্মের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হতে পারেন। শত্রুনিপাতে, বিধি-নিষেধ প্রবর্তনে ও কল্যাণ প্রচেষ্টায় তিনি তৎপর হবেন।

আন্নাসেরকে ও তার বংশাবলিকে 'আমীরুল মুমেনীন' উপাধি দান করেছেন। এ উপাধিটি খেলাফতের একটি চিহ্ন, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব। কিছুকাল পরে মাগরিবের আলমোহেদরাও অনুরূপ কাজ করেছেন।

অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বসম্মত মতের উল্লেখ করে দুই ইমামের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এই সর্বসম্মত মতের উল্লেখ কোনোপ্রকার প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। কারণ তথায় তেমন যোগ্য কিছু থাকলে উস্তাদ আবু ইসহাক ইসফারায়নী ও ইমামুল হারামাইন তার বিরোধিতা করতেন না। কারণ তাঁরা অন্য যে কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা এই বিষয়ে অধিকতর জ্ঞাত। ইমাম আল মাজারী ও আননাওয়াই অবশ্য হাদিসের মর্মানুসারে তাঁদের উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন। বর্তমানকালের অনেক বিদ্বান ব্যক্তি এই ইমামের ব্যাপারটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের যুক্তির ভিত্তি হল কোরানে উল্লেখিত দুই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। যেমন বলা হয়েছে, তাতে যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য থাকত, তা হলে আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। অবশ্য এই আয়াত হতে এ ধরনের কোনো যুক্তি বের করা সম্ভব নয়। কারণ তার এ যদি বিশিষ্ট বক্তব্যের সমস্তটাই একটা ধারণা মাত্র। আল্লাহ্ আমাদিগকে এই ধরনের একটি ব্যাপারের সম্ভাব্যতা বিচার করে দেখতে বলেছেন মাত্র, যাতে তার ফলাফল হতে তাঁর একত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হতে পারে। অথচ আমরা যা চাই, তার ক্ষেত্র একান্ত বাস্তব ইমামত। কেন একজন ইমামের স্থলে দুইজন হওয়া নিষিদ্ধ। তাই বাস্তব ভিত্তিতে খুঁজে দেখতে হবে। সুতরাং বিষয়টি সম্পূর্ণ ধর্মীয় বিধিবিধান ও বিচার-বিবেচনার অন্তর্গত। এই দিক হতে উপরোক্ত কোরানের আয়াতে সরাসরি কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আমরা এরূপ একটি বাস্তব ধারণার সৃষ্টি করব যে, দুইজনের উপস্থিতি ধ্বংসাত্মক কার্যাদির জন্ম দিবে এবং এটা হতে সিদ্ধান্ত করব যে, আমরা এমন কিছু গ্রহণ করতে পারি না, যা ধ্বংসাত্মক পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে। শুধু এরূপ ধারণার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হলেই তা হতে যুক্তি গ্রহণ করা যেতে পারে। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা।

www.amarboi.org

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সম্পূর্ণতার ব্যাপারটি এ যে, এগুলো ত্রুটিপূর্ণ বা অক্ষম হবে না। যেমন—উন্মত্ততা, অন্ধত্ব, বধিরত্ব ও বাক্হীনতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে কার্যক্ষমতার অনুপযোগী হওয়া। যেমন—দুই হাত, দুই পা ও অণ্ডকোষবিহীন হওয়া। এ কারণেই সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণতা শর্ত হিসাবে আরোপ করা হয়েছে, যাতে তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। অন্যদিকে তা কার্যের অসুবিধা না হলেও দেখতে কুৎসিত, যেমন এ সকল ইন্দ্রিয়াদি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে কোনো একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া। সুতরাং এক্ষেত্রে সম্পূর্ণতার অর্থ সব কিছুই যথাযথভাবে থাকা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাবে কার্যাদি সম্পাদনে যে অসুবিধা দেখা দেয়, তা দুই প্রকার। এক প্রকারের সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বস্থানে থাকা সত্ত্বেও অক্ষম হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তা অঙ্গহীনতার মতোই অসুবিধার সৃষ্টি করে। যেমন বন্দী হয়ে বা অনুরূপভাবে আবদ্ধ থেকে স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশে অক্ষম হওয়া। অন্য প্রকারে এ ধরনের কিছু হয় না বটে তবে তাতেও অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন ইমামের সহায়ক কোনো ব্যক্তির তাঁর উপর প্রভাবশালী হওয়া। কোনো প্রকার অন্যায্য ও গর্হিত কিছু না করেও সে এভাবে তাঁকে অক্ষম করে ফেলতে পারে। এতে সকলের দৃষ্টি ঐ প্রভাব বিস্তারকারীর উপর পড়বে। সে যদি ধর্ম, ন্যায়পরাণতা ও শাসনের ব্যাপারে সততা ও নিষ্ঠা দেখাতে পারে, তা হলে তার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে না। নতুবা মুসলমানরা যেমন কোনো ব্যক্তির অনুসন্ধান করবে, যিনি তার কবল থেকে ইমামকে উদ্ধার করতে পারেন এবং তাঁর ত্রুটি দূর করতে সক্ষম হন। এর ফলে খলিফার দায়িত্ব পালন পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠবে।

কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কে বক্তব্য এ যে, সকিফা দিবসে[৪৭] সাহাবীরা এ বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ঐদিন আনসারগণ সাদ ইবনে উবাদার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে উদ্যোগী হয়ে বলেছিলেন, "আমাদের মধ্য থেকে একজন সর্দার এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন সর্দার হবে।" কোরায়েশগণ তখন হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর এ বাণী—'ইমামগণ কোরায়েশদের মধ্য থেকে হবে'—এর দ্বারা উপরোক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁরা আরো বলেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে উপকারকারীদের উপকার করতে এবং তাদের প্রতি অসদাচরণ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি সর্দারী তোমাদের মধ্যেই থাকবে, তা হলে তিনি অন্তিম উপদেশে এ নির্দেশ দিতেন না। এভাবে তাঁরা আনসারগণকে যুক্তি-প্রমাণে সম্মত করিয়ে তাঁদের সেই প্রস্তাব—'আমাদের মধ্যে একজন সর্দার ও তোমাদের মধ্যে একজন সর্দার তা থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁরাও এ উদ্দেশ্যে সাদের প্রতি

৪৭. হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর তিরোধানের অব্যবহিত পরেই নেতৃত্বের প্রশ্নে সাহাবীরা বনু সাইদ গোত্রের দরবার কক্ষে সমবেত হন এবং সেইখানেই আনসারগণ উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই ক্ষেত্রে হজরত আবু বকর (রাঃ) কোরায়েশদের ইমামতের বাণীটি প্রথম উদ্ধৃত করেন এবং বহু বাকবিতণ্ডার পর হজরত উমর (রাঃ) অগ্রসর হয়ে হজরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে সকলকে আহ্বান জানালে এ বিতর্কের অবসান ঘটে। সকিফা শব্দের অর্থ দরবারকক্ষ। এই ঘটনার জন্য এটা সকিফা দিবস নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

www.amarboi.org

আনুগত্য থেকে ফিরে এসেছিলেন।' বিশুদ্ধ হাদিসে আরো প্রমাণ আছে যে, এ বিষয়টি সর্বদাই কোরায়েশের কোনো গোত্রে অবস্থান করবে।[৪৮] এ প্রকার প্রমাণ অসংখ্য।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, যখন কোরায়েশদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল, তাদের গোত্রপ্রীতি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল এবং তারা বিলাসব্যসন ও প্রাচুর্যে নিমজ্জিত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র সাম্রাজ্য লিপ্সায় ছড়িয়ে পড়ল, তখন তাদের পক্ষে খেলাফতের দায়িত্ব বহন করার আর শক্তি রইল না। সুতরাং তাদের উপর অনারবরা প্রাধান্য বিস্তার করে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসল। এ বিষয়টি বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে সন্দেহে ফেলেছে এবং তাঁরা কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার শর্তটিকে বাতিল করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর এ বাণীর—তোমাদের উপর যদি মুনাক্কার ন্যায় মাথাবিশিষ্ট একজন হাবশী ক্রীতদাসকে শাসক নিয়োজিত করা হয়, তা হলেও তার কথা শোন ও অনুগত হও।"[৪৯] তার ব্যবহার্য গ্রহণ করে প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। বস্তুত এ হাদীস দ্বারা এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ উপস্থিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এটা উদাহরণ থাকার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

যেমন হজরত উমর (রাঃ) বলেছেন, হুজারফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম যদি জীবিত থাকত আমি তাকে শাসক নিযুক্ত করতাম। অথবা তার সম্পর্কে আমার কোনো আপত্তি থাকত না। এ উক্তি দ্বারাও প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কারণ এটা সকলেরই জানা যে, সাহাবীর মত ও পথ দ্বারা কোনোকিছু প্রমাণ করা যায় না। তদুপরি কোনো জাতির মুক্ত ক্রীতদাস তাদেরই অন্তর্গত। এ দিক থেকে কোরায়েশের সাথে গোত্রপ্রীতিতে সালেমের সম্পর্ক বিদ্যমান। বংশ বিশেষের শর্ত আরোপ করার এটাই উপকারিতা। এ কারণে হজরত উমর (রাঃ) যখন খেলাফতের বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হলেন এবং তাঁর ধারণা মতে তার শর্তাদি নিবষ্ট হওয়ার পথ বলে মনে হল, তখন তিনি সালেমের উদাহরণ উপস্থিত করলেন। কারণ, তাঁর মতে সালেমের মধ্যে এ সকল শর্তের পূর্ণতা বিরাজমান ছিল। এমন কি এ প্রসঙ্গে তিনি বংশের কথাও উল্লেখ করলেন। কারণ গোত্রপ্রীতির ক্ষেত্রে এ বংশের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব। অবশ্য সালেমের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য কোনো বংশমর্যাদা ছিল না। কিন্তু হজরত উমর একে জরুরি মনে করেননি। কারণ বংশধারার তাৎপর্য তার গোত্রপ্রীতির মধ্যে নিহিত এবং তা এখানে আশ্রিত পোষ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং তার উদাহরণ তুলে ধরে হজরত উমর (রাঃ) মুসলমানদেরকে এমন ব্যক্তি নিয়োগ ও তার আনুগত্যের প্রতি উৎসাহী করেছেন, যার উপর কোনো দুর্নাম আরোপিত কিংবা যার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত না হয়।

কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার শর্তটি অস্বীকারকারীদের মধ্যে কাজী আবু বকর বাকেল্লানী অন্যতম। তিনি কোরায়েশদের গোত্রপ্রীতি বিনষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হতে দেখে এবং তাদের উপর অনারব রাজন্যবর্গের ঘটনা লক্ষ করে কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার শর্তটি

---

৪৮. বোখারী ও অন্যান্য হাদিস সংকলন দ্র:।

৪৯. উক্ত হাদিস অনুসারে খারেজী সম্প্রদায়ের চরম মতও প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলমুত্তাকী রচিত 'কান্‌জুল উম্মাল' দ্র:।

www.amarboi.org

বিলোপ করে দিয়েছেন। যদিও এটা বাহ্যত খারিজীদের মতের অনুরূপ, তথাপি তাঁর সমকালীন যুগে তাদের অবস্থা দেখে তিনি এরূপ উক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন, অধিকাংশ অবশ্য সেই শর্তের অনুকূলে রয়ে গেছেন এবং কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার মধ্যে কোনো অসুবিধা দেখেননি। এমন কি তারা যদি মুসলমানদের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তথাপি। এ মতের বিরোধিতা করে বলা হয়েছে যে, তা হলে যোগ্যতার শর্ত অপূর্ণ থাকবে যা দিয়ে তিনি কার্য সম্পাদনের শক্তি পেয়ে থাকেন। কারণ গোত্রপ্রীতির মহিমা নষ্ট হয়ে গেলে কার্য নির্বাহের ক্ষমতাও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হবে। এভাবে যোগ্যতার অভাব দেখা দিলে তা জ্ঞান ও ধর্মের ক্ষেত্রেও সংক্রমিত হবে। এভাবে একের পর এক শর্তগুলো লোপ পেতে থাকলে সমগ্র বিষয়টিই সর্বসম্মত মতের বিরোধী হয়ে উঠবে।

আমরা এখন বংশমর্যাদাকে শর্ত হিসাবে গ্রহণ করা সম্পর্কে কথা বলব, যাতে উক্ত মতের মধ্যকার শুদ্ধ যুক্তির তাৎপর্য উদঘাটিত হয়ে পড়ে। সুতরাং আমাদের বক্তব্য এ যে, ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতিটির জন্যই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্দেশ এবং তার প্রবর্তনার বিষয়টি থাকতে হবে। আমরা যখন কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার শর্ত আরোপ এবং এ সম্পর্কে ধর্মপ্রবর্তকের উদ্দেশ্য আলোচনা করতে বসি, তখন তাকে সুপরিচিত ধারণা অনুসারে শুধুমাত্র নবী বংশের মর্যাদার সাথে যুক্ত হওয়ার উপলক্ষ বলে ক্ষান্ত হতে পারি না। যদিও উক্ত বংশের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মধ্যে পুণ্যলাভের ব্যাপার আছে, তথাপি পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে এটাই ধর্মীয় বিধানের উদ্দেশ্য হতে পারে না। সুতরাং বংশমর্যাদার শর্তের জন্য অবশ্যই একটি উপযোগিতা বিদ্যমান, যাকে সম্মুখে রেখে এ বিধান দেয়া হয়েছে। আমরা যখন এ ব্যাপারে গভীরভাবে তলিয়ে দেখি, অনুসন্ধান করি, তখন এটাই দেখতে পাই যে, এ শর্ত আরোপের একমাত্র উদ্দেশ্য হল গোত্রপ্রীতি, যা দিয়ে সহায়তা ও অধিকার আদায় সম্ভব হয়ে থাকে। এ শক্তি যার আছে, তিনি স্বয়ং পদমর্যাদার অধিকারী হলে কোনো প্রকার মতভেদ ও দলাদলি থাকে না, জাতি ও বংশ তাঁর আশ্রয়ে নিরাপত্তা বোধ করে এবং সম্প্রীতির রজ্জু সকলকে একত্রে বেঁধে তুলতে পারে। বস্তুত কোরায়েশ মুজারের গোত্রপ্রীতির অধিকারী, তাদের ভিত্তি, এক প্রভাবশালী গোত্র ছিল। সমগ্র মুজারের উপর তারা বিশিষ্ট মর্যাদা, গোত্রপ্রীতি ও প্রাধান্যের অধিকারী ছিল। সমগ্র আরব তাদের এ মর্যাদাকে স্বীকার করত এবং তাদের প্রাধান্যকে মেনে নিত। কোরায়েশ ব্যতীত অন্যরা যদি নেতৃত্বের ভার নিত, তা হলে মতভেদ দেখা দিত এবং আনুগত্যের অভাব পড়ত। তারা ব্যতীত মুজারের অন্য কোনো গোত্র তাদের এ মতভেদ দূর করতে ও তাদেরকে এক সূত্রে আবদ্ধ করতে সমর্থ হত না। এর ফলে মতানৈক্য দেখা দিত এবং সমাজবদ্ধ জীবন ভেঙে পড়ত। ধর্মপ্রবর্তকের এটা কাম্য নয়, বরং তিনি তাদের মধ্যে ঐক্যের প্রতি লালায়িত এবং তাদের মধ্যে মতানৈক্য ও কলহ দূর করতে ইচ্ছুক। যাতে তাদের সংযোগ বৃদ্ধি পায়, গোত্রপ্রীতি দেখা দেয় এবং পরস্পর সহায়তার উদ্যোগ দেখা দেয়। একমাত্র কোরায়েশের পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল। কারণ তারা তাদের প্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা মানুষকে ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করতে সমর্থ। এর ফলে কেউ তাদের বিরোধিতা করতে ও তাদের কথা অমান্য করতে সাহস পেত না। কারণ তারা তৎক্ষণাৎ তা দূর

www.amarboi.org

করে মানুষকে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হত। এজন্য খেলাফতের ব্যাপারে কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছিল।

বস্তুত কোরায়েশ অত্যন্ত শক্তিশালী গোত্রপ্রীতির অধিকারী ছিল। সুতরাং তাদের হাতেই জাতির শৃঙ্খলা বিধান ও মতৈক্য সৃষ্টির ভার দেয়া হয়েছিল। কারণ তারা যখন নিজেদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করল তখন সমগ্র মুজার ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হল এবং সমগ্র আরব আনুগত্য নিয়ে এগিয়ে এল। তাদেরকে অনুসরণ করে অন্যান্য সকল জাতি মুসলমানদের নির্দেশ মানতে বাধ্য হল এবং তাদের সৈন্যদল পৃথিবীর দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে বিজয়াভিযানের ইতিহাস রচনা করল। এর পরও এ অভিযান দুটি সাম্রাজ্যের জন্ম দিয়ে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসল এবং আরবের গোত্রপ্রীতি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। যে কোনো ব্যক্তি আরবজাতির ইতিহাস ও তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে চিন্তা করবেন তার পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, মুজারের সকল গোত্রের মধ্যে কোরায়েশদের প্রভাব-প্রীতিপত্তি কত বেশি ছিল। ইবনে ইসহাক তাঁর চরিত্র গ্রন্থ প্রভৃতিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

যখন এটা স্থিরীকৃত হল যে, কোরায়েশ বংশের শর্ত আরোপ, তাদের গোত্রপ্রীতি ও প্রাধান্যের দ্বারা সর্ববিধ কলহ দূর করার জন্যই করা হয়েছিল, তখন তা থেকে আমরা এ কথাও জানতে পারলাম যে, বিধিপ্রণেতা এ নির্দেশাবলি বিশেষ কোনো গোত্র, কাল বা জাতিকে লক্ষ করে প্রদান করেননি। আরো জানতে পারলাম যে, তা একান্তই যোগ্যতার ব্যাপার; সুতরাং তাকে আমরা যোগ্যতা হিসাবেই গণ্য করব এবং তা থেকে সর্বজনীন কারণটি বের করে নেব—তা আর কিছুই নয় গোত্রপ্রীতি। এর ফলে আমরা এ শর্ত আরোপ করব যে, মুসলমানদের শাসনের দায়িত্ব তারাই গ্রহণ করবে, যারা নিজকালে ও পরিবেশে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী গোত্রপ্রীতি ও প্রাধান্য শক্তির অধিকারী। যাতে তাদের প্রভাবে সকলের আনুগত্য কেন্দ্রীভূত হয় এবং সকলের মধ্যে মতৈক্য গড়ে ওঠে। অবশ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও কোরায়েশদের ন্যায় এ শক্তি অন্য কারো আছে বলে জানা যায় না। কারণ তাদের ধর্মের আহ্বান ছিল সর্বজনীন এবং তাদের গোত্রপ্রীতির শক্তি ছিল পরিপূর্ণ। এ জন্যই সকল জাতির আনুগত্য তারা সহজেই লাভ করেছিল।

এ যুগে উক্ত ব্যাপারটি এমন প্রত্যেক জাতির জন্য সম্ভব, যাদের মধ্যে একটি প্রভাবশালী গোত্রপ্রীতি বিদ্যমান। যদি কেউ খেলাফত সম্পর্কে আল্লাহ্র বিশেষ উদ্দেশ্যকে অনুসন্ধান করে, তা হলে তার পক্ষে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ পবিত্র আল্লাহ্ এ খেলাফত তাঁর পক্ষ থেকে এজন্যই প্রদান করেছেন, যাতে তদ্দারা বান্দাদের বিষয়াদি সুশৃঙ্খলভাবে নিষ্পন্ন হয় এবং তাদেরকে অকল্যাণ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়। খলিফার প্রতি আল্লাহ্র এটাই নির্দেশ এবং তিনি এমন ব্যক্তিকেই এ নির্দেশ দিবেন, যার এ দায়িত্ব পালনের শক্তি আছে। পাঠক, আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, ইমাম ইবনুল খাতিব[৫০] স্ত্রী জাতি সম্পর্কে কী বলেছেন। তিনি বলেছেন যে অধিকাংশ

৫০. ইবনে উমর, জীবনকাল ৫৪৩/৪৪-৬০৬ (১১৪৯/৫০-১২০৯ খ্রি.) হি:। সাধারণভাবে ফখরুদ্দিন ইমাম রাজী নামে পরিচিত।

www.amarboi.org

ধর্মীয় বিধানেই স্ত্রীলোকদেরকে পুরুষের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশের অধীন করে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেয়া হয়নি; বরং অনুমানের দ্বারাই তা থেকে তাদের প্রতি প্রযোজ্য নির্দেশ বের করতে হয়। এর কারণ এ যে, স্ত্রীলোকেরা কোনো ব্যাপারেই প্রধান বলে স্বীকৃত নয়; বরং সর্বত্র পুরুষ তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। অবশ্য উপাসনার ক্ষেত্রে এরূপ নয়। কারণ সেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ নির্দেশের অধীন, অনুমানের ব্যাপার নয়। কারণ উক্ত ব্যাপারে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল।

তদুপরি এ ব্যাপারে বাস্তব অবস্থাই যথেষ্ট সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। কারণ কারো পক্ষেই সে ব্যক্তি বা গোত্র যাই হোক না কেন, প্রাধান্য বিস্তার ব্যতীত দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। বস্তুত ধর্মীয় বিধান খুব কমই বাস্তব অবস্থার বিরোধী হয়ে থাকে। আল্লাহ উন্নত ও সর্বজ্ঞ।

www.amarboi.org

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

[ইমামত সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতামত]

জেনে রাখুন, শিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ সহচর ও অনুসারী। প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মশাস্ত্রবিদ ও ইলমে কালামবিদদের নিকট এটা হজরত আলী (রাঃ) ও তাঁর পুত্র পৌত্রাদির অনুসারীদের নাম হিসাবে পরিচিত। তাঁদের সকলের মতে শিয়াদের মতাদর্শ হল, ইমামত সর্বশ্রেণী মানুষের কল্যাণ সাধনের কোনো ব্যাপার নয়, যা জাতির দৃষ্টিদানের অন্তর্গত হবে এবং তাদের নির্ধারণের মাধ্যমে উক্ত দায়িত্ব অর্পিত হবে। বরং তা ধর্মের অঙ্গ এবং ইসলামের পরিচালক শক্তি। কোনো নবীর পক্ষেই এ সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব নয় এবং জাতির উপর তার ভার দেয়া উচিত নয়। বরং তাঁর উপরে জাতির জন্য ইমাম নির্ধারণ করে দেয়া অবশ্য কর্তব্য। সেই ইমাম সর্বপ্রকার ছোটবড় পাপ থেকে পবিত্র হবেন।

বস্তুত হজরত আলী (রাঃ) সেই ইমাম, যাঁকে হজরত মুহম্মদ (সঃ) নির্দিষ্ট করে দিয়ে গিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তারা বিশেষ দলিল প্রমাণ ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে থাকে; এ সকল প্রমাণ ধর্মতত্ত্ববিদ ও ধর্মীয় বিধান বর্ণনাকারীদের নিকট সুপরিচিত নয়। বরং এদের অধিকাংশই মিথ্যা ও সূত্রানুযায়ী দুর্বল কিংবা তাদের অপব্যাখ্যার দরুন সম্পূর্ণ অবাস্তব। এ প্রমাণাদি তাদের নিকট দুইভাগে বিভক্ত—একভাগ প্রকাশ্য ও অন্যভাগ গুপ্ত। প্রকাশ্য প্রমাণ যেমন হজরতের বাণী, 'আমি যার কর্তা, আলীও তার কর্তা।' তারা বলে, এ কর্তৃত্ব আলী ব্যতীত অন্য কাউকেও দেয়া হয়নি। এজন্যই হজরত উমর (রাঃ) তাঁকে বলেছিলেন, "আপনিত প্রত্যেক বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনীর কর্তা হয়ে গেলেন।" হজরতের অন্য একটি বাণী, "তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ন্যায়বিচারক আলী।" ইমামতের অর্থও এভাবে আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ জারি করার মধ্যদিয়ে ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা করা। আর এটাই আল্লাহ্‌র বাণীতে উল্লেখিত কর্তৃত্বের অর্থ, যার প্রতি আনুগত্য অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং তোমাদের মধ্যে কর্তাব্যক্তির অনুগত হও।"[৫১] এজন্য একমাত্র আলীই 'সকিফা' দিবসের গোলযোগে ন্যায়বিচারের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছিল। এ প্রমাণের মধ্যে আরো একটি, হজরত বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রাণপণ করে আমার আনুগত্য স্বীকার করবে, সেই আমার পরে আমার উত্তরাধিকারী ও কর্মকর্তা হবে।" হজরতের প্রতি আলী ব্যতীত অন্য কেউ অনুরূপভাবে আনুগত্য প্রকাশ করেনি।

---

৫১. কোরান ৪, ৫৯।

www.amarboi.org

তাদের গুপ্ত প্রমাণ এ যে, কোরানের সূরা 'বারাআত' অবতীর্ণ হলে হজরত মুহম্মদ (সঃ) আলীকে তা পাঠ করে শুনানোর জন্য হজ্জের মৌসুমে মক্কাতে পাঠান। ইতিপূর্বে তিনি এ ব্যাপারে আবু বকরকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু ওহীর দ্বারা নির্দেশ আসে যে, তোমার কোনো ব্যক্তি অথবা তোমার জাতির কোনো ব্যক্তিকে এ কাজে পাঠাও। সুতরাং তিনি আলীকে পাঠক ও প্রচারক রূপে প্রেরণ করেন। তারা বলে, তাতে আলীর প্রাধান্য নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হচ্ছে। তদুপরি তিনি আলীর উপর কাউকেও প্রাধান্য দিয়েছেন এমন কথা জানা যায় না। বরং আবু বকর ও উমরের উপর দুটি যুদ্ধাভিযানে যথাক্রমে উসামা ইবনে সায়েদ ও আমর ইবনেল আসকে[৫২] প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ সকল ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি আলীকেই খেলাফতের জন্য মনোনীত করেছিলেন, অন্যকে নয়। এ প্রসঙ্গে আরো এমন প্রমাণ বিদ্যমান, যা সুপরিচিত নয় এবং অন্য আরো কিছু প্রমাণ বিদ্যমান, যা তাদের ব্যাখ্যার দরুন সম্পূর্ণ অবাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অতঃপর তাদের মধ্যে একদলের মত হল এ যে, এ সকল প্রমাণ আলীর ব্যক্তিগত সত্তার মনোনয়নের উপর সাক্ষ্যদান করে এবং এভাবে তা তাঁর পরবর্তী বংশধরদের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তেছে। এ দলকে বলা হয় 'ইমামিয়া।' তারা প্রথম দুই খলিফা সম্পর্কে ক্রটির কথা বলে। যেহেতু তারা উপরোক্ত প্রমাণাদি অনুসারে আলীকে অগ্রাধিকার দেননি এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেননি, সুতরাং তারা তাঁদের খেলাফতকে কোনো প্রকার গুরুত্বই দেয় না। এ সকল গোঁড়া শিয়ার উক্ত দুই খলিফার প্রতি উচ্চারিত জঘন্য উক্তির দিকে লক্ষ করার প্রয়োজন নেই। কারণ তা আমাদের নিকট ও তাদের নিকট সমভাবে পরিত্যাজ্য।

তাদের মধ্যে অন্য একদলের মত হল, উপরোক্ত প্রমাণাদি গুণের দিকে লক্ষ রেখেই আলীকে মনোনীত করার যোগ্য বিবেচনা করেছিল, ব্যক্তিসত্তার দিক থেকে নয়। মানুষ এ গুণাবলিকে যথাস্থানে মর্যাদা না দেয়ার জন্যই ক্রটির অধিকারী হয়েছে। এ দলকে বলা হয় 'যায়দিয়া'। তারা আলীকে শ্রেষ্ঠ বলা সত্ত্বেও প্রথম দুই খলিফাকে ক্রটিপূর্ণ অথবা তাঁদের খেলাফতকে অগুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। বরং তারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও অশ্রেষ্ঠের খলিফা হওয়াকে সিদ্ধ বলে মত পোষণ করে।

অতঃপর এ শিয়া সম্প্রদায় হজরত আলীর পরবর্তীদের মধ্যে খেলাফতের উত্তরাধিকার সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে মতানৈক্যের অধীন হয়ে পড়েছে। তাদের অনেকেই একে হজরত ফাতেমার সন্তানদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে অকাট্যভাবে বর্তাবার পক্ষপাতী, যেমন পরে বর্ণিত হবে। এদেরকেই 'ইমামিয়া' বলা হয়। কারণ তারা ঈমানের শর্ত হিসাবে এ ইমামকে জানা ও নির্ধাতি করার মত পোষণ করে। বস্তুত এটাই তাদের নিকট ধর্মীয় কার্যাদির মূল ভিত্তি। আবার তাদের মধ্যে অনেকেই হজরত ফাতেমার সন্তানদের মধ্যে যোগ্যতার বিচারে ইমাম নির্ধারণের পক্ষপাতী। তাদের মতে ইমামকে অবশ্যই জ্ঞানী, ধর্মভীরু, দাতা, সাহসী ও তাঁর ইমামতের প্রতি আহ্বানকারী হতে হবে। এ মতবাদ পোষণকারী ব্যক্তির নাম অনুসারে তাদেরকে 'যায়দিয়া' বলা হয়। ইনি

৫২. হজরতের তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে উমামাকে একটি অভিযানের নেতা নিযুক্ত করেন, যা হজরত আবুবকর প্রথম পালন করেন এবং 'খাতুস সালামিল' অভিযানে আমার নেতা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

www.amarboi.org

হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইনের পুত্র আলীর পুত্র যায়েদ। ইনি তাঁর ভাই বাকেরকে ইমামের বিদ্রোহী হওয়ার শর্তে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলে শেষোক্ত জন তাঁকে এ বলে নিরস্ত্র করেছিলেন যে, এ দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁদের উভয়ের পিতা আলী জয়নুল আবেদীনও ইমাম ছিলেন না। কারণ তিনিও বিদ্রোহ করেননি এবং বিদ্রোহের উৎসাহও দেননি। অবশ্য এ বিদ্রোহী মতবাদ ছাড়াও যায়েদকে শিয়ারা মুতাজিলা সম্প্রদায়ের লোক বলে দোষারোপ করত। তিনি নাকি ওয়াসিল ইবনে আতার কাছ থেকে এ ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে ইমামিয়া সম্প্রদায় যখন যায়েদের সাথে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে দেখতে পেল যে, ইনি প্রথম দুই খলিফার ইমামতকে মন্দ বলেন না এবং তাঁদের এতে কোনো ত্রুটি দেখেন না, তখন তারা তাঁকে পরিত্যাগ করল এবং ইমামদের মধ্যে গণ্য করা থেকে বিরত রইল। এজন্য তাদেরকে বলা হয় 'রাফেজী' বা পরিত্যাগকারী।

তাদের মধ্যে অন্য একদল মতভেদ সত্ত্বেও হজরত আলী ও তৎপুত্রদ্বয় হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর দৌহিত্রের পর তাঁদের ভাই মুহম্মদ ইবনেল হানাফিয়া এবং তাঁর পরে তাঁর সন্তানদের মধ্যে ইমামত বর্তাবার দাবি করে। তাদেরকে হজরত আলীর আশ্রিত পোষ্য কায়সানের নাম অনুসারে 'কায়সানিয়া' বলা হয়। এ সকল দলের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।

এদের মধ্যে এমন একদল বিদ্যমান, যাদেরকে চরমপন্থী বলা হয়। তাদের ধারণা বুদ্ধি ও বিশ্বাসের সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। তারা এ সকল ইমামের ঐশ্বরিক সত্তায় বিশ্বাস করে। অবশ্য তাঁরা দেখতে মানুষই, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ঐশ্বরিক গুণাবলি বিদ্যমান কিংবা আল্লাহ্ তাঁদের মানসিক সত্তায় অবতরণ করেছে। এ অবতারত্বের দিক থেকে এটা খ্রিস্টানদের হজরত ঈসার প্রতি আরোপিত মতের সাথে মিলে। হজরত আলী স্বয়ং তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ মত পোষণকারীদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছেন। মুহম্মদ ইবনেল হানাফিয়া সম্পর্কে মুখতার ইবনে আবু উবাইদ অনুরূপ মত পোষণ করলে প্রথমোক্ত জন তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং তার নিন্দা করে অনুরূপ গুণাবলি থেকে নিজের পবিত্রতা প্রচার করেন। এরূপ মতামত শোনার পর জাফর সাদেকও ভর্ৎসনা করেছেন। এদের মধ্যেই একটি শাখার মত হল, ইমামের গুণাবলি অন্য কারো হতে পারে না। এজন্য মৃত্যুর পর পরবর্তী ইমামের মধ্যে তাঁর আত্মা অনুপ্রবেশ করে। যাতে পরবর্তীদের মধ্যে এ গুণাবলির পূর্ণতা লাভ সম্ভব হয়। এটা জন্মান্তরবাদের অনুরূপ মত।

এদের মধ্যে একদল চরমপন্থী একজন ইমামের মধ্যেই সমস্ত বিশ্বাস সীমাবদ্ধ রাখে। কারণ তাদের মতে ইমাম একজনই হয় এবং তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকেও তারা ইমাম বলে স্বীকার করে না। এ কারণে তাদেরকে 'ওয়াকেফিয়া' অর্থাৎ অবস্থানকারী বলা হয়। এদের মধ্যে অনেকে বলে, ইমাম জীবিত, তাঁর মৃত্যু হয়নি। শুধু তিনি মানুষের দৃষ্টির অগোচরে আছেন। এ ব্যাপারে হজরত খিজিরের[৫৩] ঘটনা থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে। এ ধরনের কথা হজরত আলী সম্পর্কেও তারা বলে। তা এ যে, তিনি মেঘের উপরে আছেন। বজ্র-তাঁর শব্দ এবং বিদ্যুৎ তাঁর চাবুক। মুহম্মদ ইবনেল

৫৩. ইনি খোয়াজ খিজির নামে পরিচিত। তাঁর চিরজীবী হওয়া সম্পর্কে কিংবদন্তী বিদ্যমান।

www.amarboi.org

হানাফিয়া সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা বিদ্যমান। তা এ যে, তিনি হেজাজের 'রাজোয়া' পাহাড়ে অদ্যাবধি বিদ্যমান আছেন।[৫৪] এদের কবি বলেন,

জেনে রাখ, ইমাম কোরায়েশ বংশ থেকেই হয়,
তাঁরা চারজন সত্যের অধিকারী, সমান।
আলী এবং তাঁর বংশধরের মধ্যে তিনজন,
তাঁরা দৌহিত্র[৫৫] ও তাঁদের সম্পর্কে কোনো রহস্য নেই।
একজন বিশ্বাস ও পুণ্যের মূর্তিমান দৌহিত্র,
অন্য এক দৌহিত্রকে কারবালা নিরুদ্দেশ করেছে।
অন্য এক দৌহিত্রের মৃত্যু হয়নি—এমনকি
তিনি নিশান উড়িয়ে সৈন্য পরিচালনা করেছেন।
অদৃশ্য হয়েছেন, বহুদিন তাঁকে দেখা যায়নি,
রাজেয়া পাহাড়ে, যেখানে মধু আর পানি আছে।

ইমামিয়া শাখার চরমপন্থীরাও অনুরূপ মত পোষণ করে। বিশেষ করে বার ইমামের দল, তারা তাদের ইমামদের দ্বাদশ ইমাম মুহম্মদ ইবনে আল হাসান আসকরী, যাকে তারা আল মেহেদী উপাধি দিয়েছে, তাঁর সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে যে, তিনি তাদের গৃহের ভূ-কক্ষে এসে প্রবেশ করেন এবং হিল্লায় সেই স্থানে মায়ের সাথে অন্তরীণ অবস্থায় থাকাকালে অদৃশ্য হয়ে যান। তখন থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে আছেন এবং পৃথিবীর শেষ সময়ে আবির্ভূত হয়ে তাকে ন্যায়পরায়ণতায় পরিপূর্ণ করে তুলবেন। এর দ্বারা তারা তিরমিজীতে বর্ণিত আল-মেহেদী সম্পর্কীয় হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করে। তারা অদ্যাবধি তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। এজন্য তাঁর নাম দিয়েছে 'প্রতীক্ষিত ইমাম'। তারা প্রতি রাত্রে মাগরিবের নামাজের পরে উক্ত ভূ-কক্ষের দ্বারে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে। তাঁর জন্য বাহন প্রস্তুত রেখে বের হয়ে আসার নিমিত্ত নাম ধরে ডাকে। তারকার রশ্মি স্তিমিত হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এরূপ করে পরে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরবর্তী রাত্রির জন্য এ প্রচেষ্টা স্থগিত রাখে। তারা বর্তমানকাল পর্যন্ত এরূপ করছে।

এ ওয়াকেফী সম্প্রদায়ের অনেকে বলে ইমাম মৃত্যুমুখে পতিত হলেও তিনি পুনরায় পৃথিবীতে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবেন। তারা এ ব্যাপারে কোরানে বর্ণিত আসহাবে কাহাফের ঘটনা, কোন গ্রামের উপর দিয়ে অতিক্রমকারী সেই ব্যক্তি এবং বনি ইসরাইলের সেই নিহত ব্যক্তি, যাকে একটি হাড় দ্বারা আঘাত করার জন্য সংশ্লিষ্ট গোত্রকে গরু জবাই করতে আদেশ দেয়া হয়েছিল; এ সকল ঘটনা[৫৬] প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করে। এ ধরনের আরো বহু ঘটনা অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের জন্য

---

৫৪. মীর মোশাররফ হোসেন প্রণীত বিষাদ সিন্ধুর শেষাংশে উক্ত ধারণার আভাস বিদ্যমান।

৫৫. দৌহিত্র হিসাবে মুহম্মদ, ইবনেল হানাফিয়াকে ধরা যায় না। অনেকে ফাতেমার তৃতীয় পুত্র মুহসনের কথা মনে করেন।

৫৬. কোরানে বর্ণিত বিখ্যাত কাহিনী 'আসহাবে কাহাফ' বা সাতজন গুহাবাসী নিদ্রিত ব্যক্তির ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনাটিও কোরানের ১৮ নং সূরায় বর্ণিত হয়েছে, যেখানে হজরত খিজির ও মুসার সাক্ষাৎকারের কথা বলা হয়। অন্যত্র এক ব্যক্তির পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করায় একশ বছর পরে জীবন লাভের একটি ঘটনা বিদ্যমান। তৃতীয় ঘটনাটির নাম অনুসারে সূরায়ে 'বাকারা'র নামকরণ করা হয়েছে। তার ২৫৯ নং আয়াত দ্র:।

www.amarboi.org

অস্বাভাবিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোকে অন্যস্থানে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। এদের মধ্যে সৈয়দ আল-হুমাইরীও[৫৭] বিদ্যমান, যিনি তাঁর পদ্যে বলেন,

'মানুষের কাল চুল যখন ধূসর হয়ে আসে
এবং নাপিত তাকে খেজাবের পরামর্শ দেয়,
তখন জীবনের সজীবতা আর নেই, অতীত হয়েছে—
উঠ, হে বন্ধু, যৌবনের জন্য ক্রন্দন করি।
সেই দিনের কথা, যা মানুষের নিকট ফিরবে না।
এ পৃথিবীতে আর, শেষ হিসাবের দিনের পূর্বে।
কারণ যা যায়, তা আর ফিরে না—
কারো কাছে, সেই প্রত্যাবর্তনের দিন ছাড়া।
আমি বিশ্বাস করি, এটাই যথার্থ বিশ্বাস,
আমি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ করি না।
এভাবে আল্লাহ্ এমন অনেক লোকের কথা বলেছেন,
যারা মাটিতে মিশিয়া যাওয়ার পর জীবিত হবে।

আমাদের জন্য এ সকল চরমপন্থী শিয়াদের মতামত সম্পর্কে তাদের ইমামদের মন্তব্যই যথেষ্ট। তাঁরা এ সকল কথা বলেন না এবং তাদের সমুদয় যুক্তি-প্রমাণই বাতিল বলে গণ্য করেন।

শিয়াদের 'কায়সানিয়া' সম্প্রদায় মুহম্মদ ইবনেল হানাফিয়ার পরে তৎপুত্র আবু হাশেমের ইমাম হওয়ার কথা বলে। তাদেরকে 'হাশেমিয়া' বলা হয়। এর পর তারা বিভক্ত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে একদল আবু হাশেমের পুত্র আলী এবং তাঁর পুত্র হাসানের ইমাম হওয়ার দাবি পোষণ করে। অন্যরা ধারণা করে যে, আবু হাশেম সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সার্রায় মুহম্মদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে ইমামত সম্পর্কে অন্তিম নির্দেশ দিয়ে যান। অতঃপর মুহম্মদ তৎপুত্র ইব্রাহিম, যিনি ইমাম নামে পরিচিত, তাকে অন্তিম নির্দেশ দান করেন এবং ইব্রাহিম তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ্ ইবনেল হারেসিয়াকে অন্তিম উপদেশ দিয়ে যান। ইনিই পরে আস্সাফফাহ উপাধি ধারণ করেন এবং তাঁর ভাই জাফর আল মনসুরকে এ উত্তরাধিকার দিয়ে যান। সন্তান-সন্ততির মধ্যে একের পর এক শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এটাই বনি আব্বাসের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হাশেমীদের মত। এদের মধ্যে আবু মুসলিম সুলায়মান ইবনে কাছীর, আবু সলমা আল খাল্লাল এবং অন্য আরো অনেক আব্বাসী শিয়া বিদ্যমান ছিলেন। অনেক সময় তারা এ যুক্তিকে শক্তিশালী করতে গিয়ে বলে যে, বস্তুত তাদের এ ইমামতের দাবি হজরত আব্বাস থেকে এসেছে। কারণ হজরত মুহম্মদ (সঃ)-র তিরোধানের সময় তিনি জীবিত ছিলেন। সুতরাং চাচা হিসাবে তিনি উত্তরাধিকারের অধিকতর যোগ্য।

যায়দিয়া সম্প্রদায় তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী ইমামতের ব্যাপারটি নিষ্পন্ন করেছে এবং এতে তারা যোগ্যতা ও ক্ষমতাকেই প্রাধান্য দিয়েছে, কোনো বিশেষ নির্দেশকে

৫৭. ইসমাইল ইবনে মোহাম্মদ, মৃত্যু ১৭৮/৭৯ (৭৯৫/৯৬ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

নয়। তারা আলীর ইমামতের পরে তৎপুত্র হাসান, এর পরে তাঁর ভাই হোসাইন এবং হোসাইনের পুত্র আলী জয়নুল আবেদীনকে ইমাম হিসাবে গণ্য করে। অতঃপর জয়নুল আবেদীনের পুত্র যায়েদ ইমাম হন। তিনি কুফায় তাঁর ইমামতের দাবি জানিয়ে বিদ্রোহ করেন এবং নিহত হওয়ার পর তাঁর লাশ 'কানাসা'য় ঝুলিয়ে রাখা হয়। ইনিই এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম। যায়দিয়াগণ তাঁর পরে তৎপুত্র ইয়াহিয়াকে ইমাম হিসাবে স্বীকার করেন। ইনি খুরাসানে যাওয়ার পর জুজ্জানে নিহত হন। সেখানে তিনি মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে হাসানদৌহিত্রকে অন্তিম নির্দেশ প্রদান করেন। এ মুহম্মদ 'নফসে জাকিয়া' নামে খ্যাত এবং ইনি হেজাজে আল মেহেদী উপাধি গ্রহণ করে বিদ্রোহ করেন। সম্রাট আল মনসুরের সৈন্যদলের হাতে নিহত হন। তিনি তাঁর ভাই ইব্রাহিমকে উত্তরাধিকারী করে যান। ইনি বসরায় ইসা ইবনে যায়েদ ইবনে আলীসহ বসবাস করতে থাকেন। একসময়ে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটলে আল মনসুর সৈন্যদল পাঠান এবং তাঁরা পরাজিত হয়ে উভয়ে নিহত হন। জাফর সাদেক তাঁদেরকে পূর্বাহ্নেই এ সকল ঘটনার কথা বলেছিলেন। এ ভবিষ্যদ্বাণীকে জাফর সাদেকের দিব্য জ্ঞানের পরিচয় বলি মনে করা হয়।

তাদের একটি শাখা এ মত পোষণ করে যে, মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ 'নফসে জাকিয়া'র পরে ইমাম হলেন মুহম্মদ ইবনে কাসেম ইবনে আলী ইবনে উমর। এ উমর হলেন যায়েদ ইবনে আলীর ভাই। উক্ত মুহম্মদ ইবনে কাসেম 'তালেকানে' বিদ্রোহ করেন এবং ধৃত হয়ে সম্রাট আল মুতাসিমের নিকট প্রেরিত হন। সেখানে বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। যায়দিয়াদের অন্য এক শাখার ধারণা, ইয়াহিয়া ইবনে যায়েদের পরে তাঁর ভাই ইসা ইমাম হন। ইনি ইব্রাহিমের সাথে আল মনসুরের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর পরে তাঁর বংশধরদের মধ্যে ইমামতের দায়িত্ব বর্তায় এবং জজ্জ(নিগ্রো)দের মধ্যে শিয়া মতবাদ প্রচারকারীরা নিজেদেরকে উক্ত ইসার বংশধর বলে উল্লেখ করেন। তাদের ইতিহাস বর্ণনার সময় আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

যায়দিয়াদের অন্য একটি শাখা বলে, মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর পরে ইমাম হলেন তাঁর ভাই ইদ্রিস, যিনি মাগরিব অঞ্চলে পলায়ন করেছিলেন এবং সেইখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর দায়িত্ব পালন করেন তাঁর পুত্র ইদরিস এবং ফেজনগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর পরে তাঁর বংশধররা মাগরিবে সম্রাট হিসাবে বহুদিন রাজত্ব করেন। আমরা তাঁদের ইতিহাস বর্ণনায় এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

এর পর যায়দিয়াদের ব্যাপারটি আর শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়নি। তাঁদের মধ্যে যে শিয়ামত প্রচারক তাবারিস্তান দখল করেন, তিনি হলেন হাসান ইবনে যায়েদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে হাসান ইবনে যায়েদ ইবনে আলী ইবনে ইমাম হোসাইনদৌহিত্র এবং তাঁর ভাই মুহম্মদ ইবনে যায়েদ। তাদের মধ্য থেকে আন্নাসের উতরুশ দায়লমে শিয়া মতবাদ প্রচার আরম্ভ করেন এবং তাঁর নিকট দায়লমীরা মুসলমান হয়। ইনি হাসান ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে উমর এবং উমর যায়েদ ইবনে আলীর ভাই। তাঁর বংশধররা তাবারিস্তানে রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঁদের কল্যাণে দায়লমীরা

www.amarboi.org

বাগদাদের খলিফার উপর রাজশক্তি বিস্তার ও অন্যান্য প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। তাঁদের ইতিহাস বর্ণনার সময় এটা আলোচনা করব।

ইমামিয়া সম্প্রদায় হজরত আলী থেকে অন্তিম নির্দেশের মাধ্যমে তৎপুত্র হাসান, হাসানের ভাই হোসাইন, হোসাইনের পুত্র আলী জয়নুল আবেদীন, জয়নুল আবেদীনের পুত্র মুহম্মদ আল বাকের, বাকেরের পুত্র জাফর আস্‌সাদেক পর্যন্ত পৌঁছে ইমামত সম্পর্কে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একভাগ এর পর তৎপুত্র ইসমাইলের ইমাম হওয়ার কথা বলে এবং এদেরকেই 'ইসমাইলিয়া বলা হয়। অন্য ভাগ জাফর আস্‌সাদেকের অন্য পুত্র মুসা আল কাজেমের ইমামত দাবি করে। এরাই 'ইসনা আশারিয়া' বা বার ইমামের দল নামে খ্যাত। কারণ তাঁরাই দ্বাদশ ইমামের পৃথিবীর শেষ কাল পর্যন্ত অদৃশ্য থাকার কথা বলে, যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসমাইলিয়ারা ইসমাইলের ইমামত সম্পর্কে বলে যে, তা তাঁর পিতার মনোনয়ন দানের মাধ্যমে এসেছে। কারণ তাদের নিকট এ মনোনয়নের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। নতুবা ইসমাইল তাঁর পিতার পূর্বেই মারা গেছেন। সুতরাং এর অর্থ বংশধরদের মধ্যে ইমামতের ধারা অব্যাহত রাখা। যেমন হজরত মুসা ও হারুনের কাহিনী আল্লাহ্ তাদেরকে শান্তি দিন। তারা বলে, অতঃপর ইমামত ইসমাইল থেকে তৎপুত্র মুহম্মদ আল মাকতুমের উপর বর্তেছে। ইনিই অদৃশ্য ইমামদের মধ্যে প্রথম। এর কারণ এ যে, তাদের মতে ইমাম কখনো ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। ফলে তিনি অদৃশ্য থাকেন এবং প্রচারকবৃন্দ মানুষের নিকট তার অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ প্রচার কার্যাদি চালিয়ে যায়। পুনরায় যখন তাঁর ক্ষমতা ফিরে আসে, তিনি আত্মপ্রকাশ করেন এবং প্রচারও প্রকাশ্য হয়। তারা বলে, আলমাকতুমের পরে তৎপুত্র জাফর সাদেক এবং তাঁর পরে তাঁর পুত্র মুহম্মদ আল হাবিব। ইনিই অদৃশ্য ইমামদের শেষ প্রতিনিধি। তাঁর পর তৎপুত্র আবদুল্লাহ্ আল মেহেদী যার প্রচারকার্যে আবু আবদুল্লাহ্ আশ্‌শিয়ী কুতামা গোত্রে আত্মনিয়োগ করেন এবং মানুষ দলে দলে সাড়া দেয়। অতঃপর তারা তাঁকে সিজিলমাসার বন্দী দশা থেকে বের করে আনে তারা কায়রোয়ান ও মাগরিবের ক্ষমতা দখল করে। তাঁর পর তাঁর বংশধররা মিশরেরও অধিকারী হন। তাঁদের ইতিহাসে উপরোক্ত ঘটনাবলি সুপরিচিত।

ইমাম ইসমাইলের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য যেমন এদেরকে ইসমাইলিয়া বলা হয়, তেমনি গুপ্ত ইমামের ধারণা পোষণের জন্য এদেরকে 'বাতেনিয়া'ও বলা হয়ে থাকে। এদেরকে স্বধর্মত্যাগীও বলা হয়; কারণ তাদের মতবাদে প্রচলিত ধর্মমত ত্যাগের উপাদান বিদ্যমান। তাদের মতবাদের অনেকগুলো প্রাচীন এবং অনেকগুলো নবীন। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে হাসান ইবনে সাবাহ এ মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং সিরিয়া ও ইরাকের অনেকগুলো দুর্গ দখল করতে সমর্থ হন। তাঁর প্রচারকার্য এভাবে চলতে থাকে, অতঃপর মিশরের তুর্কি সম্রাট ও ইরাকের তাতারী সম্রাটগণ স্ব স্ব অঞ্চলে তাঁর কার্যকলাপ দমন করায় তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। শহরস্তানীর[৫৮] বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলমেলাল ওন্‌নেহালে' সাবাহ্‌র প্রচারকার্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

৫৮. মুহম্মদ ইবনে আব্দুল করিম, মৃত্যুকাল ৫৪৮ (১১৫৩ খ্রি.) হি.।

www.amarboi.org

ইসনা আশারিয়াদিগের অনেককে তাদের পরবর্তীগণ ইমামিয়া বলে আখ্যায়িত করে। তারা জাফর সাদেকের পুত্র মুসা কাজেমের ইমামতের দাবি করে। কারণ বড়ভাই ইসমাইল পিতার পূর্বে মৃত্যুবরণ করায় তিনি এ মুসাকে ইমামতের মনোনয়ন দান করে যান। অতঃপর তাঁর পুত্র আলী আররেজা, যাকে সম্রাট মামুন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। কিন্তু মামুনের পূর্বে মৃত্যু হওয়ায় তাঁর এ ব্যাপার সম্পূর্ণ হয়নি। তাঁর পর তৎপুত্র মুহম্মদ আত্তকী, তাঁর পর তৎপুত্র আলী আলহাদী, তাঁর পর তৎপুত্র হাসান আল আসকরী এবং তাঁর পর তৎপুত্র মুহম্মদ আল-মেহেদী, ইনিই প্রতীক্ষিত ইমাম ও তাঁর কথা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

শিয়াদের এ সকল মতবাদের প্রত্যেকটিতে প্রচুর মতানৈক্য বিদ্যমান। অবশ্য তাদের সুপরিচিত দলের সংখ্যা মোটামুটি এ। যিনি বিস্তারিতভাবে তাদের সংবাদ পাঠ করতে চান, তাকে ইবনে হজম,[৫৯] শহরস্তানী ও অন্যান্যের লেখা 'মেলাল ওন্নেহাল' নামীয় গ্রন্থাদি পাঠ করতে হবে। তাতে এর বিশদ বিবরণ বিদ্যমান। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন,[৬০] তিনিই উন্নত ও মহান।

---

৫৯. আলী ইবনে মুহম্মদ, জীবনকাল ৩৮৪-৪৫৬ (৯৯৩-১০৬৪ খ্রি.) হি.।

৬০. কোরান, ১৬, ৯৩; ৩৫, ৮; ৭৪, ৩১।

www.amarboi.org

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

[খেলাফতের রাজশক্তিতে পরিণত হওয়া]

জেনে রাখুন, রাজশক্তি গোত্রপ্রীতির এক স্বাভাবিক গন্তব্য। এটা ইচ্ছার দ্বারা হয় না, বরং অস্তিত্বের প্রয়োজনে ও তার ক্রমাগত শৃঙ্খলা স্থাপনে সংঘটিত হয়, যেমন ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। ধর্মীয় বিধান, তার অনুষ্ঠান এবং এমন প্রতিটি কাজ, যা সর্বসম্মতিক্রমে নিষ্পন্ন হয়, তাদের জন্য গোত্রপ্রীতি একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ অধিকার আদায়ের প্রশ্ন তার সহায়তা ব্যতীত নিষ্পত্তি হতে পারে না, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং জাতির জন্য গোত্রপ্রীতি একটি প্রয়োজনীয় শক্তি এবং তার দ্বারা আল্লাহ্র নির্দেশ পরিপূর্ণতা লাভ করে থাকে। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্ প্রত্যেক নবীকেই তার জাতির গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন।

অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই, ধর্মপ্রবর্তক গোত্রপ্রীতির নিন্দা করেছেন এবং তা ত্যাগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে মূর্খতার যুগের কলুষ—পিতৃপুরুষের নামে অহংকারের মনোভাব দূর করেছেন। তোমরা আদমের সন্তান এবং আদম মাটির সৃষ্টি। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত যে সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু।[৬১] অতঃপর আমরা এও পাই বে, ধর্মপ্রবর্তক রাজশক্তি ও রাজ্যাধিপতিদেরও নিন্দা করেছেন। তাদের ভোগসম্ভোগ, অহেতুক অপব্যয় ও আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুতির জন্য ভর্ৎসনা করেছেন। তিনি শুধু ধর্মের প্রয়োজনে সম্প্রীতি এবং অনৈক্য ও অসদ্ভাব দূর করতে উৎসাহ দিয়েছেন।

জেনে রাখুন, এ পৃথিবী ও তার সমুদয় অবস্থা-ব্যবস্থা ধর্মপ্রবর্তকের নিকট পরকালের বাহন মাত্র। যিনি এ বাহন হারিয়ে ফেলবেন, তার পক্ষে গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। সুতরাং ধর্মপ্রবর্তক যা নিষেধ করেছেন, যে মানবীয় কার্যাবলির নিন্দা করেছেন কিংবা তা ত্যাগ করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তার অর্থ এ নয় যে, তা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে বা সমূলে উৎপাটন করতে হবে এবং যে শক্তি তার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাকে বন্ধ করে দিতে হবে। তাঁর উদ্দেশ্য হল, তা যেন সত্যের উদ্দেশ্যে আনুগত্যের মনোভাব নিয়ে নিষ্পন্ন হয়, যাতে সমগ্র ব্যাপারটিই সত্যনিষ্ঠতা ও উদ্দেশ্যের ঐক্যে বাস্তব হয়ে ওঠে। যেমন হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে, তা আল্লাহ্ ও তার রসূলের জন্যই এবং যে ব্যক্তির হিজরত

৬১. কোরান ৪৯, ১৩।

www.amarboi.org

কোনো পার্থিব সম্পদ বা কোনো নারীর পাণি গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা ঐ উদ্দেশ্যের নিমিত্ত গণ্য হবে।[৬২] ধর্মপ্রবর্তক ক্রোধের নিন্দা এজন্য করেননি যে, তাকে মানুষের সত্তা থেকে নিষ্কাশিত করে ফেলতে হবে। কারণ তার মধ্য থেকে ক্রোধের শক্তি দূরীভূত হলে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও আল্লাহ্‌র বাণীকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবার জন্য জেহাদের মনোভাব লোপ পাবে। সুতরাং ধর্মপ্রবর্তক ক্রোধের সে রূপকে নিন্দা করেছেন, যা মানুষকে শয়তানী কার্যে ও অসৎ প্রবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। ক্রোধ যদি এ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, তা হলে অবশ্যই নিন্দনীয়। আর যদি তার শক্তি আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র জন্য ব্যয়িত হয়, তা হলে সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। বস্তুত এটাই হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর চরিত্র।

অনুরূপভাবে ধর্মপ্রবর্তক প্রবৃত্তির নিন্দা করেছেন। অথচ তার অর্থ সমূলে বিনাশ নয়। কারণ যার প্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়, তার অধিকারচেতনা থাকে না। ধর্মপ্রবর্তকের উদ্দেশ্য উক্ত শক্তিকে সহজপথে কল্যাণের জন্য পরিচালিত করা। যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় ঐশ্বরিক বিধিনিষেধের দাসানুদাসে পরিণত হতে পারে। এমনি গোত্রপ্রীতিকেও যেখানে নিন্দা করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজেই আসবে না।[৬৩] এর অর্থ এ যে, এ প্রীতি সম্পর্ক যদি মিথ্যার জন্য হয়, যেমন মূর্খতার যুগে তার অবস্থা ছিল; তা হলে অবশ্যই নিন্দনীয়। যেমন শুধু তার জন্য কারো অহংকার, কারো উপর কিছু দাবি করা; কারণ এ ধরনের কাজ সর্বদাই বুদ্ধিমানের পক্ষে অশোভন এবং পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে তা কোনো উপকারেই আসবে না। আর যদি গোত্রপ্রীতি সত্যের জন্য, আল্লাহ্‌র রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য হয়, তা হলে তা একান্ত বাঞ্ছনীয় শক্তি। কারণ তা নষ্ট হয়ে গেলে ধর্মীয় বিধিবিধান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না, যেমন ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

এরূপ রাজশক্তিও। ধর্মপ্রবর্তক তার সত্যের জন্য প্রাধান্য বিস্তার, ধর্মের জন্য সর্বজনীন প্রভাবের সৃষ্টি ও কল্যাণের জন্য তার প্রচেষ্টার নিন্দা করেননি। তার মিথ্যার প্রতাপ সৃষ্টি এবং অন্যায্য উদ্দেশ্য ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের আনুগত্যকে ব্যবহার করার নিন্দা করেছেন, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। সুতরাং রাজশক্তি যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে নিয়োজিত হয়, যদি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকারে এবং শত্রুদের বিনাশ সাধনে সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তা হলে তাতে নিন্দনীয় কিছু থাকে না। এজন্যই হজরত সুলায়মান (আঃ) প্রার্থনা করেছেন, হে প্রভু, আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান কর, যা আমার পরে আর কারো জন্য সম্ভব না হয়।[৬৪] কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর মধ্যে নবুয়ত ও রাজশক্তি একত্র হওয়ায় তা কখনো মিথ্যার পথ অনুসরণ করবে না।

হজরত উমর ইবনে আলখাত্তাব (রাঃ) যখন সিরিয়ায় উপস্থিত হয়ে হজরত মাবিয়াকে রাজশক্তিসুলভ বৈভব ও ভূষণ এবং সভাসদ ও অনুষদের মধ্যে দেখতে

---

৬২. বোখারী (১ম) দ্র:।
৬৩. কোরান ৬০, ৩।
৬৪. কোরান ৩৮, ৩৫।

www.amarboi.org

পেলেন, তখন তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, এটা কি পারস্য রাজ্যের বেশভূষা নয়, হে মাবিয়া? মাবিয়া এর উত্তরে বলেছিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আমি শত্রুদের সন্নিকটে সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস করি এবং তাদের সাথে তাল রেখে আমাদেরকে যুদ্ধ ও জেহাদের জন্য শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে হয়। এটা শুনে হজরত উমর (রাঃ) নিশ্চুপ হয়েছিলেন[৬৫] এবং এ সাজসজ্জার মধ্যে ধর্ম ও সত্যের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য দেখে তাকে আর ত্রুটি বলে মনে করেননি। যদি তিনি রাজশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে উৎসুক হতেন, তা হলে ঐ শক্তির অনুরূপ সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে উপরোক্ত উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারতেন না; বরং সম্পূর্ণভাবে তা থেকে বের হয়ে আসার জন্যই নির্দেশ দিতেন। হজরত উমর পারস্যরাজসুলভ বেশভূষা বলতে পারস্য সম্রাটগণের মিথ্যাচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং রাজকীয় ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত ধর্মহীনতার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। মাবিয়াও তা বুঝতে পেরে উত্তর দিয়েছেন যে, এতে পারস্যরাজ্যের অনুরূপ অহমিকা বা মিথ্যাচার নেই; বরং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্য। এর ফলেই হজরত উমর নিশ্চুপ হয়েছেন। বস্তুত সাহাবীদের মধ্যে রাজশক্তি ও তার অবস্থা অভ্যাসের প্রতি এরূপ একটি বিতৃষ্ণার মনোভাব ছিল। কারণ তার দ্বারা মিথ্যার সহায়তা ও অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয়া হত।

হজরত মুহম্মদ (সঃ) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে হজরত আবুবকরকে ইমামতি করার জন্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং নামাজ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হওয়ায় সকলেই তাঁকে খলিফা হিসাবে মনোনীত করলেন, তখন সমগ্র ধর্মীয় বিধানের প্রতিষ্ঠার দায়িত্বই তাঁর উপর বর্তাল। অথচ তখনো তাঁদের কেউ রাজশক্তির ব্যাপারে কোনো কথা বলেননি। কারণ তা তখনো ধর্মবিরোধী ও শত্রুদের সহায়ক শক্তি হিসাবে বিরাজমান। সুতরাং আবুবকর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তাঁর পূর্বসূরি সহচরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পালন করেন। তিনি ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় সমগ্র আরব আবার ইসলামের ছত্রচ্ছায়ায় একত্র হল।

অতঃপর আবুবকর উমরকে উত্তরাধিকারী করে গেলেন এবং শেষোক্তজন পূর্বসূরির পদাংক অনুসরণ করলেন। তিনি আরবদিগকে বিভিন্ন জাতির অধিকারভুক্ত সম্পদ ও সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে আদেশ দিলেন। এর ফলে তারা প্রাধান্য বিস্তার করে সকল কিছু ছিনিয়ে নিল। অতঃপর দায়িত্ব উসমান এবং পরে আলীর উপর বর্তাল—আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। অথচ তাঁদের সকলেই তখনো রাজশক্তি থেকে দূরে এবং তার পন্থা অনুসরণ হতে নিজেদেরকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখলেন।

বস্তুত ইসলামের যে সজীবতা ও বেদুইন জীবনের কৃচ্ছ্রতা তাঁদের মধ্যে বিরাজমান ছিল, তার ফলেই তাঁদের পক্ষে অনুরূপ চিন্তা হয়নি। কারণ তারা সকল মানুষ অপেক্ষা পার্থিব ভোগ-বিলাস থেকে দূরে অবস্থান করতেন। এর কারণ এ নয় যে, তাঁদের ধর্মমত তাঁদেরকে প্রাচুর্যের মধ্যে কৃচ্ছ্রতা সাধন করতে উপদেশ দিত এবং তা এজন্যও নয় যে, তাঁদের আবাসস্থলের বেদুইন পরিবেশ অনুরূপ বিষয়ে উৎসাহিত করত; বরং তাঁরা যে

---

৬৫. বোখারীর 'কিতাবুল আনসার ওল আশরাফ' দ্রঃ।

www.amarboi.org

জীবন যাপনে কৃচ্ছ্রতা ও অল্পে তুষ্টিতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, তাই তাঁদের পক্ষে ত্যাগ করা সম্ভবপর হচ্ছিল না।

বস্তুত মুজারের ন্যায় অসচ্ছল জীবনের অধিকারী আর কোনো জাতি ছিল না। তারা হেজাজের এমন একটি অঞ্চলে বাস করত, যেখানে না ছিল শস্য, না ছিল দুগ্ধ। সবুজ প্রান্তরগুলোতে তাদের যাওয়া নিষিদ্ধ। একে ত দূরের পথ, তদুপরি তা রাবেয়া ও ইয়ামেনের অধিকারভুক্ত। এর ফলে তারা কখনও প্রাচুর্য অঞ্চলের অভিলাষী হয়নি। তাদের আহার্যের তালিকায় অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকত কাঁকড়া ও গুবরে পোকা। তারা 'ইলহিজ' খেতে গর্ববোধ করত। এটা উটের লোমকে পাথর দ্বারা চূর্ণ করে উটের রক্তে মিশিয়ে রাঁধা এক প্রকার সামগ্রী। তাদের প্রায় অনুরূপ আহার্য ও বাসস্থানের অবস্থা ছিল কোরায়েশদের।

অতঃপর যখন সমগ্র আরবের গোত্রপ্রীতি ধর্মের সূত্রে একত্র গ্রথিত হল এবং হজরত মুহম্মদ (সঃ)-কে নবুয়ত দিয়ে আল্লাহ্ তাদেরকে সম্মানিত করলেন, তখন তারা পারস্য ও রোমের বিভিন্ন জাতির সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হল। আল্লাহ্ তাদেরকে যে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করার সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তারা দাবি করল। তারা তাদের রাজ্য অধিকার করল এবং তাদের পার্থিব সম্পদ কুক্ষিগত করে নিল। এর ফলে তাদের সম্মুখে প্রাচুর্যের সাগর উথলিয়ে উঠল। এটা এ পর্যন্ত পৌঁছল যে কোনো একটি যুদ্ধে একজন অশ্বারোহীর ভাগে পড়েছিল ত্রিশ হাজার বা প্রায় অনুরূপ স্বর্ণমুদ্রা। এভাবে তারা এত সম্পদের অধিকারী হয়েছিল যে, তা গণনায় আনা সম্ভব নয়। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত স্থূলসাধারণ। হজরত উমর তাঁর জোব্বায় চামড়ার ফিতার গিঁট দিয়ে পরতেন। হজরত আলী বলতেন, হে রৌপ্য হে স্বর্ণ, অন্যদেরকে উজ্জ্বল কর, আমাকে নয়। আবু মুসা মুরগির মাংস খেতে পারতেন না। কারণ তা কম থাকায় আরবরা তা খেতে অভ্যস্ত ছিল না। তৎকালে আরবদের মধ্যে চালনির কোনো প্রচলই ছিল না। তারা খোসা শুদ্ধই গম খেত। অথচ এটা সত্ত্বেও তাদের তৎকালীন উপার্জন পৃথিবীর যে কোনো জাতি অপেক্ষা অধিক ছিল।

মাসউদী বলেন, হজরত উসমানের সময় সাহাবীরা সম্পদ ও সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। হজরত উসমান নিহত হওয়ার সময় তাঁর খাজাঞ্চীর হাতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দিনার ও দশ লক্ষ দিরহাম ছিল। ওয়াদীউল কুরা, হুনাইন ও অন্যত্র তাঁর সম্পত্তির মূল্য ছিল এক লক্ষ[৬৬] দিনার। এটা ছাড়াও তিনি প্রচুর উট ও ঘোড়া রেখে গিয়েছিলেন। হজরত যুবায়েরের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার দিনার। তিনি এক হাজার ঘোড়া ও এক হাজার দাসী রেখে গিয়েছিলেন। হজরত তালহার ইরাক থেকে প্রতিদিনের আয় ছিল এক হাজার দিনার এবং সারা অঞ্চল থেকে ছিল এরও বেশি। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের আস্তাবলে এক হাজার ঘোড়া ছিল। এটা ছাড়াও তাঁর এক হাজার উট ও দশ হাজার ছাগল ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পদের এক-চতুর্থাংশের পরিমাণ ছিল চৌরাশি হাজার। হজরত যায়েদ

৬৬. কোনো কোনো সংস্করণে দুই লক্ষ।

www.amarboi.org

ইবনে সাবেত গাঁতি দিয়ে টুকরা করা বহু স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়াও যে সম্পদ ও সম্পত্তি রেখে যান, তার মূল্য ছিল এক লক্ষ দিনার। হজরত যুবায়ের বসরায় তার গৃহ নির্মাণ করেন; অনুরূপভাবে মিশর, কুফা ও আলেকজান্দ্রিয়ায়ও তাঁর বসতবাটী ছিল। এরূপ হজরত তালহাও কুফায় গৃহ নির্মাণ করেন এবং মদিনায় তাঁর গৃহটি মজবুত করে তৈরি করেন। তিনি প্রলেপ, ইট ও সেগুন কাঠ ব্যবহার করেন। হজরত সাদ ইবনে আবি ওক্কাস মদিনার আকিকে তাঁর গৃহ নির্মাণ করেন। তিনি উক্ত গৃহটিকে উচ্চ ছাদ, ব্যাপকভাবে প্রশস্ত এবং তার চূড়ায় ক্ষুদ্র স্তম্ভাদি বিশিষ্ট করেন। আলমেকদাদ মদিনায় তাঁর গৃহ নির্মাণ করে তার ভিতর-বাইর প্রলেপযুক্ত করেন। ইয়ালা ইবনে মুনাব্বিহ[৬৭] মৃত্যুর পর পঞ্চাশ হাজার দিনার, সম্পত্তি ও অন্যান্য অনেক কিছু রেখে যান, যার মূল্য তিন লক্ষ দিরহাম। মাসউদীর বর্ণনার উদ্ধৃতি এ খানেই শেষ।

পাঠক, তৎকালে জাতির উপার্জনের বহর এ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন। এটা তাঁদের ধর্মমতে ভর্ৎসনাযোগ্য ছিল না। কারণ এ সকল দ্রব্য ও সম্পদ তাঁরা যুদ্ধে লুণ্ঠিত সম্পদের বৈধ অংশ হিসাবে পেয়েছিলেন। তাঁরা এর দ্বারা অপব্যয়ের পথ প্রশস্ত করেননি; বরং সর্বদাই তাঁদের মধ্যে মিতাবস্থায় বিদ্যমান ছিল, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং তা তাঁদের জন্য সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি। যদিও অতিরিক্ত পার্থিব সম্পদ সংগ্রহ দূষণীয়; তবু তা একমাত্র ঐ অপব্যয় ও মিতাবস্থা থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্যই হয়ে থাকে, আমরা ইতিপূর্বেই এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছি। যখন তাঁদের মধ্যে মিতাবস্থা ছিল তাদের ব্যয় ছিল সত্যের পথে ও তার মতাদর্শ প্রচারে, সেই জন্য এ প্রাচুর্য তাদের সত্য সাধনায় ও পরকালের কল্যাণে সহায়কই হয়েছিল। অতঃপর যখন তাঁদের বেদুইন জীবন ও কৃচ্ছ্রতার আদর্শ স্তিমিত হয়ে আসল, তখন গোত্রপ্রীতির স্বাভাবিক পরিণতিতে তাঁদের মধ্যে রাজশক্তি প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করল, যেমন আমরা পূর্বেই বলেছি। এর ফলে প্রাধান্য ও প্রতাপ দেখা দিল। তবু এ রাজশক্তির বিষয়টি তাঁদের কাছে আরাম-আয়েশ ও সম্পদের প্রাচুর্যের মতোই ছিল। এ জন্যই একে তাঁরা অন্যায়ের পথে ব্যবহার করেননি এবং এর দরুন তাঁরা ধর্মের উদ্দেশ্য ও সত্যের আদর্শ থেকেও দূরে সরে যাননি।

গোত্রপ্রীতির অনিবার্য আকর্ষণে যখন মাবিয়া ও আলীর মধ্যে গোলযোগ আরম্ভ হল, তখন এও সত্যের অনুসরণ ও অনুসন্ধানের জন্যই হয়েছিল। তাঁদের কেউই কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে, মিথ্যার আকর্ষণে বা হিংসার তাড়নায় এটা করেননি। যেমন অনেক সময় অনেকে এরূপ ধারণা করেন এবং স্বধর্মত্যাগীরা এ ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করে। তাঁদের সাধ্যানুসন্ধানের মধ্যেই এ পার্থক্য দেখা দিয়েছিল এবং তাঁরা একে অপরের দৃষ্টিকোণকে সত্য লাভের পথের ভ্রান্ত ধারণা করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদি আলী এক্ষেত্রে একমাত্র সত্যের অধিকারী হতেন, তা হলে মাবিয়া কখনও মিথ্যার পক্ষে আঁকড়িয়ে ধরে থাকতেন না। বস্তুত মাবিয়া সত্যকে অনুসন্ধান করতে গিয়েই ভুল করেছেন। তাঁরা উভয়েই উদ্দেশ্যের দিক থেকে সত্যের অনুসারী ছিলেন।

---

৬৭. কোনো কোনো সংস্করণে মুনিয়া, উমিয়াও আছে। আল মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ ৩৩ (৬৫৩/৫৪ খ্রি.) হিজরিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ উভয়েই তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত।

www.amarboi.org

অতঃপর রাজশক্তির স্বাভাবিক গতি একক মর্যাদা এবং একের নির্দিষ্টকরণের দিকে এগিয়ে গেছে। মাবিয়ার পক্ষে এ শক্তিকে নিজের তরফ থেকে বা জাতির তরফ থেকে বাধা দেবার কোনো কারণই ছিল না। কারণ গোত্রশক্তির অমোঘ ও স্বাভাবিক আকর্ষণেই তা এসে ধরা দিয়েছে। এমন কি বনি উমাইয়াদের মধ্যে যারা কোনোপ্রকার সত্যের অনুসন্ধানে ছিল না, তারাও একে প্রাধান্য দিয়েছে এবং মাবিয়ার চতুর্দিকে জড় হয়েছে। তারা তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। এমতাবস্থায় মাবিয়া যদি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন এবং একক মর্যাদা লাভের পথে বনি উমাইয়াদের বিরোধিতা করতেন, তা হলে ঐক্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। অথচ তাকে সঙ্ঘবদ্ধ করে গেঁথে তোলাই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর তুলনায় এর সমালোচনা তেমন বৃহৎ কিছু নয়। কাসেম ইবনে মুহম্মদ ইবনে আবুবকরকে দেখে উমর ইবনে আবদুল আজিজ বলেছিলেন, যদি এ ব্যাপারে আমার কোনো শক্তি থাকত, তা হলে আমি তাকে খলিফা বানাতাম। অবশ্য তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তা হলে তা করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি বনি উমাইয়ার শক্তিধর গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে ভয় করতেন। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং তাঁর পক্ষে এ ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন সাধন করা সাধ্যের বাইরে ছিল। কারণ তাতে শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হত।

এ সমুদয়ই গোত্রপ্রীতির অনিবার্য আকর্ষণে রাজশক্তির পরিণতি হিসাবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং রাজশক্তি লাভের পর যদি ধরে নেই যে, কোনো এক ব্যক্তি তার সমস্ত মর্যাদা কুক্ষিগত করেছে এবং তাকে সত্যের আদর্শ ও তার বৈচিত্র্য সম্পাদনে নিয়োগ করেছে, তা হলে তাকে এজন্য দোষীসাব্যস্ত করা যায় না। হজরত সুলায়মান ও তাঁর পিতা দাউদ (আঃ) বনি ইসরাইলের মধ্যে রাজশক্তির একক মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং রাজশক্তির অনিবার্য স্বাভাবিক কারণেই এটা হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও পাঠক জানেন যে, তাঁরা নবুয়ত ও সত্যের অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে মাবিয়ার তৎপুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী করার ব্যাপারটি দেখতে হবে। কেননা এর অন্যথা কিছু করলে বনি উমাইয়ার ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যেত। তারা অন্যদের ব্যাপার কিছুতেই মেনে নিত না। যদি অন্য কাউকেও উত্তরাধিকারী করা হত, তা হলে তারা বিরোধিতা করত। তদুপরি তারা ইয়াজিদ সম্পর্কে ভালো ধারণাই পোষণ করত। এ ব্যাপারে কাউকেও সন্দেহ করার কিছু নেই এবং মাবিয়াকেও অন্যরূপ মনে করা যায় না। তিনি যদি ইয়াজিদের দুর্মতির কথা জানতে পারতেন তা হলে কখনও তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন না। মাবিয়ার প্রতি জেনে-শুনে এরূপ করার দোষ, খোদা না করুন, আরোপ করা যায় না।

এরূপ মারোয়ান ইবনেল হুকম ও তাঁর পুত্র। তাঁরা রাজশক্তির অধিকারী হলেও তাঁদের রাজত্বের আদর্শ মিথ্যাচারী ও অত্যাচারীদের ন্যায় ছিল না। তাঁরা সর্বদাই সত্যের জন্য তাঁদের প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করতেন। অবশ্য অনেক সময় অনিবার্য প্রয়োজনে অনেক কিছু করতে হয়েছে, যা একমাত্র ঐক্যের বিনষ্টের ভয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারণ এ একতার শক্তি তাঁদের নিকট সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান পেত। তাঁদের অনুগত ও অনুসারীর সংখ্যাই এর প্রমাণ দেয় এবং পূর্ববর্তীগণ তাঁদের অবস্থা ও

www.amarboi.org

উদ্দেশ্যের যে সংবাদ বর্ণনা করেছেন, তাতেও তা পাওয়া যায়। ইমাম মালেক তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে আবদুল মালেকের কার্যের দ্বারা প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মারোয়ান তাবেলীদের মধ্যে প্রথম স্তরের ছিলেন। তাঁদের ন্যায়নিষ্ঠা সুপরিচিত। অতঃপর আবদুল মালেকের বংশধরদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব বর্তেছে। তাঁরও পূর্বসূরিদের ন্যায় ধর্মকে অনুসরণ করেছেন। তাঁদের মাঝখানে উমর ইবনে আবদুল আজিজ সম্পূর্ণ প্রথম চার খলিফা ও সাহাবীদের আদর্শ অনুসরণে নিজের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিলেন। অতঃপর পরবর্তীতে দেখা দিল, তাদের মধ্যে রাজশক্তি তার পার্থিব প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করল। তারা পার্থিব লালসায় ভুলে তাদের পূর্বসূরিদের সত্যপ্রীতি ও আদর্শনিষ্ঠার কথা বিস্মৃত হল। এর ফলেই মানুষ তাদের কার্যাবলির নিন্দা করে আব্বাসীদের প্রচারণায় সহায়তা করেছিল।

সুতরাং আব্বাসী রাজপুরুষরা দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁরা ন্যায়নিষ্ঠায় যথার্থ ছিলেন এবং রাজশক্তিকে যতদূর সম্ভব সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করেছিলেন। অতঃপর হারুনুর রশীদের বংশধররা এল। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ উভয়েই ছিল। এর পর তাদের সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্ব অর্পিত হল। ততদিনে রাজশক্তি তার বিলাসব্যসনে প্রাচুর্য সৃষ্টি করেছে; তারা তাতে নিমজ্জিত হল এবং পার্থিব জীবন ও মিথ্যার প্রলোভনে ধর্মকে পশ্চাতে ঠেলে দিল। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের অন্তিম দশার নির্দেশ দিলেন। ক্রমে সমগ্র আরবের হাত থেকেই শক্তির দণ্ড খসে পড়ল এবং তাদের স্থান অন্যরা এসে দখল করল। 'আল্লাহ্ কারো উপর রেণু পরিমাণ অত্যাচারও করেন না।'[৬৮]

যে ব্যক্তি এ সকল খলিফা এবং রাজন্যবর্গের চরিত্র ও সত্যানুসন্ধানে তাঁদের মতানৈক্য সম্পর্কে চিন্তা করবেন, তিনি আমাদের বক্তব্যের সত্যতা বুঝতে পারবেন। মাসউদী আবু জাফর আল মনসুর থেকে বনি উমাইয়াদের সম্পর্কে অনুরূপ একটি উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। তাঁর সম্মুখে তাঁর চাচারা বনি উমাইয়াদের কথা উঠালেন তিনি বলেছিলেন, তাদের মধ্যে আবদুল মালেক অত্যাচারী ছিল; সে তার কৃতকর্মের জন্য কোনোপ্রকার চিন্তা করত না। সুলায়মান তার পেট ও পিঠ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। উমর এ অন্ধদের মধ্যে একমাত্র কানাব্যক্তি। তাদের মধ্যে যথার্থ পুরুষ ছিল হিশাম। তিনি আরো বললেন, বনি উমাইয়ারা তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিল এবং আল্লাহ্র প্রদত্ত দানকে সংরক্ষণ করে ভোগ করছিল। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়েছিল, অথচ তুচ্ছ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ করেনি। এভাবে দায়িত্ব তাদের ভোগবিলাসী বংশধরদের উপর ন্যস্ত হল। তারা প্রবৃত্তির তাড়নায় সম্ভোগের আকর্ষণে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। তারা তাঁর অপেক্ষাকরণ ও পাপীর প্রতি আচরণের কোনো ধারণাই পোষণ করত না। অথচ এ দিকে তারা খেলাফতকে কলুষিত করে তুলল, রাজশক্তির দায়িত্বকে গুরুত্ব দিতে ভুলে গেল এবং শাসনব্যবস্থাকে শিথিল করতে লাগল। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের গৌরব ছিনিয়ে নিলেন, তাদেরকে অসম্মানের ভূষণে সজ্জিত করলেন এবং তাদের ভোগ-সম্ভোগকে বিদূরিত করলেন।

---

৬৮. কোরান ৪, ৪০।

www.amarboi.org

অতঃপর মনসুরের সম্মুখে আবদুল্লাহ্ ইবনে মারোয়ান উপস্থিত হয়ে 'নোবা' সম্রাটের সাথে তার সাক্ষাতেব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল। আব্বাসী খলিফা আস্‌সাকফাহ্‌র সময় প্রাণভয়ে পালিয়ে সে উক্ত রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে বলল, আমি সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তাদের সম্রাট এসে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁর জন্য মূল্যবান আসন পেতে রেখেছিলাম, কিন্তু তিনি তাতে না বসে মাটির উপর বসে পড়লেন। আমি তাঁকে বললাম, কী ব্যাপার, আমাদের শয্যায় আপনার বসায় অসুবিধার কারণ কি? তিনি উত্তরে বললেন, আমি একজন সম্রাট; প্রত্যেক সম্রাটের উচিত আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। কারণ তার দানেই আমার এ গৌরবপ্রাপ্তি। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, তোমরা মদ্যপান করতে কেন? অথচ তা তোমাদের ধর্মগ্রন্থে নিষিদ্ধ। আমি বললাম, এটা আমাদের দাস ও অনুসারীদের অজ্ঞতাজনিত দুঃসাহস। তিনি বললেন তোমরা তোমাদের পশু দিয়ে কেন শস্যাদি বিনষ্ট করতে? অথচ তা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। আমি বললাম, এও আমাদের দাস ও অনুসারীরা অজ্ঞতার দরুন করেছে। তিনি বললেন, তা হলে তোমরা গরদ, স্বর্ণ ও রেশমী পোশাক কেন পরিধান করতে? তাও তো তোমাদের ধর্মগ্রন্থে নিষেধ রয়েছে। আমি বললাম, আমাদের রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় আমরা অনারবদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলাম। তারা আমাদের ধর্ম গ্রহণ করে আমাদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও এগুলো পরিধান করেছে। আমার উত্তর শুনে তিনি মাথা নিচু করে আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে বললেন, আমাদের দাস, আমাদের অনুসারী এবং অনারবরা আমাদের ধর্মে প্রবেশ করেছিল। অতঃপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, ব্যাপার তুমি যা বর্ণনা করেছ তা নয়। বরং তোমরাই আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদের উপর নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করেছি এবং যা করার ছিল না, তাই করেছ। তোমাদের অধীনস্থদের উপর অত্যাচার করেছ। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের গৌরবের ভূষণ ছিনিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে অমর্যাদার সাজে সজ্জিত করেছেন। এটা তোমাদের পাপের ফল। আল্লাহ্‌র এ প্রতিশোধ গ্রহণ এখনো তোমাদের মধ্যে শেষ হয়নি। আমি ভয় করেছি, তোমাদের উপর তাঁর শাস্তি আমাদের এ অঞ্চলে আপতিত হবে এবং আমরাও তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ব। আতিথ্য মাত্র তিনদিন। সুতরাং তোমাদের পাথেয় হিসাবে যা কিছু প্রয়োজন, তা নিয়ে আমাদের এ অঞ্চল ত্যাগ কর। মনসুর এ বক্তব্য শুনে অবাক হলেন ও ভাবতে লাগলেন।

পাঠক, আপনি নিশ্চয় বুঝে নিয়েছেন, কীভাবে খেলাফত রাজশক্তিতে পরিণত হয়েছে। সম্পূর্ণ বিষয়টি প্রথম দিকে ছিল খেলাফত এবং তাতে প্রত্যেকের শৃঙ্খলাবিধায়ক শক্তি ছিল ধর্ম। তারা তখন পার্থিব স্বার্থের উপর ধর্মের মূল্যকে স্থান দিতেন। এতে সকলের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ রেখে ব্যক্তিগতভাবে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হতেও দ্বিধা করতেন না। হজরত উসমানকে দেখুন, যখন তিনি তার গৃহে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন, তখন তাঁকে উদ্ধার করতে ইমাম হাসান, হোসাইন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, ইবনে জাফর এবং তাঁদের আরো অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে মুসলমানদের মধ্যে তরবারী উন্মুক্ত করা হতে বিরত করলেন। তাঁর ভয় হল, এর ফলে

www.amarboi.org

সেই সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে, যার উপর ধর্মের ঐক্য দাঁড়িয়ে আছে এবং একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হবে। অথচ তিনি তাঁর বিপদের গুরুত্ব ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন।

হজরত আলীকেই দেখুন, মুগিরা তাঁকে খেলাফতের প্রথম দিকে যুবাইর, মাবিয়া ও তালহাকে নিজ নিজ প্রশাসক পদে বহাল রাখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাতে সকল মানুষ তাঁর আনুগত্যে একত্র হতে পারে এবং ঐক্যবোধ দৃঢ় হয়ে ওঠে। এর পর তিনি তাঁর ইচ্ছামত সবকিছু করতে পারবেন। রাজ্য শাসনের দিক থেকে এ পরামর্শের তুলনা ছিল না। কিন্তু হজরত আলী এর মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী প্রতারণা আবিষ্কার করে অস্বীকার করলেন। পরে একদিন মুগিরা তাঁর কাছে এসে বলেছিলেন, সেইদিন আপনাকে যে পরামর্শ দিয়েছিলাম, তা আপনি জানেন; কিন্তু পরে আমার মনে হয়েছে তা ঠিক ছিল না, বরং আপনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তাই যথার্থ। এর উত্তরে আলী বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি আপনি সেইদিনই আমাকে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন, বরং আজ প্রতারণা করছেন। কিন্তু একমাত্র সত্যের তাগিদেই আপনার সেই ইঙ্গিত আমি পূরণ করতে পারিনি। এভাবেই তাঁরা তাঁদের পার্থিব স্বার্থ নষ্ট করে ধর্মের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন।—আর আমরা?

> ধর্মের জামা ছিঁড়ে দুনিয়ার জামায় তালি লাগাই,
> এতে ধর্মও থাকে না, তালি দেয়া জামাও থাকে না।[৬৯]

পাঠক, আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, কীভাবে বিষয়টি রাজশক্তিতে পরিণত হয়েছে। তাতে খেলাফতের তাৎপর্য হিসাবে ধর্মের সংরক্ষণ, তার আদর্শ স্থাপন ও সত্যের পন্থা অনুসরণই শুধু অবশিষ্ট আছে। এর শুধু একটি শক্তিতেই পরিবর্তন ঘটেছে, তা এ যে, আগে শৃঙ্খলাবিধায়ক শক্তি ছিল ধর্ম, এখন তার স্থলে গোত্রপ্রীতি ও তরবারী। এভাবেই মাবিয়া মারোয়ান, তাঁর পুত্র আবদুল মালেক এবং আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে হারুনুর রশীদ ও তাঁর কোনো পুত্রের আমল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অতঃপর খেলাফতের এ তাৎপর্যও আর থাকেনি, শুধু তার নামটিই বাকি ছিল এবং সম্পূর্ণ বিষয়টিই তখন রাজশক্তির সাধারণ রূপে পরিণত হল। প্রাধান্য বিস্তার তার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করল। তার স্বার্থের মধ্যে ভোগ-সম্ভোগের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে লাগল। আবদুল মালেকের সন্তান-সন্ততির জন্য এবং হারুনুর রশীদের পরবর্তী আব্বাসী সম্রাটদের জন্য অবস্থা অনুরূপই ছিল। তখনও তাদের মধ্যে খেলাফতের নাম বাকি আছে, কারণ তখনও আরব গোত্রপ্রীতি বিরাজমান। বস্তুত খেলাফত ও রাজশক্তি দুটি পর্যায় মাত্র, পরস্পর সংগ্রথিত। অতঃপর আরবীয় গোত্রপ্রীতি বিনষ্টের ফলে, তাদের বংশধারা ও অবস্থা-ব্যবস্থা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় খেলাফতের নিদর্শনাদিও লোপ পেল। তখন তা শুধুমাত্র রাজশক্তি, যেমন পূর্বাঞ্চলের অনারব জাতিগুলোর মধ্যে রাজশক্তি ছিল। তারা একমাত্র পুণ্যলাভের জন্যই খলিফাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। এছাড়া রাজশক্তি অনুসারেই তাদের উপাধি ও গুণাবলি নির্ধারিত হয়। এতে খলিফার কোনো হাত নেই। এভাবে মাগরিবে জানাতী সম্রাটগণ

৬৯. এ কাব্যাংশটি কবি আবুল আতাহিয়ার বলে মনে করা হয়।

www.amarboi.org

আচরণ করেছেন। যেমন উবাইদীদের সাথে সিনহাজারা এবং আন্দালুসের উমাইয়াদের সাথে এবং কায়রোয়ানের উবাইদীদের সাথে মেগরাওয়া ও বনি ইয়াফরানের ব্যবহার।

এর ফলে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে, খেলাফত প্রথম দিকে রাজশক্তির মিশ্রণ ছাড়াই অস্তিত্বে আসে; অতঃপর তাদের তাৎপর্য মিশ্রিত হয়ে ওঠে এবং একে অন্যের সাথে মিলে যায়। এর পর রাজশক্তি একক হয়ে দাঁড়ায়। এখানেই তার গোত্রপ্রীতি খেলাফতের অনুরূপ শক্তি থেকে পৃথক হয়। আল্লাহ্ দিবারাত্রি নির্ধারণ করে থাকেন;[৭০] তিনি একক ও পরাক্রমশালী।

৭০. কোরান ৭৩, ২০।

www.amarboi.org

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[আনুগত্য-শপথের তাৎপর্য]

জেনে রাখুন, আরবি 'বায়আত' শব্দের অর্থ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ। শপথ গ্রহণকারী তাঁর সর্দারকে এ বলে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে নিজের জন্য ও মুসলমানদের জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিবে এবং কোনো ব্যাপারে তাঁর সাথে কলহে প্রবৃত্ত হবে না। এতদ্ব্যতীত সর্দার তাকে যে দায়িত্ব পালন করতে দিবেন, তা ভাল হোক বা মন্দ হোক, সে তা পালন করবে। এভাবে তারা যখন কোনো সর্দারের আনুগত্য স্বীকার করে শপথ গ্রহণ করে, তখন বিষয়টিতে গুরুত্ব সৃষ্টির জন্য তাঁর হাতে তাদের হাত ন্যস্ত করে। তা যেন ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কের মতো হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই তাকে 'বায়আত' বলা হয়। তা 'বাআ' শব্দের ক্রিয়াবিশেষ্য এবং বায়আতের অর্থ হয় করমর্দন। এটাই ধর্মীয় বিধান ও অভিধানের দিক থেকে এর সুপরিচিত তাৎপর্য। হাদিসে উল্লেখিত আকাবায়[৭১] রাত্রিবেলা সেই বৃক্ষের নিকটে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রতি বায়আত, অথবা যেখানেই এ শব্দটি পাওয়া যাক না কেন তার অর্থ একই। এটাই খলিফাদের প্রতি বায়আতের অর্থ এবং এটা থেকেই বায়আতের 'আয়মান' শব্দটির তাৎপর্য নির্গত হয়েছে। খলিফাগণ তাদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণকালে তাকে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি হিসাবে গণ্য করতেন। এজন্যই এ সামগ্রিক আনুগত্যের ব্যাপারটিকে বায়আতের প্রতিশ্রুতি বলে নামকরণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণভাবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জবরদস্তি বিদ্যমান। এ কারণে ইমাম মালেক (রাঃ) যখন জবরদস্তিমূলক প্রতিশ্রুতির অন্যায্যতা সম্পর্কে ধর্মীয় বিধান দিলেন, তখন তা শাসকগণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা এর মধ্যে বায়আতের প্রতিশ্রুতির সমালোচনা লক্ষ করেছিল। এজন্য ইমাম মালেক যথেষ্ট নিগৃহীত হয়েছিলেন।

বর্তমানকালে বায়আতের সুপরিচিত সংজ্ঞা হল পারসিক সম্রাটদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ধারা অনুসারে মাটিতে, হাতে-পায়ে অথবা পরিধেয় বস্ত্রের আঁচলে চুমা দেয়া। রূপকভাবে তার উপর প্রকৃত বায়আত বা আনুগত্য শপথের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তার মধ্যে যে নম্রতা ও শিষ্টাচার বিদ্যমান, তা আনুগত্য ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদিরই পরিচায়ক। তা এভাবেই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং একটি সর্বজনসম্মত তাৎপর্যে বিশিষ্ট হয়েছে। এজন্যই তার প্রকৃত স্বরূপ করমর্দনের বিষয়টি পরিত্যক্ত হয়েছে। কারণ তাতে নেতৃত্বের ও রাজকীয় পদমর্যাদার পরিপন্থী এক প্রকার নমনীয়তা

---

৭১. হিজরতের পূর্বে মদিনাবাসীদের সাথে এটা সংঘটিত হয়।

www.amarboi.org

ও হেয়তা বিদ্যমান। অবশ্য এতদ্‌সত্ত্বেও অল্প কিছু সংখ্যক শাসকের ক্ষেত্রে বিনয় প্রকাশের জন্য এর ব্যবহার দেখা যায়। তাঁরা গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোক ও বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ প্রজাদের সাথে করমর্দন করে থাকেন।

পাঠক, সর্বজনসম্মত এ বায়আতের স্বরূপ বুঝে নিন। কারণ মানুষের পক্ষে তার স্বরূপ উপলব্ধি করা কিছুটা অসুবিধাজনক। অথচ এর সাহায্যেই সম্রাট বা ইমামের প্রতি তার দায়িত্ব বর্তিয়ে থাকে। সুতরাং বুঝে-শুনে তাতে অগ্রসর হওয়া উচিত, যাতে তার কার্যাবলি অনর্থক ও ক্ষতিকর না হয়ে দাঁড়ায়। পাঠক, রাজন্যবর্গের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনার কর্তব্যকেও এর সাথে বিবেচনা করুন। আল্লাহ্ শক্তিমান ও পরাক্রান্ত।[৭২]

---

৭২. কোরান ১১, ৬৬; ৪২, ১৯।

www.amarboi.org

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ]

জেনে রাখুন, ইতিপূর্বে আমরা ইমামত ও তার ধর্মীয় বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাতে কল্যাণধর্মিতা বিদ্যমান। বস্তুত তার স্বরূপ হল জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। কেননা ইমাম তাদের অভিভাবক, তাদের বিশ্বাসের পাত্র, যিনি জীবিতাবস্থায় তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন এবং মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিদান অব্যাহত থাকবে। তিনি তাদের জন্য এমন একজনকে অভিভাবক নিযুক্ত করে যাবেন, যেমন অভিভাবক তিনি নিজে ছিলেন এবং পরবর্তীজনকেও মানুষ তেমনি বিশ্বাস করবে, যেমন পূর্ববর্তীজনকে করেছেন। ধর্মীয় বিধান অনুসারে সর্বসম্মতভাবে এরূপ দায়িত্ব প্রদান ও অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জাতির জন্য বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। হজরত আবুবকর তাঁর শাসনকালে সাহাবীদের সম্মুখে হজর উমরের প্রতি অনুরূপ দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাহাবীরা তাকে বৈধ বলে স্বীকার করেছেন এবং হজরত উমরের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশকে অবশ্য কর্তব্য বলে ভেবেছেন। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

এরূপ হজরত উমরও সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের অবশিষ্ট ছয়জনের[৭৩] পরামর্শের উপর উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তারা সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত করতে গিয়ে একে অপরের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেন। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আবদুর রহমান ইবনে আউফের উপর বর্তায়। তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও মুসলমানদের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারেন যে, তারা মোটামুটি উসমান ও আলীর ব্যাপারে একমত। অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে হজরত উসমানকে প্রাধান্য দেন এবং পূর্ববর্তী দুইজন খলিফার আদর্শ অনুসরণ ও যতদূর সম্ভব সব বিষয়ে তাঁদের অনুপাত থাকার অঙ্গীকারে তাঁর হাতে বায়আত করেন। এভাবে হজরত উসমানের বিষয়টি স্থিরকৃত হয় এবং সকলের জন্য তাঁর নেতৃত্বে আনুগত্য জ্ঞাপন অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রথম ও দ্বিতীয় উত্তরাধিকার নির্ধারণে সাহাবীদের বিরাট অংশ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কেউই এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেননি। সুতরাং এটা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তাঁরা সকলেই এ ব্যাপারে একমত ছিলেন এবং তাঁরা তার ধর্মীয় বিধানগুলো সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। তাঁদের এ সর্বসম্মতি প্রমাণ হিসাবে সুপরিচিত।

---

৭৩. এরা হলেন হজরত উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সাদ ইবনে আবু ওক্কাস ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)।

www.amarboi.org

এভাবে কোনো ইমাম যদি তাঁর পিতা বা পুত্রকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেন, তা হলে তাঁর দোষারোপ করা যায় না। কারণ যাকে সকলে জীবৎকালে তাদের বিষয় সম্পাদনে বিশ্বাস করেছে, তিনি মৃত্যুর পর তাদের ক্ষতি করবেন, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। অনেকে অবশ্য পিতা ও পুত্র এবং পিতা ব্যতীত শুধু পুত্রের ভাবী দায়িত্বের ভারার্পণকে দূষণীয় মনে করেন। এ দিক থেকে দেখলে তাকে আপত্তি করার কিছু থাকে না। তদুপরি অনুরূপ উত্তরাধিকার নির্ধারণে যদি কোনোপ্রকার প্রয়োজনীয়তা, যেমন কোনো বিশেষ কল্যাণের প্রতিষ্ঠা বা অকল্যাণের প্রতিরোধ দেখা দেয় তা হলেও আপত্তির কোনো অবকাশই থাকে না। যেমন মাবিয়ার তৎপুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে যদিও মাবিয়ার কার্য প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার মত জনমত তাঁর পক্ষে ছিল, তথাপি তিনি মানুষের মধ্যের ঐক্য রক্ষার মতো বিশেষ কল্যাণধর্মীতার আকর্ষণেই অন্যকে না করে তাঁর পুত্রকে উত্তরাধিকারী করেছিলেন। কারণ বনি উমাইয়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একতার শক্তি সকলের ঐক্যকে সুদৃঢ় করার পক্ষে তখন যথেষ্ট ছিল। কেননা বনি উমাইয়া তখন তাদের মধ্য থেকে কাউকে ব্যতীত অন্যকে উত্তরাধিকারী করতে রাজি হত না। বস্তুত তাঁরা তখন কোরায়েশের গোত্রশক্তি, জাতির সকলের আনুগত্য ও সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তারের অধিকারী। এ কারণেই অন্যদের যাকে অধিকতর উপযুক্ত মনে হয়েছিল, তাকে ত্যাগ করে তারা নিজেদের একজনকে প্রাধান্য দিয়েছে। এটা করতে গিয়ে তারা শ্রেষ্ঠকে রেখে অশ্রেষ্ঠের মনোনয়নকে বেছে নিয়েছে। কারণ এরূপ করার মধ্যেই ধর্মপ্রবর্তকের মহান উদ্দেশ্য, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার একমাত্র পথ ছিল। সুতরাং মাবিয়া সম্পর্কে যদি অনুরূপ কিছু বিবেচনা না করা হয়, তা হলে তাঁর সাহচর্যের মর্যাদা ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ অবশ্যই এ ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করত।

তদুপরি মান্যবান সাহাবীদের উপস্থিত ও তাঁদের নীরব সম্মতি এ ব্যাপারে সন্দেহকে দূর করার জন্য যথেষ্ট। তাঁদেরকে সত্যের মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে অকর্মণ্য মনে করার কোনো কারণ নেই। এবং স্বয়ং মাবিয়াও এমন ছিলেন না, যাকে কোনোপ্রকার মর্যাদার প্রলোভন সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তাঁদের প্রত্যেকেই এরূপ ধারণা থেকে বহু উর্ধ্বে অবস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা এর পরিপন্থী ছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর যে এটা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন, তার কারণ তিনি কোনো ব্যাপারেই জড়িত থাকতে ভালোবাসতেন না; যে ব্যাপার ন্যায় বা অন্যায় যাচাই হোক না কেন। তাঁর এ চরিত্রের কথা সকলের নিকট সুপরিচিত। সুতরাং এ উত্তরাধিকারের ব্যাপারে একমাত্র ইবনে যুবায়ের ব্যতীত আর সকলেই একমত ছিলেন। এ ব্যাপারে মতানৈক্যের স্বল্পতা সকলের নিকটই পরিচিত।

অতঃপর মাবিয়ার পরবর্তীকালে বহু খলিফাই অনুরূপ উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা সকলেই সত্যকে ভালোবাসতেন এবং তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টিত হতেন। যেমন বনি উমাইয়ার আবদুল মালেক ও সুলায়মান এবং বনি আব্বাসের আস্‌সাফ্‌ফাহ, আলমনসুর, আলমাহদী, আররশীদ প্রমুখ খলিফাগণ। তাঁদের ন্যায় আরো অনেকের কথাই বলা যায়, যাদের ন্যায়পরায়ণতা, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা ও সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রচেষ্টার বিষয় সর্বজন পরিচিত। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে নিজ পুত্র বা ভাইকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য তাঁদেরকে দোষী করা যায় না এবং এমন

www.amarboi.org

কথাও বলা যায় না যে, তারা প্রথম চার খলিফার আদর্শ ত্যাগ করেছেন। কারণ তাঁদের অবস্থার সাথে পরবর্তীদের অবস্থার কোনো মিল নেই। কেননা তাঁরা এমন এক পরিবেশে ছিলেন, যেখানে রাজশক্তির স্বভাব দেখা দেয়নি। তাঁদের মধ্যকার শৃঙ্খলাবিধায়ক শক্তি ছিল ধর্ম এবং প্রত্যেকেই এ শক্তির দ্বারা পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রিত হতেন। সুতরাং তাঁরা তাঁকেই উত্তরাধিকারী করতেন, যাকে ধর্মীয় বিধান অনুমতি দিত এবং এ ক্ষেত্রে তাকেই সকলের উপর প্রাধান্য দিতেন ও অন্যদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের নিজ নিজ ধর্মমতই সংযত করে রাখত। কিন্তু তাঁদের পরবর্তীকালে মাবিয়ার সময় থেকে গোত্রশক্তির প্রভাব রাজশক্তিকে আকর্ষণ করে এনেছিল এবং ধর্মের সংযম দুর্বল হয়ে পড়ায় রাজ্যশাসন ও গোত্রশক্তির প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে যদি গোত্রপ্রীতির সন্তুষ্টির বাইরে কাউকেও উত্তরাধিকারী করা হত, তা হলে তার প্রতিবাদ উঠত, অতিদ্রুত শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ত এবং ঐক্যের স্থলে মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

এক ব্যক্তি হজরত আলীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, মুসলমানদের কী হল যে, তারা আপনার সম্পর্কে মতানৈক্য পোষণ করে; অথচ আবুবকর ও উমর সম্পর্কে তাদের কোনো মতভেদ নেই! আলী উত্তরে বলেছিলেন, কারণ আবুবকর ও উমর আমার মত লোকদের শাসক ছিলেন আর আমি তোমার মত লোকদের শাসক নিযুক্ত হয়েছি। এর দ্বারা তিনি ধর্মীয় সংযমের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। পাঠক, সম্রাট মামুনের ব্যাপারটি লক্ষ করুন না, তিনি যখন আলী ইবনে মুসা ইবনে জাফর সাদেককে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলেন এবং তাঁর উপাধি দিলেন 'আররেজা', তখন আব্বাসীরা কীভাবে তার বিরোধিতা করেছিল! তাঁরা মামুনের আনুগত্য ত্যাগ করে তাঁর চাচা ইব্রাহীম ইবনে আলমাহদীর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিল। এর ফলে বাগদাদে গোলযোগ, মতানৈক্য, চুরি-ডাকাতি, লুটপাট ও ক্ষমতা দখলের চেষ্টা এত বৃদ্ধি পায় যে, সাম্রাজ্যের ভিত্তি কেঁপে ওঠে। তাড়াতাড়ি মামুনকে খোরাসান থেকে এনে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হয়। সুতরাং উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই এ বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে। যুগ বিভিন্ন হয়ে থাকে এবং এর এ বিভিন্নতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গোত্র, গোত্রপ্রীতি ও অন্যান্য বিষয় প্রাধান্য বিস্তার করে। সর্বত্রই কল্যাণধর্মিতা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রতিটি যুগের জন্যই বিশেষ নিয়মনীতির প্রয়োজন। এটাই বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র লীলা।

অবশ্য এ উত্তরাধিকার নির্ধারণের উদ্দেশ্য যদি সম্পদের উত্তরাধিকার সাব্যস্তকরণ হয়, তা হলে তার সাথে ধর্মের কোনো সংশ্রব নেই। তা একটি বিশেষ স্বভাব, যা আল্লাহ্‌ তাঁর ইচ্ছামতো অনেকের মধ্যে সৃষ্টি করে থাকেন। তথাপি সেই ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকার সম্পর্কে শুভ পরিণামের কামনা করা দরকার এবং ধর্মের দিক থেকে যাতে তা অহেতুক পদমর্যাদার ব্যাপার না হয়ে দাঁড়ায়, তৎসম্পর্কেও সম্যক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কারণ সাম্রাজ্য আল্লাহ্‌র, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।[৭৪]

৭৪. কোরান ২২, ৫৬। অনুরূপ বক্তব্য বিদ্যমান।

www.amarboi.org

এস্থলে এমন কতগুলো বিষয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথম : ইয়াজিদের মধ্যে তাঁর শাসনকালে কী দুর্মতি দেখা দিয়েছিল। পাঠক, সাবধান এটা মনে করবেন না যে, হজরত মাবিয়া (রাঃ) ইয়াজিদের এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন। কারণ তিনি এরূপ ব্যাপার থেকে অনেক বেশি ন্যায়পরায়ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। বরং তিনি তাকে জীবৎকালে সঙ্গীত শ্রবণ সম্পর্কে ভর্ৎসনা করেছিলেন এবং তা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। অবশ্য এর পরিমাণও ছিল খুব সামান্য। অন্যদিকে এ ব্যাপারে তাঁদের মতামতও ছিল বিভিন্ন। সুতরাং ইয়াজিদের মধ্যে যখন দুর্মতি দেখা দিল, তখন সাহাবীরা তার ব্যাপারে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তার আনুগত্য ত্যাগ করতে মত দিলেন। যেমন হজরত ইমাম হুসাইন ও আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এবং তাঁদের অনুসারিগণ। আবার অনেকে তাকেই ঠিক রাখতে বললেন। কারণ তাঁর বিরোধিতার মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি ও প্রাণহানির যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। অথচ তাকে তাঁরা পুরোপুরি মেনেও নিতে পারছিলেন না। তথাপি ইয়াজিদের ক্ষমতার ভয় তাঁদের ছিল। কারণ তার পশ্চাতে বনি উমাইয়াদের সমস্ত গোত্রশক্তি এবং কোরায়েশের নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ লোকের সমর্থন বিদ্যমান। এটা মুজারের সমগ্র গোত্রপ্রীতিকেই আকর্ষণ করার শক্তি রাখে। বস্তুত তা যে-কোনো ক্ষমতা থেকে অধিকতর শক্তিমান এবং তার সম্মুখীন হবার শক্তি তাঁদের মধ্যে নেই। এজন্যই তাঁরা ইয়াজিদ সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা তার সুমতির জন্য প্রার্থনা ও তার কবল থেকে মুক্তির জন্য আন্তরিক কামনা পোষণ করছিলেন। সমগ্র মুসলিম সমাজের অবস্থা তখন এরূপ। তাদের প্রত্যেকেই সত্যকে অনুসরণ করছিলেন এবং এ উভয় দলের মধ্যে কারো সম্পর্কে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাদের পুণ্যাসক্তি ও সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্য সকলের নিকট সুপরিচিত। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের আদর্শ অনুসরণের শক্তি দিন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর উত্তরাধিকারী নির্ধারণের স্বরূপ এবং এ প্রসঙ্গে হজরত আলীকে তৎকর্তৃক মনোনয়ন দানের ব্যাপার সম্পর্কীয় শিয়াদের দাবি। বস্তুত এ বিষয়টি সিদ্ধ হয়নি এবং ঐতিহ্যবিদগণের কেউই এটা বর্ণনা করেননি। বিশুদ্ধ হাদিসে[৭৫] যা আছে, তা এ যে, তিনি কাগজ-কালি চেয়েছিলেন তাঁর অন্তিম উপদেশ লিখিয়ে যাওয়ার জন্য; কিন্তু হজরত উমর নিষেধ করেন। সুতরাং এতে বোঝা যায় যে, ব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হয়নি। এরূপ হজরত উমরকে যখন উত্তরাধিকার সম্পর্কে নিন্দা করে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বলেছিলেন, যদি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে, ক্ষতি নেই; কারণ আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তা করেছেন অর্থাৎ হজরত আবুবকর এবং যদি না করি, তাতেও ক্ষতি নেই; কারণ আমার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তা করেননি অর্থাৎ হজরত মুহম্মদ (সঃ)। এরূপ হজরত আলী (রাঃ) ও হজরত আব্বাস (রাঃ)-কে বলেছিলেন। শেষোক্তজন তাঁকে হজরতের নিকট থেকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ব্যাপারটি জেনে নিতে বললে তিনি তা অস্বীকার করে বলেছিলেন, যদি তিনি

৭৫. বোখারী দ্র:।

www.amarboi.org

এ ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হলে এ জীবনে আর তার অধিকার পাব না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আলীকে যে অন্তিম নির্দেশ দেয়া হয়নি, তা তিনি স্বয়ং জানতেন এবং অন্যকে যে দেয়া হয়নি, তাও ঠিক। শিয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়ের এরূপ সন্দেহ হওয়ার কারণ তাদের সেই ধারণা থেকে জ্ঞাত, যাতে ইমামতকে ধর্মের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু এটা তদ্রূপ নয়। বস্তুত এটা এক সর্বজনীন কল্যাণমূলক দায়িত্ব, যা নির্ধারণের ভার সকলের উপর ন্যস্ত। যদি তা ধর্মের ভিত্তি হত, তা হলে তার অবস্থা নামাজের ন্যায় সুস্পষ্ট হত এবং তাতে তিনি অবশ্য উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে যেতেন, যেমন নামাজের ইমামতির জন্য আবুবকরকে উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারটিও নামাজের ব্যাপারের মতোই সকলের নিকট সুপরিচিত হয়ে উঠত।

বস্তুত হজরত আবুবকরের খেলাফতের জন্য সাহাবীদের নামাজের উপর অনুমান করে এ বলে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যেহেতু আমাদের ধর্মের ব্যাপারে তাঁকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং আমরা কি আমাদের দুনিয়ার ব্যাপারে তাঁকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করব না; এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, অন্তিম নির্দেশের কোনো ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়নি। এতে এ বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইমামত ও উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ব্যাপারটি তৎকালে আজকের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অন্যদিকে ঐক্য ও অনৈক্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি হিসাবে গোত্রপ্রীতির অবস্থাও বর্তমানের ন্যায় ছিল না। কারণ ধর্ম ও ইসলামের সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক ঘটনাবলির মাধ্যমে মানুষের মনে এমন একটা সম্প্রীতির ভাব জাগ্রত করেছিল যে, তারা তার জন্য মৃত্যুর সম্মুখীন হতেও দ্বিধা করত না। এর কারণও ছিল; কেননা তখন তারা ফেরেশতাদের সাহায্যে আসমানী বাণীর অনবরত আগমন এবং প্রতিটি ঘটনায় আল্লাহ্র নির্দেশ লাভের মতো অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করছেন। এর ফলে মানুষের মধ্যে যে আনুগত্য ও বশ্যতার ভাব দেখা দিয়েছিল, তার জন্যই গোত্রপ্রীতির প্রয়োজন আপাতত রহিত ছিল। কারণ তাদের মন অস্বাভাবিক-অলৌকিক ঘটনাবলি ও ঐশ্বরিক শক্তির পর্যায়ক্রমিক বিকাশে আচ্ছন্ন হয়েছিল এবং ফেরেশতাদের আগমনের মত ঘটনার বাস্তবতায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যথার্থভাবে বলতে গেলে এ সকলের ধারাবাহিকতায় তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং খেলাফত, রাজশক্তি, উত্তরাধিকার ও গোত্রপ্রীতি এবং এপ্রকার অন্যান্য বিষয়, সকলেই একসঙ্গে মিশ্রিত হয়ে একটি অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, যা তৎকালে অত্যন্ত বাস্তব ছিল।

অতঃপর যখন অলৌকিক কার্যাবলির অনুপস্থিতির দরুন এরূপ সাহায্য সীমিত হয়ে আসল এবং যারা এর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাঁরাও অন্তর্ধান করলেন, তখন অবস্থার ঐ বিশেষত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে লাগল। অস্বাভাবিক ঘটনাবলির প্রভাব কমে যাওয়ার ফলে পুনরায় পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসল। তখন গোত্রপ্রীতি ও অভ্যাসসমূহকে স্বাভাবিক ধারায় কল্যাণ-অকল্যাণের নিয়ামক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দিল। সুতরাং খেলাফত ও রাজশক্তির ব্যাপারে তাদের ধারণা মতো উত্তরাধিকারী নির্ধারণের প্রশ্নটি অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করল, যা পূর্বে অনুরূপ ছিল না।

www.amarboi.org

পাঠক, নবী (সঃ)-এর সময়ে খেলাফতের কি অবস্থা ছিল, লক্ষ করুন। তিনি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে যাননি। অতঃপর খলিফাদের সময়ে তার গুরুত্ব কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেল। কারণ তখন পরস্পর সহায়তা, সংগ্রাম, বিদ্রোহ দমন ও বিজয়াভিযানের যুগ। অথচ তখনও তাঁরা এ ব্যাপারে কিছু করা বা না করার ইচ্ছার স্বাধীনতা ভোগ করছেন, যেমন আমরা হজরত উমরের বক্তব্য বর্ণনা করেছি। অতঃপর বর্তমান যুগে তা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কারণ উত্তরাধিকারী নির্ধারণ ব্যতীত পরস্পর সহায়তার ঐক্য ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সুতরাং এখন গোত্রপ্রীতিকে শক্তি হিসাবে বিবেচনা করার সময় এসেছে। কারণ এখন তাই একমাত্র অকল্যাণ ও অনৈক্য দূর করে সম্প্রীতি ও একতা গড়ে তুলতে পারে এবং তাকেই ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধন ও বিধি-বিধানের প্রতিষ্ঠার নিয়ামক হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

তৃতীয় বিষয়টি হল, সাহাবী ও তাবেয়ীনদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ইসলামী যুগের বিভিন্ন যুগের স্বরূপ। জেনে রাখুন, তাঁদের মতানৈক্য একমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারেই দেখা দিয়েছে এবং তাও বিশুদ্ধ প্রমাণাদি ও যথার্থ উপলব্ধি থেকেই জন্মেছে। বস্তুত সত্যানুসন্ধানীরা যখন মতানৈক্যে উপনীত হন, তখন যদিও আমরা বলে থাকি যে, এ সকল অনুসন্ধেয় বিষয়ে সত্য যে কোনো এক পক্ষে বিদ্যমান এবং যে পক্ষ তার লক্ষ ভেদ করতে ব্যর্থ হবে, সেই ভুলের অধিকারী; তথাপি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে সত্যের সেই পক্ষ অনির্ধারিত। সুতরাং তাতে যেমন উভয় পক্ষের সত্যের অনুসারী হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি ভুলের পক্ষও অনির্ধারিত থেকে যাচ্ছে এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারেই তাদের কোনো পক্ষেরই কোনো পাপ নেই। যদি আমরা এ কথা বলতে পারি যে, তাদের প্রত্যেকেই সত্যের অনুসারী হতে পারে এবং প্রত্যেক সত্যানুসন্ধানীই সঠিক পথে পদচারণা করছে, তা হলে আমাদের এ বক্তব্যই তাদের ভুল ও পাপের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। যথার্থভাবে দেখতে গেলে সাহাবী ও তাবেয়ীনদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল, তা মূলত ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণাজাত সত্যানুসন্ধানী মতানৈক্য এবং তার বিধান হল এই।

ইসলামী যুগে মতানৈক্যের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তা মোটামুটি এ মাবিয়া, যুবায়ের, আয়েশা ও তালহার সাথে আলীর ঘটনা, ইয়াজিদের সাথে হোসাইনের ঘটনা এবং আবদুল মালেকের সাথে ইবনে যুবায়েরের ঘটনা।

আলীর ঘটনাটি এই যে, উসমানের নিহত হওয়ার সময় মানুষ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়েছিল, তারা আলীর বায়আতে উপস্থিত হয়নি। যারা উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যেও অনেকে বায়আত করেছে। আবার অনেকে অন্যান্য লোকের আগমনের জন্যও ইমামতের ব্যাপারে তাদের একতার জন্য অপেক্ষা করেছে। যেমন—সাদ, সায়িদ, ইবনে উমর, উসামা ইবনে যায়েদ, মুগিরা ইবনে শুবা আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, কুদামা ইবনে মাজউন, আবু সাইদ খুদরী, কাব ইবনে উজযা, কাব ইবনে মালেক, নুমান ইবনে বশির, হাসমান ইবনে সাবেত, মুসাল্লামা ইবনে মুখাল্লাদ, ফুজালা, ইবনে উবাইদ ও অনান্য বিশিষ্ট সাহাবী অপেক্ষা করেন। বিভিন্ন শহরে যাঁরা অবস্থান করছিলেন, তারাও উসমানের রক্তের প্রতিশোধ দাবি করে বায়আত থেকে দূরে রইলেন। এর ফলে

www.amarboi.org

পরিস্থিতি অরাজক হয়ে উঠল এবং মানুষ কাউকে শাসক নিযুক্ত করা যায়, তৎসম্পর্কে মুসলমানদের পরামর্শসভা ডাকার জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। তারা আলীকে উসমানের সাহায্যের ব্যাপারে ও হত্যাকারীদের সম্পর্কে চুপ থাকা সম্পর্কে দোষী করল বটে; কিন্তু কিছুতেই তাঁর তাতে অংশগ্রহণের দোষারোপ করেনি। আল্লাহ্ না করুন তিনি তা থেকে অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। এমন কি মাবিয়াও যখন তাঁর উপর দোষারোপ করলেন, তাও শুধুমাত্র চুপ থাকার ব্যাপারেই ছিল। অতঃপর তাঁরা বিভক্ত হয়ে পড়লেন। আলী মত প্রকাশ করলেন যে, তাঁর বায়আত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং নবী (সঃ) এর আবাসভূমি, সাহাবীদের বাসস্থান মদিনায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাই এ ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছেন। সুতরাং অন্য যাঁরা দেরি করছেন, তাঁদের জন্য তাঁর প্রতি আনুগত্য জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উসমানের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি এজন্য দেরি করলেন, যাতে সকল মুসলমান একত্র হয়ে শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তখন উক্ত ব্যাপার সহজে সম্পন্ন করা যাবে। অন্যরা মনে করলেন যে, তাঁর বায়আত অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ নেতৃস্থানীয় সকল সাহাবী তখন বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিলেন। তাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই মদিনায় উপস্থিত ছিলেন। বস্তুত নেতৃস্থানীয় সকলের ঐকমত্য ব্যতীত বায়আত অনুষ্ঠিত হতে পারে না এবং যারা বায়আত করেছে তাদেরও এপ্রকার অল্পসংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বায়আত অন্যদের উপর জরুরি নয়। মুসলমানগণ তখন অরাজক অবস্থার অধীন; তারা প্রথমে উসমানের রক্তের প্রতিশোধ দাবি করল এবং পরে ইমাম নির্ধারণ করতে ঐকমত্য হতে চাইল। এ দাবির প্রতি সমর্থন জানালেন মাবিয়া, আমর ইবনে আলআস, উম্মুল মোমেনীন আয়েশা, যুবায়ের ও তৎপুত্র আবদুল্লাহ্, তালহা ও তৎপুত্র মুহম্মদ, সাদ সাইদ, নুমান ইবনে বশির, মাবিয়া ইবনে খুদাইজ এবং অন্যান্য সাহাবী, যাঁরা মদিনায় থেকেও আলীর বায়আত হতে দূরে থাকেন, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অবশ্য তাঁদের পরবর্তী পুরুষের প্রায় সকলেই আলীর বায়আত অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে একমত ছিলেন এবং সকল মুসলমানের জন্য তা জরুরি বলেও মনে করতেন। তাঁরা আলীর মতকেই সঠিক ভাবতেন এবং মাবিয়া ও তৎপক্ষীয় অন্য সকলের মতকে ভুল বলে জানতেন। বিশেষ করে তালহা ও যুবায়ের, যাঁরা আলীর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেও ফিরে যান বলে কথিত হয়। অবশ্য এতদসত্ত্বেও তাদের কোনোপক্ষের উপরেই পাপ বর্তায় না। কারণ সত্যানুসন্ধানীদের অবস্থাই এরূপ। কারণ হজরত আলীর ব্যাপারটি প্রথম যুগের দুটি মতের একটির উপর দ্বিতীয় যুগের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলেই সকলের নিকট পরিচিত। হজরত আলীকে জমল ও সিফ্‌ফিন যুদ্ধের নিহতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল; উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ, এদের মধ্যে মৃত প্রতিটি লোক, যার অন্তর পরিষ্কার, সে বেহেশতী হবে। তিনি উভয় পক্ষের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাবারী ও অন্যরা এটা বর্ণনা করেছেন। পাঠক, তাঁদের কারো ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে সন্দেহ করার বা তাদের সম্পর্কে সমালোচনা করার কিছু নেই। তাঁরা, যেমন আপনি জানেন এবং তাঁদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম সকলই প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত। তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা আহলে সুন্নতের নিকট সর্বদা গ্রাহ্য বলে বিবেচিত।

www.amarboi.org

অবশ্য যারা আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের সম্পর্কে মুতাজিলাদের একটি মত বিদ্যমান, কিন্তু সত্যনিষ্ঠরা তার প্রতি দৃষ্টি দেননি এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণও মনে করেননি।[৭৬]

পাঠক আপনি যদি সুবিচারের দৃষ্টিতে দেখেন, তা হলে হজরত উসমানের ব্যাপারে মানুষের মতভেদ এবং পরবর্তীকালে সাহাবীদের বিভিন্ন মতানৈক্য সম্পর্কে অবশ্যই ক্ষমার হেতু খুঁজে পাবেন। বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ্ জাতিকে পরীক্ষা করার জন্যই এ বিপদ আপতিত করেছিলেন। তারা এমন সময়ে, যখন চারদিকে আল্লাহ্ তাদের শত্রু বিনষ্ট করেছেন, শত্রুদের ভূমি ও গৃহাদির উপর তাদেরকে আধিপত্য দিয়েছেন এবং তারা সীমান্তবর্তী শহর বসরা, কুফা, সিরিয়া, মিশর্ প্রভৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ এ সকল শহরে যে সকল আরব উপস্থিত হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল অমার্জিত; তারা নবী (সঃ)-এর সাহচর্য পায়নি বললেই চলে। তারা তাঁর চরিত্র, নম্রতা প্রভৃতির প্রভাবে সংশোধিত হয়নি এবং তাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। এর ফলে তাদের মধ্যে মূর্খতার যুগের স্থূলতা গোত্রপ্রীতি, অহংকার ও বিশ্বাসজনিত স্থৈর্যের অভাব রয়ে গিয়েছিল। তদুপরি ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করার পর তা প্রধানত মোহাজের ও আনসারদের নেতৃত্বাধীনে থেকে যায়। তাঁরা কোরায়েশ, কেনানা, সকিফ, হুজাইল প্রভৃতি গোত্র এবং হেজাজ ও ইয়াসরাবের অন্তর্গত। তাঁরাই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে প্রাধান্য লাভ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী মুসলমানদের মনে তাঁদের এরূপ অবাধ নেতৃত্ব ভালো লাগল না এবং তারা হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে লাগল। কারণ তারা দেখল যে, বংশমর্যাদার দিক থেকে তারা প্রাচীন, সংখ্যায় তারা অধিক এবং পারস্য ও রোমীয়দের পরাজিত করতে তারাই অগ্রণী ছিল। তারা বকর ইবনে ওয়ায়েল, আবদে কায়স ইবনে বাবিয়া, কেন্দা, ইজদ, তমিম, কায়স প্রভৃতি ইয়ামেন ও মুজারের গোত্রাবলি। তারা স্বভাবতই কোরায়েশের প্রতি হিংসাপরায়ণ ও বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল। এর ফলে তাদের আনুগত্যে শৈথিল্য দেখা দিল এবং তারা এর হেতু হিসাবে তাদের প্রতি অন্যায়-অবিচারের অভিযোগ তুলল। তারা কোরায়েশদিগকে অসাম্যের দোষে দোষী করে সম্পদ বণ্টনে অসমতার অভিযোগে অভিযুক্ত করল।

এ সকল কথা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল এবং মদিনায় এসে পৌঁছতে লাগল। পাঠক, আপনিত তাঁদেরকে জানেন, তাঁরা একে খুবই গুরুত্ব দিলেন এবং হজরত উসমানের নিকট উপস্থিত করলেন। তিনি এ সম্পর্কে যথার্থ সংবাদ আনবার জন্য বিভিন্ন শহরে লোক পাঠালেন। আমর ইবনে আস, মুহম্মদ ইবনে মাসলামা, উসামা ইবনে যায়েদের ন্যায় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এ কাজে নিয়োজিত হলেন। তাঁরা যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে শাসকদের মধ্যে অন্যায্য কিছু দেখতে পেলেন না এবং ভর্ৎসনাযোগ্যও কিছু সেখানে ছিল না। সুতরাং তাঁরা ফিরে এসে যথারীতি তাঁদের অভিজ্ঞতা খলিফার নিকট বর্ণনা করলেন। কিন্তু বিভিন্ন শহরের অভিযোগ দূর হল না এবং বিচিত্র সব কথাবার্তা ক্রমশ বাড়তেই লাগল।

৭৬. মুতাজিলাদের সাধারণ ধারণা অবশ্য উভয় পক্ষই ভ্রান্ত ছিল।

www.amarboi.org

কুফার শাসক ওলিদ ইবনে উকবার বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ উত্থাপিত হল এবং তথাকার একদল লোক তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। হজরত উসমান তাকে শাস্তি দিলেন ও পদচ্যুত করলেন। এর পর শহরবাসীরা বিভিন্ন শাসকের পদচ্যুতি দাবি করে মদিনায় আসতে লাগল এবং তারা হজরত আয়েশা, আলী, যুবায়ের, তালহা প্রমুখ সাহাবীদের নিকট অভিযোগ করল। হজরত উসমান তাদের দাবি অনুসারে অনেক শাসককেই পদচ্যুত করলেন। কিন্তু তাদের মুখ বন্ধ হল না। বরং কুফার শাসক সাইদ ইবনে আস মদিনায় প্রতিনিধিত্বের কার্যে আসার পরে কুফায় ফিরে যেতে চাইলে তাঁকে পথিমধ্যে বাধা দেয়া হল এবং তাকে পদচ্যুত করে ফেরত পাঠান হল।

এর পর মদিনার অন্যান্য সাহাবী ও হজরত উসমানের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। তাঁরা হজরত উসমানের সমালোচনা করতে লাগলেন, কেননা তিনি আর অধিক শাসককে পদচ্যুত করতে অস্বীকার করেছিলেন। কারণ কোনো সুস্পষ্ট কারণ ব্যতীত শুধু দাবির মুখে এটা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীরা নিরস্ত্র হলেন না, তাঁরা অন্যান্য কার্যেও খুঁত ধরতে লাগলেন। অথচ হজরত উসমান এ প্রকার সমালোচনার মুখেও নিজের সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিকে আঁকড়িয়ে ধরেছিলেন। সাহাবীরাও অনুরূপভাবে সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ করছিলেন।

অতঃপর একদল দুর্যোগপ্রিয় লোক মদিনায় এসে উপস্থিত হল। প্রকাশ্যে তারা হজরত উসমানের নিকট সুবিচারও চাইতে এসেছিল, কিন্তু তাদের অন্তরে ছিল তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা। এদের মধ্যে বসরা, কুফা ও মিশরের বহু লোক ছিল। এরা হজরত আয়েশা, আলী, যুবায়ের, তালহা প্রমুখ সাহাবীদের সমর্থন লাভ করতে পেরেছিল এবং তাঁরাও এদের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে হজরত উসমানের মত পরিবর্তন করত অবস্থার শান্তি আনতে চেয়েছিলেন। সুতরাং তাদের দাবির মুখে হজরত উসমান মিশরের শাসককে পদচ্যুত করলেন। তারা ফিরে গেল, কিন্তু কিছু দূরে গিয়েই আবার ফিরে এল। এবার তাদের হাতে গোলযোগপূর্ণ একটি পত্র। তারা এটা পথিমধ্যে এক বাহকের নিকট থেকে উদ্ধার করেছে এবং এতে মিশরের শাসকের প্রতি তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। হজরত উসমান এরূপ পত্রের বিষয় শপথ করে অস্বীকার করলেন। তারা বলল, আমরা আপনার লেখক মারোয়ানকে চাই। মারোয়ানও শপথ করলেন। হজরত উসমান বললেন, নিয়মমত এটা অপেক্ষা বেশি কিছু করার নেই। কিন্তু তারা মানল না, তাঁর বাসস্থান অবরোধ করল এবং এক সতর্ক মুহূর্তে রাত্রিবেলা আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করল। গোলযোগের দ্বার উন্মুক্ত হল।

তাঁদের প্রত্যেকেরই জন্য উক্ত ঘটনায় হেতু খোঁজার অবকাশ আছে এবং তাঁরা প্রত্যেকেই ধর্মীয় ব্যাপারকে এ প্রসঙ্গে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা তার কোনো একটি দিকও নষ্ট করতে চাননি এবং এর ফলে সকলেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যানুসন্ধান করেছেন। আল্লাহ্ তাঁদের সকল অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত ও জ্ঞাত। আমরা তঁদের ব্যাপারে কল্যাণ কামনাই করি। কারণ তাঁদের অবস্থা এরই সাক্ষ্য দেয় এবং মহান সত্যবাদীর বাণীও এর নির্দেশক।

www.amarboi.org

হুসাইন ইবনে আলীর হত্যাকাণ্ড

হুসাইন সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, ইয়াজিদের দুর্মতি সেই যুগের সকলের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লে কুফার শিয়া সম্প্রদায় ইমাম হুসাইনের জন্য লোক পাঠাল, যাতে তিনি সেইখানে গিয়ে তাদের শাসনব্যবস্থায় নেতৃত্ব দিতে পারেন। হুসাইন তখন চিন্তা করে দেখলেন যে, যার পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব, তারই উচিত ইয়াজিদের দুর্মতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তিনি নিজেও নিজেকে এরূপ শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী বলে ধারণা করেছিলেন। যদি যোগ্যতার কথা বলতে হয়, তা হলে বলব, তিনি যেমন ধারণা করেছেন, তা অপেক্ষাও তিনি বেশি ছিলেন। কিন্তু শক্তির ব্যাপারে তিনি ভুল করেছিলেন; আল্লাহ্ তাঁকে শান্তি দিন। কারণ মুজারের গোত্রপ্রীতি কোরায়েশেই অধিক ছিল এবং এ কোরায়েশী গোত্রপ্রীতির উৎস হল আবদে মন্নাফ পরিবার। সাধারণ মানুষ ও কোরায়েশের সকলেই জানত যে, এ আবদে মন্নাফ পরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বনি উমাইয়া। এটা কারো পক্ষে অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য ইসলামের প্রথম দিকে সকলেই এটা ভুলে গিয়েছিল। কারণ তখন অস্বাভাবিক ঘটনাবলি, ওহীর অবতরণ ও ফেরেশতাদের মুসলমানদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা সকলের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সুতরাং তারা অভ্যাসজনিত বিষয়াদি সম্পর্কে উদাসীন, মূর্খতার যুগের গোত্রপ্রীতি ও তার কলহ বিবাদ সম্পর্কে বিস্মৃতির অধিকারী হয়ে উঠেছিল। তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্প্রীতি ও তজ্জনিত সহায়তা ও প্রতিরোধ ছাড়া অন্যকিছু ছিল না। এর কল্যাণেই তাঁরা ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সক্ষম হয়েছিল। ধর্মবোধই তাঁদেরকে নিয়ন্ত্রিত করতে ছিল এবং অভ্যাসের প্রভাব শিথিল হয়ে পড়েছিল। এর পর যখন নব্যুয়তের কাল শেষ হল এবং বিহ্বলকারী অস্বাভাবিক ঘটনাবলি আর দেখা দিল না, তখন অনেক বিষয়েই পূর্ব স্বভাব এসে স্থান গ্রহণ করল। সুতরাং গোত্রপ্রীতি আবার তার শক্তি ও আধার নিয়ে ফিরে এল। মুজার পুনরায় পূর্বের ন্যায় বনি উমাইয়ার প্রভাবাধীন হয়ে পড়ল।

পাঠক, আপনি অবশ্যই হুসাইনের ভুল বুঝতে পেরেছেন। অবশ্য এটা তাঁর পার্থিব বিষয় সম্পর্কিত ভুল, যা কোনো দোষের উদ্রেক করে না। কিন্তু ধর্মীয় দিক থেকে তিনি ভুলের অধিকারী নন। কারণ নিজের ধারণা অনুসারে এটাই তাঁর কর্তব্য ছিল এবং সেই কর্তব্য পালনের শক্তিও তার ছিল। ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, ইবনে উমর, ইবনেল হানাফিয়া—তাঁর ভাই এবং আরো অনেকে তাঁকে কুফা যাওয়ার পথে বাধা দিয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি ফিরলেন না; বরং তাই হল, যা আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছিলেন।

হুসাইন ছাড়া অন্যান্য সাহাবী যাঁরা হেজাজে এবং ইয়াজিদের সাথে সিরিয়া ইরাকে ও তাঁর অনুসারী হয়েছিলেন, তাঁদের মত ছিল এই যে, ইয়াজিদের দুর্মতি সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অবকাশ নেই। কারণ এতে ব্যাপক গোলযোগ দেখা দিবে ও রক্তপাত বৃদ্ধি পাবে। এজন্য তাঁরা এ ব্যাপারে নিজেদেরকে অক্ষম মনে করে হুসাইনের অনুসরণ করেননি। অবশ্য তাই বলে তাঁরা তাঁকে অস্বীকার বা পাপী বলে ঘৃণা করেননি। কারণ হুসাইন সত্যানুসন্ধানী এবং সত্যানুসন্ধানীদের আদর্শই এরূপ।

www.amarboi.org

পাঠক, আপনার পক্ষে এ সকল সাহাবী ও অন্যলোক, যারা হুসাইনের বিরোধিতা করেছেন ও তাঁকে সহায়তা করতে এগিয়ে যাননি, তাদেরকে পাপী বলে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। কারণ সাহাবীদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাই অধিক; তাঁরা ইয়াজিদের সঙ্গে ছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অমত প্রকাশ করেছিলেন। এমন কি হুসাইনও কারবালায় যুদ্ধরত অবস্থায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যনিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁদেরকে সাক্ষী করেছেন। তিনি বলতেন, যাও, যাবের ইবনে আবদুল্লাহ্, আবু সাইদ খুদরী, আনাস ইবনে মালেক, সহল ইবনে সাইদ, যায়েদ ইবনে আরকাম এবং তাঁদের তুল্য সকলকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি তাঁকে সাহায্য না করার জন্য তাঁদের প্রতি কোনোপ্রকার কটূক্তি বা দোষারোপ করেননি। তিনি জানতেন যে, তা তাঁদের সত্যানুসন্ধানের ব্যাপারে, যেমন তিনি নিজেও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছেন।

পাঠক, এরূপ আপনি ইমাম হোসাইনের হত্যাকেও এ সত্যানুসন্ধানের পরিণতি বলে সঠিক বলার ভুল করতে পারেন না। কারণ তিনি নিজেও এ সত্যানুসন্ধানের কাজই করেছিলেন। ব্যাপারটি তা হলে তেমনই হবে, যেমন শাফেয়ী ও মালেকীরা হানাফীদের আঙুরের রস পানের ব্যাপারটিকে শাস্তিযোগ্য বলে মনে করে। জেনে রাখুন, বিষয়টি আদৌ তেমন নয়। তাঁর বিরোধিতা তাঁদের সত্যানুসন্ধান হলেও তাঁর হত্যাকে কখনও এর অন্তর্গত করা যায় না। বরং তাঁকে হত্যার ব্যাপারে ইয়াজিদ ও তার সহচররাই দায়ী। আপনার পক্ষে এটা বলাও ঠিক হবে না যে, তাঁরা ইয়াজিদের দুর্মতি সত্ত্বেও তার বিরোধিতা করতে যেহেতু মত দেননি, সুতরাং তাঁরা তার সমুদয় কাজ শুদ্ধ বলে বিবেচনা করতেন। আরো জেনে রাখুন কোনো দুর্মতিসম্পন্ন শাসকের ঐ সকল কাজই গ্রহণযোগ্য হয়, যা ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী। তাঁদের মতে কোনো বিদ্রোহীকে হত্যা করা তখনই সঠিক হবে, যখন সে কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এ বিষয়টি বর্তমানে আমাদের আলোচ্য সমস্যায় নেই। সুতরাং ইয়াজিদের সাথে হুসাইনকে হত্যা করা যেমন ঠিক নয়, তেমনই একা ইয়াজিদের পক্ষেও হুসাইনকে হত্যা করা ঠিক নয়। বরং এটা ইয়াজিদের জঘন্য দুর্মতিপরায়ণ কার্যাবলিরই অন্তর্গত এবং হুসাইন এ ক্ষেত্রে পুণ্যবান শহীদ। তিনি তাঁর সত্যানুসন্ধানে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সাহাবীদের মধ্যে যারা ইয়াজিদের পক্ষে ছিলেন, তাঁরাও তাঁদের সত্যানুসন্ধানে ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

এ ব্যাপারে কাজী আবু বকর ইবনেল আরবি আল-মালেকী[৭৭] ভুল করেছেন। তিনি তাঁর 'আল আওয়াসিম ওল কাওয়াসিম' নামক গ্রন্থে যা বলেছে, তার অর্থ এই যে, হুসাইন তাঁর মাতামহের নীতি অনুসারেই নিহত হয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল; তাঁকে এ ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ ইমামের শর্তের প্রতি উদাসীনতাই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। অথচ ইমাম হুসাইনের ন্যায়পরায়ণ সেই যুগে আর কে ছিল এবং ইমামত ও পুতচরিত্রের দিন থেকে বিভিন্ন মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার যোগ্যতাই বা আর কার ছিল।

ইবনে যুবায়েরও ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে ইমাম হুসাইনের অনুরূপ ধারণা পোষণ করেছিলেন। অবশ্য শক্তির দিক থেকে তাঁর ভুল তদপেক্ষা আরো বিরাট। কারণ বনি

৭৭. মুহম্মদ ইবনে আব্দুলাহ, জীবনকাল ৪৬৯-৫৪৩ (১০৭৬/৭৭-১১৪৮ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

আসাদ না মূর্খতার যুগে, না ইসলামের যুগে, কখনই বনি উমাইয়ার সাথে এঁটে উঠতে পারেনি। তদুপরি বিরোধী পক্ষের ক্ষেত্রে ভুলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যেমনটি আলীর সাথে মাবিয়ার ব্যাপারে পাওয়া যায়, তারো এ স্থলে কোনো উপায় নেই। কারণ সেই সময়ে অধিকাংশের সিদ্ধান্ত আমাদেরকে পথ দেখিয়েছে; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। অবশ্য ইয়াজিদের ব্যাপারটি তার দুর্মতির জন্যই নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আবদুল মালেক প্রতিদ্বন্দ্বী ইবনে যুবায়েরের সহচর এবং ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট। পাঠক, তাঁর পুতচরিত্রের প্রমাণ হিসাবে ইমাম মালেকের তাঁর কাজের দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করাই আপনার জন্য যথেষ্ট হবে। তদুপরি ইবনে যুবায়েরের সাথে হেজাজে থেকেও ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাসের আব্দুল মালেকের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ এ কথারই প্রমাণ দেয়। সম্ভবত এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবীর মত ছিল যে, ইবনে যুবায়েরের বায়আত অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ তাতে মারোয়ানের বায়আতের ন্যায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন না। অথচ ইবনে যুবায়েরের ধারণা ছিল এর বিপরীত। তাঁদের প্রত্যেকেই এক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধানে রত এবং প্রকাশ্যে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও সত্য কোনো পক্ষে, তা স্থিরীকৃত হয়নি। আমাদের উপরোক্ত আলোচনার সাথে মিলিয়ে দেখলে ইবনে যুবায়েরের নিহত হওয়ার বিষয়টি ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসারে বিচারসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর ইচ্ছা ও সত্যনিষ্ঠা অনুসারে পুণ্যবান শহীদের মর্যাদাপ্রাপ্ত।

এ সেই মানদণ্ড, যা দিয়ে পূর্বসূরি সাহাবী ও তাবেয়ীনদের কার্যাবলি বিচার করে দেখতে হয়। তাঁরা জাতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। যদি তাঁদেরকেই আমরা আমাদের সমালোচনার শিকারে পরিণত করি, তা হলে আর কাকে ন্যায়পরায়ণতায় বিশিষ্ট করব। নবী (সঃ) বলেছেন, সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ আমার যুগ; তার পর যারা তার সন্নিহিত—দুইবার অথবা তিনবার এবং এর পর মিথ্যার বিস্তৃতি ঘটবে।[৭৮] তিনি শ্রেষ্ঠত্ব বলতে এ ন্যায়পরায়ণতাকে বুঝিয়েছেন, যা প্রথম যুগ ও তার সন্নিহিত যুগের সাথে বিশিষ্ট। সুতরাং পাঠক, সাবধান, তাঁদের কারো সম্পর্কে আপনার চিত্ত বা আপনার জিহ্বাকে কলুষিত করবেন না এবং তাঁদের দ্বারা সংঘটিত বিষয়গুলোতে কোনোপ্রকার সন্দেহ আপনার মনে স্থান দিবেন না। যতদূর সম্ভব তাঁদেরকে সত্যের অনুসারী ও সৎপথের পথিক বলে ভাবুন। কারণ তাঁরাই এ সকল গুণের জন্য অধিকতর যোগ্য। তাঁদের মতানৈক্য বিনা প্রমাণে হয়নি; তাঁদের কলহ ও তাঁদের নিহত হওয়া সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং সত্য প্রকাশের জন্যই হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এ বিশ্বাস পোষণ করুন যে, তাঁদের মতানৈক্য জাতির পরবর্তীদের জন্য শান্তির বার্তা বহন করে এনেছে। কারণ প্রত্যেকেই তাঁদের অনুসরণে সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করতে পেরেছে এবং নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী একেকজনকে ইমাম, পথপ্রদর্শক ও প্রামাণ্য সূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং এ বিষয়টি সম্যকরূপে উপলব্ধি করুন, তা হলে সৃষ্টি ও বস্তুপুঞ্জের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহিমা অবলোকন করতে পারবেন। জেনে রাখুন, তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তাঁরই সন্নিধানে আমাদের গন্তব্য ও প্রত্যাবর্তনস্থল। যথার্থই আল্লাহ্ উন্নত ও সর্বজ্ঞ।

---

৭৮. বোখারী (২য়) দ্র:।

www.amarboi.org

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[খেলাফতের ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ]

যখন এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, খেলাফত অর্থ হল ধর্মের সংরক্ষণ ও পার্থিব শৃঙ্খলা বিধানের জন্য ধর্মপ্রবর্তকের প্রতিনিধিত্ব করা, তখন তার স্বরূপ বুঝে নেয়া প্রয়োজন। ধর্মপ্রবর্তক দুটি বিষয়ে তৎপর হন; একটি হল ধর্মীয় বিধিনিষেধের যথাবিহিত প্রচারণা এবং মানুষকে তৎসম্পর্কে কর্তব্য পালনের জন্য উৎসাহিত করা। অন্যটি হল মানব জীবনের কল্যাণকে সম্মুখে রেখে পার্থিব শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মানুষের এ সমাজবদ্ধ জীবন একান্ত প্রয়োজনীয়; তেমনই তার কল্যাণ সাধনও একান্ত জরুরি ব্যাপার। কারণ এ ব্যাপারে শৈথিল্য দেখা দিলে সমাজ জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়। আমরা পূর্বে এও বলেছি যে, রাজশক্তি ও তার প্রতাপ সমাজ জীবনের এ কল্যাণ সাধনের জন্য যথেষ্ট। তবে হ্যাঁ, তার পূর্ণতর বাস্তবায়নের জন্য ধর্মীয় বিধি-নিষেধের প্রয়োজন। কারণ একমাত্র ধর্মপ্রবর্তকই এ কল্যাণের বিষয়টি সর্বাধিক অবগত। সুতরাং উক্ত খেলাফত যদি ইসলামী হয়, তা হলে তার মধ্যে রাজশক্তি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং কখনো তার অনুসারীও হয়। কিন্তু তা যদি ইসলামী জবন ব্যবস্থার বহির্ভূত হয়, তা হলে তা রাজশক্তিই হয়ে দাঁড়ায়। যাহোক, যে কোনো অবস্থায় তাতে জনসেবার বিভিন্ন পর্যায় ও তার আনুষঙ্গিক কর্তব্যাদি বিদ্যমান। এগুলোর জন্য নির্দিষ্ট অংশ আছে এবং এ সকল অংশগত বিভাগে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তব্যরত থাকেন। এ সকল ব্যক্ত সংশ্লিষ্ট প্রাধান্য বিস্তারকারী রাজশক্তির নির্দেশ অনুসারে তাদের কর্তব্যাদি পালন করে থাকেন। এর ফলে কাজটি সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং শাসন ব্যবস্থার সাথে তার সুসামঞ্জস্য দেখা দেয়। খেলাফতের পদমর্যাদার সাথে যদি রাজশক্তি মিশ্রিত থাকে, তা হলে তার কর্তব্য পালনও আমাদের পূর্ব বর্ণনা অনুসারেই হয়ে থাকে। অবশ্য ধর্মীয় ব্যাপারে তাতে এমন কতগুলো পদমর্যাদা ও বিভাগ বিদ্যমান, যা ইসলামী খলিফাগণ ব্যতীত অন্য কোনো শাসক তা পরিচালনা করেন না। আমরা এস্থলে খেলাফতের সাথে বিশিষ্ট কতিপয় বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করব এবং পরে রাজশক্তি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আমাদের আলোচনায় ফিরে আসব।

জেনে রাখুন, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ সম্বলিত বিভাগগুলো হল নামাজ, ফতোয়া, বিচার, জেহাদ ও বাজার পরিদর্শন। এর সবগুলোই প্রধান ইমামত অর্থাৎ খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত। এটা যেন মুখ্য নেতৃত্ব এবং সংবদ্ধ উৎসমূল। এ সকল বিভাগই তা থেকে উৎসারিত ও তাতে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে থাকে। কারণ খেলাফত সামগ্রিকভাবে জাতির ধর্মীয় ও পার্থিব অবস্থাদির পর্যবেক্ষণ এবং তৎসম্পর্কীয় ধর্মীয় বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করে।

www.amarboi.org

নামাজের ইমামতি

তা এ সকল বিভাগীয় কর্তব্যের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজশক্তি খেলাফতের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকলে তার মর্যাদা এ শক্তি অপেক্ষাও উন্নত। কারণ এটা দ্বারা সাহাবিগণ হজরত আবু বকরের খেলাফত সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর নামাজের ইমামতির প্রতিনিধিত্বকে তাঁরা শাসন ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা হিসাবে তুল ধরে বলেছিলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে আমাদের ধর্মের ব্যাপারে সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়েছেন, আমরা কি তাঁকে আমাদের পার্থিব ব্যাপারে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করব না? সুতরাং নামাজ যদি শাসন ব্যবস্থা থেকে উন্নততর না হত, তা হলে এরূপ অনুমান করা শুদ্ধ হত না। যখন এটা স্থিরীকৃত হল, তখন জেনে রাখুন যে, নগরীর মসজিদগুলো দুই প্রকার। এক প্রকার বৃহদাকারের, যাতে বেশিসংখ্যক মুসল্লী হয় এবং সর্বপ্রকার নামাজের জন্য তা প্রস্তুত রাখা হয়। অন্যগুলো তদ্রূপ নয়, কোনো জাতি বা মহল্লার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাতে সর্বসাধারণ নামাজ পড়তে যায় না। বৃহদাকারের মসজিদগুলোর বিষয় ব্যবস্থা দেখার ব্যাপারটি খলিফার উপর ন্যস্ত কিংবা তিনি যদি কোনো শাসক, উজির বা কাজীকে তার দায়িত্বভার অর্পণ করে থাকেন, তা হলে উক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর। তিনি তার পাঁচ অক্তের নামাজ এবং জুম্মা, দুই ঈদ, সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ ও বৃষ্টির জন্য নামাজের নিমিত্ত ইমাম ঠিক করে দিবেন। কারণ এরূপ করে দেয়াই ব্যবস্থার দিক থেকে অধিকতর উত্তম এবং এর ফলে প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। অনেকে একে অবশ্য কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন এবং এটা তাদেরই বক্তব্য, যারা জুম্মার নামাজের ব্যবস্থাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। সুতরাং তার নিমিত্ত ইমামের ব্যবস্থা করাও অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে।

অন্যদিকে যে সকল মসজিদ কোনো জাতি বা মহল্লার সাথে সংশ্লিষ্ট, তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রতিবেশীদের উপর বর্তায়। তাতে খলিফার দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নেই কিংবা তৎকর্তৃক নিয়োজিত কোনো শাসন কর্তৃপক্ষেরও তাতে হাত দেবার দরকার পড়ে না। এর ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট শর্তাদি এবং পরিচালন দায়িত্ব সম্পর্কীয় বিধিবিধান ধর্মীয় নীতিশাস্ত্রে বিদ্যমান। মাওয়ারদী[৭৯] ও অন্যান্যের লিখিত প্রশাসনিক আইনকানুন সম্পর্কীয় গ্রন্থাদিতে তা সবিস্তারে লিখিত রয়েছে। আমরা তার বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত রইলাম।

প্রথম খলিফাগণ নামাজের এ ইমামতির ব্যাপারে অন্য কারো উপর দায়িত্ব অর্পণ করতেন না। পাঠক, লক্ষ করুন অনেক খলিফাই এ নামাজের আজানের সময় মসজিদে আহত হয়েছেন এবং আততায়ীরা তা সুনির্দিষ্ট বলেই তাঁদের জন্য উক্ত স্থানে অপেক্ষা করেছেন। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা নিজেরাই এ ব্যাপারে জড়িত ছিলেন এবং অন্য কাউকেও এজন্য স্থলাভিষিক্ত করেননি। তাঁদের পরবর্তীকালে উমাইয়া সাম্রাজ্যের রাজপুরুষরাও এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তার মর্যাদাকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন।

---

৭৯. আলী ইবনে মুহম্মদ, ৯৮৫-১০৫৮ খ্রি.। গ্রন্থটির নাম 'আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া।'

www.amarboi.org

সম্রাট আবদুল মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর দ্বাররক্ষীকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে আমার দ্বাররক্ষার ব্যাপারে নিয়োজিত করেছি সকলকে বাধা দেবার জন্য; কিন্তু তিনটি বিষয় সম্পর্কে নয়। একটি হল আহার্যদ্রব্যের পরিচারক, তাকে বাধা দিলে আহার্যসামগ্রী নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে; দ্বিতীয় হল নামাজের প্রতি আহ্বানকারী, কারণ সে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন ও তৃতীয় হল সংবাদের ডাক, তা আসতে দেরি হলে দূরদূরান্তের বিষয়াদি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

অতঃপর যখন রাজশক্তির স্বাভাবিক অবস্থা দেখা দিল এবং তার আনুষঙ্গিক স্থূলতা, অহংকার ও মানুষের মধ্যে ধর্মকর্মে অসাম্য এসে উপস্থিত হল, তখন তাঁরা নামাজে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে লাগলেন। অবশ্য কখনো কখনো তাঁরা নিজেরাও নামাজের ইমামতিতে উপস্থিত হতেন এবং বিশেষ করে দুই ঈদ ও জুম্মার নামাজে আড়ম্বর ও জাঁকজমক প্রদর্শনের জন্য তাঁরা উপস্থিত থাকতেন। বনি আব্বাসের বহু খলিফা এবং উবাদইদীগণ তাঁদের সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে এরূপ করেছেন।

ফতোয়া

এর ব্যাপারে জ্ঞানীদেরকে পরীক্ষা করে, নির্দেশ দিয়ে যোগ্য লোককে নিয়োজিত করা এবং তাঁকে সাহায্য করা খলিফার দায়িত্ব। যারা অযোগ্য, তাদেরকে বিরত রাখা এবং শাসন করাও এ দায়িত্বের অন্তর্গত। কারণ এও ধর্মের ব্যাপারে মুসলমানদের কল্যাণ কামনার সাথে জড়িত রয়েছে। সুতরাং এ দায়িত্ব অবশ্য পালনীয়, যাতে অযোগ্য ব্যক্তিরা এতে প্রবেশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সুযোগ না পায়। শিক্ষকরা এ বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচিও প্রচারের ব্যবস্থা করবেন এবং এজন্য তাঁরা মসজিদে বসতে পারেন। সংশ্লিষ্ট মসজিদ যদি বৃহদাকার, শাসকের তত্ত্বাবধানে এবং যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তার ইমাম নিয়োগের দায়িত্ব শাসকের উপর বর্তায়, তা হলে এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায়, সাধারণ মসজিদ হলে এরূপ অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। ফতোয়াদানকারী ও শিক্ষক, প্রত্যেককেই নিজের সম্পর্কে বিবেচনা করে এমন বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত, যার যোগ্যতা তার নেই এবং এমন বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হওয়া ঠিক নয়, যাতে সুপথের ইচ্ছুক বিভ্রান্ত হয় ও দিশা অন্বেষণকারী আরো বেদিশা হয়ে ওঠে। হাদিসে এসেছে, তোমাদের মধ্যে বেপরোয়া ফতোয়াদানকারী বেপরোয়াভাবেই দোজখের দিকে এগিয়ে যায়। সুতরাং শাসকের উচিত তাঁদের ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়া এবং অবস্থা বুঝিয়ে তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া বা নিষেধ করা তাঁর কর্তব্য।

বিচারকার্য

তা খেলাফতেরই অধীনস্থ একটি কর্তব্য। কারণ এটা দ্বারা মানুষের মধ্যকার বিভিন্ন কলহ তাদের দাবি ও আপোষমীমাংসার ভিত্তিতে দূর করা হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কোরান ও হাদিস দ্বারা নির্ধারিত বিধিনিয়ম অনুসৃত হয়ে থাকে। এ জন্যই এটা খেলাফতের কর্তব্যাবলির অন্তর্গত বলে সাধারণভাবে ধরা হয়। ইসলামের প্রথমদিকের খলিফাগণ

www.amarboi.org

নিজেরাই এ দায়িত্ব পালন করতেন এবং এ ব্যাপারে অন্যকে নিয়োগ করতেন না। প্রথম যিনি এ ব্যাপারে অন্যকে নিযুক্ত ও তার উপর সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করলেন, তিনি হজরত উমর (রাঃ)। তিনি মদিনায় তাঁর পক্ষ থেকে আবু দারদাকে,[৮০] বসরায় শুরাইহ্‌কে এবং কুফায় আবু মুসা আল আশআরীকে কাজী নিযুক্ত করেছিলেন। শেষোক্তজনকে তিনি উক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে একটি পাত্র লিখেন, যা বিচার সম্পর্কীয় বিধিনিষেধের উৎস হয়ে রয়েছে এবং এ ব্যাপারে তা যথেষ্ট। তিনি বলেন,

অতঃপর বিচার একটি অপরিহার্য কর্তব্য এবং অনুসৃত প্রথা। তোমার উপর এ সম্পর্কে কোনো দায়িত্ব আসলে, ভালো করে তার গুরুত্ব বুঝে নিবে। কারণ এতদ্ব্যতীত সত্য সম্পর্কে কথা বলা বা তার প্রতিষ্ঠা দান করা সম্ভব নয়। তোমার চেহারা, দরবার ও ন্যায়নিষ্ঠার দ্বারা মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার করো। যাতে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তোমার পক্ষপাতিত্বের আশা এবং কোনো দরিদ্র ব্যক্তি তোমার অবিচারের ভয় না করে। ফরিয়াদীর উপর প্রমাণ উপস্থিত করার দায়িত্ব এবং অস্বীকারকারী আসামীর উপর শপথ গ্রহণই যথেষ্ট। মুসলমানদের আপোষমীমাংসা বৈধ; অবশ্য এমন মীমাংসাগত চুক্তি নয়, যা বৈধকে অবৈধ করে এবং অবৈধকে বৈধ করে। গতকল্য যে বিচার তুমি করেছ, তার পুনর্বিচারে অসুবিধা নেই। আজ আবার তুমি তোমার বুদ্ধিকে তজ্জন্য ব্যবহার কর, যাতে তোমার সম্মুখে সত্য প্রকাশিত হয় এবং সত্যের দিকে বিনা দ্বিধায় ফিরে যেতে পার। কারণ সত্যই প্রাচীন এবং মিথ্যাকে আঁকড়াইয়া থাকা অপেক্ষা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই শ্রেয়। বুদ্ধি খাটাও, বুদ্ধি খাটাও তোমার অন্তরে যে সমস্যা আবর্তিত হয়েছে, তৎসম্পর্কে এবং যার জন্য কোনো নির্দেশ কোরান-হাদিসে নেই। অতঃপর তুলনীয় ও অনুরূপ বিষয়াদি জেনে নাও এবং সমস্যাকে তার দৃষ্টান্তের উপর অনুমান কর। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত সত্যের দাবি করে অথবা তজ্জন্য প্রমাণ উপস্থিত করতে সমর্থ নয়, তাকে একটা নির্দিষ্ট সময় দান কর। ইতিমধ্যে সে যদি প্রমাণ উপস্থিত করে, তা হলে তার দ্বারা তার সত্য উদ্ধার কর। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে রায় দিতে তোমার কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এটাই অধিকতর সন্দেহ দূর করে এবং অজ্ঞতাকে বিনাশ করে। মুসলমানরা একে অপরের সাক্ষী হতে পারে; অবশ্য বিধানমত শাস্তিপ্রাপ্ত, মিথ্যা সাক্ষ্যদানে নিন্দিত এবং আত্মীয়তা ও চুক্তির ফলে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয়। পবিত্র আল্লাহ্ শপথ গ্রহণকারীকে ক্ষমা করেন এবং প্রমাণ উপস্থিতকারীর ব্যাপারটি স্থগিত রাখেন।[৮১] সাবধান, বাদীবিবাদীকে ক্লান্ত, বিরক্ত ও বিমুখ করা থেকে বিরত থেকো। মনে রেখ, সত্যকে তার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার বিনিময়ে আল্লাহ্ বৃহৎ পারিশ্রমিক ও মহৎ খ্যাতি দান করেন। ইতি—(হজরত উমরের পত্র এখানেই শেষ)।

বিচারের ব্যাপারটি খলিফাদের দায়িত্ব হলেও তাতে তাঁরা, শাসন ব্যবস্থার সাধারণ ও ব্যাপক ব্যস্ততার দরুন অন্যকে নিয়োগ করতেন। কারণ তাঁদেরকে যুদ্ধ, বিজয়াভিযান, সীমান্ত রক্ষা এবং কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকতে হত। এ

---

৮০. তাঁর নাম সম্ভবত উয়াইমির ইবনে যায়েদ।

৮১. যতদূর মনে হয়, আপাত সত্য বলে মনে হলেও মিথ্যা সাক্ষী ও প্রমাণের ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য হতে পারে। অবশ্য কাজীর জন্য এটাকেই গুরুত্ব দিয়ে বিচারকার্য সমাধা করতে হবে।

www.amarboi.org

সকল কাজ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে অন্যের দ্বারা তা সম্ভব হত না। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে বিচারের গুরুত্ব স্বীকার করেও তাঁরা একমাত্র নিজেদের ব্যস্ততা সীমিত করার জন্যই এ ব্যাপারে অন্যদেরকে নিয়োগ করতেন। অথচ এতদসত্ত্বেও তাঁরা একমাত্র স্ববংশীয় ও আশ্রিত পোষ্যদেরকেই এ দায়িত্ব অর্পণ করতেন এবং অঘনিষ্ঠদেরকে এ ব্যাপারে নিয়োগ করতেন না।

এ পদের নিয়ম-কানুন ও শর্তাদি যে-কোনো শাস্ত্রীয় গ্রন্থে সুপরিচিত এবং বিশেষ করে 'আহকামুস সুলতানিয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। অবশ্য খলিফাদের সময়ে কাজীর দায়িত্ব ছিল শুধু বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বিষয় নিষ্পত্তি করা। অতঃপর তাঁদের দায়িত্বে আরো বহু বিষয় ক্রমান্বয়ে অর্পণ করা হয়েছে এবং খলিফাদেরও রাজশক্তির শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব ব্যাপক হওয়ার সাথে সাথে এটা বৃদ্ধি পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত কাজীর এ পদমর্যাদার দায়িত্ব এভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে যে, তা বাদীবিবাদীর মধ্যকার কলহ নিষ্পত্তি ব্যতীতও মুসলমান সর্বসাধারণের কতিপয় বিশেষ অধিকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। যেমন অক্ষম তথা উন্মাদ, অনাথ, দেউলিয়া, নির্বোধ প্রভৃতির সম্পত্তি দেখাশোনা, মুসলমানদের হেবা ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থা করা এবং সংশ্লিষ্ট মতামত অনুসারে অনাথ বালিকাদের বিবাহ দেয়া। এটা ছাড়াও রাস্তাঘাট ও গৃহাদি নির্মাণের ব্যাপারে লক্ষ রাখা, সাক্ষী, আমিন ও নায়েবদের যোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখা এবং তাদের সম্পর্কে যথাবিহিত সূত্রাদি বিচার করে পরিপূর্ণ সংবাদ ও জ্ঞানলাভ করত নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। এভাবে উপরোক্ত সমুদয় কার্যই উক্ত কাজী পদের অন্তর্ভুক্ত ও অনুসারী কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করা হত।

পূর্বের খলিফারা কাজীকে অন্যায় অবিচার পরিদর্শনের কাজেও নিয়োজিত করতেন। এটা একটি বিশিষ্ট কর্তব্য; এতে শাসকের প্রতাপ ও বিচারকের দায়িত্ব উভয়ই মিশ্রিত ছিল। এর জন্য একটি শক্তিশালী হাত ও বৃহৎ প্রতাপের প্রয়োজন, যাতে উভয় পক্ষের মধ্যে অত্যাচারীকে নিরস্ত্র করা সম্ভব হয় এবং অন্যায়কারীকে শাসিয়ে দেয়া যায়। তা যেন কাজী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যা করতে পারেননি, তাই করা। এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাজ হবে প্রমাণ ও বক্তব্য পরীক্ষা করা, আলামত ও নিদর্শন বিচার করা, সত্য প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা, বাদীবিবাদীকে আপোষ মীমাংসার দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সাক্ষীদেরকে শপথের দ্বারা সতর্ক করা। এ দায়িত্ব কাজীর কর্তব্য থেকে অনেকখানি ব্যাপক।

প্রথমদিকের খলিফারা আব্বাসী সম্রাট আল-মুহতাদী পর্যন্ত নিজেরাই এ দায়িত্ব পালন করতেন। কখনো কখনো এ ব্যাপারে অন্যদেরকে ব্যবহার করতেন। যেমন হজরত উমর[৮২] (রাঃ) তাঁর কাজী আবু ইদ্রিস আল খাওলানীকে[৮৩] উপরোক্ত দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যেমন সম্রাট মামুন ইয়াহিয়া ইবনে আকসামকে এবং সম্রাট আলমুতাসিম আহমদ ইবনে আবু দাউদকে[৮৪] এ দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। কখনো তাঁরা

৮২. কোনো কোনো সংস্করণে হজরত আলী (রাঃ)।
৮৩. তাঁর নাম সম্ভবত আয়াজুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ।
৮৪. মৃত্যুকাল ২৪০ (৮৫৪ খ্রি.) হি.।

www.amarboi.org

কাজীদেরকে যুদ্ধে গ্রীষ্মকালীন সৈন্য পরিচালনার দায়িত্বও অর্পণ করতেন। সম্রাট মামুনের সময় ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম গ্রীষ্মকালীন সৈন্য নিয়ে রোমের দিকে অভিযানে যেতেন। আন্দালুসের বনি উমাইয়া সম্রাট আব্দুর রহমান আন্নাসেরের কাজী মুনজির ইবনে সায়িদ[৮৫] অনুরূপ দায়িত্বে নিয়োজিত হতেন। এ দায়িত্বের একমাত্র অধিকারী ছিলেন খলিফারা অথবা তাঁরা যদি উজিরকে এ কার্যে নিয়োজিত করতেন এবং কোনো প্রাধান্য বিস্তারকারী শাসক যদি এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিতেন, তা হলে তারাই তা সম্পন্ন করতেন।

দুর্নীতি সম্পর্কে লক্ষ রাখা ও বিভিন্ন প্রকার শাস্তি বিধান করা, যা মূলত রক্ষী প্রধানের[৮৬] কাজ, তাও আব্বাসী সাম্রাজ্য, আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্য, মাগরিব ও মিশরের উবাইদী সাম্রাজ্যে ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। এ সকল সাম্রাজ্যে এ বিভাগটিও ধর্মীয় বিভাগগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে কাজীদের দায়িত্ব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যাপক তৎপরতার প্রয়োজন হত। এটা সন্দেহজনক ব্যক্তিকে বিচারের সম্মুখীন করা, দুর্নীতিমূলক কার্যাদি অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই দমনমূলক শাস্তি প্রয়োগ করা, যথানিয়মে প্রদত্ত শাস্তি কার্যকর করা, খুনজখমের বিনিময়ে নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা এবং যারা দুষ্কর্ম ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক, তাদের ব্যাপারে নিবর্তন ও শিক্ষামূলক শাস্তি প্রদান করার দায়িত্ব পালন করা।

অতঃপর যে সকল সাম্রাজ্যে খেলাফতের অবস্থা লোপ পায়, সেখানে এ দুটি দায়িত্বও পৃথকভাবে রক্ষিত হয়নি। খলিফার তরফ থেকে দায়িত্ব অর্পিত হোক না হোক অন্যায় অবিচার পরিদর্শনের কাজটি শাসকের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। রক্ষী প্রধানের দায়িত্বটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তার একটি ভাগের দায়িত্ব হল দুষ্কর্মের সন্দেহ লক্ষ করা, শাস্তি কার্যকর করা এবং সুনির্দিষ্ট খুন ও রাহাজানির তদন্ত করা। এগুলোর জন্য এ সকল সাম্রাজ্যে একজন শাসক নিযুক্ত হতেন, যিনি ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বরং শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুসারে বিচার করতেন। তাঁকে কখনো 'ওয়ালী' আবার কখনো 'শুরতা' বলে ডাকা হত। অন্য ভাগটির মধ্যে নিবর্তনমূলক শাস্তি এবং ধর্মীয় বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট দুষ্কর্মের জন্য শাস্তি প্রদানের দায়িত্বই অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং তাকে পূর্বে বর্ণিত কাজীর অন্যান্য দায়িত্বের সাথে একত্র করা হল এবং এগুলো তাঁর কর্তব্যের ও দায়িত্বের অনুসারী হয়ে উঠল। বর্তমানকালে এর অবস্থা অনুরূপভাবে বিদ্যমান।

অন্যদিকে এ দায়িত্ব পালনও সাম্রাজ্যের গোত্রপ্রীতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর কবল থেকে দূরে সরে গেছে। কারণ সাম্রাজ্য যখন ধর্মীয় খেলাফত ছিল এবং এ দায়িত্বগুলোও ধর্মীয় অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন তাঁরা গোত্রপ্রীতিধন্য আরববাসী, তাঁদের সাথে চুক্তি, দাসত্ব বা কর্মে নিয়োগের দ্বারা সংযুক্ত—এমন ব্যক্তিদেরকেই এ সকল দায়িত্বে নিয়োজিত করত, যাদের যোগ্যতা ও নির্ভরতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। যখন খেলাফতের এ পর্যায়গত স্বরূপটি লোপ পেল এবং ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে রাজশক্তি ও সাম্রাজ্যে পরিণত হল, তখন এ ধর্মীয় বিভাগগুলোও অনেকাংশে তাদের গুরুত্ব হারিয়ে বসল। কারণ তার মধ্যে রাজশক্তিসুলভ কোনো উপাধি বা নিদর্শন নেই।

৮৫. জীবনকাল ২৭৩-৩৫৫ (৮৮৬-৯৬৬ খ্রি.) হি.।
৮৬. 'সাহিবে শুরতা।'

www.amarboi.org

অতঃপর সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই আরবদের হাত থেকে চলে গেল এবং তাদের ব্যতীত অন্যান্য তুর্কি ও বারবারদের হাতে রাজশক্তিতে পরিণত হল। তখন এ সকল দায়িত্ব গোত্রপ্রীতি ও ধর্মীয় পরিবেষ্টনী থেকে আরো দূরে সরে গেল। কারণ আরবরা ধর্মীয় বিধানকেই তাদের শাসনতন্ত্র মনে করত এবং ভাবত যে, নবী (সঃ) তাঁদেরই একজন। তাঁর প্রবর্তিত বিধি-নিষেধ ও ধর্মীয় বিধান সকল জাতির মধ্যে তাঁদের বিশিষ্ট ধর্মমত ও জীবন পথ। কিন্তু অন্যান্য জাতির এটা ভাববার বা মনে করবার অবকাশ নেই; বরং তারা এটাকে তাদের এ জাতির অন্তর্গত হওয়ার ফলে লব্ধ একটি বিশেষ সম্মান হিসাবেই মনে করে। সুতরাং তারা এ সকল দায়িত্বকে গোত্রশক্তি বহির্ভূত পূর্ববর্তী খলিফাদের আমলের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপরই ন্যস্ত করে থাকে। অথচ এ সকল যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত শত শত বছরের বিলাসব্যসনের ঐতিহ্যে লালিত হয়ে প্রান্তর জীবনের কৃচ্ছ্রতা ও সারল্যকে ভুলে গেছেন এবং তাদের অভ্যাস ও অনুভূতিতে নগর জীবনের সৌখিনতাকে গ্রহণ করেছেন এর ফলে তাদের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তির অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে। খলিফাদের পরবর্তীকালে রাজশক্তি পরিচালিত সাম্রাজ্যগুলোতে উপরোক্ত দায়িত্ব এ সকল পল্লীবাসী দুর্বল ব্যক্তির উপরই ন্যস্ত হয়েছে। তাদের নগর জীবন গ্রহণ ও বংশধারার শক্তি থেকে বিচ্যুতির ফলে এ সকল যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্মান বলতে বিশেষ কিছু নেই। তাদের ভাগ্যে তাই জুটেছে, নগর জীবনের বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের ভাগ্যে যে হেয়তা জুটে থাকে। তারা সাম্রাজ্যের গোত্রশক্তির মর্যাদা হারিয়ে এখন তার সহায়তার মুখাপেক্ষী পোষ্য শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। সাম্রাজ্যে তাদের যেটুকু মূল্য দেয়া হয়, তা এজন্য যে, তার পত্তন এ জাতির দ্বারা হয়েছিল ও তা এখনও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মান্য করে থাকে এবং যেহেতু তারাই উক্ত বিধি-নিষেধ এখনো বহন ও অনুসরণ করছে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের প্রাণপণ সাধনা এখন আর সাম্রাজ্যের সম্মান বাড়ায় না। বরং সম্রাটের দরবারের শোভা বর্ধনের জন্যই তাদের ডাক পড়ে। কেননা এখনও ধর্মীয় পদমর্যাদার কিঞ্চিৎ সম্মান অবশিষ্ট আছে। কিন্তু এ পর্যন্তই; এর ঊর্ধ্বে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ব্যাপারে তাদের কোনো হাত নেই। তারা সেই দরবারে যখন উপস্থিত হন, তখন তা প্রথাগত উপস্থিতি বলেই মনে হয়, তার পশ্চাতে বিশেষ কোনো তাৎপর্য থাকে না। কারণ নেতৃত্ব লাভ একমাত্র শক্তিমানের পক্ষেই সম্ভব হয়। যার কোনো শক্তি নেই, তার ভাঙারও কিছু নেই, গড়ারও কিছু নেই। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, তারা ধর্মীয় বিধি-বিধান দিতে পারেন এবং নির্দেশমত ফতোয়াও জারি করতে পারেন। ব্যস এটুকুই। আল্লাহ্ই সহায়ক।

অনেক সময়ে অনেকে বলেন, যথার্থ অবস্থা এর বিপরীত হওয়া উচিত। রাজশক্তির অধিকারীরা যে ধর্মশাস্ত্রবিদ ও কাজীদেরকে পরামর্শ সভার বাইরে রাখেন, এটা দূষণীয়। কেননা হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। জেনে রাখুন, বিষয়টি তাদের ধারণা মত নয়। কারণ রাজশক্তি ও রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারটি সমাজ জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যথায় তা শাসনব্যবস্থা থেকে দূরে সরে যাবে। সমাজ জীবনে অনুরূপ কিছুর মোটেও চাহিদা নেই। কারণ পরামর্শ ও

www.amarboi.org

নেতৃত্ব একমাত্র গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর পক্ষেই সম্ভব; কেননা তারাই শুধু ভাঙতে গড়তে ছাড়তে ও ধরতে পারে। অন্যদিকে যার এ শক্তি নেই, সে এর ভিতরেও থাকতে পারে না এবং বের হতে ও এর সহায়তা করতে পারে না। সে ত অপরের উপর নির্ভরশীল পোষ্যমাত্র। সুতরাং পরামর্শ সভায় যাওয়ার তার অধিকার কোথায় অথবা তাকে উক্ত সভার প্রয়োজনীয় অংশ মনে করারই কারণ কোথায়? অবশ্য, হ্যাঁ, তার ধর্মনীতি সম্পর্কে যে জ্ঞান আছে, তার পরামর্শ নেয়া যেতে পারে এবং ফতোয়ার মধ্য দিয়ে নেয়াও হচ্ছে। কিন্তু শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দেবার যোগ্যতা তার নেই। কারণ সে গোত্রপ্রীতি থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে শুধু তার অবস্থা-ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানই লাভ করেছে। সুতরাং তাঁদের প্রতি রাজ্যাধিপতি ও নেতৃস্থানীয়দের সম্মান প্রদর্শন এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁরা এখনও ধর্মে বিশ্বাস করেন এবং যারা কোনো না কোনো দিক থেকে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাদের প্রতি এ সকল ব্যক্তির একটা সমীহের ভাব আছে।

আর হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সেই বাণী জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী; জেনে রাখুন যে, ধর্মশাস্ত্রবিদরা বর্তমান যুগে ও অতীতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় বিধিনিষেধের বাহক, তার বিভিন্ন কর্তব্যাকর্তব্যের কথক এবং বিচিত্র সমস্যায় তার পথ নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেছেন। যারা এ সকল বিষয়ে তাঁদের নিকট জানতে গেছে, তাদের প্রতিই নির্দেশ দিয়েছেন। জ্ঞানীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়দেরও একই অবস্থা এবং তাঁদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক ও খুব কম ক্ষেত্রেই ঐসকল গুণে নিজেদেরকে গুণান্বিত করেছেন। অথচ পূর্বসূরিরা, আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাঁরা ধর্ম ও সদাচারের প্রতিমূর্তি হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে বিচরণ করতেন এবং সকল গুণে গুণান্বিত হয়ে সকল মতাদর্শের যথার্থতা সম্পাদনে সচেষ্ট থাকতেন। সুতরাং যাঁরা ধর্মীয় জ্ঞানের শুধুমাত্র বর্ণনাকারী না হয়ে বরং তাকে নিজ সত্তার সাথে গুণ ও অবস্থায় সংযুক্ত করেছেন, তাঁরা যথার্থই উত্তরাধিকারী। তাঁদের কথাই আল-কুশাইরীর[৮৭] পুস্তিকায় বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত যার মধ্যে এ দুটো বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী এবং তিনিই উত্তরাধিকারের যোগ্য। যেমন তাবেয়ীন পূর্বসূরি ধর্মশাস্ত্রবিদগণ, চার ইমাম এবং তাঁদের আদর্শ ও ধারা অনুসরণকারী অন্যান্য জ্ঞানীবৃন্দ। এসকল ইমাম ও নেতৃস্থানীয় জ্ঞানীদের মধ্যে যারা শুধু একটি বিষয়কে অবলম্বন করেছেন, তাঁদের মধ্যে সাধক শাস্ত্রবিদ অপেক্ষা উত্তরাধিকারের যোগ্য। কারণ সাধক অন্তত একটি দিক থেকে নিজ সত্তাকে গুণান্বিত করেছেন। কিন্তু যে শাস্ত্রবিদের মধ্যে সাধনার কোনো স্বাক্ষর নেই, তাঁর মধ্যে বস্তুত কিছুই নেই। তিনি কতগুলো বক্তব্যের সমষ্টিমাত্র; বিভিন্ন সমস্যায় তা থেকে আমরা নির্দেশ গ্রহণ করি মাত্র। আমাদের বর্তমান যুগে অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রবিদেরই এ অবস্থা। 'অবশ্য যারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকাজ করেছে এবং খুব অল্প সংখ্যক তারা।'[৮৮]

৮৭. আবদুল করিম ইবনে হাওয়াজিন; ৩৭৬-৪৬৫ (৯৮৬-১০৭২ খ্রি.) হি.।
৮৮. কোরান ৩৮, ২৪।

www.amarboi.org

আদালত

এটা একটি ধর্মীয় কর্তব্য, বিচারের অনুসারী এবং তার নিয়মাদি প্রবর্তনার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কর্তব্যের স্বরূপ হল কাজীর অনুমতিক্রমে মানুষের পক্ষে ও বিপক্ষে সাক্ষ্য দান করা। এতে নিয়োজিত ব্যক্তি সাক্ষ্য গ্রহণের সময় তা গ্রহণ করবে, বিরোধের ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করবে এবং নথিপত্রে সকল বিষয় লিখে রাখবে, যাতে মানুষের স্বত্ব, ধনসম্পদ, ঋণ ও অন্যান্য সকল বিষয় যথাযথ সংরক্ষিত হতে পারে।[৮৯] এ কর্তব্যের শর্ত হল ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী সততা ও ত্রুটিমুক্ত চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। নিয়োজিত ব্যক্তিকে অবশ্যই যথানিয়মে নথিপত্র লিখন ও বিন্যস্তকরণ জানতে হবে এবং এগুলোকে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও তার ধারা অনুসারে সাজাতে হবে। এ দিক থেকে তাকে ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখা দরকার। এ সকল শর্ত পালন, তাদের প্রয়োজনীয় অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনেকাংশে সততার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং যাঁরা এ কর্তব্য পালনে নিয়োজিত হন, মনে হয় তাঁরাই যেন সততার দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তা নয়; বরং এ দায়িত্ব অর্পণের সময় তাদের সততা পরীক্ষা করে দেখা হয়।

সুতরাং কাজীর উচিত তাদের অবস্থা বিচার করে দেখা, তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া, যাতে তাদের সততার শর্তটি সংরক্ষিত হয়। কারণ তাদেরকে মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিয়োজিত করা হয়ে থাকে; এ জন্য এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন ঠিক নয়। কারণ এ পদের সকল দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রাপ্তির ব্যাপারে তারই উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং উপরোক্ত শর্ত মতে যখন তাদের নিয়োগ নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন তারা অতি সহজেই যোগ্য সততার অধিকারী লোকদেরকে বের করে দিতে পারে। কারণ নগর জীবনের বিশালতা ও অবস্থার বিভিন্নতার জন্য কাজীর পক্ষে সততার সন্ধান পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। কারণ বিরোধী পক্ষের মধ্যে বিষয় নিষ্পত্তির জন্য অনেক সময় কাজীরা খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং তখন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করে থাকেন। প্রতি শহরেই এ শ্রেণীর লোকের দোকান ও তৎসংলগ্ন আসনাদি বিদ্যমান, যার উপর তারা বসে অপেক্ষা করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যথাযথ লেখার জন্য মানুষ তাদের শরণাপন্ন হয়।

এদিক থেকে এ দায়িত্বের বিশেষ শর্তটির নামে তার নামকরণ হয়েছে এবং এর ধর্মীয় বিধানসম্মত সততার সাথে তা মিশ্রিত রয়েছে, যার অপর দিকের নাম অসততা। কখনো তারা এক সঙ্গেই থাকে আবার কখনো পৃথক হয়ে দেখা দেয়। আল্লাহ্ উন্নত ও সর্বজ্ঞ।

বাজার পরিদর্শন ও মুদ্রা

বাজার পরিদর্শনও একটি ধর্মীয় কর্তব্য। এটাকে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎ কার্যে নিষেধের পর্যায়ে ফেলা যায়, যা বস্তুত মুসলমান জনসাধারণের জন্য নিয়োজিত প্রত্যেক

৮৯. এর পর রোজেনথালে একটি অনুচ্ছেদ বিদ্যমান, যাতে কাজীর অনুমতির প্রয়োজন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

শাসকের উপরই অবশ্য পালনীয়। এক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিকেই নিয়োগ করা দরকার। তার ফলে সেই অবশ্য পালনীয় কর্তব্যটি তার উপর ন্যস্ত হবে। সে এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য অন্য ব্যক্তিকেও নিয়োগ করতে পারে। যে অন্যায়সমূহের বিবেচনা করবে, মাত্রা অনুযায়ী নিবর্তন ও শিক্ষামূলক শাস্তি দিবে এবং মানুষকে সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করবে। যেমন সে রাস্তা-ঘাটের প্রতিবন্ধকতা দূর করবে; বোঝা বহনকারী ও নৌকার মাঝিদেরকে অধিক বোঝা বহন করতে নিষেধ করবে; পুরাতন বাড়ি-ঘর, যা পথচারীদের উপর ভেঙে পড়তে পারে, তা ভেঙে ফেলতে বলবে এবং প্রয়োজন হলে অনুরূপ অসুবিধাজনক বস্তুকে নিজে দূর করবে। সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মক্তবে গিয়ে ছাত্রদিগকে অত্যধিক প্রহার করতে দেখল শিক্ষকগণকে বাধা দিবে। যেকোনো প্রকার কলহ-বিবাদের ক্ষেত্রেও তার যাবার অধিকার আছে এবং যখনই সে এ সম্পর্কে শুনবে, উপস্থিত হয়ে বিবেচনা করতেও নির্দেশ দিবে। অবশ্য কোনো দাবি পূরণের ক্ষেত্রে তার নির্দেশ দেবার কোনো অধিকার নেই। বরং সে আহার্য ও অন্যবিধ সামগ্রীতে ভেজাল, ওজন ও সংখ্যায় কারচুপি, ঋণ প্রদানের গড়িমসি এবং এ প্রকার অন্যান্য ব্যাপার, যাতে প্রমাণ গ্রহণ বা আইনানুগ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় না, তাতে যথাবিহিত নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

তা যেন এমন কিছু বিধি-নিষেধ, যা সাধারণ ও সহজ উদ্দেশ্যপূর্ণ হওয়ায় কাজী এগুলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তব্যে নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট অর্পণ করেছেন। সুতরাং এদিক থেকে এ বিষয়টি তার ধরন অনুসারে সম্পূর্ণভাবে বিচার বিভাগের অধীন। অনেকগুলো ইসলামী সাম্রাজ্যে, যেমন মিশর ও মাগরিবে উবাইদী এবং আন্দালুসে উমাইয়াদের অধীনে এ বিষয়টি কাজীর তত্ত্বাবধানেই নিয়োজিত ছিল। তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী এতে লোক নিয়োগ করতেন, অতঃপর যখন খেলাফতের ধারা শেষ হয়ে সাম্রাজ্য একক হয়ে উঠল, তখন সম্রাটের পক্ষে সকল বিষয়ে দৃষ্টিদান প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল এবং এ বিষয়টিও ভিন্ন বিভাগে রাজশক্তির অধীনে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দিল।

মুদ্রার বিষয়টি হল, মানুষের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা যাতে জাল হওয়া বা অন্য ত্রুটির অধীন হয়ে না পড়ে, তৎপ্রীতি লক্ষ রাখা এবং প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যা বা তার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় স্বত্ব সংরক্ষণ করা। এটা ছাড়াও এ সকল মুদ্রায় সম্রাটের বিশেষ নিদর্শন অঙ্কিত করা এবং এ উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ ও নতুন মুদ্রা ছাঁচে ঢালাই করা। সম্রাটের নিদর্শন অংকনের জন্য এমন একটি লোহার সীলমোহর ব্যবহার করা, যাতে বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক চিহ্নাদি বিদ্যমান। দিনারের উপর এ সীলমোহর রেখে হাতুড়ীর দ্বারা এমনভাবে পিটাতে হবে, যাতে উক্ত নকশা মুদ্রার গায়ে যথাযথভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়। এভাবে সুনির্দিষ্ট আকৃতি, পরিমাণ ও নকশাসহ নতুন মুদ্রা তৈরি হবে, যা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত এবং মুদ্রা তৈরিকারকদের নিকট সুপরিচিত। কারণ মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর ঢালাই ও বিশুদ্ধতার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। বরং প্রয়োজন অনুসারে নতুন অনুসন্ধান ও নির্ধারণের অনুসারী। যখন কোনো অঞ্চল বিশেষ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে উপনীত হয়, তখন সাময়িকভাবে তাকেই বিনিময়ের মাধ্যম এবং যাবতীয় লেনদেনের পরিমাণ হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে এটাই সাধারণভাবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য মুদ্রামান হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এর কম হলে তাকে বিধিবহির্ভূত বলে মনে করা হয়।

www.amarboi.org

উপরোল্লেখিত সমুদয় বিষয়ে লক্ষ রাখাই মুদ্রা বিভাগের কাজ। তা ধর্মীয় বিধানসম্মত বলেই খেলাফতের অধীনে মনে করা হয়। এটা সাধারণভাবে কাজী পদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে বর্তমান যুগের ন্যায় তা স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়েছে, যেমন বাজার পরিদর্শনের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি।

খেলাফতের অধীনস্থ কর্তব্যাবলির আলোচনা এখানেই শেষ। বর্তমানে তার মধ্যে কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে, অথচ তার অন্তর্গত দায়িত্বশীল শক্তির পরিবর্তন ঘটেছে এবং অন্যগুলো সম্পূর্ণ সাম্রাজ্য শক্তির অধীন হয়ে পড়েছে। যেমন আমীর, উজির, যুদ্ধ পরিচালক ও খাজনা আদায়কারীর পদ সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যের অধীন। ধর্মযুদ্ধের পরে যথাস্থানে আমরা তার আলোচনা করব। ধর্মযুদ্ধের ব্যাপারটিও একই কারণে কর্তব্য হিসাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। অবশ্য খুব অল্পসংখ্যক সাম্রাজ্য তার ব্যবস্থা রেখেছে এবং সাধারণভাবে তার বিধি-নিষেধকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলেই তারা মনে করে।

অনুরূপভাবে বংশধারা সংরক্ষণ বিভাগ, যাঁরা খেলাফতের উত্তরাধিকার ও রাজকোষের প্রাপ্যাদি সম্পর্কে বিবেচনা করা হত, তাও খেলাফতের অভাবের ফলে পরিত্যক্ত হয়েছে। মোটামুটিভাবে বর্তমান যুগে খেলাফতের যাবতীয় কর্ম বিভাগ ও কর্তব্যাবলি রাজশক্তি ও শাসন ব্যবস্থার অধীন হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ যেভাবে ইচ্ছা করেন বিষয়াদির গতি পরিবর্তন করে দেন।

www.amarboi.org

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[আমীরুল মোমেনীন উপাধিটি খেলাফতের একটি নিদর্শন এবং খলিফাদের সময় থেকে তা সৃষ্টি হয়েছে]

বিষয়টি এই যে, যখন হজরত আবুবকর (রাঃ) এর বায়আত অনুষ্ঠিত হল, তখন সাহাবী ও অন্য সকল মুসলমান তাঁকে 'রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খলিফা' বা প্রতিনিধি বলে ডাকতেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপারটি এ প্রকারই ছিল। অতঃপর যখন হজরত উমর (রাঃ)-এর বায়আত অনুষ্ঠিত হল, হজরত আবুবকরের উত্তরসূরি হিসাবে তাঁকে সকলে 'রসূলুল্লাহ্র খলিফার খলিফা' বলে ডাকতে লাগলেন। ফলে, উপাধিটিতে শব্দ বেশি হওয়ায় ও সম্বন্ধকারকের আধিক্য থাকায় তার উচ্চারণ ক্রমশ কঠিন ও দুরূহ হয়ে উঠল। অনেক সময় দ্রুত উচ্চারণকালে তার মধ্যেকার একাধিক সম্বন্ধকারকের ব্যাপারটি স্পষ্ট হত না এবং তার অর্থও অস্পষ্ট থেকে যেত। সুতরাং সাহাবীরা তার অনুরূপ বা সমার্থবোধক অন্যান্য শব্দ এস্থলে ব্যবহার করে এ অসুবিধা দূর করতে চেষ্টা করতেন। যেমন তাঁরা অভিযান পরিচালনাকারীকে 'আমীর' বলতেন। শব্দটি 'ইমারত' (নেতৃত্ব) শব্দের তমবাচক বিশেষণ। মূর্খতা যুগের লোকেরা নবী (সঃ)কে মক্কার আমীর বা হেজাজের আমীর বলে ডাকত। সাহাবীরা সাদ ইবনে আবিওক্কাসকে তাঁর কাদেসিয়ার যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আমীরুল মোমেনীন বলে ডাকতেন এবং তাঁরাই তৎকালে মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন।

ঘটনাক্রমে হজরত উমর (রাঃ)কেও কোনো কোনো সাহাবী আমীরুল মোমেনীন বলে ডাকতে আরম্ভ করেন। সকলেই একে ভালো মনে করলেন, সঠিক বলে রায় দিলেন এবং ঐ উপাধিতে সম্বোধন করলেন। বলা হয়, প্রথম যিনি এ নামে তাঁকে সম্বোধন করেছিলেন, তিনি হলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে জহশ।[৯০] বলা হয়, আমর ইবনেল আস, মগিরা ইবনে শুবা। আরও বলা হয়, যুদ্ধ জয়ের সংবাদ নিয়ে একজন দূত মদিনায় পৌঁছে হজরত উমরকে খুঁজছিল এবং বলতে ছিল, আমীরুল মোমেনীন কোথায়? হজরত উমরের সহচরদের নিকট এ সম্বোধন খুব ভালো লাগল; তাঁরা বললেন, আল্লাহ্র কসম, তুমি তাঁকে যথার্থ নামেই ডেকেছ। আল্লাহ্র কসম, তিনিই যথার্থ আমীরুল মোমেনীন। অতঃপর তাঁরা এ নামেই তাঁকে ডাকতে আরম্ভ করলেন এবং এ উপাধিই মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়ে উঠল। তাঁর পর অন্যান্য খলিফারা একটি বিশেষ নিদর্শন হিসাবে এ

৯০. আব্দুল্লাহ্ ইবনে জহশ কি অহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন?

www.amarboi.org

উপাধি ব্যবহার করেছেন। খলিফা ব্যতীত অন্য কেউ এ উপাধি ব্যবহার করেনি। বনি উমাইয়াদের সকলেই এটা অনুসরণ করেছেন।

শিয়ারা হজরত আলী (রাঃ)কে ইমাম বলে বিশিষ্ট করেন; কারণ ইমামত খেলাফতেরই সমমর্যাদার বিষয়। এ নামকরণে তাদের এ উদ্দেশ্যও প্রচ্ছন্ন ছিল যে, হজরত আবু বকর (রাঃ) অপেক্ষাও তিনি নামাজের ইমামতির জন্য যোগ্য ছিলেন। কারণ এটাই তাদের অভিনব মতাদর্শ। সুতরাং তারা তাঁকে এ উপাধির দ্বারা বিশিষ্ট করেছে এবং পরবর্তীকালে যারা তাঁর খেলাফতের অধিকারী হয়েছেন, তাদেরকেও এ উপাধিতেই ভূষিত করেছেন। বস্তুত এ ইমামগণ যতক্ষণ গোপনে অবস্থান করেছেন, ততক্ষণই তাঁরা ইমাম; কিন্তু প্রাধান্য বিস্তার করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেই পরবর্তীদের মধ্যে ঐ আমীরুল মোমেনীন উপাধি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বনি আব্বাসের শিয়ারা; তারা ইব্রাহিম পর্যন্ত সকলকেই ইমাম বলে ডেকেছে। এ ইব্রাহিম প্রথম প্রকাশ্যে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং যুদ্ধের জন্য পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁরা মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী আস্‌সাফফাহকে তারা আমীরুল মোমেনীন উপাধি দেয়। এরূপ আফ্রিকিয়ার রাফেজী সম্প্রদায়ও। তারা তাদের ইসমাইল বংশীয় নেতৃবৃন্দকে ইমাম বলেই ডাকত; এমনকি এ নেতৃত্ব উবাইদুল্লাহ্ আল মেহেদী পর্যন্ত পৌঁছলেও এ ইমাম ডাক অব্যাহত ছিল। তাঁর পুত্র আবুল কাসেমও এ নামেই অভিহিত হতেন। অতঃপর তাদের পক্ষে ক্ষমতা লাভ সম্ভব হল, তখন তাদেরকে আমীরুল মোমেনীন উপাধিতে ভূষিত করল। এরূপ মাগরিবের ইদরিসীগণ, তারাও ইদরিসকে ইমাম বলত এবং তাঁর পুত্র ইদরিসকে বলত ছোট ইমাম। এভাবেই তাদের সকলের অবস্থা আবর্তিত হয়েছে।

খলিফাগণ একে অপরের নিকট থেকে এ আমীরুল মোমেনীন উপাধির উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। তাঁরা একে হেজাজ, সিরিয়া ও ইরাকের অধিপতিদের জন্য একটি বিশেষ নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে যারা আরবদের আবাসভূমি, সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল এবং জাতি ও বিজয়াভিযানের উৎসকে নিজেদের অধীনস্থ রেখেছেন, তারা এটা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে এর ব্যবহার প্রথম দিকে বৃদ্ধি পেলে, তারা আরো এমন কিছু উপাধি গ্রহণ করলেন, যা দিয়ে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হতে পারে। কেননা আমীরুল মোমেনীন উপাধি তখন সকলের মধ্যে সাধারণ হয়ে গেছে। এ নতুন উপাধির প্রথম ধারা স্থাপন করল বনি আব্বাস। এর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তাদের আসল নাম সাধারণের দ্বারা উচ্চারিত হয়ে সহজ ও সাধারণ হয়ে না দাঁড়ায়। এ জন্য তারা আস-সাফফাহ, আল-মনসুর, আল-মাহদী, আল-হাদী, আর-রশীদ প্রভৃতি উপাধি সাম্রাজ্যের শেষ অবধি গ্রহণ করেছিল। আফ্রিকিয়ার ও মিশরের উবাইদীগণ তাদের এ ধারা অনুসরণ করে। অথচ তাদের পূর্বে পূর্বাঞ্চলীয় বনি-উমাইয়ারা এটা থেকে দূরে ছিল। কারণ তখনো তাদের মধ্য থেকে বেদুইন জীবনের স্থূলতা ও সারল্য দূরীভূত হয়নি। তারা তখনো জীবনধারায় আরবীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে পুরোপুরি নাগরিক হয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য আন্দালুসী বনি উমাইয়াদের অবস্থা ভিন্ন প্রকার। তারা তাদের পূর্বসূরিদেরকেই অনুসরণ করেছে; তথাপি যেহেতু তারা হেজাজ তথা জাতি ও বেদুইন জীবনের কেন্দ্রভূমির অধিকারী ছিল না এবং গোত্রপ্রীতির কেন্দ্রস্থল

www.amarboi.org

খেলাফতের রাজধানী থেকে দূরে ছিল, এজন্য উপাধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করত। কারণ বহুদূরে অবস্থিত নেতৃত্বের কল্যাণেই তারা বনি আব্বাসের আগ্রাসী ধ্বংসলীলা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। অতঃপর চতুর্থ শতাব্দী হিজরির প্রথম দিকে তাদের শেষ আব্দুর রহমান (আদ্‌দাখেল)-এর কাল এসে উপস্থিত হল (ইনি আন্‌নাসের ইবনে মুহম্মদ ইবনে আমীর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহম্মদ ইবনে আবদুর রহমান মধ্যম) এবং পূর্বাঞ্চলীয় খেলাফতের উপর আশ্রিতপোষ্যদের অন্যান্য হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বিস্তারের কথা সর্বত্র প্রকাশ পেল। বস্তুত তখন উক্ত খলিফাগণকে অনারব সেনাপতিরা ইচ্ছামতো পদচ্যুত, পরিবর্তন, হত্যা ও অন্ধ করছে। এ সময়ে উক্ত শেষ আব্দুর রহমান পূর্বাঞ্চলীয় ও আফ্রিকিয়ার খলিফাদের ধারা অনুসরণ করে নিজেকে আমীরুল মোমেনীন খেতাবে ভূষিত এবং আন্‌নাসের লেদীনেল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ধর্মের সাহায্যকারী) উপাধি গ্রহণ করলেন। তখন থেকে এ বিষয়ে একটি ধারা তাঁর পরবর্তীদের মধ্যে অনুসৃত হতে দেখা গেল, যা তাঁর পিতৃপুরুষ ও পূর্বসূরিদের মধ্যে ছিল না।

অবস্থা এভাবেই চলছিল। এর পর আরবের গোত্রপ্রীতি নিঃশেষ হল এবং খেলাফতের ধারাও অবলুপ্ত হল। আশ্রিতপোষ্যরা বনি আব্বাসের উপর প্রভাব বিস্তার করল এবং কায়রোতে কর্মচারীরা উবাইদীদের উপর প্রাধান্য লাভ করল। আফ্রিকিয়ার আমীরদের উপর সিনহাজাদের এবং মাগরিবে জানাতীদের আধিপত্য দেখা দিল। আন্দালুসে ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ বনি উমাইয়াদের ক্ষমতা আচ্ছন্ন করে বসল এবং সাম্রাজ্যকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিল। ইসলামের ঐক্য আর রইল না। পূর্ব-পশ্চিমে রাজশক্তির মতাদর্শ বিচিত্র হয়ে দেখা দিল। তারা বিশেষ উপাধি গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় দিতে লাগল। একমাত্র উপাধি সুলতান ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলেরই সাধারণ একটা আকর্ষণ ছিল।

পূর্বাঞ্চলে অনারব রাজশক্তির অধিকারীদের জন্য খলিফা বিভিন্ন সম্মানসূচক উপাধি বিতরণ করতেন। এর দ্বারা তাদের নিজেদের খেলাফতের প্রতি আনুগত্য ও সুধারণা যেমন বোঝাত, তেমনি নিজেদের পদমর্যাদাকেও সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হত। যেমন, শারফুদ্দৌলা, আজদুদ্দৌলা, রুকনদ্দৌলা, মুয়েজ্জুদ্দৌলা, নাসিরুদ্দৌলা, নেজামুলমূলক, বাহাউদ্দৌলা, যখিরাতুল মুলক[৯১] এবং এ প্রকার আরো উপাধি। উবাইদীরাও এ প্রকার উপাধি দ্বারা সিনহাজা আমীরদেরকে বিশিষ্ট করতেন। তারা যখন খেলাফতের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করেছিল, তখন এ সকল উপাধি নিয়েই তাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। তারা খেলাফতের প্রতি সম্মান রক্ষার্থে ও তার অধিকারের হস্তক্ষেপের সন্দেহ দূর করতে তার সাথে বিশিষ্ট কোনো উপাধি গ্রহণ করতে সর্বদাই ইতস্তত করেছে। কারণ অন্যায্য প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তারকারীদের অবস্থা সকল সময়ে এরূপই হয়ে থাকে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

---

৯১. উপাধিগুলোর অর্থ—যথাক্রমে সাম্রাজ্য, গৌরব, সাম্রাজ্য মহাবাহু, সাম্রাজ্যস্তম্ভ, সাম্রাজ্য অলংকার, সাম্রাজ্য সহায়, রাজ শৃঙ্খলা, সাম্রাজ্য ভূষণ ও রাজখনি।

www.amarboi.org

পূর্বাঞ্চলের পরবর্তী অনারব রাজশক্তিগুলো, যখন তাদের রাজশক্তি হিসাবে অধিকার সাব্যস্ত হল, সাম্রাজ্য ও সুলতান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পথে আর কোনো বাধা রইল না, তখন তারা রাজশক্তিসুলভ উপাধি গ্রহণ করতে লাগল। কারণ খেলাফতের গোত্রশক্তি তখন নিশ্চিহ্ন প্রায় এবং সম্পূর্ণরূপে বিলীন হওয়ার সম্মুখীন। সুতরাং তারা তাদের পূর্ববর্তী উপাধিগুলোর সাথে আন্‌নাসের, আল-মনসুর ধরনের এমন সব উপাধি গ্রহণ করতে লাগল, যা তাদের আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত হবার সূত্রকে ছিন্ন করার কথাই বোঝাত। তারা এভাবে 'দীন' শব্দের সম্বন্ধ স্থাপন করে সালাহুদ্দিন, আসাদুদ্দিন, নুরুদ্দিন[৯২] প্রভৃতি উপাধিও ব্যবহার করতে আরম্ভ করল।

আন্দালুসের ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ অবশ্য খেলাফতের জন্য বিশিষ্ট উপাধিগুলোই তাদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। কারণ তাদের গোত্রপ্রীতি ও যোগ্যতা প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে শক্তির জন্ম দিয়েছিল, তাতেই তাদের পক্ষে এরূপ কথা সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং তারা বিনা দ্বিধায় আন্‌নাসের, আল-মনসুর, আল-মুতামিদ, আল-মুজাফফর ও এ প্রকার অন্যান্য উপাধি গ্রহণ করেছিল। কবি ইবনে (আবি) শরফ[৯৩] এর স্বরূপ দেখেই তাদের প্রতি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন,

আন্দালুস ভূখণ্ডে আমার সর্বাপেক্ষা দ্বিধার ব্যাপার
মুতামিদ ও মুতাজিদ উপাধি উচ্চারণ করা।
এগুলো সাম্রাজ্যের উপাধি, অস্থানে পড়ে আছে,
বিড়াল ফুলে যেন সিংহের আকৃতি ধারণ করেছে।

সিনহাজারা উবাইদী খলিফাদের দেয়া উপাধি, যেমন নাসিরুদ্দৌলা, মুয়েজ্জুদ্দৌলা প্রভৃতির উপরই সতর্কতার জন্য সন্তুষ্ট রয়েছে। অতঃপর উবাইদীদের পক্ষ ত্যাগ করে আব্বাসীদের পক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করলেও উপাধি গ্রহণের এ ধারা অব্যাহত রেখেছে। এর পর খেলাফত ও তাদের মধ্যকার ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা তার যুগ ভুলে যাওয়ার সাথে সাথে ঐ সকল উপাধিও ভুলে গেছে ও কেবল সুলতান উপাধি ব্যবহার করেছে। মাগরিবের মেগারাওয়া রাজন্যবর্গেরও একই অবস্থা; তারাও এ সকল উপাধি ব্যবহার না করে কেবল সুলতান শব্দের দ্বারা তাদের প্রান্তর জীবনের সারল্য ও মতাদর্শের পরিচয় দিয়েছে।

যখন খেলাফত নিশ্চিহ্ন হল ও তার ক্ষমতা লোপ পেল, তখন মাগরিবের বারবার গোত্রাদির মধ্য থেকে লামতুনারাজ ইউসুফ ইবনে তাশেফীন উভয় তীরের অধিকারী হলেন। বস্তুত তিনি নেতৃত্ব ও কল্যাণের প্রতিভু ছিলেন। এ কারণে তিনি খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর ধর্মীয় রীতি রক্ষার জন্য ইচ্ছুক হন। এ উদ্দেশ্যে তিনি শেভিলার উস্তাদদের মধ্যে বিখ্যাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আল আরাবী ও তৎপুত্র কাজী আবু বকরকে[৯৪] আব্বাসী খলিফা আল-মুস্তাজহেরের[৯৫] নিকট প্রেরণ করেন। তাঁরা খলিফার

---

৯২. অর্থ যথাক্রমে—ধর্মকল্যাণ, ধর্মসিংহ ও ধর্মজ্যোতি।

৯৩. যথার্থ নাম ইবনে শরফ।

৯৪. এই অধ্যায়ের ৭৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৫. ১০৯৪-১১১৮ খ্রি.।

www.amarboi.org

নিকট লামতুনা সম্রাটের বায়আত পৌঁছে তাঁর জন্য মাগরিবের নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্ব প্রার্থনা করেন। অতঃপর তাঁরা তাঁর জন্য মাগরিবের উপর খেলাফতের অধিকার ও পরিচ্ছদ পদমর্যাদার তদনুরূপ নিদর্শন ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এ অনুমতিতে তাঁকে সম্মান হিসাবে আমীরুল মোমেনীন সম্বোধন করা হয় এবং তিনি তা পরে উপাধি হিসাবে গ্রহণ করেন। অনেকে বলে, তাঁকে এর পূর্ব থেকেই আমীরুল মোমেনীন ডাকা হত এবং এটা তাঁর খলিফাসুলভ মর্যাদার জন্যই করা হত। কারণ তিনি নিজে এবং তাঁর জাতি আল-মুরাবেতীগণ সকলেই ধর্ম ও রীতিনীতির অনুসারী ছিলেন।

আল-মেহেদী তাদেরই ধারা অনুসরণ করে সত্যের দিকে আহ্বান জানান। তিনি 'আশায়েরী' মতাদর্শ গ্রহণ করে মাগরিববাসীদেরকে তা ত্যাগ করার জন্য ভর্ৎসনা করেন। কারণ পূর্বসূরিদের আদর্শ অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধানের বাচ্যার্থের রূপক বিশ্লেষণকে তারা ত্যাগ করেছিল। এ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল আল্লাহ্র দেহবিশিষ্ট হওয়া। দেহের এ বর্ণনা রূপক হওয়ার ব্যাপারটি আশায়েরীদের একটি পরিচিত মতবাদ।[৯৬] সুতরাং এ ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করেই আল-মেহেদী তাঁর অনুসারীদের নাম রাখলেন আল-মোহেদ বা একেশ্বরবাদী। তিনি আলীর বংশধরদের 'ইমাম মাসুম' হওয়ার মতও প্রচার করেন এবং তাঁর মতে প্রত্যেক যুগেই একজন ইমাম থাকা অত্যাবশ্যকীয়, যার দ্বারা সমগ্র জগতের শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়ে থাকে। সুতরাং অনুসারীরা তাঁকেও ইমাম বলে সম্বোধন করত, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি যে, এটা শিয়ামত অনুসারে তাদের খলিফাদের উপাধি। 'মাসুম' বলতে তারা ইমামতের পূতপবিত্রতার প্রতি ইঙ্গিত করেছে, এটাও শিয়া মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল-মেহেদী তাঁর অনুসারীদিগকে আমীরুল মোমেনীন উপাধি থেকে বিরত রাখেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন শিয়ামতের অনুসরণ করেন। অন্যদিকে এতে পূর্ববর্তী খলিফাদের বংশধর, বর্তমানের অযোগ্য ও অর্বাচীন পূর্বাঞ্চলীয় খলিফাদের উপাধির সাথে একাত্মতা ঘোষণার অসুবিধাও বিদ্যমান ছিল। অবশ্য তাঁর উত্তরাধিকারী আবদুল মোমেন পরে এ আমীরুল মোমেনীন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর এ ধারায় বনি আবদুল মোমেন ও তাদের পরে আবু হেফসের বংশধররা এ উপাধি অব্যাহত রাখেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের বংশধারা ব্যতীত অন্য কাউকেও এ উপাধি ব্যবহার করতে দেননি। কারণ তাদের মান্যবান পূর্বপুরুষ আল-মেহেদী আন্দোলন করে এ উপাধি ব্যবহারের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করেছেন। সুতরাং তিনিই এর অধিকারী এবং তাঁর বন্ধুস্থানীয় সহচরগণ তাঁর পরে এটা ব্যবহারের যোগ্য, অন্যরা নয়। অন্যদিকে কোরায়েশ গোত্রপ্রীতি তখন আর অবশিষ্ট নেই। কাজেই এটা তাদের একটি প্রথা হয়ে দাঁড়ায়।

অতঃপর মাগরিবে রাজশক্তির পতন ঘটলে তা জানাতীদের করতলগত হল। তাদের প্রথম দিককার রাজন্যবর্গ প্রান্তর জীবনের স্থূলতা ও সারল্যের অধিকারী হওয়ায়

---

৯৬. কোরানে আল্লাহ্র হাত, চেহারা ইত্যাদির উল্লেখ রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

www.amarboi.org

আমীরুল মোমেনীন উপাধি ব্যবহারে লামতুনাদের অনুসরণ করেননি। কারণ তাঁরা প্রথমে বনি আব্দুল মোমেনের অধীনে এবং পরে বনি আবু হেফসের অধীনে থাকায় খলিফাদের প্রতি সম্মানের জন্যও এটা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরে তাঁদের পরবর্তীরা এ উপাধি গ্রহণ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত রাজশক্তির আকাঙ্ক্ষা, মতাদর্শ ও নিদর্শনকে পূর্ণতা দান করার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর বিষয় সম্পর্কে সর্বত্র ক্ষমতাবান।[৯৭]

৯৭. কোরান ১২, ২১।

www.amarboi.org

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[খ্রিস্টধর্মের 'পোপ' ও 'পেট্রিআর্ক' উপাধি এবং ইহুদিদের 'কোহেন' নামের ব্যাখ্যা]

জেনে রাখুন, যে কোনো জাতির জন্য তাদের নবীর তিরোধানের পর এমন একজন অভিভাবকের প্রয়োজন, যিনি ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও নিয়মনীতির ব্যাপারে তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে পারেন। তিনি তাদের মধ্যে নবীর বাণী প্রচারের দায়িত্বে তাঁর প্রতিনিধিতুল্য হবেন। মানব জাতির জন্যও ঠিক তেমনি, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাদের সমাজবদ্ধ জীবনের শাসনের প্রয়োজনে এমন এক ব্যক্তির বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী, যিনি তাদেরকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবেন এবং প্রতাপের দ্বারা তাদেরকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখবেন। এরই নাম রাজশক্তি।

ইসলাম ধর্মে যেহেতু জেহাদের প্রবর্তনা আছে এবং এরই উদ্দেশ্য হল সকলের প্রতি উক্ত ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানানো ও সকলকে তার দিকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পরিচালিত করা, সেজন্য খেলাফত ও রাজশক্তি তাতে একত্র হয়ে ধর্মযোদ্ধাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং উভয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তুলেছে।

কিন্তু ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে তা গ্রহণের আহ্বান সর্বজনীন নয় এবং একমাত্র প্রতিরোধ ছাড়া ধর্মযুদ্ধও তাদের মধ্যে প্রবর্তিত হয়নি। সুতরাং ঐ সকল ধর্মের প্রচারকদের জন্য রাজশক্তির দিক থেকে সাহায্য প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাদের মধ্যে যারা রাজশক্তির অধিকারী হয়েছেন, তা সম্পূর্ণ আকস্মিক ও ধর্ম ভিন্ন অন্য কোনো প্রক্রিয়ার ফল মাত্র। কারণ তা তাদের মধ্যকার গোত্রপ্রীতির আকর্ষণে তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই দেখা দিয়েছে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কারণ ইসলাম ধর্মের ন্যায় অন্য জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারের নির্দেশ তাদের প্রতি দেয়া হয়নি। তাদেরকে একমাত্র তাদের ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

এ কারণে হজরত মুসা ও ইউশা (রাঃ)-র পরে বনি ইসরাইল চারশ বছর[৯৮] ধরে কোনোপ্রকার রাজশক্তি স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়নি। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের প্রতিষ্ঠা। এ ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজনকারীকে তারা 'কোহেন' বলত। তিনি হজরত মুসার স্থলাভিষিক্তরূপে তাদের নামাজ ও কোরবানীর বিষয়ে নির্দেশাদি প্রদান করতেন। তাঁকে হজরত হারুনের বংশধর থেকে হত; কারণ হজরত মুসার কোনো সন্তান ছিল না। অতঃপর সমাজ জীবনের প্রয়োজন অনুসারে শাসন ব্যবস্থার জন্য তারা

---

৯৮. ইবনে খলদুন তাঁর ইতিহাসের ২য় গ্রন্থে তিনশত বছর উল্লেখ করেছেন।

www.amarboi.org

সত্তর জন বয়োবৃদ্ধকে শাসক নিযুক্ত করে, যারা শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশাদি দিতেন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কোহেনই তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি শাসন ব্যবস্থায় কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতেন না। সামাজিক অবস্থা এভাবে চলতে থাকার পর তাদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি দৃঢ় হয়ে উঠল এবং রাজশক্তিসুলভ শৌর্যবীর্যের প্রাদুর্ভাব ঘটল। ফলে তারা কেনানীদেরকে পরাভূত করে জেরুজালেম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল অধিকার করে ফেলল। এ ভূমিরই উত্তরাধিকার আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছিলেন এবং হজরত মুসাও তার প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করেছিলেন। এর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে ফিলিস্তিন, কেনান, আরমান, জর্ডন, উম্মান, মারেব প্রভৃতি অঞ্চলের জাতিগুলোর সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং এ সময়ে তাদের নেতৃত্ব সেই বয়োবৃদ্ধদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। এভাবে তারা চারশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে এবং তখনো তাদের মধ্যে সাম্রাজ্যসুলভ কোনো প্রতিপত্তি গড়ে ওঠেনি। এর ফলে বনি ইসরাইল বিভিন্ন জাতির আক্রমণের মুখে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং তারা তাদের নবীদের অন্যতম সামুয়েলের মাধ্যমে এমন এক ব্যক্তিকে তাদের রাজা করার প্রার্থনা জানাল, যিনি তাদের উপর নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। ফলে তালুত (শৌল) তাদের রাজা হলেন। তিনি অন্যান্য জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করলেন এবং ফিলিস্তিনের রাজা জালুত (গোয়লিয়থ)-কে হত্যা করলেন।[৯৯] তাঁর পর হজরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) তাদের রাজা হলেন। তাঁর রাজ্য সমৃদ্ধিলাভ করল এবং হেজাজ পর্যন্ত বিস্তৃত হল। পরে ইয়ামেনের বহু অঞ্চল এবং রোমের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য বিস্তার লাভ করল। অতঃপর হজরত সুলায়মানের পরবর্তী গোত্রগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং গোত্রপ্রীতির অমোঘ তাড়নায় পৃথক পৃথক সাম্রাজ্যে বিভক্ত হল, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এদের একটি সাম্রাজ্য দশটি গোত্রের অধীনে আল-জজিরা ও মোশেলে[১০০] অবস্থিত ছিল এবং অন্যটি বনি যিহুদা ও বনি ইয়ামিনের জন্য বয়তুল মুকাদ্দস ও সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অতঃপর ব্যবিলনের সম্রাট বখতেনসর (নেবুচাডনেজার) তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদের সমুদয় অঞ্চল দখল করে নিলেন। তিনি প্রথমে দশ গোত্রের অধীনস্থ ভূভাগ এবং পরে যিহুদা বংশ ও বয়তুল মুকাদ্দস অধিকার করেন। এভাবে বনি ইসরাইলের হাজার বছরব্যাপী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। বখতেনসর তাদের মসজিদগুলো ধ্বংস করেন, তাদের তৌরাত পুড়িয়ে দেন এবং তাদের ধর্মের বহু ক্ষতি সাধন করে তাদেরকে ইস্পাহান ও ইরাকের দিকে তাড়িয়ে দেন। তাদের এভাবে বিতাড়িত হওয়ার সত্তর বছর পরে পারস্যের কায়ানী সম্রাটদের কেউ পুনরায় তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দসে ফিরিয়ে আনেন। তখন তারা পুনরায় তাদের মসজিদ নির্মাণ করে এবং পূর্বের ধারা অনুসরণ করে শুধুমাত্র ধর্মের নির্দেশাদি প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়। তারা কোহেনের পদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে; কিন্তু সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল পারস্য।

৯৯. শৌল যে গোয়ালিয়থকে হত্যা করেননি, এ সম্পর্কে ইবনে খলদুন তাঁর ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন।
১০০. দশ গোত্রের রাজ্য 'নেবালক' অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, যার রাজধানী 'সামারিয়া' (সাবাস্তিয়া) : রোজেনথালে এর উল্লেখ আছে।

www.amarboi.org

এর পর সম্রাট আলেকজান্ডার ও গ্রিকরা পারস্যবাসীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং ইহুদিরা তাদের অধীনস্থ হয়। এক সময়ে গ্রিকদের অবস্থা দুর্বল হয়ে আসে এবং গোত্রপ্রীতির জোরে ইহুদিরা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে ও তাদের প্রভাবমুক্ত হতে সমর্থ হয়। তখন তাদের আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেন বনি হুশমনাই কোহেনগণ। তাদের সম্মিলিত আক্রমণে গ্রিকরা পর্যুদস্ত হয় এবং তাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। অতঃপর ইহুদিদের উপর রোমীয়রা জয়ী হয় এবং ইহুদিরা তাদের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। রোমানরা অতঃপর বয়তুল মুকাদ্দসের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে তখন বনি হুশমনাইয়ের আত্মীয় বনি হিরোদাসের রাজত্বের অবশেষ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রোমানরা তা অবরোধ করে এবং বল প্রয়োগ করে তার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ফলে ইহুদিদের উপর হত্যা, ধ্বংস ও জ্বালানোর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। রোমানরা বয়তুল মুকাদ্দসকে ধ্বংস করে ইহুদিদেরকে রোম ও তদপশ্চাদ্বর্তী অন্যান্য অঞ্চলে বিতাড়িত করে। এটাই বয়তুল মুকাদ্দসের দ্বিতীয়বার ধ্বংস হওয়া এবং এটাকে ইহুদিরা 'বিরাট নির্বাসন' বলে অভিহিত করে। এর পর ইহুদিরা তাদের গোত্রপ্রীতি হারিয়ে ফেলার ফলে আর রাজশক্তির সাক্ষাৎ পায়নি। তারা এবং তাদের পরবর্তী বংশধররা রোমানদের অধীনে বসবাস করতে থাকে। তাদের ধর্মের ব্যাপারে তখনো তারা কোহেনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

অতঃপর হজরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন হয়। তিনি নতুন ধর্মমত প্রচার করেন এবং তৌরাতের কিছু সংখ্যক নিয়মকে বাতিল করেন। তাঁর মধ্যে নানা প্রকার অলৌকিক অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটনের ক্ষমতা দেখা দেয়। যেমন পঙ্গু ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্যকরণ,[১০১] মৃতকে জীবনদান ইত্যাদি। তাঁর চতুর্দিকে বহুলোক জড় হয় ও তাঁকে বিশ্বাস করে। তাঁদের অধিকাংশই 'হাওয়ারী' (সাধু) শ্রেণীর এবং তাঁরা সংখ্যায় বারজন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর ধর্মমতের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য চতুর্দিকে প্রেরণ করেন। এ সকল ঘটনা প্রথম রোমান সম্রাট অগাস্তাসের শাসন আমলে এবং ইহুদি শাসক হিরোদসের সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত হিরোদস হুশমনাইদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সূত্রে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। সুতরাং ইহুদিরা হজরত ঈসাকে মিথ্যাবাদী বলে তাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। হিরোদস তাদের সম্রাট রোমান অগাস্তাসের নিকট পত্র লিখে হজরত ঈসার বিরুদ্ধে তাঁকে উত্তেজিত করে তোলে। কাজেই সম্রাট তাদেরকে ঈসাকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর কোরানে যা বর্ণিত হয়েছে, তা সংঘটিত হয়।[১০২]

এর পর হাওয়ারীগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের অধিকাংশ খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য রোমের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করেন। তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ পিটার রোম নগরীতে উপনীত হন। এটা তখন রোমান সম্রাটদের রাজধানী। সেখানে তাঁরা হজরত ঈসার উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। তাঁদের বর্ণনার তারতম্যের জন্য তার চারটি সংস্করণ প্রস্তুত হয়। মথি তাঁর ইঞ্জিল গ্রন্থ বয়তুল মুকাদ্দসে

১০১. রোজেনথালে 'পঙ্গু' ও কুষ্ঠ'-এর স্থলে আছে উন্মাদ।
১০২. কোরান ৪, ১৫৭।

www.amarboi.org

হিব্রু ভাষায় লিখেন। তাঁদের মধ্যে ইউহানা (জন) ইবনে যবদী তাকে লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁদের অন্যতম লুক লাটিন ভাষায় তার ইঞ্জিল রচনা করেন। এটা কতিপয় উচ্চপদ মর্যাদার অধিকারী রোমানদের জন্য করা হয়। তাঁদের মধ্যকার ইউহানা ইবনে যবদী তাঁর ইঞ্জিল রোমান ভাষায় লিখেন। পিটার তাঁর ইঞ্জিল গ্রন্থ লাটিন ভাষায় লিখে তাঁর শিষ্য মারকাস (মার্ক) এর নামে প্রচারিত করেন। ইঞ্জিলের এ চারটি সংস্করণই নানাভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তদুপরি তার সবটুকু প্রত্যাদেশ নয়; এবং তার মধ্যে হজরত ঈসা ও হাওয়ারীগণের বাণী মিশ্রিত রয়েছে। অন্যদিকে এর সমস্তটাই উপদেশ ও কাহিনী। বিধি-নিষেধ খুবই কম। বর্তমানকালে খ্রিস্টীয় সাধু-সন্তরা রোমে একত্র হয়ে খ্রিস্টধর্মের নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেছেন এবং তার সমস্ত দায়িত্ব পিটারের শিষ্য ক্লিমেন্টের হাতে ন্যস্ত করেছেন। বস্তুত এটা কতগুলো পুস্তকের তালিকা, যেগুলো গ্রহণ করা ও তদনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন অবশ্য পালনীয়।

ইহুদিদের প্রাচীন ধর্মীয় সংবিধান সংবলিত গ্রন্থাদির মধ্যে তৌরাত-এর পাঁচটি পুস্তক : ইউশার (যশোয়ার) পুস্তক, বিচারকদের পুস্তক, রাউছের (রোখের) পুস্তক, ইহুসার (জডিসের) পুস্তক ও চার সম্রাটের পুস্তক। বনি ইয়ামীনের (ক্রনিকল) পুস্তক; ইবনে করিউনের (গরিউনের) রচিত মাক্কাবীদের তিনটি গ্রন্থ; ইমাম ইজরার গ্রন্থ; উশিরের (ইস্তারের) গ্রন্থ ও হামানের কাহিনী; হজরত আইউব সত্যনিষ্ঠের গ্রন্থ; হজরত দাউদের সঙ্গীতাবলি এবং তাঁর পুত্র সুলায়মানের পাঁচটি গ্রন্থ। ষোলটি বড় ও ছোট নবীদের নব্যুয়ত সম্পর্কীয় পুস্তিকা। হজরত সুলায়মানের উজির ইয়াশো (জেসাস) ইবনে শারেখ (সিরা)-এর গ্রন্থ।

হজরত ঈসার ধর্মবিধান সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি, যা হাওয়ারী(সাধু)গণ দীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তার সংখ্যা চারটি। ক্যাথলিকদের সাতটি পুস্তিকা এবং অষ্টমটি রসূলদের কাহিনী সংবলিত ইব্রিক্সিস (প্রেক্সিস) পলের চৌদ্দটি পুস্তিকা। ইকলিমেন্তাস (ক্লিমেন্ট)-এর বিধি-নিষেধ সংবলিত গ্রন্থ। আবু গালেমসিস (এ্যাপোকালেপসি)-র গ্রন্থ, যাতে ইউহানা ইবনে যবদীর স্বপ্নদর্শন বিদ্যমান।

রোমান সম্রাটগণ উক্ত ধর্মমত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনো তাঁরা তা গ্রহণ করেছেন এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। আবার তাকে ত্যাগ করে ধর্মাধিকারীদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও তাদেরকে হত্যা করেছেন। সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন না আসা পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজ করেছে এবং তিনি তা গ্রহণ করার পর আর পরিবর্তন হয়নি।

এ খ্রিস্টধর্মের বিধিবিধান যিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন, তাঁকে পেট্রিআর্ক বলা হত। তিনি তাঁদের নিকট ধর্মীয় ব্যাপারে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং মসিহের (ঈসার) প্রতিনিধি। তিনি দূরদূরান্তে অবস্থানরত খ্রিস্টানদের মধ্যে তাঁর প্রতিনিধি ও মনোনীত ব্যক্তিকে প্রেরণ করতেন এবং তাঁদেরকে বলা হত 'উস্কুপ' (বিশপ) অর্থাৎ তাঁরা পেট্রিআর্কের স্থলাভিষিক্ত। যে ব্যক্তি তাদের প্রার্থনা পরিচালনা করতেন ও ধর্মীয় বিধান দিতেন, তাঁকে বলা হত 'কেসিস' (প্রীস্ট) এবং যিনি সংসার ত্যাগ করে নির্জন বাস অবলম্বন করতেন, তাঁকে বলা হত রাহেব (মঙ্ক)। শেষোক্ত ব্যক্তি সাধারণত গির্জাতেই বাস করতেন।

www.amarboi.org

সেন্ট পিটার হওয়ারীদের নেতা ও ঈসার শিষ্যদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি রোমে খ্রিস্টধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ছিলেন। রোমান সম্রাট পঞ্চম নিরো অন্যান্য অনেক পেট্রিআর্ক ও বিশপসহ[১০৩] তাঁকে হত্যা করেন। রাজধানীতে অতঃপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন আরিয়ুস। মার্কাস (মার্ক) আল ইঞ্জিলী (ইভানজেলিস্ট) আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর ও মাগরিবে খ্রিস্টধর্মের প্রচারকার্যে সাত বছর অতিবাহিত করেন। তাঁর পরে 'হাননিয়া' (আননিয়াস) উক্ত অঞ্চলের প্রথম পেট্রিআর্ক নিযুক্ত হন এবং তাঁর সাথে আরো বারজন প্রীস্ট নিযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল যাতে উক্ত পেট্রিআর্কের তিরোধানের পর তাদের একজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন এবং সাধারণ ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে অন্য একজনকে প্রীস্টের স্থলাভিষিক্ত করা যায়। এভাবে পেট্রিআর্কের পদটি প্রীস্টদের দ্বারা পূরণ করার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর যখন তাদের ধর্মের নিয়মাবলি ও বিশ্বাসাদির মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা দিল, তখন কনস্ট্যান্টাইনের সময়ে নিকিয়া(নিসিয়া)-র তারা সত্যধর্ম উদ্ধারের জন্য সমবেত হন। তাদের মধ্যে তিনশ আঠার জন বিশপ ধর্মের একটি বিশেষ মতে ঐক্যবদ্ধ হন। তাঁরা এ মত সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে তাকে 'ইমাম' (ক্রীড) নামকরণ করেন এবং সর্বাবস্থায় এর প্রমাণকে গ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেন। তাঁরা লিপিবদ্ধ করেন যে, পেট্রিআর্কের জন্য প্রীস্টদের মনোনয়নের কোনো প্রয়োজন নেই এবং মার্কাসের শিষ্য হাননিয়া (আনানিয়াস) যে পদ্ধতিতে পেট্রিআর্ক নির্বাচিত করতেন, তা বাতিল বলে গণ্য হয়। তারা সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্বাচনের উপর জোর দেন এবং উক্ত বিষয়টি এভাবেই স্থিরীকৃত হয়। এর পর যদি তাঁরা ধর্মীয় নীতি নিয়মের মতভেদের দরুন একাধিক সভায় মিলিত হন; কিন্তু কখনো উক্ত পেট্রিআর্ক নির্বাচনের ব্যাপার সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়নি। উক্ত ব্যাপার পূর্বানুরূপ থাকে এবং তার সাথে বিশপ মনোনয়নের বিষয়টি সংযুক্ত করা হয়।

বিশপগণ পেট্রিআর্ককে সম্মানের জন্যই 'পিতা' বলে ডাকতেন।[১০৪] এটা বহুদিন যাবত ব্যবহৃত হওয়ার ফলে উক্ত সম্বোধনের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একাধারে পেট্রিআর্ক ও 'ফাদার' শব্দ ব্যবহার করার শেষ নিদর্শন হল আলেকজান্দ্রিয়ার পেট্রিআর্ক হিরাক্লে। অতঃপর বিশপ ও পেট্রিআর্কের সম্বোধনের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি করে শেষোক্তকে 'পোপ' ডাকতে আরম্ভ করেন, যার অর্থ পিতৃগণের পিতা। জর্জিস ইবনে আল-উমাইদ[১০৫]-এর ইতিহাসে বর্ণিত ধারণা অনুসারে এ নতুন নাম প্রথমে মিশরে প্রবর্তিত হয়। অতঃপর একে রোমের প্রধান কেন্দ্রের পেট্রিআর্কের প্রতি আরোপিত হয়। কেননা রোম সেন্টপিটারের সমাধিস্থল হওয়ার ফলে খ্রিস্টানদের নিকট খুবই মর্যাদার অধিকারী, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সেই সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত তা সেভাবেই প্রচলিত আছে।

---

১০৩. রোজেনথালে সংশোধিত পাঠে 'অন্যান্য অনেক পেট্রিআর্ক ও বিশপসহ' বাক্যাংশটি নেই। কারণ তখন এ পদগুলোর সৃষ্টি হয়নি।

১০৪. সংশোধিত পাঠে এস্থলে এই বাক্যটি সংযোজনের প্রয়োজন—এবং প্রীস্টগণ বিশপদিগকেও পিতা বলতেন। রোজেনথালে এটা বিদ্যমান।

১০৫. আল-মকীন—জীবনকাল (১২০৫-১২৭৩ খ্রি.)।

www.amarboi.org

এর পর খ্রিস্টানগণ তাঁদের ধর্মমতের ব্যাপারে পুনরায় বিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন। আল-মসীহ্-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিয়ে তাঁরা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যে প্রতিটি দলই একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করেছে এবং এর ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের প্রাধান্য দেখা গেছে। সর্বশেষে তাদের মধ্যে তিনটি দলের অস্তিত্ব সর্বজন স্বীকৃত বলে গৃহীত হয়েছে। এরা হচ্ছে 'মালাকিয়া', ইয়াকুবিয়া ও নেস্তুরিয়া। এরা ব্যতীত অন্যান্য দলগুলো সম্পর্কে কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না।

এর পর প্রতিটি দলই তাদের পেট্রিআর্ক নিযুক্ত করেছেন। রোমের পেট্রিআর্ক বর্তমানে মালাকিয়া সম্প্রদায়ের এবং তাঁকে 'পোপ' বলা হয়। রোম বর্তমানে ফিরিঙ্গীদের অধীনে এবং তাদের রাজ্যও ঐ অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত। মিশরের খ্রিস্টান প্রজাদের পেট্রিআর্ক ইয়াকুবিয়া মতের অনুসারী এবং তিনি তাদের মধ্যেই বসবাস করেন। আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানরা তাঁকেই অনুসরণ করে। মিশরের পেট্রিআর্কের তরফ থেকে তাদের মধ্যে বিশপ নিযুক্ত আছেন, তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে পেট্রিআর্কের স্থলাভিষিক্ত হন। 'পোপ' শব্দটি রোমের পেট্রিআর্কের উপাধি হিসাবেই বিদ্যমান। মিশরের ইয়াকুবিয়া সম্প্রদায় তাদের পেট্রিআর্ককে ঐ নামে সম্বোধন করেন না। এ পোপ বা 'আলবাবা' শব্দটির উচ্চারণগত স্বরূপ হল 'আল'-এর পরে দুটিই নিচের 'নুকতা' বিশিষ্ট 'বে'; তবে প্রথমটি একক ও দ্বিতীয়টি যুক্ত অর্থাৎ এর উচ্চারণ 'বাব্বা' বা 'পাপ্পা'। ফিরিঙ্গীদের নিকট পোপের আদর্শ হল, তিনি তাদেরকে কোনো এক রাজশক্তির অধীনে থাকতে আদেশ দিবেন, তাদের মতবিরোধ ও মতৈক্য সর্বাবস্থায় তারা তাঁর নির্দেশের মুখাপেক্ষী হবে। যাতে ধর্মের ঐক্য বিনষ্ট না হয় এবং এর মাধ্যমে গোত্রপ্রীতির শক্তিকে কেন্দ্র করে তারা সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। তারা এ রাজশক্তিকে 'ইম্বার যোর' (এম্পায়ারার) বলে সম্বোধন করে। শব্দটি 'য' বর্ণটির উচ্চারণ 'যাল' ও 'যয়' বর্ণ দুটির মাঝামাঝি। পোপ স্বয়ং এ এম্পায়ারারের শিরোপরে মুকুট স্থাপন করেন, যাতে তদ্বারা তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট বলে তাকে মনে করা যায়। এ জন্যই এম্পায়ারারকে 'মুকুট পরিহিত' বলা হয়; সম্ভবত এটাই এম্পায়ারার শব্দটির অর্থ।

কোহেন ও পোপ উপাধিদ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এটাই আমাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখান।[১০৬]

১০৬. কোরান ১৬, ৯৩; ৩৫, ৮; ৭৪, ৩১।

www.amarboi.org

চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজশক্তি ও সরকারি বিভিন্ন পদমর্যাদা এবং তাদের পদবী]

জেনে রাখুন, শাসক নিজে খুবই দুর্বল, সে একটি গুরুদায়িত্ব বহন করে; সুতরাং তার জন্য সমসাময়িক জনগোষ্ঠীর সাহায্যের প্রয়োজন। সে যখন নিজের সাধারণ জীবিকা নির্বাহ ও পরিশ্রমাদির ক্ষেত্রে অপরের উপর নির্ভরশীল, তখন, পাঠক, তার শাসনভার ও তার উপর প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের যে দায়িত্ব আল্লাহ্ অর্পণ করেছেন, তা কি সে একা বহন করতে পারবে? এ কারণে সে সকলের সহায়তার মুখাপেক্ষী, যাতে এর দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির বদান্যতায় তারা শত্রুর কবল থেকে বাঁচতে পারে, তেমনি নিজেদের মধ্যেও একে অপরের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে পারে। এজন্য শাসক তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধায়ক বিধিবিধান প্রয়োগ করবেন এবং জীবিকা অর্জনে তাদের পথ সুগম করে তাদের ধনসম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। তিনি তাদেরকে শুভকর্মে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং তাদের দৈনন্দিন কার্যে ব্যবহৃত বিষয়াদি, যেমন খাদ্যদ্রব্য, ওজন ও পরিমাণ ইত্যাদির ব্যাপারে যথাযোগ্য পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন, যাতে কোনো প্রকার ত্রুটি দেখা না দেয়। তিনি মুদ্রার ব্যাপারে দৃষ্টি দিবেন, যাতে মানুষের বিনিময় মাধ্যমে কোনো জাল-জুয়াচুরি প্রশ্রয় না পায়। তিনি তাদেরকে এমনভাবে শাসন করবেন, যাতে তারা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তাদের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত সমুদয় বিধিব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। এর মধ্য দিয়ে রাজশক্তির সমস্ত গৌরব তাঁর কুক্ষিগত হবে এবং এটা অর্জন করতে গিয়ে তাঁকে চরমভাবে অপরের সহানুভূতির উপর নির্ভর করতে হবে। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, একটি পর্বতকে তার স্বস্থানচ্যুত করা হয়তো সম্ভব হতে পারে; কিন্তু মানুষের সহানুভূতি অর্জন করা তদপেক্ষা কঠিন ব্যাপার।

অতঃপর এ সহানুভূতি-সহায়তার ব্যাপারটি যদি বংশধারার অন্তর্গত আত্মীয়-পরিজন এবং সহপাঠিতা ও প্রাচীনকাল থেকে কর্মে নিয়োগের সখ্যতার দ্বারা অর্জিত হয়, তা হলে তা সাম্রাজ্যের ব্যাপারে পূর্ণতা লাভ করে থাকে। কারণ এ সকল ক্ষেত্রে শাসকের চরিত্রের সাথে তাদের চরিত্রের একটি মধুর সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সহানুভূতি তার পরিপূর্ণ আকৃতি ধারণ করতে সমর্থ হয়। আল্লাহ্ কোরানে বলেন, (মুসা বললেন) আমার বংশ থেকে আমার জন্য একজন উজির নিযুক্ত কর, আমার ভাই হারুনকে এবং তার দ্বারা আমার শক্তিবৃদ্ধি কর ও তাকে আমার কর্তব্য কার্যে অংশীদার করে দাও।"[১০৭]

---

১০৭. কোরান ২০, ২৮-৩২।

www.amarboi.org

এভাবে শাসক যাদের সহায়তা কামনা করেন, তারা হয় তরবারি, কলম, মতামত, জ্ঞানগুণ কিংবা তাঁর নিকট থেকে লোকজনকে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁকে সাহায্য করে থাকে। এর ফলে তিনি প্রজা সাধারণের বিষয়গুলো পর্যালোচনা থেকে মুক্তি পান এবং কখনো রাজ্য পরিচালনার সমগ্র দায়িত্বই অন্য লোকের উপর ন্যস্ত করেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততাই শাসককে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে। সুতরাং এ সহায়তা কখনো এক ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব হয়, আবার কখনো একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হতে দেখা যায় এবং কখনো প্রতিটি দায়িত্বই বহু শাখায় সম্প্রসারিত হয়। যেমন কলম; এ সম্পর্কীয় বিভাগটিতে পত্র ও নির্দেশাদি, দান ও চুক্তিপত্রাদি, হিসাবরক্ষণ প্রভৃতি উপবিভাগ বিদ্যমান এবং এগুলো রাজকোষ, দানধ্যান ও সৈন্যদলের নথিপত্র সংরক্ষণকারীদের দায়িত্বে বর্তায়। এমনিভাবে তরবারী সম্পর্কীয় বিভাগ, তাতে যুদ্ধের সেনাপতি, অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষক, ডাকবিভাগীয় কর্মকর্তা এবং সীমান্ত রক্ষকের দায়িত্ব বর্তমান।

অতঃপর জেনে রাখুন, শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় যাবতীয় পদমর্যাদা ইসলামী সাম্রাজ্যে খেলাফতের অধীনে ন্যস্ত থাকে। কারণ খেলাফত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যাবতীয় ব্যাপারেই শৃঙ্খলাবিধানে তৎপর হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং উপরোক্ত সকল বিভাগেই ধর্মীয় বিধি-নিষেধ বিদ্যমান। তা পার্থিব অপার্থিব সকল ব্যাপারেই নির্দেশাদি প্রদান করে। কারণ মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ধর্মীয় অনুশাসনের আওতাধীন। কাজেই ধর্মশাস্ত্রবিদ রাজশক্তি ও শাসকের পদমর্যাদা অনুসারে এবং তার শর্তাদি সাপেক্ষেই এ সকল বিধানের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে শাসক খেলাফতের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করে রাজকীয় মর্যাদায় বিভূষিত হতে পারেন এবং এটাই শাসকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অথবা তাঁর রাজকীয় প্রভাব খর্ব করে অন্যের প্রভাবাধীন হতে পারেন এবং এটাই সম্ভবত তাদের মতে উজিরের কর্তব্য, যেমন এর বর্ণনা আসছে। কাজেই এ সকল ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রবিদকে বিধি-নিষেধ, সম্পদ-সম্পত্তি ও অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ অথবা শর্তাধীন বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে পদচ্যুতির ব্যাপারেও তার দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এভাবে রাজশক্তি ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় যাবতীয় সমস্যার ক্ষেত্রেই তাদের করণীয় সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রবিদ নির্দেশ দেন এবং যাবতীয় রাজকীয় ও শাসনতান্ত্রিক বিভাগ—রাজকোষ, মন্ত্রিত্ব ও প্রাদেশিক শাসন সম্পর্কীয় বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন।

ইসলামী সাম্রাজ্যে রাজশক্তি ও শাসনব্যবস্থা ধর্মীয় বিধানের আওতাধীন বলে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, ধর্মশাস্ত্রবিদকে এ সকল বিষয়ের সমুদয় সম্পর্কে দৃষ্টি দান করতে হয়। কিন্তু পাঠক, আমাদের বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য তা নয়, যেমন আপনি ইতিপূর্বে তৎসম্পর্কে অবগতি লাভ করেছেন। আমরা যাবতীয় রাজকীয় ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় পদাদির বর্ণনা মানুষের অস্তিত্ব ও তাদের সমাজবদ্ধ জীবনের স্বাভাবিক প্রবর্তনা অনুযায়ী তুলে ধরে। এতে বিশেষ কোনো ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে না। এ জন্যই আমরা ধর্মীয় বিধি-বিধানের বর্ণনায় কালক্ষেপণ করতে চাই না এবং এতে আমাদের প্রয়োজনও কম। এ সকল বিষয় অন্যত্র সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। যেমন

www.amarboi.org

বিশিষ্ট ধর্মশাস্ত্রবিদ কাজী আবুল হাসান মাওয়ারদী ও অন্যান্য অনেকের গ্রন্থে এর বর্ণনা বিদ্যমান। পাঠকদের মধ্যে যারা ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে বিশদ জানতে ইচ্ছুক, তাদেরকে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করতে হবে। আমরা খেলাফত ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে এ জন্যই আলোচনা করেছি, যাতে তার এবং রাজকীয় ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় বিধি-বিধানের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ বা তার বিশদীকরণ আমাদের গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এখানে মানুষের অস্তিত্ব ও তার সমাজবদ্ধ জীবনের স্বাভাবিক প্রবর্তনা অনুসারেই আমাদের আলোচনা উপস্থিত করব। আল্লাহ্‌ই শক্তিদাতা।

উজারত (মন্ত্রিত্ব)

এটা শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় যাবতীয় বিভাগ এবং রাজকীয় সকল পদমর্যাদার জননী। কারণ তার নামকরণের মধ্যেই সার্বিক সহায়তার ভাব বিদ্যমান। কেননা উজারত শব্দটি হয় 'মুয়াযারাত' থেকে অথবা 'বিসরুন' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমটির অর্থ সহায়তা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ বোঝা; উজির যেন তার নিয়োগকারীর সকল বোঝা ও ভার বহন করে থাকেন। এর মধ্যেও সার্বিক সহায়তার ভাব বিদ্যমান।

আমরা অত্র পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে বলেছি যে, শাসকের অবস্থা ও তাঁর ক্ষমতা চারটি বিষয়ের বাইরে সাধারণত যায় না। এর মধ্যে তাঁর সার্বিক সহায়তার জন্য ও তৎসম্পর্কীয় কার্যকারণের ক্ষেত্রে দৃষ্টি দানের নিমিত্ত যিনি সৈন্যদল, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধবিগ্রহ এবং সামগ্রিক দায়িত্ব ও অধিকারের পদে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যগুলোতে উজির নামে খ্যাত। বর্তমানকালে মাগরিবেও এ পদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। অন্যদিকে শাসক যদি স্থান ও কালগত দূরত্বে অবস্থানকারী কাউকে সম্বোধন করতে চান কিংবা তার উপর স্বীয় নির্দেশ কার্যকরী করতে উদ্যোগী হন, তা হলে যিনি শাসকের উপরোক্ত মনোভাব লিপিবদ্ধ করেন, তিনি 'কাতেব' (লেখক)। পুনরায় রাজকোষের অর্থের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা এবং যাতে এ ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি না দেখা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা; যিনি এ কাজে অর্থাৎ রাজকোষের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত, বর্তমানকালে পূর্বাঞ্চলে তাঁকেই উজির বলা হয়। সর্বোপরি শাসককে অর্থ প্রত্যার্থীদের সাক্ষাৎকারের চাপ থেকে মুক্ত রেখে তাঁর দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়া দরকার; এ ব্যাপারে তাঁকে যিনি সাহায্য করেন, তিনি দ্বাররক্ষী 'হাজেব'। এভাবে দেখতে গেলে শাসকের অবস্থা মোটামুটি এ চারটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় এবং রাজকীয় ও শাসন সংক্রান্ত এমন কোনো বিভাগ নেই বা পদমর্যাদা নেই যা এগুলোর অধীনে পড়ে না। অবশ্য এর মধ্যে সর্বোচ্চ হল সেই সার্বিক সহায়তা, যা শাসকের সকল কর্তৃত্বকেই বহন করে এবং তা সম্পাদনের জন্য সর্বক্ষণ শাসকের সংসর্গে থাকতে হয় ও তাঁর সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণ করতে হয়। অন্যদিকে এ সহায়তা যদি কোনো বিশেষ দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন সীমান্ত রক্ষা, বিশেষ রাজকোষের তত্ত্বাবধান, পানাহারের ব্যবস্থা করা, মুদ্রা ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দান, তা হলে তা স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ দায়িত্ব পালন অপেক্ষা মর্যাদায় হীন হবে। কারণ উপরোক্ত

www.amarboi.org

বিষয়ের সবগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এবং এর ক্ষমতাও সেই অনুপাতে সংকুচিত। সুতরাং এগুলো সর্বদা সাধারণ তত্ত্বাবধানের অধীন এবং তার উপরিভাগে পরিণত হবে।

ইসলাম পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোতে অবস্থা এভাবেই চলতে ছিল। অতঃপর ইসলামের আবির্ভাবে সাম্রাজ্য খেলাফতে পরিণত হল এবং উপরোক্ত বিভাগ উপরিভাগের অস্তিত্ব লোপ পেল। কারণ এগুলো সাম্রাজ্যেরই অপরিহার্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল। অবশ্য যা একান্ত স্বাভাবিক, সেই পরামর্শ বা মন্ত্রণা তখনো বিদ্যমান ছিল। কারণ এ বিষয়টি একান্ত প্রয়োজনীয় বিধায় তা লোপ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। হজরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর সহচরদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং সাধারণ ও বিশেষ ব্যাপারে তাঁদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করতেন। অবশ্য অনেক বিষয়ে হজরত আবু বকরের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এর ফলে আরবের যারা রোম, পারস্য ও আবিসিনিয়ার সাম্রাজ্য ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিল, তারা তাঁকে হজরত মুহম্মদের উজির বলে ভাবে। যদিও উজির শব্দটি মুসলমানদের মধ্যে পরিচিত হয়নি। কারণ ইসলামের সারল্য রাজশক্তির মর্যাদাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। এভাবে হজরত উমর হজরত আবু বকরের, হজরত উসমান ও আলী হজরত উমরের পরামর্শদাতা ছিলেন। রাজকোষ, আয়-ব্যয় ও হিসাব সংরক্ষণের ব্যাপারগুলো তাদের নিকট খুব গুরুত্ব লাভ করেনি। কারণ জাতি বেদুইন হওয়ায় ও পুঁথিগত শিক্ষার অভাবে লেখাপড়া ও হিসাব রক্ষার কাজে তেমন পটু ছিল না। এ জন্য তাঁরা এ ব্যাপারে আহলে কিতাব[১০৮] অথবা অনারবদের মধ্যে যাদেরকে ভালো মনে করতেন, দায়িত্ব দিতেন। অবশ্য তাদের সংখ্যাও নগণ্য ছিল। কারণ তাদের মধ্যেও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা এ বিষয়ে খুব অল্পই জ্ঞান রাখতেন। বরং বলতে গেলে, পুঁথিগত বিদ্যার অভাবেই তাঁদের এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল, যা দিয়ে তাঁরা পরিচিত হতেন। এমনিভাবে পত্রাদি লেখা ও নির্দেশাদি প্রেরণ করার ব্যাপারটিও তাঁরা তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না। একে ত পুঁথিগত বিদ্যার অভাব, তদুপরি যথাস্থানে নির্দেশ বহন করে নিয়ে গিয়ে যথাযথ পৌঁছানোর ব্যাপারে বিশ্বস্ততার অভাব তখনো মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এর ফলে শাসন ব্যবস্থায় কোনো প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা তাঁরা মনের মধ্যে পোষণ করতেন না। কারণ খেলাফত ছিল একান্তই ধর্মীয় ব্যাপার; রাজকীয় শাসনের সাথে এর কোনো সংশ্রব ছিল না। অন্যদিকে লেখা-পড়ার ব্যাপারটি তখনো শিল্প হয়ে ওঠেনি যে, তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্ঞানীকে খলিফার সহায়তায় নিযুক্ত করতে হবে। বরং তাদের মধ্যে সকলেই যথাযথভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে পারতেন। একমাত্র লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারটিরও অভাব ছিল। এ ক্ষেত্রে খলিফা প্রয়োজন হলে যোগ্য দেখে যে কোনো একজনকে নিয়োগ করতেন। আর অভাবী দর্শন প্রার্থীদেরকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারটি ত ধর্মীয় বিধানেই লিপিবদ্ধ ছিল; সুতরাং তাঁদের দ্বারে দ্বারবান নিযুক্তির প্রশ্নই ওঠে না।

অতঃপর খেলাফত যখন রাজশক্তিতে পরিণত হল, তখন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় রীতিনীতি আবার ফিরে এল। এর ফলে সর্বপ্রথম যে পরিবর্তন দেখা দিল, তা হল দ্বারদেশে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা। কারণ তাঁরা খারেজী

১০৮. অর্থাৎ গ্রন্থধারী, সাধারণভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বোঝায়।

www.amarboi.org

সম্প্রদায়[১০৯] ও অন্যান্যের অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে তখন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ইতিপূর্বে হজরত উমর, আলী, মাবিয়া, আমর ইবনেল আস এবং আরো অনেকে এ আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। তদুপরি অবারিত দ্বার হওয়ার ফলে সাধারণের ভিড়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদনে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছিল। সুতরাং তাঁরা দ্বারে রক্ষী নিযুক্ত করলেন এবং তার নাম রাখলেন 'হাজেব' বা প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী। কথিত আছে যে, খলিফা আবদুল মালেক তাঁর দ্বারে রক্ষী নিযুক্ত করে তাকে বলেছিলেন, তোমাকে আমার দ্বারদেশে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির জন্য নিযুক্ত করেছি; কিন্তু তিনটি বিষয়ের জন্য নয়। নামাজের প্রতি আহ্বানকারী; কারণ সে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানাচ্ছে। ডাক বহনকারী; কারণ সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এসেছে। খাদ্যদ্রব্য আনয়নকারী; কারণ তার আগমনে বিলম্ব ঘটলে তা নষ্ট হয়ে যাবে।

অতঃপর সাম্রাজ্যের পরিধি আরো বৃদ্ধি পেল এবং বিভিন্ন গোত্র, জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন দেখা দিল। এরূপ সাহায্যকারীর নাম দেয়া হল উজির। হিসাব সংরক্ষণের ব্যাপারটি আশ্রিত পোষ্য ও জিম্মীদের হাতেই রয়ে গেল। নথিপত্র সংরক্ষণ ও লেখার জন্য একজন বিশেষ লেখক নিযুক্ত হলেন, যিনি সম্রাটের গোপন তথ্যাদি সযত্নে রক্ষা করতেন। কারণ তা প্রকাশ হয়ে গেলে, জাতির মধ্যে শাসন ব্যবস্থায় গোলযোগ দেখা দিতে পারে। অবশ্য মর্যাদার দিক থেকে লেখক উজিরের সমান ছিলেন না। কারণ তাঁর প্রয়োজন ছিল শুধু লিখন ও লিপিবদ্ধকরণের জন্যই; ভাষার উপর তাঁর কোনো হাত ছিল না। কেননা শাসকদের মনোভাব প্রকাশের নিজস্ব ভাষাজ্ঞান তখনো বিকৃত হয়ে পড়েনি। এজন্য তৎকালে উজিরের পদমর্যাদা ছিল সর্বোচ্চ। বনি উমাইয়া সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। সুতরাং উজিরের দায়িত্ব তৎকালে সামগ্রিক বিষয়াদির সাথে জড়িত ছিল। তিনি যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা, দায়িত্ব অর্পণ, সহায়তা প্রদান ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে দৃষ্টিদান করতেন। এরই অনুসরণে সৈন্যদলের প্রতি লক্ষ রাখা, যোগ্যতা বিচার করে প্রাপ্য প্রদান এবং এ প্রকার আরো বহু দায়িত্ব উজিরকে পালন করতে হত।

এর পর আব্বাসী সাম্রাজ্যের কাল দেখা দিল। এতে রাজশক্তি ও তার পদমর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেল, উন্নত হল। সেই অনুপাতে উজিরের মর্যাদাও সুপ্রতিষ্ঠিত। সকলের চেহারা তাঁকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সকলের মাথা তাঁর সম্মুখে অবনত হয়। হিসাব সংরক্ষণের ব্যাপারেও তাঁকে দৃষ্টি দিতে হয়, কারণ সৈন্যদের প্রাপ্য বণ্টনের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত। এ কারণে রাজকোষের সঞ্চয় ও ব্যয় বৈচিত্র্যের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন এবং এ দায়িত্ব তাঁর কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। এর পর লেখনী ও পত্রাদি রচনার ব্যাপারেও তাঁর দৃষ্টি দানের প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ সম্রাটের গোপনীয়তা রক্ষার সমস্যা যেমন তখন দেখা দিয়েছে, তেমনি ভাষায় অলংকরণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। কেননা সর্বসাধারণের ভাষাজ্ঞান তখন বিকৃত হয়ে গেছে। অনুরূপ সতর্কতার জন্যই রাজকীয় নথিপত্রের বিকৃতি ও পরিবর্তনের গতিরোধ করার জন্য তাতে মোহরাঙ্কিত করার অঙ্গুরীয় প্রস্তুত হল এবং তাও উজিরের দায়িত্বে দেয়া হল। এক কথায় তৎকালে

---

১০৯. হজরত আলীর দলত্যাগী জনগোষ্ঠী।

www.amarboi.org

উজির লেখনী ও তরবারী তথা সার্বিক সহায়তার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হলেন। এ জন্যই সম্রাট হারুনুর রশীদের সময় উজির জাফর ইবনে ইয়াহিয়াকে তাঁর সাম্রাজ্যের ব্যাপারে সার্বিক দৃষ্টিদান ও পরিচালনার জন্য 'সুলতান' বলে ডাকা হত। বস্তুত তাঁর দায়িত্বে একমাত্র দ্বারবানির কার্য ছাড়া অন্য সকল বিষয়ই স্থাপিত হয়েছিল। শুধু দ্বার রক্ষীর কাজের হেয়তার জন্যই তা তাঁর দায়িত্ব থেকে বাদ পড়েছিল।

অতঃপর আব্বাসী সাম্রাজ্যে অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের যুগ দেখা দিল। এর ফলে খলিফা কখনো উজিরের দ্বারা আবার কখনো শাসকের দ্বারা পরিচালিত হতেন। উজিরের অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের কালে সর্ববিষয়ে খলিফার অনুমতির প্রয়োজন হত, যাতে ধর্মীয় বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধিত্ব প্রমাণ করা উজিরের পক্ষে যথাবিহিত হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এর ফলে তৎকালে উজারতের পদটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ত। এর একটি হল স্বনির্ভর উজারত, যাতে কোনো শাসকের স্বাবলম্বী হয়ে কাজ করার স্বরূপ ফুটে ওঠে এবং দ্বিতীয়টি হল মনোনয়ন নির্ভর উজারত, যা উজিরের প্রভাব[১১০] বিস্তারের কথাই বোঝায়। এভাবে অন্যায্য প্রভাবের ধারা চলতে থাকায় এক সময়ে বিষয়টি অনারব রাজন্যবর্গের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং খেলাফতের সকল চিহ্ন লোপ পায়। অবশ্য এ সকল প্রাধান্য বিস্তারকারী রাজন্য কখনো খেলাফতের কোনো উপাধি ব্যবহার করত না এবং এ ব্যাপারে উজিরদের সাথেও তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কারণ উজিররা প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের কর্মচারীই ছিল। বরং তারা নিজেদেরকে 'আমীর' অথবা 'সুলতান' নামে পরিচিত করাতো। সাম্রাজ্যের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারী সাধারণত 'আমীরুল উমায়া'[১১১] অথবা সুলতান উপাধি গ্রহণ করত। এ ক্ষেত্রে খলিফা তাদেরকে যে উপাধি দিতেন, তাই তারা গ্রহণ করত, যেমন পাঠক তাদের উপাধির আলোচনায় দেখতে পাবেন। তারা খলিফার ব্যক্তিগত কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিকেই উজির বলে ডাকত। সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত এ অবস্থাই চলছিল। ইতিমধ্যে ভাষার বিকৃতি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তা কিছু সংখ্যক লোকের শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। ফলে তার ব্যবহার মর্যাদাহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উজিররা এ ব্যাপারে নিয়োজিত হতে গিয়ে হীনমন্যতাবোধে পীড়িত হচ্ছে। কারণ তারা অনারব এবং তাদের ভাষায় এ অলংকরণের কোনো প্রচেষ্টাও নেই। কাজেই নানা শ্রেণীর লোক এতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল এবং উক্ত বিষয় তাদের বৈশিষ্ট্য রূপে দেখা দিল। এর ফলে উক্ত বিষয়ে নিয়োজিত ব্যক্তি উজিরের কর্মচারীরূপে গণ্য হতে লাগল। আমীর উপাধিটি যুদ্ধ পরিচালনাকারী সেনাপতি ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদির উপর কর্তৃত্বের জন্য ব্যবহৃত হল। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও সকল পদমর্যাদার উপর তার প্রভাব বিস্তৃত হল এবং সর্বব্যাপারে তার নির্দেশ প্রতিপালিত হতে লাগল। এ ক্ষেত্রে সে কখনো শাসকের প্রতিনিধি আবার কখনো অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারীরূপে দেখা দিত। এভাবে এ সকল বিষয় স্থায়ী হয়ে উঠল।

---

১১০. এ বাক্যটির শেষে রোজেনথালের অনুবাদে দুই ইমামের অনুরূপ দুই উজির নিয়োগের সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১১১. আমীরদের আমীর—প্রধান সর্দার।

www.amarboi.org

এর পর শেষের দিকে মিশরে তুর্কি সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটল। তখন তারা দেখতে পেলেন যে, উজিরের পদটি এ সকল অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারীর হস্তক্ষেপে এবং অবরুদ্ধ খলিফার একান্ত সহচরে পরিণত হওয়ার ফলে নিতান্তই সাধারণ হয়ে পড়েছে। বস্তুত উজিরের স্থান আমীরের বহু পিছনে এবং নেতৃত্বের ব্যাপারেও এটা ক্রটিপূর্ণ। সুতরাং উক্ত সাম্রাজ্যের উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারীরা উজির উপাধি গ্রহণ করাটা হেয় মনে করলেন। কাজেই বর্তমানকালে তাদের মধ্যে সৈন্যদল সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে দৃষ্টিদানকারীকে বলা হয় 'নায়েব' (প্রতিভু)। শুধু হাজেরের উপাধিটি তার স্বস্থানে বিদ্যমান।[১১২] রাজকোষের ব্যাপারে যিনি তত্ত্বাবধান করেন, তাঁকে বলা হয় উজির।

অবশ্য আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যে প্রথম থেকে উজির উপাধি যথা নিয়ম ব্যবহার করে আসছে। অতঃপর তাঁরা তাকে কতিপয় ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন করে উজির নিযুক্ত করেছিলেন। যেমন সম্পদের হিসাবাদি সংরক্ষণের উজির, পত্রাদি রচনার উজির, অত্যাচারিতদের প্রয়োজনে দৃষ্টিদানের উজির ও সীমান্ত এলাকার অবস্থাদি পর্যবেক্ষণের উজির। তাঁরা সকলে একটি সুসজ্জিত গৃহের গালিচায় একত্রে বসতেন এবং শাসক কর্তৃক তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আলোচনা করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন শাসক ও উজিরদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। সম্রাটের সাথে সর্বদা থাকার ফলে তাঁর মর্যাদা কিছুটা ভিন্ন হত এবং তিনি তাঁদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চাসনে উপবেশন করতেন। তাঁকে বলা হত 'হাজেব'। এভাবে উক্ত সাম্রাজ্যের পদমর্যাদার অবস্থা শেষ অবধি বিদ্যমান ছিল। হাজেবের পদটিকে সকলের উপরে স্থান দেয়া হত। অতঃপর ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ এসে আবির্ভূত হল এবং তাদের অধিকাংশই হাজেব উপাধি গ্রহণ করেছিল, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব।

এর পর আফ্রিকিয়া ও কায়রোয়ানে শিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। এর প্রতিষ্ঠাতারা প্রান্তর জীবনের সাথে অধিকতর পরিচিত হওয়ায় প্রথম দিকে এ সকল দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো গুরুত্ব দেননি এবং এ সকল উপাধিও ব্যবহার করেননি। এর পর যখন তাদের মধ্যে নগর জীবনের সমৃদ্ধি দেখা দিল, তখন তারা পূর্ববর্তী দুটি সাম্রাজ্যের পদমর্যাদা ও উপাধি ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন, যেমন তাদের সাম্রাজ্যে তথ্যাদি আলোচনায় পাঠক দেখতে পাবেন।

এর পর আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারাও তাদের প্রান্তরীয় চরিত্রের জন্য প্রথম দিকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দেননি। অতঃপর তারাও এ সকল উপাধি ও নাম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা উজিরের উপাধিকে যথাস্থানেই প্রয়োগ করেন। পরে অবশ্য তারা উমাইয়া সাম্রাজ্যের অনুকরণ করে শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন করত 'হাজেব'কেই উজির বলতে আরম্ভ করেন। তখন তার দায়িত্ব হয় দরবারে সুলতানের প্রতিরক্ষা, তাঁর সমীপে আগত প্রতিনিধি ও অন্যান্য লোকের তত্ত্বাবধান, তাদেরকে স্বাগত জানান ও তাদের প্রতি ভাষণদান এবং সুলতানের সম্মুখে পালনীয় অন্যান্য আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখা। আল-মোহেদরা হাজেবের এ পদটিকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন। এভাবে তাদের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে এসেছে।

---

১১২. রোজেনথালে এই বাক্যটি নেই।

www.amarboi.org

অবশ্য পূর্বাঞ্চলের তুর্কি সাম্রাজ্যে এ ধরনের পদমর্যাদার অধিকারী, যিনি সুলতানের দরবারে আগত লোকের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন, তাদের জন্য স্বাগত ভাষণদান এবং প্রতিনিধি দলকে সুলতানের সম্মুখে পেশ করার দায়িত্ব পালন করেন, তাঁকে 'দাবিদার' বলা হয়। ইনি সুলতানের গোপন তথ্যাদির লেখকের দায়িত্বও পালন করেন। তদুপরি সুলতানের প্রয়োজনে নিকটে ও দূরে সংবাদ বহনকারীদের তত্ত্বাবধানও তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত থাকে। বর্তমানকালেও তাদের মধ্যে এ অবস্থা প্রচলিত। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, তার সকল বিষয়ে সহায়ক হন।

হেজাবত (দ্বাররক্ষা)

আমরা পূর্বে বলেছি যে, এ পদবীটি উমাইয়া ও আব্বাসী সাম্রাজ্যে একটি বিশেষ পদমর্যাদার জন্য নির্ধারিত ছিল। যিনি সাধারণ মানুষ ও সম্রাটের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সময়মত দ্বার বন্ধ ও উন্মুক্ত করবার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন, তাঁকেই এ পদবীতে ভূষিত করা হত। এ বিভাগটি তৎকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসাবে গণ্য করা হত না এবং অন্য বিভাগের অধীনে ন্যস্ত থাকত। কারণ উজির প্রয়োজন মনে করলে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। আব্বাসী সাম্রাজ্যের শেষ অবধি এর অবস্থা এরূপ ছিল এবং এখনো এ অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। মিশরে এটা 'নায়েব' নামীয় উচ্চপদমর্যাদার অধীনে ন্যস্ত একটি উপবিভাগ মাত্র।

অবশ্য আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যে 'হাজেব' বলতে তাঁকেই বোঝাত, যিনি সম্রাটের দর্শনার্থী বিশেষ সাধারণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ন্ত্রণ এবং সম্রাট ও উজিরদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সুতরাং এ পদটি তাদের সাম্রাজ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিল, যেমন তাদের ইতিহাস বর্ণনাকালে, পাঠক, এটা লক্ষ করতে পারবেন। ইবনে হাদিদ[১১৩] ও অন্যরা এ হাজেবের পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর সাম্রাজ্যের উপর অন্যায্য প্রভাব দেখা দিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মর্যাদার জন্যই এ হাজেব উপাধি গ্রহণ করতেন। আল মনসুর ইবনে আবি আমের ও পুত্রগণ এ উপাধি ব্যবহার করেছেন। এর পরে রাজশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়ে তার চালচলন প্রবর্তন করলেও ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ এ উপাধি ত্যাগ করেননি এবং তাঁরা এর ব্যবহারকে সম্মানের বিষয় বলে মনে করতেন। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজন্যও রাজকীয় উপাধি ও নাম ব্যবহার করার পর 'হাজেব' এবং 'জুল উজারতাইন' (দুই উজারতের অধিকারী) পদবী দুটি গ্রহণ করতেন। এর প্রথমটির দ্বারা সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী বিশেষ ও সাধারণকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বোঝাত এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা অসি ও মসী—এ উভয় বিভাগের উপর সার্বিক অধিকার বোঝাত।

এর পর মাগরিব ও আফ্রিকিয়ার সাম্রাজ্যগুলোতে প্রান্তরীয় জীবনবোধের প্রাধান্যের জন্য এ পদবীটির কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। কখনো কখনো মিশরের উবাইদী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির সময় এ পদবীটি ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু তার পরিমাণ খুবই নগণ্য।

---

১১৩. রোজেনথালে 'ইবনে হুদাইর'। আবুল আসবাগ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৩২০ (৯৩২ খ্রি:) হি.।

www.amarboi.org

আল-মোহেদ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরও তাতে এ সকল উপাধি ও পদবী ব্যবহারযোগ্য সমৃদ্ধি না আনা পর্যন্ত এগুলো ব্যবহৃত হয়নি এবং এ কারণে এরূপ ব্যবহার দেখা যায় না। তারা উজিরের পদটিকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন এবং প্রথম দিকে উজির বলতে বিশেষভাবে সম্রাটের অন্তরঙ্গ লেখক সহচরকেই বোঝাতেন। যেমন ইবনে আতিয়া ও আব্দুস্‌সালাম আলকুমী।[১১৪] এতদ্‌সঙ্গে আয়ব্যয়ের হিসাব ও আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে দৃষ্টিদান তার দায়িত্বের মধ্যে গণ্য ছিল। অতঃপর উজির বলতে সাম্রাজ্যাধিপতি বংশের অর্থাৎ আল-মোহেদদের মধ্যে যিনি উক্ত দায়িত্বে নিযুক্ত হতেন, তাকে বোঝাত; যেমন ইবনে জামি[১১৫] ও অন্যরা। তৎকালে হাজেব পদবীটি তাদের মধ্যে পরিচিত ছিল না।

আফ্রিকিয়ার বনি আবু হেফ্‌সদের সাম্রাজ্যে প্রথম থেকেই এ সকল পদবীর ব্যবহার ছিল এবং তারা মন্ত্রণা ও পরামর্শের জন্য উজিরের পদটিকে প্রাধান্য দিতেন। তারা একে 'শায়খুল মুয়াহ্‌হেদীন' (একেশ্বরবাদীদের নেতা) বলে বিশিষ্ট করেছিলেন। ইনি নিয়োগ ও পদচ্যুতি, সৈন্য পরিচালনা এবং যুদ্ধাদির ব্যাপারে লক্ষ রাখতেন। নথিপত্র ও আয়ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের বিষয়টি একটি পৃথক পদ হিসাবে বিরাজমান ছিল। এর অধিকারীকে 'সাহেবে আশগাল' (বিষয় কর্তা) বলে ডাকা হত। তিনি আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে সার্বিক দৃষ্টি রাখতেন, সম্পদের হিসাব নেয়া, তার আদায়ের ব্যবস্থা করা এবং অনাদায়ে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারটিও তার দায়িত্বে ছিল। এ পদের একটি শর্ত এই ছিল যে, তাকে আল-মোহেদদের একজন হতে হবে। লেখনীর ব্যাপারটি তাদের মধ্যে গোপন তথ্যাদি সম্পর্কে বিশ্বস্ত এমন একজনের উপর ন্যস্ত হত, যিনি এ ব্যাপারে ভালো জ্ঞান রাখেন। কারণ তাদের মধ্যে এর প্রচলন এবং তাদের ভাষায় পত্রাদি রচনারও কোনো ধারা ছিল না। এজন্যই এ ব্যাপারে বংশের শর্তটি আরোপ করা হয়নি। তদুপরি সুলতান তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও পোষ্যবর্গের আধিক্যের জন্য রাজপ্রাসাদে এমন একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তির প্রয়োজন অনুভব করতেন, যিনি পোষ্যদের মধ্যে যথাযোগ্য শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন এবং তাদের আহার্য, প্রাপ্য, পরিচ্ছদ, রন্ধনশালার ব্যয় ও আস্তাবলের খরচ ইত্যাদির যথাবিহিত ব্যবস্থা করবেন। তিনি ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধান এবং রাজকোষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দের নির্দেশ প্রদান করবেন। তাঁরা এ পদটিকে 'হাজেব' বলতেন। অনেক সময় তাঁর দায়িত্বে নথিপত্রে রাজকীয় চিহ্নাদি ব্যবহারের কাজটিও অর্পণ করা হত। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর দক্ষতাই এ যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল; নতুবা চিহ্নগুলো প্রদানের কাজটি অন্য কারো উপর ন্যস্ত করা হত।

অবস্থা এভাবেই চলছিল। সুলতান নিজেই নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন। এ অবস্থায় হাজেব সম্রাট ও অন্যান্য সকল পদমর্যাদাধারীদের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে কাজ করতেন। সাম্রাজ্যের শেষ দিকে তার দায়িত্বে তরবারী ও যুদ্ধের ব্যাপারটিও যোগ করা

---

১১৪. ইবনে আতিয়া; মৃত্যু ৫৫৩ (১১৫৮ খ্রি.) হি.। আলকুমী; খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জীবিত ছিলেন।

১১৫. খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সক্রিয় ছিলেন।

www.amarboi.org

হয় এবং এক সময়ে তার পরামর্শ ও মতামতও সুলতানকে গ্রহণ করতে দেখা যায়। এর ফলে এ পদটি অন্য সকল পদমর্যাদা থেকে উন্নত ও সার্বিক হয়ে দাঁড়ায়। এর পর উক্ত সাম্রাজ্যের দ্বাদশ সুলতানের[১১৬] পরে সাময়িকভাবে অন্যায্য প্রভাবের যুগ আরম্ভ হয়। কিন্তু সুলতানের পৌত্র সুলতান আবুল আব্বাস পুনরায় সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। অন্যায্য প্রভাবের সোপান হাজেব পদটি উঠিয়ে দেয়ার ফলে সকল প্রকার অন্যায্য প্রভাব ও অবরুদ্ধ অবস্থার অবসান ঘটে। সুলতান নিজেই সমস্ত কাজকর্মের দেখাশোনা আরম্ভ করেন এবং বর্তমানকালেও অবস্থা অনুরূপভাবেই চলছে।

মাগরিবের জানাতী সাম্রাজ্য, তার মধ্যে সর্ববৃহৎটি হল বনি মারিনের। তাদের মধ্যে হাজেব পদের কোনো চিহ্ন নেই। সেখানে যুদ্ধ ও সৈন্যদলের নেতৃত্বের ব্যাপারটি উজিরের দায়িত্বে ন্যাস্ত। হিসাব-নিকাশ ও পত্রাদি রচনার লেখনী সংক্রান্ত বিষয়টি তৎসম্পর্কে যোগ্য লোকের হাতে অর্পিত এবং এ পদে তাদের সাম্রাজ্যের কর্মে নিয়োজিত কিছু সংখ্যক পরিবারের মধ্যে তা প্রায় সীমাবদ্ধ। অবশ্য অনেক সময় বাইরের লোককেও এ ব্যাপারে নিয়োগ করা হয়। সুলতানের দ্বার ও তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ব্যাপারটিও তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। এ পদে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বলা হয় 'মিযবার', এর অর্থ প্রধান অর্থাৎ ইনি সম্রাটের প্রাসাদে নিযুক্ত 'জান্দার' রক্ষীদের উপর কর্তৃত্বকারী। এ রক্ষীদল সম্রাটের নির্দেশ কার্যকরী করা, তাঁর দ্বারা প্রদত্ত শাস্তি প্রয়োগ করা, তাঁর শৌর্যবীর্য প্রকাশ করা এবং তাঁর কারাগারে আবদ্ধ বন্দীদের প্রতি দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ রক্ষীদলেরও একজন নেতা আছেন, রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তা তার হাতে ন্যস্ত। রাজদরবারে আগত সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও তাঁর এবং তিনিই তাদের যথাযোগ্য মর্যাদায় বিন্যস্ত করেন। তা যেন উজারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

কিন্তু বনি আবদেল ওয়াদ সাম্রাজ্যে এ সকল পদমর্যাদার কোনো চিহ্ন নেই এবং তাদের প্রান্তরীয় জীবনবোধ ও সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রাকৃতির জন্য পদমর্যাদার বিশিষ্টতা নেই বললেই চলে। অনেক সময় তারা সুলতানের প্রাসাদের ব্যাপারে তত্ত্বাবধানকারীকে 'হাজেব' বলে থাকে; যেমন বনি আবু হেফ্সের সাম্রাজ্যে ছিল। কখনো এর সাথে হিসাব-নিকাশ ও নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্বও যোগ করা হয়, যেমন পূর্বোক্তটির মধ্যে দেখা গেছে। এরূপ হওয়ার কারণ এ যে, তারা এক সময়ে পূর্বোক্ত সাম্রাজ্যের অধীনে তাদের মতবাদ নিয়েই আন্দোলনে নেমেছিল এবং এখন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভের পরও তাদেরকেই অনুসরণ করছে।

বর্তমানকালে আন্দালুসবাসীদের মধ্যে সুলতানের বিশেষ সহকারী, হিসাব-নিকাশের তত্ত্বাবধায়ক এবং আর্থিক যাবতীয় লেনদেনের বিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বলা হয় 'উকিল'। উজিরের পদটি উজিরের তুল্যই; অবশ্য অনেক সময় তার সাথে পত্রাদি রচনার ব্যাপারও যোগ করা হয়। তাদের মধ্যে সুলতান নিজেই নথিপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করেন। এজন্য সেইখানে অন্যান্য স্থানের ন্যায় রাজকীয় নথিপত্রে চিহ্নাদি প্রদানকারীর কোনো পদ নেই।

---

১১৬. আবু বকর; ১৩১৮-১৩৪৬ খ্রি.।

www.amarboi.org

মিশরের তুর্কি সাম্রাজ্যে হাজেব বলতে তুর্কি গোত্রভুক্ত প্রতাপশালী শাসককে বোঝায়, যিনি শহরাঞ্চলের নাগরিকদের মধ্যে বিধি-নিষেধ কার্যকরী করে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাদের নিকট এ পদটি নায়েবের পদের নিম্নে অবস্থিত। কারণ নায়েব সাম্রাজ্যের সাধারণ সকল ব্যাপারেই নির্দেশাদি প্রদানের ক্ষমতাধারী। অনেক সময় নায়েব বিভিন্ন দায়িত্বে লোক নিয়োগ ও পদচ্যুত করার ক্ষমতাও রাখেন। তিনি সামান্য পরিমাণ বেতনাদি মওকুফ ও মঞ্জুর করারও দায়িত্ব পালন করেন। সুলতানী নির্দেশের মতোই তাঁর অন্যান্য নির্দেশ প্রতিপালিত হয়ে থাকে। বস্তুত তিনি সম্রাটের সার্বিক বিষয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য। কিন্তু হাজেবরা শুধু সাধারণ মানুষের উপরই নির্দেশ প্রদান করতে পারেন, অবশ্য সৈন্যদের সম্পর্কে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে, সে ক্ষেত্রেও তারা নির্দেশ দানের অধিকারী। যদি কোনো নাগরিক তাদের নির্দেশ অমান্য করে, তেমন পরিস্থিতিতে তারা বলপ্রয়োগেরও অধিকারী। পদমর্যাদার দিক থেকে তারা নায়েবের নিচে অবস্থান করে।

তুর্কি সাম্রাজ্যে উজির রাজকোষের আয়ব্যয় সম্পর্কে তত্ত্বাবধান করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার কর; যেমন রাজস্ব, শুল্ক ও মাথট আদায় এবং তা সুলতানের নিজস্ব ও সাধারণ খাতে ব্যয় করার দায়িত্ব বহন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি উক্ত বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল কর্মচারীর নিয়োগ ও পদচ্যুতির ক্ষমতা রাখেন এবং তাদের পদমর্যাদা ও প্রকারভেদে নির্দেশাদি প্রদান করেন। তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রচলিত প্রথা হল, উক্ত উজির মিশরীয় কিবতীদের মধ্য থেকে হবেন। কারণ তারা বহু প্রাচীনকাল থেকে মিশরের রাজকোষ ও হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে দক্ষতার অধিকারী। সুলতান অনেক সময় প্রয়োজন মনে করলে প্রতাপশালী কোনো তুর্কিকে অথবা তাঁর সন্তান-সন্ততিকে এ পদে নিয়োগ করে থাকেন। আল্লাহ্ তাঁর বিচক্ষণতার সাথে সমুদয় বিষয়ের সংগঠন ও পরিবর্তন করে থাকেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের তিনিই প্রতিপালক।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ও রাজকোষ দপ্তর

জেনে রাখুন এ দায়িত্বটি রাজকীয় দায়িত্বাবলির মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটা রাজকোষ সম্পর্কীয় যাবতীয় তৎপরতার পরিচালনা করা, আয়ব্যয়ে সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা করা এবং সৈন্যদলের নাম লিপিবদ্ধ করত যথাবিহিত বেতনাদি নির্ধারণ করা ও যথাসময়ে তা প্রদান করা। এ ব্যাপারে যে নিয়মাবলি পালন করতে হয়, তা এ সকল তৎপরতার পরিচালকগণ এবং সাম্রাজ্যের পারিবারিক অধ্যক্ষগণ ধারাবাহিকভাবে রচনা করেছেন। এর সমুদয় নিয়ম আয়-ব্যায়ের হিসাব ও গণিতের একটা বৃহৎ অংশসহ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত তৎপরতার সাথে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্যতীত এগুলো সম্পর্কে অন্যদের কিছু করার নেই। এ নিয়মাবলি সংবলিত গ্রন্থটিকে 'দেওয়ান' বলা হয় এবং উক্ত তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা যে গৃহে একত্রে বসে, তাকেও এ নামে ডাকা হয়। বলা হয় যে, এ নামকরণের উৎস হল পারস্যরাজ খসরু একদিন তাঁর দরবার কক্ষে হিসাব-নিকাশকারীদেরকে দেখলেন, তারা গভীর মনোযোগের সাথে

www.amarboi.org

এমনভাবে হিসাব করছে যেন তারা আপন মনে কথা বলছে। তিনি এটা দেখে বলে উঠলেন, 'দেওয়ানা' অর্থাৎ ফারসি ভাষায় এর অর্থ পাগল। অতঃপর তাদের ঐ বসবার স্থানটিকে ঐ নামে ডাকা হতে লাগল। শব্দটির শেষ আকারটি অত্যধিক ব্যবহারের দরুন লোপ পেয়েছে এবং সহজ উচ্চারণে এটা দেওয়ানে পরিণত হয়েছে। এর পর এ শব্দটি হিসাব-নিকাশ ও রাজকোষ সম্পর্কীয় তৎপরতার নিয়মাবলি সংবলিত গ্রন্থের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকে বলেন, ফারসি ভাষায় এ শব্দটির অর্থ শয়তান এবং এর দ্বারা এ জন্যই নামকরণ করা হয়েছে যে, এ তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অতিদ্রুত এ সকল বিষয় বুঝতে পারে এবং তার প্রকাশ্য ও গোপন তত্ত্বাদি জানতে পারে। এভাবে এর বিচ্ছিন্ন ও বিরল দৃষ্টান্তগুলোও তারা সত্বর একত্র করতে সক্ষম। অতঃপর এ শব্দটিই তাদের বসবার স্থানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ জন্য এ শব্দটি একাধারে পত্রাদি লিপিবদ্ধ করার বহি এবং সুলতানের প্রাসাদে বসবার স্থানকে বোঝাচ্ছে, যেমন পরে আমরা বর্ণনা করব।

কখনও রাজকোষ সম্পর্কীয় এ তৎপরতার জন্য সার্বিকভাবে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হত এবং কখনো তার প্রতিটি অংশের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকত। যেমন অনেক সাম্রাজ্যে পূর্বসূরিদের ধারা ও প্রয়োজনের তাগিদে সৈন্যদল, তাদের জায়গীর ও বেতনাদির হিসাব নিকাশের জন্য একজন পৃথক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকত। জেনে রাখুন যে, এ বিভাগটি যে কোনো সাম্রাজ্যে তখনি দেখা দিয়েছে, যখন তার প্রাধান্য বিস্তার ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত, তার বিভিন্ন স্বার্থ বিবেচিত এবং গঠনমূলক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ইসলামী সাম্রাজ্যে হজরত উমর (রাঃ) সর্বপ্রথম এ দেওয়ানের প্রতিষ্ঠা করেন। এর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, হজরত আবু হোরায়রা বাহরাইন থেকে ধনসম্পদ নিয়ে এলে তার পরিমাণ এত অধিক হয়ে দাঁড়ায় যে, তার বণ্টনের ব্যবস্থা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে সাহাবীরা সম্পদের গণনা এবং তৎসম্পর্কিত প্রাপ্য ও স্বত্বের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন। এ সময় খালেদ ইবনে ওলিদ দেওয়ানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, সিরিয়ায় আমি রাজন্যবর্গকে দেখেছি, তারা 'দেওয়ান' সংরক্ষণ করেন। এর ফলে হজরত উমর তা গ্রহণ করেন। আরো বলা হয় যে, বরং এ সম্পর্কে হরমুজান'[১১৭] তাঁকে ইঙ্গিত দেয়। কারণ সে দেখতে পায় যে, কোনো প্রকার দেওয়ান সরংক্ষণ ব্যতীতই বিভিন্ন দিকে অভিযান প্রেরণ করা হচ্ছে। সুতরাং তাঁকে বলা হয়, সৈন্যদলের মধ্য থেকে কেউ যদি সরে পড়ে, তা হলে তা জানার উপায় কি? কারণ তার পশ্চাতে যে আছে, সে তার স্থান পূর্ণ করে ফেলবে। শুধু একটি বইই এ হিসাব সংরক্ষণ করতে পারে। এভাবে দেওয়ানের উৎপত্তি ঘটে। হজরত উমর (রাঃ) দেওয়ান নামের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তার ব্যাখ্যা তাঁকে দেওয়াও হয়েছিল। যখন তিনি তা স্থাপন করতে মনস্থ করলেন, তখন আকিল ইবনে আবু তালেব[১১৮], মাহরামা ইবনে নওফেল[১১৯]

১১৭. আহওয়াজের শাসক, ইরাক বিজয়ের সময় ধৃত হন।
১১৮. হজরত আলীর বড় ভাই; ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।
১১৯. রোজেনথালে 'মার্কারামা'; মৃত্যুকাল ৫৪ (৬৭৪ খ্রি.) হি.।

www.amarboi.org

জুবায়ের ইবনে মুতয়েম[১২০] প্রমুখ কোরায়েশ বংশীয় লেখকদেরকে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা ইসলামী সৈন্যদলের দেওয়ান লিপিবদ্ধ করলেন। এক্ষেত্রে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর আত্মীয়তার সূত্র ধরে পর্যায়ক্রমে ঘনিষ্ঠ থেকে অঘনিষ্ঠদের নাম তালিকাভুক্ত করা হল। এভাবেই সৈন্যদলের দেওয়ানের আরম্ভ হয়েছিল। সাইদ ইবনেল মুসাইয়ের[১২১] থেকে ইমাম আয্‌যুহরী[১২২] বর্ণনা করেছেন যে, এটা বিশ হিজরির মোহররম মাসে আরম্ভ হয়।

রাজস্ব ও রাজকোষের দেওয়ান ইসলামের আবির্ভাবের পরেও তার পূর্বের ন্যায়ই ছিল। ইরাকের দেওয়ান ফারসি ভাষায় এবং সিরিয়ার দেওয়ান রোমান ভাষায় লেখা হত। এ সকল দেওয়ানের লেখকরা এতদুভয় অঞ্চলের প্রজাদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হত। এর পর আবদুল মালেক ইবনে মারোয়ানের সময় রাজশক্তির আবির্ভাব ঘটল। জাতি তখন প্রান্তরীয় সারল্য ত্যাগ করে নাগরিক জীবনের চাকচিক্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এবং নিরক্ষরতার স্থূলতা থেকে লিপি চাতুর্যের সূক্ষ্মতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। আরব ও তাদের আশ্রিত পোষ্যরা এ বিষয়ে দক্ষতা লাভ করেছে। আবদুল মালেক তাঁর সময়ের জর্ডনের শাসক সুলায়মান ইবনে সাইদকে সেখানকার দেওয়ান আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ মত আরম্ভ করার দিন থেকে এক বছরের মধ্যে এটা শেষ করেন। আবদুল মালেকের লেখক 'সারজুন'[১২৩] এর সংবাদ জানতে পেরে রোমান ভাষার লেখকদেরকে বলেছিলেন, তোমরা এ শিল্প ছাড়া অন্য শিল্পকর্মে তোমাদের জীবিকা অন্বেষণ কর। কারণ আল্লাহ্ এটাও তোমাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন।

ইরাকের দেওয়ান সম্পর্কে আল হাজ্জাজ তাঁর লেখক সালেহ ইবনে আবদুর রহমানকে অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি পূর্ববর্তী লেখক 'যাদান ফাররুখের' শিক্ষা অনুসারে আরবি ও ফারসি উভয় ভাষাতে লিখতেন। অতঃপর যখন 'যাদান' আবদুর রহমান ইবনেল আসআদ্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হলেন,[১২৪] তখন হাজ্জাজ এ সালেহকে তার স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং দেওয়ানকে ফারসি থেকে আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করতে নির্দেশ দিলেন। সালেহ ফারসি ভাষার লেখকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এ কাজ শেষ করেছিলেন। এজন্য আবদুল হামিদ ইবনে ইয়াহিয়া বলতেন, সালেহ অদ্ভুতকর্মা লোক ছিলেন, লেখকদের উপর তার অবদানের প্রতিক্রিয়া কী গভীরভাবেই না অনুভূত হচ্ছে।

অতঃপর আব্বাসী সাম্রাজ্যে এ পদটি যিনি এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করতেন, তার দায়িত্বের সাথে যুক্ত করা হয়। যেমন বনি বারমেক, বনি সহল ইবনে নওবখত এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য উজিরগণ এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

---

১২০. তাঁর মৃত্যুকাল ৫৬-৫৯ (৬৭৬-৬৭৯ খ্রি.) হিজরির মধ্যবর্তীকাল।
১২১. মৃত্যুকাল প্রায় হিজরি প্রথম শতাব্দীর দিকে।
১২২. ১২নং পৃষ্ঠার ২১ নং টীকা দ্র:
১২৩. রোজেনথালে 'মারহুন'; মূল গ্রিক সার্জিয়াম।
১২৪. যুদ্ধটি ৮৫ (৭০৪ খ্রি.) হিজরিতে অনুষ্ঠিত হয়।

www.amarboi.org

এ পদটির সাথে ধর্মীয় বিধিনিষেধের যে সম্পর্ক বিদ্যমান, বিশেষ করে সৈন্যদল, রাজকোষের আয়-ব্যয়, সন্ধি ও বিজয় অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলের পার্থক্য নির্ধারণ, এ সকল ব্যাপারে তত্ত্বাবধানকারীর বিশেষ মতাদর্শ ও তৎসম্পর্কিত অন্য শর্তাবলি লেখক ও হিসাব-নিকাশের নিয়মসমূহ—এ সমুদয়ই শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান[১২৫] এবং তজ্জন্য সেখানকার বিস্তারিত বিবরণ অনুসরণ করতে হবে। আমাদের বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য এগুলো বর্ণনা করা নয়; বরং আমরা রাজশক্তির সেই স্বাভাবিক অবস্থা বর্ণনা করব, যে উদ্দেশ্যে আমাদের আলোচনা আরম্ভ করেছি।

এ পদটি রাজশক্তির একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ অংশ; বরং বলা যায় এটা সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলের এক-তৃতীয়াংশ। কারণ প্রত্যেক রাজশক্তির জন্যই সৈন্যদল, রাজকোষ এবং দূরস্থিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য রাজ্যাধিকারী তরবারি, লেখনী ও রাজকোষের ব্যাপারে সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। সুতরাং এ পদগুলোর অধিকারী ব্যক্তিরা রাজশক্তির একটা বিশেষ অংশের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করেন।

আন্দালুসের বনি উমাইয়া সাম্রাজ্য এবং তৎপরবর্তী ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের আমলে উক্ত পদের অনুরূপ অবস্থাই বিরাজমান ছিল।

আল-মোহেদ সাম্রাজ্যে উক্ত পদের অধিকারী আল-মোহেদদের মধ্য থেকেই নিয়োজিত হতেন এবং তিনি স্বাধীনভাবে রাজস্ব আদায়, সঞ্চয়, সংরক্ষণ এবং তৎসম্পর্কীয় কর্মচারী ও অন্যান্য পদ সম্বন্ধে বিবেচনার দায়িত্ব পালন করতেন। যথাসময়ে রাজকোষের যথাবিহিত ব্যয়াদিও তার জিম্মায় থাকত। তার পরিচয় ছিল 'সাহেব আশগাল' বা কর্মাধিকারী অনেক সময় এ পদ আল-মোহেদ ব্যতীত দক্ষ অন্য লোকেরও করতলগত হত।

বনি আবু হেফস আফ্রিকিয়ার ক্ষমতা দখল করার সময় আন্দালুসে নির্বাসন পর্ব চলছে। ফলে বাস্তুত্যাগী বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার আফ্রিকিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, যারা আন্দালুসে উপরোক্ত পদমর্যাদায় নিয়োজিত ছিলেন। যেমন গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী আলকেলআর অধিকারী বনি সাইদ[১২৬] যারা বনি আবুল হাসান নামেই অধিকতর পরিচিত। বনি আবু হেফস তাদেরকে উক্ত পদে নিয়োজিত করে আন্দালুসের মতোই কর্মাধিকারী করলেন। এভাবে তারা কখনো বনি আবুল হাসানকে, আবার কখনো আল-মোহেদদেরকে এ রাজকোষের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত করেছিলেন। অতঃপর তা আল-মোহেদদের আয়ত্তাধীন থেকে বহির্গত হয়ে লিপি ও হিসাবে সুদক্ষ ব্যক্তিদের হস্তে ন্যস্ত হয়। এর পর হাজেবের পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে এবং সাম্রাজ্যের সকল ব্যাপারে তার নির্দেশ কার্যকরী হতে আরম্ভ করলে, এ ধারার অপমৃত্যু হয়। উক্ত পদমর্যাদার অধিকারী হাজেবের অধীনস্থ হয়ে পড়েন এবং তার অবস্থা রাজকোষ সম্পর্কীয় অন্যান্য কর্মচারীর সমতুল্য বিবেচিত হয়। সাম্রাজ্যে তার যে বিশেষ পদমর্যাদা ছিল, তা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়।

১২৫. 'আহক মুস্ সুলতানিয়া'।

১২৬. বিখ্যাত ঐতিহাসিকের বংশ; ৭২ পৃষ্ঠার ৪০ নং টীকা দ্র.।

www.amarboi.org

বর্তমানকালে বনি মারিন সাম্রাজ্যে প্রাপ্যাদি বণ্টন ও রাজস্ব আদায়ের হিসাব-নিকাশ একই ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যস্ত। তিনিই সর্বপ্রকার হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করে থাকেন। সুলতান অথবা উজিরের পরেই দেওয়ান ও তৎসম্পর্কীয় তত্ত্বাবধানে তার স্থান এবং প্রাপ্যাদি ও রাজস্ব সম্পর্কীয় হিসাব-নিকাশে তার স্বাক্ষর প্রামাণ্য বলে গণ্য করা হয়।

শাসন ব্যবস্থায় এগুলোই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পদমর্যাদা ও দায়িত্ব এবং এগুলোর ব্যাপকতা ও সুলতানের সাথে এগুলোর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার জন্যই সমুন্নত মর্যাদা বলে মনে করা হয়।

তুর্কি সাম্রাজ্যে এ পদমর্যাদাগুলো বিভিন্ন ধরনের। বেতনাদির দেওয়ানের অধিকারীকে সৈন্যদলের তত্ত্বাবধায়ক বলা হয়। সম্পদের তত্ত্বাবধায়কের নাম উজির; ইনি রাজকোষের সামগ্রিক ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করেন। সম্পদ সম্পর্কীয় সকল পদমর্যাদার মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ। কারণ সম্পদ সম্পর্কীয় তত্ত্বাবধানের পদ তাদের অধীন বহু এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার ও তার বিরাটত্বের জন্যই এরূপ হয়েছে। বস্তুত তার ব্যাপক সম্পদ ও রাজকোষের তত্ত্বাবধান কোনো একব্যক্তির পক্ষে, তার ক্ষমতা যত বেশিই হোক না কেন, সম্ভব নয়। এ জন্য সকল পদাদির উপর সাধারণ দৃষ্টিদানের দায়িত্বই উজিরকে দেয়া হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও উজির সুলতানের আশ্রিতপোষ্য, গোত্রপ্রীতির অধিকারী ও সাম্রাজ্যের তরবারীর উপর ক্ষমতাবান যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা হীন মর্যাদার অধিকারী। তার ক্ষমতা ঐ ব্যক্তির ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তার অনুসরণেই উজির নিজের তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। এরূপ ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে তারা 'উস্তাদুদ্দৌলা'[১২৭] বলে থাকেন। ইনি সাম্রাজ্যের ক্ষমতাবান সৈন্যদলের আমীরদের অন্যতম এবং তরবারি শক্তির অধিকারী।

তাদের মধ্যে প্রচলিত আরো কিছু সংখ্যক পদ, যা মূলত সম্পদ ও হিসাব সম্পর্কিত, উজিরের তত্ত্বাবধানের অধীন। এদের কতক বিশেষ ব্যাপারের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন 'নাজিরখাম।'[১২৮] ইনি সুলতানের আর্থিক সঙ্গতি—তাঁর সম্পত্তি, রাজস্বের মধ্য থেকে তাঁর অংশ এবং রাজস্বের অধীন এমন সকল অঞ্চল, যা সাধারণ মুসলমানের সম্পত্তি নয়—এ সমুদয়ের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। ইনি আমীর 'উস্তাদেদার'-এর অধীন। অবশ্য উজির যদি সৈন্যদলের কেউ হন, তা হলে তিনি আর উস্তাদেদারের অধীন হন না। নাজিরখাম সুলতানের আশ্রিতপোষ্য ও তাঁর খাজাঞ্চীর অধীনে থাকেন। উক্ত খাজাঞ্চীকে, তার বিশেষ দায়িত্ব তথা সুলতানী সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'খাজিনদার'[১২৯] বলা হয়।

পূর্বাঞ্চলের তুর্কি সাম্রাজ্যে আলোচ্য পদের এটাই বিবরণ। ইতিপূর্বে আমরা মাগরিবে এর অবস্থার কথা বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্‌ই বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন; তিনিই একমাত্র প্রতিপালক।

---

১২৭. 'সাম্রাজ্য শিক্ষক'; এ উপাধি অন্যত্র 'উস্তাদেদার' রূপে দেখা দিয়েছে, যার অর্থ গৃহশিক্ষক। 'রোজেনথালে উস্তাদুদ্দৌলা' নেই।

১২৮. বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক।

১২৯. ভাণ্ডারী।

www.amarboi.org

পত্রাদি ও লিপি সংক্রান্ত দপ্তর

এ বিভাগটি তেমন প্রয়োজনীয় নয়। কারণ অনেক সাম্রাজ্য আদৌ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। যেমন সে সকল সাম্রাজ্যের প্রান্তরীয় জীবনবোধ দূর হয়ে নাগরিকত্বের পরিমার্জনা ও তদসম্পর্কীয় শিল্পজ্ঞান দেখা দেয়নি, তাদের মধ্যে এর অস্তিত্ব নেই। ইসলামী সাম্রাজ্যে আরবি ভাষার উন্নত অবস্থা ও মনোভাব প্রকাশে অলংকরণের তাগিদেই এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় পত্রের ভাষা মুখের ভাষা অপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী হয়েছে। এর গুরুত্বের জন্য শাসকের 'কাতেব' তাঁর বংশ ও গোত্রের অন্তর্গত কেউ হতেন। যেমন সিরিয়া ও ইরাকের খলিফা ও আমীর সাহাবীদের জন্য এরূপ লেখক নিযুক্ত থাকতেন। কারণ তাদের বিশ্বস্ততা ও গোপন তথ্যাদি সম্পর্কে আন্তরিকতার জন্যই এর প্রয়োজন হত। অতঃপর ভাষায় বিকৃতি দেখা দিলে বিষয়টি শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয় এবং তখন দক্ষ ব্যক্তিরাই এ কার্যে নিয়োজিত হতেন। আব্বাসী সাম্রাজ্যে কাতেবের পদমর্যাদা উন্নত ছিল। তিনি নথিপত্রের শেষে নিজের নাম স্বাক্ষর করে সুলতানের মহোরাঙ্কিত করতেন। এ সীলমোহরটি ঢালাই করা হত, যাতে সুলতানের নাম অথবা অন্য নিদর্শন থাকত। কাতেব এ সীলমোহর দ্বারা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এক প্রকার লাল মাটির উপর ছাপ দিতেন। পত্রাদির গোপনীয়তা রক্ষার জন্য উক্ত মাটির কাদা প্রস্তুত করে পত্রের ভাজ ও মিলনস্থলের উভয় দিকে সীলমোহর করা হত। এ মাটিকে সীলমোহরের মাটি বলত।

অতঃপর নথিপত্র সুলতানের নামেই জারি করা হত। কাতেব তার সম্মুখে বা পিছনে যথাস্থানে যথা নিয়মে নিজের চিহ্ন[১৩০] প্রদান করতেন। এর পর এ পদমর্যাদাটির গুরুত্ব হ্রাস পেল। সুলতানের নিকট অন্য পদমর্যাদার অধিকারীর স্থান বড় হয়ে উঠল কিংবা সামগ্রিকভাবে কোনো উজির অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করে বসল। সুতরাং কাতেবের চিহ্ন সংশ্লিষ্ট শাসকের চিহ্নাদির অনুসারী এবং তাঁর নির্দেশের অনুযায়ী হত। বস্তুত কাতেবের স্বাক্ষর একটা প্রথা হিসাবেই বিদ্যমান ছিল এবং তাই বোঝাত। নির্দেশের মালিক ছিলেন সংশ্লিষ্ট শাসক। যেমন হেফসিয়া সাম্রাজ্যের শেষের দিকে যখন হাজেবের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেল এবং তার নির্দেশ কার্যকরী হতে লাগল ও অন্যান্য প্রভাবের আবির্ভাব ঘটল, তখন কাতেবের জন্য নির্দিষ্ট চিহ্নাদির ব্যবহার মূল্যহীন হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য এতদসত্ত্বেও তার ধারা অব্যাহত ছিল এবং এর একমাত্র কারণ প্রাচীন প্রথার অনুবর্তন। হাজেব স্বয়ং কাতেবকে পত্রাদির বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দিতেন এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ীই পত্রাদির লিপি ও ধারা নির্ধারিত হত। কাতেব তার নির্দেশ পালন করতেন এবং প্রথা অনুযায়ী চিহ্নাদি ব্যবহার করতেন। কখনো সুলতান স্বয়ং এ ব্যাপারে অগ্রসর হতেন। অবশ্য এ অবস্থায় তাঁকে স্বাবলম্বী ও নিজস্ব প্রতাপের অধিকারী হতে হত এবং তিনি অনুরূপভাবে কাতেবকে বিষয়বস্তুর নির্দেশ দিতেন ও চিহ্নাদি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতেন।

---

১৩০. 'আলামত'।

www.amarboi.org

কাতেবের কার্যাদির মধ্যে একটি ছিল তত্তকি[১৩১] অর্থাৎ তিনি, সুলতানের দরবারে বিচার বা আলোচনা চলাকালে সেখানে উপস্থিত থেকে বক্তব্যের দ্বারা অনুসরণ করতেন এবং আলোচ্যমান বিষয়ে যে সকল মন্তব্য, নির্দেশ ও মীমাংসা আসত, তা লিপিবদ্ধ করতেন। কখনো এটা সুলতানের সংক্ষিপ্ত ও অলংকৃত বাক্যের ধারাতেই প্রকাশ পেত; আবার কখনো আবেদনকারীর পত্রের উপর লিখিত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে কাতেব নিজে প্রকাশ করতেন। এজন্য 'তত্তকি' লেখককে অলংকারশাস্ত্রের কিছু জ্ঞান রাখতে হত, যাতে তার কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সম্রাট হারুনুর রশীদের সময় জাফর ইবনে ইয়াহিয়া এরূপ 'তত্তকি' লিখতেন এবং আবেদনপত্রের শেষে তাঁর লিখিত মন্তব্যসহ তা আবেদনকারীকে ফেরত দিতেন। অলংকারশাস্ত্রবিদরা আগ্রহের সাথে এ সকল মন্তব্যের উদাহরণ সংগ্রহ করতেন, কেননা এগুলোতে অলংকারের বিভিন্ন প্রকার ও বিষয়াদির সুচারু দৃষ্টান্ত থাকত। বলা হয় যে, এরূপ বিবরণের শেষে লিখিত মন্তব্যগুলোর প্রত্যেকটি এক এক দিনারের বিনিময়ে বিক্রয় হত। এমনি ছিল সাম্রাজ্যের অবস্থা।

জেনে রাখুন, এ পদমর্যাদার জন্য উচ্চ শ্রেণীর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অমায়িক লোক নির্বাচন করা দরকার। তিনি গভীর জ্ঞান ও অলংকারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী হবেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌল বিষয় সম্পর্কে অধিকার থাকা প্রয়োজন, কেননা সম্রাটের দরবারে এর যে কোনোটিই আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং তার উপর মন্তব্য, নির্দেশ ও ইত্যাকার ক্ষমতা প্রকাশের প্রয়োজন হতে পারে। এতদসঙ্গে তাঁকে সুলতানী দরবারের আদব-কায়দা, সচ্চরিত্র ও সংশ্লিষ্ট গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। যাতে উদ্দেশ্য বুঝে ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পত্রাদি রচনা ও বাক্যাদি গঠনের আলংকারিক যোগ্যতা তাঁর কুক্ষিগত হয়।

অনেক সময় কোনো কোনো সাম্রাজ্যে এ পদটি তরবারির অধিকারীদের দায়িত্বে ন্যস্ত হয়। কারণ সেখানে গোত্রপ্রীতির অধিকার সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দেয়ার ফলে জ্ঞানের সাহায্যকে অগুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনেই সুলতান সকল দায়িত্ব নিজের গোত্রান্তর্গত লোকদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং সম্পদ, তরবারী ও লিপির জন্য তাঁর নিজের লোকদেরকেই ব্যবহার করেন। অবশ্য তরবারীর জন্য জ্ঞানের তেমন প্রয়োজন নেই; কিন্তু সম্পদ ও লিপির জন্য তার দরকার আছে। প্রথমটির জন্য হিসাব-নিকাশ ও দ্বিতীয়টির জন্য অলংকারশাস্ত্র। এজন্য সম্রাট এ শ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকে প্রয়োজনের সময় কাউকে নির্বাচিত করেন এবং তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে গোত্রান্তর্গত অন্য একজন উক্ত পদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকে এবং পদাধিকারীর দৃষ্টিকোণ তার দৃষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন বর্তমানকালের পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কি সাম্রাজ্যে এ অবস্থা বিদ্যমান। সেখানে লিপির ব্যাপারটি যদিও 'সাহেবে ইনশা'[১৩২] নামক পদাধিকারীর অধীন, তথাপি তার উপর তত্ত্বাবধানের জন্য গোত্রান্তর্গত 'দাবিদার' নামক একজন আমীর রয়েছেন। সুলতান উক্ত আমীরকেই বিশ্বাস এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উপরই নির্ভর করেন। আমীরের অধীন উক্ত সাহেবে

১৩১. বাক্যার্থ ঘটনার বিবরণ।

১৩২. রচনা লেখক।

www.amarboi.org

ইনশার নিকট থেকে শুধু আলংকারিক ভাষা, মনোভাব প্রকাশ যোগ্য বর্ণনা, গোপন তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে সততা প্রত্যাশা করেন।

সে সকল সুপ্রচলিত শর্তাদির মাধ্যমে সুলতান উক্ত পদে লোক নিয়োগ করে থাকেন, তার সংখ্যা বহু। বস্তুত এগুলো সুলতানকে বিচিত্র শ্রেণীর লোকের মধ্য থেকে যোগ্য লোক নির্বাচনে ও তার পরিমার্জনা সাধনে সাহায্য করে। কাতেব আবদুল হামিদের[১৩৩] লিখিত একটি পত্রে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এ সবগুলোকে একত্র করা হয়েছে। অন্যান্য কাতেবদের উদ্দেশে লিখিত তাঁর পত্রটি নিম্নরূপ।

অন্যান্য লেখকের উদ্দেশে লেখক আবদুল হামিদের পত্র

অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে রক্ষা করুন, হে লিপি শিল্পীবৃন্দ! তিনি তোমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করুন, শক্তি দিন এবং সৎপথে পরিচালিত করুন। অবশ্যই আল্লাহ্ মহান, সম্মান ও গৌরবের অধিকারী; নবী ও রসূলদের উপর তাঁর বিপুল শান্তি ও কল্যাণ আপতিত হোক এবং তাঁদের পরে মহামহিম রাজন্যবর্গ রয়েছেন। বস্তুত এভাবে আল্লাহ্ সকল মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যদিও তারা প্রকৃত প্রস্তাবে সমান। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন শিল্পকর্ম ও বিচিত্র পেশার অধীন করেছেন, যাতে তারা তাদের জীবিকা ও আহার্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। হে লেখকবৃন্দ! তিনি তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ দিকে নিয়োজিত করেছেন। তোমরা বিনয়, অমায়িকতা, জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধির অধিকারী। তোমাদের সাহায্যে খেলাফতের সৌন্দর্য বিকশিত হয় এবং তার বিষয়াদি সুনিয়ন্ত্রিত হয়। তোমাদের সদুপদেশে আল্লাহ্ শাসন ব্যবস্থাকে জনকল্যাণমুখী করেন এবং নগরগুলোকে সমৃদ্ধি দান করেন। কোনো রাজশক্তিই তোমাদের সহায়তা ত্যাগ করতে পারে না এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তাও কেবল তোমাদের নিকটেই পেতে পারে। রাজশক্তির সাথে তোমাদের সম্পর্কের তুলনা হল, তোমরা তার কর্ণ, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে; তোমরা তার চক্ষু, যা দিয়ে সে অবলোকন করে; তোমরা তার জিহ্বা, যা দিয়ে সে মনোভাব প্রকাশ করে এবং তোমরা তার হস্ত যা দিয়ে সে স্পর্শ করে। আল্লাহ্ এভাবে শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে যে সৌভাগ্য দান করেছেন, তা যেন তোমরা ভোগ করতে পার এবং তিনি যেন তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর সম্পদের এ প্রাচুর্যকে উঠিয়ে না নেন। কোনো শিল্পীর জন্যই তোমাদের ন্যায় এত ব্যাপক সৎগুণাবলি ও বিচিত্র সুচরিত্রের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

হে লেখকবৃন্দ! তোমরা যদি এ পত্রে উল্লেখিত গুণাবলির অধিকারী হতে! বস্তুত যে কোনো লেখকের পক্ষে নিজের দিক থেকে এবং যিনি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁর দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ সকল ব্যাপারের যোগ্য হওয়া প্রয়োজন। সে গাম্ভীর্যের সময় গম্ভীর, বিচারের সময় বুদ্ধিমান, অগ্রগতির সময় সাহসী, সংশয়ের সময় ধীরগামী এবং সততা ন্যায় ও সদাচারের ক্ষেত্রে আন্তরিক হবে। যা গোপন রাখার, তা গোপন রাখবে, বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করবে এবং অনাগত সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কেও অবহিত

১৩৩. ইবনে ইয়াহিয়া, তাঁর পৃষ্ঠপোষক উমাইয়া সম্রাটের সাথে ১৩২ (৭৫০ পৃ:) হিজরিতে নিহত হন।

www.amarboi.org

থাকবে। তার কর্তব্য হবে বিষয়াদিকে যথাস্থানে সংস্থাপন করা এবং দুর্ভাগ্যকে যথাযথ বিশ্লেষণ করে দেখা। জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে বিচরণ করবে এবং গভীরতা লাভ করবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জ্ঞান অবশ্যই সংগ্রহ করে নিবে। সে তার প্রবল কাণ্ডজ্ঞান, সযত্ন বিনয় ও সুচারু অভিজ্ঞতার দ্বারা যা অনাগত, তার সম্ভাবনা জেনে নিবে এবং যা আগত, তার পরিণাম চিন্তা করবে। এভাবে প্রতিটি বিষয়ের জন্য যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণ ও আগ্রহ পোষণ করবে এবং তিনি কার্যকারণকে তার প্রকৃত স্বরূপ ও অভ্যাসের মধ্যে বিন্যস্ত করবে।

হে লেখকবৃন্দ! সর্বপ্রকার বিনয় অবলম্বনে তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও। ধর্মকে হৃদয়ঙ্গম কর। মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র গ্রন্থ নিয়ে জ্ঞানার্জন আরম্ভ কর। উত্তরাধিকার আইন কণ্ঠস্থ কর। আরবি ভাষা শিখ; তাই তোমাদের ভাষার সুমার্জিত রূপ। এর পর হস্তাক্ষর সুন্দর কর; কারণ তা তোমাদের গ্রন্থের অলংকার। কাব্য পাঠ কর; তা বিরল গুণ ও তাৎপর্য অনুধাবন কর। আরব ও অনারবদের যুগপরম্পরা এবং তাদের কাহিনী ও চরিত্র জেনে নাও। এ সকলই তোমাদের মহান উদ্দেশ্যের সহায়ক হবে হিসাবশাস্ত্র সম্পর্কে অনবহিত থেক না; কেননা এটাই রাজস্ব লেখকদের ভিত্তি।

প্রলোভন থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখ, তা ভালোই হোক, বা মন্দই হোক; বোকামি ও হেয়তা যেন তোমাদেরকে স্পর্শ করতে না পারে। কারণ এতে শির অবনত হয় ও লেখকদের সম্মানের হানি ঘটে। তোমাদের শিল্পকর্মে যেন হীনমন্যতা ঠাঁই না পায়; পরনিন্দা ও কুৎসা রটনা থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখ; কেননা এগুলো একান্তই মূর্খদের স্বভাব। সাবধান অহংকার, উন্নাসিকতা ও আত্মশ্লাঘাকে স্থান দিও না; কেননা এগুলো কোনো কারণ ছাড়াই শত্রুতার জন্ম দেয়। মহান ও গৌরবময় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানে তোমরা তোমাদের শিল্পকর্মকে ভালোবাস এবং পূর্বসূরিদের মর্যাদা, ন্যায় ও গৌরবের ধারা অনুসরণ করে পরস্পরকে যোগ্যতর উপদেশ দান কর। যদি তোমাদের কাউকে সময় উৎপীড়ন করে, তা হলে তাকে সহায়তা করার জন্য তার প্রতি সহানুভূতিশীল হও, যাতে সে পুনরায় সচ্ছল অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং তার বৈষয়িক সুস্থতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তোমাদের কেউ বার্ধক্যের জন্য জীবিকা অর্জন থেকে বিচ্যুত হয়ে বন্ধু-বান্ধবের সংসর্গ ত্যাগ করে গৃহে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তা হলে তাকে দেখতে যাও, পরামর্শ দাও এবং তার অভিজ্ঞতার মূল্য ও প্রাচীনত্বের গৌরব প্রকাশ কর। যাতে ঐ ব্যক্তি তার প্রয়োজনের সময় শিল্পকর্মের সাথী ও গৌরবের অংশীদার তোমাদেরকেই তার ভাই ও পুত্র অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় মনে করে।

তোমাদের মধ্যে কারো কার্যে যদি প্রশংসার কিছু থাকে, তা হলে তা যথার্থ প্রাপককেই প্রদান করো এবং যদি নিন্দার কিছু বের হয়ে যায়, তা হলে তাও যথাস্থানে সীমাবদ্ধ রেখ। অবস্থার পরিবর্তনে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিরক্তি প্রকাশ থেকে বিরত থেক। কারণ যে কোন প্রকার ত্রুটি কেরাত বিশারদগণ[১৩৪] অপেক্ষা, হে লেখকবৃন্দ, তোমাদের জন্য অধিকতর সহজ এবং তুলনামূলকভাবে অধিকতর ক্ষতিকর। তোমরা ত জানই, যে

১৩৪. মূলে 'আল কুর্রা' আছে, এর কেরাত (কোরান পাঠ) বিশারদ ও সাধারণ শিক্ষিত—উভয়ই বুঝায়।

www.amarboi.org

ব্যক্তি তোমাদের সাহচর্যে এসে তোমাদের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছে, তার প্রতি তোমাদের কর্তব্য কী! তোমার উচিত তার প্রতিদান, কৃতজ্ঞতা, দায়িত্ব গ্রহণ, কল্যাণ কামনা, সদুপদেশ, গোপনীয়তা রক্ষা, কার্য কুশলতা প্রভৃতির মাধ্যমে তার প্রাপ্য আদায় করা। তার প্রয়োজনের সময় তোমার কার্যই এগুলোকে সত্য বলে প্রমাণ করবে এবং তার অস্থিরতা এর কল্যাণে দূরীভূত হবে। তোমরা এর গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করো। সম্পদে বিপদে, বঞ্চনায় বদান্যতায়, অনুগ্রহে ও সুখে-দুঃখে আল্লাহ্ তোমাদেরকে কর্তব্য পালনের শক্তি দান করুন। এগুলোই উত্তম চরিত্র এবং এ উন্নত শিল্পকর্মীদের এটাই নিদর্শন। যখন তোমাদের কারো উপর দায়িত্ব অর্পিত হয় অথবা আল্লাহ্র সৃষ্টির কল্যাণ কামনার কোনো কর্তব্যে নিয়োজিত হও, তখন মহান ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্র দৃষ্টিকে স্মরণ রেখো। তাঁর প্রতি তোমার কর্তব্য পালন যেন দুর্বলের জন্য তোমাকে বন্ধু ও উৎপীড়িতের জন্য সুবিচার হিসাবে গড়ে তোলে। কারণ সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার-পরিজন, তাদের মধ্যে সেই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে সর্বাপেক্ষা সহানুভূতিশীল।

তোমাদের প্রত্যেকের উচিত ন্যায়ের শাসক, সম্ভ্রান্তের পরিপোষক, প্রাপ্যাদির পরিপূরক, দেশের সমৃদ্ধি বিধায়ক, প্রজাদের মনোরঞ্জক ও তাদের দুর্গতিনাশক হওয়া। দরবারে যেন তোমরা বিনীত ও গম্ভীর হও এবং রাজস্ব সম্পর্কীয় নির্দেশাদিতেও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বন্ধুতুল্য হতে পারে।

যদি কোনো ব্যক্তির[১৩৫] সাচহর্য লাভ তোমাদের ঘটে, তা হলে তার চরিত্রাদির অনুসন্ধান করো। তার ভালো-মন্দ জানবার পর যা ভালো, তদসম্পর্কে তাকে সাহায্য কর এবং মন্দ থেকে তাকে ফেরাবার সূক্ষ্ম কৌশল ও সুন্দর মাধ্যম অবলম্বন কর। তোমরা ত জান, কোন পশুর সাহস যদি বিচক্ষণ হয়, তবে সে পশুটির অভ্যাসাদির খোঁজ নিতে চেষ্টা করবে। যদি দেখা যায় তার দ্রুতগতিতে দৌড়ের অভ্যাস আছে, তা হলে আরোহণের সময় তাকে উত্তেজিত করবে না। যদি দেখা যায় তার সামনের দুটি পাও উঠিয়ে ফেলার অভ্যাস আছে, তা হলে সম্মুখের দিক থেকেই তাকে প্রতিরোধ করতে হবে। যদি তার কামড়ানোর অভ্যাস আছে বলে ভয় হয়, তা হলে তার মাথার পার্শ্ব দিয়েই আড় সৃষ্টি করে রক্ষা পেতে হবে। যদি দেখা যায় তার গতি মন্থর, তা হলে মৃদু আঘাতের দ্বারা তার গতি বাড়িয়ে তুলতে হবে। যদি এতেও তার ধীরগতি দূর না হয় তা হলে লাগাম টেনে তাকে কিঞ্চিৎ পার্শ্বে ফিরিয়ে তা ঢিলা করে দিতে হবে। এ সকল অভ্যাসাদিতে শাসনের এমন সব প্রমাণ বিদ্যমান, যা মানুষের শাসনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয়। যারা তাদেরকে কর্মে নিয়োজিত করতে, তাদের পরীক্ষা নিতে ও তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে চান, তাদের জন্য এতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

বস্তুত লেখক তার পাণ্ডিত্যের গৌরবে, শিল্পকর্মের মর্যাদায়, সূক্ষ্ম কৌশল ও ব্যবহারে মানুষের মধ্যে স্থান করে নিবে; যাতে মানুষ তার সংসর্গ ভালোবাসে ও তার প্রতীক্ষা করে এবং তার নিকট থেকে কিছু বুঝে নিতে ও তার প্রতাপকে ভয় করতে শেখে। এজন্য তার উচিত তার সহচরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং তাকে উপলব্ধি করে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা। কারণ এক্ষেত্রে সে একটি পশু অপেক্ষা

১৩৫. এ স্থলেও অন্যত্র সহচর অর্থে নিয়োগকারী।

www.amarboi.org

অধিক সহানুভূতির দাবি করতে পারে। কেননা পশু উত্তর দিতে পারে না, যথার্থতা জানে না ও কোনো বক্তব্য বুঝতে পারে না। অবশ্য সহিস যদি তাকে কিছু বোঝার যোগ্য করে তুলতে পারে, তা হলে স্বতন্ত্র কথা। অতএব সহানুভূতিশীল হও, আল্লাহ্ তোমাদের দৃষ্টির মধ্যে শান্তি বর্ষণ করুন। তোমরা যতদূর সম্ভব চিন্তা ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ কর এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমাদের সহচরদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার, চাপ সৃষ্টি ও তাদের বিরক্তি উৎপাদন থেকে বিরত থাক। তারা যদি তোমাদের সাথে সহযোগিতা করে, তা হলে তোমরাও তাদেরকে ভাই হিসাবে গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্ চান ত, তাদের প্রতি সদয় হও।

তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার দরবার, পরিচ্ছদ, বাহন, আহার্য পানীয়, আবাস, ভৃত্য ও অন্য অনেক বিষয় এবং অধিকারের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম না করে। কারণ তোমার আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিল্পকর্মের যে গৌরব দান করেছেন, তার কল্যাণে সকলের সেবক, সুতরাং তোমাদের সেবায় যেন কোনো প্রকার ত্রুটি দেখা না দেয়। তোমরা হলে সকলের স্বার্থরক্ষক; সুতরাং তোমাদের কাজে যেন কোনো অপব্যয় ও অপচয়ের চিহ্ন না থাকে। আমি যে সকল কথা তোমাদের নিকট বলেছি ও যে সকল উদাহরণ তুলে ধরেছি, তাদের সকল কিছুতেই সততার দ্বারা সাহায্য গ্রহণ কর। অপব্যয়ের আপাত মাধুর্য ও বিলাসব্যসনের অশুভ পরিণাম থেকে দূরে সরে থাকে। কারণ এ দুটি দোষ দরিদ্রতা আনয়ন করে শির অবনত করে ও তাদের অধিকারীকে অপদস্থ করে ছাড়ে এবং লেখক ও জ্ঞানীদের জন্য এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই দৃষ্টান্ত বিদ্যমান; তাদের একটি অপরটির প্রমাণ স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের অভিনব কার্যাদির উপর প্রমাণ গ্রহণ কর। অতঃপর প্রচেষ্টার পথ অনুসরণ করে তাকে দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্টতর, প্রমাণের দ্বারা সত্যতর এবং পরিণতির ইঙ্গিতে সুন্দরতর করে তোল। জেনে রাখ, প্রচেষ্টার পথে কিছু প্রিয় বাধা আছে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার চিন্তা ও দূরদর্শিতা প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন দরবারে বসে সংযত বাক্ হও এবং বক্তব্য উপস্থাপনে ও উত্তর দানে সংক্ষিপ্তির দ্বারস্থ হও। তোমাদের বক্তব্যে যেন যুক্তি-প্রমাণের ধারা অনুসৃত হয়। কেননা এর দ্বারা তোমাদের কার্যকে কেবল সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং তোমার অধিক কথনের দোষকে নিশ্চিহ্ন করতে পার। তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্র নিকট সাহায্য-সহায়তার আকুল প্রার্থনা জানাও, যাতে সত্যের অনুসারী হতে পার এবং তোমার দেহ বুদ্ধি ও শিক্ষার ক্ষতিকর কোনো ভুলের মধ্যে জড়িয়ে না পড়। কেননা তোমাদের কেউ যদি এ ধারণা পোষণ করে এবং কেউ যদি এ মন্তব্য উচ্চারণ করে যে, তার শিল্পকর্মে যে সৌন্দর্য ও তার তৎপরতায় যে ক্ষমতার চিহ্ন বিদ্যমান, তা সুনিশ্চিতভাবে একমাত্র তার কর্মকুশলতা ও সযত্ন প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে তা হলে সে তার এ সুন্দর ধারণা ও বক্তব্যের দ্বারা মহান ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করল। সুতরাং এটা তার জন্য কখনোই যথেষ্ট নয় এবং চিন্তাশীলের নিকট এর স্বরূপ কখনই অস্পষ্ট নয়। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এরূপ না বলে যে, সে সর্ববিষয়ে অতিশয় বিচক্ষণ এবং শিল্পকর্মে বান্ধবদের অপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণু

www.amarboi.org

ও সেবাধর্মে সহচরদের অপেক্ষা আন্তরিক। কারণ বিচক্ষণদের নিকট দুইজন লোকের মধ্যে সেই অধিকতর বুদ্ধিমান, যার অসাক্ষাতে মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আলোচনা করে। অথচ সে নিজে এ মত প্রকাশ করে যে, তার সহচররাই তার অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান এবং কর্মধারায় অধিকতর সুচারু। যাহোক এ উভয় দলের জন্যই পরম প্রশংসিত আল্লাহ্র অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি থাকা প্রয়োজন। কোনো পক্ষই যেন তার মতের অব্যর্থতা ও আত্মার অপাপবিদ্ধতার গৌরব না করে এবং তার ভাই, বয়স্য, সহচর ও পরিজনের প্রতি প্রাচুর্যের অহংকার না দেখায়। আল্লাহ্র প্রশংসা সকলের অবশ্য কর্তব্য এবং তা তাঁর মহত্ত্বের সম্মুখে বিনয়ের সাথে, তাঁর পরাক্রমের সম্মুখে হীনতার সাথে ও তাঁর অনুগ্রহের সম্মুখে কৃতজ্ঞতার সাথে করতে হবে।

আমি আমার এ পত্রে তাই বলেছি যা এ প্রবাদের মধ্যে বিদ্যমান—যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করে, সে তদনুযায়ী কার্যও করে থাকে। এটাই এ পত্রের মূল বক্তব্য ও তার আলোচনার মধ্যমণি। অবশ্য এর পূর্বে মহান ও গৌরবময় আল্লাহ্র স্মরণকে স্থান দিতে হবে। এ জন্যই আমি তাকে শেষে স্থান দিয়েছি এবং তার দ্বারা শেষ করেছি।

হে বিদ্যার্থী ও লেখকবৃন্দ! আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকেও পূর্বসূরিদের সেই সৌভাগ্য ও সৎপথের জ্ঞানের অধিকারী করুন। কারণ তা তাঁর দিকেই, তাঁর ক্ষমতার মধ্যেই আমাদেরকে নিয়ে যাবে। তোমাদের উপর আল্লাহ্ শান্তি, দয়া ও কল্যাণ বর্ষণ করুন।

শুরতা (রক্ষী)

আফ্রিকিয়ায় বর্তমানকালে এ পদের প্রধানকে 'হাকিম' বলা হয়, আন্দালুস সাম্রাজ্যে 'সাহেবে মদিনা' (নগরপাল) এবং তুর্কি সাম্রাজ্যে 'ওয়ালী' (অধিকারী)। এ পদটি সাম্রাজ্যের তরবারির অধিকারীর অধীনে ন্যস্ত; অবশ্য অনেক সময় রক্ষী প্রধানও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এর প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় আব্বাসী সাম্রাজ্যে; এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদের অধিকারী প্রথমে বিভিন্ন দুষ্কর্মের তদন্ত এবং পরে তার শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। কারণ দুষ্কর্মের এমন অনেক সন্দেহজনক অবস্থা আছে, যাতে ধর্মীয় বিধানের শাস্তিদান ব্যতীত অন্য কিছু করার নেই; অথচ সাধারণের স্বার্থে শাসন ব্যবস্থার এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন হয় এবং শাসক তার কার্যকারণ ও প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বীকারোক্তি সংগ্রহ করেন। সুতরাং কাজী যে বিষয়কে তাঁর আওতাধীন নয় বলে ত্যাগ করতেন, তাকে যিনি তদন্তের সাহায্যে প্রমাণ করে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদান করতেন, তাঁকে বলা হত 'সাহেবে সুরতা'। অনেক সময় তাঁর দায়িত্বে শাস্তি প্রদান ও খুন-খারাবির তদন্তের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়া হত এবং কাজীর এতে করার কিছুই ছিল না। এভাবে এ পদমর্যাদাটিকে সাব্যস্ত করে তা আব্বাসী সম্রাটগণ তাঁদের আশ্রিত পোষ্য বিশেষ সভাসদ ও সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত করতেন। তারা সর্বসাধারণের উপর কোনো কর্তৃত্ব রাখতেন না; বরং তাদের কর্তৃত্ব ছিল দুষ্কৃতকারী সন্দেহজনক ব্যক্তি ও অপকর্মে লিপ্ত আইন অমান্যকারীদের উপর।

www.amarboi.org

অতঃপর এ পদের কর্তৃত্বের পরিধি আরো বৃদ্ধি পায় এবং আন্দালুসের বনি উমাইয়া সাম্রাজ্যে এটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে বৃহৎ রক্ষী ও ক্ষুদ্র রক্ষীতে পরিণত হয়। বৃহৎ রক্ষীকে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণের উপর ক্ষমতা দেয়া হত এবং তিনি শাসন ব্যবস্থায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, তাদের অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার ও তাদের সম্ভ্রান্ত আত্মীয়স্বজনের অনুরূপ আচরণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করতেন। ক্ষুদ্র রক্ষী শুধুই সর্বসাধারণের ব্যাপারে নিযুক্ত থাকতেন। বৃহৎ রক্ষীর জন্য সম্রাটের প্রাসাদদ্বারে একটি আসন থাকত, তাতে তিনি উপবেশন করতেন এবং তাঁর সম্মুখে কিছু সংখ্যক লোক প্রস্তুত হয়ে বসে থাকত। তাঁর নির্দেশ ব্যতীত তারা ঐ স্থান ত্যাগ করতে পারত না। তাঁরা এ পদটি রাজপুরুষদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নরাই লাভ করতেন এবং একে হাজেব ও উজির পদে উন্নীত হওয়ার সোপান মনে করা হত।

মাগরিবের আল-মোহেদ সাম্রাজ্যে এ পদটির ব্যাপক পরিচিতি থাকলেও তার দায়িত্ব তেমন ব্যাপক ছিল না। তাতে আল-মোহেদদের ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাই নিযুক্ত হতেন। শাসন ব্যবস্থায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর তাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। অতঃপর ইদানীং এ পদটির ক্ষমতা আরো লুপ্ত হয়েছে এবং তা আল-মোহেদদের আওতা বহির্ভূত হয়ে অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অধিকারে চলে গেছে।

বর্তমানকালে পূর্বাঞ্চলের বনি মারিন সাম্রাজ্যে এ পদটি তাদের আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অধীনে স্থাপিত হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের তুর্কি সাম্রাজ্যে তা তুর্কি রাজপুরুষ অথবা তাদের পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের অধিকারী কুর্দীদের বংশধরদের হাতে ন্যস্ত। এ ব্যাপারে তাদের কঠোরতা ও বিধি-নিষেধ কার্যকরী করার দক্ষতার জন্যই তাদেরকে নিয়োজিত করা হয়। দুষ্কর্মের উপাদান নিশ্চিহ্ন করা, অন্যায়ের পথ রোধ করা, তাদের আড্ডা ভেঙে দেয়া ও সজ্ঞ শক্তিকে পর্যুদস্ত করাই এ পদের উদ্দেশ্য। এর সাথে শাসনতান্ত্রিক ও ধর্মীয় শাস্তি প্রয়োগ এবং সর্বসাধারণের কল্যাণের অনুসারী নগর জীবনের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিও জড়িত থাকে। আল্লাহ্ দিন-রাত্রির পরিবর্তন করে থাকেন এবং মহাপরাক্রান্ত ও পরাক্রমশালী। উন্নত আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা।

নৌবিভাগ পরিচালনা[১৩৬]

এটা মাগরিব ও আফ্রিকিয়ার সাম্রাজ্যগুলোর বিশেষ পদমর্যাদা ও দায়িত্বের অন্তর্গত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা সেনাপতির অধীনে ও তার নির্দেশের অনুসারী হয়ে থাকে। সাধারণত এ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে তাদের প্রথা অনুযায়ী, 'আল মালান্দা[১৩৭] বলা হয়। এতে 'লাম' বর্ণটির উচ্চারণে জোর দেয়া হয় এবং ফিরিঙ্গী ভাষা থেকে গৃহীত একটি শব্দ, যা ঐ পদের নাম হিসাবে সেখানে ব্যবহৃত হয়। এ বিশেষ পদটি আফ্রিকিয়া ও মাগরিবের জন্য নির্দিষ্ট হবার কারণ এই যে, মূলত এ উভয় এলাকা প্রায় সর্বাংশে রোম সাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এরই দক্ষিণ তীরাঞ্চলে সিবতা থেকে আলেকজান্দ্রিয়া ও

১৩৬. মূলে আছে, 'কিয়াদাতুল আসাতিল' রণতরী পরিচালনা।

১৩৭. রোজেনথাল এ শব্দটি মূলত আরবি গৃহীত শব্দের বিকৃতরূপ বলে মনে করেন। বস্তুত 'এডমিরাল' শব্দটিও 'আমীরুল বাহর'—সমুদ্রাধিপতি—শব্দের বিকৃতরূপ।

www.amarboi.org

সিরিয়া পর্যন্ত বারবার এলাকা বিদ্যমান। উত্তর তীরে আন্দালুস, ফিরিঙ্গী, সাকলী (শ্লাভ), রোম হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত নানা দেশ বিস্তৃত। রোম সাগর (ভূমধ্যসাগর)-কে এর তীরাঞ্চলের দিকে লক্ষ করে শাম (সিরিয়া) সাগরও বলা হয়। এ সাগরের উভয় তীরের সন্নিকটে ও পার্শ্বে অবস্থানকারী জাতিগুলো তাদের অবস্থা-ব্যবস্থার জন্য সমুদ্রের সাথে যতটুকু জড়িত, অন্যান্য সামুদ্রিক জাতি ততটা নয়। রোমান, ফিরিঙ্গী ও গথ তথা এ সমুদ্রের উত্তর তীরে বসবাসকারী জাতিগুলোর যুদ্ধবিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই নৌকার উপর নির্ভর করত। এর ফলে তারা নৌ-আরোহণ ও নৌ-যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে যারা অন্যান্য জাতির নিকটবর্তী হবার জন্য দক্ষিণ তীরে এসেছে, যেমন রোমানরা আফ্রিকিয়ায় ও গথরা মাগরিবে, তারা এ নৌকার সাহায্যেই এসেছে। তারা সেখানে এসে বারবারদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং তাদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। সেখানে তাদের জনবসতিপূর্ণ বহু নগর ছিল, যেমন করতাজ্ঞা (কার্থেজ), সেবতিলা, জালুলা, মুরনাক, শেরশাল (চার্চিল) ও তাঞ্জা (তাঞ্জিয়ার)। তাদের পূর্বকালের কার্থেজ সম্রাট রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য ও সমরোপকরণপূর্ণ রণতরী পাঠাতেন। সুতরাং উক্ত বিষয় এ সাগরের উভয় তীরের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক উভয়কালেই অত্যন্ত সুপরিচিত।

মুসলমানরা মিশর অধিকার করার পর হজরত উমর আমর ইবনেল আস (রাঃ)-কে লিখে পাঠালেন যে, আমাকে সমুদ্রের কথা জানাও। আমর এর উত্তরে লিখেছিলেন, “সমুদ্র এক বিরাট ব্যাপার, তার উপর যারা ভাসমান হয় তারা যেন কাষ্ঠখণ্ডের উপর কীটতুল্য।” সুতরাং ঐ সময়ে তিনি মুসলমানদেরকে সমুদ্রাভিযানে অনুমতি দেননি। আরবদের মধ্যে প্রায় কেউই অতঃপর সমুদ্রাভিযানে অংশগ্রহণ করেনি অথবা যারা করেছে, তারা হজরত উমরের অনুমতি ব্যতিরেকেই এরূপ দুঃসাহস দেখিয়েছে এবং জানবার পর তজ্জন্য শাস্তিও পেয়েছে। যেমন বাজিলা সরদার আরফাজা ইবনে হারসামা আল-আজদী। ইনি উম্মানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে নৌযুদ্ধেও ব্যাপৃত হয়েছিলেন এবং হজরত উমর এটা জানতে পেরে বিরক্তি প্রকাশ ও তার দায়িত্ব অস্বীকার করেন। সুতরাং অবস্থা এরূপই ছিল। এর পর হজরত মাবিয়ার সময়ে মুসলমানদেরকে সমুদ্রাভিযানে অংশগ্রহণ করতেও ধর্মযুদ্ধে রণতরী ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করেন। এর কারণ এ যে, আরবরা প্রথম দিকে তাদের প্রান্তরীয় অভ্যাসের জন্য এ ব্যাপারে পালনীয় আচার-আচরণ ও নৌ-আরোহণে তেমন কোনো দক্ষতা পোষণ করত না। অথচ তাদের তুলনায় রোমান ও ফিরিঙ্গীরা সামুদ্রিক অবস্থার সাথে পরিচয়, তার মধ্যে প্রতিপালন ও তার যানবাহনে অভ্যস্ত থাকার ফলে সমুদ্রবিদ্যায় ও সমুদ্রাচারে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল।

অতঃপর যখন আরবদের সাম্রাজ্যে স্থায়ী বিস্তৃতি লাভ করল, তখন বহু অনারব জাতি তাদের কর্মচারী ও প্রজায় পরিণত হল। তাদের জন্য প্রত্যেক শিল্পকর্মী নিজ নিজ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় নিয়ে এগিয়ে এল। অনেক জাতিকে তারা সামুদ্রিক প্রয়োজনে নৌকার মাঝি-মাল্লারূপে নিয়োগ করল এবং এভাবে সমুদ্রের সাথে তাদের পরিচয় ও তৎসম্পর্কীয় আচার-আচরণে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেল। তাদের মধ্যেও দক্ষ নাবিকের

www.amarboi.org

জন্ম হল এবং তারা যুদ্ধবিগ্রহে সমুদ্রের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হল। তারা সমুদ্রোপযোগী, নৌকা ও জাহাজ তৈরি করল এবং রণতরী সৈনিকে ও অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ করে তুলল। তারা সশস্ত্র সৈন্য ও যোদ্ধাদের দ্বারা রণতরী পূর্ণ করে সমুদ্র তীরবর্তী বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করল। এ ব্যাপারে তারা সমুদ্র তীরবর্তী ও সীমান্ত এলাকার লোকদেরকেই বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছিল। যেমন সমুদ্রোপকূলের সিরিয়া, আফ্রিকিয়া, মাগরিব ও আন্দালুসের অধিবাসীরা। সম্রাট আব্দুল মালেক আফ্রিকিয়ার শাসক হাস্‌সান ইবনে নুমানকে[১৩৮] তিউনিসে একটি শিল্পাগার গড়ে তুলতে নির্দেশ দিলেন। এর দ্বারা ধর্মযুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য সমুদ্রোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এ প্রকার অভিযানের মধ্যে প্রথম যিয়াদতুল্লাহ্ ইবনে ইব্রাহিম ইবনে আল আগলাব-এর সময়ে প্রধান মুফতী আসাদ ইবনেল ফুরাত[১৩৯] কর্তৃক 'সাকলিয়া' (সিসিলি) বিজয় অন্যতম। এ সময়ে 'কাওসরা' (পোটালারিয়া)ও বিজিত হয়। অথচ ইতিপূর্বে মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সময় মাবিয়া ইবনে হুদাইজ[১৪০] সাকলিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন; কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিজয় লাভ তখন সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত তা ইবনেল আগলাবের সেনাপতি আসাদ ইবনেল ফুরাতের হাতে সম্ভব হয়। এর পর আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যের ও আফ্রিকিয়ার উবাইদী সাম্রাজ্যের সময় তাদের রণতরীগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে গোলযোগ সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তারা পরস্পরের এলাকা আক্রমণ করে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর ধ্বংস সাধন করেছে।

আন্দালুসের উমাইয়া সম্রাট আব্দুর রহমান আন্‌নাসেরের সময় সাম্রাজ্যের রণতরীর সংখ্যা দুইশ বা তার নিকটবর্তী এক সংখ্যায় পৌঁছেছিল। আফ্রিকিয়ার রণতরীর সংখ্যাও অনুরূপ ছিল। আন্দালুসের রণতরীর পরিচালক ছিলেন ইবনে রেমাহিস এবং এদের আগমন-নির্গমনের ঘাঁটি ছিল 'বেজায়া' (পেচিনা) ও 'আল-মারিয়া'। সমগ্র সাম্রাজ্য থেকে রণতরী এসে এ স্থানগুলোতে একত্র হত। যে সকল অঞ্চলে নৌকার ব্যবহার ছিল, তার প্রত্যেকটি থেকে একটি করে রণতরী আসত এবং তা নৌ-বিভাগের পরিচালক ও যুদ্ধ, অস্ত্র ও সৈন্যাদির অধিকারীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত থাকত। এ সকল রণতরীর অন্য এক পরিচালক তাদের পরিচালনার ব্যাপারে বায়ুর গতি অথবা দাঁড়ের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা তত্ত্বাবধান করতেন। তিনি তাদের নোঙ্গর করার ব্যাপারটিও দেখতেন। এভাবে যখন কোনো অভিযানের উদ্দেশ্যে অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সুলতানী প্রয়োজনে সমস্ত রণতরী তাদের নির্দিষ্ট ঘাঁটিতে একত্র হত, তখন সম্রাট তাঁর দলবল, উৎকৃষ্ট সেনানী ও আশ্রিত পোষ্যদের দ্বারা ঐগুলোকে পূর্ণ করে তুলতেন এবং তাঁর সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ আমীরদের মধ্যে একজনকে এগুলোর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করতেন। প্রত্যেকেই উক্ত সর্বাধিনায়কের নেতৃত্বে পরিচালিত হত। অতঃপর সম্রাট যথা

১৩৮. ৮০ হিজরিতে মৃত্যু হয়। শিল্পাগার—মূলে 'দারুস্‌সিনা', এটা হতে ইংরেজি 'আর্সেনাল' শব্দটির উৎপত্তি।

১৩৯. ১৪২-২১৩ (৭৬০-৮১৮ খ্রি:) হি.।

১৪০. ৫২ হিজরিতে মৃত্যু হয়।

www.amarboi.org

উদ্দেশ্যে তাদেরকে বিদায় জানাতেন এবং বিজয় লাভ করে লুণ্ঠিত সম্পদ তাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন।

ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোর সময়ে মুসলমানরা এ সমুদ্রকে তার সকল দিক থেকে অধিকার করে রেখেছিল। তাতে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। খ্রিস্টান জাতিগুলোর পক্ষে তাদের মোকাবিলায় কোনো দিকেই কোনো কিছু করার ছিল না। তারা সকল সময়ে বিজয়ের নিশান উড়িয়ে এর তরঙ্গমালা অতিক্রম করেছে। এর ফলে তাদের বিজয় ও লুণ্ঠনের বহু সুপ্রচলিত কাহিনী গড়ে উঠেছে। তারা তীরভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন এর সমুদয় দ্বীপাঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। যেমন 'মিউরাকা', 'মনোরাকা', 'ইয়াবেসা', 'সারদানিয়া', 'সাকলিয়া', 'কাওসারা', 'মালতা', 'আক্রিতাশ' (ক্রীট), 'কবরস' (সাইপ্রাস) এবং অন্যান্য রোমান ও ফিরিঙ্গী অঞ্চল। আবুল কাসেম আশ্‌শিয়ী[১৪১] ও তাঁর পুত্ররা আল-মাহাদিয়া থেকে তাদের রণতরী পরিচালনা করে 'জানোয়া' দ্বীপ আক্রমণ করতেন এবং বিজয় ও লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলোসহ প্রত্যাবর্তন করতেন। ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের অন্যতম 'দানিয়ার' শাসক মুজাহিদ আল-আমেরী তার রণতরীর সাহায্যে চারশ পাঁচ হিজরিতে (১০১৪/১৫ খ্রিস্টাব্দে) 'সারদানিয়া' জয় করেন। পরবর্তী পর্যায়ে খ্রিস্টানরা পুনরায় তা জয় করে নেয়। ইতিমধ্যে মুসলমানরা এ সাগরের অধিকাংশ এলাকায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। তাদের রণতরীগুলো এর উপর দিয়ে অবিরাম যাতায়াত করত এবং মুসলমান সৈনিকরা এ সকল রণতরীতে আরোহণ করে সিসিলি থেকে তার সম্মুখভাগে অবস্থিত উত্তর তীরভূমির বৃহৎ অঞ্চলগুলোতে অভিযান পরিচালনা করত। তারা ফিরিঙ্গীদের দেশ আক্রমণ করে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করত। যেমন সিসিলির সম্রাট বনি আল হুসাইনদের সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারা উক্ত দ্বীপাঞ্চলে উবাইদী মতাদর্শ প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। তাদের এ প্রকার তৎপরতার ফলে খ্রিস্টান জাতিগুলো তাদের রণতরীসহ সমুদ্রের উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে সরে যায় এবং ফিরিঙ্গী, স্লাভ অধ্যুষিত তীরভূমি ও রোমান অধিকৃত দ্বীপাঞ্চলের বাইরে তারা আসত না। কারণ মুসলমানদের রণতরীগুলো তাদের উপর সিংহবিক্রমে আপতিত হত। তদুপরি মুসলমানরা উক্ত সাগরের উন্মুক্ত জলভাগকে তাদের রণসম্ভার ও সংখ্যার দ্বারা প্রায় পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। তারা যুদ্ধ ও শান্তি উভয় উদ্দেশ্যে তার যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতো। এর ফলেই এ সমুদ্রভাগে খ্রিস্টানদের কোনো রণতরীর বিচরণ সক্ষম হয়ে উঠত না।

অতঃপর যখন উবাইদী ও উমাইয়া সাম্রাজ্যে শৈথিল্য ও ক্ষয় দেখা দিল এবং তাদের শক্তি-হ্রাস পেল তখন খ্রিস্টানরা হস্ত প্রসারিত করে পূর্বদিগন্তস্থ দ্বীপগুলো, যেমন—সিসিলি, ক্রীট, মালটা প্রভৃতি অধিকার করতে সমর্থ হল। এর পর তারা অনুরূপ স্বভাব নিয়ে সিরিয়া উপকূলের দিকে অগ্রসর হল এবং 'তারাবলিস' (ত্রিপলী), 'আস্কালন', সোর (তাইর) ও 'উক্কা' অধিকার করল। এভাবে সমগ্র সিরিয়া উপকূলীয় সীমান্ত তাদের হস্তগত হল। তারা 'বয়তুল মুকাদ্দস' অধিকার করল এবং সেখানে তারা ধর্মপ্রচার ও

১৪১. আল কায়েম, ২য় ফাতেমী সম্রাট, ৯৩৪-৪৬ খ্রি:, অভিযান ৯৩৪/৩৫ খ্রি:।

www.amarboi.org

উপাসনার জন্য গির্জা স্থাপন করল। তারা বনি খয়রুনের অধিকৃত 'তারাবলিস' (ত্রিপলীটানিয়া), কাবেস (গেবস) ও 'সাফাকেশ' (স্ফক্স) দখল করল এবং তাদের উপর মাথট ধার্য করল। এর পর তারা বুলুক্কীন ইবনে ঘিরীর বংশধরদের নিকট থেকে উবাইদী সম্রাটদের রাজধানী আলমাহদিয়া অধিকার করে নিল। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে সমুদ্রের এ অঞ্চলে তাদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। মিশর ও সিরিয়া সাম্রাজ্যের রণতরীগুলোর অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে এক সময়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বর্তমানে তাদের সাহায্য গ্রহণ করার মত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ইতিপূর্বে উবাইদী সাম্রাজ্যের আমলে তারা এরই সাহায্যে সীমা অতিক্রম করেছিল, যেমন তাদের ইতিহাসে সুপরিচিত হয়ে রয়েছে। সুতরাং এ পদমর্যাদার এখানেই ইতি। শুধু আফ্রিকিয়া ও মাগরিব এ ব্যাপারে এখনো বিশিষ্টতার দাবিদার। সমুদ্রের পশ্চিম দিক বর্তমানকালেও রণতরীতে পূর্ণ ও তাদের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ঐ অঞ্চলে কোন শত্রুর অনুপ্রবেশ এখনো সম্ভব হয়নি এবং তাদের সেই শক্তিও নেই। বর্তমানে উক্ত অঞ্চলে রণতরীর পরিচালক লামতুনা সাম্রাজ্যের অধীন 'বাদেস' দ্বীপের নেতৃবৃন্দের অন্যতম বনি মায়মুন। তাদের হাত থেকেই তা তাদের সম্মতি ও আনুগত্যের কল্যাণে সম্রাট আবদুল মোমেন[১৪২] গ্রহণ করেছেন। উভয় তীরের রণতরীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় একশতে পৌঁছেছে।

হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন আল-মোহেদ সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করল এবং সমুদ্রের উভয় তীরের উপর আধিপত্য স্থাপিত হল, তখন তারা নৌ-বিভাগের এ ব্যাপারটি, যতদূর জানা যায় সর্ববৃহৎ ও সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। তখন তাদের রণতরীর পরিচালক ছিল আহমদ সাকলী। এ ব্যক্তি মূলত সার্ভিকাশ গোত্রের শাখা সগদীয়ানের অন্তর্ভুক্ত এবং 'জেব্রা' দ্বীপে বাস করত। খ্রিস্টানরা তাকে সেখান থেকে বন্দী করে আনে এবং তাদের মধ্যেই সে প্রতিপালিত হয়। তাদের হাত থেকে তাকে সিসিলির অধিপতি মুক্ত করেন ও আশ্রয় দেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যু হলে তৎপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করার পর কোনো কারণে তিনি আহমদের উপর বিরক্ত হন। এর ফলে আহমদ তার প্রাণের ভয়ে তিউনিসে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে বনি আবদুল মোমেনের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করেন। পরে সেখান থেকে মারাকাশে পৌঁছান। সেখানে সম্রাট ইউসুফ ইবনে আবদুল মোমেন তাকে অত্যন্ত সম্মান ও হৃদ্যতার সাথে গ্রহণ করেন। তাকে বহু পুরস্কার দিয়ে তাঁর রণতরীর অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করেন। ইনি অতঃপর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ পরিচালনায় অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তাঁর কীর্তি, কাহিনী ও বিচিত্র শৌর্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সময়ে মুসলমানদের রণতরী সংখ্যায় ও নতুনত্বে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা ইতিপূর্বে বা অতঃপর আর আমরা জানতে পারিনি।

যখন মিশর ও সিরিয়ার অধিপতি সালাহউদ্দীন ইউসুফ ইবনে আইউব খ্রিস্টানদের অধীনতা থেকে সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চল উদ্ধারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হলেন এবং বয়তুল মুকাদ্দসের পবিত্রতা বিধানের চেষ্টা আরম্ভ করলেন, তখন বয়তুল মুকাদ্দসের দিকের নিকট সমুদ্র থেকে সমস্ত রণতরী এসে খ্রিস্টানদেরকে সাহায্য করতে লাগল। কারণ

১৪২. রাজত্বকাল ১১৬৩-৮৪ খ্রি:।

www.amarboi.org

বয়তুল মুকাদ্দস তখন তাদের অধীনে। সুতরাং তারা খ্রিস্টানদেরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে সাহায্য করল। আলেকজান্দ্রিয়ার রণতরীগুলো তাদের সাথে এঁটে উঠতে পারল না। কারণ পূর্ব থেকেই তারা সমুদ্রের এ পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। তদুপরি তাদের রণতরীর সংখ্যাও ছিল বেশি এবং মুসলমানরা দীর্ঘকাল ধরে তাদের এ আধিপত্য বিস্তারে কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি, যেমন এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে ইঙ্গিত করেছি। সুতরাং সালাহউদ্দীন তাঁর সমসাময়িক মাগরিবের আল-মোহেদ সম্রাট আবু ইয়াকুব আল-মনসুরের নিকট দূত পাঠালেন। 'শায়জারে'র বনি মুনকিয-এর আবদুল করিম ইবনে মুনকিয[১৪৩] এ দূত হিসাবে সেখানে গিয়েছিলেন। সালাহউদ্দীন 'শায়জার' অধিকার করলেও বনি মুনকিযের হাতেই তার শাসনভার ন্যস্ত করে রেখেছিলেন। যাহোক আবদুল করিম তাঁর পক্ষ থেকে মাগরিবের সম্রাটের নিকট রণতরীর আবেদন নিয়ে পৌঁছলেন। যাতে উক্ত অঞ্চলের রণতরীগুলো এসে সিরিয়া উপকূলে খ্রিস্টানদের রসদ সরবরাহে রত আগন্তুক রণতরীগুলোকে বাধা প্রদান করতে পারে। এ সম্পর্কে তিনি একটি পত্রও বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ পত্রটি রচনা করেছিলেন তালফাজেল আলবায়সানী[১৪৪] এর প্রারম্ভে ছিল, আল্লাহ্ আমাদের সর্দারের জন্য সফলতা ও সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করুন। আল-এমাদুল ইস্পাহানী[১৪৫] তার গ্রন্থ 'ফতলুল কুদসী'তে একে এভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল-মনসুর এ দূতদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ তাঁকে 'আমীরুল মোমেনীন' সম্বোধন না করায় তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য এ বিরক্তি তিনি প্রকাশ করেননি এবং দূতদেরকে যথারীতি হৃদ্যতা ও সম্মানের সাথে গ্রহণ করে প্রেরকের নিকট ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রয়োজনে তিনি সাড়া দেননি। যাহোক এ পত্রে এ কথার প্রমাণ বিদ্যমান যে, তৎকালে মাগরিব পূর্বাঞ্চলে খ্রিস্টান রণতরীর শক্তির ন্যায় অনুরূপ শক্তিতে বিশিষ্ট ছিল এবং মিশর ও সিরিয়া সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এর পূর্বে বা পরে রণতরী শক্তির ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

আবু ইয়াকুব আল-মনসুরের মৃত্যুর পর আল-মোহেদ সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ল এবং জাল্লাফীরা আন্দালুসের অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করে বসল। তারা মুসলমানদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে বিতাড়িত করল। ফলে তারা রোম সমুদ্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় দ্বীপগুলো অধিকার করে আবার সমুদ্রাঙ্গনে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করল। তাদের প্রতাপ ও সেই অনুপাতে রণতরীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। এক্ষেত্রে মুসলমানদের শক্তি আবার খ্রিস্টানদের সমতুল্য অবস্থায় ফিরে এল। যেমন মাগরিবের জানাতী সম্রাট আবুল হাসানের[১৪৬] সময় তাঁর ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রণতরী সংখ্যায় ও সাজসজ্জায় খ্রিস্টানদের রণতরীর সমতুল্য ছিল।

অতঃপর রণতরীর এ শক্তি থেকে মুসলমানদের অবস্থা মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ সাম্রাজ্যের দুর্বলতার জন্য তারা সমুদ্রের বিচরণ অভ্যাস ভুলে যাচ্ছিল। মাগরিবের

---

১৪৩. দূতের যথার্থ নাম সম্ভবত আবুল হারিস আবদুর রহমান ইবনে মুহম্মদ ইবনে মুনকিয, ৫২৩-৬০০ (১১২৯-১২০৩ খ্রি:) হি.। উক্ত ঘটনা ৫৮৫ (১১৯০ খ্রি:) হিজরিতে ঘটে। (রোজেনথালে, ২য় বালাম, ৪৪ পৃ. দ্র.)।

১৪৪. আবদুর রহমান ইবনে আলী, ৫২৬-৯৬ (১১৩৫-১২০০ খ্রি:) হি.।

১৪৫. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ, ৫১৯-৯৭ (১১২৫-১২০১ খ্রি:) হি.।

১৪৬. শাসনকাল ১৩৩১-৫১ খ্রি:।

www.amarboi.org

প্রান্তরীয় জীবনের প্রভাব এবং আন্দালুসীয় জীবনবোধ থেকে বিচ্যুতিও এর কারণ। খ্রিস্টানরা আবার সমুদ্রে তাদের পূর্বের আদর্শ নিয়ে ফিরে এল; তারা তাতে বিচরণ, সার্বক্ষণিক তৎপরতা ও বিচিত্র অবস্থার অভিজ্ঞতা আবার কাজে লাগাল। তারা তার অধিকাংশ অঞ্চলের জাতিগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের নৌ-শক্তির নিয়ন্ত্রণ লাভ করল। মুসলমানগণ আবার সমুদ্রের বিষয়ে অপরিচিতের স্থান গ্রহণ করল। শুধু সমুদ্র তীরের কিছু লোক এখনো এ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি। তারা এখনো সমুদ্রে নৌচালনার ব্যাপারে আগ্রহী। যদি তারা অধিক অঞ্চল ও সাহায্যকারীর সহায়তা লাভ করত কিংবা কোনো সাম্রাজ্যশক্তি যদি তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত, তা হলে তাদের এ আগ্রহ হয়ত বা পথ খুঁজে বের করতে পারত। বর্তমানকালে নৌ-বিভাগের এ পদ এখনো পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বিদ্যমান। এখনো সেখানে রণতরীর ব্যবহার তার নির্মাণ ও আরোহণের প্রক্রিয়া সুপরিচিত। কারণ কখন এ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলো থেকে প্রয়োজনের আহ্বান আসবে, তার নিশ্চয়তা নেই। যদি আসে, তা হলে মুসলমানরা আবার অধর্ম ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সমুদ্রের বুকে পাল তুলবে। মাগরিবে এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী বহু গ্রন্থ-পুস্তকে ছড়িয়ে আছে যে, মুসলমানরা আবার খ্রিস্টানদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সমুদ্রের পরপারের দেশগুলো জয় করবে। এটা অবশ্যই ঘটবে এ সামুদ্রিক রণতরীর সহায়তায়। 'আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।'[১৪৭] তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম নির্ভরস্থল।

---

১৪৭. কোরান ৩, ৬৮।

www.amarboi.org

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[বিভিন্ন সাম্রাজ্যে অসি ও মসী বিভাগের মর্যাদার পার্থক্য]

জেনে রাখুন, অসি এবং মসী উভয়টিই সাম্রাজ্যাধিপতির হাতিয়ার স্বরূপ। তিনি এগুলোর দ্বারা তার তৎপরতায় সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে, যখন তার অধিপতিরা ক্ষমতা বিন্যস্ত করতে থাকেন, তখন মসী অপেক্ষা অসির প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক হয়ে থাকে। কারণ মসী তথা লেখনী এ অবস্থায় শুধুই সেবক, সুলতানী নির্দেশের পথে বিচরণকারী এবং তরবারী তাঁর কর্মতৎপরতার অংশীদার। সাম্রাজ্যের শেষের দিকেও এমনি অবস্থা। যখন গোত্রপ্রীতির শক্তি, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি হ্রাস পায় এবং তার অধিকারীদের সংখ্যা, যেমন পূর্বে বলেছি, অবক্ষয়ের দরুন কমতে থাকে, তখন আবার তরবারীর প্রয়োজন পড়ে। সাম্রাজ্যাধিপতি তখন তরবারীর সাহায্যে নিজের শক্তি প্রকাশ করতে এবং অগ্রসরমান বিপদকে প্রতিরোধ করতে অসি-ধারীদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যেমন সাম্রাজ্যের পত্তনকালে দেখা গিয়েছিল, এ দিক থেকে সাম্রাজ্যের দুই ধারেই অসি মসী অপেক্ষা অধিক সুবিধা ভোগ করে। এ সময়ে অসিধারীদের জাঁকজমক ব্যাপকতর, প্রাচুর্য সমৃদ্ধতর ও সুবিধা ভোগ উন্নততর হয়ে দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে সম্রাট অসির কবল থেকে অনেকাংশে মুক্তিলাভ করেন। কারণ তখন সাম্রাজ্যের পত্তন শেষ হয়েছে। সুতরাং তখন তাঁর উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যের ফসল ভোগের দিকে ধাবিত; রাজকোষের বিন্যাস, অন্যান্য সাম্রাজ্যের সাথে জাঁকজমকে প্রতিযোগিতা এবং বিধি-নিষেধের সুপ্রতিষ্ঠাই তাঁর কাম্য। এ ক্ষেত্রে একমাত্র কলমই তাঁকে সাহায্য করতে পারে। সুতরাং কলমের প্রয়োজনীয়তা তখন বৃদ্ধি পায় এবং তরোয়াল তার খাপের সুখশয্যায় পরিত্যক্ত হয়। যতক্ষণ না কোনো বিপদ এসে উপস্থিত হয় কিংবা কোন ফাঁক পূরণের প্রয়োজন দেখা দেয়, ততক্ষণ তার দিকে কেউ ফিরে তাকায় না। এ সময়ে মসিধারীদের প্রয়োজনীয়তা তাদের জাঁকজমককে বিপুলতর, মর্যাদাকে উন্নততর, প্রাচুর্য ও সচ্ছলতাকে ব্যাপকতর করে তোলে। তারা সম্রাটের সাহচর্যে নিকটতর, তাঁর সাথে উঠা-বসায় নিস্তর এবং তাঁর গোপন পরামর্শে অন্তরঙ্গতর হয়ে দেখা দেয়। কারণ তখন সম্রাটের হাতিয়ার একমাত্র কলম, তার সাহায্যেই তিনি সাম্রাজ্যের ফলভোগ করতে উদ্যোগী হন। তখন তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের বিচিত্র বিচক্ষণতায় তার বিভিন্ন দিকের সংস্কার নিষ্ঠায় ও তার জাঁকজমকের সুপ্রতিষ্ঠায়

www.amarboi.org

একে নিয়োজিত করেন। এ সময়ে উজিরগণ ও তরবারীর অধিকারীরা কিছুটা নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েন। তারা সম্রাটের অন্তরঙ্গ জগতের সংবাদ থেকে দূরে এবং তাঁর বিচিত্র মনোভাব সম্পর্কে সতর্ক অবস্থায় নিজেদেরকে রক্ষা করেন।

সম্ভবত এ অবস্থার কথা বর্ণনা করেই আবু মুসলিম সম্রাট আলমনসূরকে পত্র লিখেছিলেন। মনসুর তাকে আসতে বললে তিনি উত্তরে লিখেন, "অতঃপর পারসিক জ্ঞানীদের উপদেশ থেকে যা স্মরণে আছে তা এই যে, সাধারণ মানুষ যখন শান্ত অবস্থায় থাকে, তখনই উজিরদের সর্বাপেক্ষা দুঃসময়।" এটাই আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে তাঁর নিয়ম। পবিত্র ও উন্নত আল্লাহ্‌ই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।

www.amarboi.org

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজশক্তির নিদর্শন ও শাসন ব্যবস্থার বিশেষ প্রতীক]

জেনে রাখুন, সুলতানের এমন কিছু নিদর্শন ও অবস্থা আছে, যা জাঁকজমক ও আড়ম্বরের তাগিদেই সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এগুলো বিশেষভাবে গ্রহণ করে তিনি প্রজাসাধারণ, অন্তরঙ্গ সভাসদ ও সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় সকলের মধ্যে পৃথকরূপে বিবেচিত হন। আমাদের জ্ঞানমত যতদূর সম্ভব আমরা এগুলোর মধ্যে সুপরিচিত কিছু অংশের বর্ণনা করব। 'প্রত্যেক জ্ঞানী অপেক্ষা তিনি অধিকতর জ্ঞানী।'[১৪৮]

সজ্জা (আলা)

রাজশক্তির নিদর্শনাবলির মধ্যে সাজসজ্জা অন্যতম। পতাকা ও রণধ্বজা উত্তোলন, ঢোলক বাজান এবং ভেঁপু ও শিঙ্গা বাজান এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রাজনীতি সম্পর্কে আরস্তু (এ্যারিস্টটল)-এর প্রতি আরোপিত গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর রহস্য হল রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে সন্ত্রস্ত করা। কারণ ভয়ংকর শব্দাবলি মানুষের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আমার জীবনের শপথ, এটা এমন একটি আবেগপ্রবণ বিষয়, যা যুদ্ধের ময়দানে প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। তা সেই কারণ যা আরস্তু বর্ণনা করেছেন, অবশ্য যদি সত্যই তা তিনি বলে থাকেন, তা হলে তা একাধিক বিবেচনায় অবশ্যই শুদ্ধ। যদিও এর যথার্থ তাৎপর্য হল এই যে, মানবাত্মা সুর ও বাদ্য শুনে নিঃসন্দেহে আনন্দ ও পুলক অনুভব করে। এর ফলে আত্মশক্তি এমন একটা সজীবতা লাভ করে, যদ্দরুন কঠিন ও সহজ বলে মনে হয় এবং উদ্দিষ্টের জন্য মৃত্যুবরণ করতেও দ্বিধা করে না। এ বিষয়টি বাক্‌হীন প্রাণিজগতেও বিদ্যমান। পাঠক, আপনি অবশ্যই জানেন, উট 'হুদী' শুনে উত্তেজিত হয় এবং অশ্ব শিস ও চিৎকারে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এ স্বরগ্রাম যদি সুসমন্বিত হয়, তা হলে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে আরো সক্রিয় হয়ে থাকে; যেমন সঙ্গীত। সঙ্গীত শ্রবণে শ্রোতার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তৎসম্পর্কে পাঠক নিশ্চয় অবগত আছেন। এ কারণেই অনারবগণ রণাঙ্গনে ঢোলক বা শিঙ্গা নয়; বরং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। গায়করা সুলতানকে ঘিরে তাদের বাদ্যযন্ত্রসহ গীত গাইতে থাকে এবং বিচিত্র সুরলহরীর মাধ্যমে বীরদিগকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আরব বেদুইনদের যুদ্ধে দেখেছি, গায়ক সৈন্যব্যূহের সম্মুখে বাদ্য বাজিয়ে কবিতা আবৃত্তি

---

১৪৮. কোরান ১২, ৭৫।

www.amarboi.org

করতে থাকে এবং তার বিষয়ের উত্তেজনায় বীর সৈন্যদের মনোবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তারা রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং একে অপরের অনুসরণ করে বীর্যবত্তা প্রকাশ করে। এরূপ মাগরিবের জানাতী জনগোষ্ঠী; তাদের সৈন্যসারির সম্মুখে কবি এগিয়ে যায় এবং সুরের মাদকতায় এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করে, যাতে সুদৃঢ় পর্বতও বিচলিত হয়ে ওঠে। এমন ব্যক্তিও তখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটে ইতিপূর্বে যে এর কল্পনাও করতে পারত না। এ সঙ্গীতকে তারা 'তাসুকাইত' বলে ডাকে। এর মূল হল তদ্দারা এমন একটি পুলক শিহরণ অনুভূত হয়, যা বীর্যবত্তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। যেমন মদ্যপানে অনুরূপ পুলক ও সঞ্জীবতা দেখা দেয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

পতাকার সংখ্যা, বর্ণ ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করার মধ্যে কিছুটা ভয়ঙ্করত্ব সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। এটা অনেক সময় মানুষের মনোভাবের মধ্যে একটা আগ্রাসনের ভাব সৃষ্টি করে। মানবাত্মা ও তার বহুরূপিত্ব সত্যই অদ্ভুত। 'আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবে সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ।'[১৪৯]

অতঃপর রাজন্যবর্গ ও সাম্রাজ্যসমূহ এ প্রকার নিদর্শন গ্রহণে বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকে অধিক গ্রহণ করে অনেকে অল্প; সাম্রাজ্যের বিস্তার ও ক্ষমতার সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। পতাকার ব্যাপারে বলতে গেলে তা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই যুদ্ধের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সকল জাতিই তা তাদের যুদ্ধবিগ্রহে ও অভিযান পরিচালনায় উত্তোলন করেছে। হজরত মুহম্মদ (সঃ) এবং পরবর্তী খলিফাদের সময়েও তা ছিল। অবশ্য ঢোল ও শিঙ্গা বাজানোর ব্যাপারটি মুসলমানরা তাদের সংঘশক্তির প্রথম দিকে পরিহার করে চলেছে। কারণ তারা তখন রাজশক্তির স্থূলতা ও তার জাঁকজমকের অসারতা থেকে দূরে এবং তার সামগ্রিক অবস্থাকে পরিত্যাগ করার মানসিকতায় অবস্থান করছিল। এর পর যখন খেলাফত রাজশক্তিতে পরিণত হল, তখনই এটা পার্থিব আড়ম্বর ও প্রাচুর্যের আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল। পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলো থেকে পারসিক ও রোমানরা এসে তাদের সাথে মিশ্রিত হল এবং তাদের পোষ্য হিসাবে তাদেরকে আড়ম্বর ও বিলাসব্যাসনের অভ্যাসগুলো সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগল। এর মধ্যে তাদের যা ভালো মনে হল, তারা তা সজ্জা হিসাবে গ্রহণ করল এবং সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় প্রতাপের জন্য তাদের কর্মচারীদিগকেও তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমান্তের শাসক ও সেনাপতিরা, বিশেষভাবে আব্বাসী ও উবাইদী সম্রাটদের সময়ে পতাকা বহনের অনুমতি লাভ করেছিল। তারা কোনো অভিযানে যেতে, সম্রাটের দরবারে কর্তব্য পালনে উপস্থিত হতে কিংবা, নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে তাদের সহচরসহ সাজসজ্জা করেও পতাকা উড়িয়ে যেত। এ ক্ষেত্রে তাদের ও সম্রাটের বাহিনীর মধ্যে পতাকার অল্পাধিক্য ও বর্ণবৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কোনো পার্থক্য ছিল না। যেমন আব্বাসী সম্রাটগণ কালবর্ণের পতাকা ব্যবহার করতেন। বনি উমাইয়া কর্তৃক হাশেম বংশীয়দের হত্যাকাণ্ডের প্রতি শোক প্রকাশের নিমিত্তই পতাকার এ কাল বর্ণ গ্রহণ করা হয়েছিল। এ জন্য তাদেরকে কাল পতাকাধারী বলা হত।

১৪৯. কোরান ১৫, ৮৬; ৩৬, ৮১।

www.amarboi.org

এর পর যখন হাশেমীদের বিষয়টি পৃথক হয়ে গেল এবং আবু তালেবের বংশধররা প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও প্রত্যেক সময়ে আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে আরম্ভ করল, তখন তারা এক্ষেত্রেও আব্বাসীদের বিরোধিতা করে সাদা বর্ণের পতাকা গ্রহণ করল। এজন্য তাদেরকে সাদা পতাকাধারী বলা হত। উবাইদী সম্রাটদের সমস্ত শাসন আমল ধরে এ রং ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্তমানকালেও পূর্বাঞ্চলে আবু তালেবের যে বংশধররা বিদ্রোহ করেছে, যেমন তাবারিস্থানে ও সাআদা'য় শিয়া মতবাদ প্রচারকারীরা অথবা অন্যান্য যারা অভিনব রাফেজী মতবাদের দিকে আহ্বান জানিয়েছে, যেমন কারামতীরা—তারা সকলেই এ সাদা বর্ণবিশিষ্ট পতাকা ব্যবহার করেছে ও করছে।

সম্রাট মামুন তাঁর শাসন আমলে কাল বর্ণের পতাকা ও অন্যান্য প্রতীক পরিবর্তন করে সবুজ বর্ণের পতাকা গ্রহণ করেছিলেন।

পতাকার আধিক্যের ব্যাপারে বলতে গেলে তার কোনো সীমা ছিল না। উবাইদী সম্রাটদের সময় সজ্জার অবস্থা এ ছিল যে, আল আজিজ যখন সিরিয়া বিজয়ে অগ্রসর হন, তখন তাঁর সাথে পাঁচশ পতাকা ও পাঁচশ ভেঁপু গিয়েছিল।

মাগরিবের সিনহাজা ও অন্যান্য গোত্রের বারবার রাজন্যবর্গের ব্যবহৃত পতাকার নির্দিষ্ট কোন রং ছিল না। তারা রেশমের রঙ্গিন জমিনের উপর সোনালী কারুকার্য খচিত পতাকা ব্যবহার করতেন। তাঁরা কর্মচারীদের জন্যও অনুরূপ পতাকা ব্যবহারের অনুমতি অব্যাহত রাখেন। অতঃপর আল-মোহেদ সাম্রাজ্য ও তাদের পরবর্তী জানাতীরা এ সজ্জার ব্যাপারটি ঢোলক ও পতাকাসহ সম্রাটের জন্য সীমিত করে ফেলেন। অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তারা সম্রাটের জন্য একটি বিশেষ বাহিনীর সৃষ্টি করেন, যা তাঁর গমনাগমনে তাঁকে অনুসরণ করত এবং এটাকে 'সাঁকা' বা পশ্চাদ্বাহিনী বলা হত। তারা পতাকার সংখ্যার ব্যাপারে প্রতিটি সাম্রাজ্যের মতাদর্শ অনুযায়ী অল্পাধিকের অধিকারী। তাদের অনেকে সাত সংখ্যার শুভ প্রভাবের ধারণা অনুসারে পতাকার সংখ্যা সাতটি করেছেন, যেমন আল-মোহেদ ও আন্দালুসের বনি আল আহমার সম্রাটরা। আবার অনেকে দশটি ও বিশটি পতাকাও ব্যবহার করেছেন, যেমন জানাতী রাজন্যবর্গ। সম্রাট আবুল হাসানের সময়, যেমন আমরা দেখতে পেয়েছি, ছোট-বড় মিলিয়ে ঢোলকের সংখ্যা একশ ও পতাকার সংখ্যাও একশ হয়েছিল। তারা আঞ্চলিক শাসক, কর্মচারী ও সেনাপতিদেরকে মসীনা সূত্র নির্মিত সাদা কাপড়ের একটি ক্ষুদ্র পতাকা ও একটি ক্ষুদ্র ঢোলক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। কেউ এর অতিরিক্ত কোন কিছু ব্যবহার করতে পারত না।

বর্তমানকালে পূর্বাঞ্চলের তুর্কি সাম্রাজ্যে প্রথমে একটি বৃহদাকার পতাকা ব্যবহৃত হয়। তার শিরোদেশে চুলের একটি বৃহৎ ঝুঁটি বিদ্যমান। তারা একে 'শালিশ' ও 'চিতর' নামকরণ করেছেন।[১৫০] এটা তাদের নিকট সম্রাটের নিদর্শন। এর পর আরো অনেকগুলো পতাকা থাকে, তাকে বলা হয় 'সানাজেক'। এর একবচন 'সঞ্জক'; তাদের ভাষায় এর অর্থ পতাকা। ঢোলকের ক্ষেত্রে তারা আধিক্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং

---

১৫০. রোজেনথালে এর পর—"এটা সাধারণ সৈন্যদল ব্যবহার করে। এর সম্রাটের জন্য একটি পতাকা বিদ্যমান, যাকে 'ইসবাহ' বা 'সাতফাহ' বলা হয়।"

www.amarboi.org

এর সমষ্টিকে বলেন 'কাওসাত'। তারা প্রত্যেক আমীর ও সেনাপতিকে এগুলোর মধ্যে যা ইচ্ছে গ্রহণ করতে অনুমতি দেন। শুধু 'চিতর' ছাড়া; তা সম্রাটের জন্য নির্দিষ্ট।

বর্তমানে আন্দালুসের ফিরিঙ্গী জাতির অন্তর্ভুক্ত জাল্লাকীরা খুব অল্প পতাকা ব্যবহার করে। তাদের পতাকা খুব উর্ধ্বে উত্তোলন করা হয়। এর সাথে তারা তানপুরা জাতীয় তারের বাদ্য ও ভেঁপু জাতীয় বংশীধ্বনি ব্যবহার করে। তারা সঙ্গীতের নিয়ম ও ধারা অনুসরণ করে এগুলোসহ রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়। তাদের পশ্চাদ্বর্তী অন্যান্য অনারব জাতিগুলো সম্পর্কেও প্রায় অনুরূপ তথ্যাদি আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে। "এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। অবশ্যই এগুলোর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন বিদ্যমান।"[১৫১]

সিংহাসন (সরির)

সিংহাসন, বেদী, কৌচ, কেদারা প্রভৃতি কাষ্ঠনির্মিত ও সুসজ্জিত আসন, যাতে সম্রাটগণ সোজা হয়ে অথবা হেলান দিয়ে উপবেশন করেন। এটা দরবারের অন্যান্য আসন অপেক্ষা উচ্চস্থানে অবস্থিত থাকে, যেন অন্যান্যদের সাথে সমান না হয়ে পড়ে। প্রাক্-ইসলাম যুগেই এটা সম্রাটদের নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হয় এবং অনারব সাম্রাজ্যগুলোতে ব্যবহৃত হতে থাকে। কখনো তারা স্বর্ণনির্মিত সিংহাসনেও উপবেশন করেছে। হজরত সুলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ)-এর হাতির দাঁতের স্বর্ণমণ্ডিত কেদারা ও সিংহাসন ছিল। অবশ্য যে কোনো সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও বিলাসব্যসনের যুগেই এরূপ হয়ে থাকে এবং জাঁকজমকের অবস্থাই এই, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। কিন্তু সম্রাজ্যের প্রথম দিকে প্রান্তরীয় জীবনবোধের প্রাধান্য থাকায় এর প্রতি কোনোপ্রকার আগ্রহ জন্মায় না।

ইসলামী সাম্রাজ্যে সর্বপ্রথম মাবিয়া এ সংহাসনের প্রবর্তন করেন। তিনি মানুষের নিকট এর অনুমতি চাইতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি বেশ মোটা হয়ে গেছি।" সুতরাং তারা তাঁকে অনুমতি দিয়েছিল। তিনি সিংহাসন স্থাপন করায় পরবর্তী ইসলামী রাজন্যবর্গ তাঁকে অনুসরণ করেন এবং এটা জাঁকজমকের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ইতিপূর্বে আমর ইবনেল আসও মিশরে তাঁর প্রাসাদে আরব বেদুইনদের সাথে এক সমতলে মাটিতে উপবেশন করতেন। এ অবস্থায় 'আল-মাকুকাস' তাঁর সাথে প্রাসাদে সাক্ষাৎ করতে আসতেন এবং তার পশ্চাতে লোকজন একটি স্বর্ণনির্মিত সিংহাসন বহন করে এনে সেই প্রাসাদে বসার জন্য পেতে দিত। মাকুকাস আমর ইবনেল আসের সম্মুখেই তাতে উপবেশন করতেন। অবশ্য এতে আরবরা কিছুই মনে করত না। একে ত মাকুকাসের রাজশক্তিসুলভ আচার-আচরণে হস্তক্ষেপ না করার চুক্তি হয়েছিল; তদুপরি আরবরা রাজশক্তির এ আড়ম্বরকে একান্ত হেয় মনে করত। কিন্তু এর পরে আব্বাসী ও উবাহদী সম্রাটগণসহ পূর্বে পশ্চিমের সকল ইসলামী সাম্রাজ্যে এমন সিংহাসন, বেদী ও কৌচ দেখা দিল, যা পারস্য ও রোমান সম্রাটরাও ধারণায় আনতে পারেননি। 'আল্লাহ্' দিন-রাত্রির পরিবর্তন করে থাকেন।[১৫২]

---

১৫১. কোরান ৩০, ২২।

১৫২. তুল, কোরান ২৪, ৪৪।

www.amarboi.org

টাকশাল (সিক্কা)

এটা মানুষের মধ্যে প্রচলিত দিনার ও দিরহামে মোহরাঙ্কিত করার প্রক্রিয়া। এ মোহর বা ছাপের জন্য এমন একটি লোহার ছাঁচ ব্যবহার করা হয়, যাতে কোনো নকশা বা কথা বিপরীতভাবে বিদ্যমান এবং তার দ্বারা দিনার ও দিরহামের উপর ছাপ দেয়া হয়। এর ফলে তাদের উপরিভাগে উক্ত নকশাটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এর পূর্বে একাধিকবার ঝালাই করে মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা হয়। এভাবে মুদ্রারূপে ব্যবহৃত দিনার দিরহামের পরিমাণ সঠিক ও সুনির্দিষ্ট হলে, এর সংখ্যার অনুপাত বিনিময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে; অন্যথায় অনির্দিষ্ট পরিমাণের মুদ্রা লেনদেনে ব্যবহারের জন্য ওজন করে নিতে হয়।

'সিক্কা' শব্দটি প্রথমে ছাঁচ অর্থে ব্যবহৃত হত এবং তা এ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য লোহার দ্বারা তৈরি যন্ত্র বিশেষ। পরে এ শব্দটি দিনার ও দিরহামের উপর অঙ্কিত ছাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পুনরায় সিক্কা অর্থে এ ছাপ তথা মুদ্রার কার্যপরিচালনা এবং তার প্রয়োজন ও শর্তাদি পূরণের তত্ত্বাবধানকে বোঝাতে থাকে। এটাই বস্তুত মুদ্রা সম্পর্কীয় দায়িত্ব বা পদ এবং পরে এটা এ পদমর্যাদা অর্থে সমস্ত সাম্রাজ্যে প্রচলিত হয়েছে। এটা রাজশক্তির জন্য একটি অতীব প্রয়োজনীয় দায়িত্ব। কারণ এর দ্বারাই মানুষের বিনিময় মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত মুদ্রার বিশুদ্ধতা এবং অবিশুদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। এ উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তাদের উপরিভাগে শাসকের পরিচিত নকশা অঙ্কিত করে দেয়া হয়। অনারব সম্রাটরা এ মুদ্রার জন্য নির্দিষ্ট নকশা চিত্র ব্যবহার করতেন। যেমন সংশ্লিষ্ট আমলের শাসকের চিত্র, কোন দুর্গের চিত্র, কোন প্রাণী, শিল্পকর্ম কিংবা অন্য কিছুর চিত্র। আরবরা অনুরূপভাবেই রাজশক্তির শেষ পর্যায় পর্যন্ত মুদ্রা তৈরির কাজ চালিয়ে গেছে।

ইসলামের আবির্ভাবের পর ধর্মীয় সারল্য ও আরবদের প্রান্তরীয় জীবনবোধের জন্য এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি। তারা সোনা-রূপা ওজন করে বিনিময়ের কাজ চালাত। পারস্যের দিনার ও দিরহাম তাদের সম্মুখে ছিল; তাও তারা ওজনের মাধ্যমে বিনিময়ে ব্যবহার করত এবং একে অপরের নিকট থেকে গ্রহণ করত। সুতরাং রাজশক্তি এর প্রতি দৃষ্টি না দেয়ায় এগুলো ক্রমশ অবিশুদ্ধ হয়ে পড়ে। সাইদ ইবনে মুসাইয়েব ও আবু যযিনাদ[১৫৩] বর্ণনা মতে সম্রাট আবদুল মালেক আল হাজ্জাজকে দিরহাম তৈরি এবং বিশুদ্ধ মুদ্রা অবিশুদ্ধ মুদ্রা থেকে পৃথক করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এটা চুয়াত্তর হিজরি (৬৯৩/৯৪ খ্রি:)-তে অনুষ্ঠিত হয়। আল-মাদায়েনীর[১৫৪] মতে পঁচাত্তর হিজরিতে এবং ছিয়াত্তর হিজরিতে সমস্ত অঞ্চলে তা প্রচলনের নির্দেশ দেন। তখন এ সকল দিরহামের উপর লেখা ছিল, 'আল্লাহু আহাদ আল্লাহুস্ সামাদ'[১৫৫] (আল্লাহ্ এক আল্লাহ অভাবশূন্য)।

অতঃপর ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালেকের সময় ইবনে হুবাইরা ইরাকের শাসক নিযুক্ত হয়ে তার উন্নতি বিধান করেন। তাঁর পর খালেদ আল কসরী টাকশালের উন্নয়নে

---

১৫৩. আবদুল্লাহ ইবনে দাকোয়ান, মৃত্যু ১৩০-৩২ (৭৪৮-৫০ খ্রি:) হি.। সাইদ—১২১ নং টীকা দ্র.।

১৫৪. আলী ইবনে মুহম্মদ ১৩২-২২৫ (৭৫০-৮৪০ খ্রি:) হি.।

১৫৫. কোরান ১১২, ১-২।

www.amarboi.org

উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালান এবং তাঁর পরে ইউসুফ ইবনে উমরের হাতে এর উন্নতি সাধিত হয়। বলা হয় যে, সর্বপ্রথম যিনি ইরাকে দিনার ও দিরহাম তৈরি করেন, তিনি হলেন মুসয়েব ইবনে যুবাইর। ইনি সত্তর হিজরিতে, তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ্, যিনি হেজাজ অধিকার করেছিলেন, তাঁর আদেশে এ কার্য সম্পাদন করেন। এ মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় 'বরকতুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র দয়া) এবং অন্য পৃষ্ঠায় ছিল 'ইসমুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র নাম)। এর এক বছর পরেই হাজ্জাজ তার পরিবর্তন সাধন করে পৃষ্ঠায় নিজের নাম অঙ্কিত করেন এবং হজরত উমরের সময়ে তার যে পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল, তা প্রবর্তন করেন।

এটা এই যে, ইসলামের প্রথম দিকে দিরহামের ওজন ছিল ছয় 'দনক' এবং এক 'মিকাল' এক সমস্ত সাতভাগের তিন দিরহামের হত। এর ফলে দশ দিরহাম সাত মিসকালের সমান ছিল। এর কারণ এ যে, পারস্য সাম্রাজ্যের সময় দিরহামের ওজন বিভিন্ন ধরনের ছিল। তারা মিসকালের ওজনে বিশ 'কিরাত', বার কিরাত ও দশ কিরাতের হত। অতঃপর জাকাতের ব্যাপারে তার পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিলে মধ্যমটি অর্থাৎ বার কিরাত গ্রহণ করা হয়। এর ফলে এক মিসকাল এক সমস্ত সাতভাগের তিন দিরহাম হয়ে দাঁড়ায়। বলা হয় যে তার মধ্যে একটির নাম ছিল 'বগলী', তা আট 'দনক' হত, 'তবরী' নামক অন্য একটি চার দনক এবং 'মাগরিবী' আট দনক ও 'ইয়ামনী' ছয় দনকের ছিল। হজরত উমর এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত দিরহামগুলো খুঁজে বের করতে নির্দেশ দেন। ফলে বগলী ও তবরী মিলিয়ে বার দনক হয় এবং এর অর্ধেক ছয় দনকের দিরহাম প্রচলন করা হয়। এর সাথে সাত ভাগের তিন দিরহাম যোগ করলে এক মিসকাল এবং মিসকাল থেকে দশ ভাগের তিন কমালে এক দিরহাম হয়। সম্রাট আবদুল মালেক যখন মানুষের লেনদেনে ব্যবহৃত মুদ্রা দুটির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তাদেরকে নতুন করে তৈরি করলেন তখন দিরহামের ওজন হজরত উমর (রাঃ)-র সময়ে নির্ধারিত পরিমাণে প্রচলিত হল। তিনি লোহার ছাঁচ তৈরি করিয়ে তাতে শব্দের নকশা কাটালেন, চিত্রের নয়। কারণ আরবদের নিকট বাক্য ও তার অলংকার সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয় ও বোধগম্য ছিল। তদুপরি ধর্মীয় বিধান চিত্রাদি সম্পর্কে নিষেধ করত। এটা এভাবে সম্পন্ন হবার পর সকল সময়ে মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়ে রইল। এ সকল দিনার ও দিরহামের আকৃতি ছিল গোল এবং এদের প্রান্ত ভাগের সীমা ব্যাপীয়া গোল রেখা থাকত। এদের এক পৃষ্ঠায় 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ও 'আলহামদু লিল্লাহ্'র নিয়ম অনুসারে আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং হজরত মুহম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশের উপর দরুদ লিখা থাকত। অন্য পৃষ্ঠায় তারিখ ও খলিফার নাম থাকত। আব্বাসী, উবাইদী ও উমাইয়াদের সাম্রাজ্যকালে এ ধারাই প্রচলিত ছিল।

সিনহাজারা একেবারে শেষের দিকে এসে মুদ্রার প্রচলন করে। 'বেজা'র শাসক মনসুর এর প্রবর্তন করেন। ইবনে হাম্মাদ[১৫৬] তাঁর ইতিহাসে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটলে আল-মেহেদী তাদের যে সকল প্রথার প্রবর্তন করেন, তন্মধ্যে একটি হল চতুষ্কোণ দিরহামের প্রচলন। দিনারের গোলাকৃতির

১৫৬. মুহম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাম্মাদ ৬১৭ (১২২০ খ্রি:) হিজরির দিকে গ্রন্থটি লিখেন।

www.amarboi.org

মধ্যভাগে একটি চতুষ্কোণ রেখা অঙ্কিত করে তাতেও পূর্ববৎ আল্লাহ্‌র একত্ব ও প্রশংসা লিপিবদ্ধ করা হত এবং অন্য পৃষ্ঠায় বর্তমান শাসকের নাম ও তার পরবর্তী শাসকদের নাম সারিবদ্ধভাবে লেখা থাকত। আল-মোহেদ সম্রাটরা এরূপই করেছেন এবং বর্তমানকালে তাদের মুদ্রার আকৃতি অনুরূপভাবে বিদ্যমান। আল-মেহেদী সম্পর্কে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে যে সকল কথা বলা হত, তন্মধ্যে একটি এ ছিল যে, তিনি চতুষ্কোণ দিরহাম প্রবর্তন করবেন। ভবিষ্যৎ ঘটনা বর্ণনাকারীরাই তাঁকে এই বিশেষণে বিশেষিত করতে এবং তাঁর আগমনের পূর্বেই যাদুকররা তাঁর সাম্রাজ্যের সংবাদ দিয়েছিল।

বর্তমানকালে পূর্বাঞ্চলীয়দের মুদ্রার ওজন নির্ধারিত নেই। তারা দিনার ও দিরহাম ওজন করে বিনিময়ে ব্যবহার করে থাকে এবং এটা নির্ধারিত ওজনের ধারা অনুসরণ করে এত মুদ্রার পরিবর্তে এত মুদ্রা—এ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তারা মুদ্রার পৃষ্ঠায় মাগরিববাসীদের মতো আল্লাহ্‌র নাম, প্রশংসা ও সম্রাটের নাম অঙ্কিত করেননি।[১৫৭] এটা পরম পরাক্রান্ত ও চরম জ্ঞাতার নির্ধারণ।[১৫৮]

আমরা ধর্মীয় বিধান অনুসারে দিনার ও দিরহামের যথার্থ স্বরূপ এবং তাদের ওজনের তাৎপর্য বর্ণনা করে মুদ্রা সম্পর্কীয় আমাদের এ আলোচনার ইতি টানব।

ধর্মীয় বিধান অনুসারে দিনার ও দিরহামের ওজন

এটা এ যে, দিনার ও দিরহাম দুটি মুদ্রা আকৃতি ও ওজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এদের এ বৈচিত্র্য পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। ধর্মীয় বিধানে এদের সম্পর্কে যেমন আলোচনা এসেছে তেমনি এদের সাথে সম্পর্কিত জাকাত, বিবাহ, শাস্তি প্রভৃতিতে বিধি-নিষেধও রয়েছে। সুতরাং ধর্মীয় বিধানে এদের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান, যার উপর ভিত্তি করে উপরোক্ত বিষয়াদির বিধি-নিষেধ প্রচলিত হবে এবং ধর্মীয় বিধান বহির্ভূতগুলো এ ক্ষেত্রে পরিত্যাক্ত হবে।

জেনে রাখুন, ইসলামের প্রথম দিক থেকেই, সাহাবী ও তাবেয়ীদের সময়ে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী দিরহামের ওজন হল তার দশটি সাত মিসকাল সোনার সমান। উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমতুল্য। এদিক থেকে তা এক দিনারের দশভাগের সাত ভাগ। এক মিসকাল স্বর্ণের ওজন হল বাহাত্তরটি যবের দানার সমান এবং যে দিরহাম এর দশভাগের সাত ভাগ, তা পঞ্চাশ সমস্ত পাঁচ ভাগের দুটি দানার সমতুল্য। এ সকল ওজনের সব কয়টিই সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত। মূর্খতার যুগে তাদের মধ্যে প্রচলিত দিরহাম বিভিন্ন প্রকার ছিল। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালো 'তবরী', তা চার দনকের সমান; 'বগলী', তা আট দনকের সমান এবং ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত দিরহাম এ দুটির মধ্যবর্তী ছয় দনক। জাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে একশ বগলী এবং একশ তবরী দিরহামের মাঝখানে পাঁচ দিরহাম নির্ধারিত হত।

১৫৭. রোজেনথালে 'করেন'।

১৫৮. কোরান ৬, ৯৬; ৩৬, ৩৮; ৪১, ১২।

www.amarboi.org

মানুষের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান যে, নির্ধারণের এ বিষয়টি কি আব্দুল মালেকের সময় থেকে হয়েছে এবং মানুষ পরে এর উপর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এ প্রকার একটি মত আল খেতাম 'মা আলেমুস্‌সুনান[১৫৯] গ্রন্থে এবং আল মাওয়ারদী আল আহকামুস্ সুলতানিয়া' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণ এ মতটি অস্বীকার করেছেন। কারণ এটা মেনে নিয়ে, সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তীকালে ধর্মীয় বিধান অনুসারে নির্ধারিত দিরহামের ওজন অপরিচিত ছিল বলে মনে করতে হয়। অথচ তখন জাকাত, বিবাহ, শাস্তি ও অন্যান্য ব্যাপারে দিরহামের প্রয়োজনীয়তা ছিল, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি।

এ ব্যাপারে যথার্থ বক্তব্য এই যে, ঐ সময়েও দিরহামের ধর্মীয় বিধিসম্মত ওজন সকলের জানা ছিল। কারণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন হত। কিন্তু প্রকাশে এ ওজনের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবহার ছিল না। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিধান অনুসারে তার পরিমাণ ও ওজন দ্বারা প্রচলিত দিনার-দিরহামের বিনিময় ব্যবস্থার সাথে তারা সকলেই পরিচিত ছিলেন। পরে যখন ইসলামের বিস্তৃতি ঘটল এবং সাম্রাজ্য ব্যাপক হয়ে উঠল, তখন অবস্থার চাপেই তাদের ধর্মীয় বিধিসম্মত পরিমাণ ও ওজনকে বাস্তবে রূপ দিয়ে বিনিময়ের অন্তর্গত অসুবিধাকে দূর করবার প্রয়োজন দেখা দিল। সম্রাট আবদুল মালেকের সময় এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল বলেই তিনি তাদের সম্পর্কে জ্ঞাত ধারণা থেকে তাদের পরিমাণ ও ওজনকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা দেন। তিনি এদের উপরিভাগে 'দুটি বিশ্বাসে'র সাক্ষ্যের পরে নিজের নাম ও তারিখের ছাপ অঙ্কিত করেন। মূর্খতার যুগের সকল মুদ্রা বাতিল ঘোষিত হয় এবং তাদেরকে বিশুদ্ধ করে নতুনভাবে মোহরাঙ্কিত করায় ঐগুলোর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এটাই যথার্থ বক্তব্য, যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এর পরবর্তীকালে মানুষের সম্মুখে এ ধর্মীয় বিধিসম্মত মুদ্রার বিরোধিতা করার সুযোগ দেখা দিল এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ইচ্ছা অনুযায়ী চতুর্দিকে দিনার ও দিরহামের রূপ বিচিত্র হয়ে উঠল। মানুষ আবার সেই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ন্যায় ধর্মীয় বিধিসম্মত ওজন ও পরিমাণকে মনে মনে ধারণা করতে আরম্ভ করল। আবার প্রতিটি সাম্রাজ্যের মানুষ তাদের ধারণাগত ধর্মীয় বিধিসম্মত ওজনের দ্বারা প্রচলিত মুদ্রা থেকে ধর্মীয় দায়িত্বাদি নির্বাহের ব্যবস্থা করতে লাগল।

মধ্যম ধরনের বাহাত্তরটি যবের দানার সমান দিনারের ওজন, যা বিশেষজ্ঞরা বর্ণনা করেছেন, তার উপর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ইবনে হজম এর বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, এর ওজন চৌরাশি দানা। বস্তুত এটা কাজী আব্দুল হকের[১৬০] বর্ণনায় তাঁর মত বলে উল্লেখিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এর প্রতিবাদ করেছেন এবং তারা একে ভুল ও ধারণাপ্রসূত বলে মনে করেন। এ মতই সঠিক। 'আল্লাহ্ তাঁর বক্তব্য দ্বারা সত্যকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।'[১৬১]

---

১৫৯. রোজেনথালে 'খাত্তাবী'—হামদ ইবনে মুহম্মদ ৩১৯-৮৮ (৯৩১-৯৮ খ্রি:) হি.।

১৬০. ইবনে আবদুর রহমান আল ইশবিলী ৫১০-৮১ (১১৬-৮৫ খ্রি:) হি.।

১৬১. কোরান ৮, ৭; ১০, ৮২; ৪২, ২৪।

www.amarboi.org

এরূপভাবে পাঠক, জেনে রাখুন যে, ধর্মীয় বিধিসম্মত উকিয়াও মানুষের মধ্যে সুপরিচিত নয়। কারণ যা পরিচিত আছে, তা অঞ্চল অনুসারে বিভিন্ন। কিন্তু ধর্মীয় বিধিসম্মত উকিয়ার মধ্যে ধারণাগত কোনো বিরোধ নেই। 'আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যথার্থ নির্ধারিত করে দিয়েছেন।'[১৬২]

সীলমোহর (খাতম)

এটাও শাসন ব্যবস্থারই একটি অংশ এবং রাজশক্তিরই একটি দায়িত্ব। পত্র ও সনদের উপর মোহরের ছাপ দেয়ার রীতি প্রাক্ ইসলাম যুগেও রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং পরেও আছে। বোখারী ও মুসলিমের হাদিসে প্রমাণ আছে যে, হজরত মুহম্মদ (সঃ) রোম সম্রাটের পত্র লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে বলা হয়েছিল, অনারব রাজন্যবর্গ মোহরাঙ্কিত পত্র ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করে না। সুতরাং তিনি রূপার একটি সীলমোহর গ্রহণ করেন এবং অঙ্কিত ছিল 'মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ' (মুহম্মদ আল্লাহর রসূল)।

বোখারী বলেন, তিনি তিনটি শব্দকে তিনটি সারিতে বসিয়ে মোহর তৈরি করান এবং তা দিয়ে ছাপ দেন। আরো বলেন, তাঁর ন্যায় এ সীলমোহরের নকশা আর কেউ তৈরি করেননি। আরো বলেন, এটা দ্বারা হজরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ) মোহরের কাজ চালিয়েছেন। অতঃপর হজরত উসমানের হাত থেকে এটা 'আরিসে'র কুয়ায় পড়ে যায়। তাতে অল্পই[১৬৩] পানি ছিল; কিন্তু পরে আর তার তল পাওয়া যায়নি। এর ফলে হজরত উসমান খুবই দুঃখিত হন এবং দুর্ঘটনাটিকে একটি অশুভ চিহ্ন বলে মনে করেন। তিনি পরে উক্ত মোহরের অনুরূপ একটি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন।

মোহরের নকশা তৈরি এবং তা দ্বারা ছাপ দেয়ার ব্যাপারে কতিপয় বিষয় জানার আছে। তা এই যে, এ 'খাতম' বলতে সেরূপ মোহরকে বোঝায়, যা আঙুলে পরা হয়। এটা থেকে 'তাখাত্তামা' ক্রিয়াপদটির উৎপত্তি, যার অর্থ হল 'সে আংটি পরেছে।' তা দিয়ে শেষ ও পূর্ণতাও বোঝানো হয়। এ থেকে বলা হয়, 'খাতামতুল আম্‌রা' অর্থাৎ বিষয়টি শেষ করেছি। 'খাতামতুল্ কোরআনা' অর্থাৎ কোরান শেষ করেছি। এটা থেকেই খাতমুন্নবীঈন[১৬৪] (নবীদের শেষ) ও 'খাতমুল আমর' (বিষয়টির শেষ) বোঝায়। এটা থেকে বোতল ও পাত্রাদির মুখ বন্ধ করার ছিপিকেও বোঝায়। বলা হয় এতে 'খেতাম' অর্থাৎ ছিপি আছে। এটাই কোরানে বলা হয়েছে, 'খেতামুহুমিসকুন' অর্থাৎ তার ছিপি মিশকের।[১৬৫] যারা এ শব্দের ব্যাখ্যা শেষ ও পূর্ণতা করেছেন, তারা ভুলে পতিত হয়েছেন। তারা বলেন, অর্থাৎ তারা তাদের পানীয়ের শেষাংশে মিশকের গন্ধ পাবেন। কিন্তু যথার্থ অর্থ এটা নয়। বরং তা ঐ 'খেতাম', যার অর্থ হল ছিপি। কারণ সাধারণ মদের পাত্রাদির মুখ বন্ধ করতে মাটি ও পিচ ব্যবহার করা হয়, যাতে তা সুরক্ষিত হয়ে স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধি পায়। বেহেশতী মদের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য তার

---

১৬২. কোরান ২৫, ২।
১৬৩. রোজেনথালে 'অধিক'। বোখারী দ্র:।
১৬৪. কোরান ৩৩, ৪০।
১৬৫. কোরান ৮৩, ১৬।

www.amarboi.org

ছিপি মৃগনাভির বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা যথার্থই পার্থিব জীবনে ব্যবহৃত মাটি ও পিচের ছিপি থেকে অধিকতর সুগন্ধ সুরুচির পরিচায়ক।

যখন 'খাতম' অর্থে উল্লেখিত সকল কিছু বোঝাবার বিষয়টি পরিষ্কার হল, তখন তা দ্বারা তার ফলে উৎপন্ন চিহ্ন বোঝাতে অসুবিধা কোথায়! তা এ যে, মোহরে যখন কিছু শব্দ বা নকশার আদল অঙ্কিত করে কাদামাটি বা কালির মধ্যে ডুবিয়ে কাগজের উপর ছাপ দেয়া হয়, তখন কাগজের পৃষ্ঠায় তার ছাপ অঙ্কিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মোমের ন্যায় নরম কোন বস্তুতে ছাপ দিলেও এ শব্দ বা নকশার চিহ্ন তাতে রেখায়িত হয়ে ওঠে। যদি মোহরে শব্দ থাকে এবং তা ডানদিক থেকে খোদিত হয়ে থাকে, তা হলে কাগজের পৃষ্ঠার ছাপটিকে বামদিক থেকে পড়তে হবে। যদি নকশাটি বামদিক অঙ্কিত হয়ে থাকে, তা ছাপটিকে ডানদিক থেকে পড়তে হবে। কারণ মোহরে অঙ্কিত নকশাটি ডান, বাম যে দিক থেকেই অঙ্কিত করা হোক না কেন, তা ছাপ দেবার সময় নকশাটিকে উল্টিয়ে দেয়। যাহোক, এভাবে মোহরটি কাদামাটি বা কালিতে ডুবিয়ে কাগজের পৃষ্ঠায় ছাপ দেয়ার ফলে যে চিহ্নাদি ফুটে ওঠে, তা দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয় যে, বিষয়টি শেষ হল বা পূর্ণতা লাভ করল অর্থাৎ এ পত্রের বিষয়টি যথার্থ ও কার্যকর। যেন পত্রের বিষয়টিকে এভাবে চিহ্নিত করলেই তার কার্যকারিতা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এর অন্যথা হলে তা অসম্পূর্ণ ও অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। কখনো মোহরের এ ছাপটি পত্রের লেখার শেষের দিকে থাকে; আবার কখনো প্রথম দিকেই তা আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতাবোধক সূচয়িত কিছু শব্দের সাথে ব্যবহৃত হয়। অথবা তার সঙ্গে সুলতানের নাম; আমীর বা লেখকের নাম অর্থাৎ যা যুক্তিযুক্ত হয়, তাই থাকে। কখনো তার সাথে প্রেরকের কিছু গুণকীর্তণও সন্নিবেশিত হয়। এর দ্বারা পত্রটির বিশুদ্ধতা ও তার কার্যকারিতার নিদর্শনই প্রকাশ পায়। এরূপ নাম লেখাকে সাধারণভাবে 'আলামত' বা স্বাক্ষর বলা হয় এবং মোহরের ক্ষেত্রে এ ছাপটিকে মোহর বলা হয়; কেননা তা 'আসেফী' মোহরের ধারা অনুসরণ করে নকশাবিশিষ্ট করা হয়েছে। এটা থেকেই কাজীর মোহর, যা বাদীবিবাদীর নিকট পাঠানো হয়; অর্থাৎ তাঁর স্বাক্ষরও লেখা যদ্বারা বিধি-নিষেধ কার্যকরী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সম্রাট বা খলিফার মোহর অর্থাৎ তাঁদের স্বাক্ষর।

সম্রাট হারুনুর রশীদ যখন ফজলকে বদলে তার ভাই জাফরকে উজির করতে মনস্থ করলেন, তখন তাদের পিতা ইয়াহিয়া ইবনে খালেদকে বলেছিলেন, "হে পিতা, আমি আমার মোহরটি ডানদিক থেকে বামদিকে নিতে চাই।" তিনি মোহরকে উজারতের রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। কারণ তাঁদের আমলে পত্র ও ফরমানাদির উপর মোহরাঙ্কিত করার দায়িত্ব উজিরদের উপর ন্যস্ত ছিল।

অনুরূপভাবে মোহরের গুরুত্বের বিষয়টি তাবারীর ঐ বর্ণনা থেকেও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়, যাতে তিনি বলেছেন, মাবিয়া ইমাম হাসানের সাথে সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়ে একটি সাদা কাগজের নিচে সীলমোহর দিয়ে লিখেছিলেন, "তুমি, নিচে মোহরাঙ্কিত সংশ্লিষ্ট কাগজটিতে তোমার ইচ্ছামত শর্তাদি লিখে নিতে পার; তা তোমার প্রাপ্য বলে বিবেচিত হবে।" এ ক্ষেত্রে মোহরের অর্থ হল কোনো পত্রের নিচের স্বাক্ষর; তা লেখনী বা অন্য যে কোন বস্তুর দ্বারাই দেয়া হোক না কেন।

www.amarboi.org

কখনো এর দ্বারা বোঝায় যে, মোহরটি কোনো নরম পদার্থের উপর চেপে ধরে তাতে তার ছাপ সৃষ্টি করতে হবে এবং তা পত্রের বাঁধুনি সুতার উপর স্থাপন করতে হবে। কখনো সংরক্ষণযোগ্য বিষয়াদির উপরও এ মোহর দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে তার অর্থ সেই ছিপি, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যাহোক, উভয় দিক থেকেই তা মোহরের চিহ্ন; এজন্য তাকেই মোহর বলা হয়েছে।

সর্বপ্রথম যিনি মোহরকে পত্রে ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ স্বাক্ষররূপে, তিনি হজরত মাবিয়া। কারণ তিনি তাঁর কুফার শাসক যিয়াদের নিকট আমর ইবনে যুবাইরকে একলক্ষ দেবার নির্দেশ দিয়ে একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রটি পথিমধ্যে খুলে এক লক্ষকে দুই লক্ষে পরিবর্তিত করা হয়। পরে যিয়াদ হিসাব দাখিল করলে মাবিয়া এটা অস্বীকার করেন। তিনি অতিরিক্ত এক লক্ষের জন্য আমরকে দায়ী করে বন্দী করে রাখেন। পরে আমরের ভাই আবদুল্লাহ্ উক্ত এক লক্ষ পরিশোধ করে তাকে মুক্ত করেন। এ সময় থেকেই মাবিয়া মোহরের একটি দপ্তর স্থাপন করেন; তাবারী এটা বর্ণনা করেছেন। অন্যরা বলেছেন যে, এ সময় থেকে পত্রকে সুতার দ্বারা বাঁধার নিয়ম প্রচলিত হয়। কারণ এর পূর্বে এভাবে বাঁধা হত না। মাবিয়া এভাবে তার উপর ছিপি লাগিয়ে দেন। মোহরের দপ্তরের অর্থ হল, এমন কিছু সংখ্যক লেখক, যারা সম্রাটের পত্রাদি লিখে মোহরাঙ্কিত করে তাকে স্বাক্ষর অথবা সূত্রের দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। অবশ্য কখনো দেওয়ান বা দপ্তর অর্থে তাদের বসবার স্থানকেও বোঝায়, যেমন আমরা কর্মীদের দেওয়ানের বেলায়ও বর্ণনা করেছি।

পত্রাদি গাঁথবার জন্য পৃষ্ঠা ছিদ্র করে সুতা ব্যবহার করা হয়, যেমন মাগরিবে দেখা যায় কিংবা তা ভাঁজ করে তার একটি দিক আঠা লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়, যেমন পূর্বাঞ্চলের লেখকরা করে থাকেন। কখনো ছিদ্র বা মিলনস্থলে এমন চিহ্ন প্রয়োগ করা হয়, যাতে পত্রটি খোলা বা তার পাঠ করা থেকে সংরক্ষিত থাকতে পারে। মাগরিববাসীরা ছিদ্রের স্থানে এক খণ্ড মোম ব্যবহার করে এবং তার উপর নির্দিষ্ট চিহ্নবিশিষ্ট সীলমোহরের ছাপ দেয়। এতে মোমের উপর উক্ত চিহ্নটি ফুটে ওঠে। পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোয় পত্রের আঠা লাগিয়ে বন্ধ করার স্থানে এক প্রকার মাটির উপর সীলমোহর দেয়া হত। এ মাটির রং লাল এবং তা এ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হত। এর উপর মোহরের নকশার ছাপ অঙ্কিত হত। আব্বাসী সাম্রাজ্যে এটা মোহরের মাটিরূপে পরিচিত ছিল এবং 'সিরাফ'[১৬৬] থেকে তা আনা হত। এ থেকে প্রকাশ পায় যে, তা এ উদ্দেশ্যেই বিশিষ্ট ছিল।

এটাই ঐ সীলমোহর, যা পত্রাদির চিহ্ন অথবা ছিপির নকশা হিসাবে ব্যবহৃত হত। সুতার দ্বারা বাঁধার ব্যাপারটি পত্রাদি বিভাগের সাথে বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিল। আব্বাসী সাম্রাজ্যে এ বিভাগের দায়িত্ব উজিরের উপর ন্যস্ত ছিল। অতঃপর এর প্রচলন বিচিত্র হওয়ায় পত্রাদি ও রচনা বিভাগের দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত থাকত, তিনিই সীলমোহরের ভার বহন করতেন। এর পর মাগরিব অঞ্চলে সম্রাটের সজ্জা ও নিদর্শন হিসাবে আঙুলে পরিধানযোগ্য সীলমোহর গ্রহণ করা হত। তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত করে

১৬৬. ২০৭ পৃষ্ঠা দ্র.।

www.amarboi.org

রুবি, ফিরুজা, মরকত প্রভৃতি মণি-মুক্তার দ্বারা তাকে কারুকার্যমণ্ডিত করা হত। সম্রাট এটাকে সাম্রাজ্যের নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করতেন। যেমন আব্বাসী সাম্রাজ্যে চাদর ও লাঠির নিদর্শন ছিল[১৬৭] এবং উবাইদী সাম্রাজ্যে ছত্র ব্যবহার করা হত। আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশে বিষয়াদির পরিবর্তন করে থাকেন।

'তিরায' (রাজকীয় পরিচ্ছদ)

এটা রাজশক্তি ও শাসন ব্যবস্থার আড়ম্বরের অন্তর্ভুক্ত এবং এ ব্যাপারে সাম্রাজ্যগুলোর প্রথা হল, তাঁদের নাম কিংবা তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু নিদর্শন কাপড়ের উপর অঙ্কিত করে রাজকীয় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা। এ উদ্দেশ্যে রেশম, গরদ অথবা সাদা রেশম ব্যবহার করা হয় এবং উপরোক্ত লিখনগুলো সোনালি সুতার দ্বারা তাতে যথানিয়মে বয়ন করে দেয়া হয়। কখনো সোনালী সুতার পরিবর্তে কাপড়ের রঙের বিপরীতধর্মী কোন রঙ্গিন সুতা ব্যবহার করা হয়। বিষয়টি এ ব্যাপারে দক্ষ কারিগর ও বয়নশিল্পীদের নির্ধারণ ও সংবচনের উপর নির্ভরশীল। এভাবে রাজকীয় পরিচ্ছদ এ সকল চিহ্নাদির দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এতে সাধারণ পরিচ্ছদের সাথে এর পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। সম্রাট এটা নিজে পরিধান করে, কাউকে সম্মানিত করতে চাইলে, তাকে দান করে কিংবা তাঁর সাম্রাজ্যের কোনো পদমর্যাদায় নিয়োজিত কর্মচারীকে তা পরিধানের অনুমতি দিয়ে সাধারণের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেন।

প্রাক্-ইসলাম যুগের অনারব সম্রাটরা নিজেদের ছবি ও আকৃতি কিংবা উক্ত উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট অন্য কোনো ছবি ও আকৃতি ব্যবহার করে রাজকীয় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাতেন। কিন্তু পরে ইসলামী সম্রাটগণ এ প্রথাকে দূর করে তদস্থলে তাদের নামের সাথে কল্যাণবোধক কোনো বাক্য বা কথা মুদ্রিত করাতেন। দুটি সাম্রাজ্যে এটাই রাজকীয় আড়ম্বর ও সম্মানের পরিচ্ছদ ছিল। তাদের প্রাসাদের এক দিকেই এ সকল পরিচ্ছদ বয়নের নির্দিষ্ট গৃহ ছিল, যাকে 'তিরায ঘর' বলা হত এবং যারা এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করতেন, তাদেরকে বলা হত 'তিরায কর্তা'। তারা রং, যন্ত্রপাতি ও বয়নের বিষয়টি তদারক করতেন এবং উক্ত কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বেতন, তাদের যন্ত্রপাতির সহজীকরণ ও তাদের কার্যের উন্নতিবিধানের প্রতি লক্ষ রাখতেন। সম্রাটগণ তাদের সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত ব্যক্তি ও তাঁদের আশ্রিতপোষ্যদেরকে এ পদে নিয়োগ করতেন। আন্দালুসের বনি উমাইয়া সাম্রাজ্যে এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ, মিশরের উবাইদী সম্রাটগণ এবং তাদের সমসাময়িক পূর্বাঞ্চলের অনারব সম্রাটরাও এ অবস্থা অনুসরণ করেছেন। অতঃপর যখন এ ব্যাপারে বিলাসিতা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষমতা লোপ পেল এবং সাম্রাজ্যগুলোর বিন্যাস ও প্রাধান্য বিস্তারের ধারা ব্যাহত হয়ে বহু সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ল, তখন অধিকাংশ সাম্রাজ্য থেকে এ পদমর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হল।

হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে বনি উমাইয়াদের পরে মাগরিবে আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের উদ্ভব হলে, তারা প্রথমদিকে এ সকল আড়ম্বর গ্রহণ করেনি। কারণ তখনো

১৬৭. রোজেনথালে এ চাদর ও লাঠিকে হজরত মুহম্মদের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

তাদের মধ্যে তাদের ইমাম মুহম্মদ ইবনে তুমারত আল-মেহেদীর দীক্ষার ফলে ধর্মানুভূতি ও সারল্য বিদ্যমান। তারা এ কারণে রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণ ব্যবহার করা থেকে দূরে সরে ছিল। কিন্তু তাদের বংশধররা পরবর্তীকালে যে ধরনের বিলাসব্যসনে নিমগ্ন হয়েছে, তা পূর্বসূরিদের মধ্যে ছিল না। বর্তমানে মাগরিবে আমরা মারিনী সাম্রাজ্যের উন্মেষ ও সমৃদ্ধির পর্যায়ে উক্ত আড়ম্বরের প্রচুর নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি। তারা এটা সমসাময়িক আন্দালুসের ইবনেল আহমারের সাম্রাজ্য থেকে শিখেছে এবং উক্ত সাম্রাজ্য তা ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের অনুসরণে প্রবর্তন করেছিল। এর ফলে তাদের পরস্পরের প্রভাবের একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়।

বর্তমানকালে মিশর ও সিরিয়ার তুর্কি সাম্রাজ্যে তিরাযের ব্যাপারটি প্রচুর পরিমাণে অনুসৃত হচ্ছে। অবশ্য তা তাদের রাজশক্তি ও নাগরিক সমৃদ্ধির অনুপাতে প্রচলিত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও তিরাযের জন্য তাদের সাম্রাজ্যে নির্দিষ্ট কোনো গৃহ বা প্রাসাদে অবস্থিত কোনো অঙ্গন নেই এবং তার তত্ত্বাবধানের কোনো পদও দেখা যায় না, তারা এ ব্যাপারে দক্ষ শিল্পীদের কাছে ফরমায়েশ দিয়ে তা প্রস্তুত করিয়ে নেয়। শিল্পীরা রেশম ও খাঁটি স্বর্ণের দ্বারা এ পরিচ্ছদ তৈরি করে থাকে। তাদেরকে 'মুযরকশ' বলা হয়। এটা একটি অনারব শব্দ। এর উপর তারা সম্রাট বা আমীরের নাম অঙ্কিত করে এবং অন্যান্য আরো অনেক কিছু, যা সাম্রাজ্যের যোগ্য, তৎসম্পর্কেও তারা বিচিত্র শিল্পকর্মের অনুসরণ করে। 'আল্লাহ্ দিন-রাত্রির পরিবর্তন করে থাকেন। আল্লাহ্ই যথার্থ উত্তরাধিকারী'।[১৬৮]

ফুস্তাত ও সিরাজ (রাজকীয় তাঁবু ও আচ্ছাদন)

জেনে রাখুন, রাজশক্তির নিদর্শন ও বিলাসব্যসনের অঙ্গ হিসাবে তাঁবু ও আচ্ছাদন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো মসীনাসুতা, পশম ও কার্পাসের দ্বারা তৈরি হয় এবং এগুলো টানাতে মসীনা ও কার্পাসের দড়ি ব্যবহার করা হয়। সম্রাটগণ ভ্রমণে বের হলে এগুলোর দ্বারা জাঁকজমক প্রদর্শন করেন। এ সকল তাঁবু ও চাঁদোয়া নানা বর্ণের এবং সাম্রাজ্যের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির অনুপাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয়ে থাকে। এগুলো গ্রহণের ব্যাপারে যে বিষয়টি কাজ করে থাকে, তা হল এই যে রাজশক্তি লাভের পূর্বে এবং তার প্রথম দিকে তারা যে ধরনের গৃহগুলোতে বসবাস করেছে, তারই এক আনুপূর্বিক অভ্যাস। বনি উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাটদের সময়ে আরবরা চামড়া ও পশমের নির্মিত তাঁবু গৃহে বাস করত। তখন পর্যন্তও অধিকাংশ আরব বেদুইনরা তাদের প্রান্তর জীবনের ধারা অনুসরণ করছে। সুতরাং তারা যখন কোনো অভিযানে বের হত ও যুদ্ধক্ষেত্রে যেত, তখন তাদের যাবতীয় সাংসারিক আসবাবপত্র ও স্ত্রী-পুত্রাদি পোষ্যদেরকে সঙ্গে নিত, যেমন বর্তমানকালেও তারা অনুরূপ করে থাকে। এর ফলে তাদের সৈন্যদলে পরিবারের সংখ্যা থাকত বহু এবং তারা দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গোত্রানুসারে অগ্রসর হত। আরবদের অভ্যাস অনুসারেই তাদের একদলের অবস্থান থেকে অন্যদলের অবস্থান দেখা যেত না। এ কারণে সম্রাট আব্দুল মালেক এক

১৬৮. তুল, কোরান ৭৩, ২০ এবং ২১, ৮৯।

www.amarboi.org

পশ্চাদ্বাহিনী সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করেন, যারা তাঁর ভ্রমণকালে সৈন্য দলকে তাঁর পিছনে পিছনে যাওয়ার জন্য বাধ্য করত। বর্ণিত আছে যে, এ ব্যাপারে সম্রাটকে প্রথম রুহ ইবনে যিম্বা[১৬৯] পরামর্শ দিয়েছিল এবং সম্রাট হাজ্জাজকে এ পদে নিয়োজিত করেছিলেন। পরে একদিন সম্রাট ভ্রমণে বের হলে উক্ত রুহ ইবনে যিম্বা অগ্রসর হতে দেরি করায় হাজ্জাজ তার দায়িত্ব পালনের প্রথম কীর্তি হিসাবে তার তাঁবু পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ কাহিনী সকলের নিকট সুপরিচিত এবং এটা থেকে আরব বেদুইনদের মধ্যে হাজ্জাজের প্রতাপ সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। কারণ তাদেরকে কুচ করতে বাধ্য করা একমাত্র সেই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যাকে সরল বেদুইনরা সহসা আক্রমণ করতে সাহস করবে না। কেননা সে তাদের জন্য ভীতিপ্রদ গোত্রপ্রীতির অধিকারী। এ কারণেই আব্দুল মালেক হাজ্জাজকে এ পদে নিয়োজিত করেন। কেননা তিনি জানতেন যে, সে তাঁর গোত্রপ্রীতি ও তেজবীর্যের দ্বারা এ দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

অতঃপর যখন আরবি সাম্রাজ্য নাগরিকত্ব ও আড়ম্বরের ব্যাপারে বৈচিত্র্য অর্জন করল, তারা নগর ও শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে তাঁবু ত্যাগ করে প্রাসাদের অধিবাসী হল এবং উটের পিঠ ছেড়ে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করল, তখন তারা ভ্রমণকালে মসীনার তৈরি আচ্ছাদন ব্যবহার করত। তা থেকে তারা বিভিন্ন আকার ও নির্দিষ্ট প্রকারের গৃহ, যেমন—গোল, দীর্ঘ ও চতুষ্কোণ প্রভৃতি নির্মাণ করত এবং এগুলোতে তারা দর্শনীয়ভাবে সকল সৌন্দর্যসহ আসর জমাত। তাদের মধ্যে সেনাপতি আমীর তার বৃহৎ তাঁবুর চতুর্দিকে মসীনার তৈরি বেষ্টনী ব্যবহার করত, যাকে মাগরিবের সৈন্যদলের নিজস্ব বারবার ভাষায় 'আফরাক' বলা হত। এতে শেষ বর্ণ 'ক'-এর উচ্চারণ আরবি 'কাফ' ও 'ক্বাফের' মধ্যবর্তী। এরূপ বৈশিষ্ট্য এ অঞ্চলের সুলতানের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল; অন্য কেউ তা ব্যবহার করত না।

কিন্তু পূর্বাঞ্চলে এটা সুলতান ছাড়াও প্রত্যেক সেনাপতি ব্যবহার করে থাকেন। এর পর নগরে তাদের স্থায়ী বসবাস তাদের স্ত্রী-পুত্রাদির প্রাসাদে বা অন্যত্র সুরক্ষিত গৃহে অবস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে এবং এর ফলে তাদের বোঝা নেমে গেছে। ফলে এখন সৈন্য দলের অবস্থানগত দূরত্ব হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং এখন সম্রাট ও সৈন্যদল একই ঘাঁটিতে অবস্থান করেন এবং যে কোনো ব্যক্তির একক দৃষ্টিই তাদের বর্ণ বৈচিত্র্যের আকর্ষণীয় দৃশ্যকে এক সঙ্গে অবলোকন করতে পারে। ফলে বিভিন্ন সাম্রাজ্যে বিলাসব্যসন ও আড়ম্বরের এ প্রথা দীর্ঘস্থায়ী রূপ ধারণ করেছে।

আল-মোহেদ ও জানাতী সাম্রাজ্য, যার ছায়া আমাদের উপর পতিত হয়েছে, তার অধিকারীরাও প্রথম দিকে ঐ সকল আবাস ব্যবহার করত, সাম্রাজ্যের পূর্বে যাতে তারা অভ্যস্ত ছিল; যেমন সাধারণ তাঁবু ও নিদ্রার জন্য ব্যবহৃত আচ্ছাদন। অতঃপর যখন তাদের সাম্রাজ্যেও বিলাসব্যসন ও প্রাসাদ জীবন সুদৃঢ় হল, তখন তারাও বৃহৎ তাঁবু রাজকীয় আচ্ছাদন ব্যবহার করল এবং এ ব্যাপারে তাদের সাজসজ্জা তাদের ধারণাকেও অতিক্রম করে আবাসস্থলের চূড়ান্ত বিলাসিতায় পরিণত হয়েছিল।

১৬৯. সম্রাট আব্দুল মালেকের পরামর্শদাতাদের অন্যতম; মৃত্যু: ৮৪ (৭০৩ খ্রি.) হি.।

www.amarboi.org

অবশ্য এর ফলে সৈন্যদলের অবস্থা কিছুটা অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, তারা একত্র অবস্থান করার ফলে একসঙ্গে নৈশকালীন আক্রমণের শিকারে পরিণত হতে পারে এবং একটি মাত্র চিৎকার তাদের সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার জন্য যথেষ্ট। তদুপরি তাদের সাথে স্ত্রী-পুত্রাদি না থাকার ফলে তাদের নিরাপত্তার জন্য মৃত্যুবরণের ইচ্ছাও তাদের মধ্যে ততটা দৃঢ় হতে পারে না। এ জন্য তাদের নিরাপত্তার জন্য অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। 'আল্লাহ্ শক্তিমান ও পরাক্রান্ত'।[১৭০]

নামাজের বেষ্টনী ও খোতবার প্রার্থনা

এগুলো খেলাফতের বিষয় এবং রাজশক্তির নিদর্শনের অন্তর্গত। ইসলামী সাম্রাজ্য ছাড়া অন্যত্র এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সম্রাটের নামাজের জন্য মসজিদের অভ্যন্তরে যে বেষ্টনীর সৃষ্টি করা হয়, তা মূলত মিম্বরের চারদিকে একটি পর্দার দ্বারা ঘেরাও তৈরি করা, যাতে মিম্বর ও তৎসন্নিহিত স্থান পরিবেষ্টিত হয়। সর্বপ্রথম মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এটা গ্রহণ করেন; কারণ ইতিপূর্বে তিনি খারেজীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ ঘটনা সর্বজন পরিচিত। বলা হয়, সর্বপ্রথম মারোয়ান ইবনেল হকম জনৈক ইয়ামেনীর দ্বারা[১৭১] আক্রান্ত হয়ে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর তাদেরকে অনুসরণ করে অন্যান্য সম্রাটরাও এর ব্যবস্থা করেছেন এবং সাধারণ নামাজী ও সম্রাটের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য এটা এক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এও সাম্রাজ্যের বিলাসব্যসন ও সমৃদ্ধি আসার পরই দেখা দিয়েছে; যেমন সর্বপ্রকার আড়ম্বরের অবস্থাই এ রূপ। সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্যে এ ব্যাপারে একই অবস্থা বিরাজ করেছে। আব্বাসী সাম্রাজ্যের বিভক্তি ও পূর্বাঞ্চলে বহু রাজ্যের উদ্ভবের সময় এবং অনুরূপ আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের অবসানে ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের অভ্যুদয়েও এর ব্যতিক্রম হয়নি। মাগরিবের বনি আগলাব কায়রোয়ানে এবং উবাইদী সম্রাটগণ ও তাদের শাসক মাগরিবের সিনহাজারা, ফেজের বনি বাদিস ও কেল আর বনি হাম্মাদ নিজ নিজ স্থানে এ ব্যবস্থা প্রচলিত করেছিল। এর পর আল-মোহেদেরা সমগ্র মাগরিব ও আন্দালুসের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদের প্রান্তরীয় জীবনের সারল্যের নিদর্শন হিসাবে উপরোক্ত প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন। অতঃপর যখন সাম্রাজ্য সমৃদ্ধি লাভ করল তার বিলাসব্যসনের যুগ দেখা দিল, তখন তাদের তৃতীয় সম্রাট আবু ইয়াকুব আল-মনসুর পুনরায় এ বেষ্টনীর ব্যবস্থা করেন। পরে তা মাগরিব ও আন্দালুসের সকল সম্রাটের জন্য পালনীয় প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য সাম্রাজ্যের অবস্থাও একই ছিল। এটাই বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ্র প্রবর্তিত প্রথা।

মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খোতবায় প্রার্থনা জানানোর ব্যাপারটি প্রথম দিকে নামাজের ইমামতির দায়িত্ব পালনকারী খলিফাগণের উপরই ন্যস্ত ছিল। তাঁরা নামাজের পরে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ করে তাঁর সহচরদের প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি প্রার্থনা করতেন। আমর ইবনেল আস সর্বপ্রথম মিশরে তাঁর মসজিদ নির্মাণের পর

---

১৭০. কোরান ১১, ৬৬; ৭২, ১৯।

১৭১. এ ঘটনা ৪৪ (৬৬৪/৬৫ খ্রি:) হিজরির।

www.amarboi.org

তাতে মিম্বর তৈরি করেন। ইবনে আব্বাস সর্বপ্রথম মিম্বরে দাঁড়িয়ে খলিফার জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি হজরত আলীর পক্ষ থেকে বসরায় শাসক থাকাকালে তাঁর জন্য এ প্রার্থনা জানান। এতে তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্, তুমি আলীকে সত্যের জন্য সাহায্য কর।" অতঃপর এরূপ প্রার্থনার বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হয়।[১৭২]

আমর ইবনেল আসের মিম্বর তৈরির সংবাদ হজরত উমর ইবনেল খাত্তাবের কাছে পৌঁছলে তিনি এক পত্রে তাঁকে লিখেন, "অতঃপর আমার নিকট সংবাদ এসেছে যে, তুমি মুসলমানদের ঘাড়ের উপর দাঁড়াবার জন্য একটি মিম্বর নির্মাণ করেছ। তোমার জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, তুমি দণ্ডায়মান এবং মুসলমানরা তোমার পায়ের গোড়ালির নিকট বসে আছে? আমি তোমাকে এ নির্দেশই দেই যে তুমি তা ভেঙে ফেল।'

অতঃপর যখন জাঁকজমক দেখা দিল এবং খলিফাদের নামাজ ও খোতবা পড়ার পথে বাধার সৃষ্টি হল, তখন তারা এ উভয় কার্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে লাগলেন। সুতরাং খোতবা পাঠকারী মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খলিফার নাম উচ্চারণ করে তার জন্য প্রার্থনা জানাত। কারণ আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টির কল্যাণ কামনার যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা এরূপ প্রার্থনার যোগ্য। অন্যদিকে এ সময়ে প্রার্থনা কবুল হওয়ার ধারণাও বিদ্যমান এবং পূর্বসূরিদের নিকট থেকে এ বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে তারা বলতেন, যদি কারো কল্যাণ প্রার্থনা করার অভ্যাস থাকে, তবে সে যেন তা সম্রাটের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। এক্ষেত্রে এককভাবে শুধু সম্রাটের কথাই বলা হয়েছে।

এর পর যখন অবরুদ্ধ অবস্থা ও অন্যায্য প্রভাবের যুগ এল এবং অনুরূপ প্রভাব বিস্তারকারীর সংখ্যা সাম্রাজ্যগুলোতে বেড়ে গেল, তখন তারা সম্রাটের নামের সাথে নিজেদের নাম যোগ করে উপরোক্ত প্রার্থনার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে লাগল। অবশ্য এ সকল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে এরূপ অংশীদার হওয়ার ব্যাপারটির ইতি হয়েছে। এর পর একমাত্র সম্রাটের নামেই মিম্বরের প্রার্থনা নির্দিষ্ট হয়েছে; তাতে অন্য কারো কোনো অধিকার নেই। সম্রাটের সাথে অন্য কারো এ ব্যাপারে অংশীদার হওয়া বা তার দাবি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অনেক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাই প্রথম দিককার সারল্য এবং প্রান্তরীয় জীবনের স্থূলতা ও কৃচ্ছ্রতার জন্য এ বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। তারা মুসলমানদের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির প্রতি সংক্ষেপে ও অনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত কল্যাণ কামনাতেই সন্তুষ্ট হন। কোনো খোতবায় যখন এভাবে শাসকদের প্রতি কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা জানান হয়, তখন তাকে 'আব্বাসী খোতবা' বলা হয়। এরূপ নামকরণের কারণ এই যে, প্রাচীন প্রথা অনুসারে এটা দ্বারা আব্বাসী খলিফাদিগকে মনে করা হয়। সুতরাং তাতে কোনো নির্দিষ্ট নাম বা তার প্রকাশ্য ঘোষণা থাকে না।

বর্ণিত আছে যে, আমীর আবু যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে আবু হেফস যখন বনি আব্দুল ওয়াদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ইয়াগমারাসিন ইবনে যাইয়ানের নিকট থেকে 'তেলমিসান' এলাকা ছিনিয়ে নিয়ে পুনরায় তা কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ফেরত দেন, তখন অন্যতম একটি শর্ত ছিল যে, উক্ত এলাকায় পঠিত খোতবায় আমীরের নাম উল্লেখ

১৭২. রোজেনথালে ঘটনা দুটি বর্ণনার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ আছে।

www.amarboi.org

করতে হবে। ইয়াগমারাসিন এর উত্তরে বলেছিলেন, এ কাষ্ঠখণ্ডগুলো তাদেরই, তার উপর দাঁড়িয়ে তারা যে কোনো লোকের নাম উচ্চারণ করতে পারে। অনুরূপভাবে মারিনী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব ইবনে আব্দুল হকের নিকট তিউনিসের বনি আবু হেফসের তৃতীয় সম্রাট আল মুস্তানসিবের[১৭৩] দূত উপস্থিত হলে কোনো এক শুক্রবারে তিনি জানতে পারলেন যে, খোতবায় তাদের সম্রাটের নাম না থাকায় উক্ত দূত নামাজে উপস্থিত হয়নি। সুতরাং মারিনী সম্রাট খোতবায় আল-মুস্তানসিবের জন্য প্রার্থনার অনুমতি দেন। সম্ভবত এ কারণেই তারা পরবর্তীকালে তাদের মতাদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। সকল সাম্রাজ্যেরই প্রথম দিকে প্রান্তরীয় জীবনের সারল্য থাকায় অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অতঃপর যখন তাদের শাসন দৃষ্টি প্রসারিত হল, রাজকীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির ব্যবস্থা বিবেচনায় এল এবং তারা নাগরিক জীবনের বিলাস ও আড়ম্বরকে পূর্ণতা দান করতে আরম্ভ করলেন, তখন এ সকল রাজকীয় নিদর্শন ও তার আনুষঙ্গিক বৈচিত্র্য তাদের মধ্যে দেখা দিল। তারা এ সকল ব্যাপারেও চরম সীমায় উপনীত হয়ে অন্যকে তাদের কোনো কার্যে অংশীদার করা বা কোনোপ্রকার প্রভাব বিস্তারের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিলেন। পৃথিবী একটি উদ্যান। 'আল্লাহ্ সকল বিষয়ে জাগ্রত দৃষ্টি।[১৭৪]

---

১৭৩. রাজত্বকাল (১২৪৯-৭৭ খ্রি:)।

১৭৪. তুল, কোরান ৩৩, ৫২।

www.amarboi.org

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[যুদ্ধ এবং যুদ্ধ সংঘটনে বিভিন্ন জাতির অনুসৃত প্রক্রিয়া]

জেনে রাখুন, যুদ্ধ ও অন্যান্য কলহ-বিবাদ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। এর মৌল কারণ হল একে অপরের প্রতিশোধ গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে গোত্রপ্রীতি প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। সুতরাং যখন দুটি দল একই উদ্দেশ্যে পরস্পরের সম্মুখীন হয় এবং তাদের একটি প্রতিশোধ গ্রহণ ও অন্যান্য প্রতিরোধ করলে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখনই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা মানব সমাজের একটি স্বাভাবিক বিষয়; কোনো জাতি বা গোত্র এর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রতিশোধ স্পৃহার কারণ হল, হয় প্রতিহিংসা ও প্রতিযোগিতা, শত্রুতা, আল্লাহ্ ও তাঁর ধর্মের জন্য ক্রোধের অভিব্যক্তি; অথবা রাজশক্তির উত্তেজনা ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। এদের প্রথমটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিবেশী গোত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারগুলোর মধ্যে দেখা যায়। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ শত্রুতা, এও অনেক সময় বন্য ও প্রান্তরবাসী জাতিগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়; যেমন আরব বেদুইন, তুর্কি, তুর্কেম্যান, কির্দী এবং তাদের সমতুল্য অন্যরা। কারণ তাদের বর্শার অগ্রভাগেই তাদের আহার্য এবং অন্যদের হাতে তাদের জীবিকা। যারা তাদেরকে তা ভোগ করতে বাধা দেয়, তাদের সাথেই তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এটা ব্যতীত তাদের এ প্রচেষ্টায় কোনো প্রকার মর্যাদা বা রাজ্য লাভের কোনো বাসনা নেই। তাদের একমাত্র ইচ্ছা ও একান্ত লক্ষ হল মানুষের হাতে যা আছে, তা প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেয়া। তৃতীয় কারণটিকে ধর্মীয় বিধান অনুসারে 'জেহাদ' বলা হয়। চতুর্থটি সাম্রাজ্য শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং তার আনুগত্য অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ।

যুদ্ধবিগ্রহের এ চারটি প্রকার। এর প্রথম দুটি বিরোধ ও গোলযোগের ব্যাপার এবং শেষের দুটি জেহাদ ও ন্যায়ের যুদ্ধ। অন্যদিকে যুদ্ধের যে ধরন মানব সমাজের উদ্ভবকাল থেকে বিরাজমান, তা দুই প্রকার; একটি সারিবদ্ধভাবে মোকাবিলা এবং অন্যটি আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণ[১৭৫] সারিবদ্ধভাবে মোকাবেলার বিষয়টি সর্বদাই অনারবদের মধ্যে বংশপরম্পরায় প্রচলিত এবং আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের ধারাটি আরব বেদুইন ও মাগরিবের বারবারদের মধ্যে সুপরিচিত।

সারিবদ্ধ মোকাবেলা আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণ থেকে অধিকতর তীব্র ও দৃঢ়মূল যুদ্ধরীতি। এর কারণ এই যে, সারিবদ্ধ রীতিতে সৈন্যদলকে সারিবদ্ধ হতে হয় এবং

---

১৭৫. সম্ভবত এটাই বর্তমানকালে 'গেরিলা' পদ্ধতি নামে অভিহিত হয়।

www.amarboi.org

তারা পেয়ালার সারি অথবা নামাজীদের পঙ্ক্তির ন্যায় সমদূরত্বে অবস্থান করে। এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে তারা শত্রুর দিকে অগ্রসর হয়। এর ফলে আক্রমণের ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনায় এবং শত্রুর মনে ভীতি উৎপাদনে তারা অধিকতর দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে। কেননা তা যেন একটি সঞ্চরণশীল প্রাচীর ও বিস্তারমান দুর্গ, যা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

কোরান শরীফে আছে, অবশ্যই আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা সারিবদ্ধভাবে তাঁর পথে যুদ্ধ করে যেন তারা একটি দৃঢ় সংবদ্ধ সৌধ।[১৭৬] অর্থাৎ তারা পরস্পর দৃঢ়তায় গেঁথে রয়েছে। হাদিস শরীফে আছে, "এক বিশ্বাসীর সাথে অন্য বিশ্বাসী মিলিয়ে একটি সৌধতুল্য, যার একাংশ অপরাংশের সাথে দৃঢ় সংবদ্ধ।" পাঠক, এটা থেকেই আপনি দৃঢ়তার সাথে অবস্থানের অবশ্য পালনীয়তা ও সারিবদ্ধ অবস্থা থেকে পলায়নের নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন। যুদ্ধে সারিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য হল শৃঙ্খলা রক্ষা করা, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি সারি ত্যাগ করে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল, সে যদি পরাজয় দেখা দেয়, তা হলে তার সমস্ত পাপ নিজের স্কন্ধে তুলে নিল; যেন সে নিজে এ পরাজয় মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিল এবং শত্রুকে এটা লাভ করতে সুযোগ দিল। সুতরাং এ আচরণের ফলাফলের ব্যাপকতা এবং ধর্মীয় ঐক্যের সর্বনাশের দিকে লক্ষ রেখেই এটাকে মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। এ সকল প্রমাণ থেকে এও প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সারিবদ্ধ যুদ্ধ ধর্মপ্রবর্তকের নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের রীতিতে যুদ্ধের মধ্যে সারিবদ্ধ যুদ্ধের ন্যায় প্রচণ্ডতা যেমন নেই, তেমনি তাতে পরাজয় থেকে নিরাপত্তা বোধেরও অভাব। অবশ্য অনেক সময় এ আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের রীতিতেও পশ্চাদভাগে সারিবদ্ধ সৈন্যদল অবস্থান করে, যাতে তারা প্রয়োজনের সময় অগ্রগামীদেরকে আশ্রয় দিতে পারে এবং এর সারিবদ্ধ আক্রমণের মোকাবেলা করতে পারে, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করছি।

বিস্তৃত অঞ্চল ও বিপুল সৈন্যের অধিকারী প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলো তাদের সৈন্যবাহিনীকে নানা ভাগে বিভক্ত করত। তারা এর প্রতিটি অংশকে বলত 'কুর্দুস' (দল) এবং প্রতিটি কুর্দুসের সমসংখ্যক সৈন্য সারি ছিল।[১৭৭] এরূপ করার কারণ এ যে, যখন তাদের সৈন্যসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল এবং সাম্রাজ্যের প্রতি অঞ্চল থেকে সৈন্য এসে যোগ দিল, তখন স্বভাবতই তাদের পরস্পরের পরিচয়ের অভাব দেখা দিল। বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে এ বিরাট বাহিনী পরিচয়ের অভাবে নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হল। সুতরাং তারা এ বিরাট সৈন্যদলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে তাদের মধ্যকার পরিচয়কে সুদৃঢ় করে তুলল। তারা এ সকল দলকে স্বাভাবিক পর্যায়ক্রমে চারদিকে স্থাপন করল। সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্বে সম্রাট বা পরিচালককে মধ্যভাগে স্থান দিল। এ পর্যায়ক্রমকে তারা যুদ্ধকালীন পর্যায়ক্রম বলে অভিহিত করত। পারস্য, রোম ও ইসলামের প্রাথমিক দুই সাম্রাজ্যের

১৭৬. কোরান ৬১, ৪।
১৭৭. এই বাক্যটি রোজেনথালে নেই।

www.amarboi.org

ইতিহাসে এ সম্পর্কে বিবরণ বিদ্যমান। তারা সম্রাটের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে একটি পৃথক সৈন্যদল তার পৃথক সেনাপতি, পতাকা ও নিদর্শনসহ স্থাপন করত। এ দলকে বলা হত অগ্রবাহিনী। পুনরায় অন্য একটি সৈন্যদল সম্রাটের অবস্থানের দক্ষিণ দিকে স্থাপন করত এবং তাকে বলত দক্ষিণ বাহিনী। বাম দিকে অনুরূপ অবস্থানরত সৈন্যদলকে বলা হত বাম বাহিনী এবং সমগ্র সৈন্যদলের পিছনে অবস্থানকারী দলকে বলা হত পশ্চাতবাহিনী। সম্রাট ও তাঁর সহচরবৃন্দ এ চার বাহিনীর মধ্যখানে থাকতেন এবং তাদের অবস্থানকে মধ্যভাগ[১৭৮] বলা হত। যখন তাদের জন্য এ পর্যায়ক্রমিক দৃঢ় বিন্যাস সমাপ্ত হত, তখন তার বিস্তৃতি এক দৃষ্টি সীমার মধ্যে অথবা ব্যাপক ব্যবধানের মধ্যে হতে পারত। অবশ্য এ ব্যবধান সৈন্যসংখ্যার অল্পাধিক্য লক্ষ করে দুই বাহিনীর মধ্যে একদিন বা দুইদিনের পথের বেশি হত না। এভাবে বিন্যস্ত হবার পরই সারিবদ্ধ আক্রমণের পালা আসত।

পাঠক এ ব্যাপারটি ইসলামের বিজয় অভিযান ও প্রথম দুটি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে লক্ষ করুণ। সম্রাট আবদুল মালেকের সময় কেমন করে এ বিরাট ব্যবধানের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসের দরুন সৈন্যদলের অগ্রযাত্রা বিভিন্ন হয়ে দেখা দিত। যার ফলে এমন একজনকে নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিল, যিনি পশ্চাদ্দিক থেকে তাদের অগ্রগমনকে ত্বরান্বিত করতে পারেন। সম্রাট এজন্য হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে নিয়োগ করেছিলেন, যেমন আমরা তৎপ্রতি ইঙ্গিত করেছি[১৭৯] এবং ইতিহাসেও এর বিবরণ সুপরিচিত।

আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যেও এক সময়ে এ প্রকার অধিকসংখ্যক সৈন্য ছিল। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে প্রায় কিছুই জানি না। কারণ আমরা যে সকল সাম্রাজ্য পেয়েছি, তাদের সৈন্যসংখ্যা খুবই অল্প। যুদ্ধের অঙ্গনে এদের মধ্যে অপরিচয়ের কোনো অসুবিধা ছিল না। বরং অধিকাংশ সৈন্যদলের উভয় পক্ষকে একটি ঘাঁটি বা নগরের পরিধিই স্থান দিতে পারত এবং তারা যুদ্ধের প্রচণ্ডতার সময়ও প্রত্যেকেই নিজ সাথীকে নাম ও উপাধি ধরে উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করত। এ জন্যই এ সময়ে পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

সৈন্যদলের পশ্চাতে সারিবদ্ধ প্রতিরোধ

আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের রীতিতে যুদ্ধ পরিচালনাকারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের পশ্চাতে কোনো বস্তু বা বাকহীন প্রাণীর দ্বারা একটি প্রতিরোধ সারি গড়ে তোলে, যাতে তাদের অশ্বারোহী সৈন্যরা পশ্চাদপসারণের সময় এর পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। এর দ্বারা তারা যুদ্ধের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে সৈন্যদলকে বিজয়লাভে উৎসাহিত করে। কখনো সারিবদ্ধ রীতিতে যুদ্ধকারীরাও তাদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

---

১৭৮. মূলে আছে 'কালবুন'—হৃদয়।

১৭৯. ৩০১ পৃষ্ঠা দ্র:।

www.amarboi.org

সারিবদ্ধ যুদ্ধরীতিতে অভ্যস্ত পারস্যবাসীরা এ ব্যাপারে যুদ্ধক্ষেত্রে হাতি ব্যবহার করত। তারা হস্তীর উপর দুর্গের ন্যায় কাষ্ঠনির্মিত কক্ষ বহন করত এবং এগুলো সৈন্য, যুদ্ধাস্ত্র ও রণধ্বজার দ্বারা সুসজ্জিত থাকত। তারা এ হস্তীযুথকে সৈন্যদলের পশ্চাতে স্থাপন করত, যেন এগুলো দুর্গ এবং তাদের আড়ালে থেকে আত্মরক্ষা ও যুদ্ধের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করত। পাঠক, কাদেসিয়া রণাঙ্গনে এ ব্যাপারে যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তৎপ্রতি লক্ষ করুন। পারস্যবাসীরা যুদ্ধের তৃতীয় দিনে এ হস্তীযুথের দ্বারা মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করল এবং মুসলমান পদাতিকরাও পালটা প্রচণ্ড আক্রমণে তাদের ব্যুহভেদ করে ফেলল। তারা তরবারীর আঘাতে হস্তীশুণ্ড কেটে ফেলতে আরম্ভ করলে, তারা ভয় পেয়ে পিছন দিকে মাদায়েনে অবস্থিত ঘাঁটির উদ্দেশ্যে পলায়ন করতে লাগল। সুতরাং এর ফলে পারস্য সৈন্যদল নিরাশ্রয় হয়ে চতুর্থ দিনে পরাজয় বরণ করল।

রোমান, আন্দালুসের গথ ও অন্যান্য অনারব জাতি এ উদ্দেশ্যে সিংহাসন ব্যবহার করত। তারা যুদ্ধের অঙ্গনে সম্রাটের সিংহাসন স্থাপন করে তার চারদিকে তাঁর সেবক, সভাসদ ও সৈন্যদের মধ্য থেকে তাদেরকে স্থান দিত যারা এ সিংহাসনের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। তারা এ সিংহাসনের পায়ার সাথে বেঁধে পতাকা উড়িয়ে দিত এবং এর চারদিকে তীরন্দাজ ও পদাতিকদের আরো একটি বেষ্টনী তৈরি করত। এভাবে সিংহাসনের প্রতিরোধ বিরাট হয়ে দাঁড়াত এবং তা আক্রমণকারীদের দুর্গ ও আক্রমণ শেষে পশ্চাদপসারণকারীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠত। পারস্যবাসীরা কাদেসিয়ার রণাঙ্গনে এ আয়োজনও প্রদর্শন করেছিল। রুস্তম এরূপ একটি সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু পারস্য সৈন্যদল বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় আরবরা এ সিংহাসনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং রুস্তম পলায়নরত অবস্থায় ফুরাতের কূলে নিহত হন।

আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের রীতিতে অভ্যস্ত আরব বেদুইন ও প্রান্তরবাসী অধিকাংশ যাযাবর জাতি এ ব্যাপারে তাদের উট ও ভারবাহী পশু ব্যবহার করে থাকে এবং তাদের প্রতিরোধ সারিই তাদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। একে তারা 'মাজবুযা' (আকর্ষণ স্থল) বলে। প্রত্যেক জাতিই যুদ্ধক্ষেত্রে এ প্রতিরোধ সারি ব্যবহার করে থাকে। কারণ, পাঠক আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, তা কীভাবে তাদের আক্রমণে দৃঢ়তা এবং পরাজয় ও ধ্বংসলীলা থেকে নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। বস্তুত এটা একটি পরীক্ষিত সত্য।

বর্তমানকালে সকল সাম্রাজ্যই এ বিষয়টি ত্যাগ করেছে। এ স্থলে তারা ভারবাহী পশু ও পশ্চাদ্বাহিনীর তাঁবু ইত্যাদি স্থাপন করে থাকে। কিন্তু এটা কিছুতেই হস্তীযূথ বা উষ্ট্র সারীর সমতুল্য নয়। এজন্য সৈন্যদল পরাজয়ের শিকারে পরিণত হয় এবং তারা সর্বদা সুরক্ষিত ঘাঁটির দিকে পলায়ন করতে উদগ্রীব থাকে।

ইসলামের প্রথম দিকে সকল যুদ্ধই সারিবদ্ধ রীতিতে অনুষ্ঠিত হয়। অথচ আরবরা একমাত্র আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের রীতিতেই অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ইসলামের প্রথম যুগে দুটি কারণে তারা এ যুদ্ধরীতি অবলম্বন করে। একটি এই যে, তাদের শত্রুরা সারিবদ্ধ রীতিতে অভ্যস্ত। সুতরাং তাদেরকেও বাধ্য হয়ে এ রীতি গ্রহণ করতে হয়। অপরটি হল, তারা এ জেহাদে মৃত্যুপণ করে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ তাদের বিশ্বাসের

www.amarboi.org

দৃঢ়তা এক অপার ধৈর্যের সৃষ্টি করেছিল। এ জন্যই সারিবদ্ধ রীতিতে দৃঢ়তার সাথে তারা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পেরেছিল।

সর্বপ্রথম মারোয়ান ইবনেল হকম, খারেজী যাহ্হাক এবং পরে আল হুবাইবীর[১৮০] সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে এ সারিবদ্ধ রীতি পরিত্যাগ করে কুর্দুস বিন্যাস গ্রহণ করেন। আল হুবাইরীর যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তাবারী বলেন, খারেজীরা তাদের নেতা হিসাবে শায়বান ইবনে আব্দুল আজিজ আল ইউশকরীকে মনোনীত করে এবং তার ডাক নাম ছিল 'আবুয্‌যলফা'। এর পর মারোয়ান তাদের বিরুদ্ধে কুর্দুস রীতির যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং তখন থেকে সারিবদ্ধ রীতি পরিত্যক্ত হয়। এভাবে সারিবদ্ধ রীতি পরিত্যক্ত হবার ফলে তারা তার ধারা ভুলে যায় এবং সৈন্যদলের পশ্চাতে প্রতিরোধ সারিও বিলাসব্যসনের আধিক্যের ফলে ক্রমশ বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায়। কারণ তারা যতক্ষণ প্রান্তরীয় জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ ছিল, ততক্ষণ তাদের আবাসস্থল ছিল তাঁবু এবং তারা কোথাও যেতে হলে প্রচুর উট ও গোত্রভুর্গত তাদের সকল পোষ্য স্ত্রী-পুত্রের বসবাসযোগ্য উপকরণাদি সঙ্গে নিয়ে যেত। অতঃপর রাজশক্তির বিলাসব্যসন দেখা দিল এবং তারা নগরে প্রাসাদে বসবাস করতে আরম্ভ করল, তারা প্রান্তরীয় জীবনের অভ্যাস ত্যাগ করল। পূর্বের ন্যায় উট আর পরিবারবর্গ নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি তাদের নিকট কষ্টদায়ক বলে মনে হতে লাগল। সুতরাং তারা স্ত্রী-পুত্রাদিকে ভ্রমণে যাওয়ার সময় পিছনে রেখে যেতে আরম্ভ করল। তদস্থলে রাজশক্তির বিলাসের পরিচায়ক বৃহৎ তাঁবু ও আচ্ছাদন ব্যবহার করতে লাগল এবং প্রয়োজনীয় বোঝা ও আসবাবপত্র বহনের জন্যই তারা কিছু সংখ্যক ভারবাহী পশু সঙ্গে নিত। যুদ্ধেও তাদের এ অবস্থার ব্যতিক্রম হত না। এর ফলে তাদের মধ্যে পূর্বের সেই স্ত্রী-পুত্রাদি ও পশুসম্পদ রক্ষার জন্য মৃত্যুপণ যুদ্ধের ইচ্ছা আর অবশিষ্ট রইল না। তাদের ধৈর্যের ভাব শিথিল হয়ে আসল এবং শত্রুর রণহুংকার তাদেরকে বিচলিত করতে লাগল। তাদের সারিবদ্ধ অবস্থায় পূর্বের দৃঢ়তা হ্রাস পেতে আরম্ভ করল।

অনুচ্ছেদ

সৈন্যদলের পশ্চাদভাগে একটি প্রতিরোধ সারি স্থাপন এবং আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণ রীতিতে তার অনিবার্যতার যে বিষয়টি আমরা বর্ণনা করেছি, তার ধারা অনুসরণ করে মাগরিবের রাজন্যবর্গ ফিরিঙ্গিদের একটি দলকে সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করতেন। তাদেরকে এরূপ প্রতিরোধ সারি হিসাবে ব্যবহার করার কারণ এই যে, বারবাররা স্বভাবত আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের রীতিতে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত; অথচ সুলতান তাঁর সম্মুখ ভাগের আক্রমণকারী সৈন্যদের আশ্রয়ের জন্য পশ্চাতে একটি প্রতিরোধ সারির প্রয়োজন অনুভব করতেন। সুতরাং এ পশ্চাতের সারিতে যারা থাকবে, তারা সারিবদ্ধ যুদ্ধরীতিতে অভ্যস্ত ও দৃঢ়তার অধিকারী হবে। অন্যথায় তারাও যদি সম্মুখ ভাগের সৈন্যের ন্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হতে থাকে, তা হলে সম্রাট ও সৈন্যদলের পরাজয়ের সমূহ

১৮০. রোজেনথালে 'আল-খয়বরী' এবং তিনি বর্ণিত খলিফার নাম ২য় মারোয়ান বলে মনে করেন।

www.amarboi.org

সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এ কারণেই মাগরিবের রাজন্যবর্গের জন্য এ উদ্দেশ্যে এমন একদল সৈন্য ব্যবহার করা দরকার, যারা ফিরিঙ্গিদের ন্যায় সারিবদ্ধ রীতিতে দৃঢ়তার অধিকারী। এজন্য তাঁরা এ সৈন্যদলের দ্বারা একটি সুদৃঢ় পশ্চাতের প্রতিরোধ সারি গড়ে তুলতেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিধর্মীদের দ্বারা যুদ্ধে সাহায্য গ্রহণের প্রশ্নটি জড়িত। কিন্তু একান্ত প্রয়োজনে এটা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। যেমন আমরা পূর্বে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছি যে সৈন্যদলের বিক্ষিপ্ত অবস্থার মধ্যে একটি সুদৃঢ় পশ্চাৎ সারি গড়ে তোলার জন্যই এর প্রয়োজন হত। ফিরিঙ্গীরা এ কাজের উপযোগী ছিল। কারণ, সারিবদ্ধ রীতিতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে তারা এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিত। সুতরাং অন্যদের অপেক্ষা এ ব্যাপারে তারা অধিকতর শক্তিশালী বলে বিবেচিত হত। কিন্তু এ প্রকার সাহায্য গ্রহণ শুধু মাগরিবের বার বার ও আরব বেদুইনদের সাথে যুদ্ধে ও বিদ্রোহ দমনে সংশ্লিষ্ট রাজন্যবর্গ গ্রহণ করতেন। ধর্মযুদ্ধে এরূপ সাহায্যের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কারণ এক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি তাদের সম্ভাব্য দুর্ব্যবহারের জন্য তা গ্রহণ করা হত না। বর্তমানকালে মাগরিবে এ রীতি প্রচলিত এবং আমরা তার কারণও বর্ণনা করেছি। 'আল্লাহ্ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত।'[১৮১]

অনুচ্ছেদ

আমরা জানতে পেরেছি যে, বর্তমানকালে তুর্কি জাতির লোকেরা তীর ছুঁড়ে যুদ্ধ করে থাকে। তারা সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধের সৈন্যবিন্যাস করে। তারা সমগ্র সৈন্যদল তিনটি সারিতে ভাগ করে একের পর অন্যকে বিন্যস্ত করে। তারা অশ্ব থেকে নেমে তীর নিক্ষেপের সরঞ্জামাদি তাদের সম্মুখে রাখে এবং বসে তীর চালনা করে। এভাবে প্রতিটি সারিই তার সম্মুখস্থ সারির জন্য প্রতিরোধ স্বরূপ কাজ করে এবং যাতে শত্রু তাদেরকে বিব্রত না করতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখে। এভাবে যে কোনো এক পক্ষ জয়ী না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। এ সেনাবিন্যাস বিরল ও সুদৃঢ়।

অনুচ্ছেদ

প্রাচীন জাতিগুলো যুদ্ধের সময় পরিখা খনন করার রীতি পালন করত। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন হলে সেনাদলের অবস্থানের চারদিকে পরিখা খনন করত, যাতে রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণ না ঘটে। কারণ রাত্রিকালীন এরূপ আক্রমণ অন্ধকার ও হিংস্রতার জন্য সৈন্যদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে এবং অন্ধকারের আবরণে গা-ঢাকা দিয়ে সৈন্যরা পলায়ন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সুতরাং এভাবে সৈন্যদলের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিলে পরাজয় বাস্তব আকার ধারণ করে। এ কারণেই তারা সৈন্যদলের অবস্থান তথা শিবিরের চারদিকে পরিখা খনন করত এবং সৈন্যদলের রাত্রিবাসের বিন্যাসও চারদিকে গোলাকার করে করা হত, যাতে শত্রুরা সহসা আক্রমণ করে তাদেরকে পর্যুদস্ত করতে না পারে। প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর এ ব্যাপারের উপযোগী শক্তি

১৮১. কোরান ২, ২৯; ২৩১।

www.amarboi.org

ছিল এবং এ কাজে প্রয়োজনীয় লোক নিয়োগ তারা করতে পারত। তারা সমস্ত অঞ্চল থেকে এ নিমিত্ত লোক সংগ্রহ এবং সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও জনবসতির ব্যাপকতার জন্য এটা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। অতঃপর জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল, সৈন্যসংখ্যা কমে গেল এবং প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাব দেখা দিল। সুতরাং এ রীতিও সকলে বিস্মৃত হল, যেন তার অস্তিত্বই কখনো ছিল না। আল্লাহ্ শক্তিমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

সিফ্‌ফিনের রণাঙ্গনে হজরত আলীর স্বীয় সহচরদের প্রতি উৎসাহব্যাঞ্জক বাণী ও উপদেশ

পাঠক, সিফ্‌ফিন দিবসে হজরত আলী তদীয় সহচরদের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও উপদেশের দিকে লক্ষ করুন। তাতে আপনি যুদ্ধবিদ্যার প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয় দেখতে পাবেন। বস্তুত এ ব্যাপারে তাঁর ন্যায় বিচক্ষণ আর কেই বা ছিলেন।

তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, তোমরা একটি সুদৃঢ় সৌধের ন্যায়[১৮২] তোমাদের সারিগুলোকে সমান কর। তোমাদের মধ্যে সশস্ত্রদেরকে সম্মুখে এবং নিরস্ত্রদেরকে পশ্চাতে স্থান দাও। দাঁতের মারি চেপে ধর, এতে তরবারীর আঘাত দৃঢ়তর হবে। বর্শাগ্রে কোন কিছু জড়িয়ে রাখ, তাতে তার ধারের তীক্ষ্ণতা অটুট থাকবে। দৃষ্টি নিম্নমুখী কর, এর ফলে মনোবল বাড়বে ও হৃদয়ে শান্তি পাবে। উচ্চরোল তুল না; কেননা নিম্নকণ্ঠ শৈথিল্য দূর করে ও আত্মমর্যাদা বাড়ায়। তোমাদের পতাকা সোজা রাখ; তাকে হেলিও না এবং তা বীর পুরুষ ব্যতীত অন্যের হাতে দিও না। সততা ও ধৈর্যের সাহায্য গ্রহণ কর; কেননা ধৈর্যের অনুপাতেই বিজয় লাভ সংঘটিত হয়।

এ উপলক্ষেই আল-আশতার[১৮৩] আজদ গোত্রকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা দাঁতের মারি জোরে চেপে ধর এবং শত্রুদের মুখোমুখি আক্রমণ কর। তোমরা সেই সমস্ত লোকের ন্যায় শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পর, যারা তাদের পিতা ও ভাইদের প্রতিশোধ গ্রহণে বঞ্চিত থাকার পর তার সুযোগ লাভ করেছে এবং তারা মৃত্যুপণ করে অগ্রসর হয়েছে, যাতে খালি হাতে ফিরতে না হয় এবং পৃথিবীর সম্মুখে লজ্জা পেতে না হয়।

আন্দালুসবাসী লামতুনা কবি আবুবকর আস্‌সাইরাফী তাশেফীন ইবনে আলী ইবনে ইউসুফের[১৮৪] প্রশংসাসূচক একটি কবিতায় উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। ইনি তাশেফীনকে যুদ্ধক্ষেত্রে যে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে দেখেছেন, তার প্রশংসা উপলক্ষে যুদ্ধ সম্পর্কে বহু উপদেশ ও সতর্কবাণীর উল্লেখ করেছেন। পাঠক, আপনি তাতে যুদ্ধব্যবস্থা সম্পর্কীয় অনেক কিছুই অবহিত হতে পারবেন। কবি বলেন,

---

১৮২. তুল, কোরান ৬১, ৪।

১৮৩. হজরত আলীর সেনাপতিদের অন্যতম; তার নাম মালিক ইবনে হারিস; মৃত্যু ৩৭ (৬৫৮ খ্রি:) হি।

১৮৪. আল মোরাবিতী সম্রাট; তিনি ৫৩৩ (১১৩৮ খ্রি:) হি. হতে তিন বছর রাজ্য পরিচালনা করেন। সাইরাফী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

www.amarboi.org

ওহে আবরণধারী[১৮৫] জনগোষ্ঠী!
তোমাদের মধ্যে উদ্দীপনাময় সাহসী সম্রাট কে?
কে সেই ব্যক্তি, যাকে শত্রুরা অন্ধকারে আক্রমণ করেছিল,
সকলেই ছত্রভঙ্গ হল; কিন্তু তিনি তখনো অবিচল।
অশ্বারোহী ও তরবারিধারীদের আঘাত প্রতিরোধ করলেন,
তাঁর প্রতি আনুগত্যের আকর্ষণ তখন ফিরে এল।
রাত তার অন্তর্গত শিরস্ত্রাণের ঔজ্জ্বল্যে যেন
সৈন্যদের শিরোপরি ভোরের আভা বহন করেছিল।
হে বনি সিনহাজা! তোমরা কোথায় পলায়নপর?
তোমরা কি সন্ত্রস্ত হয়ে ভয়ের মধ্যে প্রবেশ করছিলে।
চক্ষের মণি, তোমাদের দিক থেকে তার প্রতি কোন
বেদনা পৌছেনি, একটি হৃদয় বুকের মধ্যে রেখেছিলেন।
অথচ তোমরা তাশেফীনকে পরিত্যাগ করেছিলে,
তিনি চাইলে তজ্জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন।
তোমরা ত গভীর অরণ্যে সিংহতুল্য,
তোমাদের প্রত্যেকেই প্রতিটি বিপদ সম্পর্কে অবহিত।
হে তাশেফীন! তোমার সৈন্যদলের রাত্রির অক্ষমতা
দূর কর। অবশ্য সে অক্ষমতার কোনো প্রতিবিধান নেই।

(উক্ত কবিতায় যুদ্ধ ব্যবস্থা সম্পর্কে)

যুদ্ধের এমন কিছু রীতিনীতি তোমাকে উপহার দিচ্ছি,
যার সম্পর্কে তোমার পূর্বেকার পারস্য সম্রাটগণ আগ্রহী ছিলেন।
এমন নয় যে, এ সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে,
বরং কিছু উপদেশ, বিশ্বাসীদেরকে উজ্জীবিত করে ও উপকার দেয়।
বহুভাঁজ এমন বর্মগুলো পরিধান কর, যা
তুব্বা রাজন্যবর্গের শিল্পকুশলতার উত্তরাধিকার বহন করে।
এবং সুতীক্ষ্ণ ভারতীয় ছুরিকা সঙ্গে রাখ, যা
জয় ও পরাজয়ে সমান দক্ষতায় বর্মাদি ভেদ করে থাকে।
দ্রুতগামী অশ্বাদিতে আরোহণ কর, যেগুলো
সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করবে এবং বূহ্য ভেদ করবে।
শিবিরের চতুর্দিকে পরিখা খনন করো, এর ফলে
এমন একটি দুর্গ গড়ে উঠবে, যা ভেদ করা যায় না।
নদী পার হইও না; বরং তার তীরে শিবির স্থাপন কর,
তা তোমার সৈন্যদল ও শত্রুর মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করবে।
অপরাহ্নে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও; তোমার সৈন্যদলের পিছনে
এমন একটি গিরিবর্ত্ম থাকবে, যা প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
যদি সংকীর্ণ রণাঙ্গনে সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়,
তা হলে বর্শার আঘাতই সর্বাপেক্ষা সমীচীন।
প্রথম মুহূর্তেই প্রতিপক্ষকে আঘাত কর, ইতস্তত করো না;
কারণ তোমার দ্বিধান্বিত ভাব সুযোগ নষ্ট করে ফেলবে।
শক্তিমানকে তোমার সৈন্য প্রহরায় নিযুক্ত করো,
যাদের মধ্যে সততা আছে, প্রতারণা করবে না।
মিথ্যাবাদীদের হঠকারী সংবাদে কান দিও না, কারণ
মিথ্যাচারিতার জন্যই তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় না।

---

১৮৫. সিনহাজাদের বিশেষণ।

www.amarboi.org

এ কবিতায় কবির বক্তব্য : 'প্রথম মুহূর্তেই প্রতিপক্ষকে আঘাত কর, ইতস্তত করো না'—প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষের সাধারণ ধারণার বিরোধী।

কেননা হজরত উমর আবু উবাইদ ইবনে মাসুদ আস্সকফীকে ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধ পরিচালক নিযুক্ত করে বলেছেন, নবী (সঃ) সহচরদের কথা শুনো ও মান্য করে চলো এবং তাদেরকে এ বিষয়ে অংশীদার করো। যতক্ষণ না সকল বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সাড়া দিও না। কারণ এটা যুদ্ধ; এতে একমাত্র ধৈর্যশীল সেই ব্যক্তিই যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে, যার মধ্যে সুযোগের সদ্ব্যবহার ও সংযমের পরিমিত জ্ঞান আছে। অন্যত্র তাকে উদ্দেশ্য করেই তিনি বলেছেন, আমি সালিতকে[১৮৬] শুধু তার দ্রুততার জন্যই নেতৃত্ব দেইনি। বস্তুত সকল বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠবার পূর্বে যুদ্ধে দ্রুততা ক্ষতির কারণ হয়। আল্লাহ্‌র শপথ, এ ব্যাপারটি না থাকলে আমি তাকে নেতৃত্ব প্রদান করতাম। কিন্তু যুদ্ধে একমাত্র ধৈর্যশীল ব্যক্তিই যোগ্য।

হজরত উমরের এ বক্তব্যে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধে প্রয়োজনীয় অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে না ওঠা পর্যন্ত হঠাৎ কিছু করে বসা অপেক্ষা ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হওয়া ভালো। এটা সাইরাফীর বক্তব্যের বিরোধী; অবশ্য তাতে যদি এ কথাটি যোগ করে নেয়া যায় যে, একমাত্র অবস্থা সুস্পষ্ট হওয়ার পরই এরূপ তৎপরতা দেখাতে হবে, তা হলে হতে পারে। 'আল্লাহ্ উন্নত ও সর্বজ্ঞ'।

যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যদল থাকলেও বিজয় এদের উপরই নির্ভর করে না; বরং বিজয় ও প্রাধান্য অনেকাংশেই আকস্মিক ও ভাগ্য নির্ভর। এর তাৎপর্য এই যে, প্রাধান্য বিস্তারের বাহ্যিক উপাদান সামগ্রিকভাবে সৈন্যদল ও তার সংখ্যাধিক্য, প্রচুর সমরাস্ত্র ও তার নতুনত্ব এবং বীরপুরুষের আধিক্য ও প্রতিরোধ সারির বিন্যাস। এদের সাথে আন্তরিক যুদ্ধ পরিচালনা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারকেও যোগ করা যায়। অন্যদিকে এর অভ্যন্তরীণ উপকরণ হল, প্রতারণা ও আক্রমণগত কৌশল, শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙে দেবার জন্য প্রচারণা এবং সুবিধাজনক উচ্চস্থান থেকে আক্রমণ পরিচালনা, যাতে নিম্নে অবস্থানকারী শত্রুসৈন্য সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তদুপরি গোপন স্থান, জঙ্গল, সুরক্ষিত আড়াল ও পার্বত্য এলাকায় শত্রুর চোখে ধুলা দিয়ে এমনভাবে অবস্থান করা, যাতে হঠাৎ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। এতে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে এবং পালিয়ে প্রাণ রক্ষার উপায় খুঁজবে। এ প্রকার আরো বহু কৌশল বিদ্যমান। কিন্তু এ সকল অভ্যন্তরীণ উপকরণও অনেকটাই দৈবী ব্যাপার। আকস্মিক যোগ না ঘটলে মানুষের পক্ষে এর কোনোটাই পরিকল্পিতভাবে করা সম্ভব নয়। এমনকি এ সকলের ফলে শত্রুর মনে ভীতির সঞ্চারও হঠাৎ জন্মায় এবং এর ফলেই তাদের কেন্দ্রশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ও পরাজয় দেখা দেয়। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, এ অভ্যন্তরীণ কৌশলের অভাবেই পরাজয় ঘনিয়ে আসে। কারণ উভয় পক্ষই প্রাধান্য বিস্তারের জন্য এ কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে; সুতরাং তাদের মধ্যে যে কোনো একটি দলের এ ব্যাপারে কৃতকার্যতা লাভ হয়। সম্ভবত এ জন্যই হজরত মুহম্মদ

---

১৮৬. সালিত ইবনে ফয়েস এবং পূর্ব বর্ণিত আস্সকফী উভয়েই উক্ত অভিযানের প্রথম দিকে নিহত হন।

www.amarboi.org

(সঃ) বলেছেন, যুদ্ধ প্রতারণা মাত্র। আরবদের প্রবাদেও আছে অনেক কৌশল গোত্রশক্তি অপেক্ষাও উপকারী। এতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, যুদ্ধে জয়লাভ এ বাহ্যিক উপকরণ অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ কৌশলের উপরই সাধারণত নির্ভরশীল। এ গোপন কার্যকারণগুলোর সফলতাই ভাগ্যের অর্থ, যেমন যথাস্থানে তা প্রমাণিত হয়েছে। পাঠক এটাকে বিবেচনা করুন এবং বুঝে নিন। দৈবী সাহায্যের মাধ্যমে প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপারটিও অনুরূপ, যেমন আমরা বিশ্লেষণ করেছি। হজরতের এ কথার—'আমি এক মাসের পথের ব্যবধান থেকে ভীতির সাহায্যে জয়ী হয়েছি'—এর অর্থ হল অনুরূপ প্রভাব। তাঁর জীবদ্দশাতে স্বল্প সংখ্যার সাহায্যেই এভাবে পৌত্তলিকদের উপর জয়ী হয়েছিলেন এবং তাঁর পরে মুসলমানদের বিজয়াভিযানেও অনুরূপ বিষয় দেখা গেছে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীর জন্য বিধর্মীদেরকে সন্ত্রস্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে তাদের অন্তঃকরণে এক ভীতির ভাব প্রাধান্য পেয়েছিল এবং তারা পরাজয়বরণ করেছিল। এও হজরত মুহম্মদের (সঃ) অলৌকিকত্বের একটি নিদর্শন এবং এর প্রভাব শত্রুদের অন্তকরণে প্রবেশ করার ফলেই সকল ইসলামী বিজয়াভিযান সাফল্যলাভ করেছিল। অবশ্য এর কোনো চাক্ষুষ নিদর্শন কোথাও ছিল না।

আত্তুরতুশী বর্ণনা করেছেন যে, দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের সাথে অধিক সংখ্যক বিখ্যাত অশ্বারোহী বীরদের অবস্থান এ প্রাধান্য বিস্তারের কারণ হয়ে থাকে। যেমন এক পক্ষে দশ অথবা বিশজন অনুরূপ বীর বিদ্যমান এবং অন্যপক্ষে আট অথবা ষোলজন। অনুরূপ ক্ষেত্রে একজন বীরের আধিক্যও বিজয়ের কারণ হতে পারে। তিনি এ কারণটি বারংবার ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এটা আমাদের পূর্ব বর্ণিত সেই বাহ্যিক উপকরণের দিকে ইঙ্গিত করে এবং এ জন্যই সঠিক নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে যা বিবেচনাযোগ্য, তা হল গোত্রপ্রীতি অবস্থা। যদি কোনো পক্ষে একটি নিরেট গোত্রপ্রীতির শক্তি থাকে এবং অন্যপক্ষে একাধিক গোত্রপ্রীতির অস্তিত্ব দেখা যায়, তা হলে একাধিক গোত্রপ্রীতির অধিকারীদের মনোবল সহজেই ভেঙে পড়ে, যেমন গোত্রপ্রীতিহীন একক জনসমষ্টির বেলায় হয়ে থাকে। যদি সকল গোত্রপ্রীতি মিলে একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তা হলে একাধিক গোত্রপ্রীতির অধিকারী পক্ষ এ ঐক্যের বিরুদ্ধে কিছুতেই এঁটে উঠবে না। পাঠক, এটা বুঝে নিন।

জেনে রাখুন, আত্তুরতুশীর বক্তব্যের ধারা অনুসরণ করলে উপরোক্ত মন্তব্যই আমাদের নিকট শুদ্ধতর বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি এ গোত্রপ্রীতির কোনো উল্লেখ করেননি। কারণ তার আবাসস্থল ও দেশে এর কোনো অস্তিত্বই নেই। তারা প্রতিরোধ, সহায়তা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে একক শক্তিকেই একত্র করে জনগোষ্ঠী গড়ে তোলে। তাদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি বা বংশধারার কোনো প্রভাব বিবেচনা করা হয় না। আমরা গ্রন্থের প্রথম দিকেই এ ব্যাপারে বর্ণনা করেছি। অথচ এতদ্সত্ত্বেও এটা ও এটার অনুরূপ অন্যান্য উপকরণের শুদ্ধতা মেনে নিলেও এগুলো একান্তই বাহ্যিক উপকরণ মাত্র। যেমন সশস্ত্র সৈন্যদল, আন্তরিক যুদ্ধ পরিচালনা ও সমরাস্ত্রের আধিক্য এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের একত্র সমাবেশ। কিন্তু একমাত্র এগুলোকে প্রাধান্য বিস্তারের নিয়ামক কী করে বলা যায়? পাঠক, আমরা ইতিপূর্বে আপনার সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করেছি

www.amarboi.org

যে, এদের কোনোটিই অভ্যন্তরীণ উপকরণ, যেমন কৌশল ও প্রতারণা এবং দৈবী প্রভাব ও হীনমন্যতাবোধের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং আপনাকে এটা বুঝে নিতে হবে এবং সৃষ্ট জগতের অবস্থাদি সম্পর্কেও চিন্তা করতে হবে। বস্তুত আল্লাহ্‌ই দিন রাত্রির পরিবর্তন করে থাকেন।[১৮৭]

অনুচ্ছেদ

যুদ্ধ সম্পর্কীয় প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তার অভ্যন্তরীণ ও অস্বাভাবিক উপকরণের সাথে খ্যাতি ও যশের ব্যাপারটিও যোগ করা যায়। অবশ্য এটা খুব কম ক্ষেত্রেই যথাস্থানে প্রযোজ্য হতে দেখা যায়। রাজন্যবর্গ, জ্ঞানী, পুণ্যাত্মা ও সদাচারের অধিকারী সকলের সম্পর্কেই এ কথা বলা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের অখ্যাতি দূর-দূরান্তে ব্যাপ্ত হয়েছে, তারা মূলত তদ্রূপ নয়। এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন, যাঁরা কোনো খ্যাতির অধিকারী হননি, অথচ তাঁরা যথার্থই এর যোগ্য ছিলেন। আবার অনেক সময় যথার্থ আধারেই খ্যাতি স্থাপিত হয় এবং তা অধিকারীর বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দেয়।

এর কারণ এই যে, খ্যাতির এ ব্যাপারটি শ্রুতির মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করে এবং এক্ষেত্রে বর্ণনাকারীরা ক্রমশ তার উদ্দেশ্য ভুলে যায়। এর ফলে তাতে আতিশয্য ও অতিরঞ্জন দেখা দেয়; নানাবিধ কল্পনা এবং যথার্থ ঘটনার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের অভাবে মূর্খতা প্রাধান্য বিস্তার করে। কারণ বর্ণনাকারী বুঝতেও পারে না যে, তাতে কারুকার্য ও বিভ্রান্তি বিদ্যমান। অন্যদিকে পার্থিব জীবনের স্বার্থে প্রতাপশালী ও ক্ষমতাবানদের স্তুতি ও চাটুকারিতার জন্যও এরূপ আতিশয্য দেখা দেয়। যা নেই তারই প্রশংসা করে এবং শোভন অবস্থার উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রচারকার্যে লিপ্ত হয়। মানুষ স্বভাবতই প্রশংসাকাতর এবং পার্থিব সম্মান ও সম্পদ লাভে একান্ত আগ্রহী। এ কারণে তারা সৎগুণ অবলম্বন বা সৎলোকের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব খুব কমই পোষণ করে। সুতরাং তাদের এ সদাচারের প্রশংসার সাথে তাদের বাস্তব অবস্থার কোনো মিল নেই। এ খ্যাতি তার অভ্যন্তরীণ উপকরণগত শক্তির ক্ষেত্রে অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয় এবং সত্য থেকে দূরে সরে যায়। এ কারণেই অভ্যন্তরীণ গুপ্তকার্যকারণের সমন্বয়ে যা বাস্তব হয়ে ওঠে, তাকেই ভাগ্য বলে মনে করা হয়, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই সহায়।

১৮৭. তুল, কোরান ৭৩, ২০।

www.amarboi.org

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজকোষ[১৮৮] এবং তার সমৃদ্ধি ও বিনষ্টের কারণ]

জেনে রাখুন, সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে রাজকোষের ভিত্তিগত করের পরিমাণ কম থাকে; কিন্তু অধিক আদায়ের জন্য তার সমষ্টি অধিক হয় এবং শেষের দিকে করের পরিমাণ বেশি কিন্তু অনাদায়ের ফলে তার সমষ্টিগত পরিমাণ হ্রাস পায়। এর কারণ এ যে, সাম্রাজ্য যদি ধর্মীয় বিধান অনুসরণ করে গড়ে ওঠে, তা হলে তা ধর্মীয় নীতির অনুসারী করাদি, যেমন জাকাত, রাজস্ব, মাথট প্রভৃতি ধার্য করে থাকে। এরূপ করের পরিমাণ কম। পাঠক, আপনি জানেন যে, সম্পদের জাকাত পরিমাণের দিক থেকে খুবই কম। এভাবে শস্য ও পশুসম্পদের জাকাত এবং মাথট, রাজস্ব ও অন্যান্য ধর্মীয় বিধি নির্ধারিত করের অবস্থাও অনুরূপ। এগুলোর নির্দিষ্ট সীমা আছে, যা অতিক্রম করা যায় না। অন্যদিকে সাম্রাজ্য যদি প্রাধান্য বিস্তারের রাজকীয় ধারাকে অনুসরণ করে এবং গোত্রপ্রীতির উপর নির্ভরশীল হয়, তা হলেও প্রথম দিকে তার প্রান্তরীয় জীবনের প্রভাব পরিত্যাগ করতে পারে না, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রান্তরীয় জীবনবোধের সারল্যের ফলেই অপরের প্রতি সমীহ ও সম্মানের ভাব এবং নমনীয়তা ও অপরের সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে। খুব কম ক্ষেত্র ব্যতীত সাধারণভাবে তৎপ্রতি উদাসীনতাই দেখা যায়। এ কারণেই পদাদি যেমন কম থাকে, তেমনি কর আদায়ের ব্যবস্থাও তেমন সক্রিয় থাকে না, যদ্বারা সম্পদ একত্র হতে পারে। সুতরাং এভাবে প্রজাদের উপর পদাদির চাপ ও করের বোঝা কম তাকায় তারা কাজকর্মে উৎসাহী ও আগ্রহী হয়ে ওঠে। জনবসতি বাড়তে থাকে এবং শুল্ক-করাদির অভাবে তাদের আয় বৃদ্ধি পায়। এভাবে জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ ব্যয় নির্বাহের জন্য পদ ও করের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে এবং তার একত্রীকরণে রাজকোষের সমৃদ্ধি দেখা দেয়। সুতরাং এভাবে যখন সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়ে ওঠে ও একটা ধারাবাহিকতার সৃষ্টি হয় এবং একের পর এক সম্রাটের আবির্ভাব ঘটতে থাকে, তখন তাঁরা অনেকাংশে মার্জিত হয়ে ওঠেন। বেদুইন জীবনের বদভ্যাস, সারল্য, বিতৃষ্ণা ও কৃচ্ছ্রতা দূর হয় এবং রাজকীয় শক্তির দণ্ড ও নাগরিক জীবনের অমোঘ আকর্ষণ পরিমার্জনার আবির্ভাব ঘটায়। সাম্রাজ্যের অধিবাসীরাও তখন চালাক ও চতুর হয়ে ওঠে এবং প্রাচুর্য ও বিলাসব্যসনে অতি মাত্রায় নিয়োজিত থাকার ফলে তাদের অভ্যাস ও প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে সম্রাটগণ প্রজাদের উপর তথা কৃষি কর্মী, কৃষক ও অন্যান্য করদাতাদের উপর করের পরিমাণ

---

১৮৮. মূলে আছে 'জেবায়ত'; আমরা এর অনুবাদ 'রাজকোষ' করেছি। রোজেনথালে 'কর নির্ধারণ'।

www.amarboi.org

বৃদ্ধি করেন এবং এভাবে পদ ও কর ইত্যাদির অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে রাজকোষের অবস্থা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তারা ক্রয়-বিক্রয়ের উপরও কর বসান, যেমন আমরা পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করছি।

অতঃপর এভাবে এক পরিমাণের সাথে অন্য পরিমাণ যুক্ত হয়ে ক্রমশ কর বৃদ্ধি পায়। কারণ সাম্রাজ্যের বিলাসব্যসনের চাহিদাও তখন তার অভ্যাস অনুসারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রয়োজন ও তদনুযায়ী ব্যয়ের হার বেড়েছে। এর ফলে এক সময়ে এ করভার প্রজাদের কাঁধে ভারী হয়ে ওঠে এবং তারা তার নিচে পড়ে নিষ্পেষিত হতে থাকে। এ কর আদায়ের ব্যাপারটি তখন একটি বাধ্যতামূলক অভ্যাসে পরিণত হয়। কারণ এ পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যাপারটি অল্পে অল্পে সংঘটিত হয়েছে। এ জন্য কেউই লক্ষ করেনি যে, কোন সময় তা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ বোঝাকে চাপিয়ে দিয়েছে। বরং তা শেষ পর্যন্ত একটি বাধ্যতামূলক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এর পরেও এরূপ কর বৃদ্ধির গতি এক সময় সাধারণ সহ্যসীমা অতিক্রম করে। এর ফলে প্রজাসাধারণের মধ্যে আয়ের অভাবজনিত নিরাশা দেখা দেয় এবং তার পরিণাম হিসাবে কর্মস্পৃহা বিনষ্ট হয়ে থাকে। কারণ তারা তখন তাদের লাভ ও কর, ফসল ও তজ্জনিত উপকারিতার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না। এর ফল এ দাঁড়ায় যে, জনসাধারণের অধিকাংশই কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় কর আদায়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় রাজকোষও দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। রাজকোষের এইপ্রকার দুরবস্থা দূর করার জন্য অনেক সময় শুল্ককরাদি আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়, যাতে এ ক্ষতি পূরণ করা যায়। এর ফলে এ সকল কর ও শুল্ক এমন একটা সীমায় পৌঁছে, যার পরে আর কোনো লাভজনক বা সুবিধাজনক স্তর নেই। কারণ তখন সাম্রাজ্যের ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে কর নির্ধারণের বিষয়টিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, জনসাধারণ তার দ্বারা উপকার পাবার আর আশা করতে পারে না। সুতরাং রাজকোষের সমৃদ্ধি হ্রাস পেতেই থাকে এবং তার ক্ষতিপূরণের জন্য করের বোঝাও বেড়ে চলে। এক সময়ে জনবসতির কর্মোদ্যম সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তার প্রতিক্রিয়া সাম্রাজ্যের জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়; যেমন জনসাধারণের সমৃদ্ধি তার সমৃদ্ধির কারণ হয়।

পাঠক, যদি এ বিষয়টি বুঝে থাকেন, তা হলে আপনি এটা নিশ্চয় জানতে পেরেছেন যে, জনগণের সমৃদ্ধির সর্বাপেক্ষা শক্তিমান উপকরণ হল যতদূর সম্ভব তাদের করভার লাঘব করা। কারণ এর ফলে মানুষ নানাবিধ কর্মোদ্যমে নিজেকে নিয়োজিত করে সুখী হবার কামনা করতে পারে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্ব কর্মের অধীশ্বর এবং তাঁর হাতেই সর্ব বিষয়ের ক্ষমতা।[১৮৯]

---

১৮৯. তুল. সূরা ইয়াসীনের শেষাংশ।

www.amarboi.org

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় শুল্ক ধার্য করা হয়]

জেনে রাখানু, সাম্রাজ্য শক্তি তার প্রথমাবস্থায় প্রান্তরীয় চরিত্রের অধিকারী হয়, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। এ জন্য বিলাসব্যসন ও তার অভ্যাসের অভাবে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের ধারণা কম থাকে। এর ফলে ব্যয়ের মাত্রাও কম হয় এবং রাজকোষে আয়ের মাত্রা বেশি হয়ে বহুগুণ উদ্বৃত্ত অবস্থা বিরাজ করে। কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিন থাকে না। নাগরিক জীবনের বিলাস ও তার আচার-অনুষ্ঠান দেখা দিয়ে এ শক্তিও পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর ধারা অনুসরণ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এর ফলে সাম্রাজ্যাধিকারীদের খরচের মাত্রা বেড়ে যায়। বিশেষ করে সম্রাটের নিজের ব্যয় ও তদীয় সভাসদ ও অমাত্যবর্গের মধ্যে দানধ্যানের প্রাচুর্য ব্যয়ের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং রাজকোষ আর এর যোগান দিতে সমর্থ হয় না। কাজেই সম্রাটের এ নিজস্ব ব্যয় ও সহায়ক শক্তির জন্য দানধ্যানের প্রয়োজনে রাজকোষের সমৃদ্ধি সাধন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর ফলে প্রথমে রাজস্ব ও করের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয়, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। আবার এর প্রভাবেই ব্যয়, প্রয়োজন ও বিলাসব্যসনের পর্যায়ক্রমিক অভ্যাস বৃদ্ধি পায় এবং সাম্রাজ্যের সহায়ক শক্তি ও তাদের প্রাপ্যাদির ক্ষেত্রও উক্ত প্রভাবের অধীন হয়ে ক্রমশ সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ী চরিত্র ফুটে উঠতে থাকে। তার রাজকোষের আর্থিক সঙ্গতি বিধানে কর্মচারী ও দূরদূরান্তে অবস্থিত অঞ্চলগুলো অপারগ হয়ে ওঠে। সুতরাং রাজকোষের শক্তি কমতে থাকে এবং বিলাসব্যসনের অভ্যাস বাড়তে থাকে। আর এর অনিবার্য প্রভাবে সৈন্যদলের বেতন ও পুরস্কার বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় সম্রাটের পক্ষে রাজকোষের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার কর ধার্য করা, বিশেষ করে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর শুল্ক ধার্য করার মত নতুন উপায় খুঁজতে হয়। এ ক্ষেত্রে বাজারের ক্রয়-বিক্রয় মূল্যের উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর এবং নগরের সিংহদ্বারগুলো দিয়ে যাতায়াতকারী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ পরিমাণেরও কোনো স্থিরতা থাকে না। কারণ মানুষের জীবন-যাপনে বিলাসের প্রবণতা থাকায় পুরস্কারাদি যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সহায়ক শক্তি ও সৈন্যদলের প্রয়োজনও অত্যধিক হয়ে ওঠে। অনেক সময় সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে এগুলোর পরিমাণ একটা চরম সীমায় উপনীত হয়। ফলে নিরাশায় বাজারগুলো ছেয়ে যায় এবং এর প্রভাব জনবসতির উপর ছড়িয়ে পড়ে। এর অনিবার্য পরিণতি সাম্রাজ্যের দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলে এবং এ বৃদ্ধি ক্রমাগত স্থায়ী হয়ে তার বিনাশ ডেকে আনে।

www.amarboi.org

এ প্রকার বহু ঘটনা পূর্বাঞ্চলের আব্বাসী ও উবাইদী সাম্রাজ্যের ব্যয়ভার বহনের জন্য সংঘটিত হতে দেখা গেছে। হজের মওসুমে হাজীদের উপরও তাঁরা কর ধার্য করেছেন। অতঃপর সম্রাট সালাহউদ্দিন আইউব এসে এগুলো বাতিল করেন এবং সাম্রাজ্য ব্যবস্থায় একটা কল্যাণধর্মিতার প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সময়ে আন্দালুসেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছিল। পরে আলমোরাবেতী সম্রাট ইউসুফ ইবনে তাশেফীন এসে এ প্রকার কর প্রথার বিলোপ সাধন করেন। বর্তমানকালে আফ্রিকিয়ার আল-জারিদ অঞ্চলের নগরগুলোতেও তাদের নেতৃবৃন্দের অন্যায্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অনুরূপ কর বৃদ্ধির ধারা অনুসৃত হচ্ছে।[১৯০] মহান আল্লাহ্ই সব কিছু জানেন।

১৯০. আবুহেফস বংশীয় আবুবকর হতে আবুল আব্বাস কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.amarboi.org

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[সম্রাটের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ প্রজাদের জন্য ক্ষতিকর এবং রাজকোষের জন্য সঙ্গতি বিনাশক]

পাঠক, জেনেছেন যে, যখন বিলাসব্যসন ও তার বিচিত্র অভ্যাসের দরুন রাজকোষ অপর্যাপ্ত ঠেকে, যেমন পূর্বে বর্ণনা করেছি এবং এতদসম্পর্কীয় ব্যয়ভার বহন করতে ও প্রয়োজন মেটাতে তা অক্ষম হয়, তখন স্বভাবতই অধিক সম্পদ সংগ্রহ করে তার সঙ্গতি বাড়াবার চেষ্টা করা হয়। তা কখনো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর শুল্ক ধার্য করে, আবার কখনো প্রতিষ্ঠিত শুল্ক ব্যবস্থার উপর নতুন নামের বৈচিত্র্য সাধন করে অর্জিত হয়ে থাকে। কখনো এর জন্য কর্মচারী ও শুল্ক আদায়কারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের মেদমজ্জা শোষণ করা হয়। কারণ দেখা যায় যে, তারা এরূপ শুল্ক ব্যবস্থার কল্যাণে এমন সম্পদ কুক্ষিগত করেছে, যা হিসাব-নিকাশে ধরা পড়ে না। কখনো রাজকোষের সমৃদ্ধির নামে সম্রাটের পক্ষ থেকে ব্যবসা ও কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করা হয়। এরও কারণ হল এ যে, ব্যবসায়ী ও কৃষকরা অতি সামান্য পুঁজি ব্যবহার করে অধিক মুনাফা ও ফসল লাভ করছে; সুতরাং সম্রাটের পক্ষ থেকে যদি অধিক পুঁজি ব্যবহার করা যায়, তা হলে আরো অধিক সম্পদ রাজকোষে সঞ্চিত হতে পারে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সম্রাটের পক্ষ থেকে পশুসম্পদ ও শস্যক্ষেত্রের উপর পুঁজি বিনিয়োগ এবং তার উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাতকরণে মনোনিবেশ করা হয়। তাদের ধারণা, এতে রাজকোষের সমৃদ্ধি ও সম্পদ সংগ্রহে অধিকতর উপকার লাভ করা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা একান্তই ভ্রমাত্মক এবং এর ফলে অনেক দিক থেকেই প্রজাসাধারণের ক্ষতির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

প্রথমত কৃষক ও ব্যবসায়ীরা পশুসম্পদ ও পণ্যাদি ক্রয়ের ব্যাপারে পুঁজির অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গতির অভাব দেখা দেয়। কারণ প্রজারা এ ব্যাপারে একে অন্যের সমতুল্য এবং সুবিধার ক্ষেত্রে পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রতিযোগিতা একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত পরস্পরকে অনুসরণ করে তাদের সঙ্গতি ও নৈকট্য অনুসারে অবস্থানে করে। সুতরাং এ অবস্থায় যদি সম্রাট তাঁর বিরাট পুঁজির ক্ষমতা নিয়ে সেখানে আবির্ভূত হন, তা হলে অন্য কারো পক্ষে তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এর ফলে মানুষের মনে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা দেখা দেয়।

www.amarboi.org

তদুপরি সম্রাটের পক্ষে এ সকল পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশকেই বাধ্যতামূলকভাবে অথবা স্বল্পমূল্যে কুক্ষিগত করা সম্ভব হয়। এর ফলে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতার অভাবে তাদের মূল্য হ্রাস পায় এবং বিক্রেতার উপর এর প্রভাব পড়ে।

অন্যদিকে সম্রাটের পরিচালিত কৃষিকর্ম থেকে যখন শস্য, রেশম, মধু, চিনি ও অন্যবিধ পণ্য উৎপন্ন হয় এবং নানা প্রকারের বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য তাঁর কুক্ষিগত হয়, তখন তাকে যথারীতি বাজারজাতকরণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের চাহিদার প্রতি তাঁর কর্মচারীরা লক্ষ করে না। কারণ এরূপ করতে গেলে সাম্রাজ্যের অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা; সুতরাং তারা এ সকল পণ্যের ক্রেতা কৃষক ও ব্যবসায়ীর উপর এগুলো ক্রয় করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে এবং তজ্জন্য তাদের নির্ধারিত ও অতিরিক্ত মূল্য দিতে বাধ্য করে। এর ফলে ক্রেতাদের নগদ মূলধনের সমস্তই তাদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এ সকল পণ্যদ্রব্য ক্রেতাদের হাতে অচল মজুদ হিসাবে স্থায়ী হয়ে ওঠে এবং এগুলোর মধ্য দিয়ে তারা তাদের জীবিকা ও আয়ের যে ইচ্ছা পোষণ করত, তার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। অনেক সময় তারা বাধ্য হয়ে আর্থিক প্রয়োজনে তাদের মজুদ মালের কতকাংশ মন্দা বাজারে কম মূল্যে বিক্রয় করে দেয়। এভাবে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা বারবার অনুরূপ লোকসানের সম্মুখীন হওয়ার ফলে তাদের পুঁজি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তারা বসে পড়ে। এ অবস্থা বারবার ঘুরে-ফিরে আসতে থাকে। এর ফলে প্রজাদের মধ্যে অসুবিধা, অসঙ্গতি ও অলাভের হতাশা ছড়িয়ে পড়ে এবং এ ব্যাপারে তাদের তৎপরতাকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেয়। এর পরিণতিতে রাজকোষের অসঙ্গতি বেড়ে ওঠে। কারণ রাজকোষের অধিকাংশ অর্থ আসে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের উপর ধার্যকৃত কর থেকে এবং বিশেষভাবে অনুরূপ করাদি ধার্য করার পর এ অবস্থা আরো বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। সুতরাং কৃষকরা যখন কৃষিকাজ বন্ধ করে এবং ব্যবসায়ীরা যখন ব্যবসা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, তখন রাজকোষের সমৃদ্ধি ভেঙে পড়ে বা তার মধ্যে মারাত্মক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিয়ে থাকে।

অতএব সম্রাট যদি তাঁর ধার্য করের দ্বারা রাজকোষের সঙ্গতির সাথে তৎকর্তৃক পরিচালিত কৃষি ও ব্যবসার লাভের তুলনামূলক বিচার করেন, তা হলে দেখতে পাবেন, তা সেই তুলনায় একান্তই নগণ্য। তদুপরি তা লাভজনক হলেও তা তাঁর রাজকোষের এমন একটা বিরাট অংশ গ্রাস করবে, যা তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ধার্য কর থেকে পেতে পারতেন। কারণ তাঁর পরিচালিত কৃষি ও ব্যবসাতে অনুরূপ কর ধার্যের কথা চিন্তাও করা যায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অন্যরা থাকলে তাদের উপর ধার্যকৃত সমস্ত করের আয় রাজকোষে আসত। তদুপরি এর ফলে জনবসতির উপর অন্যায্য চাপ সৃষ্টি হয় এবং তাদের এরূপ অসুবিধা সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রজারা যদি তাদের সম্পদকে কৃষি ও ব্যবসার মাধ্যমে ফলবান করতে না পারে, তা হলে তা ব্যয়ের দ্বারা অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এতে তারা দুরবস্থার সম্মুখীন হবে। পাঠক, এটা বুঝে নিন।

পারস্যবাসীরা সম্রাটের বংশধর ব্যতীত অন্য কাউকেও সম্রাট হিসাবে গ্রহণ করত না। তদুপরি তাকে মর্যাদা, ধর্ম, বিনয়, দান, বীরত্ব, ভদ্রতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হত। এর উপরে তারা ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শর্ত আরোপ করত। তিনি কোনো

www.amarboi.org

শিল্পকর্ম গ্রহণ করতে পারবেন না; কেননা এতে প্রতিবেশীর ক্ষতির সম্ভাবনা এবং তিনি কোনো ব্যবসায় অবলম্বন করবেন না; কারণ এতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা অত্যধিক। তিনি কোনো ক্রীতদাসকে চাকর হিসাবে গ্রহণ করতে পারবেন না; কারণ সে তাঁকে কোনো প্রকার সৎ ও কল্যাণধর্মীয় পরামর্শ দিতে সমর্থ নয়।

পাঠক, জেনে রাখুন, বস্তুত সম্রাটের সম্পদ বৃদ্ধি ও তাঁর আনুপূর্বিক সমৃদ্ধি একমাত্র রাজকোষের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব এবং রাজকোষের সঙ্গতি বৃদ্ধিও কেবলমাত্র ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রতি যথাযথ ব্যবহার ও তাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দানের মাধ্যমেই হতে পারে। এর ফলে তাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের অধীনস্থ সম্পদকে ফলবান ও বর্ধমান করতে তাদের চিত্ত প্রসারতা লাভ করবে। পরিণামে সম্রাটের রাজকোষ তা দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। কিন্তু এ পন্থা ব্যতীত তাঁর পরিচালিত কৃষি ও ব্যবসা তা প্রজার আশু ক্ষতিকারক, রাজকোষের বিনাশক এবং জনবসতির সংহারক মাত্র। কখনো অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, বিভিন্ন অঞ্চলে এ সকল প্রাধান্য বিস্তারকারী আমীর শ্রেণীর কৃষক ও ব্যবসায়ীরা মন্দা বাজারের সুযোগ গ্রহণ করে তাদের নিকট আগত পণ্যাদির যথেচ্ছা মূল্য নির্ধারণ করে ক্রয় করে এবং এ সকল পণ্য আবার তাদের ইচ্ছামত মূল্যে প্রজাদের নিকট বিক্রয় করে থাকে। এটা পূর্বেরটির অপেক্ষাও অধিকতর জঘন্য এবং এর ফলে প্রজাদের অবস্থা-ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়। অনেক সময় সম্রাটকে এ শ্রেণীর লোকেরা অর্থাৎ কৃষক ও ব্যবসায়ীরা উপরোক্ত বিষয়ে উৎসাহিত করে এবং তাদের হাবভাবে মনে হয় যে সম্রাট এ কাজের জন্যই নিয়োজিত হয়েছেন। এভাবে তারা তাঁকে লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করে অতিক্রত সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তৎপর হয়। কারণ তাদের এ ব্যবসার জন্য সম্রাটকে কোনো প্রকার কর বা শুল্ক প্রদান করে না। এর ফলে তাদের সম্পদ খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং অতিরিক্ত ফল দান করতে থাকে। কিন্তু এর অন্তরালে সম্রাটের রাজকোষের যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা কেউই বুঝতে চায় না। সুতরাং সম্রাটের জন্য এমনি ধরনের সকল প্রচেষ্টা ত্যাগ করা উচিত, যাতে তাঁর রাজকোষ ও সাম্রাজ্যের ক্ষতি হতে পারে। আল্লাহ্ আমাদের সৎপথ প্রাপ্তির ইঙ্গিত প্রদান করে থাকেন এবং আমাদেরকে সৎকার্যে উদ্বুদ্ধ করে উপকৃত করেন। মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানের আধার।

www.amarboi.org

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[সম্রাট ও তাঁর সভাসদদের সমৃদ্ধি লাভ সাম্রাজ্যের মধ্য ভাগেই ঘটে থাকে]

এর কারণ এ যে, সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে রাজকোষ সাম্রাজ্যাধিপতির বংশ বা গোত্রের সহায়তা ও গোত্রশক্তির অনুপাতে তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে থাকে। কারণ তখন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করার জন্য তাদের প্রয়োজন সর্বাধিক; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। এ জন্যই সাম্রাজ্যাধিপতি তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে রাজকোষ সম্পর্কে সংযমের পরিচয় দেন এবং এর মাধ্যমে তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের কাজ সম্পূর্ণ করেন। এ অবস্থায় সম্রাট যেমন নিজ গোত্রের শ্রদ্ধা লাভ করেন, ঠিক তেমনি তার প্রতিষ্ঠাকে স্থায়ী করার জন্য তাদের সহায়তারও প্রয়োজন হয়। কাজেই রাজকোষ থেকে তাদের সকলের প্রয়োজন মিটিয়ে তিনি অতি অল্পই গ্রহণ করেন। পাঠক, এ সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখতে পাবেন, সম্রাটের অন্তরঙ্গ পারিষদ এবং উজির, লেখক, আশ্রিত পোষ্য প্রমুখ সভাসদদের অবস্থা তেমন ভালো নয়। কারণ তাদের মর্যাদা তখন গোত্রান্তর্গত প্রভুদের মর্যাদার দ্বারা খণ্ডিত এবং ক্ষমতার বিন্যাস তখন গোত্রশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

অতঃপর যখন সাম্রাজ্যের প্রকৃতি বিস্তার লাভ করে এবং জাতির উপর সাম্রাজ্যাধিপতির প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ হয় তখন সম্রাট প্রতিষ্ঠাতা গোত্রের সহায়তা ও সেবার অনুপাতে ন্যায্য প্রাপ্যাদি ব্যতীত অন্য সকল সুবিধা খর্ব করে আনেন এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপারে তাদের প্রয়োজনের স্বল্পতার জন্যই রাজকোষে তাদের অধিকার হ্রাস পায়। তখন আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা সাম্রাজ্যের শক্তি সংগঠন ও দায়িত্ব পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে এবং সম্রাট সমগ্র রাজকোষ অথবা তার অধিকাংশের উপর একক আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি সমস্ত সম্পদের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে রাজশক্তির সঙ্গতি বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে তা ব্যয় করেন। এভাবে তাঁর আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পায়, তার ধনভাণ্ডার পূর্ণতা লাভ করে, তাঁর মর্যাদার বিন্যাস ব্যাপক এবং সমগ্র জাতির মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং তাঁর অন্তরঙ্গ পারিষদ ও উজির, লেখক, প্রতিহারী, পোষ্য, রক্ষী প্রমুখ সভাসদদের প্রয়াজনীয়তা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তারা সম্পদ ও ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অতঃপর যখন সাম্রাজ্যে অবক্ষয় দেখা দেয় এবং তার প্রতিষ্ঠাতা গোত্রশক্তি ও গোত্রপ্রীতির ক্ষমতা হ্রাস পায়, তখন আবার সম্রাটের জন্য সাহায্যকারী ও সহায়ক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ তখন বিদ্রোহ দমন বিবাদ-ভাজন

www.amarboi.org

ও সীমান্ত সংরক্ষণ একান্ত বাস্তব প্রয়োজন এবং এর অভাবে সাম্রাজ্যের ভারসাম্য নাশের সম্ভাবনা। সুতরাং সম্রাট তখন তাঁর সহায়ক শক্তির জন্যই ব্যয় করতে তৎপর। তারা গোত্রপ্রীতি ও তরবারীর শক্তির অধিকারী জনগোষ্ঠী। তাদেরকে সম্মুখে রেখে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সম্রাটের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার তখন নিঃশেষিত হয়। তদুপরি, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, এ সময় অধিক দানধ্যান ও ব্যয়ের জন্য রাজকোষের প্রসারও অনেকখানি সংকুচিত হয়ে আসে। রাজস্ব কমে যায় এবং সাম্রাজ্য অর্থের অনটনে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং অন্তরঙ্গ সভাসদ তথা প্রতিহারী, লেখক প্রমুখ পাত্রমিত্রদের মর্যাদা হ্রাস পাবার ফলে তাদের প্রতি সম্রাটের বিলাসী বদান্যতায় ভাঁটা পড়ে। ফলে সাম্রাজ্যাধিপতির অন্তরঙ্গ শক্তির বিন্যাস সংকীর্ণ হয় এবং তাঁর সম্পদের প্রয়োজন আরো তীব্র আকার ধারণ করে। সুতরাং অন্তরঙ্গ পারিষদ ও পাত্রমিত্ররা বংশানুক্রমে যে সম্পদ কুক্ষিগত করেছিল, তাও ব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে এ পাত্রমিত্ররা তাদের পূর্বপুরুষের অর্জিত সম্পদকে এমন এক পথে অর্থাৎ সম্রাটের সহায়তায় ব্যয় করতে বাধ্য হয়, যে জন্য এগুলো সঞ্চিত হয়নি এবং এ সঙ্গে তারা নিজেরাও পিতৃপুরুষের সদিচ্ছার পথ ত্যাগ করে। অন্যদিকে সম্রাট মনে করেন যে তাঁর পূর্বপুরুষের ছত্রচ্ছায়ায় যে ঐশ্বর্য তারা সঞ্চয় করেছে, তার উপর তাঁর অধিকার সর্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং তিনি অল্প অল্প করে একের পর এক এর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের মনোভাব এবং মর্যাদা অনুসারেই তিনি অগ্রসর হন। ফলে সাম্রাজ্যের অন্তরঙ্গ পারিষদ ও পাত্রমিত্ররা তাদের ঐশ্বর্যসহ অন্তর্হিত হওয়ার দরুন তার শক্তিকেন্দ্রের ক্ষয় দেখা দেয়। বস্তুত সম্রাট এভাবে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বহু শক্তিকেই তাদের সমৃদ্ধি ও সমুন্নতি বিধানের পর পুনরায় নিঃস্ব করে ফেলেন।

পাঠক এ ব্যাপারে আব্বাসী সাম্রাজ্যের উজিরদের বেলায় যা ঘটেছে, তৎপ্রতি লক্ষ করুন। তাদের মধ্যে বনি কাহতাবা, বনি বারমেক, বনি সহল, বনি তাহের এবং অনুরূপ অন্যরা ছিল। আন্দালুসে উমাইয়া সম্রাজ্যের শেষের দিকে ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সময়ে বনি শহীদ, বনি আবু আবদা, বনি হুদাইরা, বনি বুরদ এবং সমতুল্য অন্যান্য অনেকের ব্যাপারে এটা দেখা গেছে। বর্তমানকালে আমরা যে সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাতেও এর অন্যথা হয়নি। আল্লাহ্‌র বিধান, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ

যখন সাম্রাজ্যের সভাসদরা অনুরূপ কোনো উৎপীড়নের আশঙ্কা করে, তখন তাদের অধিকাংশই পদমর্যাদা ত্যাগ করে এবং সম্রাটের অধীনতা পাশ থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্য নিয়ে সঞ্চিত সম্পদসহ কোনো দূরাঞ্চলে পালিয়ে যেতে তৎপর হয়। তাদের ধারণা এটা তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ এবং তাদের সঞ্চিত সম্পদ ভোগ করা এভাবেই অধিকতর নিরাপদ হতে পারে। কিন্তু এরূপ ধারণা একান্তই ভুল এবং তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

www.amarboi.org

পাঠক, জেনে রাখুন, একবার সাম্রাজ্যের নাগপাশে জড়িয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন ও দুঃসাধ্য। এমনকি এরূপ পলায়নে ইচ্ছুক ব্যক্তিটি যদি স্বয়ং সম্রাট হন, তথাপি প্রজাসাধারণ এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রপ্রীতির অধিকারীরা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও অনুরূপ কিছু করার অবকাশ দিবে না। যদি এমন কিছু তাঁর আচরণে প্রকাশ পায়, তা হলে তা তাঁর সাম্রাজ্য ও নিজ জীবনের ধ্বংসই ডেকে আনবে। স্বভাবত এটাই হয়ে থাকে এবং এ কারণে রাজশক্তির নাগপাশ এড়িয়ে যাওয়া একান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে সাম্রাজ্য যখন বিস্তৃতি লাভ করে তার অন্তর্গত শক্তির বিন্যাসকে সংকুচিত করে তোলে এবং তা ক্রমশ সদাচার জনিত গৌরব থেকে অন্যায় বিলাসের পথে অগ্রসর হয়, তখন একান্তই অসম্ভব।

অন্যদিকে এরূপ পলায়নের ইচ্ছা যদি অন্তরঙ্গ পারিষদ, সভাসদ ও সম্রাটের মর্যাদাবান কোনো পাত্রমিত্রের মধ্যে দেখা দেয়, তা হলে বলতে গেলে তার জন্য এরূপ করার কোনো পথই খোলা থাকে না। কারণ প্রথমত সম্রাট তাঁর অন্তরঙ্গ পাত্রমিত্র সভাসদ বরং সমগ্র প্রজাকেই নিজের আশ্রিত পোষ্য বলে মনে করেন এবং তাদের সকল গোপন রহস্য জানার অধিকার দাবি করেন। এমতাবস্থায় তাদের যেকোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্রাটের অধীনতাপাশ ছিন্ন করার গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে তাঁর আশ্রিত পোষ্যের দ্বারা অন্য কেউ তাঁর গোপনীয়তা অবহিত হোক এবং সে অন্য কোনো ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত হোক, এও তিনি স্বাভাবিক হিংসার বশেই কামনা করতে পারেন না। অনুরূপ কারণের জন্যই আন্দালুসের বনি উমাইয়া সম্রাটরা তাদের সভাসদদিগকে হজের কর্তব্য পালনে বাইরে যেতেও অনুমতি দিতেন না। কারণ তাঁদের আশঙ্কা ছিল, এর ফলে তাঁরা আব্বাসীদের আয়ত্ত হয়ে পড়বে। এর ফলে তাঁদের সাম্রাজ্যকালে সভাসদরা হজ্জব্রত পালন করতে পারেননি। উমাইয়া সাম্রাজ্য শেষ হয়ে ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের কাল না আসা পর্যন্ত আন্দালুসের রাজ সভাসদদের জন্য হজ্জব্রত পালন বৈধ বলে বিবেচিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত সম্রাট যদি এরূপ পলায়নপর কোনো সভাসদকে ছেড়েও দেন, তথাপি সম্পদ নিয়ে যাবার সুযোগ তাকে কোনো মতেই দিবেন না। কারণ সম্রাট মনে করেন যে, এ সম্পদ তাঁরই সম্পদ এবং তা তাঁর সাম্রাজ্যেরই অংশ। কেননা এ সম্পদের অধিকারী সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়াতলে থেকে তার পদমর্যাদা ব্যবহার করেই তা অর্জন করেছে। সুতরাং উক্ত সম্পদকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার একা ভোগ করার কোনো অধিকার নেই। অতএব তা এ সাম্রাজ্যেই থাকবে এবং তার দ্বারা সম্রাটগণ উপকৃত হবেন। অন্যদিকে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, কোনো ব্যক্তি এরূপ সম্পদ নিয়ে অন্যত্র সরে পড়তে সক্ষম হল; যদিও এটা খুবই বিরল, তথাপি তা সে ভোগ করতে পারবে না। কারণ ঐ অঞ্চলের রাজশক্তির দৃষ্টি তার উপর পড়বে এবং তারা তা আকার-ইঙ্গিতে ভয় দেখিয়ে বা প্রকাশ্যে জোর করে তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিবেই। কেননা তারা জানে যে, এ সম্পদ অন্য সাম্রাজ্যের রাজকোষেরই অংশবিশেষ; সুতরাং তা গুরুত্বপূর্ণ কাজেই ব্যয় হওয়া দরকার। সম্রাটদের চক্ষু বিচিত্র জীবিকার দ্বারা অর্জিত সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দিকেই বিস্ফারিত হয়ে ওঠে; আর এটাত অন্য কোনো রাজকোষ বা

www.amarboi.org

সাম্রাজ্যেরই অংশ; কাজেই এর উপর স্বভাবত ও ধর্মত হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাদের আয়ত্তাধীন।[১৯১]

নবম কিংবা দশম হেফসী সম্রাট আফ্রিকিয়ার আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া ইবনে আহমদ আল-লেহিয়ানী[১৯২] রাজশক্তির দায়িত্বমুক্ত হয়ে মিশরে গমন করেছিলেন। তিনি পশ্চিম সীমান্তের শাসক তিউনিস অভিযানকারীর ভয়ে তারাবলিস সীমান্তে গমনের ছলে পলায়ন করেন। সেখান থেকে জাহাজে আরোহণ করে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছান। যাবার কালে তার সাথে সাধারণ ধন-ভাণ্ডারের যাবতীয় সম্পদ এবং হেফসী রাজপরিবারের সকল সঞ্চিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও মণিমুক্তা বিক্রয় করে প্রচুর ঐশ্বর্য নিয়ে যান। তিনি এ সকল ঐশ্বর্যসহ হিজরি অষ্টম শতাব্দীর সতের সনে[১৯৩] মিশরের সম্রাট আন্‌নাসের মুহম্মদ ইবনে কালাউনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাট তাকে খুব সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং দরবারে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। অতঃপর ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে তার সমুদয় সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসেন। শেষ পর্যন্ত আল-লেহিয়ানী তার জন্য নির্ধারিত বৃত্তিই শুধু পেতেন। এভাবে উক্ত শতাব্দীর আটাশ সনে তাঁর মৃত্যু হয়, যেমন আমরা তাঁর ইতিহাসে বর্ণনা করব।

এ প্রকার ও এর অনুরূপ আরো বহু কুমন্ত্রণা বিদ্যমান, যদ্বারা সম্পদশালীরা তাদের সম্রাটের উৎপীড়নের ভয়ে পলায়ন করতে গিয়ে প্রতারিত হন। তারা যা পারেন, তা হল তাদের নিজেদের মুক্ত করা। কিন্তু সম্পদের পাথেয় সঙ্গে নেবার ধারণাটি একান্তই ভুল ও বিভ্রান্তিকর। তারা সাম্রাজ্যের দায়িত্ব পালনে যে খ্যাতি ও দক্ষতা লাভ করেছেন, তাই তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য যথেষ্ট। এর দ্বারা তারা যে কোনো সম্রাটের নিকট বৃত্তিলাভ করতে পারেন কিংবা তাদের মর্যাদার অনুসারী কোনো ব্যবসা বা কৃষিকর্মের পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। তাদের জানা উচিত সাম্রাজ্যগুলোর পরস্পর বংশ সম্পর্কের ন্যায় সংগ্রথিত; তথাপি

মানবাত্মা উচ্চাভিষালী, যদি তাকে প্রলোভিত করা যায়
আর অল্পে সন্তুষ্ট থাকার দিকে আকর্ষণ করলে, সে তাও মেনে নেয়।[১৯৪]

পবিত্র আল্লাহ্‌ই আহার্যদাতা। তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে ও দয়ায় সহায়তাকারী। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

---

১৯১. রোজেনথাল এর পর জাবালার উজিরের বিদ্রোহ, বাগদাদে পলায়ন ও লুণ্ঠিত হওয়ার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এটা নেই।

১৯২. শাসনকাল ১৩১১-১৭ খ্রিস্টাব্দ।

১৯৩. রোজেনথাল, ৭১৯ (১৩১৯ খ্রি:) হি.।

১৯৪. এটা হিজরি সপ্তম শতাব্দির কবি আবু যুয়েবের রচনা বলে অনুমান করা হয়।

www.amarboi.org

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[সম্রাট প্রদত্ত প্রাপ্যাদির সংকোচন রাজকোষের অসঙ্গতির পরিচয় বহন করে]

এর কারণ এ যে, সাম্রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থা বলতে গেলে এ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজার এবং এ স্থান থেকেই সভ্যতার উপকরণ সংগৃহীত হয়। সুতরাং সম্রাট যদি সম্পদ ও রাজকোষ নিজের কুক্ষিগত করে রাখেন কিংবা তা যদি সংকুচিত হয়ে যথাস্থানে ব্যয়িত না হয়, তখন তাঁর অন্তরঙ্গ পারিষদ ও সহায়ক শক্তির হাতের পুঁজি কমে যায়। এর ফলে তাদের নিকট থেকে যারা এ সম্পদ লাভ করত, তাদের ভাগ্যও শূন্যে ঝুলতে থাকে এবং তাদের ব্যয় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। অথচ তারাই বলতে গেলে ক্রেতা হিসাবে অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকে এবং তাদের ব্যয় থেকেই বাজারের প্রাণশক্তি সঞ্চালিত হয়। সুতরাং তারা হাত গুটালে বাজারে বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়; ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ অন্তর্হিত হয় এবং এটারই পরিণতিতে রাজস্বের পরিমাণ কমে যায়। কারণ রাজস্ব ও রাজকোষের ব্যাপারটি শুধুমাত্র জনবসতির আধিক্য, তাদের লেনদেন, বাজারের তেজীভাব এবং মানুষের লাভ ও উপকারিতার প্রাচুর্য থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং বাজারের দুরবস্থা রাজকোষের আয় রাজস্বের ব্যবস্থা সংকুচিত করে সম্রাটের সঙ্গতি ঘটিয়ে সাম্রাজ্যের বিপত্তি ডেকে আনে। কারণ সাম্রাজ্য, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, এক বিরাট বাজারতুল্য; বরং সকল বাজারের উৎস এবং আমদানি-রপ্তানির ভিত্তি ও উৎপত্তিস্থল। সুতরাং তাতেই যদি মন্দা দেখা দেয় ও তার লেনদেন কমে যায়, তা হলেই তার সংশ্লিষ্ট অন্য সকল বাজারেও মন্দাভাব আরো ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সম্পদ বলতে যা বোঝায়, তা হল যা সম্রাট ও প্রজার মধ্যে বারবার আবর্তন করে থাকে—সম্রাটের নিকট থেকে প্রজাদের মধ্যে এবং প্রজাদের মধ্য থেকে সম্রাটের নিকট। সুতরাং সম্রাট যদি তা কুক্ষিগত করে বসেন, তা হলে প্রজারা আর তার সাক্ষাৎ পায় না। এটাই বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ্র বিধান।

www.amarboi.org

ত্রয়োচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[উৎপীড়ন সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে]

পাঠক, জেনে রাখুন, সম্পদের ব্যাপারে মানুষের উপর উৎপীড়ন করলে, তা সম্পদ উপার্জন ও সংগ্রহে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে খর্ব করে ফেলে। কারণ তারা এটাই ভাবে যে, তাদের উপার্জন ও সঞ্চয়ের চরম পরিণতি হল লুণ্ঠিত হওয়া। সুতরাং সম্পদ উপার্জন ও সংগ্রহে তাদের আকাঙ্ক্ষা কমে গেলে তারা আর তার জন্য প্রচেষ্টা চালায় না এবং এরূপ নিস্পৃহ অবস্থা প্রজাদের উপর উৎপীড়নের পরিমাণ অনুসারেই দেখা দিয়ে থাকে। কাজেই উৎপীড়ন যদি জীবিকা অর্জনের সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক আকারে দেখা দেয়, তা হলে উপার্জন ও সঞ্চয়ের অনিচ্ছাও সকল কিছুর মধ্যে ব্যাপকতর হয়ে প্রবেশ করে। আবার এ উৎপীড়ন যদি সামান্য হয়, তা হলে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে তার প্রভাবও সেই অনুপাতে পড়ে থাকে।

বস্তুত জনবসতি ও তার প্রাচুর্য, বাজারের তেজীভাব ইত্যাদি মানুষের আগমন নির্গমন তথা তাদের উপার্জন ও উপকারিতার ব্যাপক তৎপরতার মাধ্যমেই দেখা দিয়ে থাকে। সুতরাং মানুষ যদি জীবিকা অর্জনে নিশ্চেষ্ট হয় এবং ধনোপার্জনে হাত গুটিয়ে ফেলে, তা হলে বাজারে মন্দা দেখা দেয়, অবস্থা-ব্যবস্থা সংকুচিত হয়ে আসে এবং মানুষ জীবিকার উদ্দেশ্যে তাদের আশ্রয়স্থল ও বিন্যাস ব্যবস্থা ত্যাগ করে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এভাবে জনবসতি হ্রাস পায়, দেশ উজাড় হয় এবং নগর-বন্দর শূন্য হয়ে যায়। এ শূন্যতা সম্রাট ও তাঁর সাম্রাজ্যকেও শূন্য করে তোলে। কারণ জনগণই সাম্রাজ্যের প্রকৃত উপাদান; সুতরাং তাদের অভাবে সভ্যতা তথা সামাজ্যের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতি দেখা দেয়।

পাঠক এ ব্যাপারে পারস্য সম্রাটদের কাহিনী হিসাবে তাদের ধর্মীয় গুরু মোবেজানের নিকট থেকে মাসউদী যা বর্ণনা করেছেন, তৎপ্রতি লক্ষ করুন। ঘটনাটি বাহরাম ইবনে বাহরামের সময়কার এবং উক্ত সম্রাট তাঁর শাসন আমলে উৎপীড়ন, উদাসীনতা ও তজ্জনিত সাম্রাজ্যের অসুবিধার কথা অস্বীকার করেছিলেন। মোবেজান একটি পেচকের কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে এর সত্যতার উদাহরণ তুলে ধরেছিলেন। একদিন সম্রাট একটি পেচকের কণ্ঠ শুনে মোবেজানকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তা বুঝতে পারেন কিনা। উত্তরে ধর্মগুরু বললেন, হ্যাঁ পারেন এবং তার বক্তব্য তুলে ধরে বললেন, একটি পেচক একটি পেচকিনীকে বিবাহের প্রস্তাব দিতেছে। এর উত্তরে পেচকিনী তাকে যৌতুক হিসাবে এমন বিশটি গ্রাম দিতে বলছে, যেগুলো বাহরামের রাজত্বকালে

www.amarboi.org

উজাড় হয়ে গেছে। পেচক তা মেনে নিয়েছে এবং আরো বলেছে যে, সম্রাট যদি এভাবে তাঁর সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন, তা হলে এক হাজার উজাড় গ্রাম দিতেও তার খুব বেগ পেতে হবে না। সম্রাট এ বক্তব্য শুনে সতর্ক হলেন এবং মোবেজানকে নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর এ বক্তব্যের তাৎপর্য জানতে চাইলেন। উত্তরে মোবেজান বললেন,

হে সম্রাট! ধর্মীয় বিধান ছাড়া রাজত্বের মর্যাদা পূর্ণতা লাভ করে না। তা করতে হলে আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করতে হয় এবং তাঁর বিধি-নিষেধকে কার্যকরী করে তুলতে হয়। আবার এ ধর্মীয় বিধানও রাজশক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়। রাজশক্তির জন্য জনশক্তির প্রয়োজন এবং জনশক্তি সম্পদ ছাড়া হয় না। সম্পদ পেতে হলে জনবসতির দরকার এবং ন্যায়পরায়ণতাই জনবসতির প্রাচুর্য আনয়ন করে। ন্যায় একটি নিক্তি, যা সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। প্রতিপালক একে প্রতিষ্ঠা করে তার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন এবং ইনিই হলেন সম্রাট। আপনি হে সম্রাট! কৃষিখামারগুলোকে তাদের যথার্থ মালিকের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। তারা তাকে আবাদ করত এবং তারা রাজস্ব প্রদান করত। বস্তুত তাদের নিকট থেকেই আপনার সম্পদ এসে থাকে। অথচ তাদের নিকট থেকে তা নিয়ে আপনি আপনার সভাসদ, সেবক ও পাত্রমিত্রকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করেছেন। তারা এ সকল কৃষিভূমি আবাদ করে না, তার পরিণাম সম্পর্কে ভাবে না, তার প্রয়োজনীয়তা বুঝে না এবং সম্রাটের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতার জন্য তারা রাজস্বও দেয় না। সুতরাং অন্য যারা রাজস্ব আদায় করছে এবং কৃষিভূমি আবাদের ধারা অব্যাহত রেখেছে তাদের উপর করের বোঝা চাপিয়েছে। এ জন্য তারা এ সকল কৃষিভূমি ত্যাগ করে, জনবসতি উজার করে দুর্গম স্থানের কৃষি জমিতে আশ্রয় নিচ্ছে এবং সেখানে বসবাস করছে। এর ফলে আবাদ কমেছে কৃষিজমি পতিত হয়েছে, সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং সৈন্যদল ও প্রজাসাধারণ ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে। সুতরাং পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী সম্রাটগণ তার অবস্থা বুঝতে পেরে তার প্রতি লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। কারণ তারা জানে, যে সকল উপাদান ব্যতীত সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় না, এ স্থলে তার অভাব বিদ্যমান।

সম্রাট এ বক্তব্য শোনার পর তাঁর সাম্রাজ্যের ব্যাপারে দৃষ্টি দিলেন এবং কৃষিভূমি সভাসদ অমাত্যদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার মালিকদের নিকট ফেরত দিলেন। তাদেরকে পূর্বের ন্যায় চলবার সুযোগ প্রদান করলেন। সুতরাং তারা উদ্যমের সাথে জমি আবাদ করল এবং দুর্বলরা আবার সবল হয়ে উঠল। আবার জনবসতি দেখা দিল, এলাকাগুলো সবুজ হয়ে উঠল, সম্পদ বৃদ্ধি পেল এবং রাজস্বের পরিমাণও বেড়ে গেল। সৈন্যদল শক্তিশালী হওয়ার ফলে শত্রুদের প্রলোভন দমিত হল এবং সীমান্ত সুরক্ষিত হয়ে উঠল। সম্রাট সকল কাজ নিজে তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। তাঁর শাসনকাল সৌন্দর্যমণ্ডিত হল এবং তাঁর সাম্রাজ্য স্থায়ী হল। এ কাহিনী থেকে এ কথাই জানা যায় যে, উৎপীড়ন জনবসতির উচ্ছেদ সাধন করে এবং এ প্রকার উচ্ছেদের ফলে সাম্রাজ্যের ক্ষতি ও সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে।

এস্থলে এরূপ যুক্তি উপস্থিত করা ঠিক হবে না যে, অনেক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিরাট বিরাট জনবসতিপূর্ণ নগরগুলোতে উৎপীড়ন থাকা সত্ত্বেও কখনো কোনো প্রকার

www.amarboi.org

ক্ষতিকর কিছু দেখা যায় না। পাঠক, জেনে রাখুন, এটা নগরের জনসংখ্যা ও উৎপীড়নের অনুপাতে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং যেখানে নগরের পরিধি বিরাট, তার জনসংখ্যা প্রচুর ও তার অবস্থার মধ্যে সীমাহীন ব্যাপকতা বিরাজ করে, সেখানে উৎপীড়ন ও অবিচারের দ্বারা অতি অল্পই ক্ষতি সাধিত হয়। কেননা উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে দেখা দিয়ে থাকে। সুতরাং নগরীর অবস্থা বৈচিত্র্য ও তার কর্মপ্রবাহের ব্যাপকতার ফলে এ প্রতিক্রিয়া একটা বিশেষ সময়ের ব্যবধানেই বাস্তব রূপ লাভ করে। কখনো এ উৎপীড়ক শাসনভার নগরীর জীবন বিধ্বস্ত হবার পূর্বেই সমূলে উৎপাটিত হয় এবং তদস্থলে অন্য সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটে। কাজেই এ নবীন শাসন তার সংশোধন করে নগর জীবনের অন্তর্গত ত্রুটিকে দূর করে দেয়। এর ফলে তা প্রায় বোঝাই যায় না। অবশ্য এরূপ ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে।

এ আলোচনার নির্গলিতার্থ এই যে, উৎপীড়ন অবিচারে জনবসতির ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি এবং এর পরিণামে সাম্রাজ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পাঠক, কখনো এ কথা মনে করবেন না যে, কোনো প্রকার হেতু ও বিনিময় ব্যতীত কারো সম্পদ ও সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়াই উৎপীড়ন, যেমন সাধারণভাবে এ ধারণা পোষণ করা হয়; বরং উৎপীড়ন এটা থেকেও ব্যাপক। যে কেউ অপরের অধিকারে, তার কর্ম প্রবর্তনায় হস্তক্ষেপ করল এবং তার নিকট অন্যায়ভাবে কিছু দাবি করল কিংবা ধর্মীয় বিধানের বাইরে তার উপর কোনো দাবি প্রতিষ্ঠিত করল, সে উৎপীড়ক। সুতরাং কোনো প্রকার ন্যায় ভিত্তি ছাড়া কর আদায়কারীরা উৎপীড়ক; এজন্য জবরদস্তিকারীরা উৎপীড়ক এবং এ উদ্দেশ্যে মানুষের সম্পদ ছিনতাইকারীরা উৎপীড়ক। যারা অপরের ন্যায্য দাবি পূরণ করে না, তারাও উৎপীড়ন করে এবং সাধারণভাবে যে কোনো অধিকার হরণকারীকেই উৎপীড়ক বলে মনে করতে হবে। এর সমস্ত প্রতিক্রিয়াই সাম্রাজ্যের জনবসতির ক্ষতি সাধন করে এবং জনগণের মধ্যে সভ্যতার মৌল উপাদান আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে ধ্বংস করে।

পাঠক, জেনে রাখুন, ধর্মপ্রবর্তক কর্তৃক উৎপীড়ন নিষিদ্ধ করার এটাই যথার্থ উদ্দেশ্য। কারণ উৎপীড়ন জনবসতির ক্ষতি সাধন করে তার কামনা-বাসনাকে ধ্বংস করে এবং পরিণাম, এর দ্বারা মানব জাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। এজন্য ধর্মীয় বিধান এর বিরোধিতা করে সমগ্র জীবনের উপর পাঁচটি দিক থেকে সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করেছে, তা হল ধর্ম, জীবাত্মা, বুদ্ধিমত্তা, বংশধারা ও সম্পদ সংরক্ষণ। সুতরাং, পাঠক, আপনি যেমন দেখেছেন, উৎপীড়ন জনসমাজের ক্ষতি সাধন করে তার অস্তিত্বকেই বিলুপ্ত করে দিতে চায়, অতএব তা নিষিদ্ধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত এবং এ নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোরান ও হাদিসে এ সম্পর্কে প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান এবং এর অধিকাংশই সংযম ও সংকোচের নীতি শিক্ষা দিয়ে থাকে।

যদি প্রত্যেকেই উৎপীড়ন করতে সমর্থ হত, তা হলে অন্যান্য সমাজবিরোধী অপকর্মের ন্যায় এর জন্যও কঠিন শাস্তি নির্ধারিত হত। যেমন অন্যান্য মানব অস্তিত্ববিরোধী অন্যায়, ব্যভিচার, নরহত্যা, মদ্যপান ইত্যাদির জন্য শাস্তি নির্ধারিত

www.amarboi.org

আছে এবং তা যেকোনো ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব। কিন্তু উৎপীড়নযোগ্য লোক ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। এ জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা শক্তিমান ও শাসন ব্যবস্থার অধিকারীর দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং ধর্মপুস্তকে তার নিন্দা ও পারলৌকিক শাস্তির কথা বার বার উল্লেখিত হয়েছে। যাতে তার বিরোধী ও সংযম শক্তি শক্তিমানের নিজের মধ্যেই জন্ম নেয়। 'তোমার প্রভু ত বান্দাদেরকে কখনো উৎপীড়ন করেন না'।[১৯৫]

পাঠক, আপনার পক্ষে এ কথা বলা সঠিক নয় যে, ধর্মীয় বিধানে রাহাজানির শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে এবং তা শক্তিমানের উৎপীড়ন ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কারণ অন্য সময় না হোক, অন্তত রাহাজানি করার সময় তাকে অবশ্যই শক্তিমান বলতে হবে। এর উত্তর দুইভাবে দেয়া যেতে পারে; একটি হল এটা বলা যায় যে, শাস্তির ব্যাপারটি অধিকাংশের মতে জীবাত্মা বা সম্পদের ক্ষতির উপরই নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং এটা অনুরূপ ক্ষতি করার ক্ষমতা ও তদনুযায়ী অন্যায় অনুষ্ঠানের পরেই শুধু সম্ভব হয়। এজন্যই শুধু রাহাজানির জন্য কোনো প্রকার শাস্তি নির্ধারিত নেই। অপরটি হল এরূপ বলা যায় যে, রাহাজানিকারীর এমন কোনো ক্ষমতা নেই, যেমন আমরা উৎপীড়কের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। তা এমন একটি ক্ষমতা, যা প্রতিরোধ করার শক্তি কারো নেই। এ কারণে তা ধ্বংস ডেকে আনে। কিন্তু রাহাজানিকারীর ক্ষমতা হল মাত্র ভয় প্রদর্শন, যাকে সে সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে এবং তাকে প্রতিরোধ করার শক্তি ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থার দিক থেকে সকলের হাতেই বিদ্যমান। সুতরাং তাকে সেই ধ্বংসাত্মক শক্তি বলে মনে করা যায় না। আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সকল বস্তুর উপর শক্তিমান।

অনুচ্ছেদ

সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক সমাজবিরোধী উৎপীড়ন হল অন্যায়ভাবে শ্রমিক নির্যাতন এবং প্রজাদের উপর কর্তব্যের ভার চাপিয়ে দেয়া। কেননা শ্রম, বলতে গেলে, শ্রমিকের পুঁজি স্বরূপ, যেমন আমরা আহার্যের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বর্ণনা করব। বস্তুত আহার্য ও উপার্জন, তা মানব সভ্যতার শ্রমেরই ফসল। সুতরাং তাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম সামগ্রিকভাবে তাদের পুঁজি ও উপার্জনের ভিত্তি। এটা ব্যতীত তারা জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয় না। যে সকল প্রজা সভ্যতা নির্মাণে তাদের শ্রম প্রদান করে, তাদের জীবিকা ও উপার্জন তারই উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তাদেরকে যদি অন্যভাবে শ্রম দিতে বাধ্য করা হয় এবং তাদের জীবিকার ভিত্তিকে অন্যত্র নিয়োগ করা হয়, তা হলে তাদের উপার্জন হ্রাস পায় ও তারা শ্রমের বিনিময় থেকে বঞ্চিত হয়। যেহেতু এটাই তাদের পুঁজি, কাজেই এরূপ ব্যবহারের ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের জীবিকার একটা বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যায়; বরং বলা যায়, তাদের জীবিকাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এরূপ ব্যবহার বারবার দেখা দিলে সভ্যতা বিনির্মাণে তাদের কামনা-বাসনা লোপ পায়

১৯৫. কোরান, ৪১, ৪৬; তুল, কোরান, ৩, ১৮২, ৮, ৫১; ২২, ১০; ৫০, ২৯।

www.amarboi.org

এবং তারা সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে বসে পড়ে। এতে সভ্যতার সংকোচ ও ক্ষতি সাধিত হয়। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।

মজুদ্দারী

জনবসতির ও সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনে এটা থেকেও মারাত্মক ধরনের উৎপীড়ন হল মানুষের পণ্যদ্রব্য স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং পুনরায় অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করে তা বিক্রয় করা। এ উভয় ক্ষেত্রে জবরদস্তি ও ডাকাতির অনুরূপ ব্যবহার প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় তাদেরকে সহজ কিস্তিতে ও দেরিতে মূল্য প্রদানের সুযোগ দিয়ে অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হয়। ক্রেতারা তাদের আপাত দৃশ্যমান ক্ষতিকে এ বলে মেনে নেয় যে, হয়তো এ অধিক মূল্যে ক্রীত পণ্যদ্রব্যের বাজারে তেজীভাব দেখা দিবে এবং তারা লাভবান হতে পারবে। কিন্তু মূল্য প্রদানের জন্য তারা কম মূল্যেই পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয় এবং এ উভয় দিকের ক্ষতি তাদের মূলধনের উপর আঘাত হানে। কখনো এটা নগরে বসবাসকারী, সেখানে আগত ও বাজারে সর্বপ্রকার ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে সাধারণ হয়ে দেখা দেয়। ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্যের দোকানী, এমনকি শিল্পপতিরাও যন্ত্রপাতি ও সহায়ক দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে এ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ফলে এটা সকল শ্রেণী ও স্তরে ছড়িয়ে যায় এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটা মূলধনের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং মূলধনের অভাবে বাজার থেকে বের হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কারণ লাভের দ্বারা তার পুনঃসংস্থাপনের কোনো আশা নেই। বিভিন্ন দিক থেকে আগত ব্যবসায়ীরা এর ফলে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। সুতরাং বাজার ধ্বংস হয়ে যায় এবং প্রজাদের জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ এর অধিকাংশই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নির্ভরশীল কাজেই বাজারের মন্দা অবস্থা তাদের জীবিকার দুরবস্থা ডেকে আনে এবং সম্রাটের রাজকোষের অবস্থাও মন্দ অথবা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সাম্রাজ্যের মধ্যাবস্থায় এটা থেকেই তার সমৃদ্ধি আসে এবং শেষের দিকে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ধার্যকৃত শুল্ক তার স্থান পূরণ করে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এর পরিণামে সাম্রাজ্যের বিনাশ ও নাগরিক জীবনের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে। অবশ্য এরূপ ক্ষতি ধীরে ধীরে সংঘটিত হয় এবং এ জন্য তা প্রায় বোঝাই যায় না।

এ পরিণতি অনুরূপভাবে ও পর্যায়ে মানুষের সম্পদের উপর অন্যায় আধিপত্য বিস্তারের ফলে দেখা দেয়। কিন্তু এ আধিপত্য যদি সরাসরি এবং মানুষের সম্পদ, পরিবার, জীবন, গোপনীয়তা ও সম্মানের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে বিস্তৃত হয়, তা হলে সেই মুহূর্তেই ক্রটি ও ক্ষতি বাস্তব হয়ে ওঠে। এর ফলে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতায় যে গোলযোগ দেখা দেয়, তা সাম্রাজ্যের আশু বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ সকল দোষত্রুটির কারণেই ধর্মীয় বিধান অনুরূপ সমুদয় বিষয়কেই নিষিদ্ধ করেছে। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ শাস্ত্রসম্মত হলেও অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ কুক্ষিগত করার বিষয়টি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ কেননা এর ফলে এমন সমস্ত

www.amarboi.org

অবিচার সংঘটিত হয়, যা পরিণামে মানুষের জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ করে এবং সভ্যতার বিনাশ ডেকে আনে।

পাঠক, জেনে রাখুন, এ সকল উৎপীড়ন একমাত্র সাম্রাজ্য ও শাসকের অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের লোভেই সংঘটিত হয়। কারণ তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হওয়ার ফলে তাদের ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং আইনানুগ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে লভ্য আয়ের দ্বারা এ বিপুল ব্যয়ের সংকুলান হয় না। সুতরাং তারা নতুন নতুন ধারা ও খাত তৈরি করে তা দিয়ে অতিরিক্ত ব্যয়ের অনুপাতে রাজকোষের সঙ্গতি বাড়াতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু বিলাসব্যসন ক্রমশ বেড়ে চলে এবং সেই অনুপাতে খরচের মাত্রাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কাজেই মানুষের সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রয়োজনও তীব্র হয়ে ওঠে। এভাবে সাম্রাজ্যের বিন্যাস মুছে শিথিল হয়ে ক্রমশ সীমা অতিক্রম করে এবং এক সময়ে তার নিদর্শনাদি মুছে ফেলার জন্য নতুন কোনো শক্তিকে বিজয়ী করে তোলে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা।

www.amarboi.org

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যগুলোতে কী করে সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং তাদের অবক্ষয়ের সময় তা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়]

জেনে রাখুন, যে কোনো সাম্রাজ্য তার প্রথম দিকে রাজশক্তির বৈভব থেকে দূরে অবস্থান করে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কারণ তখন তার জন্য সেই গোত্রশক্তির প্রয়োজন, যা দিয়ে তার প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য পূর্ণতা লাভ করবে। বস্তুত প্রান্তরীয় জীবনবোধই গোত্রপ্রীতির পরিচয় বহন করে। তদুপরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা যদি ধর্মীয় অনুভূতির মাধ্যমে হয়, তা হলে তাতে রাজকীয় বৈভবের চিহ্নমাত্রও থাকে না। অন্যদিকে শুধুমাত্র প্রাধান্য বিস্তারের পরাক্রমে তার প্রতিষ্ঠা হলেও, যে প্রান্তরীয় জীবনবোধ প্রাধান্য বিস্তারকে সক্রিয় করে তোলে, তার মধ্যেও রাজশক্তির বৈভব ও তার রীতি-বৈচিত্র্যের লক্ষণ দেখা যায় না। কাজেই সাম্রাজ্য যেহেতু তার উষালগ্নে প্রান্তরীয় জীবনবোধে উদ্দীপ্ত থাকে, সেজন্য তার শাসক সরল, সহজ, মানুষের নিকটবর্তী এবং অনায়াসলভ্য অবস্থায় বিরাজ করেন।

অতঃপর যখন তাঁর পরাক্রম স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায় ও তিনি একক মর্যাদায় বিভূষিত হয়ে ওঠেন, তখন সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ পারিষদবর্গের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিভৃত আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ তখন তাঁর সভাসদদের সংখ্যা বেড়েছে; সুতরাং সাধারণের সঙ্গ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলাই তাঁর জন্য প্রয়োজনীয়। এজন্য তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও সহায়কদের মধ্যে যার সম্পর্কে সন্দেহ করার কিছু থাকে, তাকে প্রবেশ দ্বার অনুমতি গ্রহণ করতে হয় এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি দ্বারদেশে একজন প্রতিহারী নিযুক্ত করেন। ইনি দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্বারদেশে অবস্থানের দায়িত্ব পালন করেন।

এর পর সাম্রাজ্য যখন আরো বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাতে রাজকীয় বৈভব ও মতাদর্শ এসে উপস্থিত হয়, তখন সম্রাটের চরিত্রও তাকেই অনুসরণ করে পরিবর্তিত হয়। এ রাজকীয় চরিত্র অদ্ভুত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যারা তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট, তাদেরকে আচার-ব্যবহারে এ বৈশিষ্ট্যের দিকে আবশ্যকীয় সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে হয়। অনেক সময় অনেক অন্তরঙ্গ পারিষদও এ ব্যাপারে যথার্থ জ্ঞানের অভাবে ভুল করে বসে, ফলে তাকে সম্রাটের বিরাগভাজন হতে হয় এবং বিরাগের পরিমাণ বেশি হলে অনেক সময় শাস্তিও পেতে হয়। সুতরাং এ সকল আদব-কায়দার সাথে একমাত্র সম্রাটের অন্তরঙ্গ পারিষদরাই অবহিত থাকে এবং তারাই বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদেরকে সম্রাটের সমীপে আসতে বাধা দেয়। কারণ সম্রাট যাতে অসন্তুষ্ট না হন, তজ্জন্য সর্বদা তারা

www.amarboi.org

সতর্ক হয়ে চলে এবং সাধারণ মানুষ যাতে সম্রাটের ক্রোধের উদ্রেক করে শাস্তিপ্রাপ্ত না হয়, সে জন্যও তারা তৎপর থাকে।

এ ক্ষেত্রে সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে পূর্বের প্রতিবন্ধকতা অপেক্ষা বিশিষ্ট আরো একটি প্রতিবন্ধকতা তাদের সম্মুখে দেখা দেয়। প্রথমটি ছিল সাধারণ লোককে বাধা দিয়ে শুধু বিশিষ্টদেরকে সম্রাটের সাহচর্যে অবস্থানের অনুমতি দেয়া। কিন্তু এ দ্বিতীয়টি সম্রাটের অন্তরঙ্গ পারিষদদের মধ্যেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে বিশেষ ও সাধারণের পার্থক্য গড়ে তোলে। এ প্রথম প্রতিবন্ধকতা সাম্রাজ্যের প্রথম দিকেই কার্যকর হয়; যেমন মাবিয়া, আবদুল মালেক ও বনি উমাইয়া সম্রাটের শাসন আমলে হয়েছে। তাঁদের এ দায়িত্ব পালনে যিনি প্রতিহারীর কাজ করতেন, তাঁকে 'হাজেব' বলা হত। শব্দটি 'হেজাব' তথা বাধা প্রতিবন্ধক ইত্যাদি অর্থের যথার্থ রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এর পর আব্বাসী শাসনের আরম্ভ এবং তাতে বিলাসব্যসন ও পরাক্রম নতুন রূপ লাভ করেছিল, যা অত্যন্ত সুপরিচিত। তখনই রাজকীয় বৈভবের যথাযথ আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে সেই দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয় এবং হাজেবের নামটি এ বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। আব্বাসী সম্রাটদের প্রাসাদে তখন দুটি দরবারে সৃষ্টি হয়; একটি দরবারে খাস ও অন্যটি দরবারে আম, যেমন তা তাঁদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

অতঃপর সাম্রাজ্যগুলো তৃতীয় একটি প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়, যা প্রথম দুটি থেকেও বিশিষ্ট এবং শাসকের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের কালে এর উদ্ভব ঘটে। সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট সভাসদরাই অল্পবয়স্ক শাসক নিযুক্ত করে এরূপ প্রভাব বিস্তারের পথ প্রশস্ত করেন। যিনি এরূপ প্রভাব বিস্তারের কাজে ব্রতী হন, তাঁর প্রথম কর্তব্য হল শাসককে তাঁর পিতার অন্তরঙ্গ পারিষদ ও সভাসদদের নিকট থেকে সরিয়ে রাখা। তিনি এরূপ করতে গিয়ে এ ধারণাই প্রকাশ করেন যে, অবাধ মেলামেশার ফলে শাসকের প্রতি ভীতির ভাব থাকবে না এবং রাজকীয় আদব-কায়দারও বিচ্যুতি ঘটবে। তার এরূপ করার যথার্থ উদ্দেশ্য হল অল্পবয়স্ক শাসককে অন্যের সাথে মিলতে না দিয়ে একমাত্র তারই স্বভাব-চরিত্রের সাথে অভ্যস্ত হতে বাধ্য করা যাতে সে অন্য কাউকেও অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারীর স্থলাভিষিক্ত করতে সক্ষম না হয়। এভাবে শাসকের উপর তার প্রভাব সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এটা চলতে থাকে। বস্তুত অন্যান্য প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজনেই এ তৃতীয় প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ সময় এটা সাম্রাজ্যের শেষের দিকেই দেখা যায়; যেমন আমরা শাসকের অবরুদ্ধ অবস্থা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছি। এটা দ্বারা বোঝা যায় যে, সাম্রাজ্যে অবক্ষয় ও তার শক্তিতে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। এটা এমন একটি ব্যাপার, যার উদ্ভবের ভয় সকল সাম্রাজ্যই করে থাকে। কেননা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শক্তিই তার অবক্ষয়ের যুগে এরূপ প্রভাব বিস্তারে অগ্রসর হয়। সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীদের প্রাধান্য বিস্তারের শক্তি লোপ পেলেই এরূপ অন্যায্য প্রভাব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সকল মানুষের মধ্যেই রাজশক্তির প্রতিপত্তি লাভ করার প্রতি আকর্ষণ বিদ্যমান। বিশেষ করে তেমন কিছু করার সুযোগ যদি দেখা দেয় এবং কার্যকারণ ও তার প্রস্তুতি যদি অনুকূল হয়।

www.amarboi.org

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[একটি সাম্রাজ্যের দুইভাগে বিভক্ত হওয়া]

জেনে রাখুন, সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রথম অবক্ষয়ের যে লক্ষণ দেখা দেয়, তা হল তার বিভক্ত হওয়া। এর কারণ সাম্রাজ্য যখন বিস্তৃতিলাভ করে বিলাসব্যসন ও প্রাচুর্যের চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন সম্রাট তার সমস্ত গৌরব কুক্ষিগত করে প্রধান হয়ে ওঠেন এবং অন্য কাউকেও তার অংশীদার হতে বাধা দেন। তিনি যথাসম্ভব এরূপ অংশীদারিত্বের সম্ভাব্য কারণগুলোকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা এ উচ্চমর্যাদার দাবিদার হতে পারেন, তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলেন। অনেক সময় অংশীদারগণ এরূপ বিপদের আশঙ্কা করে দূরে চলে যান এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যরা গিয়ে মিলিত হন। তাঁরাও এরূপ আশঙ্কার কারণেই পলায়ন করেন। ফলে সাম্রাজ্যের শক্তি বিন্যাসের মধ্যে সংকোচের ভাব দেখা দেয়। এরূপ দূরে অবস্থানকারীরা তখন ফিরে আসেন এবং সম্রাটের আত্মীয় এ প্রত্যাবর্তনকারীরা প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। এর ফলে তাদের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং সাম্রাজ্যের শক্তি বিন্যাসের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তা বিভক্ত বা বিভক্তির সন্নিকটবর্তী হয়ে পড়ে।

পাঠক, এ বিষয়টি ইসলামী আরবি সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে লক্ষ করুন। যখন তার অবস্থা খুবই দৃঢ় ও তার শক্তির বিন্যাস ব্যাপক বিস্তৃত ছিল এবং বনি আবদে মনাফের গোত্রপ্রীতি সমগ্র মুজারের উপর একক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল, তখন একমাত্র খারেজীদের হাঙ্গামা ছাড়া অন্য কোনো বিরোধী বক্তব্য কোথাও দেখা যায়নি। অবশ্য খারেজীরাও তাদের অভিনব মতাদর্শের জন্যই প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল মাত্র; তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাম্রাজ্য বা নেতৃত্ব লাভের কোনো প্রলোভন ছিল না। অন্যদিকে তাও বৃহৎ গোত্রপ্রীতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।

অতঃপর বনি উমাইয়াদের হাত থেকে রাজশক্তি অন্তর্হিত হয়ে এককভাবে বনি আব্বাসের করতলগত হলে আরবি সাম্রাজ্য বিলাসব্যসন ও প্রাধান্য বিস্তারের শেষ সীমায় পৌঁছায় এবং তখন তা দূরস্থিত অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ দান করে। এর ফলে ইসলামী সাম্রাজ্য থেকে দূরে আন্দালুসে আব্দুর রহমান আন্দাখেল প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেখানে তিনি একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে এক ইসলামী সাম্রাজ্যকেই দুইভাগে ভাগ করে ফেলেন। এর পর ইদরিস মাগরিবে উপস্থিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং তাঁর প্রচারণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর পুত্র আরোবা, মগিলা ও জানাতা গোত্রের বারবারদের সহায়তায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন এবং দুই

www.amarboi.org

মাগরিবের[১৯৬] প্রান্তসীমায় প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন। অতঃপর এ সাম্রাজ্য আব্বাসী সাম্রাজ্যের আরো অংশ বিচ্ছিন্ন করতে অগ্রসর হল এবং বনি আগলাব তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে তৎপরতা দেখাল। এর পরে শিয়ারা আবির্ভূত হল এবং তাদের সমর্থনে কুতামা ও সিনহাজা গোত্রদ্বয় উদ্যোগী হয়ে আফ্রিকিয়া ও মাগরিবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করল। পরে মিশর, সিরিয়া, হেজাজও তাদের দখলে এল। তারা ইদারসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এ সাম্রাজ্যকে আরো দুটি সাম্রাজ্যে ভাগ করে ফেলল। তখন আরবি সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হল। আরবের কেন্দ্রস্থলে বনি আব্বাসের সাম্রাজ্য; তাদের মূল ভিত্তি ইসলাম। আন্দালুসে বনি উমাইয়া সাম্রাজ্য; যা তাদের পূর্বাঞ্চলীয় পুরাতন সাম্রাজ্যেরই নবায়িত রূপ। মিশর, আফ্রিকিয়া, সিরিয়া ও হেজাজে উবাইদী সাম্রাজ্য। এ তিনটি সাম্রাজ্য এক সঙ্গেই অবস্থান করেছিল। অতঃপর তারা প্রায় কাছাকাছি সময়ে বা বলতে গেলে এক সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে আব্বাসী সাম্রাজ্যও আরো বহু সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়েছে।[১৯৭] মাওরায়ান্নাহার ও খুরাসানে বনি সামান, দায়লাম ও তাবারিস্তানে উলুবীগণ এবং এ শেষোক্ত বংশীয়রা দায়লামীদের সাহায্যে দুই ইরাক, বাগদাদ ও তার খলিফাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর পর সলজুকীরা এসে এর সমুদয় অংশও অধিকার করে নিয়েছিল। অতঃপর তাদের সাম্রাজ্যও বিস্তৃতি লাভের অন্তে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যেমন তাদের ইতিহাসে এটা সুপরিচিত।

পাঠক, এরূপে এ বিষয়টিকে মাগরিব ও আফ্রিকিয়ার সিনহাজা সাম্রাজ্যের বেলায় বিবেচনা করুন। তা যখন বাদিস ইবনে আল মনসুরের সময় চরম সীমায় পৌঁছল, তখন তাঁর চাচা হাম্মাদ বিদ্রোহ করে তার পশ্চিমাঞ্চলে নিজের অধীন করে ফেললেন। আউরাস পর্বতের নিকট থেকে তিলমিসান ও মালবিয়া পর্যন্ত দখল করে মাসিলার নিকটবর্তী কুতামা পর্বতে 'আলকেলআ' নির্মাণ করলেন। সেখানে অধিষ্ঠিত হয়ে তাদের কেন্দ্রস্থল তাতারী পর্বতের উপরিস্থিত 'আশির'ও অধিকার করে নিলেন। এর ফলে বাদিস বংশের সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে একটি নতুন সাম্রাজ্যের জন্ম হল এবং বাদিস বংশীয়রা কায়রোয়ান ও তার সন্নিহিত অঞ্চল দখল করে রইলেন। এভাবে তাদের অবস্থা চলবার পর উক্ত উভয় সাম্রাজ্যই ধ্বংস হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়া খণ্ডিত করে বনি আবু হেফস আফ্রিকিয়া দখল করে বসল এবং তাদের বংশাবলির জন্য তার এ অঞ্চলে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল। অতঃপর তাদের প্রতিষ্ঠা বিস্তৃত ও তাদের প্রাধান্য বিস্তার চরম সীমায় উপনীত হল পশ্চিমাঞ্চলে তাদের বংশধরদের মধ্য থেকেই আমীর আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া বিদ্রোহ করলেন। ইনি তাদেরই চতুর্থ সম্রাট আবু ইসহাক ইব্রাহিমের পুত্র। এর ফলে বেজা, কুসান্তিনা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে একটি নতুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল এবং আমীরপুত্ররা এর উত্তরাধিকার লাভ করল। এভাবে একটি

১৯৬. মরক্কো ও আলজিরিয়া।

১৯৭. রোজেনথালে এর পরে দুই-তিনটি বাক্য সংযোজিত হয়েছে, যাতে বনি হামদীন, বনি উকাইল, বনি তুলুন, বনি তুগাশ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

www.amarboi.org

সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর তারা তিউনিসের সবুজ সিংহাসন অধিকার করল। এর পর তাদের বংশধরদের মধ্যে আবার সাম্রাজ্য বিভক্ত হল এবং পুনরায় তাদের প্রতিপত্তি ফিরে এল।

কখনো সাম্রাজ্যের এ বিভক্তি দুই ও তিন সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং তাও মূল প্রতিষ্ঠাতা বংশ ব্যতীত অন্যদের মধ্যে ঘটেছে। যেমন আন্দালুসের ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ এবং পূর্বাঞ্চলের অনারব নরপতিরা। আফ্রিকিয়ার সিনহাজাদের অবস্থাও অনুরূপ। বস্তুত তাদের সাম্রাজ্যের শেষ দিকে আফ্রিকিয়ার প্রতিটি দুর্গেই একজন করে স্বাধীন নরপতির আবির্ভাব ঘটেছিল, যেমন তার বর্ণনা পূর্বে গেছে। বর্তমানকালের[১৯৮] কিছু পূর্ণ আফ্রিকিয়ার 'যাব' ও 'জরিদ'-এর অবস্থাও এরূপই ছিল, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব।

প্রতিটি সাম্রাজ্যের অনুরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। বিলাস ও স্বস্তির অমোঘ আকর্ষণে তাতে অবক্ষয়ের নানাবিধ উপকরণ এসে উপস্থিত হয় এবং তার প্রাধান্যের ছত্রচ্ছায়া খণ্ডিত হয়ে পড়তে থাকে। মূল প্রতিষ্ঠাতা বংশ অথবা যারা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, তারাই ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয় এবং সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ এ পৃথিবী এবং তার উপরিস্থিত সকলের উত্তরাধিকারী।

১৯৮. আবুল আব্বাস কর্তৃক হেফসী সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবনের পূর্বে।

www.amarboi.org

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যে একবার অবক্ষয় দেখা দিলে তার আর নিবৃত্তি হয় না]

আমরা ইতিপূর্বে অবক্ষয়ের বার্তাবাহী বিভিন্ন উপাদান ও কার্যকারণ একের পর এক বর্ণনা করেছি এবং আমরা এও বলেছি যে, সাম্রাজ্যে এগুলো স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। বস্তুত এ কার্যকারণের সবগুলোই স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং অবক্ষয় যেহেতু সাম্রাজ্যের একটি স্বভাবজ পরিণতি, কাজেই তা অন্যান্য স্বাভাবিক বিষয়ের ন্যায়ই অস্তিত্বে আসবে, যেমন প্রাণিদেহের মিশ্রণের মধ্যে অবক্ষয়ের আবির্ভাব ঘটে। এ কারণে অবক্ষয় একটি অতি প্রাচীন রোগ, যার কোনো ঔষধ নেই, আরোগ্য নেই। কারণ এটা স্বভাবের সৃষ্টি এবং প্রকৃতির স্বভাবের কোনো পরিবর্তন নেই। অনেক সময় শাসন ব্যবস্থায় সচেতন বহু ব্যক্তি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এ অবক্ষয়কে বুঝতে সক্ষম হন এবং তাঁরা তার কার্যকারণগুলো দূর করা সম্ভব বলে মনে করেন। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা তার ক্ষতিপূরণ ও তার প্রকৃতিগত মিশ্রণের সংশোধন করতে সচেষ্ট হন। কারণ তারা ভাবেন যে, এগুলো তাদের পূর্ববর্তী শাসকদের ত্রুটি ও উদাসীনতার ফলেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। বরং এগুলো সাম্রাজ্যের জন্য প্রকৃতিদত্ত ব্যাপার এবং রাজকীয় অভ্যাসাদি এর ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। কেননা এ অভ্যাসগুলো অন্যতর প্রকৃতি স্বরূপ। যেমন কোনো শাসক তাঁর পিতা বা বংশের অন্যদেরকে রেশম ও গরদ পরতে এবং অস্ত্র ও বাহনে স্বর্ণ ব্যবহার করতে দেখেছেন। তারা মানুষকে দর্শন দানে ও তাদের সাথে নামাজ আদায়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন। এ অবস্থায় উক্ত শাসকের পক্ষে কি তার পূর্বসূরিদের বিরোধিতা করে পোশাক ও আসবাবপত্রে স্থূলতা এবং মানুষের সাথে মেলামেশায় মুক্ত হওয়া সম্ভব! কারণ পূর্ববর্তীদের অভ্যাসই এরূপ করতে তাকে বাধা দিবে এবং তার এরূপ আচরণকে মন্দ বলে ভাবা হবে। যদি এ বাধা অতিক্রম করেও তিনি কিছু করতে যান, তা হলে তাকে তার পাগলামি এবং অভ্যস্ত জীবনধারা থেকে হঠাৎ বের হয়ে যাওয়ার মতো হঠকারিতা বলে বিবেচনা করা হবে। এর ফলে তার নিজের পরিণতি ও সাম্রাজ্যের পরিণাম উভয়ই অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে।

পাঠক, নবীদের এ সকল অভ্যাস অস্বীকার ও তাদের বিরোধিতার বিষয়টি লক্ষ করুন। যদি তাঁদের পক্ষে ঐশী সাহায্য ও দৈবী সহায়তা না থাকত, তা হলে তাঁদের অবস্থা কী হত! অন্যদিকে অনেক সময় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোত্রপ্রীতির প্রতি সমীহের ভাব চলে গিয়ে তদস্থলে মানুষের মনে এ আড়ম্বর এসে স্থান গ্রহণ করে। সুতরাং এ

www.amarboi.org

অবস্থায় উক্ত আড়ম্বরকে বিদূরিত করলে গোত্রপ্রীতির প্রতিরোধের অভাবে প্রজাদের মনোভাব সাম্রাজ্যের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। এ কারণে সাম্রাজ্য তার শেষ পরিণতি লাভ না করা পর্যন্ত এ আড়ম্বরকেই যতদূর সম্ভব বর্ম হিসাবে ধারণ করে থাকে।

অনেক সময় সাম্রাজ্য এর শেষ অবস্থায় একটা নতুন শক্তি লাভ করে; মনে হয় যেন তার অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এটা যেন নিভে যাবার পূর্বে হঠাৎ জ্বলে ওঠা। যেমন প্রদীপের শিখার বেলায় ঘটে। তাও নির্বাপণের পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ বেশিমাত্রায় আলো বিকিরণ করতে থাকে। দেখলে মনে হয়, তা যেন নতুনভাবে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা প্রজ্জ্বলন নয়, নির্বাপণ। পাঠক, এ বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং মহান আল্লাহ্, তাঁর সৃষ্টির জন্য যে গন্তব্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার রহস্য ও বিচক্ষণতা অনুধাবন করতে তৎপর হোন। 'বস্তুত প্রতিটি সময়সীমাই লিপিবদ্ধ রয়েছে।[১৯৯]

১৯৯. কোরান, ১৩, ৩৮।

www.amarboi.org

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[কি করে সাম্রাজ্যে ক্রটিবিচ্যুতি দেখা দেয়]

জেনে রাখুন যে, রাজশক্তির ভিত্তি হল দুটি বিষয় এবং তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এদের একটি শৌর্য ও গোত্রপ্রীতি; এটাকেই সৈন্যবাহিনী বলে ব্যাখ্যা করা হয়। অন্যটি হল সম্পদ, যা এ সৈন্যবাহিনীর প্রাণশক্তি এবং রাজত্বের বিভিন্ন দরকারী অবস্থা সৃষ্টির মৌল উপাদান। কোনো সাম্রাজ্যের যখন ক্রটিবিচ্যুতি দেখা দেয়, তখন এ দুটি ভিত্তিতেই তা আঘাত হেনে থাকে। আমরা প্রথমে শৌর্য ও গোত্রপ্রীতিতে ক্রটিবিচ্যুতি দেখা দেয়ার কথা বর্ণনা করব এবং পরে সম্পদ ও রাজকোষে তার আবির্ভাবের কথা বলব।

জেনে রাখুন, সাম্রাজ্যের আয়োজন ও পত্তন, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, গোত্রপ্রীতির দ্বারা সংঘটিত হয়। তার জন্য এমন একটি বৃহৎ ও ব্যাপক গোত্রপ্রীতির প্রয়োজন, যা অন্য সকল গোত্রপ্রীতিকে গ্রাস করে বেড়ে উঠবে। তাই সাম্রাজ্যাধিপতির গোত্র ও পরিবার। অতঃপর যখন রাজকীয় বিলাসবৈভবের কাল দেখা দেয় এবং গোত্রপ্রীতির অধিকারীদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকার সময় আসে, তখন সম্রাট সর্বপ্রথমে নিজের আত্মীয়-স্বজন, তারা রাজকীয় বৈভবে তাঁর অংশীদার, তাদের নিকট থেকেই দূরে সরার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীই তাদের প্রতি ব্যবহার করে থাকেন। তদুপরি তাদের উপর অন্য সকলের অপেক্ষা অধিকতর বিলাসব্যসনের প্রভাব বিস্তৃত হয়; কেননা তারা রাজকীয় প্রভাব ও পরাক্রমের অধিকারী শক্তি। সুতরাং তাদেরকে ঘিরে দুটি বিধ্বংসী চরিত্র—বিলাস ও পরাক্রম বিপুল আকৃতি ধারণ করতে থাকে। পরাক্রম শেষ পর্যন্ত তাদেরকে হত্যাকাণ্ডের দিকে এগিয়ে দেয়; কারণ সম্রাটের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর তদ্দরুন তাদের অন্তঃকরণ ইতিমধ্যে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়টি উলটে গিয়ে সম্রাটের রাজ্যনাশের ভয়কে, উসকে দেয় মাত্র। সুতরাং সম্রাট তাদেরকে হত্যা, অপমান এবং তাদের অভ্যস্ত বিলাস ও প্রাচুর্যের বিনাশ সাধন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন। তারা ধ্বংস হয়, তাদের সংখ্যা কমে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যাধিপতির গোত্রপ্রীতির শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তা সেই গোত্রপ্রীতি, যার ব্যাপক প্রভাব সমগ্র গোত্রপ্রীতিকে গ্রাস করে বেড়ে উঠেছিল। যখন তার দৃঢ়তা বিনষ্ট হয় এবং তার শক্তিমত্তা শিথিল হয়ে পড়ে, এ সময় সম্রাট তার পরিবর্তে সম্পদের জন্য আশ্রিত ও সদাচারের উদ্দেশ্যে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারা নতুন গোত্রপ্রীতির শক্তি গড়ে তোলেন। কিন্তু তা পূর্বেরটির ন্যায় দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ হয় না। কারণ তাতে রক্ত ও আত্মীয়তার বন্ধন নেই। আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে,

www.amarboi.org

গোত্রপ্রীতির মহিমা আত্মীয়তা ও রক্তসম্পর্কের দ্বারা সুদৃঢ় হয়ে থাকে। কারণ এটা আল্লাহ্‌দত্ত বন্ধন। এভাবে সাম্রাজ্যাধিপতি তাঁর স্বাভাবিক গোত্রশক্তি ও সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন।

অনুরূপভাবে অন্য গোত্রশক্তিও তাদের অন্তর্গত ঈর্ষার প্রভাবে সম্রাট ও তাঁর পারিষদের প্রতি স্বভাবদত্ত বিমুখতা প্রদর্শন করে। সম্রাট তাদেরকেও হত্যা ও বিপর্যয় সাধনের মাধ্যমে ধ্বংস করেন। একের পর এক এটা সংঘটিত হয় এবং পরবর্তী জন পূর্ববর্তীকে এ বিষয়ে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়। অথচ এইসঙ্গে তাদের মধ্যে বিলাস-ব্যসনের ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়েছে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং বিলাসিতা ও হত্যাকাণ্ডে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। তারা গোত্রপ্রীতির শক্তি ও শৌর্যের কথা বিস্মৃত হয়ে তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বসে। তখন তারা খণ্ডিত শক্তি মাত্র এবং তুলনামূলকভাবে অতিশয় হীন। এর ফলে বিভিন্ন দিকে ও সীমান্ত অঞ্চলে সংরক্ষিত শক্তিতে শৈথিল্য নামে, প্রজারা বিভিন্ন অঞ্চলে রাজকীয় বৈভবের প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোত্র ও অন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব মাথাচাড়া দিতে থাকে। কারণ তখন তারা দূরস্থিত শক্তির সাহায্যে এবং প্রতিরোধকারী শক্তির অভাবে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে বলে মনে করে। এভাবে ক্রমশ তা বৃদ্ধি পায়, রাজকীয় শক্তির বিন্যাস সংকুচিত হয়ে আসে এবং বিদ্রোহী শক্তির তৎপরতা কেন্দ্রের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সাম্রাজ্য কখনো দ্বিধা ও ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তার শক্তির বিন্যাস অনুসারেই এটা হয়, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। তখন সাম্রাজ্যের এ বিভক্তি ও নবপত্তনে গোত্রপ্রীতি ভিন্ন অন্য শক্তি কাজ করে। এর কারণ গোত্রপ্রীতির সেই পূর্ব প্রভাব ও প্রতিপত্তির দিকে তাদের আনুগত্য তখনো বর্তমান।

পাঠক, এ বিষয়টিকে ইসলামী যুগের আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে বিবেচনা করুন। এটা প্রথম দিকে সুদূর আন্দালুস, হিন্দ ও চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তখন বনি আবদে মনাফের গোত্রপ্রীতির সহায়তায় বনি উমাইয়ার প্রভাব সমগ্র আরবে কার্যকরী ছিল। এ অবস্থায় দামেশক থেকে সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেক কর্ডোভায় আবদুল আজিজ ইবনে মুসা নুসাইরকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। তিনি নিহত হলেন।[২০০] সুলায়মানের নির্দেশ অমান্য করার শক্তি কারো ছিল না। কিন্তু গোত্রপ্রীতির এ দাপট বেশি দিন টিকল না। বিলাসিতা তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলল।

তাদের পরে বনি আব্বাস এল। তারা হাশেমী বংশের শক্তি খর্ব করে আবু তালেব বংশীয়দেরকে হত্যা ও নির্বাসিত করল। বনি আবদে মনাফের গোত্রপ্রীতি সংকুচিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল। আর তখন তাদের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করল। দূরস্থিত অঞ্চলগুলোতে অবস্থানকারী শক্তি তাদের বিরোধী হয়ে উঠল। যেমন আফ্রিকিয়ায় বনি আগলাব, আন্দালুসে তার অধিবাসীরা এবং অন্যান্য শক্তি-সম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ল। এর পর মাগরিবে বনি ইদরিস দেখা দিল এবং বারবাররা তাঁদের গোত্রপ্রীতির সেই পূর্ব

২০০. ৯৭ (৭১৬ খ্রি:) হিজরিতে এ ঘটনা ঘটে।

www.amarboi.org

শক্তির প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তাঁদের পক্ষাবলম্বন করল। তারা এও বুঝতে পারল যে, সাম্রাজ্যের কোনো প্রতিরোধ বা সংগ্রামী শক্তি এখানে এসে হানা দিতে পারবে না।

সাম্রাজ্যের শেষের দিকে আরো বহু শক্তি বের হয়ে পড়ল। বিভিন্ন দিকে ও দূরাঞ্চলে তাদের প্রচারণা ও রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে সাম্রাজ্যকে আরো বিভক্ত করে তুলল। এভাবে সাম্রাজ্যের শক্তি বিন্যাস খণ্ডিত হতে হতে তা কেন্দ্রে এসে পৌঁছতে থাকে। এর পর পারিষদ শক্তি ও বিলাসব্যাসনের অমোঘ বিধানে প্রথমে দুর্বল ও পরে ধ্বংস হয়ে যায় এবং খণ্ডিত সকল সাম্রাজ্যই এর ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে।

অনেক সময় গোত্রপ্রীতির অভাব সত্ত্বেও তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয়। কারণ মূল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা গোত্রপ্রীতির প্রতি মানুষের আনুগত্যের নিষ্ঠা তখনো বিদ্যমান। তা একান্তই আনুগত্য ও মান্যতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা বহুকাল যাবত মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। তার আরম্ভ কখন কীভাবে হয়েছে, তা কেউ জানে না; সুতরাং মানুষ সাম্রাজ্যাধিপতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ব্যতীত অন্য কিছু বোঝে না। এর জন্যই গোত্রপ্রীতির সহায়তা ছাড়াই রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। রাজ্যাধিপতি তার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে খণ্ড খণ্ড সৈন্যদল ও বেতনভোগী জনসমষ্টিকে একত্র করে কার্যোদ্ধার করেন। এর সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যকার সেই আনুগত্যের ভাব এসে যুক্ত হয়। ফলে কারো পক্ষে তাঁর নির্দেশ অমান্য করা অথবা তাঁর বিরোধী হওয়া সম্ভব হয় না। অবশ্য অধিকাংশ মানুষ যদি তাঁর বিরোধী হয়, তাঁকে অমান্য করে, তবে অন্য কথা; এ অবস্থায় কোনো চেষ্টাই কার্যকরী হয় না। কিন্তু অনেক সময় এরূপ বিরোধিতা থাকে না; ফলে সাধারণ মানুষের আনুগত্য ও মান্যতাকে সম্বল করে এরূপ সাম্রাজ্য কলহ ও বিদ্রোহ থেকে মুক্তি লাভ করে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মনের উপর তার প্রভাব স্থায়ী হয়ে সর্বপ্রকার বিরোধিতা ও অমান্যতার ভাব দূর করে দেয়। এভাবে সাম্রাজ্য তার প্রতিষ্ঠাতা গোত্র বা বংশ থেকে যে বিরোধিতা ও গোলযোগের সম্মুখীন হতে পারত, তা থেকেও বেঁচে থাকে। কিন্তু এ শান্ত অবস্থাতেও তার অবক্ষয় রুদ্ধ হয় না; সে নিজের মধ্যে সংকুচিত হয়ে আসতে থাকে। যেমন দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ শক্তি, খাদ্য গ্রহণ না করলে তা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কার্যকরী থেকে নিস্তেজ হয়ে আসে। 'প্রতিটি সময়সীমাই লিপিবদ্ধ রয়েছে।'[২০১] প্রতিটি সাম্রাজ্যই নির্দিষ্ট সময়সীমার অধীন। 'আল্লাহ্ দিবারাত্রি নির্ধারণ করে থাকেন।'[২০২] তিনি একক ও পরাক্রান্ত।

সম্পদের মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়, সেই সম্পর্কে জেনে রাখুন, প্রতিটি সাম্রাজ্যই তার প্রাথমিক অবস্থার প্রান্তরীয় জীবনবোধের অধীন থাকে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ সময়ে তা প্রজাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, মিতব্যয়ী, সম্পদের প্রতি সংযমী এবং রাজকোষের সমৃদ্ধি সম্পর্কে উদাসীন থাকে। কারণ তখনো সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য চাতুর্য ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন দেখা দেয়নি এবং হিসাব-নিকাশের জন্য কর্মচারীর প্রয়োজনও তীব্র হয়ে ওঠেনি। যেহেতু অপব্যয় করার কোনো উপলক্ষ এসে তখনো জোটেনি, সেজন্য সম্পদের প্রাচুর্য ও সাম্রাজ্যের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিন থাকে না; প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও পূর্ণতায় পৌঁছে। বিলাসব্যসন

২০১. কোরান, ১৩, ৩৮।
২০২. কোরান, ৭৩, ২০।

www.amarboi.org

এসে উপস্থিত হয় এবং তার সঙ্গে ব্যয়ের প্রাচুর্যও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শুধু সম্রাটের নিজস্ব ব্যয় নয়, সাধারণভাবে সকলের ব্যয়ই বেড়ে যায়; এমনকি এটা পল্লী অঞ্চলেও অনুপ্রবেশ করে। এর ফলে সৈন্যদলের বেতন ও অন্যান্য কর্মীদের খোরাকী বাড়িয়ে দিতে হয়। পুনরায় এ অধিক লভ্যের ফলে বিলাসব্যসন বৃদ্ধি পায় এবং তদনুযায়ী খরচের পরিমাণও বাড়ে। সাধারণ প্রজারাও এ প্রভাবের বাইরে থাকে না। কারণ মানুষ তাদের শাসকের ধর্ম ও অভ্যাস অনুকরণ করে। তখন সম্রাট বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্যের উপর শুল্ক ধার্য করতে বাধ্য হন। যাতে বিলাসের প্রয়োজন অনুসারে রাজকোষের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে নাগরিক জীবনের বিলাসবহুল সাদৃশ্যই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তদুপরি তাঁর শাসনব্যবস্থার খরচ ও সৈন্যদলের বেতনের জন্যও এটার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিলাসের স্রোত এটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়; শুল্কের বাঁধ তাকে রোধ করতে পারে না। সাম্রাজ্য তখন অধীনস্থ প্রজাদের উপর হস্ত সম্প্রসারিত করতে ও প্রতিপত্তির সুযোগ নিতে উদ্যত হয়। ফলে সে প্রজাদের সম্পদ থেকে শুল্ক, ব্যবসা প্রভৃতির মাধ্যমে এবং অনেক ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার অজুহাত সৃষ্টি করে কিংবা বিনা অজুহাতেই নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে থাকে। সৈন্যদলও এ সময়ে গোত্রপ্রীতির শৈথিল্যের দরুন সাম্রাজ্যের ঘাড়ে চড়ে বসতে চায়। সুতরাং তাদের এ স্বাভাবিক অগ্রাভিযানকে অর্থের প্রতিরোধ সৃষ্টি করে বাধা দিতে হয়। তাদের প্রাপ্য ও পুরস্কারের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং এটা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। এ অবস্থায় কর আদায়কারীরাও প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে। কারণ রাজকোষের প্রাচুর্যের সমস্ত অর্থই তাদের হাত দিয়ে আসে। এর ফলে তাদের প্রতিপত্তি বেড়ে যায় এবং রাজকোষের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে তারা সম্পদ হস্তগত করে। অন্যদিকে সম্পদ সংগ্রহের এ প্রতিযোগিতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মধ্যে নিন্দার চর্চা হতে থাকে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে তারা পরস্পরের জন্য দুর্নাম ও দুষ্কৃতি ডেকে এনে একে একে সকলেই নিঃস্বতা ও দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। ফলে তাদের দ্বারা সাম্রাজ্যের যে আড়ম্বর ও শোভা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা লোপ পায়। তাদের সম্পদ গ্রাস করে সাম্রাজ্য তখন ধনাঢ্য অন্য প্রজাদের দিকে হাত বাড়ায়। অন্যদিকে সাম্রাজ্যের শৌর্যবীর্য তখন আরো শিথিল হয়ে পড়েছে এবং এ অন্যায্য হস্তক্ষেপ ও প্রতিপত্তিই তাকে দুর্বল করে ফেলেছে। রাজ্যাধিপতির তখন শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় অর্থ ব্যয়ের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তখন এ অর্থই তরবারীর শক্তি অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর। সুতরাং শাসন খরচের জন্য, সৈন্যদলের প্রাপ্যাদি মিটানোর জন্য তাঁর অর্থের প্রয়োজন আরো বেড়ে চলে; কিন্তু কিছুতেই সংকুলান হয় না। সাম্রাজ্যের অবক্ষয় মূর্তিমান হয়ে ওঠে এবং সীমান্ত অঞ্চলে বিদ্রোহের ধ্বজা আন্দোলিত হতে আরম্ভ করে। সাম্রাজ্য তখন সর্বক্ষেত্রেই তার দৃঢ়তাকে হারিয়ে ক্রমশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলে। যে কোনো ভাগ্যান্বেষীরই তা তখন চারণভূমি এবং যে কোনো শক্তিমান তা প্রতিষ্ঠাতাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম। অবশ্য তখনো এটা হঠাৎ প্রতিরোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু তা তৈলহীন প্রদীপের সলিতা, নেভার পূর্বে জ্বলে ওঠে মাত্র। আল্লাহ্ সকল বিষয়ের অধিকারী এবং সকল বস্তুর ব্যবস্থাকারী। তিনি ভিন্ন অন্য উপাস্য নেই।

www.amarboi.org

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[প্রতিটি সাম্রাজ্য প্রথমে তার সীমা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত হয় এবং পরে পর্যায়ক্রমে সংকুচিত হয়ে বিনাশ ও ধ্বংস হয়ে যায়[২০৩]]

ইতিপূর্বে এ তৃতীয় অধ্যায়েরই খেলাফত ও রাজশক্তি সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতি সাম্রাজ্যের জন্যই দেশ ও অঞ্চলের এমন একটি নির্দিষ্ট ভাগ আছে, যার বেশি হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। পাঠক, এ বিষয়টিকে আপনি সাম্রাজ্যের গোত্রশক্তির বিভিন্ন দিক ও অঞ্চলের উপর সহায়ক হিসাবে অবস্থানের অনুপাতে বিবেচনা করতে পারেন। সুতরাং তা পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত হয়ে যেখানে শেষ হবে, সেখানেই ঐ সাম্রাজ্যের সীমান্ত এবং তা চক্রাকারে সাম্রাজ্যকে বেষ্টন করে থাকবে। কখনো এ সীমা প্রথম সাম্রাজ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শক্তি আরো ব্যাপক হলে পূর্বাপেক্ষা সীমান্ত বিস্তৃততর হয়ে দেখা দেয়। এ সকল অবস্থা অবশ্য তখনই সম্ভব হয়, যখন সাম্রাজ্য প্রান্তরীয় জীবনবোধ সরল ও শৌর্যবীর্যে স্থূল হয়।

অতঃপর যখন পরাক্রম ও প্রাধান্য বিস্তৃত হয়, রাজকোষের সমৃদ্ধির ফলে সম্পদ ও সম্ভোগের প্রাচুর্য দেখা দেয় এবং বিলাসিতা ও নাগরিকতার সমুদ্র উথলিয়ে ওঠে, তখন পুরুষ পরম্পরায় তার মধ্যে লালিত-পালিত হওয়ার ফলে সহায়ক শক্তির চরিত্র কোমল ও পারিষদবর্গের মনোভাব আয়েশী হয়ে ওঠে। এর অমোঘ আকর্ষণে তাদের স্বভাবে ভীরুতা ও আলস্য জন্ম নেয়। কারণ তারা নাগরিক জীবনের নমনীয়তা অবলম্বন করে এবং প্রান্তরীয় জীবনের সারল্য ও স্থূলতা থেকে দূরে সরে গিয়ে পরাক্রম ও পৌরুষের সকল চিহ্ন অবলুপ্ত করে ফেলে। তারা তখন নেতৃত্বের স্থায়িত্ব ও তার আধিপত্য নিয়ে কলহে প্রবৃত্ত হয়। পরিণামে তারা একে অপরের দ্বারা নিহত হয়। সম্রাটও তাদের এ হানাহানি থামাতে গিয়ে তাদের নেতৃস্থানীয় বয়োবৃদ্ধদেরকে হত্যা করেন। এর ফলে নেতা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অভাব দেখা দিয়ে শুধু অনুগত ও অধীনস্থদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সাম্রাজ্যের তেজবীর্য ও সামর্থ্যের এতে ক্ষতি হয় এবং এভাবে সাম্রাজ্যে প্রথম ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেয়। এটা প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্রাজ্যের সহায়ক শক্তি ও সৈন্যদলেরই ত্রুটি, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এর সাথে রাজকীয় পরাক্রমের যোগ্য আড়ম্বরের জন্য অপব্যয়ও এসে যোগ দেয়। আহার্য, পোশাক, প্রাসাদ নির্মাণ, অস্ত্রশস্ত্রের নবায়ন ও অশ্বাদির প্রশিক্ষণের মধ্যে

---

২০৩. আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এ পরিচ্ছেদটি সংখ্যাবিহীন অবস্থায় বিদ্যমান। যতদূর মনে হয়, এটা পরবর্তীকালের সংযোজন। আমরা গ্রন্থের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য অত্র পরিচ্ছেদটিকে সংখ্যায়িত করলাম, এর ফলে মূল অপেক্ষা পরিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল।

www.amarboi.org

আতিশয্যের সৃষ্টি করে জাঁকজমক সীমা অতিক্রম করে। রাজকোষের আয়-ব্যায়ের সাথে তাল মেলাতে পারে না। সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেয়। এটা মূলত সম্পদ ও রাজকোষ সম্পর্কীয় ত্রুটি। এ দুটি ত্রুটির ফলে সাম্রাজ্যে দুর্বলতা ও সংকোচের প্রসার ঘটে। কখনো সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এর ফলে তারা বিবাদকারী প্রতিবেশীদের সাথে এঁটে উঠতে ও প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় না; অনেক সময় বিভিন্ন দিকের ও সীমান্তের নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যের দুর্বলতা অনুভব করে তাদের অধীনস্থ এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার ও স্বাধীন হবার চেষ্টা করে। সাম্রাজ্যাধিপতির পক্ষে তাদেরকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় না। ফলে সাম্রাজ্যের প্রাথমিক বিন্যাস যে সীমায় পৌঁছেছিল, তা থেকে সংকোচন দেখা দেয়। সুতরাং সাম্রাজ্য তার সামর্থ্যানুসারে পুনরায় শক্তির বিন্যাস করে সীমান্ত স্থাপন করে। অতঃপর এ দ্বিতীয় সীমান্ত বেষ্টনীতেও প্রথমটির ন্যায় গোত্রশক্তির দুর্বলতা ও আলস্য এবং সম্পদ ও রাজকোষের অসঙ্গতি দেখা দেয়। সুতরাং সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শক্তি তার অনুসৃত সৈন্য, সম্পদ ও শাসক সম্পর্কীয় রীতিনীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। যাতে তার আয়, ব্যয়, সহায়ক শক্তি, অঞ্চল/বিভাগ ও রাজকোষের সঙ্গতি অনুসারে প্রাপ্যাদি বন্টনের মাধ্যমে একটা স্থায়ী অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে সকল বিষয়ই সাম্রাজ্যের পূর্বাবস্থায় লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুমান ও বিবেচনা করা হয়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও চারদিক থেকে অসুবিধা দেখা দিতে থাকে। এর ফলে পরবর্তী এ পর্যায়ে তাই দেখা দেয়, যা এর পূর্ববর্তী পর্যায়ে দেখা গিয়েছিল। সাম্রাজ্যাধিপতি পূর্বসূরির ন্যায় আবার বিবেচনা করতে বসেন এবং প্রথমটির পরিমাপ অনুসারে দ্বিতীয়টির সমুদয় অবস্থাকে জরিপ করেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রতিটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার ইচ্ছা করেন এবং তদনুসারে চতুর্দিকের অবস্থার পরিবর্তন করেন। ফলে সাম্রাজ্যশক্তির বিন্যাস পূর্বাপেক্ষা ভিন্নতর আকার ধারণ করে। কিন্তু এতেও পূর্ববর্তীটির ন্যায় অবস্থা দেখা দেয়। এভাবে তারা তাদের পূর্ববর্তী রীতিনীতি পরিবর্তন করতে থাকেন। ফলত তারা যেন নতুন সাম্রাজ্য ও ভিন্ন রাজশক্তির জন্ম দেন। অতঃপর একসময়ে তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে এবং তার পার্শ্ববর্তী জাতিগুলো তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন করে। তার উপরেও তাই আপতিত হয়, যা আল্লাহ্ নির্ধারিত করে রেখেছেন।

পাঠক, ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোতে এ বিষয়টিকে বিবেচনা করুন। তার শক্তি বিন্যাস বিজয়াভিযান ও বিভিন্ন জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে কীভাবে বিস্তৃত হয়েছিল! অতঃপর সহায়ক শক্তি বেড়ে গেল এবং প্রাপ্য ও প্রাচুর্যের কল্যাণে তাদের সংখ্যা বহুগুণিত হয়ে উঠল। বনি উমাইয়ার কাল শেষ হয়ে বনি আব্বাসের যুগ দেখা দিল। এ সময়ে বিলাসব্যসন বাড়ল নাগরিক জীবন বাস্তব হয়ে উঠল এবং এদের আকর্ষণে ত্রুটিবিচ্যুতি উপস্থিত হল। সুতরাং শক্তির বিন্যাস আন্দালুস ও মাগরিবের দিক থেকে সংকুচিত হয়ে এল। সেখানে যথাক্রমে উমাইয়া মারোয়ান বংশীয় এবং আলী বংশীয়দের রাজ্য স্থাপিত হয়ে এ দুই সীমান্ত সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পরে সম্রাট হারুনুর রশীদের সন্তানদের মধ্যে কলহ দেখা দিল এবং চারদিকে আলী বংশীয়

www.amarboi.org

রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রচারণা চলল ও রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হল। সম্রাট আল-মুতাওয়াক্কিল নিহত হলেন। আমীররা খলিফাদের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখল। বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকরা নিজ নিজ স্থানে স্বাধীন হয়ে উঠতে লাগল। ঐ সকল অঞ্চলের রাজস্ব বন্ধ হল; কিন্তু বিলাসের স্রোতে ভাঁটা পড়ল না। এর পর আল-মুতাজিদ এসে শাসন ব্যবস্থার রীতিনীতি পরিবর্তন করলেন এবং যে সকল অঞ্চল অন্যায্য প্রভাবের অধীনে চলে গিয়েছিল, তাদেরকে ত্যাগ করলেন। যেমন মাওরায়ান্নাহারে বনি সামান, ইরাক ও খুরাসানে বনি তাহের, সিন্ধু ও পারস্যে বনি সাফফার, মিশরে বনি তুলুন এবং আফ্রিকিয়ায় বনি আগলাব। এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে একসময়ে আরবীয় শক্তি শেষ হল এবং অনারব শক্তির প্রাধান্য দেখা দিল। বনি বুয়া ও দায়লামীরা ইসলামী সাম্রাজ্য কুক্ষিগত করে খলিফাদেরকে অবরুদ্ধ করল। মাওরায়ান্নাহারে বনি সামানের অধিকার পূর্ববৎ চলতে লাগল। ফাতেমী বংশীয়রা মাগরিব থেকে মিশর ও সিরিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে তা দখল করে নিলেন। এর পর তুর্কিদের মধ্য থেকে সলজুকীরা অগ্রসর হয়ে ইসলামী রাজ্যগুলো দখল করল এবং খলিফারা পূর্ববৎ অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে রইলেন। এক সময়ে তাঁদের এ সীমাবদ্ধ সাম্রাজ্যও বিলুপ্ত হল।

সম্রাট আন্‌নাসেরের[২০৪] সময় থেকে অন্যায্য প্রভাবের বিস্তৃতির ফলে খলিফাগণ চন্দ্রবেষ্টনী অপেক্ষাও সংকীর্ণতর একটি অঞ্চলে তাঁদের আধিপত্য রেখেছিলেন। তা ইস্পাহান পর্যন্ত আরবীয় ইরাক, পারস্য ও বাহরাইন। এভাবে কিছুকাল চলার পর খেলাফতের বিষয়টি হালাকু ইবনে তুলী ইবনে দুশী খানের হাতে নিশ্চিহ্ন হল। মোঙ্গল ও তাতারীদের এ সম্রাট সলজুকীদের নিকট থেকে ইসলামী রাজ্যগুলো দখল করে নিলেন।

এভাবে প্রতিটি সাম্রাজ্যই শক্তির বিন্যাসের দিক থেকে তার পূর্ববর্তীটি অপেক্ষা সংকীর্ণতর হয়ে দেখা দেয়। পর্যায়ক্রমে এদের এ সংকোচন এক সময়ে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। পাঠক, প্রতিটি সাম্রাজ্যে, তা বৃহৎ হোক বা ক্ষুদ্র হোক, এ বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। সাম্রাজ্যগুলো সম্পর্কে এটাই আল্লাহ্‌র প্রথা যতক্ষণ না তাঁর দ্বারা নির্ধারিত স্বাভাবিক বিলুপ্তির কাল এসে পৌঁছায়। তাঁর মুখচ্ছবি ব্যতীত সমুদয় বস্তু নশ্বর।'[২০৫]

---

২০৪. আব্বাসী সম্রাট, শাসনকাল ১১৮০-১২২৫ খ্রি:।
২০৫. কোরান, ২৮, ৮৮।

www.amarboi.org

উনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের নবায়ন ও নবপ্রতিষ্ঠা কী করে ঘটে]

জেনে রাখুন, যে কোনো সাম্রাজ্য যখন অবক্ষয় ও বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়, তখন তাতে নতুন সাম্রাজ্যের জন্ম ও পত্তন দুইভাবে হতে পারে।

সাম্রাজ্যের দূরস্থিত অঞ্চলগুলোতে নিয়োজিত কর্মচারীরা তার ছত্রচ্ছায়া খণ্ডিত করে নিজ নিজ এলাকায় অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের প্রত্যেকে একটি পৃথক রাজ্যের অধিকারী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে তার জাতির শক্তি ও প্রাধান্য অনুসারে তার প্রতিষ্ঠা নির্ধারিত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি ও আশ্রিতপোষ্যরা তার উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে। এরূপ রাজশক্তি উত্থান ক্রমান্বয়ে প্রচেষ্টার ফলে সংঘটিত হয়। কখনো এ প্রচেষ্টার সময় আরো প্রতিযোগী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে টানাটানি করে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় কলহে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষেত্রে তারই জয় হয়, যার হাতে তদীয় সাথী অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা বিদ্যমান এবং পরিণামে সে সঙ্গীকে পরাস্ত করে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম। যেমন আব্বাসী সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে দেখা গেছে। তাঁদের ছত্রচ্ছায়া দূরস্থিত অঞ্চলগুলোতে খণ্ডিত হয়ে পড়ায় বনি সামান মাওরায়ান্নাহারে, বনি হামদান মোশেল ও সিরিয়ায় ও বনি তুলুন মিশরে অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করে বসল। আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যেও অনুরূপ অবস্থা দেখা দিয়েছিল। তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োজিত কর্মচারীরাই ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ হয়ে বসল। তারা সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড করে বহু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল এবং তাদের পরে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও আশ্রিতরা তার উত্তরাধিকার লাভ করল।

এরূপ প্রাধান্য বিস্তারে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যশক্তি ও নবোত্থিত রাজশক্তির মধ্যে কোনোপ্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ হয় না। কারণ সাম্রাজ্যাধিপতিরা নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকেন; তাদের এ অধিকার কেড়ে নেবার জন্য কোনো শক্তি অগ্রসর হয় না। এটা কেবলমাত্র সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের দরুন তাঁদের ছত্রচ্ছায়া খণ্ডিত হয়ে পড়ে এবং এটা প্রতিরোধ করতে তাঁরা অসমর্থ হন।

দ্বিতীয় পন্থাটি হল, প্রতিবেশী কোনো জাতি বা গোত্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে তারা কোনোপ্রকার মতবাদ প্রচার করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, যেমন আমরা পূর্বে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করেছি; অথবা এমন কোনো শৌর্য ও গোত্রপ্রীতি, যা ব্যাপকতায় তার গোত্রান্তর্গত প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী করে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর করে দেয়। কখনো এটা প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত হয় এবং সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ী অবস্থা তাদের প্রাধান্য বিস্তারকে নিশ্চিত করে তোলে। তাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা সংগ্রাম করে এবং পরিণামে জয়ী হয়ে তেমনভাবে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়, যেমন সাধারণত হয়ে থাকে।[২০৬] পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা।

---

২০৬. রোজেনথালে এ অনুচ্ছেদটির পরে—'সবুক্তগীন ও তাঁর বংশধরের সাথে সলজুকীদের এবং আল-মোহেদদের সাথে মারিনী সম্রাটদের অনুরূপ অবস্থাই ঘটেছিল।'—বিদ্যমান।

www.amarboi.org

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[নবোত্থিত রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে অধ্যবসায়ের পরিচয় দেয়; হঠাৎ আক্রমণ করে না]

আমরা বর্ণনা করেছি যে, নবোত্থিত ও নবায়িত এ সাম্রাজ্য দুই প্রকারের হয়ে থাকে। একটি বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের দ্বারা; যখন সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়া তাদের উপর খণ্ডিত হয়ে পড়ে এবং তার শক্তি সংকুচিত হয়ে আসে, তখন এটা দেখা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের দিক থেকে এ ব্যাপারে কোনো দাবি উত্থাপিত হয় না, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। কারণ যা তাদের হাতে আছে, তাতেই তারা সন্তুষ্ট এবং সেই অনুপাতেই তাদের শক্তি সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যটি সাম্রাজ্যের প্রতি আহ্বানকারী ও বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। তারা এর দাবি উত্থাপন করে। কারণ এজন্য প্রয়োজনীয় শক্তি তাদের অধিকারে আছে। অবশ্য এও তাদের গোত্রপ্রীতি ও শৌর্যশক্তির বৈশিষ্ট্য অনুসারে দাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কার্যকর হতে হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ও তাদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে যুদ্ধবিগ্রহ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এক সময়ে এগুলোর ফলাফল একত্র হয়ে তাদের প্রাধান্য ও জয়কে সম্ভব করে তোলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হঠাৎ আক্রমণ করে তারা জয়ী হয় না। এর কারণ, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, যুদ্ধের জয়-পরাজয় কতকগুলো কাল্পনিক আধিদৈবিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। যদিও জনসংখ্যা, অস্ত্রবল ও পরিচালননিষ্ঠা বিজয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে, তথাপি এ সকল কাল্পনিক বিষয়াদি ব্যতীত তাও কার্যকর হয় না, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এজন্যই যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা উপকারী ও সর্বাধিক ফলপ্রসূ কৌশল হল প্রতারণা। হাদিসে আছে যুদ্ধ প্রতারণা মাত্র।[২০৭]

প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের অভ্যস্ত মনোভাব, যা একান্ত জরুরি ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়, যেমন একাধিক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে, তাই নবোত্থিত রাজশক্তির পথে বাধার সৃষ্টি করে এবং তার প্রভাবে তাদের অনুসারী ও অনুগামীদের শৌর্যবীর্যে শৈথিল্য নেমে আসে। তার যদি সম্রাটের অন্তরঙ্গ পারিষদবর্গের অন্তর্গত এবং তাঁর আনুগত্য ও সহায়তার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়, তথাপি এর অন্যথা হয় না। সুতরাং অন্যদের ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি করে দেখা দেয় এবং যেহেতু তাদের মধ্যে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের এ বদ্ধমূল বিশ্বাসের ফলে শৈথিল্য দেখা দেয়, সুতরাং তারা ত্রুটি-বিচ্যুতির অধীন না হয়ে পারে না। এ কারণেই দেখা যায় নবোত্থিত রাজশক্তির

---

২০৭. ৩১৯ পৃ. দ্র.।

www.amarboi.org

প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এর ফলে তাদেরকে ধৈর্য ও প্রতীক্ষার দ্বারস্থ হয়ে সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশকে স্পষ্টতর হবার সুযোগ দিতে হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে শৈথিল্য আসে এবং নবোত্থিত রাজশক্তি তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যথার্থ কার্যক্রম গ্রহণ করে। পরিণামে বিজয় ও প্রাধান্য তাদের করতলগত হয়।

এতদ্ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য অধিকতর ঐশ্বর্যের অধিকারী। এটা তাদের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি ও ব্যাপক সুখ-সম্ভোগের ফসল। বিশেষভাবে তারা রাজকোষের সম্পদের সহায়তা গ্রহণ করেছে এবং তন্নিমিত্ত তাদের আয়ত্তে প্রশিক্ষিত অশ্বারোহী দল ও নবায়িত অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে। তাদের রাজকীয় বৈভব তা দিয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় দান-ধ্যানাদি এমন বিপুল আকার ধারণ করেছে, যা দিয়ে তারা শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে সমর্থ হয়। নবোত্থিত রাজশক্তির এসব কিছুই নেই। তারা তখনো প্রান্তরীয় জীবনবোধ, দারিদ্র্য ও অস্বচ্ছলতার অধীন। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের উল্লেখিত অবস্থা তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে এবং তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ইতস্তত করতে থাকে। এজন্যই তাদের পক্ষে দীর্ঘসূত্রতার প্রয়োজন, যাতে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অবক্ষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার গোত্রশক্তি ও রাজকোষের ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃঢ়মূল হয়ে দাঁড়ায়। কেবল তখনই মাত্র নবোত্থিত রাজশক্তি তার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দীর্ঘদিনের অধিকার চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এটাই বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রথা।

অন্যদিকে নবোত্থিত রাজশক্তির প্রায় সকলেই প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনকারী। তাদের বংশধারা, অভ্যাস ও চরিত্র এটাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তারা এর গৌরবের অংশীদার এবং এর উপর যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে এর সহায়তা পরিত্যাগকারী। এ কারণে তাদের উভয় শক্তির মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে একটি ব্যবধানের সৃষ্টি হতে থাকে। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের কোনো সংবাদ নবোত্থিত রাজশক্তির জন্য সহজলভ্য হয়ে ওঠে না। প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো দিক থেকেই তাদের মধ্যকার পরস্পরের পরিচয় লাভের সুযোগ থাকে না। এরূপ বিচ্ছিন্নতার জন্য তারা অধিকার দাবি করলেও একটা ইতস্তত ভাবের মধ্যে বিরাজ করে এবং হঠাৎ আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে। যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের সময়সীমা শেষ হয়ে আসে এবং সবদিক থেকে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি পূর্ণতা লাভ করে, ততক্ষণ তারা অপেক্ষা করে। কেননা কেবল তখনি নবোত্থিত রাজশক্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও বিলুপ্তির পূর্ণজ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে এর বিভিন্ন দিক ও অঞ্চল অন্যদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার ফলে তাদের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এ সময়ে তাদের শক্তি কেন্দ্রীভূত আকাঙ্ক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হতে পারে। কারণ তখন তাদের ধারণার সেই ইতস্তত ভাব আর নেই। তাদের প্রতীক্ষা তার সীমায় পৌঁছেছে। কাজেই সক্রিয়তা তখন বিজয়ের অনুসারী।

পাঠক, এটাকে আব্বাসী সাম্রাজ্যের মধ্যে তুলনা করুন। তার আবির্ভাবকালে শিয়ারা দাবি উত্থাপন করেও দশ বছর কিংবা তারও অধিককাল খুরাসানে অবস্থান

www.amarboi.org

করেছিল এবং নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করার কাজে ব্যাপৃত ছিল। কেবল এ অপেক্ষার পরই তাদের জন্য প্রস্তুতি শেষ হয়ে উমাইয়াদের উপর বিজয় লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

অনুরূপভাবে তাবারিস্তানের উলুবীদের অবস্থা; তারাও দায়লামে তাদের দাবি প্রচার করতে আরম্ভ করে। অতঃপর দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার পর এ অঞ্চলে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার উলুবীদের ক্ষমতা অন্তর্হিত হলে দায়লামীরা পারস্য ও দুই ইরাকের রাজশক্তি লাভ করে। এর পর তারাও দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করে এবং ইস্পাহানের বিচ্ছিন্নতার পর বাগদাদের খলিফার উপর তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এরূপ উবাইদী সম্রাটরাও। তাদের দাবি উত্থাপনকারী মাগরিবের আবু আব্দুল্লাহ আশ্‌শিয়ী বারবার গোত্র কুতামার মধ্যে দশ বছর কিংবা তারও অধিককাল প্রতীক্ষা করে অতঃপর আফ্রিকিয়া বনি আগলাবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হন এবং সমগ্র মাগরিবের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। অতঃপর তারা মিশর অধিকারে উদ্যোগী হন। কিন্তু তজ্জন্য ত্রিশ বছর অথবা অনুরূপ দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। ইতিমধ্যে তার উদ্দেশ্যে সৈন্যদল ও রণতরী প্রেরণ অব্যাহত রাখেন। তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য বাগদাদ ও সিরিয়া থেকে জলে-স্থলে সাহায্য এসে পৌঁছত। তারা আলেকজান্দ্রিয়া, ফাইয়ুম ও সাইদ অধিকার করেন। তাদের দাবি অতঃপর হেজাজের দিকে প্রভাবিত হয় এবং মক্কা ও মদিনা দখলে আসে। এর পর তাদের সেনাপতি জওহর আল কাতেব সসৈন্যে মিশর নগরীতে অবতীর্ণ হন এবং তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন। তিনি বনি তুগেজের সাম্রাজ্য শক্তি সমূলে উৎপাটিত করেন এবং কায়রো নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সম্রাট আল মুয়েজ্জুলেদীনেল্লাহ্ অতঃপর আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের প্রায় ষাট বছর পরে মিশরে এসে অবতীর্ণ হন।

অনুরূপভাবে তুর্কি রাজন্যবর্গ সলজুকীরা যখন বনি সামানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করল এবং মাওরায়ান্নাহার অতিক্রম করে এল, তখনও তাদেরকে খুরাসানের বনি সবুক্তগীন সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ত্রিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।[২০৮] এর পর অনেক দিনের ব্যবধানে তারা বাগদাদে অভিযান পরিচালনা করে এবং তা অধিকার করে খলিফাকে তাদের কুক্ষিগত করে নেয়।

এরূপ তাতারীরাও তাদের পরে প্রান্তর হতে ছয়শ সতের হিজরিতে বের হতে আরম্ভ করে; কিন্তু তাদের প্রাধান্য বিস্তার চল্লিশ বছরের প্রচেষ্টার পরে সম্পূর্ণতা লাভ করে।

অপরূপ মাগরিবের অধিবাসীরা। লামতুনা গোত্রের আল মোরাবেতীরা মেগরাওয়া সম্রাটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয় এবং পরে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এর পর আল-মোহেদেরা লামতুনাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় এবং দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর যুদ্ধ-বিগ্রহের পর তাদের রাজধানী মারাকেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

২০৮. সুলতান মাহমুদের পুত্র প্রথম মাসউদের সময় ৪৩১ (১০৪০ খ্রি:) হিজরিতে ঘটে।

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে জানাতী গোত্রের বনি মারিন আল-মোহেদদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এবং প্রায় ত্রিশ বছরের যুদ্ধ-বিগ্রহের পর তারা ফাস অধিকার করে তাকে তাদের সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অতঃপর আরো ত্রিশ বছর যুদ্ধাদি পরিচালনার পর তাদের রাজধানী মারাকেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আমরা এ সকল বিষয় সম্পর্কে উক্ত সাম্রাজ্যগুলোর ইতিহাসে বর্ণনা করব। নবোত্থিত রাজশক্তিগুলোকে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি ও তা বাস্তবায়নের জন্য অনুরূপভাবে অপেক্ষা করতে হয়। এটাই বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রথা এবং তুমি আল্লাহ্‌র প্রথার কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না।[২০৯]

ইসলামের বিজয়াভিযানে যা সংঘটিত হয়েছে, তা দিয়ে এ বক্তব্যের উপর আপত্তি উত্থাপন করা যায় না যে, তারা কীভাবে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর তিরোধানের তিন কি চার বছরের মধ্যে পারস্য ও রোমের উপর আধিপত্য বিস্তার করল! পাঠক, জেনে রাখুন, এও আমাদের নবী (সঃ)-এর অলৌকিক কার্যাবলির অন্যতম। এর রহস্য হল, বিশ্বাসের অমোঘ আকর্ষণে মুসলমানরা শত্রুর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে মৃত্যুপণ করে নেমেছিল এবং আল্লাহ্ তাদের শত্রুদের হৃদয়ে ভীতি ও হীনমন্যতা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এ সকলই নবোত্থিত রাজশক্তির পক্ষে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতীক্ষার স্বাভাবিক রীতির বিপরীত ছিল। যেহেতু এটা স্বভাবের বিপরীত, সেজন্য এটা অবশ্যই আমাদের নবী (সঃ)-এর অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের অন্তর্গত; ইসলামী জাতীয়তা প্রতিষ্ঠায় যার বহিঃপ্রকাশ সকলের নিকট সুপরিচিত। অলৌকিক ক্রিয়াদির সাথে স্বাভাবিক বিষয়বস্তুকে তুলনা করা যায় না এবং তার দ্বারা আপত্তি উত্থাপনও সমীচীন নয়। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।

২০৯. কোরান, ৩৩, ৬২; ৩৫, ৪৩; ৪৮, ২৩।

www.amarboi.org

একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের শেষের দিকে জনবসতির প্রাচুর্য এবং অধিকমাত্রায় মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়]

জেনে রাখুন, ইতিপূর্বে এ বর্ণনা আপনার সম্মুখে এসেছে যে, সাম্রাজ্য তার প্রথম দিকে অবশ্যই রাজকীয় শক্তিতে অমায়িক ও শাসন ব্যবস্থায় ন্যায়ানুগ হয়ে থাকে। এটা ধর্মের কারণে হতে পারে; যদি তার প্রতিষ্ঠার প্রচারণা ধর্মীয় হয়। অথবা সাধারণ সদাচার ও সৎগুণের জন্যও হতে পারে; যেহেতু সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক প্রান্তরীয় জীবনবোধ এটাই কামনা করে। সুতরাং রাজশক্তি বন্ধুভাবাপন্ন সদাচারী হলে প্রজাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং তারা জনবসতি বৃদ্ধির উপাদান ও কার্যকারণ অনায়াসে অনুসন্ধান করে। এর ফলে তা পূর্ণতা লাভ করে ও বংশধারা বেড়ে যায়।

যেহেতু এর সমস্ত কিছুই ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়, সেজন্য এর প্রভাব কমপক্ষে এক পুরুষ অথবা দুই পুরুষ পরে দর্শনীয় হয়ে থাকে। দুই পুরুষ পরে প্রতিটি সাম্রাজ্য তার স্বাভাবিক বয়ঃক্রমে উপনীত হয়। সুতরাং এ সময়ে জনবসতি তার বৃদ্ধি ও পূর্ণতার সীমায় পৌঁছে। পাঠক, এ কথা বলবেন না যে, ইতিপূর্বে আপনি জানতে পেরেছেন, সাম্রাজ্যের শেষের দিকে প্রজাদের নিগ্রহ ও রাজশক্তি দুর্ব্যবহার দেখা দেয়। অবশ্য এ কথা যথার্থ; কিন্তু এর দ্বারা আমাদের বক্তব্যের উপর আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। কারণ এ সময়ে যদিও প্রজা নিগ্রহ দেখা যায় এবং তজ্জন্য রাজকোষের হানি ঘটে; কিন্তু এর প্রভাবে জনবসতির সংকোচন একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে দেখা দেয়। কারণ স্বাভাবিক সবকিছুই ধীরে সংঘটিত হয়।

অতঃপর এ সময়ে সাম্রাজ্যের শেষের দিকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়ার কারণ এই যে, সাম্রাজ্যের শেষের দিকে সম্পদ সংগ্রহ ও রাজকোষের জন্য মানুষের উপর যে অবিচার অনুষ্ঠিত হয় তজ্জন্য তারা অনেক স্থলেই কৃষি কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। অনেক সময় গোলযোগ সৃষ্টি এবং সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের জন্য বিদ্রোহের আধিক্যও প্রজাদের উৎসাহে শৈথিল্যের জন্ম দেয়। ফলে ফলে সাধারণভাবে শস্যাদির মজুদ কমে যায়। শস্যের উৎপাদন ব্যবস্থা ও তার ফসলের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই এবং তা এক অবস্থায়ও থাকে না। স্বভাবতঃই পৃথিবীতে বৃষ্টি কখনো বেশি হয়, কখনো কম হয় এবং তার পতনের মধ্যে প্রাবল্য ও দৌর্বল্য, আধিক্য ও স্বল্পতা দৃষ্ট হয়ে থাকে। ফসল, ফলমূল ও দুগ্ধও সেই অনুপাতে জন্মায়। সুতরাং মানুষ সর্বদাই তাদের আহার্যের ব্যাপারে সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল। কাজেই সঞ্চয় না থাকলে মানুষের জন্য দুর্ভিক্ষের

www.amarboi.org

ভাবনা বড় হয়ে দাঁড়ায়। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ তা ক্রয় করতে না পেরে ধ্বংস হয়। অনেক সময় এমনি ফসলহীনতা দেখা দেয় এবং মজুদও কিছু থাকে না, তখন সকল মানুষই অনাহারের অধীন হয়ে পড়ে।

মৃত্যুর আধিক্য সম্পর্কে বলতে গেলে তাও এ প্রকার দুর্ভিক্ষের কারণে সংঘটিত হয়, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। কিংবা সাম্রাজ্যের দুর্বলতার জন্য গোলযোগ বৃদ্ধি পায় এবং তদ্দরুন অসুবিধা ও হত্যাকাণ্ড দেখা দেয় অথবা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এর কারণ সাধারণভাবে জনবসতির আধিক্যের জন্য আবহাওয়া দূষিত হওয়া। কারণ ঘনবসতির জন্য দুর্গন্ধ ও দূষিত আর্দ্রতার সংস্পর্শে এসে জীবাত্মার আহার্য বায়ু বিকৃত হয়ে ওঠে। এরূপ বিকৃতির কারণ স্থায়ী হলে বায়ুর মিশ্রণ বিগড়ে যায়। সুতরাং এরূপ বিকৃতি মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছলে তা দিয়ে ফুসফুস রোগাক্রান্ত হয়। এর ফলেই ফুসফুস সংক্রান্ত বিভিন্ন মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। এমন কি বায়ুর বিকৃতি মারাত্মক পর্যায়ে না পৌঁছলেও তার অন্তর্গত দূষিত উপাদান বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশকে দূষিত করে এবং এর দরুন বিভিন্ন প্রকার জ্বর দেখা দেয়। দেহ রোগাক্রান্ত হয় ও ধ্বংস হয়ে যায়।

সাম্রাজ্যের শেষের দিকে জনবসতির বৃদ্ধিই এ প্রকার দুর্গন্ধ ও দূষিত আর্দ্রতার জন্ম দিয়ে থাকে। কারণ এর প্রথম দিকে রাজশক্তি অমায়িক, সদয় ও কম চাপ সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং জনসংখ্যার এরূপ বৃদ্ধি খুবই স্বাভাবিক। এজন্য বিজ্ঞানের[২১০] পুস্তকের যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, জনবসতির মধ্যে স্থানে স্থানে খোলা মাঠ ও শূন্যভূমি থাকা প্রয়োজন। যাতে বায়ুর প্রবাহ প্রাণিকুলের সংস্পর্শে দুর্গন্ধ ও পচনে দূষিত বায়ুকে দূর করে তদস্থলে বিশুদ্ধ বায়ু আনয়ন করতে পারে। অন্যদিকে সম্ভবত এ কারণে অধিক ঘনবসতিপূর্ণ নগরগুলোতে অন্যস্থান অপেক্ষা মৃত্যুর হার অনেক বেশি। যেমন পূর্বাঞ্চলে মিশর ও পশ্চিমাঞ্চলে ফাস। আল্লাহ্ যা ইচ্ছে নির্ধারণ করেন।

---

২১০. মূলে 'হিকমত'—তৎকালে দর্শন অর্থে ব্যবহৃত।

www.amarboi.org

দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[মানুষের সামাজিক বিষয়াদির শৃঙ্খলা বিধানের জন্য শাসন নীতির প্রয়োজন]

জেনে রাখুন, আমরা ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে দেখতে পেয়েছি যে, মানুষের জন্য সমাজবদ্ধ জীবন অত্যাবশ্যকীয়। এটাই আমাদের আলোচ্য সভ্যতার অর্থ। এ সামাজিক জীবনে এমন একজন শৃঙ্খলাবিধায়ক শাসকের প্রয়োজন, যার আশ্রয় ও নির্দেশে তা পরিচালিত হতে পারে। এটা কখনো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ ধর্মমতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং প্রচারকের দ্বারা উপস্থাপিত বিষয়াদির পাপ-পূণ্যের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার আনুগত্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে ওঠে। কখনো এটা বুদ্ধিগ্রাহ্য শাসননীতি মাত্র; মানুষের কল্যাণ অনুধাবনের পর শাসক কর্তৃক তার প্রয়োগের আশায় তারা এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। প্রথমটির দ্বারা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয়; কেননা ধর্মপ্রবর্তক পারলৌকিক কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত এবং তার অনুসরণে মানুষ পারলৌকিক মোক্ষ লাভ করে। কিন্তু দ্বিতীয়টির যা কিছু উপকার, তা একমাত্র ইহলোকের জন্য।

পাঠক, 'নগর শাসন'[২১১] সম্পর্কে আপনি যা শুনতে পান, তা এ পর্যায়ের নয়। কেননা দার্শনিকদের কাছে তার অর্থ উক্ত সমাজের প্রতিটি মানুষ এমন বিবেক ও চরিত্রের অধিকারী হবে, যাতে একান্তই শাসকের প্রয়োজন ফুরায়। এরূপ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ জীবনকে তারা 'আদর্শ নগরী' বলে অভিহিত করেন এবং তার জন্য অনুসরণীয় নীতিমালাকে 'নগর শাসন' বলা হয়। এর দ্বারা তারা ঐ শাসন নীতি বোঝান না, যা দিয়ে সমাজ জীবনের সাধারণ মানুষ নিয়ন্ত্রিত ও তাদের কল্যাণ সাধিত হতে পারে। বস্তুত এটা তদ্রূপ নয়। এ আদর্শ নগরী বলতে গেলে তাদের বিরল ও অবাস্তব ধারণা মাত্র। তারা তা ধরে নিয়ে ও অনুমান করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

আমরা পূর্বে বুদ্ধিগ্রাহ্য যে শাসনব্যবস্থার কথা বলেছি, তা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। তার একটি সর্বসাধারণের কল্যাণের অনুসারী এবং বিশেষভাবে সম্রাটের শাসন স্থায়িত্বের শুভাশুভ নির্ধারক। তাই পারস্যবাসীদের শাসননীতি যার ভিত্তি হল দার্শনিক বিষয়াদি। আল্লাহ্‌ ধর্মীয় জাতীয়তা ও খেলাফতের দ্বারা তা হতে আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। কেননা ধর্মীয় বিধান এ সাধারণ ও বিশেষ কল্যাণ এবং সংশ্লিষ্ট আদব-কায়দা সম্পর্কে পথ নির্দেশক। রাজকীয় বিধি-নিষেধও তার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়টি সর্বাগ্রে সম্রাটের কল্যাণ তথা তাঁর পরাক্রম ও প্রতীক্ষার মাধ্যমে রাজশক্তির স্থায়িত্ব কিভাবে

---

২১১. পলিটিক্যাল অটোপরিনিজম (রোজেনথাল)।

www.amarboi.org

আসবে, তৎসম্পর্কে মনোযোগী হয়। সাধারণ মানুষের কল্যাণ সেখানে এর অনুসারী। এটাই সেই শাসন নীতি, যা মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল সমাজবদ্ধ মানুষ অনুসরণ করে থাকে। অবশ্য মুসলমান নরপতিগণ তাকে যতদূর সম্ভব ধর্মীয় বিধিনির্দেশের অধীন করে থাকেন। এজন্য তাদের শাসন নীতি, ধর্মীয় বিধান, চারিত্রিক রীতি, সমাজ জীবনের স্বাভাবিক প্রথা এবং প্রয়োজনীয় গোত্রপ্রীতি ও শৌর্যবীর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সমষ্টিতে পরিগণিত হয়। তাতে প্রথমে ধর্মীয় বিধানকে এবং পরে যথাক্রমে রীতিনীতির দার্শনিকগণকে ও চরিত্রাদিতে রাজন্যবর্গকে অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

এ বিষয়াদি সম্পর্কে অতিশয় সুন্দর ও ব্যাপক নির্দেশাদিসহ তাদের ইবনে হুসাইন তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্ ইবনে তাহেরের জন্য একটি পত্র রচনা করছিলেন। সম্রাট মামুন শেষোক্তকে আররাক্কা, মিশর ও তাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসক করে পাঠালে এ পত্রটি লেখা হয়। তার পিতা তাহের এ বিখ্যাত পত্রটিতে তাকে সাম্রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় যাবতীয় ধর্মীয়, চরিত্রগত, শাসনতান্ত্রিক ও রাজকীয় নীতি বিষয়ে উপদেশ ও অঙ্গীকার প্রদান করেন এবং সদাচার ও সৎচরিত্রের নির্দেশ দেন। বস্তুত তা শাসক মাত্রেরই অনুসরণযোগ্য; এমনকি সাধারণ মানুষও তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। পত্রটির বক্তব্য নিম্নরূপ।[২১২]

পুত্র আবদুল্লাহ্‌র প্রতি তাহের ইবনে হুসাইনের পত্রের বিষয়

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। অতঃপর তোমার উচিত একক ও অংশীদারহীন আল্লাহ্‌কে মেনে চলা ও তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত দৃষ্টির প্রতি লক্ষ রাখা ও তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকা। তোমার প্রজাবৃন্দকে রাত্রিদিন সংরক্ষণ কর এবং আল্লাহ্ তোমার মধ্যে সততার যে আদর্শ দিয়েছেন, তোমার পরিণাম স্মরণ করে তাকে অত্যাবশ্যকীয় করে নাও। কেননা এ বিষয়ই তোমার অবলম্বন হবে, এর উপরেই তুমি নির্ভরশীল হবে এবং এ সম্পর্কেই তুমি জিজ্ঞাসিত হবে। এর দ্বারা তোমার কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রিত করলে প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করবেন এবং মহাপ্রলয়ের দিনে তোমাকে তাঁর নিষ্করুণ শাস্তি ও প্রতিশোধ থেকে মুক্তি দিবেন। কারণ পবিত্র আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর বান্দাদের পরিচালনার ভার অর্পণ করে তোমার প্রতি সদাচার প্রদর্শন করেছেন এবং তোমার উপর করুণাকে অবশ্যপালনীয় করে তুলেছেন। তুমি তাদের মধ্যে ন্যায়কে অনুসরণ কর এবং তার অধিকার ও সীমাকে প্রতিষ্ঠা দাও। তাদের অধিকার হরণ এবং তাদের পরিজনও পদমর্যাদার হস্তক্ষেপ করা থেকে দূরে থেক। তাদের রক্ত ও তাদের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করো; যাতে তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারে। কারণ আল্লাহ্ তোমার অবশ্য কর্তব্য সম্পর্কে জবাবদিহি চাইবেন, তার জন্য দায়ী করবেন, তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং তোমার পূর্বাপর সকল কৃতকার্যের জন্য পুণ্যও প্রদান করবেন। সুতরাং এর জন্য তোমার বুদ্ধি-বিবেক ও

২১২. পত্রটি তাবারীর ইতিহাস হতে উদ্ধৃত।

www.amarboi.org

দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত কর এবং এক্ষেত্রে কোনো বাধাই যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে। কারণ এটাই তোমার দায়িত্বের শিরোদেশ এবং তোমার কর্তব্যের প্রাণশক্তি। সর্বপ্রথমে আল্লাহ্ যেন এ ব্যাপারেই তোমাকে সহায়তা দান করেন। তুমি প্রথমেই তোমার নিজের দিকে লক্ষ রেখে তোমার কর্তব্য পালন করবে এবং প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ তোমার উপর যা অবশ্য পালনীয় বলে নির্দেশ করেছেন, তা বাস্তবায়িত করবে। পাঁচ অক্তের নামাজ সর্বদা পড়বে এবং তার জন্য স্বেচ্ছায় জামাতের অনুসারী হবে। তা যেন নির্ধারিত প্রথা অনুসারে পরিপূর্ণ অজু এবং প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র স্মরণের দ্বারা সমাধা হয়। তোমার কোরান পাঠে ধীরতা অবলম্বন কর এবং রুকু, সেজদা ও দরুদ[২১৩] পাঠে স্থৈর্যের পরিচয় দাও। তাতে যেন তোমার ইচ্ছা ও চিন্তা নিয়োজিত থাকে। তোমার অধীনস্থ ও সহচরদের মধ্য থেকে এ ব্যাপারে একটি জামাত গঠন কর এবং তার রীতিনীতি প্রতিপালন কর। কারণ নামাজ যেমন প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেছেন, কুকথা ও কুকাজ থেকে বিরত রাখে।[২১৪]

অতঃপর এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রবর্তিত প্রথার অনুসরণ করে, তাঁর পূত চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এবং তাঁর পরবর্তী পুণ্যাত্মা পূর্বসূরিদের আদর্শ মেনে পালন করবে। যদি তোমার সম্মুখে কোনো সমস্যা এসে উপস্থিত হয়, তা হলে ধর্মভীরুতার সূত্র ধরে তার কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচনা করবে এবং তজ্জন্য প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে আদেশ-নিষেধ বৈধ-অবৈধ প্রভৃতির যে নির্দেশ দিয়েছেন ও তার পরিপূরক হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যে সকল নির্দেশাদি বর্তমান রয়েছে, তাকে অবশ্যই মানবে। এর পর এ সম্পর্কে প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করবে এবং তোমার নিজের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ও মানুষের ঘনিষ্ঠতা-অঘনিষ্ঠতা কোনো কিছুই যেন তোমাকে ন্যায়ের পথ থেকে দূরে সরিয়ে না নেয়।

ধর্মশাস্ত্র ও শাস্ত্রবিদদিগকে এবং ধর্ম ও ধার্মিকদিগকে প্রাধান্য দিও। প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র গ্রন্থে এবং তার নির্দেশের অনুসারীদিগকে মান্য করো। কারণ মানুষের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সৎগুণ ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান, তার অনুসন্ধান, তৎসম্পর্কে উৎসাহ প্রদান এবং প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের পরিচয় অর্জন করা। কেননা তা সার্বিক কল্যাণের বার্তাবাহী, তার দিকে পরিচালনাকারী, তার নির্দেশকারী এবং সর্ববিধ পাপ ও অন্যায় থেকে নিবৃত্তকারী। এর সাথে প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র সহায়তা যুক্ত হলে মানুষ অধিকতরভাবে তাঁকে চিনতে, তাঁর মহিমা উপলব্ধি করতে এবং পারলৌকিক পরম মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে এ গুণ প্রকাশ পেলে তোমার দায়িত্বের প্রতি মানুষের সমীহের ভাব বৃদ্ধি পাবে তোমার শাসনকে ভয় করবে, তোমাকে ভালোবাসবে এবং তোমার ন্যায়-নিষ্ঠার উপর নির্ভর করবে।

সর্ববিষয়ে তোমাকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। এর ন্যায় অধিকতর উপকারী, অধিকতর নিরাপদ ও অধিকতর গৌরবজনক পন্থা অন্য কিছু নেই। কেননা মধ্যপন্থা

---

২১৩. অজু-হস্তমুখাদি প্রক্ষালন; রুকু—হাঁটুর উপর হাত রেখে নত হওয়া; সেজদা—হাঁটু ও হাতের উপর ভর রেখে মাটিতে মাথা ঠেকানো; দরুদ—হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর উপর শান্তি বাণী পাঠ।

২১৪. কোরান, ২৯, ৪৫।

www.amarboi.org

সৎপথ প্রদর্শন করে, সৎপথ দৈবী সহায়তার প্রতীক এবং এ সহায়তা সৌভাগ্যের দিকে আকর্ষণ করে। বস্তুত মধ্যপন্থার দ্বারাই ধর্ম ও সদাচারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাকে তোমার ইহলৌকিক সর্বকাজে গ্রহণ কর।

পারলৌকিক কল্যাণ, পুণ্য, সৎকাজ, সদাচার, সৎজ্ঞান ও তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে উদাসীন হইও না। যদি প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর বান্ধবদিগের সাহচর্য তোমার কাম্য হয়, তা হলে প্রচুর পুণ্য এবং তার সংগ্রহ তৎপরতায় ব্যাপৃত হইও। মনে রেখো, পার্থিব ব্যাপারে মধ্যপন্থা সম্মানের সৃষ্টি করে ও পাপ লাঘব করে। এটা অপেক্ষা কোনো ব্যক্তির উপদেশে তুমি নিজকে তোমার অধিকতর আয়ত্তে রাখতে এবং তোমার কর্তব্যাবলিকে অধিকতর সুসংহত করতে পারবে না। সুতরাং তাকে গ্রহণ কর, তার দ্বারা পরিচালিত হও; তা হলে তোমার দায়িত্ব পালন সার্থক হবে, তোমার ক্ষমতা বাড়বে এবং তোমার সাধারণ ও বিশেষ সহচররা সুসমন্বিত হয়ে উঠবে। প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র প্রতি তোমার ধারণাকে সুন্দর কর; তোমার প্রজাপালন স্থায়ী হবে এবং সর্ববিধ কাজে তাঁর সহায়তা কামনা কর; তোমার সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হয়ে উঠবে।

কোনো ব্যক্তিকে কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত করলে তার বিষয়টি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি কুধারণা পোষণ করো না। কারণ নির্দোষী ব্যক্তির প্রতি কুধারণা পোষণ ত সন্দেহ করা পাপ এবং এ পাপ সন্দেহকারীর উপর বর্তায়। তোমার সহচরদের প্রতি সুধারণা পোষণ করাকে তোমার বৈশিষ্ট্য করো এবং তাদের সম্পর্কে সর্বপ্রকার কুধারণা দূর করে তাদেরকে মুক্তি দিও। এতে তোমার প্রতি তাদের আনুগত্য ও সাধনায় আন্তরিকতা দেখা দিবে। আল্লাহ্‌র শত্রু শয়তান শ্রেণীর লোককে তোমার ভরসাস্থল করো না। কেননা তারা তোমার অতি অল্প শ্রান্তি অপনোদন করবে এবং তাদের প্রতি কুধারণা পোষণের দুশ্চিন্তা তোমার মনে ঢুকিয়ে দেবে। এর ফলে তোমার জীবনের আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। জেনে রাখ তুমি সুধারণা পোষণ করেই কেবলমাত্র শক্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পার এবং তার সাহায্যেই তোমার পছন্দনীয় কর্তব্যকে যথেষ্ট সুন্দরভাবে পালন করতে পার। তা তোমার দিকে মানুষকে আকর্ষণ করবে এবং তোমার সকল কাজে দৃঢ়তা আনয়ন করবে। সুতরাং তোমার সহচরদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে এবং তোমার প্রজাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে কোনো কিছুই যেন তোমার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। অন্যদিকে এ দুটি গুণ যেন সমস্যার সমাধান ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তোমাকে শিথিল না করে। তুমি সর্বদা সহচরদের কর্তব্যে, প্রজাদের আচরণে ও তাদের প্রয়োজনে দৃষ্টি রাখবে এবং তাদের যাতে সহায়তা হয় তা বিচার করবে। এটা অপেক্ষা সহজ পথ অন্য কিছু নেই। এটা ধর্মের পরিপোষক ও কর্মের উজ্জীবক।

এ সমুদয় ব্যাপারে তোমার ইচ্ছাকে আন্তরিক করবে। তোমার প্রবৃত্তিকে এমন এককভাবে দৃঢ় করবে, যাতে তুমি জান যে, তোমার কৃতকার্যের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তোমার সদাচারের জন্য পুরস্কৃত হবে এবং তোমার অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেয়া হবে। কারণ প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ ধর্মকে আশ্রয় ও শক্তি হিসাবে নির্ধারিত করেছেন এবং যে তাকে অনুসরণ ও তার দ্বারা শক্তি গ্রহণ করে, তাকে উন্নীত করেছেন।

www.amarboi.org

তোমার অধীনস্থ ও শাসিত মানুষের সাথে ধর্মীয় ধারা ও তার ন্যায়ানুগ পন্থায় ব্যবহার কর। অন্যায়কারীদের মধ্যে তাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ কর। এতে বিলম্ব করো না, ক্লান্ত হইও না এবং অন্যায়ের যোগ্য প্রতিবিধান করতে দ্বিধান্বিত হইও না। কারণ এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন তোমার প্রতি মানুষের সদিচ্ছাকে নষ্ট করবে। বরং তোমার এতদসম্পর্কীয় দায়িত্ব পালনে সুপরিচিত পন্থায় দৃঢ়চিত্ত হও এবং অভিনব ও সন্দেহজনক পন্থা পরিহার কর। এতে তোমার ধর্ম রক্ষা পাবে এবং তোমার পৌরুষ পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

কোনো অঙ্গীকার করলে পূর্ণ কর এবং কোনো কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিপালন কর। সদাচার গ্রহণ কর এবং তা দিয়ে প্রতিরোধ কর। তোমার প্রজাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যথাসম্ভব না দেখতে চেষ্টা করো। মিথ্যা ও অসত্যের দ্বারা তোমার জিহ্বাকে কলুষিত করো না। নিন্দুককে প্রশ্রয় দিও না। কেননা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যে কোনো ব্যাপারেই হোক না কেন, তোমার প্রথম বিচ্যুতি আসবে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দান ও তাকে শক্তিশালী করে তোলায়। কারণ মিথ্যায় পাপের আরম্ভ এবং দোষারোপ ও নিন্দায় তার পরিসমাপ্তি। কেননা নিন্দুক তার বন্ধুকেও রেহাই দেয় না। সুতরাং তার বক্তব্যে কারো উপকার ও কার্যসিদ্ধি হয় না। তুমি কল্যাণ ও সত্যের অনুসারীদিগকে গ্রহণ কর এবং সত্যপ্রিয় সম্ভ্রান্তদের মর্যাদা বাড়াও এবং দুর্বলদের সহায়তা কর। রক্তসম্পর্কের মর্যাদা দিও এবং তার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর মহিমার সম্মান বাড়িও। এটা যেন তোমার পুণ্য বৃদ্ধি ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধন করে। অন্যায় প্রবৃত্তি ও অবিচার থেকে দূরে থেকো। তা যেন তোমার মতামতকে বিচলিত না করে। তোমার প্রজাদের কাছে তোমাকে তা থেকে মুক্ত বলে প্রকাশ কর। তাদের শাসনব্যবস্থাকে ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা সৌভাগ্য করে তোল এবং তাদের মধ্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠা কর। তাদের সম্মুখে সেই জ্ঞান তুলে ধর, যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ক্রোধের সময় আত্মহারা হইও না; তোমার উপর ধৈর্য ও গাম্ভীর্যকে প্রভাবশালী হতে দাও। সাবধান, কোনো কাজে উন্নাসিকতা, হঠকারিতা ও অহংকার দেখিও না।

সাবধান, কখনো এ কথা বলো না যে, আমি ক্ষমতাপ্রাপ্ত, যা ইচ্ছে করতে পারি। এতে মতামতের ত্রুটি দেখা দেয় এবং প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শৈথিল্য প্রকাশ পায়। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমার ইচ্ছে ও তাঁর প্রতি তোমার বিশ্বাসকে আন্তরিক কর। মনে রেখো, রাজ্য একমাত্র পবিত্র ও মহান আল্লাহ্র; তিনি যাকে ইচ্ছে দান করেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছে হয়, ছিনিয়ে নেন[২১৫] শাসনব্যবস্থা যারা তাঁর অনুগ্রহকে উপলব্ধি করে না, তাদের নিকট থেকে সৌভাগ্য ছিনিয়ে নিতে এবং তাদের উপর দুর্ভাগ্য আপতিত করতে তাঁর তুল্য তৎপর আর কাউকেও পাবে না। সাম্রাজ্যশক্তির ব্যাপকতায় যারা আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করে এবং যারা সেই প্রবল পরাক্রান্ত প্রভুর বদান্যতায় নিজেদেরকে অতিমানব মনে করে, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেন না।

---

২১৫. তুল, কোরান, ৩, ২৬।

www.amarboi.org

তোমার প্রবৃত্তির লালসা ত্যাগ করো। তোমার সঞ্চয় ও পুঁজি, যা তুমি জমা করার চেষ্টা করবে, তা যেন পুণ্য ও ধার্মিকতা হয়। তাতে যেন প্রজাদের কল্যাণ কামনা, তাদের আঞ্চলিক সমৃদ্ধি, তাদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধান, তাদের জীবনের নিরাপত্তা এবং উৎপীড়িতের প্রতি সহায়তা বিদ্যমান থাকে।

জেনে নাও, সম্পদ যখন সঞ্চিত ও ভাণ্ডারে সুরক্ষিত হয়ে পড়ে, তখন আর তা বাড়ে না। কিন্তু তা যদি প্রজাদের কল্যাণে, তাদের প্রাপ্যাদি প্রদানে ও তাদের দুঃখ দূরীকরণে নিয়োজিত হয়, তা হলে বাড়ে, পবিত্র হয় এবং তার দ্বারা সাধারণের অবস্থার সংস্কার হয়, বিভিন্ন অঞ্চলের সমৃদ্ধি আসে, সময় সুখের হয় উপকার ও সম্মানের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। সুতরাং তোমার ভাণ্ডারের পুঁজি যেন ইসলামের সমৃদ্ধি ও তার অনুসারীদের জন্য সম্পদ বণ্টন হয়। তা থেকে তুমি আমীরুল মোমেনীনের বন্ধু-বান্ধবকে যথেষ্ট পরিমাণে দাও এবং তাদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান কর। যাতে তাদের বিষয়াদি ও জীবিকা সচ্ছল হয়, তজ্জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তুমি যদি এটা করতে পার, তা হলে তোমার সৌভাগ্য স্থায়ী হবে এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আরো অধিক দাবি করতে পারবে। তুমি এর দ্বারা প্রজাদের রাজকোষ ও রাজস্বের উপর আরো অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। সুতরাং সকলেই যখন তোমার ন্যায়নিষ্ঠা ও বদান্যতার কথা বুঝতে পারবে, তখন তোমার প্রতি আনুগত্য আরো দৃঢ় হবে।

আমি যে সকল বিষয় তোমার মধ্যে দেখতে ইচ্ছে করেছি, তা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ কর এবং এ ব্যাপারে যা কিছু উজ্জ্বল করে তুলেছি, তার জন্য নিজকে প্রস্তুত কর। তাতে যেন তোমার অধিকার ব্যাপক হয়। সম্পদেরও ঐ অংশটুকুই অবশিষ্ট থাকবে, যা আল্লাহ্‌র পথে, তাঁর সত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হয়েছে। যারা কৃতজ্ঞ, তাদের প্রতিদান সম্পর্কে অবহিত হও এবং তাদের নিমিত্ত তা প্রতিষ্ঠা কর। সাবধান, পার্থিব জীবন ও তার প্রলোভন যেন তোমাকে পরকালের ভয়াবহতা সম্পর্কে উদাসীন করে না তোলে। তা হলে তৎকালে তোমার উপর আরোপিত দাবিকে তুমি তুচ্ছ বলে ভাববে। বস্তুত এরূপ তুচ্ছভাব শৈথিল্যের জন্ম দেয় এবং শৈথিল্য ধ্বংস ডেকে আনে। তোমার কর্তব্য যেন প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। তুমি তাঁর নিকট পুণ্যের প্রত্যাশী হও। কেননা পবিত্র আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণভাবে দান করেছেন। তুমি কৃতজ্ঞতার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তার উপর নির্ভরশীল হও। আল্লাহ্ তোমাকে আরো অধিক কল্যাণ ও অনুগ্রহ প্রদান করবেন। বস্তুত প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের কৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহকারীদের অনুগ্রহ অনুপাতে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

পাপকে তুচ্ছ মনে করো না, হিংসুকের সহায় হইও না, অন্যায়কারীকে দয়া দেখিও না, অকৃতজ্ঞকে আপন করো না, শত্রুকে তোষামোদ করো না, নিন্দুককে বিশ্বাস করো না, প্রতারককে প্রশ্রয় দিও না, ব্যভিচারীকে বন্ধু বানিও না, নির্বোধকে অনুসরণ করো না, কপটকে প্রশংসা করো না, মানুষকে হেয় ভাবিও না, নিঃস্ব প্রত্যর্থীকে বিমুখ করো না, মিথ্যাকে ভাল বলো না, রহস্যপ্রিয়কে গণ্য করো না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না, অহংকার দেখিও না, ক্রোধ প্রকাশ করো না, আশা ভঙ্গ করো না, গর্বসহকারে পথ চলো

www.amarboi.org

না, অজ্ঞানকে সংশোধন করতে যেও না, পরকাল অন্বেষণে ত্রুটি করো না, ছিদ্রান্বেষণে দৃষ্টি দিও না, অত্যাচারীকে ভয়ে বা ভাবনায় ত্যাগ করো না এবং পরকালের পুণ্য পার্থিব জীবনে চেও না।

শাস্ত্রবিদদের সাথে অধিকতর পরামর্শ করো; তোমার প্রবৃত্তিকে ধৈর্যের সাথে সক্রিয় করো; অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করো; তোমার পরামর্শ সভায় অমিতব্যায়ী ও কৃপণকে প্রবেশ করতে দিও না। এবং তাদের কোনো কথা শুনিও না। কারণ তাদের উপকার অপেক্ষা অপকার বেশি। প্রজাদের সম্পর্কে গৃহীত তোমার যেকোনো কর্মতৎপরতা কার্পণ্যের দ্বারা যত দ্রুত বিনষ্ট হতে পারে, অন্য কোনো কিছুর দ্বারাই তত নয়। মনে রেখো, তোমার মধ্যে লোভ দেখা দিলে তুমি বেশি গ্রহণ এবং অল্প ত্যাগ করবে। এরূপ অবস্থা হলে তোমার কার্যাবলির অতি অল্প অংশই তুমি সমাধা করতে পারবে। কারণ প্রজারা একমাত্র তোমার স্বভাব তথা তাদের সম্পদ সম্পর্কে নির্লোভ ও তাদেরকে উৎপীড়নে সংযত দেখেই তোমাকে ভালোবাসবে। তোমার বন্ধুদের মধ্যে যে আন্তরিকতার সাথে অগ্রসর হয়, তাকে অন্তরঙ্গ হিসাবে গ্রহণ কর এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনে ও তার যোগ্য প্রাপ্যাদি প্রদানে তাকে প্রীত কর। অর্থ লোভকে প্রাধান্য দিও না। কারণ, এটা জেনে রেখো, মানুষ সর্বপ্রথম এর প্রলোভনেই তার প্রভুর নির্দেশ অমান্য করে। নির্দেশ অমান্যকারী অসম্মানিত হয়। এটাই প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ—যে সকল ব্যক্তি তাদের প্রবৃত্তির লালসা থেকে বাঁচতে পারে, বস্তুত তারাই সফলকাম হয়। সত্যের পথে তোমার দানধ্যানের মাত্রাকে সহজ কর। তোমার লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মধ্যে যেন মুসলমানদের জন্য ন্যায় অংশও প্রাপ্য থাকে। বিশ্বাস কর, যথার্থই দানশীলতা মানুষের সকল তৎপরতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাকে তোমার চরিত্রের অন্তর্গত করে নাও এবং আদর্শ ও কর্মে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাক।

সৈন্যদলের নথিপত্র ও তাদের লিখনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর, তাদের প্রাপ্যাদি যথাসময়ে প্রদান কর এবং তাদের জীবন-যাপনকে সচ্ছল করে তোল। প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ এটা দ্বারা তাদের অভাব দূর করবেন এবং তাদের তৎপরতাকে তোমার জন্য শক্তিপ্রদ করে দিবেন। এতে তাদের মধ্যে তোমার প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে এবং তোমার নির্দেশ পালনে তারা অকুণ্ঠচিত্তে এগিয়ে আসবে। সম্রাট তার সৈন্যদল ও প্রজাদের উপর ন্যায়বিচারে, প্রাপ্যাদি প্রদানে, সুবিবেচনায়, বদান্যতায়, অনুগ্রহে, পুণ্য কামনায় ও সচ্ছলতা আনয়নে যে পরিমাণ দয়া প্রদর্শন করেন, তাঁর সৌভাগ্যও সেই পরিমাণে বাস্তব হয়ে ওঠে। অতএব দুই বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে যে কোনো একটির শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করে তাকেই অনুসরণ কর। তাকেই তোমার কর্তব্য পালনের সূত্র করে নাও। মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অবশ্যই তুমি মোক্ষ, কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করবে।

জেনে রাখ, মহান আল্লাহ্‌র নিকট বিচার এমন একটি বিষয়, যার উপরে আর কিছু হতে পারে না। কেননা তা যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র সেই তুলাদণ্ড, যা পৃথিবীর মানুষের অবস্থা যাচাই করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে। এ জন্য বিচার ও কর্তব্যকর্মে ন্যায়পরায়ণতাকে অবলম্বন করলে প্রজাদের অবস্থা সংশোধিত হয়, পথঘাট নিরাপদ

www.amarboi.org

হয়, নির্যাতিতের প্রতিবিধান হয়, মানুষের যথার্থ প্রাপ্য লাভ হয়, জীবন-যাপন সুখের হয়, আনুগত্যের যথার্থতা পালিত হয়, আল্লাহ্র নিকট থেকে শান্তি ও স্বস্তির আগমন হয়, ধর্মের সুসার হয় এবং ধর্মীয় বিধান ও প্রথা তাদের যথাস্থানে প্রবর্তিত হয়। সুতরাং প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র বিষয়ে দৃঢ় হও, ছিদ্রান্বেষণ থেকে দূরে অবস্থান কর এবং যথাযথ শাস্তি প্রদানের জন্য তৎপর থাক। তাড়াতাড়ি করো না এবং ধমক ও তাচ্ছিল্য দেখিও না। শপথে সন্তুষ্ট হও, তোমার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাও, তোমার যথার্থতা সম্পর্কে সতর্ক হও, তোমার বক্তব্যে আন্তরিকতা দেখাও এবং পক্ষগুলোর প্রতি সদয় হও। সন্দেহ দেখা দিলে অপেক্ষা কর এবং প্রমাণের ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ে যাও। তোমার প্রজাদের মধ্যে কারো সম্পর্কে যেন কোনো প্রকার সংস্কার, সুধারণা ও কোনো নিন্দুকের নিন্দা তোমাকে বিচলিত করতে না পারে। ধীর হও, সময় নাও, বিশ্লেষণ কর, দৃষ্টি দাও, চিন্তা কর, চেষ্টা কর ও বিবেচনা কর। তোমার প্রতিপালকের জন্য বিনীত হও এবং সকল প্রজার প্রতি সমদৃষ্টি রাখ। সত্যকে তোমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দাও। রক্তপাত করতে তাড়াতাড়ি করো না। কারণ প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র নিকট রক্তের মূল্য বড় বেশি। সুতরাং যথার্থ কারণ ব্যতীত রক্তপাত করো না।

যে রাজস্ব থেকে প্রজাদের অবস্থা সুদৃঢ় হয়, তৎপ্রতি লক্ষ রেখো। আল্লাহ্ একে ইসলামের জন্য সম্মান ও সমুন্নতি, মুসলমানদের জন্য সচ্ছলতা ও প্রতিরোধ, ইসলাম বিরোধীদের জন্য হেয়তা ও ক্রোধ এবং বিধর্মীদের জন্য পরিণামে নীচতা ও অপমান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং রাজস্ব আদায়কারীদের প্রতি তা সত্য, ন্যায়, সমতা ও সর্বজনীনতার মধ্য দিয়ে আরোপ কর। কোনো সম্ভ্রান্তের সম্ভ্রম ও কোনো ধনাঢ্যের ধন যেন এ ব্যাপারে তোমার হস্তকে সংকুচিত না করে। তোমার কোনো লেখক, কোনো পারিষদ ও সভাসদ যেন তা থেকে অব্যাহতি না পায়। সম্ভাব্যসীমার অতিরিক্ত কারো নিকট থেকে গ্রহণ করো না। এ ব্যাপারে তোমার নীতি যেন বিভিন্ন না হয়। সকল মানুষকেই একই সত্যের নীতিতে উদ্বুদ্ধ কর। কারণ একমাত্র এটাই তাদের সম্প্রীতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। সাধারণ মানুষের প্রীতিকে অবলম্বন কর।

মনে রেখো, তুমি তোমার শাসক পদের মাধ্যমে ভাণ্ডারি, রক্ষাকারী ও প্রহরী নিযুক্ত হয়েছ। তোমার শাসনাধীন লোকদেরকে এজন্যই 'রায়ত' (প্রহরাধীন) বলা হয়, কেননা তুমি তাদের প্রহরী এবং তাদের নিয়ামক। সুতরাং তাদের নিকট থেকে স্বেচ্ছাদত্ত সমৃদ্ধি অনুসারে গ্রহণ কর এবং তাদের প্রতিষ্ঠা, কল্যাণ ও প্রয়োজন পূরণে ব্যয় কর। তাদের উপর এমন ব্যক্তিকে কর্মচারী নিয়োগ কর, যার দূরদর্শিতা, কর্মক্ষমতা, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানে গভীরতা, শাসনে ন্যায়নিষ্ঠা ও সততা বিদ্যমান। তাদের আহার্যের সচ্ছলতা বিধান কর। কেননা এটা সেই অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্গত যার দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত হয়েছে ও তুমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছ। সুতরাং এ ব্যাপারে যেন কোনো চিন্তা তোমাকে ব্যতিব্যস্ত না করে এবং কোনো বাধা তোমাকে বিরত না রাখে। তুমি যখনই তাকে প্রাধান্য দিবে এবং তৎসম্পর্কে তোমার যা করণীয়, তা করবে, তখনই তোমার প্রভুর নিকট থেকে অধিকতর সৌভাগ্যের প্রত্যাশী হতে পারবে। তোমার কর্মে নতুন সম্ভাবনা দেখা দেবে, তোমার প্রজাদের অধিকতর প্রীতি আকর্ষণ করবে এবং কল্যাণের

www.amarboi.org

দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে। তোমার অঞ্চলে সচ্ছলতা আসবে, তোমার এলাকায় সমৃদ্ধি দেখা দেবে, তোমার শাসন স্থলে প্রাচুর্য প্রকাশ পাবে, তোমার রাজস্ব বেড়ে যাবে এবং তোমার সম্পদ পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। তুমি এর দ্বারা তোমার সৈন্যদলকে সন্তুষ্ট করতে পারবে এবং তোমার তরফ থেকে দানধ্যানাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সুখী করতে সক্ষম হবে। তুমি এ ব্যাপারে তোমার শত্রুর নিকটও সুশাসক ও ন্যায়নিষ্ঠ বলে পরিগণিত হবে। তোমার সকল কর্তব্যকর্মে তুমি ন্যায়, অস্ত্র, শক্তি ও প্রস্তুতির অধিকারী হবে। সুতরাং এ বিষয়েই তুমি প্রচেষ্টায় নিরত হও এবং তার উপর কোনো বিষয়কে অগ্রাধিকার দিও না। মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পরিণামে তুমি প্রশংসার অধিকারী হতে পারবে।

তোমার অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগে এমন একজন বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ কর, যে তোমাকে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারীর সংবাদ জানাতে পারে। সে তাদের চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে তোমাকে লিখে জানাবে, এর ফলে, বলতে গেলে, তুমি প্রতিটি কর্মচারীর সাথে তার সকল ব্যাপার দেখে বেড়াবার মতো ক্ষমতা লাভ করবে। তুমি যদি তাদেরকে কোনো নির্দেশ প্রদান করতে চাও, তা হলে তার পরিণামফল চিন্তা করে দেখ। যদি তার ফলে শান্তি ও স্বস্তিই লভ্য বলে মনে কর এবং তা দিয়ে কোনো শুভ তৎপরতা ও প্রতিরোধ গড়ে উঠবে বলে আশা কর, তা হলে তা প্রদান কর। অন্যথায় তা স্থগিত রাখ এবং দূরদর্শী ও জ্ঞানীদের সাথে তা নিয়ে আলোচনা কর। অতঃপর এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কেননা অনেক সময় অনেক ব্যক্তি এমন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যা তার ক্ষণিকের খেয়াল মাত্র। তা তাকে বিচলিত করে ও উত্তম বলে মনে হয়। কিন্তু তার পরিণামের দিকে সে যদি লক্ষ না করে, তা হলে তা তাকে ধ্বংস করে ফেলে এবং দায়িত্বজ্ঞানের ত্রুটি প্রকাশ পায়। সুতরাং তুমি যা কিছু করতে ইচ্ছে কর, তৎসম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নাও এবং পরে প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে তাতে শক্তি প্রয়োগ কর। তোমার সর্ববিধ কাজে কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচনা করার শক্তি তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর।

প্রতিদিনের কাজ সেই দিনেই সমাধা করো; আগামী দিনের জন্য তুলে রেখো না। তার সাথে নিজকে ব্যাপৃত রাখ। কারণ আগামীকাল এমন অনেক বিষয় ও ঘটনা নিয়ে আসবে, যা তোমাকে আজকার বিলম্বিত কাজ করার সময়ই দেবে না। মনে রেখো, যে দিন যায়, তা তার সমস্ত সুযোগ নিয়েই অন্তর্হিত হয়। সুতরাং তুমি যদি তার কর্তব্যকে বিলম্বিত কর, তা হলে তোমার নিকট দুই দিনের কাজ জমা হয়ে উঠবে এবং তা তোমাকে এমনভাবে ব্যাপৃত রাখবে যে, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। সুতরাং প্রতিদিনের কাজ যদি যথাসময়ে সম্পন্ন করতে পার তা হলে তুমি তোমার দেহ ও মনকে বিশ্রাম দিতে পারবে এবং তোমার শাসনব্যবস্থা কাজকেও সুসংহত করতে সক্ষম হবে।

মানুষের মধ্যে স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত এমন ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের কর, যাদের আন্তরিকতাকে তুমি পরীক্ষা করেছ, তোমার প্রতি যাদের আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, যারা সদুপদেশ দেয় এবং তোমার দায়িত্বকে সংরক্ষণ করে। অতঃপর তাদেরকে অন্তরঙ্গ কর এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। এমন সকল সম্ভ্রান্ত পরিবার অনুসন্ধান কর, যারা

www.amarboi.org

বর্তমানে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; অতঃপর তাদের দুর্দশার ভার লাঘব কর এবং তাদের অবস্থার পরিবর্তন কর, যাতে তারা তাদের অন্তঃকরণে কোনোপ্রকার ঘৃণা পোষণ করতে না পারে। গরিব ও অসহায়দের জন্য নিজের একটা সময় ব্যয় কর। যারা অত্যাচারের কথা তোমাকে জানাতে পারে না, যারা নিজেদের অধিকারের দাবি উত্থাপন করতে জানে না, সেইসকল ক্ষুদ্র-তুচ্ছদের গোপন বেদনা জানতে চেষ্টা কর। তোমার কর্মচারীদের মধ্যে কল্যাণধর্মীদেরকে এরূপ লোকের অভাব ও প্রয়োজনের কথা তোমাকে জানাতে বল এবং তাদের দুরবস্থার প্রতিবিধান করতে দায়িত্ব নাও। লক্ষ রাখ, যেন যথার্থভাবে তাদের আল্লাহ্‌দত্ত প্রাপ্য তারা পায়। দুর্দশাগ্রস্ত অনাথ ও বিধবাদের খোঁজখবর নাও এবং আমীরুল মোমেনীনের অনুসরণ করে 'বয়তুল মাল' থেকে তাদের খোরাকীর ব্যবস্থা কর। মহান আল্লাহ্ তাঁকে যেভাবে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে ও আত্মীয়তুল্য ব্যবহার করতে শক্তি প্রদান করেছেন, তুমিও সেরূপ কর। এর ফলে একদিকে যেমন তাদের অবস্থার সুসার হবে, অন্যদিকে তেমন আল্লাহ্ তদ্দরুন তোমাকে পুণ্য ও প্রাচুর্য প্রদান করবেন। দুঃখীদেরকে বয়তুল মাল থেকে পারিশ্রমিক দাও। তাদের মধ্যে যারা কোরান পাঠ করতে পারে, যারা তা কণ্ঠস্থ করেছে, তাদেরকে এ ব্যাপারে অন্যান্যের অপেক্ষা অগ্রাধিকার ও অধিক প্রদান কর। মুসলিম রোগাক্রান্তদের জন্য গৃহাদির ব্যবস্থা কর, যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারে এবং তাদের সেবাযত্নের জন্য লোক নিয়োগ কর। তাদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত করে তাদের ইচ্ছা সেই পরিমাণে পূরণ কর, যাতে বয়তুল মালে অপব্যয়ের পরিস্থিতি দেখা না দেয়।

জেনে রাখ, মানুষের প্রাপ্যাদি পরিশোধ করলে ও তাদের সর্বোত্তম ইচ্ছাদি পূরণ করলেও তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না, পরিতৃপ্তি লাভ করে না, যতক্ষণ না তাদের অভাবের কথা তারা শাসকের নিকট উপস্থিত করতে পারে। এর মাধ্যমে তারা আরো অধিক প্রাপ্য, আরো অধিক অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে থাকে। অনেক সময় এরূপ দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি মানুষের অনুরূপ আবেদন-নিবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। কারণ তার আধিক্য তার ধ্যান-জ্ঞান আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তার জন্য তাকে বিরক্তি ও কষ্ট পোহাতে হয়। কিন্তু এ ব্যক্তিকে এ কারণে সেই ব্যক্তির ন্যায় মনে হয় না, যে ন্যায়-নিষ্ঠ হয়ে পার্থিব জীবনের প্রতিটি কাজের যথার্থতা অনুধাবন করে, পরকালে তন্নিমিত্ত প্রাপ্য পুণ্যের গৌরবকে বুঝতে পারে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সহায়ক বিষয়কে স্বাধীনভাবে অনুসরণ করে এবং তাঁর নিকট তজ্জন্য করুণার প্রত্যাশা করতে সক্ষম হয়।

তোমার সমীপে প্রবেশ করতে মানুষকে বেশি মাত্রায় অনুমতি দাও এবং তাদেরকে দর্শন দান কর। তাদের বক্তব্য শুনতে তোমার মেজাজকে ঠাণ্ডা রাখ, তোমার নিজকে নমনীয় কর, তোমার মুখমণ্ডলকে সহাস্য রাখ, কথোপকথনে ও জিজ্ঞাসায় বিনয়ী হও এবং তাদের প্রতি তোমার অবারিত দান ও প্রতিদানের মহত্ত্ব প্রকাশ কর। যদি কাউকে কিছু দাও, তা হলে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে দাও। তাতে যেন একটি উত্তম কাজ করার ও তজ্জন্য প্রতিদান পাবার অনুভূতি থাকে এবং কোন প্রকার আবিলতা ও গঞ্জনার ভাব

www.amarboi.org

যেন তাকে আচ্ছন্ন না করে। এরূপ দান মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমার জন্য একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হবে।

তোমার পার্থিব জীবনে বর্তমান সকল সমস্যাকে পূর্ববর্তী শাসক, নেতা এবং অতীত যুগ ও জাতির অভিজ্ঞতার আলোকে বিবেচনা করে দেখো। অতঃপর তোমার সকল কর্তব্যকর্মে মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। তাঁর ভালোবাসাকে যেন বুঝতে পার, তাঁর বিধান ও প্রথাকে যেন পালন করতে পার এবং তাঁর ধর্ম ও গ্রন্থকে যেন প্রতিষ্ঠা দিতে পার—সেভাবে অগ্রসর হইও। প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র সান্নিধ্য থেকে যা কিছু তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে এবং তাঁর ক্রোধের উদ্রেক করে, তা পরিত্যাগ করো।

তোমার কর্মচারীরা যে সম্পদ সঞ্চয় করে, তার পরিচয় নিও এবং তারা যা ব্যয় করে, তাও দেখো। কখনো নিষিদ্ধের সঞ্চয় করো না এবং অপব্যায়ের দ্বারস্থ হইও না।

জ্ঞানীদের সাথে অধিকতর মেলামেশা করো, তাঁদের পরামর্শ চেয়ো এবং তাঁদের সাহচর্যে বসো। তোমার প্রবৃত্তি যেন সুপ্রথার অনুসরণ ও তার প্রতিষ্ঠা দানে তৎপর হয় এবং সচ্চরিত্রের অনুকরণ ও তার মহত্ত্বকে প্রাধান্য দেয়। তোমার সমীপে আগমনকারী ও অন্তরঙ্গতায় বিচরণকারী সেই সব ব্যক্তিকে সম্মান দেখিও, যারা কোনো ত্রুটি দেখে যেন তোমার ভয়ে তোমার নিকট গোপনে জানাতে বিরত না হয় এবং কোনো বিষয়ের অপূর্ণতা যেন তোমাকে বোঝাতে ইতস্তত না করে। বস্তুত এরূপ লোকই তোমার সর্বাপেক্ষা উত্তম বন্ধু ও সাহায্যকারী।

তোমার সম্মুখে যে সকল কর্মচারী ও লেখক বিদ্যমান, তাদের প্রতি লক্ষ রেখো। প্রতিদিন তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় করে দিও, যখন তারা লিখন, আদিষ্ট কাজ, কর্মচারীদের প্রয়োজন, সাম্রাজ্যের বিষয়াদি ও প্রজাদের সমস্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর তোমার সম্মুখে আনীত সমস্যাগুলো সম্পর্কে তোমার কান, চক্ষু, অনুভূতি ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত কর। বারবার দেখ ও বারবার চিন্তা কর। যা কিছু সত্যের ও সুচিন্তার অনুসারী, তার অনুমতি দাও এবং তাতে কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচনার জন্য প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র সাহায্য চাও। আর যা কিছু সত্যের বিরোধী, তার জন্য প্রার্থনাকে রোধ কর এবং তা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখ। তোমার কোনো প্রজা বা অন্য কারো প্রতি কোনো সদয় ব্যবহারের জন্য গঞ্জনা দিও না এবং প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা, দৃঢ়তা ও মুসলমানদের হিতার্থে সাহায্য ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করো না। এ উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কোনো সৎকাজ করতে যেও না।

তোমার প্রতি লিখিত আমার পত্রকে বুঝতে চেষ্টা কর, তার প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং তাকে কার্যকরী করে তোল। তোমার সকল কাজে আল্লাহ্র সাহায্য চেয়ো এবং কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচনার শক্তি প্রার্থনা করো। বস্তুত প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ কল্যাণ ও কল্যাণকামীদের সাথে অবস্থান করেন। সুতরাং তোমার শ্রেষ্ঠ চরিত্র ও উত্তম আকাঙ্ক্ষা যেন প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টিবিধান; তাঁর ধর্মের শৃঙ্খলা, তাঁর অনুসারীদের সম্মান ও নির্ভরতা এবং তোমার নিজ জাতি ও আশ্রিত জনগোষ্ঠীর প্রতি

www.amarboi.org

সুবিচার ও কল্যাণের বাহক হয়। আমি প্রবল ও মহান আল্লাহ্র নিকট তোমার জন্য উত্তম সাহায্য, সহায়তা, সৎপথ ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইতি—

ঐতিহাসিকরা বলেন, এ পত্রটি প্রকাশ পেলে ও তার বিষয়বস্তু প্রচারিত হলে মানুষ অবাক বনেছিল। সম্রাট মামুনের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে এবং তাঁর সমীপে তা পাঠ করা হলে তিনি বলেছিলেন, হে আবু তৈয়ব। অর্থাৎ তাহের এতে ত ইহকাল পরকালের যাবতীয় বিষয়, প্রচেষ্টা, দূরদর্শিতা, রাজনীতি, রাজকল্যাণ প্রজাদের অধিকার, শাসনব্যবস্থা প্রতিরক্ষা, খলিফার প্রতি আনুগত্য, খেলাফতের দৃঢ়তা প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সুন্দর ও মনোজ্ঞভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। অতঃপর সম্রাট মামুন এর অনুলিপি প্রস্তুত করে সকল দিকের কর্মচারীদের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন এবং তদনুযায়ী চলতে ও কাজ করতে নির্দেশ দিলেন। বস্তুত শাসন নীতি সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি, তন্মধ্যে এ অত্যন্ত সুন্দর। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা।

www.amarboi.org

ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[ফাতেমী সাম্রাজ্য, এ সম্পর্কে মানুষের মতামত এবং তার রহস্য উদ্‌ঘাটন]

পাঠক, জেনে রাখুন যুগ যুগ ধরে সমগ্র মুসলমান সমাজের মধ্যে এটা সুপরিচিত রয়েছে যে, পৃথিবীর শেষকালে নবীবংশ থেকে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যিনি ধর্মকে শক্তিশালী ও ন্যায়নীতিকে প্রকাশ করবেন। মুসলমানরা তাঁর অনুসরণ করবে এবং তিনি সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন। তাঁরই নাম আল-মেহেদী। দজ্জালের আত্মপ্রকাশ ও অন্যান্য যাবতীয় ঘটনা তাঁরই পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত হবে। এগুলো মহাপ্রলয়ের শর্ত হিসাবে বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। মেহেদীর পরে হজরত ঈসা অবতীর্ণ হয়ে দজ্জালকে হত্যা করবেন কিংবা তাঁর সাথে একত্রে উক্ত হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করবেন এবং তাঁর নামাজে মেহেদীকে ইমাম হিসাবে বরণ করে নিবেন।

মানুষ এ সকল বিষয়ের প্রমাণ হিসাবে এমন সকল হাদিস উপস্থিত করে, যা হাদিসবিদদের দ্বারা গৃহীত ও প্রকাশিত হলেও তাদের প্রামাণ্য অস্বীকারকারীর অভাব নেই এবং তারা কিছু সংখ্যক হাদিসের সাহায্যে এ মতামতের বিরোধিতা করে থাকে। পরবর্তীকালের সুফী মতাবলম্বীরা এ ফাতেমীর বিষয়ে ভিন্ন পথ ও অন্য প্রমাণ উপস্থিত করেন। অনেক সময় তাঁরা এ ব্যাপারে দিব্যজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করেন। বস্তুত এটাই তাঁদের সাধন মার্গের ভিত্তি।

আমরা এখন এ প্রসঙ্গে প্রামাণ্য হাদিসসমূহের উল্লেখ করব এবং তা অস্বীকারকারীদের সমালোচনা ও তার প্রামাণ্য ভিত্তি বর্ণনা করব। এর পর সুফীপন্থীদের বক্তব্য ও মতামত উদ্ধৃত করব। পাঠক, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এ বিষয়টি আপনার নিকট পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, হাদিসশাস্ত্রবিদদের একটি দল[২১৬] মেহেদী সম্পর্কীয় বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে তিরমিজী আবু দাউদ, বাজ্জাজ, ইবনে মাজা, হাকেম, তিবরানী, আবু ইয়ালা আল-মোশেলী প্রমুখ দ্যিমান। তারা একদল[২১৭] সাহাবীর

---

২১৬. তিরমিজী—২৫ পৃষ্ঠার ৬৬ নং টীকা দ্র:। আবু দাউদ—সুলায়মান ইবনে আশআস; ২০২-৭৫ (৮১৮-৮৯ খ্রি:)। রাজ্জাজ—আহমদ ইবনে আমর; মৃত্যু ২৯২ (৯০৫ খ্রি:) হি:। ইবনে মাজা-মুহম্মদ ইবনে ইয়াজিদ; ২০৯-৭০ (৮২৫-৮৭ খ্রি:) হি:। হাকেম—১১১ পৃষ্ঠা ১০৫ টীকা দ্র:। তিরবানী—সুলায়মান ইবনে আহমদ; ২৬০-৩৬০ (৮৭৩-৯৭১ খ্রি:) হি:)। আবু ইয়ালা আল মোশেলী—আহমদ ইবনে আলী; মৃত্যু ৩০৭ (৯২০ খ্রি:) হি.।

২১৭. ইবনে মাসউদ—আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ। আবু সাইদ খুদরী—সাদ ইবনে মালিক; মৃত্যু ৬৩-৬৫ (৬৮২-৮৫ খ্রি:) হি:। উম্মে হাবিবা—হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর স্ত্রী। উম্মে সলমা—হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর স্ত্রী। সউবান—সউবান ইবনে বজদুদ; মৃত্যু ৫৪ (৬৪৪ খ্রি:) হি:। কুর্রা ইবনে ইয়াস—মৃত্যু ৬৪ (৬৮৪ খ্রি:) হি.। আলী হেলালী—অজ্ঞাত (?)। আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারেস—ইবনে জজ—মৃত্যু ৮৫-৮৮ (৭০৪-৭০৭ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

প্রতি এ সকল হাদিসের সূত্র নির্দেশ করেছেন; যেমন আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, তালহা, ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আনাস, আবুসাইদ খুদরী, উম্মে হাবিবা, উম্মে সলমা, সউবান, কুর্রা ইবনে ইয়াস, আলী হেলালী ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারেস ইবনে জজ। তাঁদের প্রতি নির্দেশিত সূত্রাদিতে অনেক সময়েই আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব। অবশ্য হাদিসশাস্ত্রবিদদের নিকট এটা সুপরিচিত যে, হাদিস বিচারের ক্ষেত্রে গুণগ্রাহিতা অপেক্ষা সমালোচনাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং সূত্রটির কোনো কোনো ব্যাক্তির বিরুদ্ধে যদি উদাসীনতা, বিস্মৃতি, দুর্বলতা ও কুসংস্কারের আপত্তি উত্থাপিত হয়, তা হলে তা হাদিসটির বক্তব্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগায় এবং তাকে মূল্যহীন করে তোলে। পাঠক, এ কথা বলবেন না যে, অনেক সময় এরূপ সন্দেহ বিশুদ্ধ দুটি সংকলনের সূত্রেও পাওয়া যায়। কারণ উক্ত দুটি সংকলনের বিষয় অনুসরণ ও তা কার্যকরীকরণ সম্পর্কে জাতির সর্বসম্মত মত বিদ্যমান। বস্তুত সর্বসম্মতি সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় সহায়তা ও সকল প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করে থাকে। কিন্তু উক্ত দুটি বিশুদ্ধ সংকলন ভিন্ন অন্যগুলোর জন্য এরূপ সুযোগ নেই। এ কারণেই শাস্ত্রবিদদের বর্ণনা অনুসারে আমরা এ সকল সংকলনের সূত্রাদির সমালোচনা করতে সক্ষম।

সুহায়লীর[২১৮] বর্ণনা অনুসারে আবুবকর ইবনে আবু খায়সামা[২১৯] তাঁর সংকলনে মেহেদী সম্পর্কীয় হাদিস সংগ্রহে কিছুটা আতিশয্য প্রদর্শন করেছেন। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিরল সূত্র হল 'ফাওয়ায়েদুল আখবার' নামক গ্রন্থে আবুবকর ইস্কাফের[২২০] বর্ণনা। এটা তিনি মালেক ইবনে আনাসের পূর্বে মুহম্মদ ইবনে মুনকাদির[২২১] ও তার পূর্বে জাবের[২২২] থেকে গ্রহণ করেছেন। উক্ত হাদিসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, "যে মেহেদীর বিষয়টি মিথ্যা বলবে, সে ধর্মচ্যুত হবে এবং যে দজ্জালের বিষয়টি মিথ্যা বলবে, সে মিথ্যাবাদী হবে।" পশ্চিমদিক থেকে সূর্যোদয়ের ক্ষেত্রেও এরূপ বলেছেন। আমার যতদূর মনে হয় এবং পাঠক, আপনারও মনে হবে, এটা অতিরঞ্জিত। মালেক ইবনে আনাস থেকে এরূপ হাদিসের সূত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কারণ আবুবকর ইস্কাফ হাদিসশাস্ত্রবিদদের কাছে সন্দেহজনক মিথ্যা হাদিস রচক।

তিরমিজী ও আবু দাউদ ইবনে আব্বাসের প্রতি নির্দেশিত সূত্র দ্বারা যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তা আসেম ইবনে আবু নজুদের[২২৩] ধারায়, যিনি সপ্ত কোরান পাঠ শাস্ত্রবিদদের অন্যতম, যর ইবনে হুবায়েশের[২২৪] প্রতি নির্দেশিত হয়েছে। ইনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন, "পৃথিবীর আয়ুষ্কাল শেষ

---

২১৮. আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ্; ৫০৮-৫৮১ (১১১৫-১১৮৫ খ্রি:) হি:।

২১৯. আহমদ ইবনে জুহায়ের; ১৮৫-২৭৯ (৮০১-৯৩ খ্রি:) হি:।

২২০. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে মালিক; ২৬৩-৩৫২ (৮৭৭-৯৫৩ খ্রি:)। অন্য কেউ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।

২২১. জীবনকাল ৬০-১৩০ (৬৮০-৭৪৮ খ্রি:) হি:।

২২২. হয় জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্; মৃত্যু ৭৩ (৬৯৩ খ্রি:) হি: অথবা তাঁর সমসাময়িক জাবের ইবনে সামুরা।

২২৩. মৃত্যু ১২৭-২৮ (৭৪৪-৪৬ খ্রি:) হি:; পিতার নাম বাহদালা।

২২৪. মৃত্যু ৮০-৮৩ (৬৯৯-৭০৩ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

হয়ে যদি একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তা হলেও আল্লাহ্ সেই দিনটিকে এত দীর্ঘ করবেন, যাতে তিনি এমন একজন লোককে প্রেরণ করতে পারেন, যে আমার অনুসারী কিংবা আমার বংশান্তর্গত হবে এবং যার নিজের নাম আমার নাম ও পিতার নাম আমার পিতার নামের অনুরূপ হবে।" এটা আবু দাউদের বর্ণনা এবং তিনি তার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। অবশ্য তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তিকায় বলেছেন যে, তাঁর সংকলনে যে হাদিস সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, তা ভালো। তিরমিজীর বর্ণনা হল, যতদিন না আরবের উপর আমার বংশান্তর্গত এমন একজন লোক আধিপত্য বিস্তার করবে, যার নাম আমার নামের ন্যায় হবে, ততদিন পৃথিবীর আয়ু শেষ হবে না। অন্য একটি বর্ণনায়, যতক্ষণ না আমার বংশান্তর্গত কোনো লোক আধিপত্য বিস্তার করবে এই উভয় বর্ণনায় হাদিসটি তিরমিজীর নিকট ভালো ও শুদ্ধ। তিরমিজী ও আবু দাউদ আবু হুরায়রা পর্যন্ত অপেক্ষিত অন্য একটি ধারায়ও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেন, সউরী, শুবা, যায়েদ[২২৫] ও অন্যান্য মুসলিম শাস্ত্রবিদগণ আসেম থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, আব্দুল্লাহ্ থেকে যর ও যর থেকে আসেম বর্ণিত সবগুলোর ধারাই শুদ্ধ। কারণ তিনি আসেম থেকে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। এবং তাঁকে মুসলিম ধর্মশাস্ত্রবিদদের অন্যতম বলে মনে করেন।

অবশ্য আসেম সম্পর্কে আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, তিনি ভালো লোক ছিলেন; কোরান পাঠ শাস্ত্রবিদ, সদাচারী ও নির্ভরশীল। কিন্তু আমাশ[২২৬] তাঁর অপেক্ষাও অধিকতর স্মৃতিধর। হাদিস বিচারের ক্ষেত্রে শুবা আমাশকে তাঁর উপর প্রাধান্য দিতেন। আজলী[২২৭] বলেন, আসেমের বর্ণনায় যর ও আবু ওয়ায়েল[২২৮] সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। এটা দ্বারা তিনি উক্ত দুইজন থেকে বর্ণিত বিষয়ের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মুহম্মদ ইবনে সাদ বলেন, তিনি নির্ভরশীল ছিলেন, যদিও তাঁর হাদিসে বহু ভুল বিদ্যমান। ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান[২২৯] বলেন, তাঁর হাদিসে অস্থিরতা রয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আবু হাতেম[২৩০] বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম যে, আবু যুরআ[২৩১] আসেমকে নির্ভরশীল বলে মনে করেন। উত্তরে তিনি বললেন,[২৩২] তার মর্যাদা তদ্রূপ নয়। তার সম্পর্কে ইবনে উলাইয়া[২৩৩] সমালোচনা করে বলেছেন, আসেম নামীয় সকল ব্যক্তিই বিস্মৃতিপরায়ণ। আবু হাতেম বলেন, তার মর্যাদা আমার নিকট সত্য ও ভালো হাদিস বর্ণনাকারী হিসাবে গ্রহণযোগ্য হলেও তিনি তার জন্য প্রয়োজনীয়

২২৫. সউরী-সুফিয়ান ইবনে সাইদ; মৃত্যু ১৬১ (৭৭৮ খ্রি:) হি:। শুবা ইবনে হাজ্জাজ, মৃত্যু ১৬০ (৭৭৭ খ্রি:) হি:। যায়েদা ইবনে কুদামা; মৃত্যু ১৬০—৬৩ (৭৭৭-৮৩ খ্রি:) হি:।

২২৬. সুলায়মান ইবনে মেহরান; মৃত্যু ১৪৭/৪৮ (৭৬৪/৬৫ খ্রি:) হি:।

২২৭. আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ; ১৮২-২৬০ (৭৯৯৮৭৪ খ্রি:) হি:।

২২৮. শকিক ইবনে সলিমা; (?)।

২২৯. মৃত্যু ২৭৭ (৮৯১ খ্রি:) হি:।

২৩০. জীবনকাল—২৪০-৩২৭ (৮৫৫-৯৩৯ খ্রি:) হি:।

২৩১. আবু হাতেম মুহম্মদ ইবনে ইদরিস আররাজী; মৃত্যু ২৭৭ (৮৯০ খ্রি:) হি:।

২৩২. উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল করিম; ২০০-২৬৪ (৮১৫-৮৭৪ খ্রি:) হি:।

২৩৩. ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম; ১১০-১১৩ (৭২৯-৮০৯ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে নেসারীর[২৩৪] মত বিচিত্র। ইবনে হেরাশ[২৩৫] বলেন, তার হাদিসে ত্রুটি আছে। আবুজাফর উকাইলী[২৩৬] বলেন, তার মধ্যে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ব্যতীত অন্য কোনো ত্রুটি ছিল না। দারু কুতনী[২৩৭] বলেন, তার স্মৃতির ব্যাপারে বক্তব্য আছে। ইয়াহিয়া বাত্তান[২৩৮] বলেন, আমি আসেম নামীয় প্রতিটি ব্যক্তিকেই দুর্বল স্মৃতির অধিকারী পেয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমি শুবাকে বলতে শুনেছি, আসেম ইবনে আবু নজুদ আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করতেন, অথচ মানুষ তার সম্পর্কে নানা কথা বলত। যাহাবী[২৩৯] বলেন, তিনি কোরান পাঠশাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য, কিন্তু হাদিসে তদ্রূপ নয়। তিনি সত্যবাদী, বুদ্ধিমান ও সুন্দর হাদিস বর্ণনাকারী।

যদি কেউ বলেন যে, তার নিকট থেকে বোখারী ও মুসলিম হাদিস বর্ণনা করেছেন, তা হলে তার উত্তর বলব, তারা অন্যের সাথে যুক্তভাবে তার হাদিস বর্ণনা করেছেন, এককভাবে নয় এবং আল্লাহ্ই সর্বোত্তম জ্ঞাতা।

মেহেদী সম্পর্কীয় অধ্যায়ে আবু দাউদ আলী (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। ফিতর ইবনে খলিফা[২৪০] কাসেম ইবনে আবু মুর্রা[২৪১] থেকে ও কাসেম আবু তুফায়েল[২৪২] থেকে এর বর্ণনা দিয়েছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, যদি সময়ের একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তথাপি আল্লাহ্ আমার বংশ থেকে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যে এ পৃথিবীকে তেমনিভাবে ন্যায়ের দ্বারা পূর্ণ করবে, যেমন তা অন্যায়ের দ্বারা পূর্ণ ছিল। ফিতর ইবনে খলিফাকে যদিও আহমদ, ইয়াহিয়া ইবনে কাত্তান, ইবনে মুঈন[২৪৩], নেসারী ও অন্যরা নির্ভরযোগ্য বলে মত দিয়েছেন, তথাপি আজলী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি ভালো হাদিস বর্ণনা করেন এবং তাঁর মধ্যে কিঞ্চিৎ শিয়া প্রবণতা আছে। ইবনে মুঈন একবার বলেছেন ইনি নির্ভরযোগ্য শিয়া মতাবলম্বী। আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইউনুস[২৪৪] বলেছেন, আমরা ফিতরের নিকট গেলেও যেহেতু তিনি পরিত্যাক্ত, সেজন্য আমরা তার নিকট থেকে হাদিস লিখতাম না। অন্য একবার বলেছেন, আমি ফিতরের নিকট গেলেও তাকে কুকুরের ন্যায় পরিত্যাগ করতাম। দারুকুতনী বলেছেন, তাকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা যায় না। আবুবকর ইবনে আইয়াশ[২৪৫] বলেছেন, আমি একমাত্র তার খারাপ মতাদর্শের জন্যই তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা ত্যাগ করেছি। জুরজানা[২৪৬] বলেছেন, অস্থিরমতি নির্ভরযোগ্য নয়। শেষ।

---

২৩৪. প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদিস সংকলনের অন্যতম সংকলক; আহমদ ইবনে আলী; ২১৫—৩০০ (৮৩০-৯১৫ খ্রি:) হি:।
২৩৫. আহমদ ইবনে হাসান; ১৮৩-২৪৩ (৮০০-৮৫৮ খ্রি:) হি:।
২৩৬. মুহম্মদ ইবনে আমর; মৃত্যু ৩২২ (৯৩৪ খ্রি:) হি:।
২৩৭. আলী ইবনে উমর; ৩০৬-৩৮৫ (৯১৯-৯৯৫ খ্রি:) হি:।
২৩৮. ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ; ১২০-১৯৮ (৭৩৮-৮১৩ খ্রি:) হি:।
২৩৯. মুহম্মদ ইবনে আলী; ৬৭৩-৭৪৮ (১২৭৪-১৩৪৮ খ্রি;) হি:
২৪০. মৃত্যু ১৫৩ (৭৭০ খ্রি:) হি:।
২৪১. মৃত্যু ১১৪-১২৫ (৭৩০-৭৪৩ খ্রি:) হি:; ইবনে বাজ্জা।
২৪২. আমর ইবনে ওসিলা; মৃত্যু ১০০ (৭১৯ খ্রি:) হি:।
২৪৩. ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন; ১৫৮-২৩৩ (৭৭৫-৮৪৮ খ্রি:) হি:।
২৪৪. জীবনকাল ১৪৩-২২৭ (৭৬১-৮৪২ খ্রি:) হি:।
২৪৫. মৃত্যু ১৯২-৯৪ (৮০৭-১০ খ্রি:) হি:।
২৪৬. ইব্রাহিম ইবনে ইয়াকুব; মৃত্যু ২৫৯ (৮৭৩ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

আবু দাউদ আলী (রাঃ)-র প্রতি নির্দেশিত সূত্রে যথাক্রমে হারুন ইবনে মুগিরা, উমর ইবনে আবু কায়েস, শুয়ায়েব ইবনে আবু খালেদ, আবু ইসহাক সাবিয়ী[২৪৭] থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী তাঁর পুত্র হুসাইনের প্রতি তাকিয়ে বললেন, আমার এ পুত্র নেতা, যেমন তাকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই নাম দিয়েছেন। অচিরেই তার বংশ থেকে এমন এক ব্যক্তি প্রকাশ পাবে, যার নাম তোমাদের নবীর নামের অনুরূপ হবে; সে তাঁর চরিত্র পাবে; কিন্তু দেহ পাবে না। সে পৃথিবীকে ন্যায়ের দ্বারা পূর্ণ করবে। হারুন বলেছে, উমর ইবনে আবু কয়েস মুতরেফ ইবনে তরিফ[২৪৮] থেকে, সে আবুল হাসান থেকে সে হেলাল ইবনে উমর থেকে আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, আলীকে বলতে শুনেছি যে, নবী (সঃ) বলেছেন, মাওরায়ান্নাহার থেকে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করবে, যার নাম হারেস এবং তার অগ্রবাহিনীতে এক ব্যক্তি থাকবে, যার নাম মনসুর; সে কষ্ট স্বীকার করবে অথবা আশ্রয়স্থল হবে নবী বংশের জন্য, যেমন কোরায়েশরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আশ্রয়স্থল হয়েছিল। প্রত্যেক বিশ্বাসীর উপর তাকে সাহায্য করা অথবা বললেন, তার ডাকে সাড়া দেয়া অবশ্য কর্তব্য হবে। আবু দাউদ এ হাদিসটি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। অন্যত্র তিনি হারুন সম্পর্কে বলেছেন, সে শিয়া সন্তান। সুলায়মানী[২৪৯] বলেছেন, তার বিষয়টি বিতর্কিত। আবু দাউদ উমর ইবনে আবু কয়েস সম্পর্কে বলেছেন, তার সম্পর্কে অসুবিধা নেই; কিন্তু তার হাদিসে ভুল আছে। যাহাবী বলেছেন, সত্যবাদী, তবে সন্দেহ আছে। আবু ইসহাক সাবিয়ী সম্পর্কে বলতে গেলে যদিও বিশুদ্ধ দুটি সংকলনে তার হাদিস বিদ্যমান, তথাপি এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সে শেষ জীবনে গোলমাল করেছে এবং আলী থেকে তার হাদিসটি বিচ্ছিন্ন সূত্র। অনুরূপ হারুন ইবনে মুগিরা থেকে আবু দাউদের বর্ণনা। দ্বিতীয় সূত্রটির মধ্যে আবুল হাসান ও হেলাল ইবনে উমরের পরিচয় অজ্ঞাত। আবুল হাসান একমাত্র মুতরেফ ইবনে তরিফের হাদিসের মাধ্যমেই পরিচিত হয়েছে। শেষ।

আবু দাউদ আরো একটি এবং অনুরূপভাবে ইবনে মাজা ও হাকেম তাঁর 'আল-মুস্তাদরক' গ্রন্থে সলমা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এটা আলী ইবনে নুফায়েলের[২৫০] ধারায় সাইদ ইবনে মুসাইয়ের থেকেও সে উম্মে সলমা থেকে বর্ণনা করেছে যে, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি; মেহেদী ফাতেমার সন্তান। হাকেমের বর্ণনা, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে মেহেদীর বর্ণনা করতে শুনেছি; তিনি বলেছেন, "হ্যাঁ, সে সত্য; সে ফাতেমার সন্তান।" এ হাদিসটি সম্পর্কে শুদ্ধ বা অনুরূপ কোনো মন্তব্য করা হয়নি। আবু জাফর উকাইলী এটাকে দুর্বল বলে মত প্রকাশ করে বলেছেন, এ হাদিসের বর্ণনায় আলী ইবনে নুফায়েলকে অন্য কেউ অনুসরণ করেনি এবং তার পরিচয় এ স্থলেই সীমাবদ্ধ।

আবু দাউদ আরো একটি হাদিস উম্মে সলমা থেকে বর্ণনা করেছেন, যা যথাক্রমে সালেহ ইবনে খলিল,[২৫১] তার এক সঙ্গী এবং উম্মে সলমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

---

২৪৭. আমর ইবনে আব্দুল্লাহ্; মৃত্যু ১২৬-১২১ (৭৪৩-৭৪৭ খ্রি:) হি:।
২৪৮. মৃত্যু ১৪০-১৪৩ (৭৫৭-৭৬১ খ্রি:) হি:।
২৪৯. আহমদ ইবনে আলী ইবনে আমর; ৩১১-৪০৪ (৯২৪-১০১৪ খ্রি:) হি:।
২৫০. মৃত্যু ১২৫ (৭৪৭ খ্রি:) হি:।
২৫১. শুদ্ধ নাম সম্ভবত আবু খলিল সালেহ ইবনে আবু মারয়ম। কেননা পরে আবু খলিল বলে উল্লেখিত হয়েছে।

www.amarboi.org

কোনো এক খলিফার মৃত্যুর সময় মতানৈক্য দেখা দিবে। তখন এক ব্যক্তি মদিনা থেকে মক্কার দিকে পলায়ন করবে। সেখানে মক্কাবাসীরা তাকে বিদ্রোহ করতে বলবে এবং তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা কাবার স্তম্ভ ও মকামে ইব্রাহিমের মধ্যবর্তী স্থলে তাঁর হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবে। সিরিয়া থেকে তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করা হবে। তারা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী প্রান্তরে ধ্বসে যাবে। মানুষ এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর তাঁর নিকট সিরিয়ার সাধু ব্যক্তিরা এবং ইরাকের বিভিন্ন গোত্র এসে আনুগত্যের শপথ নিবে। অতঃপর কোরায়েশ থেকে এক ব্যক্তি উত্থিত হবে যার মাতুল গোষ্ঠী বনি কেলাব। এর পর তাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করবে এবং তাদের উপর জয়ী হবে। এ অভিযান বনি কেলাবের এবং যারা বনি কেলাবের লুণ্ঠিত দ্রব্যের দর্শক না হবে, তারা সফল হতে পারবে না। সে সম্পদ বণ্টন করবে এবং মানুষের মধ্যে তাদের নবী (সঃ)-এর বিধান অনুসারে কাজ করবে। পৃথিবীতে ইসলামকে আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করবে। সে সাত বছর থাকবে। অনেকে বলেন,[২৫২] নয় বছর। অতঃপর আবু দাউদ এই হাদীসটি আবু খলিলের বর্ণনা হতে উদ্ধৃত করেছেন। আবু খলিল এটা আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারেস[২৫৩] থেকে এবং সে উম্মে সলমা থেকে বর্ণনা করেছে। এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী সূত্রটির সঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই সূত্রের ব্যক্তিবর্গ বিশুদ্ধ সংকলনদ্বয়ের মাপকাঠিতে গৃহীত। তাদের মধ্যে আপত্তিজনক ও রহস্যজনক কিছু নেই।

কখনো বলা হয় যে, এ হাদিসটি কাতাদার বর্ণনা। সে আবু খলিল থেকে এটা গ্রহণ করেছে। কাতাদা অবশ্য এটা শোনেনি; সে শুধু নির্দেশ করেছে। এরূপ সন্দেহজনক ব্যক্তির হাদিস তখনই গ্রহণ করা যায়, যখন তা শ্রুতির দ্বারা সমর্থিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও উক্ত হাদিসটিতে মেহেদীর সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই। শুধু আবু দাউদ তাকে এতদ্‌সম্পর্কীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ আরো একটি হাদিস আবু সাইদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করেছেন হাকেম। উক্ত হাদিসটি ইমরান কাত্তান[২৫৪] কাতাদা[২৫৫] থেকে, কাতাদা আবু বসরা[২৫৬] থেকে ও আবু বসরা আবু সাইদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, মেহেদী আমার বংশের, প্রশস্ত কপাল, উন্নত নাসা, পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচারে পরিপূর্ণ করবে, যেমন তা অন্যায় ও অবিচারে পূর্ণ ছিল। সে সাত বছর রাজত্ব করবে। এটা আবু দাউদের বর্ণনা এবং তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। হাকেমের বর্ণনা—মেহেদী আমাদের বংশের, উন্নত নাসা, উন্নত, প্রশস্ত; পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচারে পরিপূর্ণ করবে, যেমন তা অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ ছিল। বাঁচবে এরূপ—তিনি তাঁর বাম হাত প্রসারিত করলেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধা ও তর্জনী ব্যতীত অন্য তিনটি

---

২৫২. এটা হিশাম ইবনে উবুয়া হতে; মৃত্যু ১৪৫-৪৭ (৭৬২-৬৫ খ্রি:) হি:।
২৫৩. মৃত্যু ৭৯-৮৪ (৬৯৮-৭০৩ খ্রি:) হি:।
২৫৪. ইমরান ইবনে দোয়ার।
২৫৫. কাতাদা ইবনে দায়মা; মৃত্যু ১১৭ (৭৩৫ খ্রি:) হি:।
২৫৬. আবু নযবা (?); মুনযিব ইবনে মালিক; মৃত্যু ১০৮/৯ (৭২৬/২৮ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

আঙুল গুটিয়ে রাখলেন। হাকেম বলেন, মুসলিমের শর্তানুসারে এটা শুদ্ধ হাদিস; যদি বোখারী ও মুসলিম এটা বর্ণনা করেননি। শেষ।

ইমরান কাত্তানের প্রামাণ্য সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। বোখারী তার হাদিস আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছেন, বর্ণনার জন্য নয়। ইয়াহিয়া কাত্তান তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেননি। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন বলেন, খুব দৃঢ় নয়। অন্যত্র বলেন, কোনো কিছুই নয়। আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, আশাকরি সে ভাল হাদীস বর্ণনা করবে। ইয়াজিদ ইবনে যুরাই[২৫৭] বলেন সে হারবিয়া[২৫৮] ছিল। মুসলমানদেরকে[২৫৯] হত্যা করা বৈধ মনে করত। নেসায়ী বলেন, দুর্বল। আবু উবাইদ আজুরী[২৬০] বলেন, আমি আবু দাউদকে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম; তিনি বললেন, ভালো হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। আমি তার ভালো ছাড়া মন্দ শুনিনি। অন্য একবার তাকে বলতে শুনেছি, দুর্বল; সে ইব্রাহিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের[২৬১] সময়ে বড় কঠোর ধর্মীয় বিধান দিত। তাতে রক্তপাত ছিল।

তিরমিজী, ইবনে মাজা ও হাকেম আবু সাইদ খুদরী থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা যায়েদ আম্মীর[২৬২] ধারায় আবু সিদ্দিক নাজী[২৬৩] থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমরা কোনো কিছু ঘটার আশঙ্কা করে আল্লাহ্‌র নবী(সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে মেহেদী আত্মপ্রকাশ করবে এবং সে পাঁচ, সাত অথবা নয় জীবিত থাকবে। খুদরী বলেছেন, এরূপ সংখ্যায় সন্দেহ হলে আমরা বললাম, এগুলো কি? তিনি বললেন, বছর। আরো বললেন, তার নিকট কোনো একব্যক্তি এসে বলবে, হে মেহেদী আমাকে কিছু দাও! তিনি বললেন, তার কাপড়ে সে যে পরিমাণ বহন করতে পারে, ততটুকু ঢেলে দেবে। এটা তিরমিজীর বর্ণনা না এবং তিনি এটাকে ভালো হাদিস বলেছেন। আবু সাইদ ছাড়া অন্যদিক থেকেও নবী (সঃ) থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজা ও হাকেমের বর্ণনা, আমার উম্মতের মধ্যে মেহেদী হবে এবং কম করে হলেও সাত কিংবা নয় বছর পর্যন্ত থাকবে। আমার উম্মত তার মধ্যে এমন সমৃদ্ধির সাক্ষাৎ পাবে, যা তারা আর কখনো পায়নি। পৃথিবী প্রচুর শস্য দিবে এবং তা কেউ সঞ্চয় করবে না। সম্পদ তখন স্তূপীকৃত। তখন কোনো একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলবে, হে মেহেদী, আমাকে কিছু দাও। সে বলবে, নাও। শেষ।

যায়েদ আম্মী সম্পর্কে যদিও দারু কুতনী, আহমদ ইবনে হাম্বল ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন প্রমুখ জ্ঞানী বলেছেন যে, সে ভালো এবং আহমদ আরো বাড়িয়ে বলেছেন যে, সে ইয়াজিদ রাক্কাশী[২৬৪] ও ফজল ইবনে ইস।[২৬৫] থেকেও বেশি মর্যাদার অধিকারী, তথাপি তার সম্পর্কে আবু হাতেম বলেছেন, দুর্বল। তার হাদিস লেখা হয়; কিন্তু তা দিয়ে প্রমাণ

২৫৭. জীবনকাল ১০১—৮২ (৭২০—৯৯ খ্রি:) হি:।
২৫৮. খারেজী শিয়াদের একটি সম্প্রদায়।
২৫৯. খারেজী ব্যতীত অন্য মুসলমানদেরকে।
২৬০. মুহম্মদ ইবনে আলী।
২৬১. ইনি সম্রাট আল মনসুর আব্বাসীর সময় ১৪৫ (৭৬৩ খ্রি:) হিজরীতে নিহত হন। ২৩২ পৃষ্ঠা দ্র:।
২৬২. যায়েদ ইবনে হাওয়ারী।
২৬৩. বকর ইবনে আমর/কয়েস; মৃত্যু ১০৮ (৭২৮ খ্রি:) হি:।
২৬৪. ইয়াজীদ ইবনে আবান; মৃত্যু ১১০-১২০ (৭২৮-৭৩৮ খ্রি:) হি:।
২৬৫. উক্ত ইয়াজীদের ভাগিনেয়।

www.amarboi.org

গ্রহণ করা হয় না। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন অন্য একটি বর্ণনায় বলেছেন, কোনো কিছুই নয়। অন্য এক সময় বলেছেন, তার হাদিস লেখা হয় এবং সে দুর্বল। জুরজানী বলেন, নির্ভরশীল। আবু যুর্‌আ বলেন, দৃঢ় নয়; বাজে হাদিস বর্ণনাকারী, দুর্বল। আবু হাতেম বলেন, তদ্রূপ নয়; তার নিকট থেকে শুবা হাদিস বর্ণনা করেছেন। নেসায়ী বলেন, দুর্বল। ইবনে আদী[২৬৬] বলেন, খুব সাধারণ হাদিস বর্ণনা করে এবং যারা শুবা তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন বলে তার হাদিস গ্রহণ করে, তারা দুর্বল সম্ভবত শুবাও তার অপেক্ষা দুর্বল কারো নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেননি।

কখনো বলা হয়, মুসলিম তাঁর সংকলনে জাবের থেকে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিরমিজীর হাদিসটি তার ব্যাখ্যা হিসাবে উপস্থিত হয়। জাবেন বলেছেন, রসূলুল্লাহ্‌ও বললেন, আমার উম্মতের শেষের দিকে এমন একজন খলিফা হবে, যে সম্পদ ঢেলে দিবে, তা কখনো গণনা করবে না। আবু সাইদের একটি হাদিসে আছে, তিনি বললেন, তোমাদের খলিফাদের মধ্যে এমন একটি খলিফা হবে, যে সম্পদ ঢেলে দিবে। উক্ত উভয়ের নিকট থেকে অন্য এক ধারায়, শেষ সময়ে এমন একজন খলিফা হবে, যে সম্পদ বন্টন করবে, অথচ তা গণনা করবে না। শেষ।

মুসলিমের হাদিসগুলোতে মেহেদীর কোনো বর্ণনা নেই এবং এমন কোনো প্রমাণও নেই যে, এগুলোর দ্বারা তাই উদ্দেশ্য ছিল। হাকেম আরো একটি হাদিস আউফ আরাবীর[২৬৭] ধারায় আবু সিদ্দিক নাজী হয়ে আবু সাইদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন। খুদরী বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, প্রলয় আসবে না, যতক্ষণ না পৃথিবী অন্যায়, অবিচার ও উৎপীড়নে পরিপূর্ণ হবে। অতঃপর আমার বংশ থেকে একব্যক্তি বের হবে, যে তাকে ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ করবে, যেমন তা অবিচার-উৎপীড়নে পূর্ণ।

এ সম্পর্কে হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে শুদ্ধ। অবশ্য তারা এ হাদিস বর্ণনা করেননি। হাকেম এটাকে সুলায়মান ইবনে উবায়েদের[২৬৮] ধারাতে ও আবু সিদ্দিক নাজী হয়ে আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমার উম্মতের শেষের দিকে মেহেদী বের হবে। আল্লাহ্ তাকে খুব বৃষ্টি দিবেন, পৃথিবী শস্যাদি দিবে, সম্পদ পরিপূর্ণ হবে, পশু সম্পদ বাড়বে এবং উম্মত বৃহদাকার হয়ে উঠবে। সে সাত কিংবা আট বাঁচবে, অর্থাৎ বছর। হাকেম বলেন, হাদিসের সূত্রটি শুদ্ধ; যদিও বোখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেননি। এই সঙ্গে সুলায়মান ইবনে উবায়েদের হাদিস ছয়টি হাদিস সংকলনে কেউই বর্ণনা করেননি। অবশ্য ইবনে হাব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে গণ্য করেন এবং এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, কেউ তার সম্পর্কে কথা বলেছেন।

অতঃপর হাকেম এটাকে আসদ ইবনে মুসার[২৬৯] ধারাতেও যথাক্রমে হাম্মাদ ইবনে সলমা,[২৭০] মাতর ওয়ার্রাক[২৭১] ও আবু হারুন আবদী,[২৭২] আবু সিদ্দিক নাজী হয়ে আবু

---

২৬৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে আদী; ২৭৭-৩৬৫ (৮৯১-৯৭৬ খ্রি:) হি:।
২৬৭. আউফ ইবনে আবু জামিলা; ৫৯-১৪৭ (৬৭৮-৭৬৪ খ্রি:) হি:।
২৬৮. এক বর্ণনায় পিতার নাম 'আবিদ'।
২৬৯. জীবনকাল ১৩২-২১২ (৭৫০-৮২৮ খ্রি:) হি:।
২৭০. মৃত্যু ১৬৭ (৭৮৪ খ্রি:) হি:।
২৭১. মাতর ইবনে রহমান; মৃত্যু ১৪০ (৭৬৮ খ্রি:) হি: (?)।
২৭২. উমারা ইবনে জোয়ান।

www.amarboi.org

সাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, পৃথিবী অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ হবে; তখন আমার বংশাবলি থেকে একব্যক্তি প্রকাশ পাবে, সে সাত অথবা নয় রাজত্ব করবে। সে পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ করবে, যেমন তা অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ ছিল। হাকেম এতে বলেছেন, এ হাদিসটি মুসলিমের শর্তানুসারে শুদ্ধ ও ভালো। এর উপর মুসলিমের শর্তারোপের কারণ এই যে, তিনি এটা হাম্মাদ ইবনে সলমা ও তার উস্তাদ মাতর ওয়ার্রাকের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তার অন্য উস্তাদ আবু হারুন আবদীর নিকট থেকে মুসলিম হাদিস বর্ণনা করেননি। ইনি অনেক দুর্বল; মিথ্যার সন্দেহযুক্ত। তার দুর্বলতা প্রকাশ করার জন্য হাদিসশাস্ত্রবিদদের মতামতের বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অবশ্য তার বর্ণনাকারী আসাদ ইবনে মূসা, যিনি 'আসাদুসসুন্না' (হাদিসসিংহ) নামে খ্যাত, হাম্মাদ ইবনে সলমা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তার সম্পর্কে যদিও বোখারী বলেছে, প্রসিদ্ধ হাদিসবেত্তা; তিনি তার বিশুদ্ধ সংকলনে আলোচনার জন্য তার হাদিস গ্রহণও করেছেন এবং আবু দাউদ ও নেসায়ী তার হাদিস দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করেছেন, তথাপি অন্য একসময় তিনি বলেছেন, নির্ভরযোগ্য, তবে তিনি গ্রন্থ রচনায় না গেলেই ভালো করতেন। তার সম্পর্কে মুহম্মদ ইবনে হযম[২৭৩] বলেছেন, অন্যায্য হাদিস বর্ণনাকারী।

তিবরানী এটাকে তার মধ্যম সংকলনে আবুল ওয়াসেল আবদুল হামিদ ইবনে ওয়াসেল থেকে বর্ণনা করেছেন। আবুল ওয়াসেল আবু সিদ্দিক নাজী থেকে, নাজী হাসান ইবনে ইয়াজিদ সাদী—বনি বাহদালাদের একজন থেকে এবং সাদী আবু সাইদ খুদরী থেকে গ্রহণ করেছেন। খুদরী বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মত থেকে এমন একব্যক্তি আবির্ভূত হবে, যে আমার বিধানের কথা বলবে; প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করাবেন; পৃথিবী তার প্রাচুর্য প্রকাশ করবে এবং পৃথিবী তার দ্বারা ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ হয়ে উঠবে, যেমন তা অন্যায় ও অবিচারে পূর্ণ হয়েছিল। সে এই উম্মতের মধ্যে সাত বছর কাজ করবে এবং বয়তুল মুকাদ্দসে অবতীর্ণ হবে। তিবরানী এর সম্পর্কে বলেন, হাদিসটি একদল লোক বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তাদের কেউই তার ও আবু সাইদের মধ্যে আবুল ওয়াসেল ব্যতীত অন্য কাউকেও আনেননি এবং ইনিই হাসান ইবনে ইয়াজিদ হয়ে আবু সাইদ বর্ণনা করেছেন। শেষ।

এই হাসান ইবনে ইয়াজিদ সম্পর্কে ইবনে আবু হাতেম উল্লেখ করেছেন এবং আবু সাইদ খুদরী থেকে বর্ণিত তার এ হাদিসের সূত্র ব্যতীত তার অতিরিক্ত কোনো পরিচয় তুলে ধরেননি। আবু সিদ্দিক ও আবু সাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন। যাহাবী তাঁর 'মিজান' নামক গ্রন্থে বলেছেন, হাসান অপরিচিত; কিন্তু ইবনে হাববান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য আবুল ওয়াসেল, যিনি আবু সিদ্দিক থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন, ছয়টি হাদিস সংকলনের কেউই তার হাদিস প্রকাশ করেননি। ইবনে হাববান তাকেও দ্বিতীয় স্তরের নির্ভরযোগ্যদের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন।

২৭৩. বিখ্যাত স্পেনীয় জ্ঞানী; ২৩৪ পৃষ্ঠা, ৫৯ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

তার সম্পর্কে আরো বলেছেন, ইনি আনাস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তার নিকট থেকে শুবা ও ইতাব ইবনে বিশর[২৭৪] হাদিস গ্রহণ করেছেন।

ইবনে মাজা তার 'কিতাবুস্‌সুনন' নামক সংকলনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এটা ইয়াজিদ ইবনে আবু যিয়াদের[২৭৫] ধারায় ইব্রাহিম[২৭৬] ও আলকামা[২৭৭] হয়ে আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ্‌র কাছে আছি, এমন সময় হাশেম বংশীয় একদল যুবক অগ্রসর হয়ে এল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদেরকে দেখামাত্র তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হল ও তিনি বিবর্ণ হয়ে উঠলেন। আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমি বললাম, আমরা এতক্ষণ আপনার মধ্যে কেমন একটা বিমর্ষভাব লক্ষ করেছি। তখন তিনি বললেন, আমাদের নবী বংশীয়দের জন্য আল্লাহ্ ইহকালের উপর পরকালকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমার বংশাবলি আমার পরে বিপদে পড়বে, নির্বাসিত হবে, বিতাড়িত হবে। এমন সময় পূর্বদিক থেকে একটি জাতি এগিয়ে আসবে, তাদের সাথে থাকবে কৃষ্ণ পতাকা। তারা কল্যাণ প্রার্থনা করবে; কিন্তু তা পাবে না। তখন তারা যুদ্ধ করবে, সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং যা চাইবে তাই দেয়া হবে; কিন্তু তারা গ্রহণ করবে না। অতঃপর তারা তাকে আমার বংশের একব্যক্তির নিকট প্রত্যার্পণ করবে এবং সে এটা সুবিচারে পূর্ণ করবে যেমন অবিচারে পূর্ণ ছিল। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার সাক্ষাৎ পায়, তবে যেন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের নিকট আসে।

এ হাদিসটি হাদিসবেত্তাদের নিকট পতাকার হাদিস বলে পরিচিত। ইয়াজিদ ইবনে আবু যিয়াদ এর বর্ণনাকারী। শুবা এ হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, এর বর্ণনাকারী যোগসূত্র স্থাপনকারী ছিলেন। অর্থাৎ ইনি যে হাদিস রসূলুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছেনি, তাকে তাঁর সাথে সংযুক্ত করতেন। মুহম্মদ ইবনে ফুজায়েল[২৭৮] বলেছেন, ইনি শিয়াদের মহান নেতৃবৃন্দের অন্যতম। আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, তিনি হাদীস কণ্ঠস্থকারী ছিলেন না। অন্যত্র বলেছেন, তার হাদীস তদ্রূপ নয়। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, দুর্বল। আজলী বলেছেন, হাদীস গ্রহণ করা যায়। তবে শেষের দিকে তিনি হাদীস বুঝতে ছিলেন। আবু যুরআ[২৭৯] বলেছেন, নরম; তার হাদিস লিখা হয়, কিন্তু প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। আবু হাতেম বলেছেন, দৃঢ় নয়। জুরজানী বলেছেন, আমি তাদেরকে তার হাদিসকে দুর্বল বলতে শুনেছিল। আবু দাউদ বলেছেন, আমি কাউকেও তার হাদিস ত্যাগ করেছে বলে জানি না। অবশ্য তার অপেক্ষা অন্যরা আমার নিকট অধিক প্রিয়। ইবনে আদী বলেছেন, ইনি কুফাবাসী শিয়াদের অন্তর্গত; দুর্বলতা সত্ত্বেও তার হাদিস লেখা হয়। মুসলিম তার নিকট থেকে অন্যের সাথে যুক্তভাবে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

---

২৭৪. মৃত্যু ১৮৮/৯০ (৮০/৬ খ্রি:) হি:।

২৭৫. জীবনকাল ৪৭-১৩৬ (৬৬৭-৭৫৩ খ্রি:) হি:।

২৭৬. আলকামার কাছ থেকে দুইজন ইব্রাহিম হাদিস বর্ণনা করেছেন; একজন হলেন ইব্রাহিম ইবনে মুয়ায়েদ এবং অন্যজন তদপেক্ষা বিখ্যাত ইব্রাহিম ইবনে ইরাজাদ নখলী। শেষোক্ত জন আলকামার ভাগিনেয় ও ৯৬ (৭১৫ খ্রি:) হিজরিতে মৃত্যু হয়।

২৭৭. আলকামা ইবনে কয়েস।

২৭৮. মৃত্যু ১৯৫ (৮১ খ্রি:) হি:।

২৭৯. হয় পূর্বোক্ত রাজী, না হয় দামেস্কী, আব্দুর রহমান ইবনে আমর; মৃত্যু ২৮২ (৮৯৫ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

মোটামুটি অধিকাংশই তার দুর্বলতার কথক। হাদিসবেত্তাগণ এ হাদিসটি, যা যথাক্রমে ইব্রাহিম, আলকামা ও আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তার দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এটাই পতাকার হাদিস নামে খ্যাত। এর সম্পর্কে ওকি ইবনে জারাহ্[২৮০] বলেছেন, কোনো কিছুই নয়। অনুরূপভাবে আহমদ ইবনে হাম্বলও বলেছেন। আবু কুদামা[২৮১] বলেছেন, আমি আবু উসামাকে[২৮২] বলতে শুনেছি, ইব্রাহিম থেকে ইয়াজিদ কর্তৃক বর্ণিত পতাকার এ হাদিসটি সম্পর্কে সে যদি আমার নিকট পঞ্চাশটি দৃঢ় শপথও গ্রহণ করে, তথাপি আমি তাকে সত্য বলে মনে করব না। এটা কি ইব্রাহিমের মতাদর্শ? এটা কি আলকামার মতাদর্শ? এটা কি আবদুল্লাহ্র মতাদর্শ? উকাইলী এ হাদিসটিকে দুর্বলদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। যাহাবী বলেছেন, শুদ্ধ নয়।

ইবনে মাজা আলী (রাঃ) থেকে ইয়াসীন আজলীর[২৮৩] বর্ণনায় ইব্রাহিম ইবনে মুহম্মদ ইবনে হানাফিয়া হয়ে তার পিতা ও পিতামহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী বলেছেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, মেহেদী আমাদের বংশাবলির মধ্যে; আল্লাহ্ তার দ্বারা এক রাত্রিতে কল্যাণ সাধন করবেন। ইয়াসীন আজলী সম্পর্কে ইবনে মুঈন যদিও বলেছেন, কোনো অসুবিধা নেই; তথাপি বোখারীর মন্তব্য হল, তার সম্পর্কে বিরোধ আছে। তাঁর পরিভাষায় এই মন্তব্য অতিমাত্রায় দুর্বলতার সাক্ষ্য দেয়। ইবনে আদী তার গ্রন্থ 'কামেল' এ তাকে উদ্ধৃত করেছেন এবং যাহাবী তার 'মিজান' গ্রন্থে এ হাদিসটিকে তার প্রতি বিরূপ মন্তব্যের জন্য উল্লেখ করেছেন। তার সম্পর্কে বলেছেন যে, সে এর দ্বারাই পরিচিত।

তিবরানী তার মধ্যম সংকলনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রসূলুল্লাহ্! মেহেদী কি আমাদের মধ্যে হবে, না অন্যদের মধ্যে? তিনি বললেন, বরং আমাদের মধ্যে; আমাদের দ্বারাই আল্লাহ্ শেষ করবেন, যেমন আমাদের দ্বারা আরম্ভ করেছিলেন। আমাদের দ্বারাই তাদেরকে আল্লাহ্র অংশীদারিত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আমাদের দ্বারাই প্রকাশ্য শত্রুতার পর তাদের অন্তঃকরণে সম্প্রীতি স্থাপন করবেন। যেমন আমাদের দ্বারা আল্লাহ্র অংশীদারিত্বের বিরোধের পর তাদের হৃদয়কে সংহত করেছিলেন। আলী বলেছিলেন, তারা বিশ্বাসী, না অবিশ্বাসী? তিনি বললেন, তারা গোলযোগ আক্রান্ত ও অবিশ্বাসী। শেষ।

এই সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে লাহিয়া[২৮৪] বিদ্যমান, সে দুর্বলতার জন্য সুপরিচিত। এতে উমর ইবনে জাবের হাজরামীও[২৮৫] রয়েছে, সে তার অপেক্ষাও দুর্বল। আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, জাবের থেকে অপরিচিত হাদিসই বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমি জানতে পেরেছি যে, সে মিথ্যা বলত। নেসায়ী বলেছেন, দৃঢ় নয়। আরো বলেছেন,

---

২৮০. জীবনকাল ১৩১-৯৭ (৭৪৯-৮১২ খ্রি:) হি:।
২৮১. উবায়দুল্লাহ ইবনে সায়িদ; মৃত্যু ২৪১ (৮৫৬ খ্রি:) হি:।
২৮২. হাম্মাদ ইবনে উমাম; মৃত্যু ২০১ (৮১৭ খ্রি.) হি:।
২৮৩. ইয়াসীন ইবনে সায়বীন।
২৮৪. মৃত্যু ১৪৪ (৭৯১ খ্রি:) হি:।
২৮৫. মৃত্যু ১২০ (৭৩৮ খ্রি:) হিজরির পরে।

www.amarboi.org

ইবনে লাহিয়া বৃদ্ধ, নির্বোধ ও অপরিপক্ব ছিল। সে বলত, আলী মেঘের উপর আছেন। সে আমাদের সঙ্গে বসা অবস্থায় কোনো মেঘ দেখলে বলত, এই যে আলী মেঘের সাথে চলে যাচ্ছেন। তিবরানী আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, শেষ সময়ে গোলযোগ দেখা দেবে। তাতে মানুষ এমনভাবে ধরা পড়বে, যেমন স্বর্ণ তার খনিতে বাঁধা পড়ে। তোমরা সিরিয়াবাসীদেরকে গালি দিও না; বরং তাদের মধ্যে দুষ্টমতিদেরকে গালি দাও। কেননা তাদের মধ্যে সাধু ব্যক্তি বিদ্যমান। আশঙ্কা হয়, সিরিয়াবাসীদের উপর আকাশ থেকে বিপদ নেমে আসবে, যাতে তাদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। এমন কি তাদের সাথে যদি তখন শৃগালেরাও যুদ্ধ করে, তা হলেও জয়ী হবে। এ সময় আমার বংশাবলি থেকে এক ব্যক্তি তিনটি পতাকাসহ আবির্ভূত হবে। কেউ অধিক বললে বলবে তাদের সংখ্যা পনের হাজার এবং কেউ অল্প বললে বলবে তাদের সংখ্যা বার হাজার। তাদের সংকেত হবে 'মার মার'। তারা সাতটি পতাকার সাক্ষাৎ পাবে। তাদের প্রতিটির নিচেই রাজ্যাকাঙ্ক্ষী বিদ্যমান। তারা সকলকেই হত্যা করবে। আল্লাহ্ মুসলমানদের মধ্যে তাদের সম্প্রীতি, সম্পদ, সীমান্ত ও পতাকা ফিরিয়ে দিবেন। শেষ।

এই সূত্রেও আবদুল্লাহ্ ইবনে লাহিয়া তার দুর্বলতার জন্য সুপরিচিত। হাকেম এ হাদিসটি তার গ্রন্থ 'মুস্তাদরক'-এ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, সূত্রের দিক থেকে শুদ্ধ। বোখারী ও মুসলিম তাঁদের বর্ণনায় গ্রহণ করেননি। অতঃপর হাশেমী আবির্ভূত হবে এবং আল্লাহ্ মানুষকে তাদের সম্প্রীতির দিক থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনাটির ধারায় ইবনে লাহিয়া নেই। তাই শুদ্ধ সূত্র, যেমন বর্ণনা করা হয়েছে। হাকেম তার মুস্তাদরকে আলী (রাঃ) থেকে আবু তুফায়েলের বর্ণনায় মুহম্মদ ইবনে হানাফিয়ার বক্তব্য বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন, আমরা আলী (রঃ)-র সমীপে ছিলাম, এমন সময় একব্যক্তি তাঁকে মেহেদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। আলী বললেন, দেখ; অতঃপর তিনি আঙুল দ্বারা সাত দেখালেন এবং এটা শেষ সময়ে এমন পরিবেশে আসবে, যখন কোনো ব্যক্তি 'আল্লাহ্, আল্লাহ্' বললে তাকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ্ তার জন্য এমন প্রচুর লোক সৃষ্টি করবেন, যারা মেঘমালার মতো ছড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে সম্প্রীতি স্থাপন করবেন, ফলে তারা কাউকেও ভয় করবে না এবং তাদের মধ্যে কেউ প্রবেশ করলেও উল্লসিত হয়ে উঠবে না। তাদের সংখ্যা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ন্যায়; পূর্ববর্তীরা তাকে অতিক্রম করতে পারেনি এবং পরবর্তীরাও তার নাগাল পাবে না। তাদের সংখ্যা তালুতের[২৮৬] সাথে নদী অতিক্রমকারীদের সংখ্যার অনুরূপ। আবু তুফায়েল বলেছেন, ইবনে হানাফিয়া বললেন, তুমি কি তাকে চাও? বললাম, হাঁ! তিনি বললেন, সে এ দুই পাহাড়ের[২৮৭] মধ্যবর্তী স্থল থেকে বের হয়ে আসবে। বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, অবশ্যই আমি তাকে আমার মৃত্যু পর্যন্ত ত্যাগ করব না। সে সেখানে অর্থাৎ মক্কায় মারা যাবে। হাকেম বলেন, এ হাদিসটি বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে শুদ্ধ। শেষ।

---

২৮৬. বাইবেলোক্ত সৌল; কোরান, ২, ২৪৯।
২৮৭. মক্কার নিকটবর্তী।

www.amarboi.org

অবশ্য তা শুধু মুসলিমের শর্তেই শুদ্ধ। কেননা এই সূত্রে আম্মার দুহনী ও ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক[২৮৯] বিদ্যমান। বোখারী তাদের নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেননি। তাতে আমর ইবনে মুহম্মদ আনকাজীও[২৯০] রয়েছে, তার হাদিস বোখারী আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছেন, প্রমাণের জন্য নয়। এতদ্সত্ত্বেও তাতে আম্মার দুহনীর শিয়া মতবাদের স্পর্শ আছে। তাকে যদিও আহমদ, ইবনে মুইন, আবু হান্মে, নেসায়ী ও অন্যরা নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তথাপি আলী ইবনে মদিনী[২৯১] সুফিয়ান[২৯২] থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিশার ইবনে মারোয়ান[২৯৩] তার পায়ের রগ কেটে দিয়েছিল। আমি বললাম, কেন? সুফিয়ান বললেন, সামনে তার শিয়ামতের জন্য।

ইবনে মাজা আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে সাদ ইবনে আব্দুল হামিদ ইবনে জাফরের[২৯৪] বর্ণনায় যথাক্রমে আলী ইবনে যিয়াদ ইয়ামামী[২৯৫] আকরামা ইবনে আম্মার[২৯৬] ও ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ্[২৯৭] হয়ে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে আনাস বলেছেন আমি রসূলুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি, আমরা আবদুল মুত্তালেবের সন্তান, জান্নাতবাসীদের নেতা। আমি, হামজা, আলী, জাফর[২৯৮] হাসান, হুসাইন ও মেহেদী। শেষ।

আকরামা ইবনে আম্মারের হাদিস যদিও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তবু তা অন্যের অনুসরণে মাত্র। তাকে অনেকে দুর্বল বলেছেন, অনেকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবু হাতেম রাজি বলেছেন, সে সন্দেহজনক, শ্রুতির উল্লেখ না থাকলে গ্রহণযোগ্য নয়। আলী ইবনে যিয়াদ সম্পর্কে যাহাবী তার 'মিজান' গ্রন্থে বলেছেন, সে যে কে, তা বলতে পারি না। পুনরায় বলেছেন, এখানে শুদ্ধ আব্দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ। সাদ ইবনে আব্দুল হামিদকে যদিও ইয়াকুব ইবনে আবু শায়ক[২৯৯] নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং যদিও ইবনে মুঈন তার সম্পর্কে বলেছেন, কোনো অসুবিধা নেই, তথাপি সউরী তার সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন। তাঁরা বলেন, তিনি তাকে ধর্মীয় বিধান দিতেও ভুল করতে দেখেছেন। ইবনে হাব্বান বলেছেন, সে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্গত, যাদের দানে মাত্রাজ্ঞান নেই; সুতরাং সে প্রামাণ্য নয়। আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, সাদ ইবনে আব্দুল হামিদ দাবি করে, সে মালেকের পুস্তকাবলি উপস্থাপনের সময় তা শুনেছে। অথচ মানুষ তার দাবির সত্যতা অস্বীকার করে। সে এই বাগদাদেই আছে, হজ করেনি; সুতরাং সে শুনল কী রূপে? যাহাবী তাকে ঐ সকল লোকের মধ্যে গণ্য করেন, যাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হলেও তার কোনো প্রভাব তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

---

২৮৯. মৃত্যু ১৫২-৫৯ (৪৬৯-৭৫ খ্রি:) হি:।
২৯০. মৃত্যু ১৯৯ (৮১৫ খ্রি:) হি:।
২৯১. আলী ইবনে আবদুল্লাহ্; ১৬১-২৩৫ (৭৭৮-৮৫০ খ্রি:) হি:।
২৯২. সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না; ২২ পৃষ্ঠা ৫৬ নং টীকা দ্র:।
২৯৩. সম্ভবত উমাইয়া সম্রাট মারোয়ানের পুত্র (?)।
২৯৪. মৃত্যু ২০৯ (৮৩৪ খ্রি:) হি:।
২৯৫. শুদ্ধ আব্দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ।
২৯৬. মৃত্যু ১৫৯ (৭৭৬ খ্রি:) হি:।
২৯৭. মৃত্যু ১২৭ (৭৫০ খ্রি:) হি:।
২৯৮. জাফর হজরত আলীর ভাই।
২৯৯. জীবনকাল ১৮২-২৬২ (৭৭৯-৮৭০ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

হাকেম তার মুস্তাদরক গ্রন্থে মুজাহেদের[৩০০] বর্ণনায় ইবনে আব্বাস থেকে তাঁর উপর আপেক্ষিত একটি হাদিস গ্রহণ করেছেন। মুজাহেদ বলেছেন, আমাকে ইবনে আব্বাস বললেন, যদি আমি না শুনতাম যে, তুমিও নবী বংশের অনুরূপ, তা হলে তোমার নিকট এ হাদিস বর্ণনা করতাম না। মুজাহেদ বলেছেন, তখন তিনি বললেন, এটা গোপনে থাকবে; আমি অপছন্দনীয় কারো কাছে এটা বর্ণনা করব না। মুজাহেদ বলেছেন, তখন ইবনে আব্বাস বললেন, আমাদের মধ্যে নবীর বংশে চারজন; আমাদের মধ্যে সাফফাহ, আমাদের মধ্যে মুনজির, আমাদের মধ্যে মনসুর ও আমাদের মধ্যে মেহেদী। মুজাহেদ বলেছেন, তখন তিনি বললেন, এ চারজনের ব্যাখ্যা করুন। ইবনে আব্বাস বললেন, সাফফাহ্ অনেক সময় তার সহায়কদিগকে হত্যা করবে এবং শত্রুকে ক্ষমা করবে। মুনজিরকে আমার মনে হয়, তিনি বললেন, সে বহু সম্পদ বণ্টন করবে, অথচ তজ্জন্য তার মনে কোনো গর্ববোধ থাকবে না এবং নিজের অধিকারের সামান্য অংশও সে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে। মনসুরকে তার শত্রুর বিরুদ্ধে সেই পরিমাণ সাহায্য করা হবে, যা রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত সাহায্যের অর্ধেক। তার শত্রুরা দুইমাসের পথ দূর থেকে ভয়ে কাঁপত; মনসুরের জন্য এক মাসের পথ দূর থেকে ভয়ে কাঁপবে। মেহেদী সেই ব্যক্তি, সে পৃথিবীকে সুবিচারে পূর্ণ করবে, যেমন তা অবিচারে পূর্ণ ছিল। নিরীহ প্রাণী হিংস্র প্রাণীদেরকে ভয় করবে না। ভূমি তার কলিজার টুকরা বের করে দিবে। মুজাহেদ বলেছেন, আমি বললাম, তার কলিজার টুকরা কি? তিনি বললেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্তম্ভ সদৃশ কিছু। শেষ।

হাকেম বলেন, হাদিসটির সূত্র শুদ্ধ; অবশ্য বোখারী ও মুসলিম তা প্রকাশ করেননি। এটা ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম ইবনে মুহাজির তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। ইসমাইল দুর্বল। ইব্রাহিম, তার পিতার হাদিস যদিও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তথাপি অধিকাংশের মতে সে দুর্বল। শেষ।

ইবনে মাজা সউবান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, তোমাদের ভাণ্ডারের নিকট তিনজন একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের প্রত্যেকেই খলিফার পুত্র। তাদের কারো তা হস্তগত হবে না। অতঃপর পূর্বদিক থেকে কাল পতাকার উদয় হবে এবং তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে, যা কোনো জাতি কখনো করেনি। অতঃপর তিনি কিছু কথা বলেছিলেন, যা আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। তিনি বললেন, যখন তোমরা তাকে দেখবে, তখন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর। কারণ সেই হচ্ছে আল্লাহ্‌র খলিফা মেহেদী। শেষ।

এই সূত্রের ব্যক্তিবর্গ বোখারী ও মুসলিমের অনুরূপ। কিন্তু সেখানে আবু কেলাবা জরমী[৩০১] বিদ্যমান, যাহাবী ও অন্যরা যার সম্পর্কে বলেছেন সে সন্দেহজনক। এতে সুফিয়ান সউরীও রয়েছে, সে অশ্রুত হাদিস বর্ণনাকারী হিসাবে বিখ্যাত। তারা উভয়েই সূত্র নির্দেশ করেছে মাত্র; কিন্তু শোনার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেনি। সুতরাং

৩০০. ইবনে জবর; মৃত্যু ১০১-৪ (৭১৯-২৩ খ্রি:) হি:।
৩০১. আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ; মৃত্যু ১০৪-৭ (৭২২-২৬ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

গ্রহণযোগ্য নয়। এ সূত্রে আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম[৩০২] আছে; সে শিয়া মতবাদের জন্য বিখ্যাত শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে গোলমাল করেছে। ইবনে আদী বলেন, সে বিভিন্ন বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে এমন সব হাদিস বর্ণনা করেছে যা অন্য কারো সাথে মেলেনি। তারা তাকে শিয়া মতের অধিকারী বলে গণ্য করেছেন। শেষ।

ইবনে মাজা আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারেস ইবনে জজ যুবাইদী থেকে ইবনে লাহিয়ার ধারায় যথাক্রমে আবু যুরআ, উমর ইবনে জাবের হাজরামী হয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারেস ইবনে জজ বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, মানুষ পূর্বদিক থেকে নির্গত হয়ে মেহেদীর জন্য প্রতিষ্ঠা করবে, অর্থাৎ তার শাসনব্যবস্থা। তিবরানী বলে, ইবনে লাহিয়া এ হাদিস এককভাবে বর্ণনা করেছে। ইতিপূর্বে তিবরানী তার মধ্যম সংকলনে আলী থেকে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তার আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবনে লাহিয়া দুর্বল এবং তার উস্তাদ উমর ইবনে জাবের তার অপেক্ষা দুর্বল।

বাজ্জার তার সংকলনে ও তিবরানী তার মধ্যম সংকলনে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিবরানীর বর্ণনা : আবু হুরায়রা বলেছেন, নবী (সঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে মেহেদী হবে। যদি কম হয় তবে সাত, নতুবা আট কিংবা নয়। তার সময়ে আমার উম্মত এমন প্রাচুর্যের অধিকারী হবে, যা অন্য কখনো তার হয়নি। তাদের উপর আকাশ অনবরত বর্ষণ করবে এবং ভূমি কোনো শস্য সঞ্চয় করে রাখবে না। সম্পদ স্তূপীকৃত হয়ে থাকবে। কোনো এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলবে, হে মেহেদী, আমাকে দাও। সে বলবে, নাও। তিবরানী ও বাজ্জার বলেন, এটা মুহম্মদ ইবনে মারোয়ান আজলীর[৩০৩] এককভাবে বর্ণিত হাদিস। বাজ্জার আরো বলেন, কেউ তার অনুসরণ করেছে বলে জানি না। তাকে যদিও আবু দাউদ নির্ভরযোগ্য বলেছেন, ইবনে হাব্বান যদিও তাকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে মুঈন যদিও তার সম্পর্কে বলেছেন, ভালো ও অন্য একবার বলেছেন, কোনো অসুবিধা নেই, তথাপি তার সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। আবু যুরআ বলেন, আমার নিকট তদ্রূপ নয়। আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল[৩০৪] বলেন, আমি মুহম্মদ ইবনে মারোয়ান আজলীকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখেছি; আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু হাদিস লেখেনি। আমরা ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিতাম। আমাদের কোনো কোনো সঙ্গী তার নিকট থেকে লিখেছি। তিনি যেন তাকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন।

আবু ইয়ালা মোশেলী তার সংকলনে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে আমার বন্ধু আবুল কাসেম (সঃ) বর্ণনা করলেন, প্রলয় সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার বংশ থেকে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বের হবে। সে তাদেরকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে না আসা পর্যন্ত আঘাত করবে। আবু হুরায়রা বলেছেন, বললাম, কতদিন রাজত্ব করবে? তিনি বললেন, পাঁচ ও দুই। আবু হুরায়রা বলেছেন, বললাম, পাঁচ ও দুই কি? তিনি বললেন, আমি জানি না। শেষ।

---

৩০২. জীবনকাল ১২৬-২১১ (৭৪৪-৮১৭ খ্রি:) হি:।

৩০৩. অথবা উকাইলী।

৩০৪. জীবনকাল ২১৩-৯০ (৮২৯-৯০৩ খ্রি :) হি:।

www.amarboi.org

এই সূত্রে যদিও বশির ইবনে নাহিক বিদ্যমান আবু হাতেম বলেন, তথাপি তা দিয়ে প্রমাণ গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য বোখারী ও মুসলিম তার দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন এবং মানুষ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছে। তারা আবু হাতেমের মন্তব্য—'প্রমাণ গ্রহণ করা যায় না'র প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি। কিন্তু তাতে রেজা ইবনে আবু রেজা ইয়াশকুরী রয়েছে, যার সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। আবু যুরআ বলেন, নির্ভরযোগ্য। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন বলেন, দুর্বল। আবু দাউদ বলেন, দুর্বল। অন্যত্র বলেন, ভাল। বোখারী তাঁর সংকলনে তার একটি মাত্র হাদিস গ্রহণ করেছেন।

আবুবকর বাজ্জার তার সংকলনে এবং তিবরানী তার বৃহৎ ও মধ্যম সংকলনে কুর্রা ইবনে ইয়াস থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। কুর্রা বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, পৃথিবী অবশ্যই অবিচার ও উৎপীড়নে পরিপূর্ণ হবে। যখন তা অবিচার ও উৎপীড়নে পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহ্ আমার উম্মত থেকে এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যার নাম আমার নাম ও যার পিতার নাম আমার পিতার নাম হবে। সে এটাকে সুবিচার ও ন্যায়ের দ্বারা পূর্ণ করবে, যেমন তা অবিচার ও উৎপীড়নে পূর্ণ ছিল। আকাশ তার বৃষ্টিকে বিন্দুমাত্রও বাধা দিবে না এবং ভূমিও তার উদ্ভিদের কোনো কিছু সঞ্চয় করে রাখবে না। সে তোমাদের মধ্যে সাত, আট অথবা নয় থাকবে; অর্থাৎ বছর। শেষ।

এই সূত্রে দাউদ ইবনে মুজাব্বের ইবনে কাহজাম[৩০৫] তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছে। তারা উভয়েই অতিশয় দুর্বল।[৩০৬]

তিবরানী তার মধ্যম সংকলনে ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মুহাজির ও আনসারদের একটি দলের মধ্যে ছিলেন; আলী ইবনে আবু তালেব তাঁর বাম দিকে ও আব্বাস তাঁর ডান দিকে; এমন সময় আব্বাস ও আনসারদের একজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল এবং আনসারীটি আব্বাসকে কটু কথা বলে ফেলল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আব্বাসের ও আলীর হাত ধরে বললেন, অচিরেই এর বংশ থেকে এমন যুবক জন্মাবে যার দরুন পৃথিবী অবিচারে-উৎপীড়নে পূর্ণ হবে এবং অচিরেই এর বংশ থেকে এমন যুবক জন্মাবে, যার দরুন পৃথিবী ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ হবে। তোমরা যখন এটা দেখবে, তখন তোমাদের উচিত তমিমী যুবককে সাহায্য করা। সে পূর্বদিক থেকে আসবে, সেই মেহেদীর পতাকা বহনকারী। শেষ।

এই সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর উমরী[৩০৭] ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে লাহিয়া; তারা উভয়েই দুর্বল। শেষ।

তিবরানী তার মধ্যম সংকলনে তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, অচিরেই গোলযোগ দেখা দিবে, তাতে একপক্ষ নিশ্চুপ হলে

---

৩০৫. মৃত্যু ২০৬ (৮২১ খ্রি:) হি:।

৩০৬. এর পর রোজেনথাল দুইটি অনুচ্ছেদে তিবরানী কর্তৃক উম্মে হাবিবা হতে একটি হাদিস ও তার সূত্র বিচার বর্ণনা করেছেন। আমাদের ব্যবহৃত মূলগ্রন্থে এটা নেই। হাদিসটি এরূপ—রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, পূর্বদিক থেকে মানুষনবী বংশের এক ব্যক্তির জন্য আসবে। তারা প্রান্তরে উপস্থিত হলে সে তাদের সাথে অদৃশ্য হবে। যারা পিছনে থাকবে, তারাও তার সাথে মিলিত হবে এবং অনুরূপ পরিণাম লাভ করবে ইত্যাদি। সূত্রে সালামা ইবনে আব্বাস দুর্বল।

৩০৭. মৃত্যু ১৭৩ (৭৯০ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

অন্যপক্ষ উত্তেজিত হয়ে উঠবে। এমন সময় আকাশ থেকে কেউ ডেকে বলবে তোমার নেতা অমুক। শেষ।

এই সূত্রে মুসান্না ইবনে সাবা[৩০৮] বিদ্যমান, সে অতিশয় দুর্বল। হাদিসটিতে মেহেদীর কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। একমাত্র কিছুটা মিলের জন্যই সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ও জীবনীতে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে।

এগুলোই মেহেদীর অবস্থা ও শেষ সময়ে তার আবির্ভাব সম্পর্কে হাদিসবেত্তাগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। পাঠক, আপনি দেখেছেন যে, সমালোচনায় এর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক হাদিস টিকে থাকতে পেরেছে। অনেক সময় মেহেদীর বিষয়টি অস্বীকারকারীরা মুহম্মদ ইবনে খালেদ জুন্দী থেকে বর্ণিত একটি হাদিসকে দৃঢ়তার সাথে উপস্থিত করে। উক্ত হাদিসটি আব্বান ইবনে সালেহ ইবনে আবু আইয়াশ,[৩০৯] হাসান বসরী[৩১০] হয়ে আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী (সঃ) বলেছেন, মেহেদী ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কেউ নয়। মুহম্মদ ইবনে খালেদ জুন্দী সম্পর্কে ইবনে মুঈন বলেন, সে নির্ভরযোগ্য। বায়হকী[৩১১] বলেন, এটা মুহম্মদ ইবনে খালেদের একক বর্ণিত হাদিস। তার সম্পর্কে হাকেম বলেন, সে অপরিচিত ব্যক্তি। তার সূত্র সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে। কখনও পূর্বের ন্যায় বর্ণনার পরে এটাকে মুহম্মদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ীর দিকে নির্দেশ করা হয় আবার কখনো মুহম্মদ ইবনে খালেদ, আব্বান, হাসান হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়। বায়হকী বলেন, এতেও সেই মুহম্মদ ইবনে খালেদের বর্ণনার দিকে ফিরে আসে এবং সে অপরিচিত। আব্বান ইবনে আবু আইয়াশ পরিত্যক্ত। নবী (সঃ) থেকে হাসানের বর্ণনা বিচ্ছিন্ন। মোট কথা হাদিসটি দুর্বল ও অস্থির। কখনো এ কথা—মেহেদী ঈসা ভিন্ন অন্য কেউ নয়—সম্পর্কে বলা হয়, শব্দটি মেহেদী নয়, মাহদিয়া অর্থাৎ দোলনাধারী; সুতরাং হাদিসটির অর্থ দোলনায় ঈসা ভিন্ন অন্য কেউ কথা বলেনি।[৩১২] এভাবে অর্থের পরিবর্তন করে এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণের প্রতিবাদ করা হয়। অথবা উক্ত হাদিস ও অন্যান্য হাদিসের মধ্যকার বিরোধকে নিষ্পত্তি করা হয়। এটা জুরাইহ সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস[৩১৩] ও অনুরূপ অন্য হাদিস দ্বারা অস্বাভাবিক ঘটনাবলির জন্য খণ্ডিত।

সুফী সাধকদের মধ্যে পূর্বসূরিরা এ প্রকার কোনো বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হননি। তাঁরা কর্তব্যের সাধনা এবং তা থেকে লব্ধ অনুভূতি ও দশা নিয়েই কথা বলতেন। শিয়াদের মধ্যে ইমামিয়া ও রাফেজী সম্প্রদায় আলী (রাঃ)-র শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর নেতৃত্বের দাবি তজ্জন্য নবী (সঃ)-এর অন্তিম উপদেশ এবং আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর খেলাফত অস্বীকার

---

৩০৮. মৃত্যু ১৪৯ (৭৬৭ খ্রি:) হি:।

৩০৯. জীবনকাল ৬০-১১০ (৬৮০-৭২৯ খ্রি:) হি:।

৩১০. ইসলামী শাস্ত্রের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জ্ঞানী; মৃত্যু ১১০ (৭২৮ খ্রি:) হি:।

৩১১. আহমদ ইবনে হুসাইন; ৩৮৪-৪৫৮ (৯৯৪-১০৬৬ খ্রি:) হি:।

৩১২. তুল, কোরান, ৪, ৪৬; ৫; ১১০।

৩১৩. প্রসিদ্ধ ইহুদি সাধু জুরাইহ'কে এক বেশ্যা রমণী পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছিল; কিন্তু ব্যর্থ হয়ে অন্য একটি লোকের দ্বারা গর্ভবতী হয় এবং ইহুদিরা এর দোষ সাধুর উপর আরোপ করলে তিনি প্রার্থনা করেন। ফলে নবজাত শিশু তার পিতৃ পরিচয় প্রদান করে।

www.amarboi.org

করা নিয়েই বাক্‌বিতণ্ডা করত, যেমন আমরা তাদের মতাদর্শ বর্ণনায় উল্লেখ করেছি। অতঃপর তাদের মধ্যে পবিত্র ইমামের ধারণার সৃষ্টি হল এবং এই মতাদর্শে বহু রচনা প্রকাশ পেতে লাগল। তাদের মধ্যে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় এক প্রকার অবতারবাদের আশ্রয় নিয়ে ইমামের মধ্যে ঐশী ক্ষমতার দাবি করল। অন্যরা কিছুটা জন্মান্তরবাদের অনুসারে মৃত ইমামের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে মত প্রকাশ করল। অন্য অনেকে ইমামের মৃত্যুর ফলে যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে, তার পুনরুজ্জীবনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। আবার অন্য অনেকে আমাদের পূর্ব বর্ণিত মেহেদী সম্পর্কীয় হাদিস ও অন্যবিধ প্রমাণের সাহায্যে সম্পূর্ণ বিষয়টি নবী বংশের মধ্যে ফিরে আসার প্রত্যাশা করতে আরম্ভ করল।

অতঃপর পরবর্তী সুফী সাধকদের নিকটেও বিষয়টি ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে দিব্যানুভূতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। তাঁদের অনেকের মুখ থেকে সাধারণভাবে অবতারবাদ ও সর্বাস্তিবাদ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ পেতে লাগল। এতে তাঁরা ইমামিয়া ও রাফেজী সম্প্রদায়ের ইমামদের অবতারত্ব ও ঐশ্বরিক ক্ষমতার অনুরূপ মতামতে অংশ গ্রহণ করলেন। তাঁরা 'কুতুব' ও 'আবদাল'[৩১৪] এর কথাও বললেন। এটা যেন রাফেজী সম্প্রদায়ের ইমাম ও নকিবেরই অনুরূপ। তাঁরা শিয়া মতামতের মধ্যে ডুবে গেলেন এবং তাঁদের ধর্মানুভূতিতে শিয়া আদর্শ গ্রহণ করে আতিশয্যের সৃষ্টি করলেন। এমন কি তাঁদের প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়ালো 'খিরকা' পরিধান করা। আলী (রাঃ) হাসান বসরীকে এটা পরিধান করিয়ে 'তরিকায়' স্থির থাকার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং এটা একটি প্রথারূপে তাঁদের উস্তাদদের অন্যতম জুনায়েদ[৩১৪*] থেকে তাদের নিকট এসে পৌঁছেছে। অথচ কোনো শুদ্ধ মতেই তা আলীর সাথে সংশ্লিষ্ট হবার কোনো কারণ নেই। কারণ এরূপ প্রথা শুধু আলী (রাঃ)-র জন্যই বিশিষ্ট কোনো কিছু ছিল না; বরং সাহাবীরা সকলেই সৎপথ প্রদর্শনের ব্যাপারে আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। সুতরাং তাঁদের সকলকে বাদ দিয়ে একমাত্র আলীর সাথে এর সংযুক্তির মধ্যে শিয়া মতবাদের গন্ধ বিদ্যমান। এটা থেকে ও অনুরূপ পূর্বে বর্ণিত বিষয়াদি থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, তারা শিয়া মতের অধীন হয়ে পড়েছিলেন এবং তার ধারা অনুসারে নিজেদেরকে সজ্জিত করে তুলেছিলেন।

তাঁদের মধ্য থেকে কুতুব সম্পর্কীয় ধারণাও প্রকাশ পেয়েছে। রাফেজী সম্প্রদায়ের ইসমাইলিয়া গোষ্ঠী ও পরবর্তী সুফী সাধকদের গ্রন্থাদিতে অনুরূপ ধারণার মতই প্রতীক্ষিত ফাতেমীর ধারণাও বিদ্যমান। তারা একে অপরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন এবং একে অপরের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। বস্তুত তা উভয় দলের মতো কতকগুলো অলীক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেক সময় অনেকে জ্যোতিষীদের সাদৃশ্যসূচক বিষয়াদি দিয়েও এ সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থিত করেন। তা এক ধরনের ভবিষ্যৎবাণী। এর পরবর্তী পরিচ্ছেদেই এ সম্পর্কে আলোচনা আসছে।

এ পরবর্তী সুফী সাধকদের মধ্যে যাঁরা সর্বাপেক্ষা অধিক ফাতেমীর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, তাঁরা হলেন ইবনে আরবি হাতেমী[৩১৫] তাঁর 'আনকা মুগরিব' নামক

৩১৪. কুতুব—ধ্রুব নক্ষত্র; অনুরূপ অমোঘ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং আবদাল—স্থলাভিসিক্ত অথবা ভ্রাম্যমাণ অলৌকিক পুরুষ।

৩১৪* জুনায়েদ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ২৯৮ (৯১১ খ্রি:) হি:।

৩১৫. প্রখ্যাত সুফি সাধক মুহম্মদ ইবনে আলী; ৫৬০-৬৩৮ (১১৬৫-১২৪০ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

গ্রন্থে; ইবনে কেসী[৩১৬], তাঁর খালউ নালাইন' নামক গ্রন্থে; আবদুল হক ইবনে সাবইন[৩১৭] এবং তার শিষ্য ইবনে আবু ওয়াতিল 'খাল্উ নালাইন' গ্রন্থের ব্যাখ্যায়। এ ব্যাপারে তাদের অধিকাংশ আলোচনাই প্রহেলিকা ও রূপকধর্মী। খুব অল্পই তাঁরা সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেছেন অথবা তাদের ব্যাখ্যাকাররা এরূপ সুস্পষ্টতার আশ্রয় নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাদের মতাদর্শের সার কথা, যা ইবনে আবু ওয়াতিল বর্ণনা করেছেন, তা এই যে, নব্যুয়তের দ্বারাই ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার পরে সত্য ও সৎপথ প্রকাশ পেয়ে থাকে। এর পর তাকে অনুসরণ করে খেলাফত এবং খেলাফতের শেষে দেখা দেয় রাজত্ব। এর ফলে আবার উৎপীড়ন, অহংকার ও মিথ্যা ফিরে আসে। তাঁরা বলেন, যেহেতু আল্লাহ্র বিধানে প্রচলিত প্রথা হল প্রতিটি বস্তুকে তার মূলের দিকে ফিরিয়ে আনা, সেজন্য নবুয়তের পুনরুজ্জীবন ও 'বেলায়েতে'র[৩১৮] সত্য প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। এর পর খেলাফত আসবে এবং তার পিছনে রাজশক্তি ও প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে মিথ্যা এসে উপস্থিত হবে। পুনরায় অধর্ম তার নিজ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। এই বক্তব্যের দ্বারা তারা নব্যুয়তের ব্যাপারে যা ঘটেছে এবং যেভাবে তার পর খেলাফত ও তার পর রাজত্ব দেখা দিয়েছে, তৎপ্রতি ইঙ্গিত করতে চান। এ তিনটি পর্যায়। অনুরূপভাবে উক্ত ফাতেমীর বেলায়েত, তার পশ্চাদ্বর্তী মিথ্যার দ্বারা তারা দজ্জালের আবির্ভাবকে বুঝিয়েছেন। এর পর অধর্ম দেখা দেবে। এ তিনটি পর্যায়ও পূর্ববর্তী তিনটি পর্যায়ের অনুরূপ।

তাঁরা বলেন, যেহেতু কোরায়েশদের খেলাফতের ব্যাপারটি ধর্মীয় বিধান অনুসারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থিত এবং স্বল্পজ্ঞান মানুষের দ্বারা তার অস্বীকার একান্তই তাৎপর্যহীন, সেজন্য ইমামতের ব্যাপারটিও নবী (সঃ)-এর সাথে বিশিষ্ট কোরায়েশ বংশের মধ্যেই হবে। তা হয় প্রকাশ্যে, যেমন আবদুল মুত্তালেবের বংশধর; না হয় গোপনে, যারা যথার্থ অর্থে বংশধারার পরিচয়বাহী। এক্ষেত্রে বংশ বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝাবে, যার উপস্থিতি উক্ত বংশের অনুপস্থিতিকে দূর করতে সক্ষম।

ইবনে আরবি হাতেমী তাঁর রচনাবলির মধ্যে 'আনকা মুগরিব'[৩১৯] নামক গ্রন্থে ফাতেমীকে 'খাতামুল আউলিয়া' নাম দিয়েছেন এবং ডাকনাম দিয়েছেন 'লেবনাতুল ফেদ্দা' বা রৌপ্য ইট। এর দ্বারা তিনি বোখারী কর্তৃক 'খাতামুন্নবীঈন'[৩২০] অধ্যায়ে একটি হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উক্ত হাদিসে নবী (সঃ) বলেছেন, পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে আমার তুলনা হল, যেমন এক ব্যক্তি একটি গৃহ তৈরি করে এমনভাবে শেষ করল যে, তাতে মাত্র একটি ইট ব্যবহারের স্থান অবশিষ্ট আছে; আমি সেই ইট। তাঁরা এ ইটের দ্বারা 'খাতামুন্নাবীঈনে'র ব্যাখ্যা করেন, যা একটি সৌধকে পূর্ণতা দান করে। এর অর্থ তিনি এমন একজন নবী, যার নব্যুয়ত পরিপূর্ণতার অধিকারী। তাঁরা এই নব্যুয়তের সাথে তুলনা করে বেলায়েতেরও পর্যায়গত পার্থক্য নির্দেশ করেন এবং

৩১৬. ৬৩১, পৃষ্ঠা ১০নং টীকা দ্র:।
৩১৭. আবদুল হক ইবনে ইব্রাহিম; ৬২৩/২৪-৬৬৯ (১২২৬/২৭-১২৭১ খ্রি:) হি:।
৩১৮. ওলীর মর্যাদা।
৩১৯. অদ্ভুত 'আনকা' বা কল্পিত অমর পক্ষী।
৩২০. নবীদেরকে অঙ্গুরীয় বা সীলমোহর—এই অর্থে শেষ নবী।

www.amarboi.org

এক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার অধিকারীকে 'খাতামুল আউলিয়া' বলে নামকরণ করেন। অর্থাৎ তিনি বেলায়েত সম্পূর্ণকারী মর্যাদার অধিকারী, যেমন 'খাতামুন্নাবীঈন' নবুয়্যত সম্পূর্ণকারীর মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এ কারণেই ধর্মপ্রবর্তক এ মর্যাদাকে উল্লেখিত হাদিসের মধ্যে গৃহ সম্পূর্ণকারী শেষ ইট বলে অভিহিত করেছেন। এক্ষেত্রে তারা একই ধরনের এবং তুলনার ক্ষেত্রেও তারা একই ইট তুল্য। অবশ্য এ দুটি মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য নবুয়্যতকে বলা হয়েছে স্বর্ণ ইট ও বেলায়েতকে রৌপ্য ইট। বস্তুত স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং তাঁরা স্বর্ণ ইট বলতে নবী (সঃ)-কে বোঝান এবং রৌপ্য ইট বলতে এই ওলী ফাতেমী প্রতীক্ষিতকে বোঝান। তিনি 'খাতামুন্নাবীঈন' এবং ইনি 'খাতামুল আউলিয়া'।

ইবনে আবু ওয়াতিলের বর্ণনা মতে ইবনে আরবি বলেছেন, ইনি প্রতীক্ষিত ইমাম, নবীর বংশধর ও ফাতেমার সন্তান। তাঁর আবির্ভাব হিজরি সনের 'খে-ফে-জিম' যাবার পর ঘটবে। তিনি তিনটি হরফ ব্যবহার করে 'আবজদ' হিসাব অনুসারে তার সংখ্যা ধরে নিয়েছেন। উপরে এক বিন্দুবিশিষ্ট 'খে'র সংখ্যা ছয়শ, ক্বাফের বোনদ 'ফে'র সংখ্যা আশি এবং নিচে এক বিন্দুবিশিষ্ট জিমের সংখ্যা তিন। সব মিলিয়ে ছয়শত তিরাশি হিজরি। হিজরি সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ। কিন্তু এ সময় কেটে গেলেও যখন আবির্ভাব ঘটল না, তখন তাদের অনুগামী কিছু সংখ্যক লোক বলতে লাগল যে, এটা তাঁর জন্ম বছর। তারা তাঁর জন্মকেই আবির্ভাব বলে ব্যাখ্যা করল এবং তাঁর আত্মপ্রকাশ সাতশ দশ হিজরিতে ঘটবে বলে প্রচার করল। কারণ ইনিই মাগরিব অঞ্চলের ইমাম হয়ে দেখা দিবেন।

ইবনে আবু ওয়াতিল বলেন, তাঁর জন্ম যেহেতু ইবনে আরবির ধারণা অনুসারে ছয়শ তিরাশি (১২৮৪-৮৫ খ্রি:) হিজরিতে হবে, সুতরাং ইমাম হিসাবে আত্মপ্রকাশের সময় তাঁর বয়স হবে ছাব্বিশ বছর। তিনি বলেন, তারা অনুমান করেন যে, দজ্জালের আত্মপ্রকাশ সাতশ তেতাল্লিশ মুহম্মদী দিনে ঘটবে। হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর তিরোধান থেকে তারা এ মুহম্মদী দিন গণনা আরম্ভ করেন এবং এটা হাজার বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত চলবে। ইবনে আবু ওয়াতিল তাঁর 'খালউ নালাইন' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেন, প্রতীক্ষিত ওলী, আল্লাহ্‌র দায়িত্ব বহনকারী, নির্দেশিত ব্যক্তি মুহম্মদ মেহেদী খাতামুল আউলিয়া। তিনি নবী নন; তিনি শুধু মাত্র ওলী। তাঁকে তাঁর আত্মা ও বন্ধু প্রেরণ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক জাতির জ্ঞানী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নবীর তুল্য। তিনি আরো বলেছেন, আমার জাতির জ্ঞানীরা বনি ইসরাইলের নবীদের সমতুল্য। তাঁর সুসংবাদ মুহম্মদী দিনের প্রথম থেকেই পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছিল। এবং পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত উক্ত দিনের অর্ধেককাল অবধি অব্যাহত ছিল। এর পর তা আরো দৃঢ় হয়েছে, উস্তাদগণের দ্বারা তাঁর আগমন নিকটবর্তী হয়েছে বলে সুসমাচার প্রদত্ত হয়েছে এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তার সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে দেখা দিয়েছে। ইবনে আবু ওয়াতিল বলেন, কিন্দী[৩২১] বর্ণনা করেছেন, ইনিই সেই ওলী, যিনি মানুষের সঙ্গে জোহরের নামাজ পড়বেন, ইসলামকে নতুন জীবন দিবেন, ন্যায়কে প্রকাশ করবেন,

৩২১. ১০৪ পৃষ্ঠা ৯০নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

আন্দালুস দ্বীপ জয় করবেন, রোমে পৌঁছে তা অধিকার করবেন, পূর্বদিকে গিয়ে তাও অধিকারে আনবেন, কনস্ট্যান্টিনপোল জয় করবেন এবং পৃথিবীর রাজস্ব তাঁর হবে। মুসলমানরা শক্তিশালী হবে, ইসলাম উন্নত হবে এবং সনাতন ধর্ম[৩২২] প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। জোহরের নামাজ থেকে আসরের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে নামাজের অক্ত আছে। তিনি (সঃ) বলেছেন, এ দুটির মাঝখানে অক্ত আছে। কিন্দী আরো বলেছেন, নোক্তাবিহীন আরবি হরফ অর্থাৎ যেগুলোর দ্বারা কোরানের বিভিন্ন সূরা আরম্ভ হয়েছে, সেগুলোর মোট সংখ্যা মান সাতশ তেতাল্লিশ এবং সাত দজ্জালী। অতঃপর আসরের নামাজের সময় ঈসা অবতীর্ণ হবেন। পৃথিবী শুদ্ধ হবে এবং বাঘের সাথে ছাগল চড়বে। তাঁর সাথে তাদের ইসলাম গ্রহণের পর অনারব সাম্রাজ্য একশ ষাট বছর স্থায়ী হবে। এটা নোক্তাবিশিষ্ট ক্বাফ-ইয়া-নুনের সংখ্যা মানের সমান। তন্মধ্যে চল্লিশ বছর হবে ন্যায়ের রাজত্ব। ইবনে আবু ওয়াতিল বলেন, তাঁর বাণীর মধ্যে 'মেহেদী ঈসা ভিন্ন অন্য কেউ নয়' বলে যে কথা আছে তার অর্থ হল, মেহেদীর সমান বেলায়েত ও হেদায়েতের শক্তি ঈসা ভিন্ন অন্য কারো হবে না। বলা হয়, এর অর্থ দোলনায় ঈসা ভিন্ন অন্য কথা বলবে না। এটা জুরাইহ ও অন্যদের হাদিস দ্বারা খণ্ডিত। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, তিনি বলেছেন এ ব্যাপার অনুরূপ থাকতে থাকতে কিয়ামত দেখা দিবে অথবা তাদের উপর বারজন খলিফা হবে অর্থাৎ কোরায়েশী। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তাঁদের অনেকে ইসলামের প্রথম দিকে ছিলেন এবং অনেকে শেষের দিকে হবেন। তিনি বলেছেন, আমার পরে খেলাফত ত্রিশ, একত্রিশ অথবা ছত্রিশ। তার শেষ হাসানের খেলাফতে এবং মাবিয়ার ক্ষমতালাভের প্রথম দিকে। সুতরাং মাবিয়ার প্রথম দিককার অবস্থা প্রাথমিক যুগের নামানুসারে খেলাফতের অন্তর্গত এবং তিনি ষষ্ঠ খলিফা। সপ্তম খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এবং অবশিষ্ট পাঁচজন তাঁরা নবী বংশের আলীর সন্তান। এটা তাঁর সেই বাণীর দ্বারা সমর্থিত, যাতে বলা হয়েছে অবশ্যই তুমি দুই প্রান্তের অধিকারী অর্থাৎ জাতির। তুমি তার প্রথম দিকে খলিফা হবে এবং তোমার বংশধর তার শেষের দিকে। অনেক সময় এর দ্বারা প্রত্যাবর্তনের মত পোষণকারীরাও প্রমাণ উপস্থিত করে। তাদের নিকট নির্দেশিত প্রথম ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের সময় আবির্ভূত হবে।

তিনি বলেছেন, পারস্য সম্রাট বিধ্বস্ত হলে তার পর আর পারস্য সম্রাট নেই এবং রোমান সম্রাট বিধ্বস্ত হলে তার পর আর রোমান সম্রাট নেই। আমার আত্মা যার হাতে, তাঁর শপথ, তোমরা তাদের ভাণ্ডার আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে। উমর ইবনে খাত্তাব পারস্য সম্রাটের ভাণ্ডার ব্যয় করেছেন এবং যিনি রোমান সম্রাটের ভাণ্ডার ব্যয় করবেন, তিনি হলেন এই প্রতীক্ষিত ব্যক্তি; কনস্টান্টিনপোল বিজয়ের সময় তা ঘটবে। তার নেতা অতি উত্তম নেতা এবং তার সৈন্যদল অতি উত্তম সৈন্যদল হবে। তিনি (সঃ) এরূপ বলেছেন, তার শাসনকাল বিজোড় সংখ্যক। বিজোড় সংখ্যা তিন থেকে নয়; বলা হয় দশ পর্যন্ত। চল্লিশের কথাও এসেছে; কোনো কোনো বর্ণনায় সত্তর। চল্লিশ বছর হল তাঁর ও তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্য থেকে তাঁর দায়িত্ব বহনকারী চারজন খলিফার

৩২২. মূল—'আদ্‌দীনুল হানিফিয়া'।

www.amarboi.org

সময়কাল। তাঁদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইবনে আবু ওয়াতিল বলেন, জোতিষীরা বর্ণনা করেছেন, তাঁর ও তাঁর বংশধরদের শাসনকাল একশ পঁচানব্বই বছর স্থায়ী হবে। সুতরাং উক্ত শাসন খেলাফত ও ন্যায়ের ভিত্তিতে চল্লিশ অথবা সত্তর বছর থাকবে। অতঃপর অবস্থার বৈচিত্র্য দেখা দিয়ে তা রাজত্বে পরিণত হবে। ইবনে আবু ওয়াতিলের বক্তব্য এখানে শেষ।

ইনি অন্যত্র বলেছেন, ইসার অবতরণ মুহম্মদী দিনের তিন চতুর্থাংশ অতিবাহিত হবার পর আসরের নামাজের সময় হবে। ইনি বলেন, ইয়াকুব ইবনে ইসহাক কিন্দী তাঁর 'কিতাবুল জিফার' নামক গ্রন্থে, যেখানে তিনি রাশি সংযোগের কথা বলেছেন, সেখানে আছে, এই সংযোগ যখন দোয়াদ-হে—এই দুই হরফের সংখ্যামান অর্থাৎ ছয়শ আটানব্বই হিজরির প্রথম দিকে মেষ রাশিতে পৌঁছবে, তখন মসিহ্ অবতীর্ণ হবেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছামতো পৃথিবী শাসন করবেন। ইনি বলেন, হাদিসে এসেছে ঈসা দামেশকের পূর্বদিকে সাদা মিনারের নিকটে অবতরণ করবেন। তিনি দুই হলুদ বর্ণ বিশিষ্টের মাঝখানে অবতরণ করবেন। অর্থাৎ জাফরানী-হলুদবর্ণের দুটি পোশাক এবং তাঁর দুইহাত দুইজন ফেরেশতার কাঁধে ন্যস্ত থাকবে। তাঁর চুল লম্বা হবে; যেন তিনি কোনো গর্ত থেকে বের হয়ে এসেছেন। তিনি যখন মাথা নত করবেন, বৃষ্টি পড়বে এবং মাথা উন্নত করলে মোতির ন্যায় মণিমানিক্য ঝরবে। তাঁর মুখমণ্ডলে বহু তিলের দাগ থাকবে। অন্য এক হাদিসে আছে, দৃঢ় গঠন এবং সাদা লাল। অন্য একটি হাদিসে, তিনি 'গরব'-এ বিবাহ করবেন। 'গরব'-এর অর্থ বেদুইনদের এক প্রকার বালতি। অর্থাৎ তিনি বেদুইনদের মধ্যে বিবাহ করবেন এবং তাঁর স্ত্রী সন্তান প্রসব করবে। চল্লিশ বছর পরে তাঁর মৃত্যুর কথা বর্ণনা করেছেন। বলা হয়, সা মদিনায় মৃত্যুমুখে পতিত হবেন এবং উমর ইবনে খাত্তাবের পার্শ্বে তাঁকে কবরস্থ করা হবে। আবু বকর ও উমর দুইজন নবীর মাঝখানে পুনরুত্থিত হবেন।

ইবনে আবু ওয়াতিল বলেন, শিয়ারা বলে, ইনিই মসিহ্, মুহম্মদী বংশের মসিহ্‌দের মসিহ্।[৩২৩] আমি বললাম, অনেক সুফী সাধক এর উপরই সেই হাদিসটি—মেহেদী ঈসা ভিন্ন অন্য কেউ নয়—কে দাঁড় করিয়েছেন। অর্থাৎ সেই মেহেদী ব্যতীত অন্য কোনো মেহেদী হবে না, মুহম্মদী ধর্মবিধানের ব্যতিক্রমহীন যথাযথ অনুসরণের ক্ষেত্রে যাকে মুসাই ধর্মবিধানে আগত ঈসার সাথে তুলনা করা যায়।

এইপ্রকার ও অনুরূপ এমন বহু কথা আছে, যদ্দারা তারা নির্দিষ্ট সময়, ব্যক্তি ও স্থান নির্দেশ করে। এসব ব্যাপারে তাদের ব্যবহৃত প্রমাণাদি ভিত্তিহীন ও স্বকপোলকল্পিত। এ কারণে সময় অতিবাহিত হয়, কিন্তু তার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। আবার তারা আভিধানিক অর্থের পরিবর্তন করে কাল্পনিক বিষয় যোগ দিয়ে তাদের মতামত নবায়নে প্রয়াসী হয়। পাঠক, আপনি অবশ্যই তা লক্ষ করেছেন।

---

৩২৩. এ বর্ণনা হতে বিষয়টি আরো বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়েছে অর্থাৎ ঈসা, মসিহ, ফাতেমী, মেহেদী সবগুলো তালগোল পাকিয়ে গেছে। অন্যদিকে এ স্থলে ঈসা অর্থে যীশুখ্রিস্ট নয় (রোজেনথাল ২য় খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা ৯৪৭নং টীকা দ্র:)।

www.amarboi.org

যে সকল সুফীসাধক আমাদের সমসাময়িককালে বিদ্যমান, তাঁদের অধিকাংশই এমন এক সংস্কারকের আত্মপ্রকাশের কথা বলেন, যিনি ধর্মীয় বিধানের প্রতিষ্ঠা ও সত্যের উদ্ধার সাধন করবেন। তাঁরা তাঁর আবির্ভাবকে আমাদের যুগের নিকটবর্তী সময়েই নির্ধারিত করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে বলেন, তিনি ফাতেমার সন্তান হবেন এবং অনেকে এমন নির্দিষ্ট কিছু বলেন না। আমরা তাঁদের একটি দল থেকে অনুরূপ কথা শুনেছি এবং তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান হলেন মাগরিবের ওলীশ্রেষ্ঠ আবু ইয়াকুব বাদেসী। তিনি এই হিজরি অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। তাঁর কথা আমাকে আমার সঙ্গী ও তাঁর পৌত্র আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া শুনিয়েছেন। ইনি তাঁর পিতা আবু মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ থেকে তাঁর পিতা উপরোক্ত ওলী আবু ইয়াকুবের কথা বর্ণনা করেছেন।

এটাই, শেষ পর্যন্ত, পাঠক, সুফীসাধকদের বক্তব্য সম্পর্কে যা আমরা জানতে পেরেছি বা যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হাদিস বর্ণনাকারীরা মেহেদী সম্পর্কীয় যে সকল সংবাদ দিয়েছেন, তাও আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে তুলে ধরেছি। পাঠক এ পরিপ্রেক্ষিতে যে সত্য আপনার নিকট প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, তা এই যে, ধর্মই বলুন আর রাজ্যই বলুন গোত্রপ্রীতির শৌর্য ব্যতীত তাদের কোনোটার প্রচারণাই পরিপূর্ণতা লাভ করে না। কেবলমাত্র ঐ শক্তিই একে প্রকাশ করে, তার বিরোধী শক্তিকে প্রতিরোধ করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে তাকে পূর্ণতা দান করতে সক্ষম।

ইতিপূর্বে আমরা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা যথাস্থানে পাঠক, আপনার সম্মুখে ঐ শক্তির কথা প্রতিষ্ঠিত করেছি। ফাতেমীদের গোত্রপ্রীতি এমনকি সমগ্র কোরায়েশের গোত্রপ্রীতি পৃথিবীর সর্বস্থান থেকে নির্মূল হয়ে গেছে। অন্যান্য জাতির গোত্রপ্রীতি কোরায়েশের অনুরূপ শক্তির উপর মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অবশ্য হেজাজের মক্কায় ও মদিনায় এখনও তার সামান্য অংশ বিদ্যমান। আবু তালেবের বংশধর বনি হাসান, বনি হোসাইন, বনি জাফর[৩২৪] প্রমুখ বেদুইনরা ঐ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে এবং তার উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। তারা যথার্থই বেদুইন গোত্রপ্রীতির অধিকারী; তাদের স্বভাব অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে, বিচিত্র নেতৃত্বে ও বিচ্ছিন্ন মতবাদে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। তাদের সংখ্যা অত্যধিক কয়েক সহস্র হবে। সুতরাং উক্ত মেহেদীর আবির্ভাব যদি সত্য হয়, তা হলে তা একমাত্র তাঁদের মধ্যেই হতে পারে। আল্লাহ্ তাদের অন্তঃকরণে সম্প্রীতি স্থাপন করে তাঁর অনুসরণে তাদেরকে সেই গোত্রপ্রীতির অধিকারী করবেন, যার শক্তিতে তাঁর বাণীর প্রচার ও মানুষকে তৎপ্রতি আকর্ষণ করার কাজে পূর্ণতালাভ করতে পারে। কিন্তু এটা ব্যতীত শুধু কোনো ফাতেমীয় আবির্ভূত হয়ে মানুষকে আহ্বান করা অর্থহীন। কেননা নবীবংশের হলেও গোত্রপ্রীতি ও শৌর্যহীন এ ব্যক্তির পক্ষে কোনো কার্যই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আমরা পূর্বে যে সকল বিশুদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে তা একান্তই অবাস্তব।

জনসাধারণ ও নির্বোধ শ্রেণীর লোকেরা যা দাবি করে, তা ঐ পর্যায়ের নয়, যাতে কোনো প্রকার বুদ্ধির পরিচয় ও জ্ঞানের অভিজ্ঞতা আছে। তারা এ ব্যাপারে

---

৩২৪. হজরত আলীর ভ্রাতা জাফরের বংশধর।

www.amarboi.org

কোনোপ্রকার স্থান ও কালের নির্দেশ ব্যতীতই সাধারণ ধারণা পোষণ করে মাত্র। তা ফাতেমীর আত্মপ্রকাশ সম্পর্কীয় প্রচারণার ফলশ্রুতি; তারা এর অধিক কোনো তাৎপর্য সম্পর্কে অনবহিত, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সকল দেশে ও দিকে তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে নির্দেশ করে; যেমন আফ্রিকিয়ার যাব ও মাগরিবের সুস অঞ্চল। অনেক অদূরদর্শী লোককে মাসায়[৩২৫] অবস্থিত তীর্থস্থানে যেতে দেখেছি। উক্ত তীর্থটি মাগরিবের আবৃত বেদুইনদের অন্তর্গত কুদালা গোত্রের সন্নিকটবর্তী। তাদের ধারণা ফাতেমী তাদের মধ্যে আসবে এবং তাদের জন্য দাবি উত্থাপন করবে। অবশ্য তাদের ধারণার কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। শুধু মাত্র ঐ গোত্রগুলোর অভিনব জীবন-যাপন, তাদের প্রকৃত অবস্থা জানার উপায়হীনতাই এর জন্ম দিয়েছে। কারণ তাদের সংখ্যার আধিক্য বা অল্পতা, তাদের শক্তির প্রাবল্য ও দুর্বলতা কোনো কিছুই সঠিকভাবে জানা যায় না। কোনো প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের আয়ত্তে ও শক্তি বিন্যাসের মধ্যে তারা ধরা পড়ে না। সুতরাং তাদের ধারণায় এই সব গোত্রের মধ্যেই ফাতেমীর আবির্ভাবের নিশ্চয়তা সর্বাধিক। কারণ এদের সাহায্যে তিনি অতি সহজেই সাম্রাজ্যের অধীনতা ও তার কঠোর শাসন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবেন। কিন্তু এরূপ একটি সম্ভাবনা ছাড়া এ ধারণার আর কোনো ফলশ্রুতি তাদের মধ্যেও দেখা যায় না। কখনো উক্তস্থানে অনেক নির্বোধ এ উদ্দেশ্য নিয়েও যায় যে, তারা ঐ ধারণার সাহায্য নিয়ে নিজেদেরকে ফাতেমী হিসাবে চালিয়ে দেবে। কিন্তু এটা একান্তই দুরভিসন্ধি ও নির্বুদ্ধিতা। এর ফলে অনুরূপ অনেক ব্যক্তিই নিহত হয়েছে।

আমাদের ওস্তাদ মুহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আবেলী বলেছেন, অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে সুলতান ইউসুফ ইবনে ইয়াকুবের[৩২৬] সময়ে সুফী সাধক এক ব্যক্তি দাবি উত্থাপন করেছিল যে, সেই প্রতিক্ষিত ফাতেমী। তোজরা নামক স্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে তাকে 'তোয়ায়জুরী' বলা হত। সুসবাসী বহুলোক, দ্বালা ও কাযোলা গোত্রের অনেকেই তাকে অনুসরণ করতে লাগল এবং তার ব্যাপারটি ক্রমশ বড় হয়ে দাঁড়ালো। মাসমুদা গোত্রের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং সাকসবী তাকে হত্যার জন্য একজন লোক নিয়োগ করলে, সে রাত্রে গোপনে তাকে হত্যা করল। এই সঙ্গে তার দাবিরও ইতি হল।

অনুরূপভাবে সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকের নয় দশকে গামারায় আব্বাস নামে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে দাবি করল যে, সেই ফাতেমী। গামারায় সাধারণ মানুষ তাকে অনুসরণ করল। যে জোরপূর্বক ফাস-এ প্রবেশ করে তার বাজার জ্বালিয়ে দিল এবং মাজাম্মা অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে তাকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করা হয় এবং তার কাজ অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এই ধরনের বহু কাহিনী বিদ্যমান।

আমাদের পূর্বোল্লেখিত ওস্তাদ এ প্রসঙ্গে এ অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়েছেন। তিলমিশানের উপর ছায়া বিস্তারকারী পর্বতে শায়খ আবু মাদায়েনের[৩২৭] সমাধিস্থলে

---

৩২৫. ১৮৮ পৃষ্ঠা দ্র:।

৩২৬. মারনী সম্রাট; ১২৮৬-১৩০৭ খ্রি:।

৩২৭. মৃত্যুকালে ৫৯৪ (১২৯৮ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

'রাবাতুল উব্বাদ' নামে যে তীর্থস্থান আছে, হজে যাবার সময় তিনি সেখানে কারবালার অধিকারী নবীবংশীয় এক ব্যক্তির সাথী হয়েছিলেন। এ ব্যক্তির অনুগামীর সংখ্যা অনেক, বহু ছাত্র ও সেবক ছিল। তাঁর জন্মস্থানের অধিবাসীরা বিভিন্ন দেশে যাবার জন্য তাঁর খরচ বহন করত। ওস্তাদ বলেন, রাস্তায় তাদের সাথে আমার অবস্থান আরো ঘনিষ্ঠ হল এবং আমি তাদের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারলাম। তারা করবালার বাসস্থান ত্যাগ করে একমাত্র এ উদ্দেশ্যে ফাতেমীর মতবাদ প্রচারের জন্য মাগরিবে এসেছে। পরে তারা বনি মারিন সাম্রাজ্য ও ইউসুফ ইবনে ইয়াকুবের তৎকালীন তিলমিসানে অবস্থান দেখে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং উক্ত ব্যক্তি তাঁর সাক্ষীদিগকে লক্ষ করে বলেন, ফিরে চল; আমাদের ভুল প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এটা আমাদের উপযোগী সময় নয়। এ ব্যক্তির উক্ত কথা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, তিনি সময়োপযোগী গোত্রপ্রীতি ছাড়া যে অনুরূপ কাজ সম্পন্ন হবার নয়, তা বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং তিনি যখন দেখলেন যে তিনি এ স্থানে একান্তই অপরিচিত, তার শৌর্য বলতে কিছু নেই এবং বনি মারিনের গোত্রপ্রীতির সমতুল্য কোনো শক্তি মাগরিবে করো মধ্যে দেখা যায় না, তিনি দমে গেলেন ও তাঁর লোভ ত্যাগ করে সত্যের দিকে ফিরে আসলেন। এখন শুধু একটি বিশ্বাসই তাঁর মধ্যে উৎপন্ন হতে বাকি আছে, তা এই যে, ফাতেমী ও কোরায়েশদের গোত্রপ্রীতির আর সুদিন নেই; বিশেষ করে মাগরিবে তা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু তাঁর দাবির প্রতি তাঁর গোঁড়ামি হয়তো এ কথা বুঝতে সুযোগ দিবে না। 'আল্লাহ্ই জানেন এবং তোমরা জান না।'[৩২৮]

মাগরিবে সাম্প্রতিককালে সত্য ও ধর্মীয় জীবন প্রতিষ্ঠার প্রতি আহ্বান জানানোর একটা ধারা লক্ষ করা গেছে তাঁরা এ কাজে উদ্বুদ্ধ হন, তাঁরা ফাতেমী বা অন্য কারো সাথে একে যুক্ত করেন না। তাঁদের প্রত্যেকেই এককভাবে সময়ে সময়ে ধর্মীয় জীবন প্রতিষ্ঠা ও অধর্ম নাশের জন্য এগিয়ে আসেন। তারা এটা নিয়ে প্রচেষ্টা চালান ও তাদের অনুসারীর দল বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা রাস্তাঘাট নিরাপদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কারণ আরব বেদুইনদের অধিকাংশই এর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করায় নিয়োজিত। যেমন আমরা তাদের জীবিকা অন্বেষণের ব্যাপারে পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং তারা যতদূর সম্ভব এ অন্যায়কে দূর করতে চেষ্টা করেন। অবশ্য এতে তাদের মধ্যে ধার্মিকতার কোনো অনুভূতি দৃঢ়তা লাভ করে না। কারণ আরব বেদুইনদের অনুশোচনা ও ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থ হল লুটপাট ও ডাকাতি বন্ধ করা। বস্তুত তারা তাদের অনুশোচনা ও ধর্মে সুমতির ব্যাপারে এর অধিক কিছু বুঝতে সক্ষম নয়। কেননা এটাই তাদের একমাত্র পাপ, ধার্মিকতার পূর্বে যাতে তারা অবস্থান করছিল এবং এর জন্যই তাদের অনুশোচনা। এ জন্যই পাঠক, আপনি দেখতে পাবেন যে, এ সকল আপাত দৃশ্যমান ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্গাতাদেরকে যারা অনুসরণ করে, তারা ধর্মীয় আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যে তেমন কোনো গভীরতা লাভ করতে সমর্থ হয় না। গোলযোগ, ডাকাতি ও পথঘাট অসুবিধা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকা বা রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। এর পর সাধ্যানুসারে তারা জীবিকা অর্জন ও পার্থিব সম্পদ আহরণের দিকেই দৃষ্টি দেয়। মানুষের ধর্মীয় জীবনে অনুপ্রাণিত করার পুণ্য এবং এ পার্থিব সম্পদের মধ্যে কতই না

৩২৮. কোরান, ২, ২১৬; ২৩২; ৩, ৬৬; ২৪, ১৯।

www.amarboi.org

পার্থক্য! এ দুটি বিষয়কে কিছুতেই একত্র করা যায় না। এ জন্যই যেহেতু তাদের মধ্যে ধার্মিকতার অনুভূতি দৃঢ়তা লাভ করে না, সেই কারণে মিথ্যার প্রলোভন থেকে তাদের সার্বিক মুক্তিও সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর অধিক কিছু করারও কথাই ওঠে না।

তদুপরি এরূপ ধর্মপ্রচারকারীদের নিজেদের মধ্যেও ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মীয় মর্যাদার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাদের মৃত্যু হলে এ বিষয়টিও সেই সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের সম্প্রদায়গত সম্প্রীতির কোনো চিহ্ন থাকে না। আফ্রিকিয়ায় সপ্তম শতাব্দীতে সুলাইমের অন্তর্গত কাব গোত্রের কাসেম ইবনে মুর্রা ইবনে আহমদ নামক এক ব্যক্তির ব্যাপারে অনুরূপ অবস্থা দেখা গেছে। তার পরে অন্য এক ব্যক্তিরও অনুরূপ অবস্থা হয়েছে। সে রিয়াহ্ বেদুইনদের একটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং তার নাম মুসাল্লাম। তাকে সাআদা বলে ডাকা হত। সে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিকতর ধার্মিক ও নিজের মতাদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তার অনুসারীদের অবস্থা সুবিধাজনক হয়নি, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। যাহোক সুলাইম ও রিয়াহ গোত্রের ইতিহাস বর্ণনার সময় যথাস্থানে এর আলোচনা আসবে।

এর পরও মানুষ অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মপ্রচারে নেমেছে। তারা তাকে গোলমাল করে ধর্মীয় জীবন সংগ্রাম নাম দিয়েছে; কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশেরই এ উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি ছিল না। সুতরাং তাদের নিজেদের এবং পরবর্তী অনুসারীদের কারো আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। শেষ।

www.amarboi.org

চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্য ও জাতি সম্পর্কে পূর্বাভাস এবং তদন্তর্গত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা ও দিব্যজ্ঞান সম্পর্কে রহস্যোদ্‌ঘাটন]

জেনে রাখুন, মানব প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হল তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের পরিণাম সম্পর্কে আগ্রহী হওয়া এবং জীবন, মৃত্যু, ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে ভবিষ্যতে যা ঘটবে, তা জেনে নেয়া। বিশেষ করে সাধারণ ঘটনাবলি, যেমন পৃথিবীর আয়ু কত দিন আছে, কোন্ সাম্রাজ্য কত দিন টিকবে এবং তাদের বয়সের পার্থক্যই বা কত দিন! বস্তুত এ প্রকার বিষয়াদি জানার আগ্রহ মানুষের সহজাত। সম্ভবত এ কারণেই বহু লোককে দেখা যায়, তারা স্বপ্নের মাধ্যমেও এ সমস্ত বিষয় জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। দৈবজ্ঞদের প্রদত্ত সংবাদের মাধ্যমেও এ সমস্ত বিষয় জানার আগ্রহ সম্রাট থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের নিকট পরিচিত। নগরগুলোতে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যারা এ পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে। কারণ তারা জানে যে, মানুষ ভবিষ্যৎ জানার জন্য খুবই উৎসুক। সুতরাং তারা রাস্তার ধারে ও দোকানে আসর জমিয়ে অপেক্ষা করে এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদেরকে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। সকাল-সন্ধ্যা তাদের নিকট নগরের স্ত্রীলোক; বালক ও নির্বোধ শ্রেণীর লোকেরা তাদের সর্বকর্মের পরিণাম জানার জন্য ভিড় জমায়। তারা তাদেরকে জীবিকা, সম্পদ, জীবন, দাম্পত্য সম্পর্ক, শত্রুতা ও এ প্রকারের আরো বহু বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয়। এ পেশার মধ্যে যারা বালুকা লিখন পদ্ধতির সাহায্য নেয়, তাদেরকে বলা হয় জ্যোতিষী; যারা নুড়ি ও শস্য চালনার সাহায্য নেয়, তারা গণক এবং যারা দর্পণ ও জলে দৃষ্টিপাতের সাহায্য নেয়, তারা 'মাণ্ডলিক'। এ পেশাটি নগর/পল্লীতে বিস্তৃত গর্হিত কার্যাদির অন্যতম। এ কারণে ধর্মীয় বিধানে এর নিন্দা করা হয়েছে। মানুষ সাধারণভাবে অদৃশ্যের সংবাদ জানতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ্ যদি স্বপ্নে বা জাগরণে তা জানার ক্ষমতা কাউকেও দান করেন, তা হলে স্বতন্ত্র কথা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাঁরা এ পেশার সাহায্য গ্রহণ করেন ও তৎসম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তাঁরা হলেন রাজন্যবর্গ ও আমীর-উমরাহগণ। তাঁরা তাদের সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল জানতে চান। এ জন্যই জ্ঞানীদের দৃষ্টিও এ বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এ সম্পর্কে দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী ও সাধকদের বাণী বিদ্যমান। তাঁরা কোন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা আসন্ন, কোন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, কার সাথে যুদ্ধ ও ঝগড়ার সূত্রপাত হবে, কোন রাজ্য কতদিন টিকবে, কতজন রাজা হবেন এবং যতদূর সম্ভব তাদের নাম পর্যন্ত বলে দিতে চেষ্টা করেন। এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীকে বলা হয় 'পূর্বাভাস।'

www.amarboi.org

আরবে বহু দৈবজ্ঞ ও ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল, বেদুইনরা বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য তাদের শরণাপন্ন হত। তারা আরবের আশু রাজশক্তির উদ্ভব ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অনেক সংবাদ দিয়েছে। যেমন ইয়ামেনের সম্রাট রাবেয়া ইবনে নসরের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিল শক্ব ও সাতিহ। তারা বলেছেন, হাবশীরা তাঁর রাজ্য দখল করবে এবং পুনরায় তা তাদের নিকট ফিরে আসবে। এর পর আরবদের রাজশক্তি ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে। এরূপ সাতিহ মোবেজানের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিল। পারস্য সম্রাট খসরু এ ব্যাপারে তার নিকট আবদুল মসিহকে পাঠিয়েছিলেন। সে বলেছিল যে, অচিরেই আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এরূপ বারবার গোত্রের মধ্যেও দৈবজ্ঞ ছিল। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল বনি ইয়াফরানের মুসা ইবনে সালেহ। অনেকে বলে সে গামারার অন্তর্ভুক্ত। তাদের বাগ্‌ধারায় কবিতার আকারে তার বহু বাণী বিদ্যমান। এগুলোতে বহু বিষয়ের পূর্বাভাস আছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল মাগরিবে জানাতা গোত্রের রাজশক্তি ও সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া। তার এ সকল বাণী গোত্রগুলোতে খুবই প্রচলিত। তারা অনেক সময় বলে যে, তিনি ওলী ছিলেন; অনেক সময় বলে, দৈবজ্ঞ; আবার অনেক সময় তাদের মধ্যে এমন ধারণাও দেখা যায় যে, তিনি নবী। কারণ তাঁর জীবনকাল তাদের মতে হিজরতের বহু পূর্বেকার ব্যাপার। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

কখনো কোনো গোত্র এ ব্যাপারে নবীদের সংবাদ প্রদান দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করে। কারণ অনেক নবীই অনুরূপ সংবাদ দিয়েছেন। যেমন বনি ইসরাইলের মধ্যে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আগত নবীরা জিজ্ঞাসিত হলে অনুরূপ বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করতেন।

ইসলামী সাম্রাজ্যে এ প্রকার সংবাদের প্রাচুর্য রয়েছে। অবশ্য তার মধ্যে অনেকগুলো সাধারণভাবে পৃথিবীর বয়স ও তার স্থিতিকাল সম্পর্কীয় এবং অনেকগুলো বিশেষভাবে কোনো সাম্রাজ্য ও তার বয়সের ব্যাপারে। ইসলামের প্রথম দিকে এ ব্যাপারে সাহাবীদের নিকট থেকে বর্ণিত হাদিসের উপর নির্ভর করা হত। বিশেষ করে বনি ইসরাইল থেকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীরা; যেমন কাব আল-আহবার, ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ ও তাদের অনুরূপ। অনেক সময় বর্ণিত বিষয়গুলোর সাধারণ অর্থ ও তাদের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা থেকেও এ বিষয়ের উপাদান সংগ্রহ করা হত।

জাফর ও অন্যান্য নবী বংশীয়দের অনেক বাণী ও ঘটনা বিদ্যমান যারা তারা এই পেশার ভিত্তি নির্ধারণ করে। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন, দিব্যানুভূতির ব্যাপারটিত তাঁদের ওলী হওয়ার সাথে যুক্ত। কারণ এ ধরনের ব্যাপার তাঁদের পরবর্তী বংশাবলি ও অন্যান্য লোকের মধ্যেও ছিল এবং তাদের ওলী হওয়া সম্পর্কে অস্বীকারের কোনো কারণ নেই। তিনি (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে পূর্বাভাস দানকারী আছে। সুতরাং তৎবংশীয়রা এ মহান মর্যাদা ও দিব্যবিভূতি লাভের জন্য অধিকতর যোগ্য। অবশ্য জাতির প্রাথমিক অবস্থা অতিবাহিত হবার পর মানুষ যখন জ্ঞানবিজ্ঞান ও পরিভাষা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করল এবং দার্শনিকদের পুস্তকাবলি আরবি ভাষায় অনূদিত হল, তখন এ ব্যাপারে অধিকাংশ লোক জ্যোতিষীদের বাণীর উপর নির্ভর করত। তারা রাজশক্তি, সাম্রাজ্য, রাশি সংযোগের অধীন অন্যান্য সাধারণ বিষয় এবং জন্ম, অন্যান্য প্রশ্ন, রাশির উদয়ের

www.amarboi.org

সাথে বিশেষভাবে জড়িত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আকাশমণ্ডলের অবস্থান অনুযায়ী সংবাদ প্রদান করত। আমরা এখন মহাজন বাণীর ব্যাপারটি আলোচনা করব এবং পরে যথারীতি জ্যোতিষীদের বিষয় আলোচনায় ফিরে আসব।

পৃথিবীর বয়স ও বিভিন্ন জাতির আয়ুষ্কাল সম্পর্কে মহাজন বাণী, যা সুহায়লীর গ্রন্থে তাবারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা এই যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে পৃথিবী মাত্র পাঁচশ বছর স্থায়ী হবে। কিন্তু এটা মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে তাবারীর ভিত্তি হল ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত একটি বাণী পৃথিবী পারলৌকিক সপ্তাহগুলোর মধ্যে একটি সপ্তাহ মাত্র। কিন্তু তাবারী এর কোনো প্রমাণ বর্ণনা করেননি। এর তত্ত্ব আল্লাহ্ই ভালো জানেন, সম্ভবত এই যে, পৃথিবীকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির সময় অনুসারে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ঐ সময়ের পরিমাণ হল সাত দিন এবং প্রতি দিনের দৈর্ঘ এক সহস্র বছর। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমার প্রভুর নিকট একটি দিন তোমাদের গণনার এক সহস্র বছরের তুল্য।[৩২৯] তাবারী বলেন বিশুদ্ধ সংকলনদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, পূর্ববর্তীদের তুলনায় তোমাদের আয়ুষ্কাল আসরের নামাজ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তিনি (সঃ) বলেছেন, প্রেরিত আমি ও মহাপ্রলয় এরূপ—তিনি তর্জনী ও মধ্যমার দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। আসরের নামাজ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ, যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় প্রায় এক সপ্তমাংশের অর্ধেক এবং তর্জনী ও মধ্যমার পার্থক্যও অনুরূপ। সুতরাং উক্ত সময় সপ্তাহের এক-সপ্তমাংশের অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচশ বছর হবে।[৩৩০]

এ পরিমাণ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এ বাণীর দ্বারাও সমর্থিত হয়; তিনি বলেন, আল্লাহ্ এ উম্মতকে অর্ধেক দিন স্থায়ী করতে অসমর্থ নয়। এতে প্রমাণ হয় যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীর বয়স পাঁচ হাজার পাঁচশ বছর। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা পাঁচ হাজার ছয়শ বছর অর্থাৎ অতীত কাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, পৃথিবীর সাকুল্য সময় ছয় হাজার বছর[৩৩১] সুহায়লী বলেন, হাদিস দুটিতে তাদের বর্ণনা অনুসারে কোনো বিষয়ের কোনো প্রমাণ নেই। কারণ বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত।

রসূলুল্লাহ্র সেই বাণী—আল্লাহ্ এ উম্মতকে অর্ধেক দিন স্থায়ী করতে অসমর্থ নয়—এতেই অর্ধেকের বেশি স্থায়ী হবার সম্ভাবনা নষ্ট হয় না। রসূলুল্লাহ্র বাণী—প্রেরিত আমি ও মহাপ্রলয় এরূপ—এতে উভয়ের নৈকট্যই বোঝাচ্ছে। অন্যদিকে তাঁর ও প্রলয়ের মাঝখানে অন্য কোনো নবী নেই এবং তাঁর ধর্মীয় বিধান ভিন্ন অন্য কোনো বিধান নেই।

অতঃপর সুহায়লী এ উম্মতের আয়ুষ্কাল নির্ধারণের জন্য অন্য একটি উপলব্ধির দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা যদি তাতে যথার্থ কিছু পাওয়া যায়। তা এই যে, তিনি কোরানের বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভের বিভিন্ন বর্ণমালাকে দ্বিরুক্তি বাদ দিয়ে একত্র করেছেন। তিনি বলেন, তা চৌদ্দটি বর্ণ এ সকল শব্দাবলিতে একত্র হয়েছে : আলম, ইস্তাআ, নস,

---

৩২৯. কোরান, ২২, ৪৭।

৩৩০. একদিন—এক হাজার বছর; তার অর্ধেক পাঁচশ বছর।

৩৩১. বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক উল্লেখিত বছরের সংখ্যা নিম্নরূপ হবে—ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ৬,৫০০; মুনাব্বিহ—৬, ৬০০ এবং কাব—৭,০০০ বছর।

www.amarboi.org

হ্বক্ব ও করহ। অতঃপর আবজাদের হিসাব অনুসারে এদের সংখ্যামান গ্রহণ করেছেন। এতে সাতশ তিন হয়েছে[৩৩২] এবং এর সাথে সহস্রাব্দের অবশিষ্ট বছরগুলো রসূলুল্লাহ্র আবির্ভাবের পূর্ববর্তীকাল থেকে যোগ করা হয়েছে। এটাই ইসলামের আয়ুষ্কাল। সুহায়লী বলেন, এ বর্ণমালার মধ্যে এরূপ একটি ইঙ্গিত থাকা তাদের অস্তিত্বের উপযোগিতার দিক থেকে অসম্ভব বলে মনে হয় না। আমি (গ্রন্থকার) বলি এ 'অসম্ভব মনে হয় না' কথাটি থেকে বোঝা যায়, এ বর্ণমালা অনুরূপ কোনো ইঙ্গিতের জন্য নয় এবং তাদের অনুরূপ ব্যাখ্যার অধীন করাও সমীচীন হতে পারে না।

এ ব্যাপারে যে বিষয়টি সুহায়লীকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, তা হল ইবনে ইসহাক কর্তৃক 'কিতাব্স্সিয়রে' বর্ণিত ইহুদি রাব্বি আখতাবের দুই পুত্রের ঘটনা। উক্ত দুই পুত্রের নাম আবু ইয়াসের ও তার ভাই হাই। তারা কোরানের বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার মধ্যে 'আলিফলামমিম'-এর কথা শুনতে পেয়ে আবজদের হিসাবে তাদের সংখ্যামান নির্ণয় করে ইসলামের আয়ুষ্কাল বলে ব্যাখ্যা করল। এতে মোট একাত্তর হল। তারা একে খুব কম সময় মনে করে হাই নবী (সঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, এ প্রকার আরো বর্ণ আছে? তিনি উত্তরে বললেন, আলিফ লাম মিম সোয়াদ। এর পর বর্ধিত করলেন, আলিফ লাম র। এর পর বর্ধিত করলেন, আলিফ লাম মিম রা। এর ফলে একাত্তর ও দুইশ হল এবং আয়ুষ্কাল বেড়ে গেল। হাই বলল, হে মুহম্মদ! আপনার বিষয়টি আমাদের কাছে কেমন দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে! আমরা বুঝতে পারছি না, আপনাকে কি বেশি দেয়া হয়েছে অথবা কম! অতঃপর তারা চলে গেল। আবু ইয়াসের তাদেরকে বলল, হয়তো তোমরা বুঝতে পারনি তাঁকে সংখ্যার সম্পূর্ণটাই দেয়া হয়েছে; তা নয়শ চার বছর[৩৩৩] ইবনে ইসহাক বলেন, এর পর আল্লাহ্র বাণী অবতীর্ণ হল—তার মধ্যে সুবোধ্য শ্লোকসমূহ বিদ্যমান, তাই গ্রন্থজনীন এবং অন্যগুলো দ্ব্যর্থবোধক।[৩৩৪] শেষ।

এই ঘটনা থেকে অনুরূপ সংখ্যা দ্বারা ধর্মের স্থায়িত্বের কোনো সময় নির্ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ এ বর্ণমালার দ্বারা স্বভাব বা যুক্তি কোনো দিক থেকেই সংখ্যা বোঝায় না। এটা একমাত্র এগুলোর আবজদের হিসাবের ধারায় গণনার মধ্যে ধরে নিতে এরূপ কিছু একটা হতে পারে। আবজদের হিসাবটি সুপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন; এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো প্রথা প্রাচীন হলেই তা প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট নয়। আবু ইয়াসের ও তার ভাই হাইও এমন কোনো ব্যক্তি নয়, যাদের মতামত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তারা ইহুদি রাব্বিও নয়। কারণ তারা হেজাজের বেদুইন জীবনের অধিকারী ছিল। জ্ঞান ও শিল্পকলা সম্পর্কে উদাসীন, এমন কি তাদের নিজ ধর্ম সম্পর্কেও তারা জ্ঞান রাখত না এবং তাদের সম্প্রদায় ও ধর্মগ্রন্থও ভালো করে বুঝত না। তারা এ ধরনের গণনা সম্পর্কে একটা ঔৎসুক্য পোষণ করত, যা প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই এক শ্রেণীর সাধারণ লোক পোষণ করে থাকে। সুতরাং সুহায়লী যে বিষয়টি নিয়ে দাবি উত্থাপন করেছেন, তা প্রমাণ হিসাবে তাকে কোনো সহায়তাই করছে না।

---

৩৩২. রোজেনথাল ৯০৩ উল্লেখ করেছেন।

৩৩৩. রোজেনথালে ৭০৪ বছর। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আবজদের হিসাবে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্নতা রয়েছে (১৩৭ পৃষ্ঠা ১৪২নং টীকা দ্র:)।

৩৩৪. কোরান, ৩, ৭।

www.amarboi.org

এ ধর্মের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রামাণ্য কিছু মহাজন বাণী বিদ্যমান, যা সংক্ষেপে তার পূর্বাভাস প্রদান করেছে। এ সম্পর্কে আবু দাউদ হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান[৩৩৫] থেকে, তার ওস্তাদ মুহম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া যাহাবীর[৩৩৬] ধারায় যথাক্রমে সাইদ ইবনে আবু মরিয়ম[৩৩৭], আবদুল্লাহ্ ইবনে ফররুখ[৩৩৮], উসামা ইবনে যায়েদ লায়সী[৩৩৯], আবু কুবায়সা ইবনে যুয়ায়ে,[৩৪০] তার পিতা হয়ে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, আমি বুঝতে পারি না আমার সাথীরা কি ভুলে গেছেন অথবা তারা ভুলবার ভান করছেন। আল্লাহ্র কসম, রসূলুল্লাহ্ পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত প্রতিটি দল যার অনুসারীর সংখ্যা তিনশ ও তার বেশি হতে পারে, তার পরিচালক, তার নাম, পিতার নাম এমন কি গোত্রের কথা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ এ হাদিস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার পুস্তিকায় বলেছেন, যে হাদিসের উপর কোনো মন্তব্য নেই, তা ভালো। অবশ্য এ হাদিসটি শুদ্ধ বলে ধরে নিলেও সংক্ষিপ্ত। এ কারণে তার সংক্ষেপকে বিশদ করতে ও এর দুর্বোধ্যতাকে পরিস্ফুট করতে অন্য কিছু সংখ্যক ভালো সূত্রের বর্ণিত হাদিসের প্রয়োজন। আলোচ্য হাদিসটি 'সুনান' নামীয় সংকলনের বাইরে অন্যত্র এ সূত্রেই ভিন্নধারায় বর্ণিত হয়েছে। বিশুদ্ধ দুটি সংকলনে এটা হুজায়ফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে মহাপ্রলয় পর্যন্ত সংঘটিতব্য এমন কোনো বিষয় নেই, যা যথাস্থানে বর্ণনা করতে তিনি বাকি রেখেছেন। যাঁরা তাকে স্মরণ রেখেছেন, তাঁরা স্মরণ রেখেছেন এবং যাঁরা তাকে ভুলে গেছেন, তাঁরা ভুলে গেছেন। আমার এ সাথীরা সকলেই তা জানেন। শেষ।

বোখারীর বর্ণনা, মহাপ্রলয় পর্যন্ত সব কিছুই বর্ণনা করেছেন। তিরমিজীর গ্রন্থে আবু সাইদ খুরদী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের সাথে সকাল সকাল আসরের নামাজ পড়লেন। এর পর তিনি বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত সকল কিছুরই সংবাদ আমাদেরকে দিলেন। যারা তা স্মরণ রেখেছে, তারা স্মরণ রেখেছে এবং যারা ভুলে গেছে, তারা ভুলে গেছে। শেষ।

এ সবগুলো হাদিসই বিশুদ্ধ সংকলনদ্বয়ের আলোচ্য বিষয় অনুসারে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি ও কিয়ামতের শর্তাদি সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কেননা এগুলো ধর্ম প্রবর্তক (আল্লাহ্ তাঁর উপর শান্তি ও স্বস্তি বর্ষণ করুন) স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে অতি সাধারণ বিষয়াদি সম্পর্কে বলেছেন। সুতরাং এ ধারায় আবু দাউদ এককভাবে যে অতিরিক্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন, তা বিরল ও অস্বীকৃত। তদুপরি হাদিসবেত্তাগণ তার হাদিসের সূত্রান্তর্গত ব্যক্তিদের সম্পর্কে মতানৈক্য পোষণ করেন। ইবনে আবু মরিয়ম ইবনে ফররুখ সম্পর্কে বলেন, তার সকল হাদিস অস্বীকৃত। বোখারী বলেন, তার হাদিস

৩৩৫. মৃত্যু ৩৬ (৬৫৭ খ্রি:) হি:।

৩৩৬. সুহলী (রঃ); মৃত্যু ২৫২-৫৭ (৮৬৬-৭১) হি:।

৩৩৭. সাইদ ইবনে হকম; ১৪৪-২২৪ (৭৬২-৮৩৯ খ্রি:) হি:।

৩৩৮. ১১৫-৭৫ (৭৩৩-৯১ খ্রি:) হি:।

৩৩৯. ৮৩-১৫৩ (৭০২-১০ খ্রি:) হি:।

৩৪০. মৃত্যু ৮৬-৮৯ (৭০-৮ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

কখনো স্বীকৃত হয়, কখনো অস্বীকৃত। ইবনে আদী বলেন, তার সকল হাদিসই অসংরক্ষিত। উসামা ইবনে যায়েদ সম্পর্কে বলতে গেলে, যদিও তার হাদিস বিশুদ্ধ দুটি সংকলনে গৃহীত হয়েছে এবং ইবনে মুঈন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন—তথাপি বোখারী তাঁর হাদিস আলোচনার জন্যই গ্রহণ করেছেন এবং ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ ও আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁকে দুর্বল বলেছেন। আবু হাতেম বলেন, তাঁর হাদিস লেখা হত; কিন্তু প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হত না। আবু কুবায়সা ইবনে যোয়ায়েব অপরিচিত। সুতরাং আবু দাউদের হাদিসে বর্ণিত অংশ এ দিক থেকেও দুর্বল বলে প্রতিপন্ন হয়। তদুপরি পূর্ব বর্ণিত বিরলত্বও আছেই।

কখনো তারা সাম্রাজ্যের পূর্বাভাসে বিশেষভাবে 'কিতাবুল জিফর'কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে এবং তারা ধারণা করে যে, তাতে মহাজন বাণী ও জ্যোতিষের ধারায় বর্ণিত সকল জ্ঞান একত্র করা হয়েছে। অথচ তারা তাদের এ পুস্তকের মূল উৎস ও ভিত্তি সম্পর্কে কিছুই জানে না। পাঠক, জেনে রাখুন, 'কিতাবুল জিফর'-এর মূল ভিত্তি হল এই যে, শিয়া যায়দিয়া সম্প্রদায়ের নেতা হারুন ইবনে সাইদ আজলীর[৩৪১] কাছে একটি পুস্তক ছিল, তা তিনি ইমাম জাফর সাদেকের বাণী থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এতে সাধারণভাবে নবী বংশের উপর অচিরে আগামী বিপদ-আপদ এবং বিশেষভাবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির অবস্থার কথা ছিল। এগুলো ইমাম জাফর ও তাঁর ন্যায়-অন্যায় ব্যক্তির জন্য দিব্যজ্ঞান ও বিভূতির কল্যাণে লব্ধ হয়ে থাকতে পারে। কারণ এটা আল্লাহ্‌র ওলীদের ক্ষমতার অন্তর্গত। এ বাণীগুলো একটি ক্ষুদ্র ভেড়ার চামড়ায় লিখিতভাবে ইমাম জাফরের নিকট ছিল। হারুন আজলী এগুলো তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করে লিপিবদ্ধ করেন এবং মূলের চামড়ার উপর লিপিবদ্ধ অবস্থাকে অনুসরণ করে তার নামকরণ করেন 'জিফর'। কেননা অভিধানে 'জিফর' অর্থ ক্ষুদ্র। পরে তারা এরূপ পূর্বাভাস প্রদানের বিদ্যাটিকেই 'জিফর' বলে অভিহিত করেন এবং তার উৎস হয়ে দাঁড়ায় এ পুস্তক। এতে কোরানের ব্যাখ্যাও ছিল এবং তার মধ্যে যে গূঢ় তত্ত্ব বিদ্যমান, তাও জাফর যাদেকের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছিল। অবশ্য এ পুস্তকের বর্ণনার সূত্র সংবদ্ধ নয়, তার মূল ভিত্তিও জানা যায়নি; বরং এগুলো যুক্তি-প্রমাণহীন কতিপয় বিরল বাণী মাত্র। যদি জাফর সাদেকের সাথে এর সংযোগ শুদ্ধ হয়ে থাকে, তা হলে তা তাঁর নিজের দিক থেকে এবং তাঁর গোষ্ঠীর অন্যান্য লোকের দিক থেকে যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কেননা তাঁদের প্রায় সকলেই বিভূতির অধিকারী ছিলেন।

জাফর সাদেক থেকে যা শুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা এই যে, তিনি অনেক সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দিতেন এবং পরে দেখা যেত তাঁর সতর্কীকরণ সত্য হয়ে উঠেছে। তিনি তার চাচা যায়েদের পুত্র ইয়াহিয়াকে তার নিহত হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা না মেনে বিদ্রোহ করেন ও নিহত হন। জুযজানে সংঘটিত এই ঘটনা সকলের নিকট পরিচিত। বিভূতি যখন অন্যদের মধ্যেও পাওয়া যায়, তা হলে, পাঠক, আপনি তাদের সম্পর্কে কি ভিন্নরূপ

৩৪১. ইনি ইব্রাহিম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসানের সহচর ছিলেন; ৩৫৩ পৃষ্ঠা ২৬১ টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

চিন্তা করতে পারেন! তাঁরা জ্ঞানে, ধর্মে ও নবুয়তের পদাঙ্ক অনুসরণে অন্যদের অপেক্ষা বিশিষ্ট। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে তাঁদের সম্ভ্রান্ত উৎসই শাখা-প্রশাখার পবিত্রতার সাক্ষ্য বহন করে। নবীবংশের বিশেষ কারো প্রতি নির্দেশিত হওয়া ছাড়াই এ প্রকার বহু বাণী প্রচলিত রয়েছে। উবাইদী সাম্রাজ্য সম্পর্কেও এ প্রকার বহু বাণী বিদ্যমান।

পাঠক, উবায়দুল্লাহ্ মেহেদী ও তৎপুত্র মুহম্মদ হাবিবের সাথে আবু আবদুল্লাহ্ শিয়ীর সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ইবনে রফিক যা বর্ণনা করেছেন, তৎপ্রতি লক্ষ করুন। তাঁরা আবু আবদুল্লাহ্‌কে কীভাবে বহু সংবাদ দিয়েছিলেন এবং কীভাবে তাকে ইয়ামেনের শিয়ামত প্রচারক ইবনে হাওশবের নিকট পাঠিয়েছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি আবু আবদুল্লাহ্‌কে মাগরিবে গিয়ে সেখানে শিয়ামত প্রচার জোরদার করতে বলেছেন। কারণ, তিনি বিশেষ দীক্ষার ফলে জানতে পেরেছিলেন যে, তাদের প্রচারকার্য সেখানে সফলকাম হবে।

আফ্রিকিয়ায় শিয়া সাম্রাজ্য বিস্তৃত হওয়ার পর উবায়দুল্লাহ্ মেহেদী যখন 'মাহদিয়া' নগরীর পত্তন করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, ফাতেমীদেরকে দিনের ঘণ্টা খানিক সময়ের জন্য সুরক্ষিত করার নিমিত্ত এ নগরীর পত্তন করলাম। আমি এর প্রাঙ্গণে গর্দভারোহীর বিশ্রামস্থল তাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি। তাঁর পৌত্র ইসমাইল আল মনসুরের নিকটও এই বাণী পৌঁছেছিল। সুতরাং যখন গর্দভারোহী আবু ইয়াজিদ তাঁকে মাহদিয়ায় অবরুদ্ধ করে ফেলল[৩৪২] তখন তিনি তার বিশ্রামস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তার সংবাদ এলে দেখতে পেলেন তাঁর পিতামহ উবায়দুল্লাহ্ যে স্থান নির্দেশ করেছিলেন, তা সত্য হয়েছে। সুতরাং আলমনসুর জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উঠলেন। তিনি শহর থেকে বের হয়ে তাকে পরাজিত করলেন এবং যাবের সীমান্ত পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে তার উপর জয়ী হলেন ও তাকে হত্যা করলেন। এ প্রকার বহু কাহিনী তাদের নিকট বিদ্যমান।

জ্যোতিষশাস্ত্র

জ্যোতিষীরা সাম্রাজ্যের পূর্বাভাস সম্পর্কে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধি-বিধানকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে, যেমন রাজশক্তির উদ্ভব ও সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ইত্যাদিতে তারা রাশি সংযোগের দ্বারা, বিশেষভাবে দুটি বৃহৎ গ্রহ শনি ও বৃহস্পতির মধ্যকার এই সংযোগ থেকে সংবাদ প্রদান করে। এ দুটি বৃহৎ গ্রহ প্রতি বিশ বছরে একবার সংযুক্ত হয়। পুনরায় এ সংযোগ এ ত্রিভুজ ক্ষেত্রের অন্য একটি রাশিতে দক্ষিণ ত্রিত্বে দেখা দেয়। এর পর আবার এটা অন্য একটি রাশিতে সংঘটিত হয়। এভাবে প্রতি ত্রিভুজ ক্ষেত্রে দ্বাদশবার সংযুক্ত হয়ে তিন রাশির ষাট বছর পূর্ণ হয়। পুনরায় অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ষাট বছর এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ষাট বছর হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রতিটি ত্রিভুজে দ্বাদশবার এবং চারটি আবর্তনে মোট দুইশ চল্লিশ বছর সময় লাগে। প্রতিটি রাশিতে এ সংযোগের আবর্তন দক্ষিণ ত্রিত্ব অনুসারে হয় এবং তা

৩৪২. এ ঘটনা ৩৩৩-৩৪ (৯৪৫ খ্রি:) হিজরির এবং ৩৩৬ (৯৪৭ খ্রি:) হিজরিতে আবু ইয়াজীদের মৃত্যু হয়।

www.amarboi.org

এক ত্রিভুজ থেকে তার সন্নিহিত অন্য ত্রিভুজে গমন করে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ত্রিভুজের শেষ রাশিটির সন্নিহিত পরবর্তী ত্রিভুজের রাশিতে আবর্তিত হয়ে থাকে। এ সংযোগ, যাকে বৃহৎ দুটি গ্রহের সংযোগ বলা হয়, তা বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও মধ্যম, এ তিনভাগে বিভক্ত হয়। বৃহৎ সংযোগ হল এ দুটি গ্রহের আকাশমণ্ডলের বিশেষ স্তরে নয়শ ষাট বছরে একবার ফিরে আসা। মধ্যম হল, উক্ত দুটি গ্রহের প্রতিটি ত্রিভুজ ক্ষেত্রে দ্বাদশ বার সংযুক্ত হওয়া এবং দুইশ চল্লিশ বছর পরে অন্য একটি ত্রিভুজে আবর্তন করা। ক্ষুদ্রটি হল উক্ত দুটি গ্রহের কোনো রাশির পর্যায়ে সংযুক্ত হওয়া এবং বিশ বছর পরে দক্ষিণ ত্রিত্ব অনুসারে অনুরূপ পর্যায় বা পলে অন্য রাশিতে সংযোগের অধীন হওয়া।

এর উদাহরণ এই যে, মেষ রাশির প্রথম পলে সংযোগ দেখা দিল, এর বিশ বছর পরে ধনু রাশির প্রথম পলে দেখা দিবে এবং আরো বিশ বছর পরে ধনু রাশির প্রথম পলে দেখা দিবে এবং আরো বিশ বছর পরে সিংহ রাশির প্রথম পলে আসবে। এর সবগুলোই আগ্নেয় এবং এর প্রতি সংযোগই ক্ষুদ্র। এর পর আবার এটা ষাট বছর পরে মেষ রাশির প্রথমে প্রত্যাবর্তন করবে। একে বলা হয় সংযোগ বলয় ও সংযোগ আবর্তন। দুইশ চল্লিশ বছর পরে আগ্নেয় থেকে মৃন্ময়ে আবর্তন করবে; কেননা তা পরবর্তী। এটাই মধ্যম সংযোগ। অতঃপর বায়বীয় ও এর পর জলীয় পর্যায়ে আবর্তন করবে এবং পুনরায় মেষ রাশির প্রথম দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। এটাই বৃহৎ সংযোগ।

বৃহৎ সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যেমন রাজশক্তি ও সাম্রাজ্যের পরিবর্তন, একজাতি থেকে অন্য জাতির হস্তে রাজকীয় ক্ষমতা হস্তান্তর ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করে। মধ্যম সংযোগ রাজশক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার এবং তন্নিমিত্ত আন্দোলনকারীদের সংবাদ দেয়। ক্ষুদ্র সংযোগ মতবাদ প্রচারকারী ও বিদ্রোহী এবং নগরীর বিনাশ ও তার জনবসতির ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে।

এ সকল সংযোগের মধ্যে প্রত্যেক ত্রিশ বছরে একবার কর্কট রাশিতে দুটি অশুভ গ্রহের সংযোগ দেখা দেয়। একে বলা হয় চতুর্থ। কর্কট রাশি পৃথিবীর উপর উদিত বিধায় তাতে শনির দশা ও মঙ্গলের দুর্যোগ দেখা দিয়ে থাকে। এর ফলে এ সংযোগ গোলযোগ, যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত, বিদ্রোহ, সৈন্য সমাবেশ, সৈন্যদলের বিদ্রোহ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের হেতু নির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। উক্ত দুটি গ্রহের সংযোগকালীন শুভাশুভ অনুসারে হেতু নির্দেশের ব্যবস্থায় এ সকল বিষয় স্থায়ী বা দূর হয়ে থাকে।

গণক জিরাস ইবনে আহমদ নিজামুল মুলকের[৩৪৩] জন্য প্রণীত তার গ্রন্থে বলেছেন, মঙ্গলের বৃশ্চিক রাশিতে প্রত্যাবর্তন ইসলাম ধর্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বহন করে; কেননা তাই এ ধর্মের হেতু নির্দেশক। বৃশ্চিক রাশিতে দুটি বৃহৎ গ্রহের সংযোগে নবী (সঃ)-র জন্ম হয়েছিল। সুতরাং তা পুনরায় ঐস্থলে এলে খলিফাদের মধ্যে গোলযোগ দেখা দেয়, ধার্মিক ও জ্ঞানীদের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং তাঁদের অবস্থার হানি হয়। অনেক সময় ধর্মীয় স্থান ধ্বংস হয়ে যায়। কখনো বলা হয়, আলী (রাঃ), বনি উমাইয়ার মারোয়ান ও বনি আব্বাসের আল-মুতাওয়াক্কিল নিহত হওয়ার সময় এ সংযোগ দেখা দিয়েছিল। সুতরাং এ সকল অভিজ্ঞতা সংযোগের নিয়ম-নীতির সাথে মিলিয়ে নিলে বিষয়টি খুবই দৃঢ় হয়।

৩৪৩. প্রসিদ্ধ সলজুকী উজির; মৃত্যু ৪৮৫ (১০৯২ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

শাজান বলখী[৩৪৪] বর্ণনা করেছিলেন যে, ইসলাম ধর্ম তিনশ বিশ বছর স্থায়ী হবে। তার এই বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আবু মাশার বলেছিলেন, একশ পঞ্চাশ বছর পরে তাতে প্রচুর মতভেদ দেখা দিবে। তাও শুদ্ধ হয়নি। জিরাস বলে, পূর্ববর্তীদের গ্রন্থাবলিতে দেখেছি, জ্যোতিষীরা পারস্য সম্রাটকে আরব রাজশক্তি ও তাদের মধ্যে নবীর আবির্ভাবের সংবাদ দিয়েছিল। তাদের হেতু নির্দেশক গ্রন্থ হল শুক্র এবং তা তুঙ্গে অবস্থান করবে। সুতরাং তাদের রাজশক্তি চল্লিশ বছর স্থায়ী হবে। আবু মাশার[৩৪৫] 'কিতুব্বুল কেরানাত' গ্রন্থে বলেছেন, অংশ যখন মীন রাশির সাতাশ ভাগে পৌঁছবে, তখনই শুক্রের তুঙ্গাবস্থা এবং তার সাথে বৃশ্চিক রাশিতে সংযোগ দেখা দেবে। এটাই আরবের হেতু নির্দেশক। তখন আরব সাম্রাজ্য দেখা দিবে এবং তাদের মধ্যে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাদের রাজশক্তি ও তার স্থায়িত্ব শুক্রের তুঙ্গীভবনের অবশিষ্ট এগার অংশ, যা মীন রাশির নৈকট্য লাভের জন্য প্রয়োজন, সেই অনুপাতে ছয়শ দশ বছর হবে। আবু মুসলিমের[৩৪৬] আত্মপ্রকাশ শুক্রের আবর্তনকালে ঘটে, অংশ তখন মেষ রাশির প্রথম দিকে এবং ভাগ্যাধিপতি বৃহস্পতি।

ইয়াকুব ইবনে ইসহাক কিন্দী বলেন, ইসলাম ধর্মের আয়ুষ্কাল ছয়শ তিরানব্বই পর্যন্ত স্থায়ী হবে। তিনি বলেন, কেননা শুক্র উক্ত ধর্মের উদ্ভব সংযোগে মীন রাশির আটাশ অংশ ও ত্রিশ পলে অবস্থান করছিল। সুতরাং তার অবশিষ্ট রইল এগার অংশ ও আঠার পল। এক অংশ ষাট পলে বিভক্ত। সুতরাং তা ছয়শ তিরানব্বই বছর হবে। তিনি বলেন, ধর্মের এ আয়ুষ্কাল সম্পর্কে দার্শনিকরা সকলে একমত এবং কোরানের সূরাগুলোর প্রথমে লিখিত বর্ণমালার দ্বিরুক্তি বাদ দিয়ে আবজাদের হিসাবে তাদের সংখ্যামান নির্ণয় করলেও এ মতের সমর্থন মিলে। আমি (গ্রন্থকার) বলি, এটা সেই হিসাব, যা সুহায়লী বর্ণনা করেছেন। যতদূর মনে হয়, পূর্বের এ মতটির ভিত্তি সুহায়লীই স্থাপন করেছেন, যেমন আমরা পূর্বে তার নিকট থেকে তা উদ্ধৃত করেছি।

জিরাস বলেন, হরমুজ জ্ঞানী আফ্রিদকে[৩৪৭] আর্দেশির, তার সন্তান-সন্ততি ও সাসানী সাম্রাজ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তার রাজ্যের হেতু নির্দেশক বৃহস্পতি। তা তুঙ্গে থাকার ফলে তাকে দীর্ঘ ও শুভ কাল চারশ সাতাশ বছর দেয়া হয়েছে। অতঃপর শুক্রের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। তা তুঙ্গে পৌঁছলে আরবদের হেতু নির্দেশক হয়ে দাঁড়াবে। তারা রাজ্যাধিপতি হবে; কেননা সংযোগের উদয় রাশি তখন তুলা এবং তার অধিপতি শুক্র। সংযোগের সময় তা তুঙ্গে ছিল। এর ফলে এটাই নির্দেশ করে যে, তারা এক হাজার ষাট বছর রাজত্ব করবে। পারস্য সম্রাট নওশেরোয়া তাঁর উজির দার্শনিক বুরজেচমেহেরকে রাজশক্তি পারস্য থেকে আরবের হাতে চলে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি উত্তরে বললেন যে, তার রাজ্যকালের পঁয়তাল্লিশ বছরে আরব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জন্মগ্রহণ করবে এবং পূর্ব ও পশ্চিমের অধীশ্বর হবে। তখন বৃহস্পতি শুক্রের জন্য আধিপত্য ছেড়ে দেবে এবং সংযোগ বায়বীয় ত্রিভুজ থেকে

৩৪৪. পরবর্তী আবু মাশারের শিষ্য।
৩৪৫. জাফর ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ২৭২ (৮৮৬ খ্রি:) হি:।
৩৪৬. আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পারস্য সেনাপতি, ১৩৭ (৭৫৫ খ্রি:) হিজরিতে নিহত।
৩৪৭. রোজেনথালে জ্ঞানী 'হরমুজাফ্রিদ'।

www.amarboi.org

জলীয় বৃশ্চিক রাশিতে আবর্তন করবে। এটাই আরবদের হেতু নির্দেশক। এ সকল প্রমাণ থেকে এ কথাই নির্দেশিত হয়, উক্ত ধর্ম শুক্র বলয়ের সমান আয়ুষ্কাল লাভ করবে। তাই এক হাজার ষাট বছর।

পারস্য সম্রাট পারভেজ দার্শনিক উইলিয়ামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনিও বুরজেচমেহের-এর অনুরূপ উত্তর দিয়েছিলেন। বনি উমাইয়া শাসন আমলে রোমান জ্যোতিষী থিউফিলাস[৩৪৮] বলেছেন, ইসলাম ধর্ম বৃহৎ সংযোগের আয়ুষ্কাল নয়শ ষাট বছর স্থায়ী হবে। অতঃপর যখন সংযোগটি বৃশ্চিক রাশিতে আসবে, যেমন উক্ত ধর্মের আবির্ভাবের সময় ছিল এবং উক্ত ধর্মের উদ্ভব সংযোগের নক্ষত্রমণ্ডলীর অবস্থান বিপর্যয় ঘটবে, তখন তার কার্যকারিতা হ্রাস পাবে অথবা অনুরূপ ধারণার বিপরীতার্থক বিধি-নিয়মের নবায়ন সংঘটিত করতে হবে।

জিরাস বলেন, দার্শনিকরা একমত যে, পৃথিবীর ধ্বংস জল ও অগ্নির প্রাধান্যের ফলেই সংঘটিত হবে, যাতে সমগ্র সৃষ্টি বিনষ্ট হয়ে যাবে। সিংহ রাশির মধ্যভাগ চব্বিশ অংশ অতিক্রম করার কালে এটা ঘটবে। বস্তুত এটা মঙ্গলের সীমা এবং এটা নয়শ ষাট বছর অতিবাহিত হবার পর দেখা দেবে।

জিরাস বর্ণনা করেন, জবলস্তানের[৩৪৯] সম্রাট তার দার্শনিককে সম্রাট মামুনের নিকট পাঠিয়েছিলেন। যোবান নামক উক্ত দার্শনিক উপঢৌকনাদিসহ তাঁর দরবারে উপস্থিত হন। তার সংবাদাদির উপর নির্ভর করেই মামুন তাঁর ভ্রাতার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাহেরকে পতাকা বহন করতে দিয়েছিলেন। মামুন উক্ত দার্শনিকের জ্ঞানকে খুবই মর্যাদা দেন এবং তাকে তাঁদের সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি সম্রাটকে উক্ত সাম্রাজ্য তাঁর বংশধরদের হাত থেকে ভ্রাতৃ সন্তানদের মধ্যে চলে যাওয়ার সংবাদ দেন। অনারব দায়লমীরা সাম্রাজ্যের পঞ্চাশ বছরে খেলাফতের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করবে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছে অনুযায়ী অনেক কিছুই হবে। অতঃপর তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে। এর পর তুর্কিরা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে অগ্রসর হয়ে সিরিয়া, ফুরাত ও সাইহুন পর্যন্ত দখল করে নিবে। অচিরেই তারা রোম অঞ্চলও দখল করবে এবং আল্লাহ্ যা চান, তাই হবে। তখন মামুন তাকে বললেন, আপনি কীভাবে এগুলো জানলেন? তিনি বললেন, দার্শনিকদের পুস্তক থেকে এবং ভারতীয় সাসা ইবনে দাহিরের জ্যোতিষী বিধান থেকে; ইনিই দাবা খেলার প্রবর্তন করেন। আমি (গ্রন্থকার) বলি, দায়লমীদের পরে যে তুর্কিদের আত্মপ্রকাশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তারা সলজুক এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকেই তাদের সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়ে গেছে।

জিরাস বলেন, জলীয় ত্রিভুজের মীন রাশি থেকে সংযোগের আবর্তন আটশ তেত্রিশ ইয়াজদাগিদ[৩৫০] বছরে অনুষ্ঠিত হবে। এর পরে তা বৃশ্চিক রাশির দিকে যাবে, যেখানে

৩৪৮. মূলে তওফিল অথবা নওফিল; ঐতিহাসিক আল কিফতীর মতে ইনি আব্বাসী সম্রাট আল-মাহদীর সমসাময়িক।

৩৪৯. গজনী।

৩৫০. ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে এর আরম্ভ।

www.amarboi.org

তিপ্পান্ন সনে ইসলামের উদ্ভব সংযোগ বিরাজমান ছিল। জিরাস বলেন, মীন রাশিতে যা আছে, তাই প্রথম আবর্তন এবং যা বৃশ্চিক রাশিতে আছে, তা থেকেই ধর্মের হেতু নির্দেশগুলো বের হয়ে আসে। তিনি বলেন, প্রথম সংযোগ থেকে প্রথম বছর জলীয় ত্রিভুজগুলোতে আবর্তিত হবে রজব মাসের দ্বিতীয় দিনে আটশ পঁয়ষট্টি অব্দে।[৩৫১] কিন্তু অনুরূপভাবে কোনো কথাই সংঘটিত হয়নি।

কোনো সাম্রাজ্যের বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে জ্যোতিষীরা মধ্যম সংযোগ এবং তৎকালে আকাশমণ্ডলের বিশেষ অবস্থানকে ভিত্তি করে সংবাদ দিয়ে থাকেন। কারণ তাদের নিকট তা সাম্রাজ্যের পত্তন, জনবসতির অবস্থা, সাম্রাজ্যের সহায়ক জাতি, তার রাজন্যবর্গ, তাদের নাম, তাদের বয়স, তাদের রীতিনীতি, তাদের ধর্ম, তাদের অভ্যাস এবং তাদের যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে হেতু নির্দেশ করে থাকে। যেমন আবু মাশার তার 'কিতাবুল কেরানাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কখনো এ সকল বিষয়ের সংবাদ ক্ষুদ্র সংযোগ থেকেও পাওয়া যায়, যেহেতু মধ্যম সংযোগও এদের হেতু নির্দেশক হিসাবে বিদ্যমান। এগুলো থেকে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

সম্রাট হারুনুর রশীদ ও মামুনের জ্যোতিষী ইয়াকুব ইবনে ইসহাক কিন্দী সম্ভাব্য সংযোগাবলি সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করে তার নাম দিয়েছিলেন 'আশ্‌শিয়াতু বিজ্জিফর'। এর এ নামকরণে তাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ জাফর সাদেকের প্রতি আরোপিত সেই রচনার ইঙ্গিত বিদ্যমান। কিন্দী তার এ গ্রন্থে তথাকথিত আব্বাসী সাম্রাজ্যের বিষয়াদি সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করেন। এ বিষয় তার শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তিনি তার ধ্বংস সম্পর্কেও ইঙ্গিত দেন। বাগদাদের উপর আগামী দুর্যোগ সম্পর্কে বলেন, তা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সংঘটিত হবে। তার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মেরও অবসান ঘটবে।

আমরা এ গ্রন্থ সম্পর্কে কোনো সংবাদ পাইনি এবং এমন কাউকেও পাইনি, যিনি এর সম্পর্কে সংবাদ রাখেন। সম্ভবত তাতারী সম্রাট হালাকু খান বাগদাদ দখল করে যে সমস্ত পুস্তক দজলা নদীতে নিক্ষেপ করেছিল, তন্মধ্যে এ পুস্তকটিও তলিয়ে গিয়ে থাকবে। এ তাতারীরাই শেষ খলিফা আল-মুতাসিমকে হত্যা করে। মাগরিবে উক্ত পুস্তকের প্রতি নির্দেশিত একটি পুস্তিকা পাওয়া যায়, যার নাম ক্ষুদ্র 'জিকর'। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে তা বনি আবদুল মোমেনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কারণ তাতে পূর্ববর্তী আল-মোহেদ সম্রাটের বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যমান। এতে অতীত সম্পর্কে প্রদত্ত পূর্বাভাসগুলোতে বাস্তব অবস্থার সামঞ্জস্য আছে; কিন্তু এর পরের সবগুলোই মিথ্যা।

আব্বাসী সাম্রাজ্যে কিন্দীর পরেও বহু জ্যোতিষী ছিলেন এবং পূর্বাভাস সম্পর্কে তাদের গ্রন্থাদিও বিদ্যমান। পাঠক, সম্রাট আল-মাহদীর ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে আব্বাসী সাম্রাজ্যের একজন অনুগত শিল্পী আবু বুদায়েলের বক্তব্য থেকে তাবারী যা তুলে ধরেছেন, তৎপ্রতি লক্ষ করুন। আবু বুদায়েল বলেন, রবি ও হাসান[৩৫২] রশিদের সাথে তাঁর পিতার শাসন আমলে একটি অভিযানে বের হয়ে আমার নিকট লোক

৩৫১. ইয়াজদাগির্দ সন দিয়ে বক্তব্য আরম্ভ হলেও তা হিজরি সন।
৩৫২. রাব ইবনে ইউসুফ উজির এবং হাসান হাজেব-প্রতিহারী ছিলেন।

www.amarboi.org

পাঠিয়েছিলেন। আমি অধিক রাত্রিতে তাদের নিকট এলাম। সেখানে সাম্রাজ্যের পূর্বাভাস সম্পর্কীয় একটি গ্রন্থ তাদের নিকট দেখতে পেলাম। তাতে আল মাহ্দীর শাসনকাল দশ বছর লেখা ছিল। আমি বললাম, এ পুস্তকটি মাহ্দীর নিকট গোপন থাকবে না। অথচ তাঁর শাসনকালের যা অতীত হবার হয়েছে। সুতরাং তিনি এটা দেখতে পেলে, আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, একে নিজের মৃত্যু বলেই গ্রহণ করবেন। তাঁরা বললেন, উপায় কী? আমি তখন বুদায়েল বংশের লিপিবিশারদ আম্বাসাকে ডেকে পাঠালাম এবং সে আসলে তাকে বললাম, এ পৃষ্ঠাটি বদল করে দশের স্থানের চল্লিশ লিখে দাও। সে তা সম্পন্ন করল। আল্লাহ্র কসম আমি যদি নিজের চোখে এ পৃষ্ঠাটিতে দশ লেখা না দেখতাম, তা হলে চল্লিশ লেখার পর বলার উপায় ছিল না যে, তা ঐ স্থানে কখনো ছিল।

এর পর মানুষ সাম্রাজ্যের পূর্বাভাস সম্পর্কে গদ্যে-পদ্যে রেজায[৩৫৩] ছন্দে অনেক কিছুই লিখেছি এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় যা কিছু বলার বলেছি। বিভিন্ন হাতের বিচিত্র সেই সৃষ্টি প্রচুর। তাদেরকে ভবিষ্যদ্বাণী বলা হয়। এদের মধ্যে অনেকগুলো সাধারণভাবে ধর্ম সম্পর্কীয় এবং অনেকগুলো বিশেষভাবে সাম্রাজ্য সম্পর্কীয় রচনা। কিন্তু প্রতিটিই জগতের বিখ্যাত সকল লোকের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অথচ এ সকল সংবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট থেকে এগুলো যে যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা বিশ্বাস করার মত ভিত্তি কোথাও নেই।

ভবিষ্যদ্বাণী

মাগরিবে এ প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত ইবনে মুর্রানার একটি 'কসিদা'[৩৫৪] বিদ্যমান, যা 'তওবিল' ছন্দে ও 'রে' বর্ণের অন্ত্যমিলে রচিত এবং মানুষের মধ্যে বহুল প্রচলিত। সাধারণ মানুষ এটাকে সাধারণ পূর্বাভাস বলে মনে করে। সুতরাং তার অনেক বিষয়কেই তারা বর্তমান ও ভবিষ্যত্বের ব্যাপারে ব্যবহার করে থাকে। আমরা আমাদের উস্তাদবর্গের নিকট থেকে যা শুনেছি, তা এই যে, এগুলো লামতুনা সাম্রাজ্যের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা তার রচক উক্ত সাম্রাজ্যের কিছুকাল পূর্বেই বর্তমান ছিলেন। ইনি তাতে বনি হামুদের আশ্রিত পোষ্যদের নিকট থেকে বিচ্যুত করে সিবতা (সিউটা)-র উপর লামতুনদের প্রাধান্য বিস্তার[৩৫৫] এবং আন্দালুস তীরবর্তী অঞ্চলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণনা করেছেন।

মাগরিবের অধিবাসীদের নিকট এ প্রকার ভবিষ্যদ্বাণীর আরো একটি উদাহরণ 'তুব্বাইয়া' নামক একটি 'কসিদা', যার আরম্ভটি নিম্নরূপ :

> আমি আনন্দিত, কিন্তু এটাকে আমার আনন্দ বলা যায় না;
> কখনো পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গও আনন্দ প্রকাশ করে।
> এটা আমার লীলাবৈচিত্র্য বলেও মনে হয় না,
> বরং প্রয়োজনীয় কিছু কার্যকারণকে স্মরণ করার নিমিত্ত।

---

৩৫৩. আরবি ছন্দের অন্যতম।
৩৫৪. কসিদা—দীর্ঘ পয়ার; তওবিস—আরবি ছন্দ বিশেষ।
৩৫৫. ৪৭৬ (১০৮৩ খ্রি:) হিজরিতে ঘটে।

www.amarboi.org

এতে প্রায় পাঁচশ অথবা বলা হয় এক হাজারের মত চরণ আছে। এতে আল-মোহেদ সাম্রাজ্য সম্পর্কেই অধিকাংশ বর্ণনা বিদ্যমান এবং ফাতেমী ও অন্যদের সম্পর্কেও ইঙ্গিত রয়েছে। প্রকাশ এই যে, এটা কৃত্রিম। মাগরিবে অনুরূপ অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কীয় রচনা 'যজলী' নামীয় ক্রীড়া পদ্য। এটা কোনো ইহুদির রচনা বলে নির্দেশ করা হয়। সে তাতে তার সমকালীন দুটি বৃহৎ ও অশুভ গ্রহের সংযোগ এবং অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করেছে। ফাসে তার অপঘাত মৃত্যুর কথাও এতে বিদ্যমান। মানুষের ধারণা তা ঐরূপই হয়েছে। পদ্যটির আরম্ভ নিম্নরূপ :

এ নীলের বর্ণচ্ছটা, তার তুঙ্গাবস্থায় শুভ রয়েছে,
হে জাতি, এ ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম কর।
শনিগ্রহ এ নিদর্শনের সংবাদ দিয়েছে,
তার আকৃতি পরিবর্তন করেছে, এখন সে শান্তিময়।
একটি নীল 'শাশ' পাগড়ীর পরিবর্তে
এবং একটি নীল টুপি জোব্বার বিনিময়ে।

এর শেষাংশে সে বলে,

এ ছন্দোবদ্ধতা সমাপ্ত হল এক ইহুদির দ্বারা
সে ফাস নগরীতে গুলীবিদ্ধ হবে ঈদের দিন।
এমন কি প্রান্তরগুলো থেকে মানুষ তার দিকে আসবে
এবং সে নিহত হবে, হে জাতি এককভাবে।

এতে প্রায় পাঁচশ চরণ বিদ্যমান। এতে ঐ সকল গ্রহণযোগ্য বর্ণনা করা হয়েছে; যা আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের হেতু নির্দেশ করে।

মাগরিব অঞ্চলে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে 'মুতাকারিব' ছন্দে ও 'বে' বর্ণের অন্ত্যমিলে রচিত অন্য একটি কসিদাও বিদ্যমান। এটা তিউনিসের আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বনি আবু হেফসের পূর্বাভাস সংবলিত এবং এর রচয়িতা হিসাবে ইবনে আব্বার-এর নাম উল্লেখিত। কনস্টান্টিনপোলের কাজী ও মহান বক্তা আবু আলী ইবনে বাদিস[৩৫৬] যিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়ে বিচক্ষণ ও জ্যোতিষী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বিদ্যমান, তিনি আমাকে বলেছেন, এই ইবনে আব্বার আন্দালুসের সেই ইবনে আব্বার নয়, যিনি হাদিসবেত্তা ও লেখক ছিলেন[৩৫৭] এবং আল মুস্তানসির যাকে হত্যা করেন। উক্ত ইবনে আব্বার তিউনিসের এক দরজী; ঘটনাক্রমে আন্দালুসী হাদিসবেত্তার সাথে তার নাম মিশে যাওয়ায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

আমার পিতা, আল্লাহ্ তাঁকে শান্তি দিন, অনেক সময় ভবিষ্যদ্বাণীর অনেক পদ্য আমাকে আবৃত্তি করে শুনাতেন। তার কোনো কোনো অংশ আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। যেমন,

আমার অক্ষমতা এ জন্য যে, সময় পরিবর্তমান,
সে তার উজ্জ্বল দাঁত দেখিয়ে প্রতারণা করে।

---

৩৫৬. ইবনে খলদুনের সাথে ৭৬১ (১৩৫৯/৬০ খ্রি:) হিজরিতে ফেজে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।
৩৫৭. মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বার; ৫৯৫-৬৫৮ (১১৯৯-১২৬০ খ্রি:) হি:। তিউনিসে নিহত হন।

www.amarboi.org

অন্যত্র :[৩৫৮]

তাঁর সৈন্যদল থেকে একজন নেতৃস্থানীয়কে পাঠাবেন,
সে ঐ স্থানে পর্যবেক্ষণে নিরত থাকবেন।
শায়খের নিকট তার সংবাদ এসে পৌঁছবে,
এবং তিনি রুগ্ন উটের ন্যায় অগ্রসর হবেন।
তাঁর ন্যায়পরায়ণতা থেকেই চরিত্র প্রকাশ পাবে,
এটাই ত সেই কৌশল, যা দিয়ে মানুষ আকৃষ্ট হয়।

অন্যত্র, সাধারণভাবে তিউনিসের অবস্থা বর্ণনায় :

তুমি কি দেখ না, সকল প্রথাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে,
পদমর্যাদাশালী ব্যক্তির অধিকার কেউ স্বীকার করে না!
সুতরাং তিউনিস থেকে বিদায় গ্রহণ কর এবং
তার পরিচিত স্থানগুলোকে বিদায় সম্ভাষণ জানাও ও যাও।
অচিরে তাতে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে;
তাতে দোষী-নির্দোষী সকলেই পতিত হবে।

আমি তিউনিসের এ বনি আবু হেফস সাম্রাজ্য সম্পর্কে মাগরিব অঞ্চলে প্রচলিত অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাতে তাঁদের দশম শাসক বিখ্যাত সুলতান আবু ইয়াহিয়ার পর তাঁর ভাই মুহম্মদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। রচয়িতা বলেন,

এবং আবু আবদুল ইলার[৩৫৯] পরে তার ভাই,
যিনি ওয়াস্‌সাব নামে যথার্থ পদে অভিহিত হবেন।

কিন্তু ইনি তাঁর ভ্রাতার পরে সাম্রাজ্যের অধিকারী হননি। মনে মনে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

মাগরিব অঞ্চলে পরিচিত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে হাওশনীর নামের সাথে জড়িত একটি ক্রীড়া পদ্যও বিদ্যমান। তা সাধারণ লোকের ভাষায় স্থানীয় ছন্দে রচিত। তার আরম্ভ :

হে আমার অশ্রু, আমাকে একাকী থাকতে দাও;
বৃষ্টি থেমে যায়, কিন্তু তুমি থামতে জান না!
সকল নদনদী পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে,
কিন্তু তুমি পূর্ণায়মান-বিস্তারমান জলাশয়।
সমুদয় অঞ্চল আর্দ্রতামণ্ডিত,
এবং তুমিত জান অবস্থা কত শোচনীয়!
গ্রীষ্ম গেল শীতও গেল,
বর্ষা ও বসন্ত সকলই দূরীভূত।
তারা বলে আমার এ দুঃখবোধ যথার্থ;
আমাকে কাঁদতে দাও, এটা আমার অক্ষমতা।
হায়, দেখ, এ সময়ে কে দেখ;
কী কঠিন, কী বিষণ্ন-মায়াহীন!

এটা দীর্ঘ এবং মরক্কো অঞ্চলের লোক স্মৃতিতে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত। যতদূর মনে হয়, এও কৃত্রিম। কারণ এটার একটি আভাসও বাস্তবায়িত হয়নি। এ কারণে সাধারণ

৩৫৮. রোজেনথালে এ স্থলে এ বাক্যটি সংযোজিত আছে—নবম আবু হেফস সম্রাট আল-লেহিয়ানী সম্পর্কে।

৩৫৯. ছন্দের জন্য আব্দুল্লাহ্‌কে আব্দুল ইলাহ্ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

মানুষের মধ্যে এর ব্যাখ্যার অন্ত নেই। যারা বিশেষভাবে এ পূর্বাভাসের পেশায় নিয়োজিত, তারা এর ব্যাখ্যায় আরো জটিলতার স্রষ্টা।

পূর্বাঞ্চলে আমি আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। এটা ইবনে আরবি হাতেমীর নামে প্রচলিত। এর দীর্ঘ প্রহেলিকা প্রায় বাণীর ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। রচনাটি মধ্যে মধ্যে গাণিতিক হেঁয়ালী, রহস্যময় ইঙ্গিত, জীবজন্তুর পূর্ণ ছবি, কর্তিত মস্তক এবং অদ্ভুত সব প্রাণীর আকৃতির দ্বারা সুসজ্জিত। শেষের দিকে 'লাম' বর্ণের অন্ত্যমিলে একটি কসিদা বিদ্যমান। যতদূর মনে হয়, তার সমস্তটাই অশুদ্ধ। কেননা তা কোনো যথার্থ বিদ্যা, যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র বা অন্য কিছু হতে জাত নয়।[৩৬০] আমি শুনেছি, সেখানে নাকি ইবনে সিনা ও ইবনে উকারের নামে প্রচলিত আরো কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ঐগুলোতেও বিশুদ্ধতার কোনো প্রমাণ নেই। কারণ ঐগুলোও গ্রহ সংযোগের ফলাফল থেকে গৃহীত[৩৬১] পূর্বাঞ্চলের আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী আমি দেখেছি; তা তুর্কি সাম্রাজ্যের পূর্বাভাসে রচিত এবং বাজেরিকী নামে এক সুফী সাধকের নামে প্রচলিত। এর সমস্তটাই বর্ণমালার প্রহেলিকা। তার আরম্ভ—

যদি তুমি জিফরের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চাও, হে প্রশ্নকর্তা!
সেই জিফরবিদ্যা, যা হাসানের পিতার[৩৬২] দ্বারা আদিষ্ট।
বুঝি নাও, গ্রহণ কর তার বর্ণ ও বাক্যাবলি,
তার গুণ হৃদয়ঙ্গম কর, যেমন বুদ্ধিমান বিচক্ষণের কাজ।
যা আমাদের সময়ের পূর্বেকার, তার বর্ণনা করব না,
কিন্তু আমি অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা বলব।
বেবিরাস মাসে অবশিষ্ট থাকবে তার পাঁচটির পরে
'হে' ও 'মিমে'র সাথে অস্থির, পর্বত গুহায় নিদ্রিত।
'শিন', তার নাভীর নিচে একটি নিদর্শন রয়েছে,
তার বিচার শক্তি, সেই বিচার যা চিন্তাশীল লোকের।
মিশর ও সিরিয়া ইরাকের ভূমিসহ তার
এবং আজরবাইজান ও তার রাজ্যে ইয়ামেন পর্যন্ত।

---

৩৬০. এর পরে রোজেনথালে নিম্নলিখিত সংযোজনটি বিদ্যমান—
আমি শুনেছি, মিশরের লোকেরা ইবনে আরবি হতে ভবিষ্যদ্বাণীর একটি চমৎকার নিদর্শন বর্ণনা করছে। সম্ভবত এটা পূর্ব বর্ণিত রচনাটির অন্তর্গত নয়। ইবনে আরবি কায়রো নগরীর একটি জন্ম পত্রিকা তৈরি করেছিলেন। তাতে তিনি উক্ত নগরীর আয়ু স্থির করেছেন ৪৬০ বছর। এতে আমরা তার সময়সীমা ৮৩০ (১৪২৬ খ্রি:) পর্যন্ত ধরতে পারি। কারণ আমরা যদি তার প্রদত্ত সৌর বছরকে চান্দ্র বছরে পরিবর্তন করার জন্য প্রতি শতাব্দিতে তিন বছর অতিরিক্ত যোগ করি, তা হলে আমরা অতিরিক্ত চৌদ্দ বছর পাই এবং আমাদের পূর্ববর্তী ৪৬০ + ১৪ = ৪৭৪ বছর হয়। এর সাথে ৩৫৮ (৯৬৯) বছর যোগ করলে ৮৩২ হিজরি পাই। সুতরাং বলা যায় যে কায়রো নগরী ৩৫৮ হিজরিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা ৮৩২ হিজরিতে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য যদি ইবনে আরবির এ জন্ম পত্রিকা শুদ্ধ হয় এবং তাঁর জ্যোতিষী গণনা নির্ভুল হয়।

৩৬১. এর পর রোজেনথালে নিম্নের অনুচ্ছেদটি সংযোজিত হয়েছে—
ইবনে আবু উকারের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কীয় রচনাটি প্রামাণ্য নয়। কেননা ইবনে কিরিয়ার জীবন কাহিনীতে ইবনে খল্লিকান। কিতাবুল আগানী হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আবু উকার তথা মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু উকার সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সমতুল্য, যারা বাস্তবে খুবই পরিচিত, কিন্তু যথার্থ ভিত্তিহীন; যেমন মজনু লায়লা ও ইবনে কিরিয়া। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

৩৬২. হযরত আলী (রাঃ)।

www.amarboi.org

অন্যত্র :

বোরানের বংশধর, যখন তারা তাহেরকে লাভ করল,
নির্ভীক, তীব্র ও শাখার দ্বারা সমর্থিত।
দুর্বল দন্ত 'সিন'কে উৎপাটিত করতে 'সিন' এসেছে,
নয়, যদিও সে উন্নীত এবং 'নূন' শতাব্দীর অধিকারী।
সাহসী জাতি, বুদ্ধি ও পরামর্শের প্রতিভূ
'হের সাথে স্থায়ী হবে এবং শাখার অধিপতির পরে কোথায়।

অন্যত্র :

একটি 'বে' বছরের পরে সে নিহত হবে—
রাজ্যের বাক্‌পটু 'মিমে'র পরামর্শ তার সন্নিহিত।

অন্যত্র :

এ সেই পঙ্গু কালবী, তার সাহায্য কামনা কর;
তার সময়েই দুর্যোগ, সেই দুর্যোগ সম্পর্কে সাবধান হও।
পূর্বদিক থেকে সৈন্যদলসহ সে অগ্রসর হয়ে আসবে,
'ক্বাফ' থেকে সে মুক্ত, অথচ 'ক্বাফ' দুর্যোগের দ্বারা আক্রান্ত।
হত্যায় সে 'দাল' এবং সিরিয়ার ন্যায় সমগ্র অঞ্চল
শোক প্রকাশ আরম্ভ করবে দেশবাসী ও দেশের জন্য।
যখন আসবে, কেঁপে উঠবে, হায়, সমগ্র মিশর
ভূ-কম্পনে এবং 'হে' সর্বদা থাকবে বস্ত্রহীন।
ত্বয়, য়য় ও আইন তারা সকলেই বন্দী হবে
ধ্বংসোন্মুখ এবং অযথা সম্পদ ব্যয় করবে।
'ক্বাফ' ক্বাফকে প্রেরণ করবে তাদের নিকট,
তাকে সহজভাবে নাও; কেননা বাসস্থান হিসাবে দুর্গস্বরূপ।
তারা তার ভাইকে দাঁড় করাবে, সে তাদের মধ্যে ভালো,
সহস্রের সিঁড়ি 'সিন' এ জন্য নির্মাণ করেনি।
তাদের ক্ষমতা হে'র সাহায্যে সম্পূর্ণ হবে এবং
কোনো কালেই কেউ রাজশক্তির নিকটবর্তী হতে পারবে না।

বলা হয় যে, রচয়িতা মালীক জহীর[৩৬৩] এবং তাঁর পিতা তাঁর নিকটে মিশরে আগমন সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছে।

তার পিতা তার নিকট আসবে দেশ ত্যাগের পর,
দীর্ঘ অদর্শন এবং কঠিন ও কদর্য জীবন-যাপন হতে।

কসিদাটির চরণ সংখ্যা বহু এবং যতদূর মনে হয় কৃত্রিম। প্রাচীনকালে এ প্রকার কৃত্রিম রচনার অভাব ছিল না এবং এগুলো বহুল প্রচলিতও ছিল।

ঐতিহাসিকগণ বাগদাদের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, সম্রাট আল-মুক্তাদিরের সময় সেখানে এক চতুর লিপিকর ছিল। মানুষ তাকে দানিয়ালী বলে ডাকত। সে কাগজ পুরাতন করে তাতে প্রাচীন লিপিতে সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নাম সাংকেতিক বর্ণমালায় লিখত। এর দ্বারা সে প্রত্যেকের মনোগত উচ্চাশা ও পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষাকে আভাসে বর্ণনা করত। যেন এগুলো ভবিষ্যদ্বাণী এবং এগুলোর দ্বারা সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে পার্থিব ঐশ্বর্য লাভ করত। সে একবার তার এরূপ রচনায় 'মিম' বর্ণটি তিনবার ব্যবহার করে তাসহ সম্রাট আল-মুক্তাদিরের আশ্রিত পোষ্য

৩৬৩. কোন কোন সংস্করণে এ নামের সাথে 'বারফুক' শব্দটি যুক্ত হয়েছে।

www.amarboi.org

মুফলেহ নামক অমাত্যের কাছে এল। মুফলেহ তখন সাম্রাজ্যের একটি উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। দানিয়ালী তাঁকে বলল, এই তিন মিমের দ্বারা আপনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ 'মুফলেহ মওলা মুক্তাদির'; এর প্রথম বর্ণ থেকে তিনটি মিম নেয়া হয়েছে। এর সাথে সে মুফলেহের সাম্রাজ্যের পদমর্যাদা সম্পর্কীয় বাসনার কিছু বর্ণনাও যোগ করল এবং তাঁর পরিচিত অবস্থাদির কিছু নিদর্শনও এর সাথে মিশাল। ফলে অতি সহজেই মুফলেহ এ হেঁয়ালীতে ধরা পড়লেন এবং তার জন্য প্রচুর সম্পদ দান করলেন। অতঃপর দানিয়ালী উজির হাসান[৩৬৪] ইবনে কাসেম ইবনে ওহাব সম্পর্কেও এরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণী রচনা করে মুফলেহকে দেখাল। উজির তখন পদচ্যুত অবস্থায় ছিলেন। দানিয়ালী তাঁর অবস্থা বর্ণনা করতে পূর্বের ন্যায় বর্ণমালা ব্যবহার করল। তাতে তাঁর নাম ও অন্যান্য নিদর্শন দিল এবং এ কথাও বলল যে, ইনি অষ্টাদশ খলিফার উজির নিযুক্ত হবেন। তাঁর সময়ে সমস্ত বিষয় দৃঢ়তালাভ করবে এবং শত্রুরা ভয় পাবে। তাঁর সময় পৃথিবীতে সমৃদ্ধি দেখা দেবে। সে মুফলেহকেও এ সকল বিষয় অবগত থাকার কথা উল্লেখ করল। সে তাতে অন্যান্য সম্ভাব্য বিষয় এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী যোগ করে দিল। এর পর সম্পূর্ণ বিষয়টি দানিয়ালের প্রতি নির্দেশ করে তা শেষ করল। মুফলেহ এটা দেখে বিস্মিত হলেন। তিনি সম্রাট আল-মুক্তাদিরকে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন এবং এ সকল নিদর্শন ও অবস্থা সম্পর্কে ইবনে ওহাবের যোগ্যতার প্রতি সম্রাটকে আকর্ষণ করলেন। ফলে ইবনে ওহাব মন্ত্রিত্বের পদে বরিত হয়েছিলেন। অথচ এ কৌশলের সম্পূর্ণ ভিত্তিটাই ছিল মিথ্যা ও প্রহেলিকাজাত মূর্খতায় পরিপূর্ণ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কীয় যে রচনাটির সাথে বাজেরিকীর নাম যুক্ত হয়েছে, তাও এ প্রকার একটি অলীক সৃষ্টি।

মিশরের পল্লী অঞ্চলের অনারব হানাফীদের এক শায়খের পুত্র আকমাল উদ্দিনকে[৩৬৫] আমি এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী এবং যার প্রতি এগুলো আরোপিত হয়, সেই সুফী সাধক বাজেরিকী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এ ব্যক্তি তাদের মত ও পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রাখতেন। উত্তরে তিনি বললেন, বাজেরিকী কলন্দরিয়া তরিকার সাধক। এই তরিকার লোকেরা দাড়ি না রাখার এক অভিনব মতের অনুসারী। বাজেরিকী দিব্যানুভূতির দ্বারা ভবিষ্যতের অনেক কথা বলত এবং তার নিকট অবস্থানকারী নির্দিষ্ট লোকের প্রতি তার ইঙ্গিত প্রকাশ করত। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ে সে প্রহেলিকাময় বর্ণমালা দ্বারা কিছু বক্তব্য নির্ধারণ করত। অনেক সময় তার অভ্যাস অনুসারে তা পদ্যের আকারেও বের হয়ে আসত এবং অন্যেরা সেগুলো লিখে নিত। মানুষ এগুলো বোঝার জন্য পাগল হয়ে উঠত। সকলেই এগুলোকে ইঙ্গিতময় ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে করত। সুতরাং এ ব্যাপারে কৃত্রিম পেশাধারীরা প্রতিযোগেই এর মধ্যে প্রক্ষেপ যোগ করেছে এবং সাধারণ মানুষ এ প্রহেলিকার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গলদঘর্ম হয়েছে। অথচ এটা একান্তই অসম্ভব ব্যাপার। কারণ যে কোনো রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য পূর্বাহ্ণে তার নিয়মাবলি জানতে হয় এবং তা নির্ধারণ করতে হয়;

৩৬৪. কোন সংস্করণে 'হুসাইন' বিদ্যমান।

৩৬৫. মুহম্মদ ইবনে মাহমুদ; ৭১০-৭৮৬ (১৩১১-১৩৮৪ খ্রি:) হি:। ইনি সর্বাস্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

www.amarboi.org

যেমন এ পদ্যের বর্ণগুলো, এগুলোর জন্য পূর্বনির্ধারিত একটা অর্থ থাকা দরকার, যা সে অতিক্রম করবে না।

আমি দেখতে পেলাম, এ বিজ্ঞ ব্যক্তিটির বক্তব্যের মধ্যে এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আমার মনে যে একটি অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, তা নিরাময়ের এক মহৌষধি রয়েছে। 'আমরা কখনই সুপথ খুঁজে পেতাম না, যদি না আল্লাহ্ আমাদেরকে সুপথ দেখাতেন।[৩৬৬] পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা এবং তিনিই সহায়।[৩৬৭]

---

৩৬৬. কোরান, ৭, ৪৩।

৩৬৭. এর পরে রোজেনথালে নিম্নোক্ত সংযোজনটি বিদ্যমান। আমরা সম্পূর্ণতার জন্য এটা তুলে দিলাম। পরবর্তীকালে আমি দামেশকে ইবনে কাশিরের ইতিহাসটির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পাই। আমি মিশরের সুলতানের সেনাবাহিনীর সাথে ৮০২ (১৪০০ খ্রি:) হিজরিতে সেখানে গিয়েছিলাম। তখন আমি মিশরে মালেকী মজহাবের কাজী পদে নিযুক্ত।
ইবনে কাসির তাঁর ইতিহাসে ৭২৪ (১৩২৪ খ্রি:) হিজরির ঘটনাবলি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বাজেরিকীর জীবন বৃত্তান্তে বলেছেন, সামসুদ্দিন মুহম্মদ বাজেরিকীকে এক অভিনব মতের অনুসারী 'বাজেরিকীয়া' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়। এ সম্প্রদায় স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। বাজেরিকীর পিতা জামালউদ্দিন আবদুর রহমান ইবনে উমর মোশেলী, ফাকেয়ী মজহাবের একজন ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি দামেশকেই শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পুত্র উক্ত মজহাবের ধারা অনুসারেই বর্ধিত হয় এবং সামান্য কিছু শিক্ষা-দীক্ষার পরই আধ্যাত্মতত্ত্বে জড়িয়ে পড়ে। একটি দল তাকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে এবং তার অনুগামী হয়ে ওঠে। ফলে মালেকী মজহাবের কাজী তার আচার-আচরণের জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং সে পূর্বাঞ্চলে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। সেখানে সে প্রমাণ করতে সক্ষম হয় যে, যারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদের সাথে তার শত্রুতা ছিল। এর ফলে হাম্বলী মজহাবের কাজী তার পূর্ববর্তী দণ্ড মওকুফ করেন।
অতঃপর বাজেরিকী দামেশকের নিকটবর্তী কাবুনে বেশ কিছুদিন বসবাস করে। সে ৭২৪ হিজরির ১৬ রবিউস্‌সানী মোতাবেক ১২ এপ্রিল, ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে বুধবার রাত্রে মারা যায়।
ইবনে কাসির বলেন, বাজেরিকী 'জিফর' সম্পর্কে একটি পদ্য রচনা করেছে, যার আরম্ভটি নিম্নরূপ :
শোন এবং বর্ণমালা ও তাদের সংখ্যা মান হৃদয়ঙ্গম কর;
তার বিবরণ একজন বুদ্ধিমান চতুর লোকের ন্যায় বুঝে নাও।
সিরিয়া ও মিশরে কী হবে, আকাশের প্রভু তা বলবেন,
তাতে কল্যাণ আছে আর আছে সীমাহীন দুর্যোগ।
বেবিরাসকে একটি পানপাত্র দেয়া হবে পাঁচজনের পর পান করতে
এবং স্নেহ ও স্নিগ্ধ অস্থিরতার সাথে কোমল শয্যায় শায়িত।
হায়, দামেশক তার ভূমিতে কী পতিত হচ্ছে—
তারা আল্লাহ্র গৃহ ধ্বংস করেছে, কী সুন্দর তার নির্মাণ!
এটা নিপাত যাক, ধর্মের বিরুদ্ধে কত কী, কতজনকে নিহত করেছে;
জ্ঞানী ও অভাজনদের কত রক্ত তারা পাত করেছে।
কত কোলাহল, কত বন্দী, কত লুটপাটের নির্মম দৃশ্য—
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড!
অস্তিত্ব অন্ধকার এবং দেশ বিষণ্ন জর্জর
এমন কি কবুতরগুলোর বৃক্ষশাখায় রোরুদ্যমান।
হায়, অসহায় সৃষ্টি! ধর্মের কি কোনো সহায় নেই!
উঠ এবং প্রান্তর ও পর্বত হতে সিরিয়ায় যাও।
ইরাক এবং উচ্চ ও নিম্ন মিশরের আরবেরা আসছে,
অধর্মের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠেছে।

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

বিভিন্ন দেশ ও নগরী
সমগ্র মানব সভ্যতা এবং
তাদের ক্রিয়াশীল আগত ও অনাগত অবস্থাসমূহ।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রথম পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্য শহর-নগরের পূর্ববর্তী এবং এগুলো রাজশক্তির দ্বিতীয় ফসল]

এর বর্ণনা এই যে, স্থাপত্য ও সৌধশ্রেণী নির্মাণ একান্তভাবে নাগরিকত্বের লক্ষণ, যা বিলাসব্যসন ও সাচ্ছন্দ্যের দিকে আকর্ষণ করে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এটা প্রান্তরীয় জীবন এবং লক্ষণাদির পরবর্তী স্তর। তদুপরি নগর শহর স্বভাবত প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিরাট সৌধ ও ব্যাপক স্থাপত্যের অধিকারী এবং এগুলো সর্বসাধারণের সম্পদ হিসাবেই গড়ে ওঠে; ব্যক্তিবিশেষের নয়। এজন্যই এগুলো নির্মাণে বহুলোকের শ্রম ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। অবশ্য এটা এমন প্রয়োজনীয় স্তরের নয়, যার অনস্বীকার্যতা সর্বজনীন এবং তার নির্মাণে সকলেই বাধ্য হয়ে সাড়া দেবে। বরং এগুলো নির্মাণ করতে তাদেরকে বাধ্য করতে হয়। রাজদণ্ড এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় কিংবা প্রতিদান ও পারিশ্রমিকের প্রলোভন তাদেরকে আকর্ষণ করে। কেননা একমাত্র রাজশক্তির পক্ষেই এই উভয় কাজ করা সম্ভব। সুতরাং রাজশক্তির ও সাম্রাজ্যের জন্যই শহর পত্তন ও নগর পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

অতঃপর যখন নগরীর পত্তন হল এবং প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিভঙ্গি, ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর প্রয়োজন অনুসারে তার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হল, তখন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বই তার স্থায়িত্ব। সুতরাং সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল যদি সংকীর্ণ হয়, তা হলে তার শেষ অবস্থায় নগরীর সমৃদ্ধি স্তিমিত হয়ে আসে ও তার জনবসতি সংকুচিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে যদি তার আয়ু দীর্ঘ ও পরিধি ব্যাপক হয়, তা হলে অনবরত তাতে নির্মাণকার্য চলতে থাকে, বিলাসবহুল গৃহাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও বাজারের বিন্যাস ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এমনকি এর ফলে নগরীর পরিধি বিস্তৃত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করে এবং তার অঙ্গন প্রশস্ততর হয়ে ওঠে। যেমন বাগদাদ ও অনুরূপ অন্যান্য নগরীর বেলায় ঘটেছে।

খাতিব[১] তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, সম্রাট মামুনের সময় বাগদাদে সাধারণ স্নানাগারের সংখ্যা ছিল পঁয়ষট্টি হাজার। এর সংশ্লিষ্ট ও নিকটবর্তী উপশহর ও মহল্লার সংখ্যা চল্লিশকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এটা একক প্রাচীরবেষ্টিত নগরী ছিল না। কারণ জনসংখ্যার বিস্তৃতি তাতে অতিক্রম করেছিল। ইসলামী সাম্রাজ্যে কায়রোয়ান, কার্ডোভা ও মাহদিয়ার অবস্থা অনুরূপ ছিল। এর পরে বর্তমানে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি মিশরের অবস্থাও এরূপ।

---

১. আহমদ ইবনে আলী; ৩৯২-৪৬৩ (১০০২-১০৭১ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

নগরী পত্তনকারী সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটলে, যদি উক্ত নগরীর উপকণ্ঠে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে পর্বত, সমতল প্রান্তর থাকে, যে স্থান থেকে সর্বদা তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তা হলে এ প্রকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে এবং সাম্রাজ্যের পরেও তার আয়ুষ্কাল স্থায়ী হয়। যেমন, পাঠক, মাগরিবের ফেজ ও বগি এবং পূর্বাঞ্চলে ইরাকে আজমকে আপনি দেখতে পাবেন। পাহাড়ি অঞ্চলের লোক দ্বারা তাদের জনবসতি অটুট রয়েছে। কারণ প্রান্তরবাসীদের জীবন যখন উপার্জন ও স্বাচ্ছন্দ্যের সীমায় পৌঁছে, তখন তারা স্বস্তি ও শান্তির অন্বেষণ করে। কেননা এটাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সুতরাং তারা নগর ও শহরাঞ্চলে এসে তার জীবন গ্রহণ করে। কিন্তু যদি এ প্রকার নগরীর সন্নিহিত প্রান্তর জীবন থেকে তার প্রয়োজনীয় সহায়তার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তা হলে সাম্রাজ্যের পতন তার সুসংবদ্ধতা নষ্ট করে দেয়, তার সংরক্ষণ ভেঙে পড়ে, ধীরে ধীরে তার জনবসতি কমতে থাকে এবং একসময়ে তার অধিবাসীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে তাকে উজাড় করে ফেলে। যেমন পূর্বাঞ্চলে মিশর,[২] বাগদাদ ও কুফা এবং পশ্চিমাঞ্চলে কায়রোয়ান, মাহদিয়া ও বনি হাম্মাদের কেলআ। এ প্রকার আরো নগরী বিদ্যমান; পাঠক, হৃদয়ঙ্গম করুন।

অনেক সময় নগরীর পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠাতারা অতীত হলেও তার বুকে অন্য রাজশক্তি, ভিন্ন সাম্রাজ্যের পদার্পণ ঘটে। তারা নতুন নগরীর পত্তন না করে এটাকে তাদের স্থায়ী নিবাস ও রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করে। সুতরাং তারা এর সংস্থাপনকে রক্ষা করে এবং এর স্থাপত্য ও শিল্পকীর্তি বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে এ সাম্রাজ্যের অবস্থার সমৃদ্ধি ও বিলাসের ব্যাপকতায় উক্ত নগরী আবার নতুন জীবন ফিরে পায়। যেমন বর্তমান সময়ে ফেজ ও কায়রোর ব্যাপারে ঘটেছে। আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান, সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।[৩]

---

২. সম্ভবত 'ফুস্তত' নগরী।

৩. রোজেনথালে এ বাক্যটির পরিবর্তে—'এটা বুঝে নেয়া উচিত এবং সৃষ্টিতে আল্লাহ্র রহস্যলীলা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।'

www.amarboi.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[রাজশক্তি নাগরিক জীবনের দিকে আকর্ষণ করে]

এটা এই যে, গোত্র ও গোত্রশক্তিগুলো যখন রাজশক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে, তখন দুটি কারণে তারা নাগরিক জীবনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর হয়। এর একটি—রাজশক্তি তাদেরকে শান্তি-স্বস্তি ও দুঃসহভার নামিয়ে বিশ্রামের দিকে আকর্ষণ করে এবং প্রান্তরীয় জীবনে সভ্যতার যে ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের মধ্যে ছিল, তা দূর করে তাকে পরিপূর্ণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যটি হল—রাজশক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগীদের সহিংস দৃষ্টি থেকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন তাদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কারণ তাদের সীমান্তবর্তী যে সকল নগর-বন্দর আছে, সেগুলো অনেক সময়েই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের আশ্রয়স্থল এবং তাদের বিদ্রোহের উৎসভূমি হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত এরই সাহায্যে তারা তাদের হস্তচ্যুত রাজশক্তিকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা চালায়। এজন্যই রাজশক্তির অধিকারীরা নগরের সাহায্য গ্রহণ করে তাদেরকে পরাজিত করে। কারণ নগরের উপর আধিপত্য বিস্তার অত্যন্ত আয়াসসাধ্য ও কঠিন ব্যাপার। এদিক থেকেই নগর সশস্ত্র বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তাতে প্রাচীর ও অন্যান্য বাধাবিপত্তি এমন সুবন্দোবস্ত রয়েছে, যা প্রচুর সৈন্যসংখ্যা ও প্রভূত শৌর্যবীর্য ছাড়াই সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। কারণ এই শৌর্যবীর্য ও গোত্রশক্তির প্রয়োজন যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র দৃঢ়তার জন্যই দেখা দেয়। যেহেতু সেখানে একদল অন্য দলের উপর বারবার আক্রমণ পরিচালনা করে, সেই জন্য দৃঢ়তাই সেখানে সকলের কাম্য হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে নগরবাসীরা প্রাচীরের আশ্রয়ে সেই দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে থাকে। সুতরাং তাদের জন্য ব্যাপক গোত্রশক্তি ও বিরাট সৈন্যসংখ্যার প্রয়োজন হয় না। এদিক থেকে নগর দুর্গস্বরূপ। যারা এ দুর্গে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে, অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই প্রতিদ্বন্দ্বী, রাজ্যকামী শক্তির তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় মনোবল ও প্রচেষ্টা ভেঙে পড়ে।

এ কারণেই রাজশক্তির অধিকারীরা তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শহর-নগর থাকলে সম্ভাব্য পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে বসে। যদি সেখানে তদ্রূপ কিছু না থাকে, তবে সর্বপ্রথম তারা তাদের সভ্যতার অগ্রগতির প্রয়োজনে তার বন্দোবস্ত করতে তৎপর হয় এবং তার নিশ্চিত আশ্রয়ে নিজের দুঃসহ বোঝা নামিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। অন্যদিকে এর ফলে রাজ্যকামী শক্তির পথে বাধার সৃষ্টি হয় এবং অন্তর্গত ও বহিরাগত বিদ্রোহ প্রতিরোধ সহজতর হয়ে ওঠে।

উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হল যে, রাজশক্তি নাগরিক জীবনে পদার্পণ ও তার উপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রতি আকর্ষণ করে থাকে। আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান; তিনি সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ এবং তিনিই একমাত্র সহায়। কেননা তিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিপালক নেই।

www.amarboi.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[একমাত্র সমৃদ্ধ রাজশক্তিই বিরাট নগরী ও সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করতে সক্ষম]

আমরা ইতিপূর্বে সাম্রাজ্যের নিদর্শন স্থাপত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। এগুলো তার শক্তির অনুপাতেই হয়ে থাকে। কেননা নগর-নগরীর প্রতিষ্ঠা বহু কর্মী ও বহুতর সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়। সুতরাং কোনো সাম্রাজ্য যদি বৃহদাকার ও ব্যাপক পরিধির হয়, তা হলে দূর-দূরান্ত থেকে কর্মীরা এসে একত্র হতে পারে এবং তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক সময় এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়, যাতে স্থাপত্যের উপযোগী ভার বহন সহজ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এগুলোর সাহায্য ছাড়া মানুষের শক্তিসামর্থ্য অনেক সময়েই এ প্রকার বিরাট কার্যের জন্য পর্যাপ্ত নয়। যেমন কপিকল ও এই ধরনের অন্যান্য যন্ত্র।

প্রাচীনকালের নিদর্শন ও বৃহৎ সৌধাবলি, যেমন খসরুর দরবারগৃহ, মিশরের পিরামিড, মাগরিব অঞ্চলের শেরশাল (চার্চিল) এবং মালগার (কার্থেজের) খিলানসমূহ দেখে বহুলোকেরই এ ধারণা জন্মায় যে, এগুলো তারা সম্মিলিত ও একক দৈহিক শক্তিতে নির্মাণ করেছিল। সুতরাং এগুলোর বিরাটত্ব অনুসারে তাদের বিরাট দেহের কল্পনা করা হয়; যাতে ঐ সকল দেহ দৈর্ঘ্যে শক্তিতে এ সমস্ত বৃহদাকার স্থাপত্যের নির্মাতা হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে তারা যন্ত্রপাতি, কপিকল ও জ্যামিতিক কলা-কৌশলের প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্মৃত হয়।

যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে, তাদের অধিকাংশের পক্ষেই অনারব সাম্রাজ্যগুলোতে স্থাপত্য, তার জন্য প্রয়োজনীয় ভার বহনের কৌশল এবং অন্যান্য সাহায্য স্বচক্ষে দর্শন করা সম্ভব। এ অভিজ্ঞতা আমাদের বক্তব্যের চাক্ষুষ প্রমাণ হিসাবে কাজ করবে।

বর্তমানকালে প্রাচীন নিদর্শনাবলিকে সাধারণ মানুষ 'আদ' জাতির কীর্তি বলে মনে করে। এটা প্রাচীন একটি জাতির নাম। কারণ সাধারণ মানুষের ধারণা এ জাতির লোকেরা বিরাট দেহ ও বিপুল শক্তির অধিকারী ছিল বলেই তাদের নির্মিত সৌধাবলি এরূপ বিরাট হতে পেরেছে। অথচ বিষয়টি আদৌ তা নয়। কারণ আমরা এমন অনেক জাতির কীর্তি সৌধ আমাদের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি, যাদের দৈহিক আকৃতি সম্পর্কে আমরা অবহিত। এগুলো সেই প্রাচীন স্থাপত্যের সমতুল্য বিরাট কিংবা তদপেক্ষাও বৃহদাকার। যেমন খসরুর দরবারগৃহ, আফ্রিকিয়ার শিয়া সম্রাট উবাইদীদের সৌধাবলি

www.amarboi.org

এবং সিনহাজা, যাদের কীর্তিমালা বনি হাম্মাদের 'কেলআ'র মিনারগুলোতে বর্তমানকাল পর্যন্ত দৃশ্যমান। এরূপ কায়রোয়ানের মসজিদে আগলাবীদের স্থাপত্য, রাবাতে আল-মোহেদদের নির্মাণ কৌশল এবং চল্লিশ বছর ধরে সুলতান আবু সায়িদের তিলমিসানের বিপরীত দিকে আল-মনসুরায় নির্মিত সৌধাবলি।[৪] এরূপভাবে কার্থেজের খিলানগুলোর কথা বলা যায়, যার মাধ্যমে উর্ধ্বগামী প্রণালীর দ্বারা অত্র এলাকার অধিবাসীরা নগরে পানীয় জল সরবরাহ করত। এগুলো বর্তমানকালেও আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে। অনুরূপ দূর ও নিকটের অন্যান্য স্থাপত্য ও বৃহদাকার সৌধ, যাদের নির্মাতাদের সংবাদ আমাদের গোচরীভূত হয়েছে, তাতেই আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে, তারা আদৌ বিরাট দেহের অধিকারী ছিল না। এটা একমাত্র আদ, সামুদ ও আমালেকাদের সম্পর্কে কাহিনী রচয়িতাদের উর্বর মস্তিষ্কের ধারণা।

বর্তমানকালেও আমরা পর্বতগাত্রে খোদিত সামুদ জাতির আবাসস্থল দেখতে পাই। বিশুদ্ধ হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে যে, এগুলোই তাদের বাসস্থান ছিল এবং বহু বছর ধরে হজগামী কাফেলার লোকেরা এগুলো প্রত্যক্ষ করে আসছে। তারা অভ্যন্তর ভাগ, পরিধি ও উচ্চতায় কোনোক্রমেই অস্বাভাবিক নয়। সাধারণ মানুষ ধারণার বশবর্তী হয়েই এগুলো সম্পর্কে আতিশয্য প্রদর্শন করেছে। এমন কি তারা ধারণা পোষণ করে যে, উজ ইবনে ইনাক, আমালেকা গোত্রের একটি লোক এত দীর্ঘ ছিল যে, সে সমুদ্র থেকে তাজা মাছ ধরে তা সূর্যের মধ্যে ঝলসে নিয়ে আহার করত। এতে তাদের এ ধারণাও প্রকাশ পাচ্ছে যে, সূর্যের নিকটবর্তী স্থলে তা অত্যধিক উষ্ণ। কিন্তু তারা জানে না যে, সূর্যের উষ্ণতা আমাদের নিকটেই অধিক এবং তাও তার কিরণমালা ভূপৃষ্ঠ ও তার বায়ুতে প্রতিফলিত হয়েই সৃষ্টি করে। নতুবা সূর্য তার স্বরূপে উষ্ণও নয়, শীতলও নয়। তা অবিমিশ্র এক উজ্জ্বল নক্ষত্র মাত্র।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা বিদ্যমান। সেখানে আমরা বর্ণনা করেছি যে, সাম্রাজ্যের কীর্তিমালা তার মৌল শক্তির অনুপাতেই স্থাপিত হয়। আল্লাহ্ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে আজ্ঞা করেন।[৫]

---

৪. রোজেনথালে আবু সায়িদের পরিবর্তে আবুল হাসানের নাম বিদ্যমান। প্রথম জন (১৩১০-৩১ খ্রি:) পরবর্তীকালীন।

৫. কোরান, ৩, ৪৭।

www.amarboi.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[বৃহৎ ও ব্যাপক সৌধ কীর্তি স্থাপন কোনো একক সম্রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়]

এর কারণ সম্পর্কে আমরা পূর্বে যা বর্ণনা করেছি, তা এই যে, স্থাপত্যের জন্য ব্যাপক সহযোগিতা ও মানবিক সামর্থ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রয়োজনীয়। অনেক সময় নির্মাণকার্য তার বিরাটত্বের জন্যই একক বা সম্মিলিত যন্ত্রপাতির সাহায্যেও নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে না, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। বরং পরবর্তীকালে তার সম্পূর্ণতা বিধানের জন্য পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রথম তার ভিত্তি স্থাপন করে এবং পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এসে তাতে যোগ দেয়। এদের প্রত্যেকেই সাধ্যানুসারে কর্মী ও শ্রমের একত্রীকরণের প্রচেষ্টা চালায়। ফলে সমগ্র প্রচেষ্টা একত্র হয়ে উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং নির্মাণকাজ পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে যে কেউ একে দেখে মনে করে, তা একই সাম্রাজ্যের কীর্তি।

পাঠক, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের বর্ণিত 'মারেব' বাঁধের প্রতি লক্ষ করুন। এ বাঁধের নির্মাণ কাজ সাবা ইবনে ইয়াশজুব আরম্ভ করেন এবং তিনি সত্তরটি নদীকে তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে সক্ষম হন। কিন্তু মৃত্যু এসে তার এ নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করতে বাধা দেয়। পরবর্তীকালে হিমিয়ার সম্রাটেরা তার পূর্ণতা সাধন করেন।

অনুরূপভাবে কার্থেজ ও তার উন্নত খিলানের উপর দিয়ে পানীয় জল বহনের প্রণালী নির্মাণ সম্পর্কেও বর্ণনা বিদ্যমান। বস্তুত যে কোনো বৃহদাকার নির্মাণকার্যের সাধারণ অবস্থাই এরূপ। এই বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে আমরা বর্তমানকালেও দেখতে পাই, হয়ত কোনো রাজশক্তি একটি বিরাট কাজ আরম্ভ করে তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা অনুসারে ভিত্তি স্থাপন করল। কিন্তু তার পরবর্তী সম্রাটগণ তার পরিপূর্ণতা সাধনে তৎপর না হওয়ার ফলে তা অনুরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পড়ে থাকে। এক্ষেত্রে আমরা এও দেখতে পাই যে, এমন বহু প্রাচীন নির্মাণকীর্তি বিদ্যমান, যা ধ্বংস করে ফেলাও সাম্রাজ্য শক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। যদিও এ কথা স্বীকার্য যে, নির্মাণ অপেক্ষা ধ্বংস সাধন বহুগুণে সহজ। কারণ ধ্বংস তার প্রাথমিক অবস্থা, অস্তিত্বহীনতার দিকে প্রত্যাবর্তন করায় এবং নির্মাণ তার বিপরীত ধারায় একটি অস্তিত্বকে মূর্তিমান করে তোলে। সুতরাং আমরা যদি এমন কোনো নির্মাণকার্যের সাক্ষাৎ পাই, ধ্বংস করা সহজসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও যার ধ্বংস সাধন সম্ভব হয় না, তা হলে আমরা এ কথাই বুঝতে সক্ষম হই যে, তার নির্মাতাগণ ব্যাপক শক্তির অধিকারী ছিল এবং একক কোনো সাম্রাজ্যের পক্ষে তার নির্মাণ সম্ভব হয়নি।

www.amarboi.org

খসরুর দরবার গৃহের ব্যাপারে আরবরাই অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। সম্রাট হারুনুর রশীদ তা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করেন। তিনি ইয়াহিয়া ইবনে খালিদের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে পাঠান। ইয়াহিয়া তখন কারাগারে বন্দী; সেই অবস্থায় সম্রাটকে বলে পাঠান, আমীরুল মোমেনীন, এরূপ করবেন না; বরং তাকে দণ্ডায়মান থাকতে দিন। তা আপনার পিতৃপুরুষের শৌর্যের কথাই প্রকাশ করবে এবং মানুষের মনে এ ধারণারই সৃষ্টি করবে যে, যারা এরূপ বিরাট নির্মাণকার্যের অধিপতিদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে, তারা কতই না শক্তিশালী ছিল। কিন্তু সম্রাট তার এ পরামর্শে সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, নিশ্চয় অনারবদের প্রতি সহানুভূতিই তাকে এ প্রকার পরামর্শ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাকে ধ্বংস করেই ছাড়ব। অতঃপর তিনি তাকে ভেঙে ফেলার জন্য বহু শ্রমিক নিয়োগ করলেন। তাকে আগুন দ্বারা উত্তপ্ত করে কুঠার ব্যবহার করালেন। কিন্তু ভেঙে ফেলা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত করার পর যখন অক্ষমতা প্রকাশ পেল, তখন তিনি অসম্মানের ভয়ে ভীত হয়ে উঠলেন। আবার ইয়াহিয়ার নিকট লোক পাঠালে তিনি তাঁকে ধ্বংস না করার পরামর্শ দিয়ে বললেন, আমীরুল মোমেনীন, আপনি এ ইচ্ছা ত্যাগ করুন। কারণ এর জন্য অধিককাল ব্যয় করলে মানুষ বলতে আরম্ভ করবে যে, আরবের সম্রাট আমীরুল মোমেনীন অনারবদের একটি নির্মাণ কীর্তি ভেঙে ফেলতেও সমর্থ হলেন না। সম্রাট এবার তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন এবং তার ধ্বংস সাধন থেকে বিরত হলেন।

এরূপ সম্রাট মামুনও মিশরের পিরামিড ভেঙে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে বহু শ্রমিক নিয়োগ করেন; কিন্তু দীর্ঘকালেও কিছু হয়নি। শ্রমিকরা তার গাত্রদেশে একটি সুড়ঙ্গ কাটতে সমর্থ হয় এবং তার দ্বারা বহির্প্রাচীর ও অন্তর্প্রাচীরের মধ্যবর্তী একটি উন্মুক্ত স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ধ্বংস প্রচেষ্টার এটাই ছিল শেষ পরিণতি। বর্তমানকালেও নাকি এই সুড়ঙ্গটি বিদ্যমান। বহু লোকের ধারণা মামুন উক্ত প্রাচীরদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বহু ধনরত্ন লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

বর্তমানকালে ঝুলন্ত খিলানগুলোর ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনা দেখা যাচ্ছে। তিউনিসের লোকেরা নির্মাণকার্যে পাথর ব্যবহার করে এবং কারিগররা ঐ সকল খিলানের পাথর উক্ত কাজে খুবই পছন্দ করে থাকে। এ জন্য দীর্ঘদিন যাবত তারা এগুলো ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু বহু ঘর্মপাত করার পরই শুধু তার সামান্য অংশ স্থানচ্যুত করতে সক্ষম হয়। এ কার্যে নিযুক্ত বহু দলের চেষ্টা সেখানে খুবই পরিচিত। আমিও বাল্যকালে তার বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কার্যাবলিকে সৃষ্টি করেছেন।[৬]

৬. কোরান, ৯৬।

www.amarboi.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[নগর পরিকল্পনায় যে সকল বিষয় লক্ষ রাখা দরকার এবং তৎপ্রতি উদাসীনতা যে পরিণামের সৃষ্টি করে]

জেনে রাখুন, নগর এমন একটি আবাসস্থল, যা মানুষ তার বিলাসব্যসন ও তদানুষঙ্গিক ইচ্ছেগুলোর পরিপূরণের উদ্দেশ্যে অবলম্বন করে থাকে। তখন তারা শান্তি ও স্বস্তি চায় এবং তার জন্যই প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্মাণ করে। সুতরাং এ ব্যাপারটি যখন তারা বাসস্থান ও আশ্রয়ের জন্য গ্রহণ করে, তখন তাতে সম্ভাব্য অকল্যাণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং উপকারিতা ও উপযোগিতার বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

অকল্যাণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসাবে এটা লক্ষ রাখতে হবে, যাতে উক্ত নগরের বাসস্থানগুলো একটি প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে সুরক্ষিত হয়। উক্ত নগর এমন দুর্ভেদ্য স্থানে পত্তন করতে হবে, যেখানে সহজে অনুপ্রবেশ করা না যায়। যেমন কোনো দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল কিংবা সাগর বা নদীর দ্বারা বেষ্টিত কোনো এলাকা; যাতে কোনো সেতু বা বাঁধ ছাড়া প্রবেশ করা সত্যিই দুঃসাধ্য হয়। এর ফলে শত্রুর পক্ষে তার উপর আধিপত্য বিস্তার দুরূহ এবং তার প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা দৃঢ়তর হয়ে উঠবে।

নগরকে পরিবেশগত অকল্যাণ তথা রোগ-শোকাদির প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করার জন্য এটা লক্ষ রাখতে হবে, যাতে তার আবহাওয়া ভালো হয়। কারণ বায়ু যদি স্থির ও দূষিত হয় এবং দূষিত জলাশয়, দুর্গন্ধযুক্ত পয়ঃপ্রণালী অথবা স্যাঁতসেঁতে স্থানের নিকটবর্তী হয়, তা হলে এ সাহচর্যের ফলে বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে ওঠে এবং নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট জীবকুলকে রোগাক্রান্ত করে তোলে। এটা পর্যবেক্ষণের দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ যে সকল নগরে ভালো আবহাওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা হয় না, সেখানে সাধারণভাবে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

মাগরিবের আফ্রিকিয়ার জারিদ অঞ্চল 'কাবেস' নগর এ ব্যাপারে বিখ্যাত। তাতে বসবাসকারী ও আগত কেউই এ কারণে এক প্রকার দূষিত জ্বরের আক্রমণ থেকে মুক্তি পায় না। বলা হয় যে, এর পাদুর্ভাব ইদানীং ঘটেছে; পূর্বে এরূপ ছিল না। এর কারণ হিসাবে আল বকরী বর্ণনা করেছেন যে, ঐ নগরে নাকি একটি গর্ত দেখা দেয় এবং তার মধ্যে তামার তৈরি একটি পাত্র পাওয়া যায়, যার মুখ সীসার দ্বারা ঢালাই করা ছিল। তার মুখের ছিপিটি খুলবার পর তা থেকে ধোঁয়া বের হয়ে বায়ুর সাথে মিশে গেছে। এর পর থেকেই সেখানে এরূপ জ্বর দেখা দিতে থাকে। সম্ভবত এ বক্তব্যের দ্বারা এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে, উক্ত পাত্রে কোনো যাদু প্রক্রিয়ার দ্বারা রোগ-শোককে বন্দী করে

www.amarboi.org

রাখা হয়েছিল, এখন তা ছুটে যাওয়ায় উক্ত নগরে রোগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।

এ প্রকার একটি ধারণা সাধারণ লোকের সংস্কার এবং তাদের অলীক গল্পগুজবের বিষয় মাত্র। আলবকরী[৭] এমন কোনো পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন না, যাতে তিনি এ ধারণার প্রতিবাদ বা তার দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারেন। সুতরাং তিনি যেমন শুনেছেন, তেমনই বর্ণনা করেছেন।

পাঠক, আপনার সম্মুখে যা সত্যকে প্রকাশ করবে, তা এই যে, দূষিত বায়ুর স্থিতাবস্থাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবদেহে দোষের অনুপ্রবেশ এবং জ্বরাদি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। সুতরাং এরূপ পরিবেশে যদি বায়ুস্রোত প্রবাহিত হয়ে ডানে-বামে প্রসারিত ও প্রধাবিত হয়, তা হলে তাতে জাত প্রাণিদেহের রোগ-শোকাদি অনেকাংশে দূরীভূত হয়ে যায়।

নগর যদি ঘন জনবসতিপূর্ণ হয় এবং মানুষের চলাচল বৃদ্ধি পায়, তা হলে বাতাস অবশ্যকীয় তরঙ্গাভিঘাত লাভ করে। বাইরের বায়ু তাতে প্রবেশ করে তার স্থিতাবস্থাকে দূর করে এবং এর বায়ুর চলাচল ও প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জনবসতি কমে গেলে বায়ু আর পূর্বানুরূপ চলাচল ও প্রবাহের সৃষ্টি করতে পারে না। তা স্থির ও নিশ্চল হওয়ার ফলে তার দূষিতাবস্থা বৃদ্ধি পায় এবং অকল্যাণের বাহক হয়ে ওঠে। এ কাবেস শহর, আফ্রিকিয়ার নবীন জনসমাগমের সময় ঘনবসতিপূর্ণ এবং অধিবাসীদের চলাচলে তরঙ্গায়িত ছিল। এ কারণেই তার বায়ু স্রোতশীল, প্রবহমান এবং অকল্যাণ দূরীকরণে সহায়ক ছিল। সুতরাং তার দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং রোগ-শোকের প্রাদুর্ভাব কম ছিল। অতঃপর তার জনবসতি হ্রাস পেলে তার দূষিত বায়ু স্থির হয়ে পানীয় জলকে দূষিত করে তোলে এবং পরিবেশ দূষিত হয়ে রোগের প্রকোপ ঘটায়। এটা ভিন্ন অন্য কোনো কারণ নেই।

আমরা এর বিপরীত অবস্থাও দেখতে পেয়েছি। এমন একটি শহর, যার পত্তনের সময় জলবায়ুর প্রতি খুব একটা দৃষ্টি দেয়া হয়নি; এ কারণে তার জনবসতি অল্প ছিল এবং রোগ-শোকের প্রকোপ ছিল বেশি। অতঃপর তার জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ প্রাথমিক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। এর উদাহরণ বর্তমানকালে রাজধানী ফেজ, যাকে 'নতুন শহর'[৮] বলে অভিহিত করা হয়। পৃথিবীতে অনুরূপ উদাহরণ প্রচুর। পাঠক, এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করুন, তা হলে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

নগর পরিকল্পনায় সাধারণের উপকার ও সুযোগ-সুবিধা বিধানের জন্য কতিপয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক। তন্মধ্যে পানীয় জল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং নগরটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত হবে কিংবা তার কাছে সুপেয় জলের একাধিক ঝর্ণা থাকবে। কারণ নগরের সন্নিকটে জলের ব্যবস্থা থাকলে তা অধিবাসীদের জলের প্রয়োজনকে সহজে পূরণ করতে সক্ষম। কেননা জল একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এর ফলে সাধারণ মানুষের জন্য তার নিকট অবস্থান এক ব্যাপক সুযোগের সৃষ্টি করবে।

---

৭. ৪৯ পৃ: দ্র:।

৮. এর পত্তনকাল ৬৭৪ (১২৭৬ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

নগরের জন্য অন্য লক্ষণীয় সুযোগের মধ্যে গৃহপালিত পশুদের চারণভূমি। কেননা প্রতিটি গৃহস্বামীর জন্যই প্রজনন, দুগ্ধ ও আরোহণের জন্য বিভিন্ন প্রকার পশু প্রতিপালন করা প্রয়োজন এবং তাদের উপযোগী চারণভূমিও দরকার। সুতরাং এরূপ চারণভূমি যদি উর্বর ও নিকটবর্তী হয়, তা হলে তা তাদের জন্য অধিক সুযোগ এনে দেয়। কেননা তার দূরাবস্থান একান্তই পীড়াদায়ক। অনুরূপভাবে নগরের জন্য কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজন। কেননা শস্যই আহার্যের প্রধান উপকরণ। সুতরাং নগরীর কৃষিক্ষেত্রগুলো যদি তার নিকটবর্তী হয়, তা হলে তা কর্ষণ এবং তা থেকে শস্যাদি আহরণ সহজতর হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে নির্মাণ কাজ ও রন্ধনের জন্য বৃক্ষাদির প্রয়োজন। কারণ রন্ধনকার্য ও অন্যান্য উত্তাপ সৃষ্টির জ্বালানি হিসাবে কাঠের প্রয়োজন খুবই সাধারণ ব্যাপার এবং ছাদের জন্যও এর আবশ্যকতা রয়েছে। এতদ্ব্যতীতও কাঠ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমাগ্রীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নগর পরিকল্পনায় আরো লক্ষণীয় ব্যাপার হল, যাতে তা সাগরের নিকটবর্তী স্থলে অবস্থিত হয়। এর ফলে দূর-দূরান্ত থেকে এতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনয়নে সুবিধা হবে। অবশ্য এ প্রকার অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা পূর্বগুলো অপেক্ষা গৌণ। বস্তুত, প্রয়োজনের পার্থক্যের জন্যই তার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে অধিবাসীদের প্রয়োজনই সর্বাগ্রে স্থান পায়।

নগর পত্তনকারী অনেক সময় সুন্দর ও শোভন প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। অথবা তিনি তার নিজের চিন্তাধারা ও স্বজাতির প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখেই তার পরিকল্পনা করেন। তাতে অন্যের চিন্তা স্থান পায় না। যেমন ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবরা ইরাক ও আফ্রিকিয়ার নগর পত্তনে অবলম্বন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি, যেমন উটের চারণভূমি, তার উপযোগী বৃক্ষ-লতা ও লবণাক্ত পানীয়ের প্রতি লক্ষ রেখেছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় পানীয় জল, কৃষিক্ষেত্র, বৃক্ষাদি, গৃহপালিত অন্যান্য পশুর চারণভূমি এবং অনুরূপ অন্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেননি। যেমন তাদের প্রতিষ্ঠিত কায়রোয়ান, কুফা, বসরা প্রভৃতি শহর। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি লক্ষ না রাখার ফলেই এগুলো অতি সহজে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে।

সমুদ্র তীরবর্তী নগরগুলোতে যে বিষয়টি লক্ষ রাখা দরকার, তা এই যে, এগুলো যেন পার্বত্য এলাকায় অথবা ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যখানে স্থাপিত হয়। যাতে নগরের উপর কোনোপ্রকার বহিরাক্রমণের সূত্রপাত হলে তারা সমবেতভাবে প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে পারে। এর কারণ এই যে, কোনো নগর সমুদ্রতীরে যদি এমনভাবে অবস্থিত হয়, যার পার্শ্বে গোত্র ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনবসতি বিদ্যমান না থাকে এবং তারা দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল দ্বারা সংরক্ষিত না হয়, তা হলে তার উপর রাত্রিকালীন অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। সামুদ্রিক রণতরীগুলো অতি সহজেই এর উপর চড়াও হয়ে ক্ষতিসাধন করতে পারে। কারণ তারা বুঝতে পারে যে, সেখানে প্রতিরোধের তেমন কোনো সুবন্দোবস্ত নেই। কেননা নগর জীবনে অভ্যস্ত অধিবাসীরা স্বস্তির মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে যুদ্ধাভিযানের স্পৃহা থেকে দূরে সরে গেছে। এ প্রকার অবস্থা হয়েছে, পূর্বাঞ্চলের আলেকজান্দ্রিয়া ও পশ্চিমাঞ্চলের তারাবলিসের এবং 'বুনা' ও

www.amarboi.org

'সালা'-কেও এ পর্যায়ে ফেলা যায়। কিন্তু যখন গোত্র ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনবসতি এমনভাবে তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিরাজমান থাকে, যাতে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের বেলায় তারা সাড়া দিতে সমর্থ হয় এবং তার অবস্থান এমন দুর্গম পার্বত্য এলাকায় হয়, যাতে তা উক্ত এলাকার শীর্ষদেশে ও বেষ্টনীতে আক্রমণেচ্ছুদের কাছে দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে, তা হলে স্বভাবতঃই শত্রুরা এ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে নিরাশ হয়ে পড়ে। কারণ তারা জানে যে, আক্রমণ মাত্রই তারা তৎপর হয়ে উঠবে এবং প্রতিরোধের জন্য অন্য সকলে সাড়া দিয়ে ছুটে আসবে। এ অবস্থা দেখা যায় 'সেবতা', 'বেজা', এমন কি ক্ষুদ্র 'কেলো' নগরীতে।

পাঠক, এ বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝে নিন এবং আলেকজান্দ্রিয়াকে আব্বাসী সাম্রাজ্যের সময় থেকে সীমান্ত নগর বলার কারণের মধ্যে একে বিবেচনা করুন। অথচ রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচারণা একে অতিক্রম করে 'বরকা' ও আফ্রিকিয়ায় পৌঁছেছিল। একে এরূপ মনে করার একমাত্র কারণ এই যে, তার সহজ অবস্থানের জন্য সমুদ্র থেকে সম্ভাব্য ভীতির আশঙ্কা সর্বদা বিরাজ করত। সম্ভবত এ কারণেই—আল্লাহ্ ভালো জানেন—ইসলামী শাসন আমলেই আলেকজান্দ্রিয়া ও তারাবলিস বহুবার শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। আল্লাহ্ মহান এবং সর্বজ্ঞ।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[মসজিদ ও পৃথিবীর মহান সৌধরাজি]

জেনে রাখুন, পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ এ পৃথিবীর কিছু অংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তাঁর মর্যাদার দ্বারা বিশিষ্ট করেছেন, তাঁর বান্দাদের উপাসনার স্থান হিসাবে নির্ধারিত করেছেন এবং সেখানে পুণ্য লাভের সুযোগকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর নবী ও রসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে অবহিত করেছেন যাতে তাঁর বান্দারা তাঁর অনুগ্রহের পথে সহজে গমন করে সৌভাগ্য লাভে ধন্য হতে পারে।

বিশুদ্ধ দুটি হাদিস সংকলনের[১০] বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান হিসাবে তিনটি মসজিদ রয়েছে; এগুলো হল মক্কা, মদিনা ও বয়তুল মুকাদ্দস। মক্কার পবিত্র গৃহ, তা হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর নামের সাথে যুক্ত। আল্লাহ্ তাঁকে এ গৃহ নির্মাণ করতে এবং এর প্রতি মানুষকে হজের নিমিত্ত আহ্বান জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোরানের বর্ণনা অনুসারে[১১] এটা তিনি ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) নির্মাণ করেন এবং তন্মধ্যে আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইসমাইল, তাঁর মাতা হাজেরা এবং সেখানে আগত জুরহুম গোত্রের সাথে বসবাস করতে থাকেন। আল্লাহ্র ইচ্ছামত মাতা-পুত্রের মৃত্যু হলে তাঁরা কাবার নিকটবর্তী 'হিজের' নামক স্থানে সমাহিত হন। হজরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) বয়তুল মুকাদ্দস নির্মাণ করেন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে এর মসজিদ ও সৌধ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হজরত ইসহাকের বংশের বহু নবী এর চতুষ্পার্শে সমাহিত হয়েছেন। মদিনা আমাদের নবী হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর হিজরতের স্থল। মহান আল্লাহ্ই তাঁকে ঐস্থানে হিজরত করতে এবং সেখানে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে পবিত্র মসজিদের ভিত্তি পত্তন করেন এবং তাঁর মহান সমাধিও তার মাটিতে অবস্থিত। এ তিনটি মসজিদ মুসলমানের চক্ষের মণি, কলিজার টুকরা ও তাঁদের ধর্মের গৌরব। বহু হাদিসে এগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব, তাদের সাহচর্যে পুণ্যের প্রাচুর্য এবং উপাসনায় কল্যাণের আতিশয্যের কথা সুপরিচিত। আমরা এ স্থলে উক্ত তিনটি মসজিদের প্রাথমিক অবস্থা এবং ক্রমশ পরিপূর্ণতা লাভের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে তাদের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করব।

মক্কার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে বলা হয় যে, হজরত আদম (আঃ) তাকে 'বয়তুল মামুর'[১২]-এর বিপরীত দিকে নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর তাকে বন্যায় ধ্বংস করে

১০. বোখারী (১ম খণ্ড) দ্র:।
১১. কোরান, ২, ১২৫।
১২. সপ্তাকাশের উপরে অবস্থিত একটি উপাসনাস্থল। তুল, কোরান, ৫২, ৪।

www.amarboi.org

ফেলে। এতে এমন কোনো প্রামাণ্য সংবাদ নেই, যার উপর নির্ভর করা চলে। এটা আল্লাহ্‌র সংক্ষিপ্ত বর্ণনা[১৩]—'যখন ইব্রাহিম এ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করলেন এবং ইসমাইল', তা থেকে ব্যাখ্যাতারা সংগ্রহ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ ইব্রাহিম (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তাঁর ও তাঁর স্ত্রী সারার সাথে হাজেরার মনোমালিন্যের বিষয় সকলের নিকটই সুপরিচিত। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর পুত্র ইসমাইল ও হাজেরাকে এ নির্জন স্থানে নির্বাসন দিতে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন। সুতরাং ইব্রাহিম তাদেরকে এ স্থলে রেখে চলে যান। এর পর কীভাবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাঁরা 'জমজম কূপের' সাক্ষাৎ পান, কীভাবে জুরহুম গোত্রের সখ্যতা লাভ করেন এবং কীভাবে তারা তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁদের সাথে বসবাস করার জন্য জমজমের চতুষ্পার্শ্বে বসতি স্থাপন করে, তার সবকিছুই যথাস্থানে বর্ণিত রয়েছে। এ সময় ইসমাইল কাবার স্থানে একটি গৃহ নির্মাণ করে তাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি খেজুরের খুঁটি দিয়ে তাঁর ছাগলের জন্য উক্ত গৃহের পার্শ্বে একটি বেষ্টনী তৈরি করেন। ইব্রাহিম (আঃ) বহুবার তাঁকে দেখার জন্য সিরিয়া থেকে এ স্থানে আগমন করেন। অবশেষে তিনি এ বেষ্টনীস্থলে কাবাগৃহ নির্মাণের নির্দেশ লাভ করেন। তিনি এটা নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁর পুত্র ইসমাইলের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন এবং এতে হজ্জ করার জন্য মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইসমাইল এ স্থলেই বসবাস করতে থাকেন। তাঁর মাতা হাজেরার মৃত্যু ঘটে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান-সন্ততি তাদের মাতুল গোত্র জুরহুমের সাথে কাবার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকে। অতঃপর আমালেকারা এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এভাবেই কাবার বিধিব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলে।

পৃথিবীর সর্বশ্রেণীর মানুষ এই কাবার দিকে ছুটে আসত। শুধু বনি ইসমাইল বা অন্যান্য গোত্র নয়; বরং তার পার্শ্বে, তার পরিধি থেকে বহুদূরে যারা ছিল, তারাও আসতে দ্বিধা করত না। কথিত আছে, তুব্বা রাজন্যবর্গও কাবায় হজ্জব্রত পালন করতে আসতেন ও তাকে সম্মান করতেন। কোনো এক তুব্বারাজ[১৪] কাবাগৃহকে পর্দা ও ডোরাদার কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তাকে পরিষ্কার করে তার চাবিতালার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। এও বর্ণিত আছে যে, পারস্যবাসীরা এতে হজ্জব্রত পালন করত এবং তার জন্য উৎসর্গ নিয়ে আসত। আবদুল মোত্তালেব জমজম কূপ পুনঃ খননের সময় যে দুটি স্বর্ণ নির্মিত হরিণ পেয়েছিলেন, তাও তাদেরই সেই উপঢৌকন।

হজরত ইসমাইলের বংশের পরে জুরহুম গোত্রই তাদের মাতুল হওয়ার দাবিতে এর তত্ত্বাবধান করছিল। অতঃপর খুজাআ গোত্র বিদ্রোহ করে এ দায়িত্ব তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বহুদিন তা পালন করে। এর পর ইসমাইলের সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি পেয়ে নানা গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কেনানা, কেনানা থেকে কোরায়েশ ও অন্যান্য গোত্রশক্তির আবির্ভাব ঘটে। খুজাআর দায়িত্ব পালন ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠলে কোরায়েশরা তা গ্রহণ করে এবং তাদেরকে কাবার অঙ্গন থেকে বের করে দেয়। তদবধি দায়িত্ব তাদের হাতেই ন্যস্ত আছে। এ দায়িত্ব গ্রহণকালে কোরায়েশের

---

১৩. কোরান, ২, ১২৭।
১৪. আবু রোয়েব (রোজেনথাল)।

www.amarboi.org

গোত্রপ্রীতি কুসাই ইবনে কেলাব কাবাগৃহকে পুনঃনির্মাণ করেন এবং তার ছাদ তৈরিতে 'দোম' ও কাঠ ও খেজুর শাখা ব্যবহার করেন। আশা বলেন,[১৫]

আমি শপথ গ্রহণ করি দুই আচ্ছাদনের—গীর্জার পদরীর এবং
সেইঘর, যা কুসাই ও মাদাদ ইবনে জুরহুম নির্মাণ করেছে।

অতঃপর কাবাগৃহ বন্যায় ডুবে যায়। বলা হয়, আগুন লেগে ধ্বংস হয়। তারা একে পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের সম্পদ থেকে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। এ সময়ে জেদ্দার সমুদ্রতীরে একটি জাহাজ ভগ্ন হলে ছাদের জন্য তার তক্তাগুলো ক্রয় করে আনে। কাবার দেয়ালগুলো তখন দেহ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ ছিল। তারা তাকে আঠার হাত[১৬] উঁচু করে এবং পূর্বের ভূমি সংলগ্ন দ্বারকে দেহ সমান ভিত্তির উপর স্থাপন করে; যাতে তার মধ্যে বন্যার পানি প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থ-সামর্থ্য কম হওয়াতে তারা তার পূর্ব ভিত্তি থেকে সাড়ে ছয় হাত পরিমাণ স্থান ত্যাগ করে তাকে একটি অনুচ্চ বেষ্টনীর দ্বারা ঘিরে দেয়। কাবা প্রদক্ষিণকালে এ বেষ্টিত অংশের বাইরে দিয়ে পদচারণা করতে হয় এবং একেই 'হিজর' বলা হয়ে থাকে।

কাবাগৃহে, ইবনে জুবায়েরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে মক্কাকে দুর্গ হিসাবে ব্যবহার করা পর্যন্ত অনুরূপ নির্মাণ ব্যবস্থার দ্বারাই সুসজ্জিত ছিল। এ সময়ে হুসাইন ইবনে নুমায়ের সকুনীর নেতৃত্বে ইয়াজীদ ইবনে মাবিয়ার সৈন্য এসে মক্কা অবরোধ করে এবং হিজরি চৌষট্টি সনে তারা কাবার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করায় তাতে আগুন ধরে যায়। বলা হয়, তারা 'নেপাথ' নামীয় যন্ত্র থেকে ইবনে জুবায়েরের উপর যে প্রস্তর বর্ষণ করে, তাতে কাবার দেয়ালগুলো ফেটে যায়। সুতরাং ইবনে জুবায়ের ঐগুলো ভেঙে ফেলে পুনরায় পূর্বাপেক্ষা সুন্দর করে কাবার নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেন।

উক্ত নির্মাণকার্যে সাহাবীরা মতানৈক্যে পৌঁছলে ইবনে জুবায়ের হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর একটি বাণীর দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করেন।[১৭] তিনি আয়শাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, তোমার জাতি যদি অধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে নবীন না হত, তা হলে আমি অবশ্যই কাবাকে ইব্রাহিমের ভিত্তির উপর স্থাপন করতাম এবং তার জন্য পূর্ব-পশ্চিমে দুটি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতাম। সুতরাং ইবনে জুবায়ের কাবাকে ভেঙে ফেলে হজরত ইব্রাহিমের ভিত্তিমূল প্রকাশিত করেন এবং তা প্রত্যক্ষ করার জন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সেখানে একত্র করেন। ইবনে আব্বাস তাঁকে মানুষের কেবলা সম্পর্কে সতর্কতার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। সুতরাং ইবনে জুবায়ের আপাতত তার ভিত্তির উপর কাঠের বেষ্টনী প্রস্তুত করিয়ে তাকে আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত করে কেবলার কাজ চলবার ব্যবস্থা করেন। তিনি সানা শহরে নির্মাণকার্যে ব্যবহারযোগ্য চুন ও অন্য দ্রব্যের জন্য প্রেরণ করে তা সংগ্রহ করেন এবং প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবহৃত কাবার পাথরের আকার জেনে নিয়ে প্রয়োজনমত তাও একত্র করে রাখেন। অতঃপর তিনি হজরত ইব্রাহিমের ভিত্তির উপর তার নির্মাণকার্য আরম্ভ করান।

১৫. আরবের বিখ্যাত কবি আবুল বাসির মায়মুন ইবনে রেস; মৃত্যু ২ (৬২৬ খ্রি:) হি:।
১৬. মূলে আছে 'ফেরাউন'।
১৭. বোখারী (১ম খণ্ড) দ্র:।

www.amarboi.org

তিনি তার প্রাচীরের উচ্চতা সাতাশ হাত পর্যন্ত বর্ধিত করেন এবং হাদিসের নির্দেশ অনুসারে ভূমি সংলগ্ন তার পূর্ব-পশ্চিমে দুটি দ্বার নির্গত করেন। তিনি কাবার মেঝে ও প্রাচীরগাত্রে মার্বেল পাথর ব্যবহার করেন এবং তার কপাট ও খিলে স্বর্ণ ব্যবহার করে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন।

অতঃপর সম্রাট আবদুল মালেকের সময় হাজ্জাজ এসে মক্কা অবরোধ করেন এবং 'মেঞ্জিনিক' থেকে গোলা বর্ষিয়ে কাবার দেয়ালগুলো ধ্বসিয়ে দেন। এর পর ইবনে জুবায়ের পরাজিত হলে আবদুল মালেকের সাথে ইবনে জুবায়েরের দ্বারা কাবাগৃহ নির্মাণ ও তার বর্ধিতকরণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। আবদুল মালেক তাকে নির্মূল করে পুনরায় কোরায়েশ গোত্রের ভিত্তির উপর স্থাপিত করতে নির্দেশ দেন। সুতরাং তা বর্তমানেও অনুরূপ অবস্থায় বিদ্যমান। বলা হয়, আবদুল মালেক ইবনে জুবায়ের কর্তৃক বর্ণিত হজরত আয়েশার হাদিসের বিশুদ্ধতার কথা পরে জানতে পেরে লজ্জিত হন এবং বলেন, খুবই ভালো হত যদি আবু হাবিবকে[১৮] এ কাবাগৃহ ও তার নির্মাণকার্যের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিতে পারতাম।

হাজ্জাজ সম্রাটের নির্দেশ অনুসারে কাবাগৃহের সাড়ে ছয় হাত পরিমাণ অংশ ভেঙে ফেলে 'হিজর' নামক স্থানটি পৃথক করেন এবং তাকে কোরায়েশ গোত্রের নির্মাণ পরিধিতে পুনঃ স্থাপন করেন। তিনি পশ্চিম দ্বারটি বন্ধ করে দেন এবং পূর্ব দ্বারের নিচেকার অংশটি বর্তমানে যেমন আছে, তেমনভাবে রুদ্ধ করে সোপান সংলগ্ন করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় অংশই অপরিবর্তিত রয়েছে। সুতরাং বর্তমানকালে কাবাগৃহের নির্মাণকার্যের সমুদয় অংশ প্রায়ই ইবনে জুবায়ের কর্তৃক সম্পাদিত। তাঁর ও হাজ্জাজের নির্মাণকার্যের মধ্যে দেয়ালের একটি অংশে একটি দৃশ্যমান ফাঁক বিদ্যমান। তাতে যে জোড়া দেয়া হয়েছে, তা বোঝা যায়। উক্ত দুটি নির্মাণকার্যের মধ্যে এক অঙ্গুলি পরিমাণ একটি ফাটলের ন্যায় পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল। পরে তাকে জোড়া দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

এ স্থলে কাবা প্রদক্ষিণ সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রবিদরা যে সকল নির্দেশ প্রদান করেন, তার সাথে বিরোধের সম্ভাবনায় বেশ কিছু সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাঁরা বলেন, প্রদক্ষিণকারী যদি কাবার ভিত্তি সংলগ্ন অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানটি, যাকে 'শাজরোয়াঁ' বলা হয়, তা ত্যাগ করে না চলে, তা হলে তার প্রদক্ষিণ কাবাগৃহের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়বে। কারণ কাবাগৃহ তার কিছু ভিত্তি ত্যাগ করে অবশিষ্টাংশের উপর স্থাপিত হয়েছে। উক্ত পরিত্যক্ত অংশকেই 'শাজরোয়াঁ' বলা হয়। অনুরূপভাবে 'হেজরে আসোয়াদ'কে চুম্বন প্রদানকারীরাও চুম্বন দানের পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্থান ত্যাগ করবে, যাতে তার প্রদক্ষিণ কাবার অভ্যন্তর ভাগে গিয়ে না পড়ে। এক্ষেত্রে কাবার দেয়ালগুলো যদি ইবনে জুবায়েরের নির্মাণকার্য হয়ে থাকে, যা হজরত ইব্রাহিমের ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে, তা হলে ধর্মশাস্ত্রবিদদের এ সকল বক্তব্য কি করে সম্ভব হয়? এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার দুটি পথই খোলা আছে; এর একটি হল এই যে, হাজ্জাজ তার সমস্তটা ভেঙে ফেলে পুনঃনির্মাণ করেছেন, যেমন অনেকেই এ মত পোষণ করেন। কিন্তু

১৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ের।

www.amarboi.org

দুটি নির্মাণকার্যের মধ্যে জোড়া দেয়ার যে ব্যাপারটি চাক্ষুষ বিদ্যমান এবং দুটি নির্মাণকার্যের একটির উপরের দিকে অন্যটির পার্থক্যের সুস্পষ্টতা যেভাবে রয়েছে, তা এ মতের বিরোধিতা করে। অন্যটি হল এই যে, ইবনে জুবায়ের সম্পূর্ণ দিক থেকে কাবাকে হজরত ইব্রাহিমের ভিত্তির উপর পুনঃস্থাপন করেননি। তিনি শুধু 'হিজর' নামক স্থানটিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এ জন্য কাবাগৃহ বর্তমানে ইবনে জুবায়েরের নির্মাণকার্য হলেও তা হজরত ইব্রাহিমের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয়নি। অথচ এটা অসম্ভব এবং এ দুটি পথ ভিন্ন অন্য গন্তব্যও নেই। মহান আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

কাবাগৃহের প্রাঙ্গণ, তাই মসজিদ এবং তাই প্রশিক্ষণকারীদের পরিক্রমণ পথ ছিল। হজরত মুহম্মদ (সঃ) এবং তাঁর পরবর্তী হজরত আবুবকরের সময় তার চারদিকে কোনো প্রাচীর ছিল না। অতঃপর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে হজরত উমর চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহগুলো ক্রয় করে উচ্ছেদের পর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। তার চতুর্দিকে দেহ অপেক্ষা অনুচ্চ একটি প্রাচীরের বেষ্টনী নির্মাণ করলেন। এর পর হজরত উসমান, ইবনে জুবায়ের এবং ওলিদ ইবনে আবদুল মালেক পর্যায়ক্রমে এ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। উক্ত মসজিদকে মার্বেল পাথরের স্তম্ভাদি দ্বারা সুসজ্জিত করে তোলেন। অতঃপর সম্রাট মনসুর ও তৎপুত্র মাহদী এর সম্প্রসারণে উদ্যোগী হন। এ সময়ে এসে তার সম্প্রসারণ স্থিতিলাভ করে এবং বর্তমান অবস্থায় শেষ হয়।

আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত এ গৃহের মর্যাদা ও অনুগ্রহের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, তিনি একে প্রত্যাদেশ ও ফেরেশতাদের অবতরণস্থল এবং উপাসনার আগার করেছেন। তিনি তার নিকটে হজ্বব্রত পালন ও উৎসর্গ প্রদানকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করেছেন। তার পবিত্র অঙ্গনকে সমুদয় স্থান থেকে অধিক সম্মান ও অধিকার প্রদান করেছেন। যারা ইসলাম ধর্মের বিরোধী তাদেরকে এ পবিত্র অঙ্গনে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ পবিত্র অঙ্গনে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, তাকে অবশ্যই সেলাইবিহীন একটি তবন পরিধান করতে হবে। এতে আশ্রয় গ্রহণকারী নিরাপদ এবং এতে বিচরণকারী পশুপক্ষীও সকল বিপদ থেকে মুক্ত। এতে কাউকেও ভয় দেখানো যাবে না, কোনো পশুপক্ষী শিকার করা যাবে না এবং জ্বালানি হিসাবে কোনো বৃক্ষকে ব্যবহার করা যাবে না। এ পবিত্র অঙ্গন, যাকে অনুরূপ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে, তার সীমা হল, মদিনার পথে 'তান্নিম' পর্যন্ত তিন মাইল, ইরাকের পথে 'মুনকাতা' পর্বতের গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত সাত মাইল, 'জিরানা'র পথে 'শাইব' পর্যন্ত নয় মাইল, তায়েফের পথে 'বতনে নিমারা' পর্যন্ত সাত মাইল এবং জেদ্দার পথে 'মুনকাতা আশায়ের' পর্যন্ত সাত মাইল।

এটাই মক্কার মর্যাদা ও তার বিবরণ। এজন্যই তাকে 'গ্রাম জননী'[১৯] বলা হয়। কাবাকে তার উন্নত আকৃতির জন্য 'কাবা' বলা হয়[২০]। এটা 'কাব' শব্দজাত। মক্কাকে

১৯. কোরান, ৬, ৯২; ৪২, ৭।
২০. কাব অর্থ উন্নত।

www.amarboi.org

'বাক্কা'ও বলা হয়। আসমাই[২১] বলেন, কারণ মানুষ একে অপরকে তার দিকে ঠেলে দেয়।[২২] মুজাহেদ বলেন,[২৩] মক্কা আসলে বাক্কা; উচ্চারণে 'বে'র স্থলে 'মিম' এসে গেছে। যেমন 'লাজিম' ও 'লাজিব' একই শব্দ। উক্ত বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণস্থল সন্নিহিত বলেই এরূপ হয়েছে। নখঈ[২৪] বলেন, 'বে'র দ্বারা গৃহ এবং 'মিমে'র দ্বারা শহর বোঝায়। জুহরী[২৫] বলেন, 'বে'র দ্বারা সমগ্র মসজিদ এবং 'মিমে'র দ্বারা সমগ্র পবিত্র অঙ্গন বুঝিয়ে থাকে। সেই মূর্খতার যুগেও মানুষ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত এবং পারস্য সম্রাট ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ এর জন্য সম্পদ ও সামগ্রী প্রেরণ করতেন। জমজম কূপ খননের সময় আবদুল মোত্তালেব যে দুটি স্বর্ণের হরিণ ও তরবারী পেয়েছিলেন, সেই কাহিনী সকলের নিকট সুপরিচিত।

হজরত মুহম্মদ (সঃ) মক্কা বিজয়ের সময় কাবার একটি সুরক্ষিত আধারে সত্তর হাজার 'উকিয়ে' (আউন্স) স্বর্ণ পেয়েছিলেন। এটা রাজন্যবর্গের উপঢৌকন থেকে সঞ্চিত হয়েছিল। তার মূল্য ছিল সহস্র সহস্র দিনার এবং তার ওজন ছিল দুইশ 'কেন্তার' (শতকিয়া ওজন)। হজরত আলী ইবনে আবু তালেব বলেছিলেন, হে রসূলুল্লাহ্! আপনি যদি এ সম্পদের দ্বারা আপনার যুদ্ধে সাহায্য গ্রহণ করতেন! কিন্তু তিনি তা করেননি। অতঃপর আবু বকরের নিকটও তার উল্লেখ করেন; কিন্তু তিনিও তাকে নাড়াননি। আজরাকী[২৬] এ সকল কথা বর্ণনা করেছেন।

বোখারী তাঁর সূত্রে আবুওয়ায়েল[২৭] থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি শায়বা ইবনে উসমানের[২৮] নিকট বসেছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন, কোনো এক সময়ে তিনি উমর ইবনে খাত্তাবের নিকট বসা ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, আমার ত ইচ্ছা হয় তাতে যত স্বর্ণ-রৌপ্য আছে সমুদয় মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেই। তখন তিনি বললেন, আপনি তা করতে পারেন না। উমর বলেছিলেন, কেন? শায়বা বললেন, কারণ আপনার পূর্বসূরি দুইজন তা করেননি। উমর বলেছিলেন, হ্যাঁ, তাঁদের দুইজনের আদর্শ অনুসরণযোগ্য। এ হাদিসটি আবু দাউদ ও ইবনে মাজাও বর্ণনা করেছেন।

এ সম্পদ কাবাতেই এভাবে অবস্থান করছিল। আল আফতাসের গোলযোগের সময় এর ব্যতিক্রম ঘটে। আল আফতাস হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আলী জয়নুল আবেদীন; ইনি হিজরি ১৯৯ সনে মক্কার উপর আধিপত্য বিস্তার করার সময় কাবার সঞ্চিত সম্পদ গ্রহণ করতে গিয়ে বলেন, কাবা এ সম্পদ দিয়ে কী করবে; এত অনর্থক এখানে পড়ে আছে! আমরা এর যথার্থ উত্তরাধিকারী। আমাদের যুদ্ধের

---

২১. ২২ পৃষ্ঠা ৫০নং টীকা দ্র:।
২২. বাক্কা শব্দের অর্থজাত।
২৩. ৩৫৮ পৃ: ৩০০ টীকা দ্র:।
২৪. ৩৫৫ পৃ: ২৭৬ টীকা দ্র:।
২৫. ১২ পৃ: ২১ টীকা দ্র:।
২৬. মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্, মৃত্যু ২৪৪ (৮৫৯ খ্রি:) হিজরির পরে।
২৭. ৩৫০ পৃ: ২২৮ টীকা দ্র:।
২৮. মৃত্যু ৫৯ (৬৭৯ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

প্রয়োজনে এ সম্পদের সাহায্য গ্রহণ করব। অতঃপর তিনি তা বের করে ব্যয় করেন। তখন থেকেই কাবার সঞ্চিত সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়।

বয়তুল মুকাদ্দসকেই দূরতম মসজিদ[২৯] বলা হয়। এটা প্রাথমিক অবস্থায় সিবিয়ানদের সময়ে 'শুক্র মন্দির'-এর স্থান হিসাবে পরিচিত ছিল। তারা তাদের উৎসর্গের নিয়ম অনুসারে সেখানকার একটি পর্বতগাত্রে তৈল উৎসর্গ করত। অতঃপর এই মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং বনি ইসরাইল বয়তুল মুকাদ্দস অধিকার করে তাকে তাদের নামাজের কেবলা হিসাবে গ্রহণ করে।

এর বিবরণ এই যে, হজরত মুসা যখন বনি ইসরাইলসহ মিশর থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন বয়তুল মুকাদ্দস দখল করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কারণ আল্লাহ্, তাদের পিতৃপুরুষ ইসরাইল, তাঁর পিতা ইসহাক ও ইয়াকুবকে[৩০] এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা 'তীহ' প্রান্তরে অবস্থান করতে লাগলেন। আল্লাহ্ তখন মুসাকে 'সন্ত' কাঠের একটি তাঁবু নির্মাণ করতে নির্দেশ দিলেন এবং প্রত্যাদেশ দ্বারা তার পরিধি, গঠন, মূর্তি ও ছবি প্রভৃতির বিবরণ দান করলেন। তার অভ্যন্তরে একটি সিন্দুক, বাসনপত্রসহ দস্তরখান ও দীপাধারসহ দীপমালা রাখার নির্দেশ দিলেন। পশু উৎসর্গের জন্যও একটি স্থান নির্মিত হল। এর সমুদয় বিষয় তৌরাত গ্রন্থে বিশষদভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর মুসা তাঁবু নির্মাণ করে তাতে প্রতিশ্রুত সিন্দুক স্থাপন করলেন। এ সিন্দুকেই দশটি আদেশ সংবলিত কাষ্ঠখণ্ড রক্ষিত আছে। মূল কাষ্ঠখণ্ডগুলো নষ্ট হয়ে যাবার ফলে তাদের অনুভূতি হিসাবে এগুলো নির্মিত হয়। তার পার্শ্বে পশু উৎসর্গের স্থানও তিনি নির্ধারিত করেন।

আল্লাহ্ মুসাকে এ নির্দেশ দেন যে, হারুন উৎসর্গাধিকারী হবেন। তারা উক্ত তাঁবুকে তীহ প্রান্তরে তাদের তাঁবু সারির মধ্যভাগে স্থাপন করে তার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন এবং তার সম্মুখে পশু উৎসর্গ করতেন। এরই সন্নিধানে প্রত্যাদেশের আশায় সমবেত হতেন। অতঃপর তারা সিরিয়া অধিকার করে বনি ইয়ামীন ও বনি ইক্রিম-এর মধ্যবর্তী কিলকাল নামীয় পবিত্র ভূমিতে উক্ত তাঁবু সন্নিবেশিত করেন। ঐস্থলে তা চৌদ্দ বছর থাকে; সাত বছর যুদ্ধকালীন এবং সাত বছর উক্ত অঞ্চল বিভক্তকরণের সময়। অতঃপর ইউশা (আঃ)-এর মৃত্যু হলে তা কিলকালের নিকটবর্তী শিও অঞ্চলে স্থানান্তরিত করে তার চার দিকে প্রাচীর বেষ্টনী স্থাপন করেন। এ স্থলে তা তিনশ বছর অবস্থান করে এবং তার পর উক্ত তাঁবু বনি ফিলিস্তিনের অধিকারভুক্ত হয়, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।[৩১] তারা এর উপর আধিপত্য বিস্তার করার পর পুনরায় তা প্রত্যার্পণ করে এবং রাব্বি আলীর মৃত্যুর পর বনি ইসরাইল একে 'নওফ' নামক স্থানে নিয়ে যায়। অতঃপর তালুতের সময় তা বনি ইয়ামীনের অঞ্চলে কিনিউনে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর দাউদ (আঃ) সাম্রাজ্যের অধিকারী হলে উক্ত তাঁবু ও সিন্দুককে বয়তুল মুকাদ্দসে নিয়ে যান এবং তার জন্য একটি বিশেষ আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে তাকে

২৯. 'মসজিদুল আকসা'; কোরান, ১৭, ১।
৩০. এ স্থলে ইব্রাহিম হওয়া প্রয়োজন।
৩১. ৩য় অধ্যায়ের ৩৩শ পরিচ্ছেদ দ্র:।

www.amarboi.org

পর্বতোপরি স্থাপন করেন। এভাবেই উক্ত তাঁবু পর্বতোপরি থাকাকালে বনি ইসরাইলের কেবলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হজরত দাউদ উপরোক্ত স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু তা পূর্ণতা লাভ করেনি। তিনি তাঁর পুত্র সুলায়মানকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে যান। সুতরাং সুলায়মান তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বছরে এবং হজরত মুসার মৃত্যুর পাঁচশ বছর পরে তার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেন। তিনি ব্রোঞ্জ দ্বারা তার স্তম্ভ, স্ফটিকের দ্বারা এর অঙ্গন[৩২] এবং তার দ্বারাদি ও প্রাচীরগাত্র স্বর্ণ দ্বারা সুসজ্জিত করেন। তিনি উক্ত তাঁবুর অন্তর্গত মূর্তি, ছবি, বাসনপত্র, দীপাধার, চাবি প্রভৃতি স্বর্ণমণ্ডিত করলেন। তিনি উক্ত মসজিদের মেঝের উপর একটি কবর নির্মাণ করে তাতে প্রতিশ্রুত সিন্দুক, যাতে কাষ্ঠফলক সংরক্ষিত ছিল, তা রাখার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর পিতার ভূমি সিহুন থেকে তা মসজিদ নির্মাণকালে আনয়ন করা হল। সকল গোত্র ও রাব্বিরা সমবেতভাবে তা বহন করে এনে উক্ত কবরে সংস্থাপন করলেন। মসজিদের অন্যান্য স্থানে যথানিয়মে তাঁবু, বাসনপত্র ও উৎসর্গস্থল সুরক্ষিত হল। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এভাবে বহুদিন কেটে গেল।

অতঃপর উক্ত মসজিদ নির্মাণের তিনশ বছর পরে বখতে নিসর (নেবুচাড-নেজার) তাকে ধ্বংস করে ফেলেন। তিনি তৌরাত ও লাঠি পুড়িয়ে, মূর্তিগুলো গলিয়ে সমস্ত প্রস্তরখণ্ড ইতস্তত ছড়িয়ে দেন। অতঃপর পারস্য সম্রাটগণ বনি ইসরাইলের প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিয়ে উক্ত মসজিদ গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। ইসরাইলের নবী উজাইর পারস্য সম্রাট বাহমনের সহায়তায় তার নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেন। উক্ত সম্রাটের জন্মের সাথে বখতে নসর কর্তৃক বন্দী ইসরাইলদের সম্পর্ক ছিল। তিনিই সুলায়মান ইবনে দাউদের নির্মিত মসজিদের পরিধি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর পরিধিতে তার সীমা নির্দিষ্ট করে দেন। উক্ত সীমা অতিক্রম করা হয়নি।

উক্ত মসজিদের নিচে খিলানযুক্ত যে সকল কুঠুরী বিদ্যমান, যেগুলো একের উপর অন্য বিন্যস্ত; নিম্নস্তরের খিলানের উপর স্তরের স্তম্ভ স্থাপিত অবস্থায় দুটি স্তরে শোভিত রয়েছে, এগুলোকে অনেকেই হজরত সুলায়মানের আস্তাবল বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে তা নয়। এটা তাদের ধারণা অনুসারে বয়তুল মুকাদ্দসকে অপবিত্রতা থেকে সংরক্ষণের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। তাদের ধর্মবিধান অনুসারে অপবিত্রতা যদিও পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে বিদ্যমান এবং তার ও পৃথিবীর উপরিভাগের মধ্যে একটি মৃত্তিকা স্তর দ্বারা আচ্ছাদিত, তথাপি উক্ত উপরিভাগ ও অভ্যন্তরভাগের মধ্যে একটি সরল রেখায় স্থাপিত বস্তু উপরিভাগকে অপবিত্র করতে পারে বলে তাদের ধারণা। বস্তুত তাদের বিধানে ধারণা ও বাস্তব একই মূল্য বহন করে। সুতরাং তারা এভাবে এ সকল খিলানযুক্ত কুঠুরী নির্মাণ করেছে, যাদের নিম্নস্তরের স্তম্ভগুলো খিলানে এসে ঠেকেছে এবং উপর স্তরের স্তম্ভগুলো উক্ত খিলানের উপর স্থাপিত হওয়ায় সরল রেখার সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে। সুতরাং কোনোপ্রকার সরল রেখায় স্থাপিত বস্তুর দ্বারা অপবিত্রতা পৌঁছবার উপায় নেই। এভাবে উক্ত কাল্পনিক অপবিত্রতা থেকে উক্ত মসজিদকে পবিত্র রাখা হয়েছে; যাতে তার পবিত্রতা সম্পাদনে এ ব্যবস্থা চরম ও পরম বলে গণ্য হয়।

---

৩২. 'সুলায়মান ও শিবার রাণী' কাহিনীতে এর উল্লেখ আছে। রাণীকে পরীক্ষা করার জন্য এটা নির্মিত হয়। তুল. কোরান, ২৭, ৪৪।

www.amarboi.org

অতঃপর গ্রিক, পারস্য ও রোমান সম্রাটগণ পর্যায়ক্রমে বনি ইসরাইলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছেন। এ সময়ে তাদের রাব্বি বংশ বনি হাশমনাই সাম্রাজ্যের অধিকারী হয় এবং পরবর্তীকালে বৈবাহিক সূত্রে তাদের আত্মীয় হিরোদাস ও তাঁর সন্তান-সন্ততির নিকট উক্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। হিরোদাস সুলায়মান (আঃ)-এর ভিত্তির উপর বয়তুল মুকাদ্দসকে আবার গড়ে তোলেন। তিনি এটাকে সুসজ্জিত করে ছয় বছরে সম্পূর্ণ করেন। অতঃপর রোমান সম্রাট তিতাস এসে বনি ইসরাইলের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। তিনি বয়তুল মুকাদ্দস ও তার মসজিদ ধ্বংস করেন এবং উক্ত স্থানে চাষাবাদ করতে আদেশ দেন। এর পর রোম হজরত মসিহ (আঃ)-এর ধর্ম অবলম্বন করে উক্তস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। কিন্তু এর পরও রোমান সম্রাটদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ ও বর্জনের বৈচিত্র্য দেখা দেয় এবং কনস্ট্যান্টাইন না আসা পর্যন্ত এটা চলে থাকে। তাঁর মাতা হেলেনা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাদের ধারাণামত যে যূপকাষ্ঠে ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, তার অনুসন্ধানে বয়তুল মুকাদ্দসে উপস্থিত হন। পাদরীরা তাঁকে সংবাদ দেন যে, উক্ত কাষ্ঠখণ্ড ভূমিতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং তার উপর বিষ্ঠা ও আবর্জনা নিক্ষেপ করা হত। হেলেনা উক্ত কাষ্ঠখণ্ড খুঁজে বের করেন এবং তদস্থলে একটি গির্জা স্থাপন করেন। তাকে 'কুমামা' গির্জা বলা হয়। তাদের ধারণামতে তা ঈসার কবরের উপর সংস্থাপিত। উক্ত হেলেনা বয়তুল মুকাদ্দস মসজিদের অবশিষ্টাংশও ধ্বংস করে উক্ত পর্বতের উপর আবর্জনা ও বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। এর ফলে উক্ত স্থানটি আবৃত হয়ে উক্ত মসজিদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এটা তিনি তাঁর ধারণা অনুসারে ঈসার কবরের প্রতি ইহুদিদের আচরণের প্রতিশোধ বলে মনে করেছিলেন। অতঃপর খ্রিস্টানরা কুমামা গির্জার বিপরীত দিকে 'বেথহেলেম' নির্মাণ করেন[৩৩]; এ গৃহেই ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

এভাবেই এতদসংক্রান্ত অবস্থা চলতে থাকে; ইতিমধ্যে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং বিজয়াভিযানের সূত্রপাত হয়। বয়তুল মুকাদ্দস বিজয়ের সময় হজরত উমর স্বয়ং উপস্থিত হন। তিনি সেই পর্বতখণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে তা দেখিয়ে দেয়া হয়। তখন তার উপর আবর্জনা ও মাটি স্তূপীকৃত হয়েছিল, তিনি তা মুক্ত করে তার উপর প্রান্তরীয় ধারায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি তার প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে যথাসম্ভব সম্মান প্রদর্শন করেন। বস্তুত কোরান শরীফে[৩৪] এ সম্পর্কে যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

অতঃপর ওলিদ ইবনে আবদুল মালেক উক্ত মসজিদকে ইসলামী জগতের অন্যান্য মসজিদের ধারায় সুদৃঢ় করে আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন। তিনি মক্কার পবিত্র মসজিদ ও মদিনার নবীর মসজিদ অনুরূপভাবে সুসজ্জিত করেছিলেন। দামেশকের মসজিদও তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়। আরবের লোকেরা একে 'ওলিদের চত্বর' বলে ডাকে। এ সকল মসজিদ নির্মাণের সময় ওলিদ রোমান সম্রাটকে প্রয়োজনীয় কর্মী

৩৩. ইবনে খলদুনের বর্ণনায় এটা স্থান নয়, স্মৃতিসৌধ।
৩৪. ১৭, ১।

www.amarboi.org

ও সামগ্রী প্রদানের জন্য বাধ্য করেছিলেন; যাতে তারা এগুলোকে 'মোজাইক' কারুকার্যে ভূষিত করে। রোমান সম্রাট তাঁরা আজ্ঞা পালন করেন এবং সমস্ত বিষয় পরিকল্পনা অনুসারে সুসম্পন্ন হয়।

অতঃপর হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে খেলাফতের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে তা কায়রোর শিয়া সম্রাট উবাইদীদের অধিকারে ছিল। কিন্তু ক্রমশ তাদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং ফিরিঙ্গীরা এসে বয়তুল মুকাদ্দসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। তারা এর অধিকার লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সিরিয়া সীমান্তেও তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তারা উক্ত পর্বতের উপর একটি গির্জা নির্মাণ করে এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার জন্য গর্ব অনুভব করতে থাকে। ইতিমধ্যে সালাহ্ উদ্দিন ইবনে আইউব কুর্দী মিশর ও সিরিয়ার রাজ্যপাট নিয়ে স্বাধীন হয়ে দাঁড়ান। তিনি মিশরে উবাইদীদের আধিপত্য ও অভিনব মতবাদ নিশ্চিহ্ন করে সিরিয়ার উপর অভিযান পরিচালনা করেন। সেখানকার ফিরিঙ্গীদের সাথে জেহাদে অবতীর্ণ হয়ে প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং বয়তুল মুকাদ্দসসহ সমস্ত সিরিয়া সীমান্ত তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। হিজরি পাঁচশ আশি অব্দের নিকটবর্তী সময়ে এ ঘটনা ঘটে। তিনি উক্ত গির্জা ধ্বংস করেন এবং উক্ত পর্বতখণ্ডটিকে মুক্ত করে তদুপরি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা এই বর্তমানকাল পর্যন্ত অনুরূপভাবে বিদ্যমান।

পাঠক, আশাকরি এ প্রসঙ্গে আপনার নিকট সেই সুপরিচিত সমস্যাটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না, যা বিশুদ্ধ হাদিসে নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ্র ঘর প্রথম কোনটি নির্মিত হয়েছিল, সেই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, মক্কা। জিজ্ঞেস করা হল, অতঃপর কোনটি? বললেন, বয়তুল মুকাদ্দস। জিজ্ঞেস করা হল, এ দুটির মধ্যে কতদিনের পার্থক্য? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। কারণ মক্কা ও বয়তুল মুকাদ্দসের মসজিদ নির্মাণের মধ্যে যে সময়ের পার্থক্য তা প্রকৃত প্রস্তাবে হজরত ইব্রাহিম ও হজরত সুলায়মানের সময়ের ব্যবধানতুল্য। কারণ সুলায়মানই বয়তুল মুকাদ্দসের প্রকৃত নির্মাতা। এ দিক থেকে সময় হাজার বছরেরও অনেক বেশি।

জেনে রাখুন, হাদিসে নির্মাণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা প্রকৃত নির্মাণকার্য নয়; বরং প্রথম কোন গৃহটি আল্লাহ্র উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তাই বোঝান হয়েছে। এটা অসম্ভব নয় যে, বয়তুল মুকাদ্দস সুলায়মানের নির্মাণকার্যের পূর্বে অনুরূপ সময়ের পরে উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। কারণ এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, সিরিয়ানরা সেখানে শুক্রমন্দির নির্মাণ করেছিল। সম্ভবত তা পূর্ব থেকে উপাসনার স্থান ছিল বলেই তারা এ স্থলে মন্দির নির্মাণ করেছে। যেমন মূর্খতার যুগের লোকেরা কাবার চতুর্দিকে ও তার অভ্যন্তরে মূর্তি ও ছবি স্থাপন করেছিল। যে সিরিয়ানরা শুক্র মন্দির নির্মাণ করে, তারা হজরত ইব্রাহিমের সমসাময়িক। এজন্যই মনে হয়, মক্কা ও বয়তুল মুকাদ্দসের উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার মধ্যে চল্লিশ বছরের পার্থক্য হওয়া অসম্ভব নয়। যদিও সেখানে তখনও নির্মাণকার্য অনুষ্ঠিত হয়নি, যা সকলের নিকট সুপরিচিত। কারণ প্রথম যিনি বয়তুল মুকাদ্দস নির্মাণ করেন, তিনি হজরত সুলায়মান। পাঠক, এ বিষয়টি ভালো করে বুঝে নিন; কেননা এর মধ্যেই এ সমস্যার সমাধান বিদ্যমান।

www.amarboi.org

প্রদীপ্ত নগরী মদিনার পূর্বনাম 'ইয়াসরব'। আমালেকাদের অন্তর্গত ইয়াসরব ইবনে মুহায়েল এ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার নামেই এর নামকরণ করা হয়। তাদের নিকট থেকে হেজাজের অন্যান্য অধিকারসহ এ নগরীও বনি ইসরাইলের করতলগত হয়। অতঃপর তাদের প্রতিবেশী গাস্সানের বনি কায়লা[৩৫] ইহুদির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে উক্ত নগরী ও তার দুর্গগুলো অধিকার করে নেয়। এর পর উক্ত নগরীর উপর আল্লাহ্‌র শুভ দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি তার দিকে হিজরত করার জন্য নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দেন। তিনি সেখানে হিজরত করেন; তাঁর সাথে ছিলেন হজরত আবুবকর এবং অন্যান্য সাহাবীরাও পরে তাঁর অনুসরণ করেন। তিনি উক্ত নগরীতে পদার্পণের পর মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এমন একস্থলে তাঁর গৃহাদি গড়ে তোলেন, যা আল্লাহ্ কোন অনাদিকাল থেকে সম্মানিত করে তাঁর জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কায়লার সন্তান-সন্ততিরা তাঁকে আশ্রয় দেন এবং সাহায্য করেন। এ জন্যই তাদেরকে বলা হয় 'আনসার' বা সাহায্যকারী। এ মদিনা থেকেই ইসলামের বাণী সম্পূর্ণ হয় এবং সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার, তাঁর জাতির উপর আধিপত্য লাভ, মক্কা বিজয় ও তার অধিকার অর্জনের মধ্যদিয়ে তা শেষ হয়। এ সময়ে আনসারদের মনে এ ধারণার উদ্ভব হয়েছিল যে, হয়ত তিনি এখন তাঁর নিজ শহরে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করবেন। এ ধারণা তাদের মধ্যে গুরুতর রূপ ধারণ করার ফলে হজরত মুহম্মদ (সঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ও আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তিনি স্থান পরিবর্তন করবেন না। এভাবেই তাঁর তিরোধানের পর তাঁর মহান সমাধি এ নগরীতেই স্থাপিত হয়।

এই নগরীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদিসে যা এসেছে, তাতে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা নেই। শুধু জ্ঞানীদের মধ্যে মক্কার উপরে এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। ইমাম মালেক মদিনার শ্রেষ্ঠত্বের উপর মত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রাফি ইবনে খুদাইজ[৩৬] থেকে একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য যুক্ত হাদিসের প্রমাণ উদ্ধৃত করেন। উক্ত হাদিসে নবী (সঃ) বলছেন, মদিনা মক্কা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্য আরো কিছু হাদিসের সাহায্যার্থে, যেগুলো উক্ত বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করে, এ হাদিসটি আবদুল ওহাব তাঁর 'মাউনা'[৩৭] গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী উক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন।

যাহোক, যে কোনো দিক থেকেই তা মক্কার পরবর্তী সম্মানের অধিকারী। চারদিক থেকে মুসলমানরা তাদের কলিজা দিয়ে এটাকে আবৃত করে রেখেছে। পাঠক, লক্ষ করুন, এ মহান মসজিদের শ্রেষ্ঠত্ব কীভাবে পর্যায়ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পূর্বাহ্নে নির্দিষ্ট আল্লাহ্‌র শুভ দৃষ্টিই তাকে এ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। পাঠক, এর প্রতি লক্ষ করলে আপনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও পর্যায়ক্রমে তার প্রতিষ্ঠা লাভের রহস্যটি অনুধাবন করতে পারবেন। পার্থিব ও অপার্থিব সকল বিষয়েই এটা বিদ্যমান।

---

৩৫. যতদূর সম্ভব আউস ও খজরজ গোত্রদ্বয়ের মহিলা পূর্বপুরুষের নাম। এ দুই গোত্রের লোকদেরকেই আনসার বলা হয়।

৩৬. তাঁর মৃত্যু ৫৯-৭৪ (৬৭৮-৬৯৩ খ্রি:) হিজরী মধ্য ধারণা করা হয়।

৩৭. প্রসিদ্ধ মালেকী পণ্ডিত; তাঁর গ্রন্থের নাম 'মাউনা লেমজহাবে আলিমেল মদিনা'—'মদিনার ধর্মশাস্ত্রবিদদের মতাদর্শের সহায়ক'।

www.amarboi.org

পৃথিবীতে এ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্যকোনো উপাসনালয়ের কথা জানি না। অবশ্য ভারতীয় দ্বীপ সিংহলে হজরত আদমের মসজিদের[৩৮] কথা বলা হয়; কিন্তু তার জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ কোথাও নেই।

প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে এমন অনেক মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে তারা ধর্মীয় অনুভবের প্রেরণায় সম্মান করত। তন্মধ্যে পারস্যবাসীদের অগ্নিমন্দির, গ্রিকদের মন্দিরসমূহ এবং আরব বেদুইনদের দেবগৃহগুলো, যা অভিযান পরিচালনার সময় নবী (সঃ) ধ্বংস করে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মাসউদী এ প্রকার বহু গৃহের বর্ণনা করেছেন। আমরা এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা উপস্থিত করতে চাই না। কারণ ধর্মীয় দিক থেকে এরূপ আলোচনা গর্হিত এবং যথার্থ ধর্মবোধ সম্পর্কেও তা পরিপন্থী। সুতরাং এরূপ আলোচনা এবং তাদের সংবাদাদির প্রতি কোন প্রকার গুরুত্বই দেয়া হয় না। এ ব্যাপারে ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে যা আলোচিত হয়েছে, তাই যথেষ্ট। যাঁরা এ সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করতে ঔৎসুক্যবোধ করেন, তাদেরকে ঐসকল গ্রন্থ পাঠ করতে হবে। 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে সুপথ প্রদর্শন করেন[৩৯]।' তিনিই পবিত্র।

---

৩৮. 'আদম' নামে একটি পর্বত বিদ্যমান।

৩৯. কোরান, ২, ১৪২, ২১৩।

www.amarboi.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[আফ্রিকিয়া ও মাগরিবে শহর-নগরের সংখ্যা খুবই কম]

এর কারণ এই যে, এ অঞ্চলগুলো বারবারদের অধীনে ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে হাজার হাজার বছর ধরে এ সকল স্থানের জনবসতি প্রান্তরীয় জীবনধারায় অভ্যস্ত ছিল। এখানে নাগরিক জীবন কখনো কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, যাতে তাদের জীবনধারা পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ফিরিঙ্গী ও আরবদের যে সকল সাম্রাজ্য এখানে স্থাপিত হয়েছে, তাও এমন কোনো দীর্ঘকালব্যাপী ছিল না, যাতে নাগরিক জীবনবোধ দৃঢ়তা লাভ করতে পারে। সুতরাং প্রান্তরীয় জীবনধারা ও তার অবস্থা বৈচিত্র্যই সর্বদা এখানে প্রবাহিত হয়েছে এবং অধিবাসীরা তার সাথেই ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছে। এ কারণেই স্থাপত্য ক্ষেত্রে তাদের অবদান খুবই নগণ্য। অন্যদিকে শিল্পনৈপুণ্য সম্পর্কে বারবারদের কোনো ধারণা নেই। কারণ তারা একান্তই যাযাবরী জীবনে অভ্যস্ত। বস্তুত শিল্পজ্ঞান নাগরিকত্বের অনুসারী। স্থাপত্যশিল্প তার গভীরতার দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক হয়। বারবারদের মধ্যে যেহেতু এ বিষয়ে কোনোপ্রকার নৈপুণ্য নেই, সেজন্য স্থাপত্যের প্রতি তাদের আকর্ষণও সেই পরিমাণে কম। এক্ষেত্রে নগর নির্মাণের প্রশ্নই ওঠে না। তদুপরি তাদের সমাজবদ্ধ জীবন গোত্রপ্রীতি ও বংশধারার দ্বারা পরিচালিত এবং তাদের কোনো গোষ্ঠীই এটা থেকে মুক্ত নয়। অথচ গোত্রপ্রীতি ও বংশধারার গভীর আকর্ষণ প্রান্তরীয় জীবনের দিকেই সর্বাধিক।

শান্তি ও স্বস্তিই মানুষকে নগর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে আনে এবং তার অধিবাসীরা নগররক্ষীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। পাঠক, এ কারণেই প্রান্তরবাসীদেরকে দেখতে পাবেন, তারা নগরবাস ও সেখানে অবস্থানকে ঘৃণার চোখে দেখে। কারণ একমাত্র সম্পদের প্রাচুর্য ও বিলাসব্যসনই তাদেরকে এ প্রকার জীবনের দিকে আকর্ষণ করতে পারে। অথচ তাদের মধ্যে এগুলোর একান্ত অভাব। এজন্যই আফ্রিকিয়া ও মাগরিবের সমুদয় জনবসতি অথবা তার অধিকাংশ প্রান্তরবাসী। তারা তাঁবু, কুঁড়ে, নিদ্রা তাঁবু ও পর্বতগুহায় বসবাস করে থাকে। অন্যদিকে অনারব দেশগুলোর অধিকাংশ অথবা সমুদয় জনবসতি গ্রাম, শহর ও মহল্লায় বাস করে। সিরিয়া, আন্দালুস, মিসর, ইরাক আজম ও এ প্রকার অন্য দেশের ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা লাভ করা যেতে পারে। কারণ অনারবরা সাধারণভাবে বংশধারার চেতনাশূন্য। তারা একে সংরক্ষণ করে, তার সুষ্ঠুতার জন্য গর্ব প্রকাশ করে এবং তার ঘনিষ্ঠতার জন্য

www.amarboi.org

প্রচেষ্টা চালিয়ে খুব কম ক্ষেত্রেই জীবন অতিবাহিত করে। সুতরাং ঐস্থলেও দেখা যায় অধিকাংশ বংশ চেতনাসম্পন্ন মানুষ যাযাবরী ও জীবনের অধিকারী। কারণ, একমাত্র সেখানেই বংশগত চেতনার ঘনিষ্ঠতা স্পষ্টতর ও দৃঢ়তর হয়ে থাকে। গোত্রপ্রীতির আকর্ষণও একই পরিণতির দিকে আকর্ষণ করে। তার অধিকারীও যাযাবরী জীবনের দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং ঐ নগর জীবন থেকে দূরে থাকে; যা তাদের বীর্যবত্তাকে ধ্বংস করে তাদেরকে অপরের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য করে। পাঠক, এ বিষয়টি বুঝে নিন এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে একে বিবেচনা করুন। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা এবং তিনিই সহায়।

www.amarboi.org

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[ইসলামের নিজস্ব সাম্রাজ্যশক্তি এবং তার পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর তুলনায় তার স্থাপত্য ও নির্মাণ শিল্প অত্যন্ত কম।]

এর কারণ, বারবারদের প্রসঙ্গে যা বলেছি, ঠিক তাই। কারণ আরবরাও অনুরূপভাবে যাযাবরী জীবনবোধে অভ্যস্ত এবং নির্মাণ শিল্প থেকে দূরবর্তী। অন্যদিকে তারাও ইসলামের পূর্বে সাম্রাজ্যশক্তি তথা তাদের অধিকৃত সাম্রাজ্যগুলোর সাথে অপরিচিত ছিল। সুতরাং তারা সাম্রাজ্যশক্তি লাভ করার পর এমন কোনো দীর্ঘসময় পায়নি, যাতে তাদের নাগরিকত্ব পূর্ণতা লাভ করতে পারে। এ সঙ্গে অধিকৃত সাম্রাজ্যগুলোর স্থাপত্যও তাদেরকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে। তদুপরি প্রথমদিকে ধর্মই গৃহগুলো নির্মাণের ব্যাপারে আতিশয্য প্রদর্শন ও সীমা অতিক্রমণের বিরোধী ছিল যেমন কুফা শহরে গৃহাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রস্তর ব্যবহারের অনুমতি চাইলে হজরত ওমর অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে বাঁশ নির্মিত গৃহগুলোতে আগুন ধরে গেলে এ অনুমতি চাওয়া হয়। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, নির্মাণ কর, তবে কখনই তিনটি গৃহের অধিক করো না। নির্মাণকার্যে একে অপরের উর্ধ্বে যাবার চেষ্টা করো না। তোমরা প্রবর্তিত প্রথাকে অনুসরণ কর, সাম্রাজ্যও তোমাদেরকে অনুসরণ করবে। তিনি প্রতিনিধিদলকে এ নির্দেশ দিয়ে মানুষকেও নিয়মের বাইরে নির্মাণকার্য পরিচালনা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তখন তারা জিজ্ঞাসা করে, নিয়ম কি? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, যা অপব্যয়ের নিকটবর্তী হবে না এবং মধ্যপন্থার বাইরে যাবে না।

অতঃপর ধর্মের প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসলে এ সকল বিষয়ে নতুন উদ্যম দেখা দিল এবং রাজশক্তি ও তার বিলাসব্যসন এসে উপস্থিত হল। আরবরা পারস্যবাসীদেরকে এ কাজে নিয়োজিত করে তাদের কাছ থেকে নির্মাণশিল্প ও স্থাপত্যের সহায়তা গ্রহণ করল। এ সময়ে শান্তি ও বিলাসের অমোঘ আকর্ষণে তারা অট্টালিকা নির্মাণ ও সৌধ স্থাপনে মনোনিবেশ করেছিল। কিন্তু তখন সাম্রাজ্যশক্তি প্রায় শেষ অবস্থায় উপনীত, সুতরাং অধিক নির্মাণ কাজ ও শহর-নগরের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য তারা অতি অল্প সময়ই পেয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য জাতির বেলায় তা হয়নি। পারস্যবাসীদের সাম্রাজ্যশক্তি হাজার হাজার বছর ধরে বিস্তৃত ছিল। অনুরূপভাবে কিবতী নাবাতী ও রোমানদের। এরূপ প্রথম যুগের আরব—আদি, সামুদ, আমালেকা ও তুব্বা রাজন্যবর্গের অবস্থা। তাদের সময় দীর্ঘ ছিল বলেই নির্মাণশিল্প তাদের মধ্যে সুদৃঢ় হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তাদের অট্টালিকা ও সৌধরাজি সংখ্যায় ও স্থায়িত্বে কালের বুকে স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিল। পাঠক, আপনি এ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করলে আমাদের এ বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। আল্লাহ্ পৃথিবী ও তার উপরিস্থিত সমুদয়ের উত্তরাধিকারী।

www.amarboi.org

নবম পরিচ্ছেদ

[আরবদের নির্মিত সৌধাবলির অল্পসংখ্যক ব্যতীত সমুদয়ই অতি সত্বর ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে]

এর কারণ প্রান্তরীয় জীবনবোধের প্রাধান্য ও নির্মাণ শিল্পের অনভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এজন্যই তাদের স্থাপত্য কীর্তি দৃঢ় ও স্থায়ী হতে পারেনি। এর, আল্লাহ্ই ভালো জানেন, অন্য একটি কারণ বিদ্যমান এবং তা এক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় বলে মনে হয়। এটা নগর পরিকল্পনায় তাদের সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতি যথাযথ দৃষ্টিদানের অভাব; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। এক্ষেত্রে তারা স্থান, উত্তম আবহাওয়া, পানীয় জল, কৃষিক্ষেত্র ও চারণভূমির প্রতি লক্ষ রাখেনি। বস্তুত প্রাকৃতিক জনপরিবেশের ধারা অনুসারে এ সকল বিষয়ে পার্থক্যের ফলে নগর জীবনের মধ্যে ভালো-মন্দের পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। আরবরা এ ব্যাপারে উদাসীন। তারা শুধুমাত্র তাদের উটের চারণভূমির প্রতিই লক্ষ রাখে। পানীয় জল ভাল কি মন্দ, অল্প কি অধিক, তৎপ্রতি তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। কৃষিক্ষেত্র, উদ্ভিদাঙ্গন ও জলবায়ুর প্রতিও তাদের ঔৎসুক্য নেই। কারণ তারা বিচরণশীল জাতি এবং সুদূর অঞ্চল থেকে শস্যাদি বহন করে আনতে তারা অভ্যস্ত। বায়ুর ব্যাপারে বলতে গেলে শূন্য প্রান্তরের সর্বত্রই তার চলাচলে বৈচিত্র্য বিদ্যমান এবং তাদের বিচরণ এর বিশুদ্ধতার জন্য দায়ী। কারণ বায়ু একমাত্র স্থায়ী বসবাস ও অধিক আবর্জনার ফলেই দূষিত হয়ে ওঠে।

পাঠক, তাদের কুফা, বসরা ও কায়রোয়ান নগর পরিকল্পনার প্রতি লক্ষ করুন। তারা তাতে তাদের উটের চারণভূমি ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়নি। তারা প্রান্তরের সন্নিকটে এবং বিচরণের জন্য খুবই উপযোগী। কিন্তু সেই তুলনায় নগরের যোগ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে অনেক দূরে। ঐগুলোতে এমন কোনো উপকরণ নেই, যা তাদের পরেও এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি; বস্তুত এ প্রকার উপকরণ জনবসতির সংরক্ষণের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। এজন্যই এ সকল নগরের পরিবেশ বাসস্থানের জন্য স্বাভাবিক নয়। এমন কি অন্যান্য জাতির মধ্যস্থলেও এগুলো অবস্থিত নয়, যাতে তাদের দ্বারা আবাদ হতে পারে। সুতরাং যেই মুহূর্তে তাদের রাজ্যশক্তি ও তাদের গোত্রপ্রীতির অমোঘ আকর্ষণ, যা এই নগরগুলোর সমৃদ্ধি জিইয়ে রেখেছিল, বিনষ্ট হয়ে গেল, তখনি তাদের ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতা নেমে আসতে দেরি হয়নি; যেন ঐগুলো কোন সময় অস্তিত্বেই ছিল না। 'আল্লাহ্ নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাঁর নির্দেশের অবমাননাকারী কেউ নেই।"[৪০]

---

৪০. কোরান, ১৩, ৪১।

www.amarboi.org

দশম পরিচ্ছেদ

[শহর-নগরে অবক্ষয়ের লক্ষণ কী করে প্রকাশ পায়]

জেনে রাখুন, যে কোনো নগর পরিকল্পনার প্রথম দিকে তাতে গৃহগুলোর স্বল্পতা থাকে এবং নির্মাণকার্যে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি ও উপকরণেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়। উপকরণের মধ্যে পাথর, চুন এবং দেয়াল সুসজ্জিত করার জন্য টালি, মার্বেল, মোজাইক, কাচ, খনিজ অঙ্গার, ঝিনুক তখন অপ্রতুল থাকে। সুতরাং এ সময়ের নির্মাণকার্য যাযাবরী ধারার অনুসারী হয় এবং তার উপকরণাদিও সহজে নষ্ট হয়ে যায়।

অতঃপর যখন শহরের জনবসতি বাড়তে থাকে, তার অধিবাসীর সংখ্যা স্ফীত হয়ে ওঠে, তখন কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উপকরণও পর্যাপ্ত পরিমাণের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এ সময়ে নির্মাণকুশলীর সংখ্যাও বেড়ে তাকে চরম সীমায় উপনীত করে; যেমন তার অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এর পর যখন আবার তার জনবসতিতে ভাঁটা পড়ে, তার অধিবাসীর সংখ্যা কমে যায়, তখন এর অমোঘ ও ফলশ্রুতিতে নির্মাণকার্যের সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকে। নির্মাণকার্যে পূর্বের সেই নতুনত্ব, দৃঢ়তা এবং অলংকরণের আতিশয্য আর থাকে না। এর পর কর্মীর সংখ্যাও কমতে থাকে এবং অধিবাসীদের স্বল্পতার জন্য বাইরে থেকে পাথর, মার্বেল ইত্যাদি আনার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এ সময়ে তারা নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত উপকরণই পুনরায় ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। তারা এক অট্টালিকা থেকে অন্য অট্টালিকায় তা স্থানান্তরিত করে। কারণ জনসংখ্যার স্বল্পতার জন্য তখন অধিকাংশ অট্টালিকা, সৌধ ও গৃহ শূন্য হয়ে পড়ে এবং তাদের পূর্বাবস্থা হতে বিচ্যুত হয়। এভাবে এক অট্টালিকা হতে অন্য অট্টালিকায়, এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে স্থানান্তরিত হতে হতে তাদের অধিকাংশই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। তখন তারা আবার যাযাবরী নির্মাণধারায় ফিরে আসে এবং পাথরের পরিবর্তে সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করে। অট্টালিকার আর অলংকরণের আতিশয্য থাকে না। নগরের নির্মাণকার্য পল্লী ও বস্তির অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তার উপর যাযাবরী জীবনের প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে। অতঃপর তা আরো হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে একান্ত ধ্বংসের সীমায় উপনীত হয়; অবশ্য যদি অনুরূপ কোনো ভাগ্য তার থাকে। এটাই সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত প্রথা।

www.amarboi.org

একাদশ পরিচ্ছেদ

[শহর-নগরের সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক তৎপরতার শ্রেষ্ঠত্ব তাদের অধিবাসীদের সংখ্যার আধিক্য এবং স্বল্পতা অনুসারেই হয়ে থাকে]

এর কারণ এই যে, ইতিপূর্বে এটা জ্ঞাত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, একক কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার জীবিকার প্রয়োজনীয় উপকরণ স্বাধীনভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এ জন্যই সমাজবদ্ধ জীবনে তারা পরস্পরকে সাহায্য করে থাকে। সে অভাব পূরণে একটি ক্ষুদ্র দল সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তা দিয়ে তাদের অপেক্ষা বহু গুণ বেশি লোকের প্রয়োজন মিটে। আহার্যের জন্য গমের কথা ধরা যাক; কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে তার ন্যায্য অংশ এককভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। বস্তুত ঐ অংশটুকু সংগ্রহ করতে তাকে ছয় অথবা দশজনের সাহায্য নিতে হবে। যন্ত্রপাতির জন্য কর্মকার ও সূত্রধর, পশুর জন্য পশুপালক, ভূমি কর্ষণের জন্য চাষী, শস্য কর্তনের জন্য কর্মী এবং অন্যান্য কৃষিকর্মীর সহায়তার প্রয়োজন। তাদের ভিন্ন ভিন্ন অথবা সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল ঐ পরিমাণ খাদ্য সংগৃহীত হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে তাদের এ সম্মিলন তাদের সংখ্যা অপেক্ষা বহুগুণ বেশি লোকের আহার্যের সংস্থান করতে সক্ষম। উৎপাদন প্রচেষ্টার ফলে যে ফসল লাভ করা যায়, তা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সংখ্যা ও প্রয়োজন মিটিয়ে সর্বদাই উদ্বৃত্ত হয়ে থাকে।

যে কোনো নগর ও শহরের অধিবাসীরা যখন তাদের অভাব ও প্রয়োজনের পরিমাণ অনুসারে উৎপাদন শ্রমকে বণ্টন করে নেয়, তখন অতি অল্প শ্রমেই কার্যসিদ্ধি হতে পারে এবং অবশিষ্ট শ্রম প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তা বিলাস ও তার অভ্যাসাদি পরিপূরণে ব্যয়িত হয়। অন্যদিকে এ অতিরিক্ত শ্রমের ফসল দিয়ে অন্যান্য শহরবাসীর প্রয়োজন মিটে এবং তারা এটা বিনিময় ও মূল্যের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এভাবে অতিরিক্ত শ্রমের অধিকারীরা সম্পদ লাভ করে। পাঠক, অত্র গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের উপার্জন ও জীবিকা পরিচ্ছেদে এ কথা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, উপার্জন শ্রমের মূল্য ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সুতরাং শ্রম বিনিয়োগ যদি বেশি হয়, তা হলে তার মূল্যও তাদের মধ্যে বেশি হয়ে থাকে এবং তদনুপাতে অবশ্যই উপার্জন বৃদ্ধি পায়। এ বৃদ্ধি তাদেরকে সম্পদ ও সমৃদ্ধির অনিবার্য পরিণতি বিলাসব্যসন এবং গৃহ, পরিচ্ছেদ, যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র প্রভৃতির সংস্কার ও অলংকরণের দিকে আকর্ষণ করে। তারা পরিচারক-পরিচারিকা ও যানবাহন সংগ্রহ করে। অনুরূপ সকল কার্যই আবার নতুন মূল্য বহন করে আনে, শিল্পীদেরকে উৎসাহিত করে এবং

www.amarboi.org

তাদের স্থায়িত্ব অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ফলে শ্রম ও শিল্পের বাজারে তেজীভাব দেখা দেয়। শহরের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যায়। এ সকল কার্যে নিয়োজিত কর্মীদের জীবনে সচ্ছলতা এসে তাদের শ্রমের মূল্য বাড়িয়ে দেয়।

এভাবে শহরের জনবসতি বৃদ্ধি পেলে শ্রমের বিনিয়োগও পুনরায় বেড়ে যায়। উপার্জনের বৃদ্ধি বিলাস, তার অভ্যাস ও প্রয়োজনকে বাড়িয়ে তোলে। তার চাহিদা পূরণের জন্য নিত্যনতুন শিল্পকর্ম আবিষ্কার করতে হয়। এর ফলে মূল্যমান বৃদ্ধি পায় এবং পুনরায় নগরের উপার্জন পরিধি প্রসার লাভ করে। শ্রমের বাজার পূর্বাপেক্ষাও তেজীভাব ধারণ করে। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তাতে সমৃদ্ধি দেখা দেয়। কারণ অতিরিক্ত শ্রম সর্বদাই সম্পদ ও বিলাসকে আকর্ষণ করে আনে। কিন্তু জীবিকা অর্জনের জন্য নিয়োজিত মৌলিক শ্রমের অবস্থা অনুরূপ নয়। এ জন্যই কোনো শহর যদি মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রম বিনিয়োগকারী কোনো জনগোষ্ঠীর অধিকারী হয়, তা হলে তাদের জীবনে উপার্জন, সমৃদ্ধি এবং বিলাসব্যসন ও তার অভ্যাসাদির এমন প্রাচুর্য পাওয়া যাবে, যা অন্যকোন শহরে সুলভ নয়। সুতরাং যে শহর যত বেশি জনসম্পদের অধিকারী, তা তদপেক্ষা হীন শহরের একই ধারায় আবর্তিত জীবন থেকে অধিকতর বিলাস ও প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কাজীর সাথে কাজীর, ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসায়ীর, শিল্পীর সাথে শিল্পীর, দোকানীর সাথে দোকানীর, আমীরের সাথে আমীরের এবং রক্ষী প্রধানের সাথে রক্ষী প্রধানের তুলনা করা যায়।

পাঠক, মাগরিবে আপনি এ বিষয়টিকে বিবেচনা করে দেখতে পারেন। যেমন ফেজের সাথে তার অন্যান্য শহরের তুলনা করুন। বেজা, তেলমিসান, সেবতার কথাই ধরুন না কেন; তাদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে একটা বিরাট পার্থক্য লক্ষ করতে পারবেন। অতঃপর যদি বিশেষ ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেন, তা হলে দেখতে পাবেন ফেজের কাজীর অবস্থা তেলমিসানের কাজীর অনুরূপ অবস্থা থেকে অনেকখানি প্রশস্ত। অন্যান্য পেশার লোকদের মধ্যে একই অবস্থা বিরাজ করছে। এভাবে তেলমিসানের সাথে 'ওহরান' ও আলজিরিয়ার তুলনা করতে পারেন এবং ওহরান ও আলজিরিয়ার সাথে তদপেক্ষা হীন শহরের। এভাবে তুলনার পর্যায় অতিক্রম করে আপনি সেই বস্তীবাসীদের মধ্যে পৌঁছবেন, যাঁরা তাদের শ্রমের দ্বারা শুধু জীবনের একান্ত প্রয়োজনই মিটিয়ে থাকে। অনেকস্থলে মৌলিক প্রয়োজন পূরণের অভাবও পরিলক্ষিত হবে। এ পার্থক্যের একমাত্র কারণ হল শ্রম বিনিয়োগের পার্থক্য। যেন তাদের সবগুলো শ্রমের বাজার। তার প্রতিটি বাজারে শ্রমের মূল্য অনুসারেই ব্যয় নির্ধারিত হয়। ফেজের কাজীর যে আয়, তা সেখানকার বাজারের ব্যয়ের জন্য সমমানের। এরূপ তেলমিসানের কাজীর কথাও বলা যায়। যে ক্ষেত্রে আয় ও ব্যয় বেশি, অধিবাসীদের অবস্থা সেখানে সমৃদ্ধতর। ফেজে এ দুটি বিষয় বেশি হওয়ার কারণ সেখানে বিলাসব্যসনের অনিবার্য তাগিদে শ্রমের বাজারমূল্য অধিক। সুতরাং অবস্থা-ব্যবস্থাও সেখানে বিরাট। অতঃপর এভাবে আপনি ওহরান, কুস্তানতুনিয়া, আলজিরিয়া, বস্করা প্রভৃতির অবস্থা বিচার করতে করতে এমন স্থলে পৌঁছলেন, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, যেখানে শ্রম মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতেও অক্ষম। এ কারণেই এ সকল জনপদকে শহরের মধ্যে গণ্য করা হয় না; তারা

www.amarboi.org

পল্লী ও বস্তীরই সমতুল্য। আর এ জন্যই আপনি এ সকল শহরের অধিবাসীদেরকে দারিদ্র্য ও অনটনের ক্ষেত্রে পরস্পর সংলগ্ন ও শোচনীয় অবস্থার অধিকারী হিসাবে দেখতে পাবেন। কারণ তাদের শ্রম তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। তারা তাদের জীবিকাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেনি, যাতে তার অতিরিক্ত উৎপাদন তাদের উপার্জন বৃদ্ধি করতে পারে। তারা এ কারণে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত। অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

পাঠক, এ বিষয়টি এমন কি দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের অবস্থার মধ্যে বিবেচনা করতে পারেন। ফেজের ভিক্ষুকের অবস্থা তেলমিসান ও ওহরানের ভিক্ষুক অপেক্ষা ভালো। আমি ফেজের ভিক্ষুকদেরকে কোরবানীর সময় তাদের কোরবানীর মূল্য ভিক্ষা চাইতে দেখেছি। তাদেরকে এমন অনেক বিলাসদ্রব্য ও সুখাদ্য ভিক্ষা চাইতে দেখেছি, যেমন মাংস, ঘৃত, রন্ধনের মসল্লা, পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী, চালুনী, বাসনপত্র ইত্যাদি; যা তেলমিসান, ওহরানের কোনো ভিক্ষুক প্রার্থনা করলে, তাকে তা দিতে অস্বীকার, তজ্জন্য দুর্ব্যবহার করা এবং ধমক দেয়া হবে।

বর্তমানকালে আমরা কায়রো ও মিশরের সম্পদ, সমৃদ্ধি ও বিলাসব্যসনের যে সংবাদ পাচ্ছি, তা আমাদের নিকট বিস্ময়কর বলে মনে হয়। এ কারণে মাগরিবের বহু দরিদ্রলোক এ সমৃদ্ধির লোভে মিশর গমনে আকর্ষিত হচ্ছে। কারণ তারা শুনেছে যে, অন্য সকল অঞ্চল অপেক্ষা সেখানে অধিকতর সমৃদ্ধি বিদ্যমান। সাধারণ লোকের ধারণা, এ সমৃদ্ধির কারণ উক্ত অঞ্চলের লোকেরা সকল কিছুই নিজেদের জন্য কুক্ষিগত করে রেখেছে অথবা তারা গুপ্ত সম্পদের অধিকারী। এজন্যই তারা অন্য সকল শহর অপেক্ষা অধিকতর দানধ্যান করতে সক্ষম। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। বরং তার কারণ তাই, পাঠক, যা আপনি পূর্বে জানতে পেরেছেন যে, মিশর ও কায়রোর জনবসতি অন্য সকল অঞ্চল অপেক্ষা অনেকগুণ বেশি। এ কারণেই তাদের অবস্থাও বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য আয়-ব্যয়ের অবস্থা প্রায় প্রতি শহরেই তুল্য মূল্য। যখন আয় বেশি হয়, ব্যয়ও বেশি হয়ে থাকে এবং এর বিপরীতটিও লক্ষযোগ্য। সুতরাং আয়-ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে গেলে অধিবাসীদের জীবনে সচ্ছলতা দেখা দেয় এবং শহরের পরিধি বেড়ে যায়।

পাঠক, এ প্রকার প্রাচুর্যের যে কোনো সংবাদ আপনি লাভ করেন না কেন, তাকে অস্বীকার করবেন না। এটাকে জনসম্পদের প্রাচুর্য দিয়ে বিবেচনা করুন। বস্তুত এর কল্যাণেই উপার্জনের আধিক্য এমন একটি সচ্ছলতার জন্ম দেয়, যা দান-ধ্যানকে অবারিত করে তোলে। পাঠক, এ বিষয়টিকে যে-কোনো একটি সমৃদ্ধ নগরের বাক্‌হীন পশু-পক্ষীদের বেলাতেও বিবেচনা করতে পারেন। দেখবেন তারা কেমন করে অঞ্চল বিশেষের ঘরবাড়িকে নিজেদের বিচরণক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয় এবং অন্যগুলোকে পরিত্যাগ করে। সম্পদশালী, ধনাঢ্য ও সচ্ছলতার অধিকারী ব্যক্তিদের বাড়ির আঙ্গিনা ও আস্তাকুড় শস্যকণা ও উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকে; এ কারণে সেখানে পিপীলিকা ও অন্যবিধ কীট-পতঙ্গের ভিড় দেখতে পাবেন। তাদের শস্য ভাণ্ডারের বৃহদাকারের ইঁদুর তাদের অনুসারী মার্জার কুল এবং তাদের বাড়ির আশেপাশে পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে

www.amarboi.org

বেড়ায়। এরা অনর্থক উড়ে না, উদ্দিষ্ট আহার্য লাভ করে পরিতৃপ্তও হয়। কিন্তু দরিদ্র ও অসচ্ছল লোকদের ঘরবাড়ির দিকে লক্ষ করুন; সেখানে কোনো কীটপতঙ্গ প্রবেশ করবে না, তার আশেপাশে কোনো পাখি উড়ে বেড়াবে না এবং তাদের ভাঁড়ারে কোনো ইঁদুর বা বিড়াল এসে আশ্রয় নিবে না। কবি বলেছেন[৪১]

পাখি সেখানেই নেমে আসে, যেখানে শস্যকণা ছিটিয়ে দেয়া হয়;
তারা এ জন্যই সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়িঘর ছাড়তে চায় না।

পাঠক, এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র লীলা অনুধাবন করুন। এ ক্ষেত্রে বাক্‌হীন প্রাণীদের সমাবেশের সাথে সবাক্ মানুষের আচরণের তুলনা করুন। উচ্ছিষ্ট খাদ্যকণার সাথে প্রাচুর্যের ফলে অতিরিক্ত সম্পদের বিষয়টি মিলিয়ে দেখুন। এর একমাত্র কারণ সম্পদের প্রাচুর্য তাদের জীবনযাত্রাকে এতটা সচ্ছল করে তুলেছে যে, তারা তা ছিটিয়ে-ছড়িয়ে ব্যয় করতে দ্বিধা করে না। সুতরাং এ কথা ভালো করে জেনে রাখুন যে, এ প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি একমাত্র নগর জীবনে জনসম্পদের প্রাচুর্যের অনুসারী। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞাতা। তিনিই নিখিল বিশ্বের মুখাপেক্ষী নন।[৪২]

৪১. কবির নাম বাশ্‌শার ইবনে বুরদ; মৃত্যু ১৬৭ (৭৮৬ খ্রি:) হি:।
৪২. কোরান, ৩, ৯৭।

www.amarboi.org

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[নগরসমূহের দ্রব্যমূল্য]

জেনে রাখুন, প্রতিটি বাজারই মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান দিয়ে থাকে। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক মৌলিক প্রয়োজনের অধীন; যেমন আহার্যের জন্য গম, যব এবং অনুরূপ খাদ্য শাকসব্জি, মটর কলায়, দাল ইত্যাকার যাবতীয় শস্য ও তাদের মসল্লা হিসাবে পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি। অন্যগুলো পরিপূর্ণতা বিধায়ক প্রয়োজনের সৃষ্টি; যেমন মসল্লা, ফলমূল, পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী, যানবাহন এবং যাবতীয় শিল্পকর্ম ও স্থাপত্য। সুতরাং যখন নগরের পরিধি বিস্তারলাভ করে এবং তার অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন মৌলিক প্রয়োজনের আহার্যসামগ্রী ও তার অনুরূপ দ্রব্যাদির মূল্য সুলভ হয়। অন্যদিকে বিলাসসামগ্রী—যথা মসল্লা, ফলমূল ও অনুরূপ অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য মহার্ঘ হয়ে থাকে। আবার নগরের জনসংখ্যা কমে গিয়ে তার দুরবস্থা দেখা দিলে এ মূল্যানুপাত বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।

এর কারণ এই যে, শস্য আহার্যের একটি অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। সুতরাং তা সংগ্রহের চাহিদা একান্তভাবে সাধারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ কোনো ব্যক্তিই তার নিজের বা তার পরিবার-পরিজনের আহার্যসামগ্রী একমাস বা একবছরের জন্য সংগ্রহ করে রাখতে দ্বিধা করে না। সুতরাং নগরের সমস্ত লোক কিংবা অধিকাংশ অধিবাসী অথবা তার নিকটতর একটি জনসংখ্যা এ সংগ্রহকার্যে ব্যাপৃত হয়। এভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করার ফলে প্রত্যেকের নিজের খাদ্য ও পরিবার-পরিজনের আহার্য থেকে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্বৃত্ত হয় এবং তার দ্বারা শহরের অন্য আরো কিছু সংখ্যক অধিবাসীর প্রয়োজন মিটে। অনুরূপভাবে সমগ্র শহরে খাদ্যের একটা সাধারণ উদ্বৃত্তরূপ নিঃসন্দেহে ধারণা করা যায়। সুতরাং কোনো কোনো বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের অসুবিধা ব্যতীত প্রায় সর্বদাই খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সুলভ থাকে। যদি এরূপ দুর্যোগের আশঙ্কা করে মানুষ অনুরূপভাবে খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করে না রাখত, তা হলে জনবসতির প্রাচুর্যের জন্য খাদ্যদ্রব্যের এত প্রতুলতা হত যে, তা কোনোপ্রকার বিনিময় ও মূল্য ব্যতীতই মানুষকে বিলিয়ে দিতে হত।

মসল্লা, ফলমূল ও ইত্যাকার ধরনের রুচিকর সামগ্রীগুলো সাধারণ চাহিদার বিষয় নয়। এটা সংগ্রহ করে রাখার বিষয়টি সমগ্র জনবসতির তৎপরতাকে আলোড়িত করে না। এমনকি অধিকাংশের মধ্যেও এর প্রতি আকর্ষণ দেখা যায় না। তদুপরি নগর পরিবেশ যখন ব্যাপক বিস্তৃত, জনসংখ্যাবহুল ও বিলাসব্যসনের প্রতি অতিমাত্রায়

www.amarboi.org

উদ্যোগী হয়ে ওঠে, তখন তার সাথে সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা লাভের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এর ফলে এ সকল সামগ্রীর মজুদ প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ বহু ব্যক্তিই এগুলো লাভ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু সামগ্রীর স্বল্পতাহেতু প্রয়োজনীয় যোগান দেয়া কিছুতেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং ইচ্ছুক ব্যক্তিদের এ ক্ষেত্রে ভিড় জমে যায় এবং স্বচ্ছল ও বিলাসী লোকেরা অন্যদের অপেক্ষা বহুগুণ বেশি মূল্য দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দুর্মূল্যে সংগ্রহ করতে অপব্যয়ের দ্বারস্থ হয়। পাঠক, এ কারণেই এ সকল বিলাসী দ্রব্যে দুর্মূল্য দেখা দেয়, যেমন আপনি লক্ষ করে থাকেন।

জনবসতিপূর্ণ নগরগুলোতে শিল্পকর্ম ও শ্রমের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। এর বৃদ্ধির কারণ তিনটি; প্রথমত: জনবসতি অধিক হওয়ায় বিলাসব্যসনের চাহিদা প্রচুর হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত: নগরের আহার্যসামগ্রীর প্রাচুর্য কর্মীদের জীবনে সাধারণ সচ্ছলতার নিশ্চয়তা বিধানের নিমিত্ত তারা পরিশ্রম ও কর্মতৎপরতাকে অত্যধিক মূল্যবান মনে করে। তৃতীয়ত: আরামপ্রিয় লোকের সংখ্যা অধিক হওয়ায় তারা প্রয়োজনীয় কর্মের জন্য অন্যদেরকে নিয়োগ করতে বাধ্য হয় এবং শিল্পীদের উপর নিজের কর্তব্য ন্যস্ত করতে গর্ববোধ করে। সুতরাং তারা পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে শ্রমের যথার্থ মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়ে কর্মে নিয়োজিত করে। এর ফলে কর্মী, শিল্পী ও পেশাধারী ব্যক্তিরা নিজেদেরকে মূল্যবান মনে করতে থাকে এবং তদনুপাতে তাদের শ্রমের মূল্যও বেড়ে যায়। কাজেই এ সকল ব্যাপারে নগরবাসীদের ব্যয়বাহুল্য ঘটে।

অন্যদিকে স্বল্প জনসংখ্যাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র শহরে শ্রমের ন্যূনতার জন্য আহার্যসামগ্রীর পরিমাণ কম থাকে। তদুপরি শহরের ক্ষুদ্র পরিবেশই তাদের মনে আহার্যসামগ্রীর অভাবে আশঙ্কা জাগিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় তাই সঞ্চয় করে রাখতে উৎসাহিত করে। সুতরাং তার অস্তিত্ব তাদের নিকট দুর্লভ হয়ে ওঠে এবং একান্ত আগ্রহী ক্রয়েচ্ছুদের নিকট তা মহার্ঘ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিলাস সামগ্রীর ক্ষেত্রে অধিবাসীদের স্বল্পতাজনিত দুরবস্থার দরুন তেমন কোনো চাহিদাই থাকে না। ফলে তার বাজার মন্দা হয়ে দাঁড়ায় এবং তার মূল্যমান একান্ত সুলভ হয়ে ওঠে।

কখনও কখনও খাদ্যসামগ্রীর মূল্যের মধ্যে শুল্ক, শাসকের নির্ধারিত অতিরিক্ত বাজার কর, শহরের উন্নয়ন কর এবং কর আদায়কারীদের নিজেদের জন্য বিক্রেতাদের উপর ধার্য কর প্রভৃতি এসে অনুপ্রবেশ করে। এর ফলে গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শহরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অধিক হতে দেখা যায়। কারণ শুল্ক, অতিরিক্ত কর, আরোপিত কর ইত্যাদির চাপ গ্রামবাসীদের উপর অতি অল্প অথবা নেই বললেও চলে। অথচ শহরে এর ঠিক বিপরীত; বিশেষ করে সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায়। অনেক সময় খাদ্যসামগ্রীর মূল্যের মধ্যে চাষাবাদ-শ্রমের মূল্যও যোগ করা হয় এবং মূল্যমান নির্ধারণের সময় তার প্রতি লক্ষ রাখা হয়। যেমন বর্তমানকালে আন্দালুসে করা হচ্ছে। এর কারণ খ্রিস্টানরা মুসলমানদিগকে সমুদ্র তীরবর্তী অনুর্বর, অনাবাদী ও উদ্ভিদের অনুপযোগী ভূমির দিকে ঠেলে দিয়ে তারা নিজেরা উর্বর ও আবাদী অঞ্চলের অধিকারী হয়ে বসায় মুসলমানরা

www.amarboi.org

বাধ্য হয়ে তাদের কৃষিকর্মে ভূমি সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেছে। এ প্রচেষ্টায় তাদেরকে মূল্যবান শ্রম এবং সার ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হয়েছে, যা একান্তই ব্যয়সাপেক্ষ। এ কারণে তাদের কৃষিব্যয় আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং তাকে কৃষিপণ্যের মধ্যে যোগ না করে তারা পারেনি। এভাবে যেদিন থেকে সমুদ্র তীরবর্তী মুসলিম অধ্যুষিত ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলোতে খ্রিস্টানরা চাষীদেরকে বিতাড়িত করেছে, তখন থেকেই আন্দালুসের দুর্মূল্য দেখা দিয়েছে।

মানুষ যখন ঐ সকল অঞ্চলের পণ্যাদির দুর্মূল্যের কথা শুনে, তারা ধারণা করে যে, এর কারণ সেখানকার শস্য ও আহার্যদ্রব্যের স্বল্পতা। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। বরং আমরা যতদূর জেনেছি, জনবসতির তুলনায় তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই স্থায়ীভাবে কৃষিকার্যে নিয়োজিত। তাদের মধ্যে শাসক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ লোক পর্যন্ত প্রায় সকলেরই কৃষিভূমি, খামার ও শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। খুব অল্পসংখ্যক শিল্পকর্মী, শ্রমজীবী, যুদ্ধ ব্যবসায়ী ও ধর্মযোদ্ধাগণ ব্যতিরেকে সকলেই উক্ত কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। অথচ এতদসত্ত্বেও সুলতান তাদের বেতনাদি প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যে শস্য সরবরাহ করছেন। অর্থাৎ কৃষি পণ্য থেকে তাদের আহার্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিচ্ছেন। সুতরাং তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের দুর্মূল্যের কারণ, আমরা যেমন বর্ণনা করেছি, তাই।

অন্যদিকে বারবারদের ভূমি ব্যবস্থা যেহেতু তার সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে উর্বরতা ও উদ্ভিজ্জ উপযোগিতার দ্বারা বিশিষ্ট, সেজন্য তাদের কৃষি উৎপাদনে তার প্রাচুর্য ও সাধারণ সমৃদ্ধির জন্য ব্যয়ের মাত্রা বহুগুণে কম এবং এ কারণেই সেখানে আহার্যসামগ্রীর মূল্য একান্তই সুলভ। আল্লাহ্ দিবা-রাত্রি নির্ধারণ করে থাকেন।[৪৩] তিনি একক ও পরাক্রমশালী। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিপালক নেই।

---

৪৩. কোরান, ৭৩, ২০।

www.amarboi.org

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[প্রান্তরবাসীদের পক্ষে জনবসতিবহুল নগরীতে বসবাস করা অসুবিধাজনক]

এর কারণ এই যে, নগর পরিবেশ সর্বদাই জনবহুল এবং বিলাসব্যসনে পরিপূর্ণ, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ বিলাসের জন্যই সেখানকার অধিবাসীদের অভাব-অনটনের ধারণা অত্যধিক এবং এর প্রতি অমোঘ আকর্ষণের ফলেই তারা এগুলো পূরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। একসময়ে তাদের এ অভ্যাস অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে পরিণত হয় এবং তজ্জন্য শ্রম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ক্রমশ মহার্ঘ হয়ে ওঠে। কারণ, বিলাসের আকর্ষণে সকলেই এগুলোর সংগ্রহকরণে ভিড় জমায়। তদুপরি শাসন ব্যবস্থার দিক থেকে বাজার, পণ্যদ্রব্য প্রভৃতির উপরে আরোপিত কর পণ্য মূল্য হিসাবে পরিগণিত হয়। এজন্য সেখানকার সুযোগ-সুবিধা, আহার্য ও শ্রম ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জনবসতির অনুপাতে নগরবাসীদের ব্যায়ের মাত্রা একটা চরম সীমায় উপনীত হয়। এ প্রকার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সেখানে বসবাসকারীরা নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের জীবনযাত্রা নির্বাহ ও অন্যান্য কর্ম নিষ্পত্তির জন্য প্রচুর অর্থের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

অথচ প্রান্তরবাসী কোনো লোকের আয়ই অধিক নয়। কারণ তারা এমন এক স্থানে বসবাস করে, যেখানে বাজারের মন্দাভাব ও শ্রমের স্বল্প মূল্য সর্বদাই বিরাজমান। বস্তুত শ্রমের মূল্যের উপরই উপার্জন নির্ভর করে এবং এ কারণে তাদের পক্ষে এমন উপার্জন বা সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, যা দিয়ে বৃহৎনগরীর ব্যয়ভার সংকুলান হওয়া সম্ভব। সুতরাং তাদের পক্ষে নগর পরিবেশের সুযোগ-সুবিধার দুর্মূল্যতা ও অভাবের ব্যাপকতাকে এড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই তারা সেই প্রান্তরীয় জীবনে স্বল্প পরিশ্রমে নিজের প্রয়োজনীয় অভাব পূরণেই ব্যাপৃত থাকে। সেখানে বিলাসব্যসনের অভ্যাস নেই এবং জীবন-যাপনেও ব্যয়ভারের কোনো চাপ নেই। এ জন্য সম্পদ সংগ্রহের প্রতিও তাদের কোনোপ্রকার লালসা নেই। এ কারণেই দেখা যায়, প্রান্তরবাসীদের মধ্যে যারা নাগরিক জীবন অবলম্বন করতে উৎসাহী হয়, অতি অল্পদিনের মধ্যে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং তারা পদে পদে অপমানের সম্মুখীন হতে থাকে। অবশ্য কিছু সংখ্যক এমন লোককে এর ব্যতিক্রম ধরা যায়, যাদের সম্পদের সঙ্গতি আছে, প্রয়োজনে অতিরিক্ত ব্যয় করার সামর্থ্য আছে, কেবল তারাই স্বাভাবিক জীবন বিকাশের ধারায় বিলাস ও স্বস্তির প্রতি আকর্ষিত হয় এবং নগর জীবনে প্রবেশ করে নাগরিকদের বিলাসব্যসন ও অভ্যাস আচরণের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ হয়। এভাবেই নগর জীবন ধারার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। আল্লাহ্ সকল বিষয়কে বেষ্টন করে রয়েছেন।[৪৪]

---

৪৪. কোরান, ৪৯, ৫৪।

www.amarboi.org

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের দিক থেকে বিভিন্ন অঞ্চল ও নগর জীবন একই প্রকার]

জেনে রাখুন, বিভিন্ন অঞ্চলের জনবসতি পূর্ণতা লাভ করলে, সেখানে বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হয় ও অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সেই অনুপাতে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেয়। তারা শহর-নগর নির্মাণ করে তাদের সাম্রাজ্য ও রাজশক্তির ব্যাপকতা সৃষ্টি করে। এ সকল কিছুর কারণ, আমরা যেমন বর্ণনা করেছি, শ্রমের অধিকতর বিনিয়োগ এবং সম্মুখেও তার বর্ণনা আসবে যে, এটাই ধনাঢ্যতার কারণ। কেননা যে কোনো অধিবাসীর পক্ষে যদি তার শ্রম বিনিয়োগ করে তার মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর উদ্বৃত্ত থাকে, তা হলে জনসম্পদের অনুপাতে সেই উদ্বৃত্ত এমন একটা জীবনমান নির্ধারণ করে দেয়, যার উপর মানুষ বিনা দ্বিধায় তাদের উপার্জনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। যেমন আমরা এ সম্পর্কে পরে জীবনযাপন, আহার্য ও উপার্জন সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদগুলোতে বর্ণনা করব। বস্তুত এর ফলেই সমৃদ্ধি দেখা দেয়, অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, বিলাসব্যসন ও প্রাচুর্য এসে উপস্থিত হয়। বাজারের তেজীভাবের জন্য রাজকোষের সমৃদ্ধি ঘটে, তার সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। তখন প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মিত হয় এবং নগরের পরিকল্পনা ও শহরের পত্তন সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

পাঠক, এ বিষয়টি পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোতে বিবেচনা করুন। যেমন মিশর, সিরিয়া, ইরাক আজম, হিন্দ, চীন; উত্তর দিকের সমস্ত এলাকা এবং রোম সাগরের অপর তীরস্থ অঞ্চল। কীভাবে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের মধ্যে সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছে, শহর-নগরের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানকালে আমরা মাগরিবের মুসলমানদের সন্নিধানে আগত খ্রিস্টান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অবস্থায় যে সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা দেখতে পাচ্ছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পূর্বাঞ্চলে ব্যবসায়ীদের অবস্থাও একই প্রকার। তাদের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সকল সংবাদ আমরা পেয়ে থাকি, তন্মধ্যে দূরতম প্রাচ্য ইরাক আজম, হিন্দ ও চীনের কথা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাদের ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্য সম্পর্কে ভ্রমণকারীরা যে সকল অদ্ভুত বিবরণ প্রদান করেছে, তা অনেক সময়েই অসম্ভব অবাস্তব বলে মনে হয়। সাধারণ লোকেরা এ সকল কাহিনী শুনে ধারণা করে যে, এর কারণ তাদের ঐশ্বর্যই অধিক অথবা স্বর্ণরৌপ্যের সকল খনিই তাদের এলাকায় বিদ্যমান অথবা প্রাচীন জাতিগুলোর সমুদয়

www.amarboi.org

স্বর্ণ অন্যদেরকে বঞ্চিত করে তারাই ভোগ করেছে। অথচ প্রকৃত অবস্থা এর কোনটিই নয়। এ অঞ্চলে স্বর্ণের খনি সম্পর্কে আমরা যতদূর জানি, তা সুদানে অবস্থিত এবং তুলনামূলকভাবে মাগরিবের নিকটবর্তী। তদুপরি তাদের অঞ্চলের সমুদয় পুঁজিই তারা ব্যবসায় খাটিয়ে অন্যান্য অক্ষম থেকে মুনাফা অর্জন করে। যদি তাদের এলাকায় স্থায়ী সম্পদের কোনো পূর্ণ ভাণ্ডার থাকত, তা হলে এভাবে তারা পুঁজি নিয়োগ করে অন্যান্য দেশে ঘুরে বেড়াত না; বরং মানুষের সম্পদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের গৃহেই বসে থাকত।

জ্যোতিষীরা পূর্বাঞ্চলের এরূপ অবস্থা দেখে এবং তাদের সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য অবগত হয়ে বিস্মিত হয়েছেন। তাদের ধারণা, পূর্বাঞ্চলের লোকদের জন্মলগ্নে নক্ষত্রের শুভ প্রভাব ও ভাগ্য লক্ষণ মাগরিবের লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশি। এ ধারণা তখনই শুদ্ধ হয়, যখন তা জ্যোতিষশাস্ত্রের সাথে জাগতিক অবস্থাকে মিলিয়ে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। জ্যোতিষিরা এ বক্তব্যে শুধু জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কারণটির কথা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু জাগতিক কারণটি অবশিষ্ট রয়েছে। তা এই যে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, জনবসতির প্রাচুর্য এবং তা পূর্বাঞ্চল ও তার দিগ্‌দিগন্তে বিশেষভাবে বর্তমান। অধিকতর জনবসতি অধিকতর পরিশ্রমজাত উপার্জনের প্রাচুর্য বিধান করে। এ কারণে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা পূর্বাঞ্চলে অধিকতর সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছে। এটা শুধুমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রীয় নক্ষত্রের প্রভাবের ফল নয়। পাঠক, আমাদের পূর্ববর্তী বর্ণনা থেকে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, নক্ষত্রের প্রভাব কখনও স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারে না। এ জন্য তার প্রভাব, পৃথিবীর জনবসতি ও তার গতি-প্রকৃতির সামঞ্জস্য বিধান হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

পাঠক, জনবসতির কল্যাণে সমৃদ্ধির এ বিষয়টিকে আফ্রিকিয়া ও 'বরকা' অঞ্চলে বিবেচনা করুন। যখন তাদের অধিবাসীর সংখ্যা কমে গিয়ে জনবসতি উজার হয়ে পড়ল, তখন কেমন করে তাদের অবস্থা-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে অধিবাসীরা অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হল। তাদের রাজকোষের সমৃদ্ধি হ্রাস পেল এবং সাম্রাজ্যশক্তি হীন হয়ে পড়ল। অথচ ইতিপূর্বে সেখানে শিয়া ও সিনহাজাদের সাম্রাজ্য ছিল এবং পাঠক, আপনি তাদের সমৃদ্ধি, রাজকোষের প্রাচুর্য এবং তাদের খরচপত্র ও দানধ্যানের আতিশয্যের কথা অবশ্যই শুনতে পেয়েছেন। এমন কি অধিকাংশ সময় মিশরাধিপতির সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় নির্বাহের জন্য এ কায়রোয়ান থেকে সম্পদ পাঠাতে হত। সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি এ পরিমাণ ছিল যে, জওহর আল কাতেব তাঁর মিশর জয়ের অভিযানে সৈন্যদের আহার্য, বেতন ও অন্যান্য খরচপত্রের প্রয়োজনীয় সম্পদ এখান থেকেই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রাচীনকালে মাগরিবের এ অঞ্চল যদিও আফ্রিকিয়ার তুলনায় ন্যূন ছিল, তথাপি সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার কোনরূপ অন্যথা ছিল না। আল-মোহেদদের সাম্রাজ্যকালে তার অবস্থা সমৃদ্ধ ও তার রাজকোষ পরিপূর্ণ ছিল। অথচ বর্তমানকালে তার জনবসতি হ্রাসের ফলে পূর্বাবস্থা অনেকগুণে কমে গেছে। তার মধ্য থেকে বারবারদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী চলে গেছে এবং তার অভ্যস্ত জীবনধারায় ক্ষয়ের চিহ্ন অত্যন্ত প্রকট হয়ে

www.amarboi.org

পড়েছে। তা যেন ক্রমশ আফ্রিকিয়ার অবস্থার দিকে ফিরে যাচ্ছে। অথচ ইতিপূর্বে তার জনবসতি রোম সাগর থেকে সুদান পর্যন্ত এবং দৈর্ঘ্যে দূরতম সুসম ও বরকা পর্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল। বর্তমানে তার অধিকাংশ স্থান জনবিরল প্রান্তর, শূন্যমাঠ ও মরুভূমি। শুধুমাত্র সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল ও তৎসন্নিহিত পাহাড়ী এলাকাগুলোতে পূর্বাবস্থা কিছুটা বিদ্যমান। আল্লাহ্ পৃথিবী ও তার উপরিস্থিত সমুদয়ের উত্তরাধিকারী এবং তিনিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।

www.amarboi.org

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[নগর পরিবেশে কৃষিখামার ও ভূসম্পত্তি সংগ্রহ এবং তার উপকারিতা ও উৎপাদন]

জেনে রাখুন, নগর ও শহরবাসীদের জন্য কৃষিখামার ও ভূসম্পত্তি অধিকমাত্রায় সংগ্রহের ব্যাপারটি একবারে ও এককালে কখনই সংঘটিত হয় না। কারণ তাদের মধ্যে কারো পক্ষে এমন কোনো সম্পদের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়, যা দিয়ে সে সীমা অতিক্রমকারী মূল্যের কোনো সম্পত্তি হস্তগত করতে পারে। বাস্তবক্ষেত্রে তার সচ্ছলতা এক প্রকার চরম সীমায় উপনীত হলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বরং তাদের এ প্রকার ভূসম্পত্তি সংগ্রহ পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে। হয় এটা সে পিতা-পিতামহ ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে এবং ঘটনাক্রমে বহুলোকের সমস্ত সম্পত্তি অথবা তার অধিকাংশ একব্যক্তির হাতে এসে জড় হয়; কিংবা বাজারমূল্যের অস্থিরতার জন্য এরূপ সম্পত্তি কারো অধিকারে চলে আসে। কারণ যখন একটি সাম্রাজ্য শেষ হয়ে আসে ও অন্যটির আরম্ভ হয়, তখন এ যুগসন্ধিক্ষণে সাম্রাজ্যের সহায়ক শক্তি ধ্বংস হয়, তার বিন্যাস দৃঢ়তা ভেঙে পড়ে এবং নগর পরিবেশের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এ সময়ে ভূসম্পত্তির উপযোগের অভাবে তার চাহিদা কমে যায়। কেননা সামগ্রিক অবস্থারই তখন পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং তার মূল্য সুলভ হওয়ার ফলে খুব অল্প সম্পদের বিনিময়েই তা লাভ করা সম্ভব হয়। এভাবে তা উত্তরাধিকারের মধ্যদিয়ে পরবর্তীদের অধিকারে চলে আসে। অবশ্য ইতিমধ্যে নগর পরিবেশ পরবর্তী সাম্রাজ্য শক্তির বদান্যতায় নতুন যৌবন ফিরে পেতে শুরু করেছে। পুনরায় এর বুকে এক নবীন শৃঙ্খলাবোধ সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ সময়ে আবার কৃষি খামার ও ভূসম্পত্তির উপযোগিতা ফিরে আসায় তার চাহিদা বেড়ে যায় এবং তার মূল্যমান মহার্ঘ হয়ে ওঠে। বস্তুত তখন তার এমন একটি গুরুত্ব দেখা দেয়, যা প্রথম অবস্থায়ও ছিল না। একেই বাজার মূল্যের অস্থিরতা বলা হয়েছে। এর ফলে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী শহরের সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। অবশ্য এটা তার চেষ্টায় বা উপার্জনের দ্বারা হয় না। কারণ তার একক ক্ষমতা কোনো সময়েই এরূপ কিছু করতে পারে না।

কিন্তু এরূপ কৃষি খামার ও ভূসম্পত্তির উপকারিতার কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, তা কোনো সময়েই তার অধিকারীর জীবনের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট নয়। কারণ, তার দ্বারা তার বিলাসব্যসন ও তার উপকরণের চাহিদা পূরণ হয় না। বড় জোর তা

www.amarboi.org

থেকে তার সাধারণ প্রয়োজন ও জীবিকার চাহিদা মিটতে পারে। আমরা দেশের জ্ঞানীদের নিকট থেকে এ প্রসঙ্গে যা শুনতে পেয়েছি, তা এই যে, এইপ্রকার কৃষি খামার ও ভূসম্পত্তি অর্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল পরবর্তী দুর্বল সন্তান-সন্ততির অসহায়তার আশঙ্কা দূর করা। যাতে যতক্ষণ তারা উপার্জনক্ষম না হয়ে ওঠে, ততক্ষণ তার দ্বারা প্রতিপালিত, আহার্যপ্রাপ্ত এবং তার সহায়তায় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ হতে পারে। এভাবে তারা উপার্জনশীল হয়ে উঠলে নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম হবে। কখনো বংশধররা এমনও হয় যে, দৈহিক ত্রুটি অথবা বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য তারা জীবন ধারণ উপযোগী সম্পদ উপার্জন করতে সমর্থ হয় না। এ পরিস্থিতিতে ভূসম্পত্তি তাদের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এ উদ্দেশ্যেই ভূসম্পত্তি অর্জন করে থাকেন।

এতদ্ব্যতীত কেউ যদি তার দ্বারা পুঁজি সংগ্রহ ও বিলাসী জীবনের উপকরণ লাভ করতে চায়, তা হলে বলতে হবে, অসম্ভব। অবশ্য অনেক সময় বাজারমূল্যের অস্থিরতার ফলে খুব কম ও বিরল হলেও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এও একমাত্র তার মূল্যমান এমন এক চরম সীমায় পৌঁছলেই সম্ভব হয়, যেখানে তার শ্রেণী ও মূল্য উভয়েই নগর পরিবেশে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হবে। তবে এমন কিছু ঘটলে অনেক সময়েই আমীর ও শাসকদের দৃষ্টি তার উপর পতিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা তা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে অথবা কিনে ফেলতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ফলে তার মালিকরা বিপদ ও দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে বিজয়ী এবং তিনিই মহান আরশের অধিকারী।[৪৫]

৪৫. কোরানের দুইস্থানে বর্ণিত দুইটি বাক্য একত্র করা হয়েছে।

www.amarboi.org

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

[নগরের পুঁজিপতিদের জন্য জাঁকজমক ও প্রতিরোধ শক্তি থাকা প্রয়োজন]

এর কারণ এই যে, কোনো নাগরিকের পুঁজির প্রাচুর্য এবং কৃষি খামার ও ভূসম্পত্তির ব্যাপকতা ঘটে নগরীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদশালী হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠলে সকলের দৃষ্টি তার উপর পতিত হয়। তার বিলাসব্যাসন ও সচ্ছল অবস্থাজনিত বৈচিত্র্যের জন্য সে আমীর, অমাত্য ও রাজন্যবর্গের প্রতিবেশী হয়ে ওঠে এবং তারাও তার প্রতি হিংসা পোষণ করতে আরম্ভ করে। মানুষের স্বভাবেই যেহেতু উৎপীড়নের ভাব বিদ্যমান, সেই জন্য তার সম্পদ সৌভাগ্যের উপর তাদের লোভাতুর দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তা ছিনিয়ে নেবার জন্য তারা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। তারা সকল প্রকার সম্ভাব্য কৌশলের দ্বারস্থ হয়ে তাকে শাসন ব্যবস্থার নির্দেশের অধীনে আনতে চেষ্টা করে এবং তা তার নিকট থেকে গ্রহণ করার একটি প্রকাশ্য অজুহাত তৈরি করে। সাধারণভাবে অধিকাংশ শাসন ব্যবস্থাই অত্যাচারী হয়ে থাকে। কারণ নির্ভেজাল ন্যায়বিচার একমাত্র ধর্মানুমোদিত খেলাফতেই পাওয়া সম্ভব; অথচ তা একান্তই স্বল্পকাল স্থায়ী। হুজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, খেলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর; অতঃপর তা অত্যাচারী রাজশক্তিতে প্রত্যাবর্তন করবে। এ কারণেই জনবসতির মধ্যে সুপরিচিত সম্পদ ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির জন্য এমন একটি সহায়ক শক্তির প্রয়োজন, যা তার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে এবং এমন একটি জাঁকজমক থাকা দরকার, যাকে লোকে সমীহ করতে বাধ্য হয়। এটা সম্রাটের আত্মীয়তা, অন্তরঙ্গতা অথবা এমন একটি গোত্রপ্রীতির সহায়তা হতে পারে, সম্রাট যার শ্রদ্ধাশীল। সে এর আশ্রয়ে থেকে তার উপর আগত অতর্কিত আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবে। অন্যদিকে যদি তার অনুরূপ কোনো প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকে, তা হলে সে নানাবিধ কৌশল ও শাসনতান্ত্রিক নির্দেশের শিকারে পরিণত হবে। আল্লাহ্ নির্দেশ দান করেন এবং নির্দেশ অমান্যকারী কেউ নেই।[৪৬]

---

৪৬. কোরান, ১৩, ৪৯।

www.amarboi.org

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[নাগরিক সভ্যতা সাম্রাজ্যেরই অবদান এবং তার ধারাবাহিকতা ও দৃঢ়তাতেই সভ্যতার সমৃদ্ধি]

এর কারণ এই যে, নাগরিক সভ্যতা এমন একটি স্বাভাবিক অবস্থা, যা মানব সভ্যতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এর এ অতিরিক্ত অবস্থাটি সচ্ছলতা এবং জনসংখ্যার আধিক্য ও স্বল্পতার দরুন সীমাহীনভাবে বিচিত্র হয়ে থাকে। এও নানাপ্রকার ও আকারের শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শিল্পকর্মের ন্যায় বিচিত্রধর্মীয় হয়ে ওঠে। এ কারণে এর প্রতিটি শাখাই নিজস্ব শিল্পী ও দক্ষ কারিগরের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এভাবে যতই তার শাখা-প্রশাখা বাড়তে থাকে ততই সংশ্লিষ্ট শিল্পীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি পুরুষ তার রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। অতঃপর সময়ের ধারাবাহিকতা এ শিল্পকলাকে বহন করার ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা তার বিচিত্র দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে কালের ব্যাপক পরিধি বারবার এ সকল শিল্পকলাকে পরীক্ষা করে দৃঢ় ও প্রভাবশীল করে তোলে।

অবশ্য এদের অধিকাংশই নগর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ এখানে জনবসতি যেমন অধিক, তেমনি তারা যোগ্য সচ্ছলতারও অধিকারী। অন্যদিকে এর সমস্ত কিছুই সাম্রাজ্যের কল্যাণে উৎপন্ন হয়। কেননা সাম্রাজ্যই প্রজাদের সম্পদ একত্র করে তা তার অন্তরঙ্গ সহায়ক ও কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। অবশ্য তাদের সচ্ছলতা যে পর্যায়েই থাকুক না কেন পদমর্যাদাই তাদেরকে অবস্থার পরিবর্তন সাধনে সাহায্য করে। এর ফলে প্রজাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আয় সাম্রাজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যে ব্যয়িত হয়। অতঃপর তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত নগরবাসীরাও এর অংশ পায়। এদের সংখ্যাই অধিক এবং এ কারণে তাদের ঐশ্বর্য বিরাট, তাদের সম্পদ প্রচুর এবং তাদের বিলাসব্যসন ও তার মতাদর্শ ব্যাপক হয়ে ওঠে। এর ফলে তৎসম্পর্কিত শিল্পকর্মের সকল প্রকার বৈচিত্র্য তাদের মধ্যে স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়। এটাই নাগরিক সভ্যতা।

সম্ভবত এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত নগরগুলো যদিও জনসংখ্যায় পরিপূর্ণ থাকে, তথাপি তাদের অবস্থা অনেকাংশে যাযাবরী জীবনের ধারাবাহিক এবং সর্বপ্রকার মতাদর্শের দিক থেকেই নগর সভ্যতার সাথে বিভিন্ন। অথচ সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে তার কেন্দ্র ও রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত নগরে এর বিপরীত অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। এটা শাসকের সান্নিধ্য ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর সম্পদ বিতরণের ফলশ্রুতি ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। এটা যেন জলের স্রোত; এটা নিকটবর্তী

www.amarboi.org

সকল ভূমিকেই তা সবুজ করে তোলে এবং তার নিকট থেকে ক্রমশ দূরবর্তী সকল কিছুর মধ্যেই আনুপাতিক শুষ্কতা বিরাজ করে। আমরা পূর্বে বলেছি যে, শাসক ও সাম্রাজ্য পৃথিবীর পণ্যকেন্দ্র বিশেষ। সুতরাং সমস্ত পণ্য এর মধ্যে ও সন্নিকটে স্তূপীকৃত হয় এবং যতই তা থেকে দূরে যাওয়া যায়, ততই পণ্যের স্বল্পতা দেখা দিয়ে এক সময়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে ওঠে। সুতরাং উক্ত সাম্রাজ্য যদি তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে এবং তার শাসকবৃন্দ একের পর এক নগরীতে শাসন পরিচালনা করতে সমর্থ হয়, তা হলে নগরের সভ্যতা-সংস্কৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে স্থায়ী মর্যাদায় বিভূষিত হয়।

পাঠক, ইহুদিদের ব্যাপারে এ বিষয়টি বিবেচনা করুন। সিরিয়ায় তাদের সাম্রাজ্যকাল একহাজার চারশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এর ফলে কীভাবে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি দৃঢ়তা লাভ করেছে এবং জীবনধারা ও তার অভ্যাসসমূহের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তারা উপাদেয় আহার্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন শিল্প বৈচিত্র্যের পরিচয় রেখে গেছে, যা অদ্যাবধি অনুসৃত হচ্ছে। তদুপরি সিরিয়ার এ সভ্যতা-সংস্কৃতি শুধু তাদের দ্বারাই নয়, তাদের পরবর্তীকালে আরো ছয়শ বছর ধরে রোমান সাম্রাজ্যে তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এভাবে তারা তার একটা চরম রূপ তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে।

অনুরূপভাবে কিবতীদের সম্পর্কেও বলা যায়; পৃথিবীতে তিন সহস্র বছরব্যাপী তাদের সাম্রাজ্য শাসন মিশরের নগর সভ্যতায় এক স্থায়ী অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। তাদের পরবর্তীকালে গ্রিক ও রোমানদের রাজশক্তি তার উত্তরাধিকার লাভ করেছে। অতঃপর ইসলাম এসে সকল কিছুকে বাতিল করে দিয়েছে। অথচ এর পূর্বে মিশরের এ সভ্যতার একটা ধারাবাহিকতা রক্ষিত হচ্ছিল। অনুরূপভাবে ইয়ামেনেও সভ্যতার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠা প্রাচীন আরব আমালেকা ও তুব্বা রাজ্য শাসনের ফলে দেখা গিয়েছিল এবং হাজার হাজার বছর ধরে অনুসৃত এ সভ্যতার পরবর্তী উত্তরাধিকারও লাভ করেছে, মুজার রাজশক্তি।

অনুরূপভাবে ইরাকেও সভ্যতা-সংস্কৃতির একটা ধারা নাবতী ও পারস্য শাসনের ফলে গড়ে ওঠে এবং কেলাদীয়, কায়ানী, সামানী ও আরবদের পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টায় হাজার হাজার বছর ধরে তা অনুসৃত হতে থাকে। বস্তুত বর্তমানকাল পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে সিরিয়া, ইরাক ও মিশরবাসীদের ন্যায় সভ্যতার অধিকারী অন্য কোনো জাতি নেই। অনুরূপভাবে আন্দালুসেও সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি ধারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও স্থায়ী হয়ে ওঠে। কারণ গথদের রাজ্যশাসন সেখানে একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে অগ্রসর হয়েছিল। পরবর্তীকালে বনি উমাইয়ারা তার উত্তরাধিকার লাভ করে এবং তাদের সম্মিলিত ধারাবাহিকতা সহস্র সহস্র হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত দুটি সাম্রাজ্যই ছিল বৃহৎ এবং এর ফলে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দরুন সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

কিন্তু আফ্রিকিয়া ও মাগরিবের অবস্থা তদ্রূপ নয়। সেখানে ইসলামের অনুপ্রবেশের পূর্বে তেমন কোনো বৃহৎ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। একমাত্র রোমান ও ফিরিঙ্গীরাই সমুদ্র অতিক্রম করে অফ্রিকিয়ায় পৌঁছেছিল এবং তীরাঞ্চলগুলোতে আধিপত্য বিস্তার

www.amarboi.org

করেছিল। দূরদূরান্ত বিস্তারী বারবার গোত্রগুলোর আনুগত্য কখনই এ সকল সাম্রাজ্যের প্রতি দৃঢ়মূল হতে পারেনি। বস্তুত উক্ত আধিপত্যও দুর্গ ও সৈন্য ঘাঁটি ব্যতীত অন্যত্র বিস্তৃত হয়নি। এজন্য মাগরিব অঞ্চলে কোনো সাম্রাজ্যের ছায়াপাত কখনো ঘটেনি। একমাত্র গথদের প্রতি তারা সমুদ্রের এ তীরে থেকেই মাঝে মধ্যে আনুগত্যের শপথ প্রেরণ করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ কর্তৃক ইসলামের আবির্ভাব ঘটলে এবং আরবরা আফ্রিকিয়া ও মাগরিবের উপর আধিপত্য বিস্তার করলেও প্রথম দিকে তা অল্পকালের জন্যই স্থায়ী হয়েছিল। অন্যদিকে আরবরা তখনও যাযাবরী জীবনধারায় অভ্যস্ত। তাদের মধ্যে যারা এ অঞ্চলে স্থায়ী হয়ে উঠেছিল, তারাও এমন কোনো সভ্যতার সাক্ষাৎ লাভ করেনি, যা পূর্ববর্তীদের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অনুসরণ করতে পারে। কারণ বারবাররা সর্বদাই যাযাবরী জীবনের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। অতঃপর দূরতম মাগরিবের বারবাররা অতি অল্পকাল পরেই মায়সারা মুজাফফরীর নেতৃত্বে হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের সময় সাম্রাজ্যের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। এর পর আর তাদের মধ্যে আরব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা প্রত্যাবর্তন করেনি। বরং তারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়। তারা ইদরিসের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেও তার ধরন আরবি ছিল না। কারণ বারবাররাই আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তাদের আরবদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। আফ্রিকিয়ার উপর আগালেবা ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আরবরা প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল। সম্ভবত এ কারণেই তাদের মধ্যে নাগরিক সভ্যতার কিছু কিছু নিদর্শন দেখা যায়। এও রাজশক্তির বিলাসব্যসন, ঐশ্বর্য এবং কায়রোয়ানের জনবসতির আধিক্যের জন্য সম্ভব হয়েছিল। তাদের কাছে এটা প্রথমে কুতামারা এবং পরে সিনহাজারা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। কিন্তু এ সমুদয় প্রচেষ্টাই অত্যন্ত স্বল্পকালের; সকল মিলিয়েও চারশ বছর হবে না। অতঃপর তাদের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় এবং এর সঙ্গে তাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার বর্ণও ধূসর হয়ে ওঠে। পুনরায় তার আরব বেদুইন হেলালীদের আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং তারা তা নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। শুধু নগর সভ্যতার একটি অতি গোপন ধারা তাদের মধ্যেই বিদ্যমান, যাদের পূর্বপুরুষরা এককালে কেলআ, কায়রোয়ান ও মাহদিয়ার অধিবাসী ছিলেন। পাঠক, আপনি তাদের আচার-আচরণ ও গৃহস্থালীর উপকরণের মধ্যে এমন অনেক নিদর্শন দেখতে পাবেন, যার মধ্যে নগর সভ্যতার সাথে অন্য বিষয় মিশ্রিত হয়ে রয়েছে। যে কোনো অভিজ্ঞ নাগরিকের পক্ষেই তার পার্থক্য বিচার করা সম্ভব। আফ্রিকিয়ার অধিকাংশ শহরেরই এ অবস্থা। কারণ সেখানে আগলেবাদের সময় থেকে শিয়া ও সিনহাজাদের সাম্রাজ্যকাল দীর্ঘ হয়েছিল। এ তুলনায় মাগরিবের সাম্রাজ্যকাল যেহেতু স্বল্পস্থায়ী, সেজন্য সেখানে নাগরিক সভ্যতার এরূপ গোপন নিদর্শনও বিদ্যমান নেই।

অবশ্য মাগরিবে আল-মোহেদদের আন্দালুস শাসনের সময় থেকে নাগরিক সভ্যতার একটি বিরাট অংশ স্থানান্তরিত হয় এবং তা তাদের অভ্যাসের মধ্যে স্থায়িত্বও লাভ করে। কারণ তারাই আন্দালুসের বিভিন্ন অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে তাকে শাসন করছিল। এর ফলে আন্দালুসবাসী বহুলোক ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মাগরিবে আগমন করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি-বিন্যাসের কথা পাঠক নিশ্চয়ই অবগত

www.amarboi.org

আছেন; এর ফলে তাতে নাগরিক-সভ্যতার একটা ব্যাপক অংশ দেখা দেয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য এটা আন্দালুসীদের অনুকরণের ফলশ্রুতি মাত্র। অতঃপর পূর্ব আন্দালুসের অধিবাসীরা খ্রিস্টানদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে আফ্রিকিয়ায় আগমন করে। তারা সেখানে তার নগরগুলোতে সভ্যতার নিদর্শন রেখে যেতে সমর্থ হয়। এর অধিকাংশ ভাগ অবশ্য তিউনিসে এবং সেখানে তার সাথে মিশরীয় সভ্যতার মিশ্রণ ঘটেছিল। তদুপরি বিভিন্ন ভ্রমণকারীরাও এর মধ্যে মিশ্রণের উপাদান বহন করে এনেছিল। এভাবে মাগরিব ও আফ্রিকিয়ায় নগর সভ্যতার একটি বিরাট অংশ স্থায়ী হয়ে তার উপর থেকে পূর্বের আচ্ছাদন অপসৃত হয় এবং বংশপরম্পরায় অনুসৃত হতে থাকে। কিন্তু বারবাররা আবার তাদের সেই পূর্বের যাযাবরী জীবন ও স্থূলত্বের মধ্যে ফিরে যায়। এ সকল দিক লক্ষ করলে এ কথা অবশ্যই বলতে হয় যে, মাগরিব ও তার বিভিন্ন শহর অপেক্ষা আফ্রিকিয়ায় নগর সভ্যতার নিদর্শন তুলনামূলকভাবে অধিক। এর কারণ মাগরিব অপেক্ষা আফ্রিকিয়ায় সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর এবং পরস্পরের মেলামেশার ফলে মিশরের সাথে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। পাঠক, এ বিষয়টি ভালো করে বুঝে নিন; কারণ বিষয়টি অনেকের নিকট অপরিচিত।

জেনে রাখুন যে, এ সভ্যতার ব্যাপারটি একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা মাত্র। এটা সাম্রাজ্যের সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি, কোনো জাতি বা পুরুষের লোকসংখ্যার বিস্তৃতি, শহর ও নগরের বিরাটত্ব এবং ঐশ্বর্য ও সচ্ছলতার প্রাচুর্যের সমাহার বিশেষ। কারণ সাম্রাজ্য ও রাজশক্তি মানুষের সমাজ ও সভ্যতার একটি মূর্ত প্রকাশ এবং এর অন্তর্গত সবকিছুই এর উপকরণ—প্রজা, নগর-পরিবেশ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবস্থা। রাজকোষের সম্পদ তাদের কাছেই ফিরে আসে। তাদের সচ্ছলতা সাধারণত তেজী বাজার ও ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে এসে থাকে। শাসক তাঁর যে সম্পদ প্রজাদের মধ্যে বেতন ও দানধ্যানে ব্যয় করেন, তাই তাদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করে আবার তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করে এবং পুনরায় তার নিকট থেকে তাদের মধ্যে ফিরে যায়। প্রজারা এ কর ও রাজস্ব হিসাবে শাসককে প্রদান করে এবং শাসক বেতন হিসাবে আবার তাই তাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেন। বস্তুত যে-কোনো সাম্রাজ্যের অবস্থা অনুসারেই প্রজাদের সাচ্ছন্দ্য দেখা যায় এবং প্রজাদের অবস্থা, এমনকি তাদের সংখ্যার অনুপাতেই সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য লাভ ঘটে। এর মূল ভিত্তি হল জনবসতি ও জনসংখ্যার ব্যাপকতা। পাঠক, এটাকে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রয়োগ করে বিবেচনা করুন এবং চিন্তা করে দেখুন; সত্য বলেই জানতে পারবেন। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দেন এবং তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করার মতো শক্তি কারো নেই।

www.amarboi.org

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[নগর সংস্কৃতি সভ্যতার শেষ পর্যায়, এর আয়ুষ্কালের অন্তিম এবং
এর বিকৃতির লগ্ন নির্দেশক]

পাঠক, ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, গোত্রপ্রীতির চরম পরিণতি রাজশক্তি ও সাম্রাজ্য স্থাপন এবং যাযাবরী জীবনের ক্রমবিকশিত গন্তব্য হল নগর সংস্কৃতি। এ সকল যাযাবরী, নাগরিক, রাজকীয় ও সাধারণ অবস্থার প্রতিটিরই একটি প্রত্যক্ষ জীবনকাল বিদ্যমান। যেমন সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুর জন্যই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। যুক্তি ও শ্রুতি উভয় ক্ষেত্রেই এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, একটি মানুষের জন্য তার বিকাশ ও শক্তি অর্জনের চরম সীমায় পৌঁছতে চল্লিশ বছর প্রয়োজন। সুতরাং সে যখন চল্লিশ বছরে পৌঁছায়, তখন তার প্রকৃতি বিকাশ ধারায় কিছু কালের জন্য থমকে দাঁড়ায় এবং এর পর বাঁচার দিকে অগ্রসর হয়ে যায়। কাজেই, পাঠক, এটা অবশ্যই জেনে রাখুন যে, সভ্যতাও একই অবস্থার অধীন; তারও একটি চরম পর্যায় আছে, যার পর সে আর বিকশিত হতে পারে না। কারণ কোনো জনবসতির জন্য যখন বিলাস ও ঐশ্বর্য আয়ত্তাধীন হয়, তখন তা স্বভাবতই তাদেরকে নগর সংস্কৃতি ও তৎসংশ্লিষ্ট অভ্যাসাদি সৃষ্টির দিকে আকর্ষণ করে। আর নগর সংস্কৃতি সম্পর্কে, পাঠক, আপনি যা জানেন, তা এই যে, তা অনিবার্যভাবে নানাবিধ বিলাসসামগ্রীর সৃষ্টি করে এবং অবস্থার মধ্যে নতুনত্বের ধারা বহন করে আনে যে শিল্প সামগ্রীতে কারুকার্য করা সম্ভব, সে তাতে নানা আকার ও প্রকারের উদ্ভাবন ঘটায়। যেমন রন্ধন শিল্প, পরিচ্ছদ শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, শয্যা শিল্প, অথবা বাসন শিল্প এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য সমুদয় সামগ্রী। কারুকার্য বিধানের ফলে তাদের প্রতিটিতে এত বৈচিত্র্য বিদ্যমান, যা যাযাবরী জীবন ও কারুকার্যহীন অবস্থায় কখনই তেমন প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হয় না। যখন গৃহস্থালীর এ সকল অবস্থা একটা চরম কারুকার্যের অধীন হয়ে পড়ে, তখন তাকে অনুসরণ করার প্রবৃত্তিও সম্ভোগপ্রিয় হয়ে ওঠে। মানবাত্মা এর ফলে এমন সকল অভ্যাসের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে ওঠে যে, তার চাহিদা পূরণে তার ধর্ম ও পার্থিব সম্পদ উভয়েই অপারগ হয়ে পড়ে। ধর্ম ব্যর্থ হয়; কারণ তার প্রবৃত্তিতে এ সকল অভ্যাস এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায় যে, তাকে উচ্ছেদ করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। পার্থিব সম্পদ অপারগ হয়; কারণ তার এ অভ্যাসের চাহিদা পূরণ করতে হলে যে পরিমাণ ব্যয় করা দরকার, তা তার উপার্জন কিছুতেই যোগান দিতে সমর্থ হয় না।

এর বর্ণনা এই যে, যে নগরী বিচিত্র সাংস্কৃতিক তৎপরতার অধিকারী, তার অধিবাসীদের ব্যয়ভার বিরাট আকার ধারণ করে। অন্যদিকে নগর সংস্কৃতি জনবসতি

www.amarboi.org

অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং যে নগরীর জনসংখ্যা অধিক, তার সংস্কৃতিও সেই অনুপাতে পূর্ণতর রূপের অধিকারী। ইতিপূর্বে আমরা এ কথাও বর্ণনা করেছি যে, অধিক জনবসতিপূর্ণ নগর তার বাজার মূল্যে মহার্ঘতা এবং তার প্রয়োজন পূরণে অধিকতর মূল্য দিয়ে থাকে। তদুপরি এর উপর কর আরোপিত হয়ে তাকে আরো দুর্মূল্য করে তোলে। কারণ সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির শেষ পর্যায়েই ঘটে এবং এ সময়ই সাম্রাজ্যের ব্যায়ভার বেড়ে যাওয়ার জন্য করাদি আরোপ করা হয়, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ কর পণ্যসামগ্রীর দুর্মূল্যতা বাড়ায়। কারণ ব্যবসায়ী ও দোকানী সকলেই তাদের মজুদমাল ও পুঁজির উপর তাদের অন্যান্য ব্যয়, এমনকি নিজেদের পরিশ্রমের মূল্যকেও চাপিয়ে দেয়। এ কারণেই আরোপিত কর তারা বিক্রিত পণ্যের মূল্যের মধ্যে ধরে দেয়। এর ফলে নগরবাসীদের ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে তা সুলভ অবস্থা ত্যাগ করে অপব্যয়ের দিকে এগিয়ে যায়। বিচিত্র অভ্যাস ও তাদের প্রতি আনুগত্যের ফলে তারা এটা থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজে পায় না। তাদের আয়ের সকল অংশই এ ব্যায়ের গহ্বরে পতিত হয়। তারা একে একে অনাহার ও অসচ্ছলতার দিকে অগ্রসর হয় এবং দারিদ্র্য এসে তাদের উপর চেপে বসে। পণ্যাদি ক্রয়ের পূর্বের সেই মরিয়াভাব আর থাকে না। বাজারে মন্দাভাব দেখা দেয় এবং নগরীর পরিবেশ শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে করুণ পরিণতির সকল উপকরণই নগর সংস্কৃতি ও তার বিলাসিতা ডেকে আনে এবং এরা পরিণামে অত্যন্ত সাধারণভাবে বাজার ও সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে নগরীর বিলুপ্তি ঘটায়।

অবশ্য নগরবাসীদের নিজেদের মধ্যে একাদিক্রমে অবক্ষয়ের চিহ্নাদি পরিস্ফুট হওয়ার ব্যাপারটি এ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এ সকল অভ্যাসের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে তারা যে পরিমাণ আয়াস ও কষ্ট স্বীকার করে, তাতেই তাদের প্রবৃত্তি কলুষ কালিমায় লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং মানবাত্মার স্বভাবসুলভ পথ ত্যাগ করার ফলে এ অনাচারের কুফল তাকে নিস্তেজ করে ফেলে। এজন্য ক্রমশ তার মধ্য থেকে দুষ্কর্ম, দুর্নীতি, প্রতারণা এবং জীবন-যাপনে কোনো না কোনো প্রকারের কূটকৌশল প্রকাশ পেতে থাকে। জীবাত্মা তার চিন্তায়, অন্বেষণে এবং তার জন্য যে কোনো অপকৌশল প্রয়োগে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। পাঠক, এ জন্যই আপনি তাদেরকে মিথ্যা, জুয়াজোচ্চুরি, প্রতারণা, চুরি, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রণে নির্ভীক অবস্থায় দেখতে পান। অতঃপর আপনি অবশ্যই তাদেরকে বিলাসিতার ফলে ভোগ সম্ভোগের অনিবার্য তাড়নায় দুষ্কর্মের সকল মত ও পথ সম্পর্কে অধিকতর অবহিত দেখতে পাবেন। তারা এটা প্রকাশ্যে করতে এবং এর দাবি উত্থাপন করতেও দ্বিধা করে না। তারা এর অন্বেষণে লজ্জাশরমকে বিসর্জন দেয় এবং নিজেদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়পরিজন ও গুরুগুর্বীর সম্মুখেও মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অথচ তাদের সম্মুখে অনুরূপ আচরণ প্রকাশে ও নির্লজ্জ হওয়ার ব্যাপারে যাযাবরী জীবনের অধিকারীরা কল্পনাও করতে পারে না। পাঠক, আপনি তাদেরকে কূটকৌশল ও প্রতারণায় অভিজ্ঞ দেখতে পাবেন; যাতে তারা এর সাহায্যে সম্ভাব্য ভর্ৎসনা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং তাদের পক্ষে দুষ্কর্মের যথাযোগ্য শাস্তি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এমনিভাবে এগুলো নগরবাসীদের

www.amarboi.org

অধিকাংশের অভ্যাস ও চরিত্রে পরিণত হয়; অবশ্য আল্লাহ্ যাকে বাঁচান, সেই শুধু বাঁচে। নগরীর পরিবেশ এ প্রকার নিম্ন শ্রেণীর অসচ্চরিত্র লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যের অধিপতি ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা এদের সংস্পর্শে এসে মলিন হতে থাকে। বিশেষ করে সাম্রাজ্য যাদের শাসনের ব্যবস্থা করেনি এবং যাদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ত্যাগ করেছে, তারা অনিবার্যভাবে সঙ্গী ও প্রতিবেশীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ ক্ষেত্রে বংশগত কৌলিন্য ও পারিবারিক ঐতিহ্য কোনো কাজেই লাগে না। কারণ মানুষ অনুকরণপ্রিয়। তারা একমাত্র চরিত্র, সদ্‌গুণ অর্জন এবং অসৎ স্বভাব বর্জনের মধ্য দিয়েই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে থাকে। সুতরাং কারো মধ্যে যদি কোনো কারণে একবার অসৎ স্বভাব দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে, তা হলে সে সর্বপ্রকার সদ্‌গুণ হারিয়ে বসে এবং তখন তার বংশগত কৌলিন্য ও পারিবারিক ঐতিহ্য তাকে কোনো সাহায্যই করতে পারে না। এ কারণেই পাঠক, দেখতে পাবেন যে, বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয়, সৎ পরিবার ও রাজকীয় ঘরানার সন্তানেরা নিচু শ্রেণীর লোকদের সাথে মিশে নিতান্ত হীন পেশা গ্রহণ করে জীবন-যাপন করছে। কারণ তাদের চরিত্রের পতন ঘটেছে এবং তারা মন্দস্বভাব ও প্রতারণায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। যখন কোনো জাতি অথবা নগরীর মধ্যে অনুরূপ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন আল্লাহ্ তার ধ্বংস ও বিনাশের নির্দেশ প্রদান করেন। এটাই তাঁর সেই মহান বাণীর মর্ম, যেখানে তিনি বলেছেন, আমরা যখন কোনো গ্রামকে ধ্বংস করে ফেলতে ইচ্ছে করি, তখন আমরা তার বিলাসী ধনিকদেরকে নির্দেশ দেই— তারা সেখানে দুষ্কর্ম করে; সুতরাং তাদের উপরে সত্য প্রকটিত হয়। অতঃপর আমরা তাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে ফেলি।[৪৭]

তার কারণ এই যে, এ পরিস্থিতিতে তাদের উপার্জন তাদের অভাব পূরণ করতে সমর্থ হয় না। কেননা তাদের অভ্যাস অত্যধিক এবং প্রবৃত্তির তাড়না সবল। সুতরাং তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। এভাবে একের পর এক মানুষের অবস্থায় অবক্ষয় দেখা দিলে সমুদয় নগরীর শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে এবং ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। সম্ভবত এ কারণেই কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলে থাকেন, কোনো নগরে যখন নারাঙ্গি গাছের সংখ্যা বেশি হয়, তখন বুঝতে হবে তা ধ্বংসের সন্নিকটবর্তী। এজন্য সাধারণ নাগরিকদের অনেকেই নারাঙ্গি গাছ লাগায় না। এবং তাদের ঘর দ্বারে এর অবস্থানকে অশুভ বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়; তার বিনাশ বিশেষ করে নারাঙ্গি গাছের সাথে যুক্ত করার কোনো হেতু নেই। বরং এর অর্থ এই যে, নগর উদ্যান ও জলের ফোয়ারা নাগরিক সভ্যতার অনিবার্য ফসল। এদের মধ্যে নারাঙ্গি, লেবু[৪৮], সরল ও এ প্রকার অন্যান্য গাছ, যা কোনো আহার্য যোগায় না, উপকারও দেয় না; তার উপস্থিতি শুধু নগর সংস্কৃতির চূড়ান্তরূপই প্রকাশ করে। কেননা উদ্যানে এগুলো শুধু অঙ্গ সৌরবের জন্য লাগানো হয় এবং তাও নগর সংস্কৃতি তার যাবতীয় বৈচিত্র্যসহ আত্মপ্রকাশ করার পরই সম্ভব হয়ে থাকে। এটাই সেই পর্যায়, যেখানে নগরের বিনাশ ও অবক্ষয়ের আরম্ভ, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। করবী গাছ সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা

---

৪৭. কোরান, ১৭, ১৬।

৪৮. সম্ভবত এ সকল ফলের ব্যবহার একান্ত সীমিত বিধায় অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে।

www.amarboi.org

হয়েছে। এও এ পর্যায়েরই ব্যাপার। কারণ উদ্যানে করবী রোপণের উদ্দেশ্য হল তার সাদা লাল ফুলের দ্বারা তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। এটা বিলাসের ধর্ম।

নগর সংস্কৃতির বিচারের অন্যতম আরো একটি কারণ হল প্রবৃত্তির সম্ভোগ ও তার বল্গাহীন অনুশীলনের বিলাস। এর ফলে ঔদারিকতার প্রসার ঘটে এবং চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের ব্যাপারে আতিশয্য দেখা দেয়। এরই অনুসারী হয়ে আসে যৌনবিলাস–অধিক বিবাহ, ব্যভিচার ও সমকামিতা। এগুলোর প্রসার মানব জাতির অস্তিত্বকে বিকৃত করে তোলে। ব্যভিচার বংশধারার মধ্যে এক অস্বাভাবিক মিশ্রণের সৃষ্টি করে প্রত্যেককেই নিজের সন্তান সম্পর্কে সন্দিগ্ধ করে দেয়। কারণ গর্ভধারণে একাধিক বীর্যের উপস্থিতি কোনোটিরই নিশ্চয়তা বিধান করে না। এর ফলে সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক অপত্য স্নেহের অভাব দেখা দেয় এবং তাদের প্রতিপালনের প্রতি উদাসীনতার ফলে তার ধ্বংস হয়ে যায়। এরূপ মনোভাব মানব জাতির অস্তিত্বের পরিপন্থী। অন্যদিকে অনুরূপ মিশ্রণের সন্দেহ ছাড়াও অস্তিত্বের বিনাশ ঘটতে পারে; যেমন সমকামিতার দ্বারা হয়ে থাকে। তাতে সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনাই হ্রাস প্রায়। এ কারণে এ ব্যাপারটি ব্যভিচার থেকেও জঘন্য। কেননা এর প্রসার মানুষের অস্তিত্বের বিকাশ ব্যতিরেকেই নিঃশেষ হয়ে যায়। অথচ ব্যভিচার স্বয়ং অস্তিত্বহীনতা নয়; বরং তার উপাদানকে বহন করে মাত্র। এ বিষয়ে ইমাম মালেকের মতাদর্শ অন্য সকলের অপেক্ষা বিশিষ্ট।[৪৯] এতে বোঝা যায়, তিনি এ সম্পর্কে ধর্মীয় বিধানের যথার্থতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

পাঠক, এ বিষয়টি ভালো করে বুঝে নিন এবং বিবেচনা করে দেখুন যে, যথার্থই নগর সংস্কৃতি ও তার বিলাসব্যসন সভ্যতার চরম পর্যায়। বস্তুত তা যখন তার চরম বিকাশ সীমায় পৌঁছে, তখনি তাতে বিকৃতি দেখা দেয় এবং অবক্ষয়ের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণীদের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল অনুরূপ অবক্ষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বরং বলতে গেলে নগর সংস্কৃতি ও বিলাসব্যসনের ফলে যে অভ্যাসাদি গড়ে ওঠে, তারাই মূর্তিমান অবক্ষয়। কারণ, মানুষ এ কারণেই মানুষ যে, সে তার কল্যাণ আকর্ষণ করার, তার অকল্যাণকে প্রতিরোধ করার এবং এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তার চরিত্র দৃঢ় করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু একজন নগরবাসীর পক্ষে নিজের এ ক্ষমতা বহিঃপ্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। কোথাও সে স্বস্তিজনিত অক্ষমতার জন্য তার প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করতে সমর্থ হয় না। আবার কোথাও প্রাচুর্য ও বিলাসিতার মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে অহংকারের জন্য সে তা করতে ঘৃণা করে। এ দুটি মনোভাবই ঘৃণিত। এভাবে সে তার অকল্যাণকে প্রতিরোধ করতে এবং তজ্জন্য তার চরিত্রকে সংশোধন করতেও সে অপারগ। কারণ নাগরিক তার শিক্ষাদীক্ষা ও শাসনের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে প্রয়োজনীয় শৌর্যকে হারিয়ে বসেছে। সে এখন রক্ষীদলের উপর নির্ভরশীল; তারাই তার পক্ষ থেকে প্রতিরোধের কাজ করে। এ অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ধর্মকেও বিকৃত করে ফেলে। কারণ তার প্রবৃত্তি যে সকল অভ্যাসের দ্বারা পরিবৃত্ত এবং তার আত্মা যে সকল কালিমার দ্বারা কলুষিত, তা থেকে মুক্তি পাবার কোনো পথ তার

৪৯. মালেকী মজহাবে এর জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু নির্দিষ্ট রয়েছে।

www.amarboi.org

নেই; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। খুব কম ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। কাজেই মানুষ যখন তার ক্ষমতা, চরিত্র ও ধর্মের দিক থেকে বিকৃত হয়ে পড়ে, তখন বলতে গেলে তার মনুষ্যত্বই বিনষ্ট হয় এবং তা স্বভাবের বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। এ দিক থেকে দেখতে গেলে যারা সুলতানী সৈন্যদলে থাকা সত্ত্বেও যাযাবরী জীবন ও স্থূলরুচির অধিকতর নিকটবর্তী, তারা এ নগর সংস্কৃতি ও তার চারিত্রিক পরিমণ্ডলে প্রতিপালিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা অনেকখানি সুস্থতার অধিকারী। এটা প্রায় প্রতিটি সাম্রাজ্যেই বিদ্যমান। উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, নগর সংস্কৃতি পৃথিবীর সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের বিকাশের একটি চরম বিরতি পর্যায়। আল্লাহ্ পবিত্র ও মাহন; প্রতি মুহূর্তে তিনি কর্তব্যরত[৫০] এবং কোনো কর্তব্যই তাঁকে অন্য কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে পারে না।

---

৫০. কোরান।

www.amarboi.org

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

[যে নগরগুলো রাজশক্তির কেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করে, সাম্রাজ্যের পতন ও অবক্ষয়ে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়]

আমরা ইতিপূর্বে সভ্যতার আলোচনায় বক্তব্য রেখেছি যে, যখন কোনো সাম্রাজ্য অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন তার শাসকের রাজধানী হিসাবে যে নগরী বিরাজমান ছিল, তার জনবসতিও হ্রাস পায়। অনেক সময় তা ধ্বংসের পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়। তার ব্যতিক্রম খুব কমই দেখা যায়। এর কতিপয় কারণ বিদ্যমান।

প্রথমত, প্রতিটি সম্রাজ্যই তার প্রথম দিকে যাযাবরী চরিত্রের অধিকারী হওয়ার ফলে মানুষের সম্পদ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে এবং এ ব্যাপারে কোনোপ্রকার চাতুর্যের প্রশ্রয় দেয় না। এর ফলে রাজকোষের উৎস কর ও জরিমানার চাপ খুব কম থাকে। ব্যয় কম হওয়ার জন্য বিলাসিতার খুব একটা অবকাশ থাকে না। সুতরাং ঐ নগরী যখন পূর্ববর্তী রাজশক্তির কবল থেকে পরবর্তী অন্য কোনো নতুন শক্তির আয়ত্তাধীন হয়ে পড়ে, তখন সেখানে বিলাসব্যসনে ভাটা পড়ে। নতুন রাজশক্তির অধীনস্থ প্রজারাও বিলাসব্যসন থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। কারণ প্রজাবৃন্দ শাসকদের অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তারা সাম্রাজ্যের রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। অনেক সময় এটা স্বেচ্ছায় হয়; কেননা মানুষ স্বাভাবিকভাবেই নেতৃবৃন্দের আদর্শ অনুসরণ করে। আবার অনেক সময় তারা অনুরূপ আচরণ করতে বাধ্য হয়। কেননা সাম্রাজ্য তাদেরকে বিলাস সংকোচের দিকে আহ্বান জানায় এবং অভ্যাসাদির পরিপোষক প্রয়োজনীয় ঐশ্বর্য থেকেও তাদেরকে বিরত রাখে। এ কারণে নগর সংস্কৃতির মধ্যে ভাটা দেখা দেয় এবং বিলাসব্যসনের বহু কিছু বিদূরিত হয়। এটাই সেই অবস্থা, যা আমরা নগর সংস্কৃতির বিনাশ বলে উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, যে কোনো সাম্রাজ্যের পক্ষে একমাত্র শত্রুতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের পরই প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভ হয়ে থাকে। এ শত্রুতার অর্থ হল প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে একে অপরের অস্তিত্ব বিলোপ করার প্রয়াস। তাদের প্রত্যেকেই নিজের অভ্যাস ও অবস্থার আধিক্যের দ্বারা অপরের উপর জয়ী হতে চেষ্টা করে। সুতরাং দুটি প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একটির বিজয়ের অর্থ অন্যটির বিলোপ সাধন। এর ফলেই পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের সকল বিষয়ই নবাগত সাম্রাজ্যের নিকট দূষণীয়, ক্ষতিকর ও কদর্য বলে ঠেকে। বিশেষ করে বিলাসব্যসনের সকল অবস্থাই নবাগতরা ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে এবং তারা তার স্থলে নবতর বিলাসলীলার উদ্ভব ঘটায়। এভাবে পর্যায়ক্রমে তারা

www.amarboi.org

সম্পূর্ণ নতুন একটি নগর সংস্কৃতির জন্ম দেয়। কিন্তু এর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ভূতপূর্ব সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি বিনাশ পেতে থাকে। এটাকে আমরা নগর সংস্কৃতির অবক্ষয় বলে বর্ণনা করেছি।

তৃতীয় বিষয়টি হল, প্রত্যেক জাতির একটি জন্মস্থান প্রয়োজনীয়, যেখান থেকে তাদের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাদের রাজশক্তির সূত্রপাত হবে। এর পর তারা যখন অন্য কোনো দেশ জয় করে, তখন তা পূর্বটির অনুসারী হয় এবং তার শহর-নগরও পূর্ববর্তী শহরের অনুগত হয়ে ওঠে। এভাবে অধিকৃত সাম্রাজ্যে শক্তির বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যভাগে হওয়া উচিত; যাতে সে শক্তি বিন্যাসেরও কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। ফলে, সাম্রাজ্যের অধিকারীরা তাদের পূর্ববর্তী রাজধানী ত্যাগ করে নতুন রাজধানী স্থাপন করে এবং তাদেরকে অনুসরণ করে মানুষ সম্রাট ও সাম্রাজ্যশক্তির নৈকট্যের জন্য সেই নতুন স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পরিণামে প্রথমটির জনবসতি কমে গিয়ে উজাড় হয়ে যায়। অথচ নগর সভ্যতা জনবসতির আধিক্যের ফলেই সজীব থাকে; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এখানে তার অভাব দেখা দেয়ার ফলে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। এটাই আমাদের আলোচ্য অবক্ষয়।

এর উদাহরণ সলজুকীদের ঘটনা থেকে নেয়া যায়। তারা তাদের রাজধানী বাগদাদ থেকে ইস্পাহানে স্থানান্তরিত করায় অনুরূপ অবস্থা দেখা গিয়েছিল। আরবরাও পূর্ববর্তী শাসনকেন্দ্র মাদায়েন থেকে বসরা ও কুফায় তা স্থানান্তরিত করেছিল। অনুরূপভাবে বনি আব্বাস উমাইয়া রাজধানী দামেশককে ত্যাগ করে বাগদাদকে বরণ করে নিয়েছিল। মাগরিবের বনি মারিণও মারাকেশ থেকে ফেজে রাজধানী স্থানান্তর করে। মোটামুটিভাবে সাম্রাজ্যের এ প্রকার রাজধানী পরিবর্তন প্রথম নগরীর সভ্যতার ক্ষতি সাধন করে।

চতুর্থ বিষয়টি হল, যে কোনো নতুন সাম্রাজ্য যখন পূর্ববর্তী অন্য কোনো সাম্রাজ্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন এ নতুন শক্তি অবশ্যই পূর্ববর্তী শক্তি ও তার দলবল সম্পর্কে অবহিত হতে চেষ্টা করে এবং তাদেরকে যতদূর সম্ভব সাম্রাজ্যের এমন কোনো অংশে বিতাড়িত করতে উদ্যোগ নেয়, যাতে তারা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে সমর্থ না হয়। কারণ, রাজধানীর অধিকাংশ লোকই সাম্রাজ্যের সমর্থক; হয় তারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় সহায়ক শক্তি হিসাবে এখানে এসেছে অথবা তারা নাগরিক হিসাবেই উক্ত সহায়তায় অংশগ্রহণ করেছে। কারণ তারা যে নগর পরিবেশে বসবাস করে, তাতে সাধারণভাবেই সাম্রাজ্য শক্তির সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। কেননা তারা বিচিত্র পেশায় ও বিভিন্ন আকারে জীবিকা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। এ কারণে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই এ সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়াতলে লালিত হয়ে তারই অনুসারী হয়ে উঠেছে। হয়ত বা তারা শৌর্যবীর্য বা গোত্রপ্রীতির অধিকারী নয়; কিন্তু দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যের বদান্যতায় তার প্রতি যে সম্প্রীতি ও আনুগত্যের ভাব জন্মেছে, তার আকর্ষণেই তার স্থায়িত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। কিন্তু নবাগত সাম্রাজ্য শক্তি স্বাভাবিকভাবেই পুরাতন সাম্রাজ্যের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করতে প্রয়াসী হয়। সুতরাং তারা

www.amarboi.org

এ প্রকার লোকদেরকে সম্ভাব্য নিরাপদ স্থানে তাদের তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করে। অনেক সময় তারা বন্দী ও অন্তরীণ অবস্থায় যায়; আবার অনেক সময় বেশ সম্মান ও সৌহার্দের সাথে তাদেরকে স্থানান্তর করা হয়। যাতে তারা কোনোপ্রকার অসদ্ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে। এ বিতাড়নের ফলে অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে, রাজধানীতে ব্যবসায়ী, কৃষিকর্মের সাথে জড়িত মজদুর, কয়ালের কাজে নিযুক্ত কর্মী এবং সাধারণ মানুষ ব্যতীত আর কেউই অবশিষ্ট থাকে না। তাদের শূন্যস্থানে নবাগত শক্তির সাহায্যকারী ও দলবল এসে জাঁকিয়ে বসে এবং নগরীর নতুন প্রাণসঞ্চার করে। কিন্তু ইতিপূর্বে পুরাতনের যাওয়ার ফলে নগরীর জনবসতিতে যে শূন্যতা দেখা দেয়, তাকেই আমরা নগর সভ্যতার অবক্ষয় বলে নির্দেশ করেছি।

অতঃপর এ স্থলেই নবাগত সাম্রাজ্য শক্তির ছত্রচ্ছায়াতলে আবার নবীন জনবসতি গড়ে ওঠে এবং তাদের সহায়তায় সাম্রাজ্যের যোগ্যতা অনুযায়ী একটি নতুন সংস্কৃতিও জন্মলাভ করে। এর তুলনা এমন একটি গৃহের সাথে করা যায়, যার মধ্যে প্রচুর অসুবিধা বিদ্যমান এবং তার অনেক গঠন ও সুযোগ-সুবিধা বর্তমান পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এমন একটি গৃহের কেউ যদি অধিকার লাভ করে, তা হলে তার সামর্থ্যানুসারে বিশেষ বিশেষ ধারায় অবশ্যই এ গৃহের পরিবর্তন সাধন করবে। তার গঠন বদলে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে নিশ্চয়ই সে নিজের চাহিদা ও পরিকল্পনা মত তাকে গড়ে তুলবে। সুতরাং সে এ গৃহের অনেক কিছুই ভেঙে ফেলে পুনরায় নির্মাণ করবে। বস্তুত এ প্রকার বহু ঘটনাই আমরা রাজধানী শহরগুলোতে ঘটতে শুনেছি ও দেখেছি। আল্লাহ্ দিবারাত্রি নির্ধারণ করে থাকেন।[৫১]

সামগ্রিকভাবে এরূপ পরিস্থিতির প্রাথমিক স্বাভাবিক কারণ হল এই যে, রাজশক্তি ও সাম্রাজ্য সভ্যতার জন্যই; তারা যেন তার প্রমূর্তরূপ। বস্তুত সভ্যতার উপকরণগুলোকেও যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য এ শক্তি সংগঠনের প্রয়োজন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিষয়াবলির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, এদের একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করা যায় না। সুতরাং জনবসতি ব্যতীত সাম্রাজ্য যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি জনবসতিও সাম্রাজ্য ও রাজশক্তির সহায়তা ব্যতীত কোনো কিছু করতে অপারগ। কারণ মানুষের স্বভাবে পরস্পর উৎপীড়নের যে ভাবটি বিদ্যমান, তার একজন শৃঙ্খলা বিধায়কের অস্তিত্ব অনিবার্য করে তোলে এবং তদনুযায়ী শাসন ব্যবস্থাও নির্ধারিত হয়ে যায়। তা ধর্মীয় বিধান অনুসারে অথবা রাজশক্তির প্রাধান্য বিস্তারে, যেভাবেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তার অর্থই হচ্ছে সাম্রাজ্য। সুতরাং তারা যেহেতু পরস্পর পৃথক হতে পারে না, সেজন্য একের অবক্ষয় অন্যের অবক্ষয় ডেকে আনে এবং একের অস্তিত্বহীনতা অন্যের অস্তিত্বহীনতার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অবশ্য সভ্যতার সামগ্রিক বিনাশ একমাত্র সাম্রাজ্য শক্তির সামগ্রিক পতন থেকেই অস্তিত্বে আসে। যেমন সাধারণভাবে রোমান, পারস্য ও আরব সাম্রাজ্য এবং উমাইয়া ও আব্বাসী সাম্রাজ্য। আবার কখনো ব্যক্তিবিশেষের সাম্রাজ্য; যেমন নওশেরোয়াঁ, হিরাক্লিয়াস, আবদুল মালেক ইবনে মারোয়ান, হারুনুর রশীদ প্রমুখ সম্রাটগণ। তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে

৫১. কোরান, ৭৩, ২০।

www.amarboi.org

সৃষ্ট সভ্যতায় পরবর্তী উত্তরাধিকারী এসে তাঁর অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধির ধারা অক্ষুণ্ন রাখে। তাঁদের মধ্যে নিকট সাদৃশ্য থাকার ফলে খুব একটা অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয় না। তার কারণ, সাম্রাজ্যের যে শক্তিটি সভ্যতার বিকাশ সাধনে তৎপর হয়, তা হল তার গোত্রপ্রীতি ও শৌর্যবীর্য। তা সাম্রাজ্যের বংশপরম্পরাগত ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্থায়ী হয়ে বিরাজ করে। সুতরাং এ গোত্র যখন বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন তার স্থলে যে গোত্রপ্রীতি এসে দেখা দেয়, তা সভ্যতায় কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। সুতরাং এটা পূর্ববর্তী শৌর্যবীর্যকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে সভ্যতার অবক্ষয়কে ব্যাপক করে তোলে; যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। তিনি যদি ইচ্ছে করেন, তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে নবীন সৃষ্টির আগমন ঘটাতে পারেন এবং তা আল্লাহ্র নিকট দুঃসাধ্য কিছু নয়।[৫৭]

---

৫৭. কোরান, ১৪, ১৯।

www.amarboi.org

বিংশ পরিচ্ছেদ

[কোন কোন নগর অন্য নগর অপেক্ষা বিশেষ শিল্পকর্মের দ্বারা চিহ্নিত হয়]

এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, নগরবাসীদের পরিশ্রম পরস্পরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে। কেননা সভ্যতার মৌল প্রকৃতিই হল পরস্পর সহায়তা। এ সহায়তা সম্পাদনে যে শ্রম নিয়োজিত হয়, তা বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ জনগোষ্ঠীর আয়ত্তাধীনে থাকে এবং তারাই তার জন্য যত্নশীল হয়ে তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মে দক্ষতা অর্জন ও তাকে তাদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। তার দ্বারাই তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ এবং আহার্য অন্বেষণ করে থাকে। কারণ নগরবাসী সকলেই উক্ত শিল্পের মুখাপেক্ষী এবং দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োজন অনুভব করে। অন্যদিকে যে সকল শিল্পকর্মের চাহিদা নগরজীবনে অনুপস্থিত, তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। কারণ তাতে দক্ষতা অর্জন বা তাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করায় কোনোপ্রকার উপকারিতা নেই।

এ সকল শিল্পকর্মের মধ্যে এমন অনেক শিল্প আছে, যা দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার অন্তর্গত এবং প্রায় প্রতিটি শহরেই পাওয়া যায়; যেমন সীবন শিল্প, লৌহশিল্প, কাষ্ঠশিল্প এবং অনুরূপ অন্যান্য শিল্প। এর মধ্যে আবার কতগুলো আছে যা বিশেষভাবে বিলাসব্যসন ও তার অবস্থা বৈচিত্র্যের জন্য প্রয়োজনীয়। এগুলো একমাত্র বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী নগরগুলোতে পাওয়া যায়। যেখানে জনজীবন নগর সংস্কৃতির অভ্যাস ও বিলাসব্যসনে পরিবৃত। যেমন কাঁচ শিল্প, রঞ্জন শিল্প, তেল শিল্প, রন্ধন শিল্প, তাম্রশিল্প, পিষ্টক শিল্প, শয্যা শিল্প, মাংস শিল্প এবং অনুরূপ অন্যান্য শিল্প। এদের মধ্যেও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। সুতরাং যে-কোনো নগরীর সংস্কৃতি অভ্যাস ও বিলাসী চাহিদার অনুপাতেই উক্ত শিল্পকর্মসমূহের মধ্যে কতিপয় এক নগরে এবং অন্য কতিপয় অন্য নগরে বিকশিত হয়ে থাকে। স্নানাগারসমূহকেও এ পর্যায়ে ধরা যায়; তারাও কেবল বৃহৎ ও বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী নগরগুলোতেই পাওয়া যায়। কারণ এগুলো ব্যবহারের জন্য বিলাসী মনোভাব ও সম্পদের প্রাচুর্য থাকা প্রয়োজন। এ কারণে স্নানাগার মধ্যমশ্রেণীর নগরগুলোতে পর্যন্ত পাওয়া যায় না। যদিও অনেক রাজশক্তি ও নেতৃবৃন্দ অনুরূপ কিছুর প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং স্নানাগারের পত্তন করে সচলও করে তোলেন, তথাপি যেহেতু সেখানে এগুলোর প্রতি সাধারণ মানুষের কোনো আকর্ষণ নেই, সেজন্য অতিসত্বর পরিত্যক্ত ও ধ্বংস হয়ে যায়। পরিচালনাকারীরা তা ছেড়ে পলায়ন করে। কারণ এরূপ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে তারা জীবিকা নির্বাহ বা কোনো প্রকার উপকার লাভ করতে সমর্থ হয় না। আল্লাহ্ সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রসারিত করেন।[৫৩]

---

৫৩. কোরান, ২, ২৪৫।

www.amarboi.org

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[নগর জীবনে গোত্রপ্রীতির অস্তিত্ব এবং নগরবাসীর কতকাংশের অপর কতকাংশের উপর প্রাধান্য বিস্তার]

এটা অতিশয় সুস্পষ্ট যে, মানুষ এক বংশধারার অন্তর্গত না হলেও তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সংযোগের স্বভাব বিদ্যমান। অবশ্য, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, এ সম্প্রীতি বংশধারাজাত সম্প্রীতি অপেক্ষা দুর্বল হয়ে থাকে। কারণ এর ফলে বংশধারাগত ঐক্যের একটি সামান্য অংশই লাভ হয়। নগরবাসীদের অনেকেই বৈবাহিক সম্পর্কেও ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে এবং পরস্পরকে তারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ও আত্মীয়তা সূত্রে আকর্ষণ করে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মধ্যে গোষ্ঠী ও গোত্রাদির মধ্যকার শত্রুতা ও বন্ধুত্বের অনুরূপ মনোভাব বিদ্যমান। এর ফলে তারাও নানা দলে ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় যখন সাম্রাজ্যের মধ্যে অবক্ষয় দেখা দেয় এবং দূরবিস্তৃত অঞ্চলগুলো থেকে তার ছত্রচ্ছায়া সংকুচিত হয়ে আসে, তখন নগরবাসীরা তাদের নিরাপত্তা এবং তাদের আঞ্চলিক স্বার্থ সম্পর্কে তৎপর ও যত্নবান হতে বাধ্য হয়। তারা মিলিত হয়ে পরামর্শ করে এবং উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থকে নিম্ন শ্রেণীর স্বার্থ থেকে পৃথক করে ফেলে এবং যেহেতু মানুষের স্বভাবের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের উচ্চাশা বিদ্যমান, সেই জন্য নেতৃস্থানীয়রা শাসকের দুর্বলতা ও সাম্রাজ্যের অসহায়তার সুযোগে অন্যায় হস্তক্ষেপের দিকে অগ্রসর হয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তার সঙ্গীর সাথে প্রতিযোগিতায় নামে এবং প্রত্যেকেই নিজ দল, পোষ্য ও চুক্তিবদ্ধ জনসমষ্টির নিকট থেকে সাহায্য ও আনুগত্য কামনা করে। তারা জনতা ও সাধারণের সমর্থন আদায়ের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে আরম্ভ করে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সহচরকে অতিক্রম করার চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত কারো না কারো প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অন্য সকলকে এর যোগ্যতা মেনে নিতে বাধ্য করে। সুতরাং তারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে হত্যা ও নির্বাসনের মাধ্যমে নির্মূল করতে চেষ্টা করে। এমনিভাবে তাদের মধ্য থেকে একটি কার্যকরী শৌর্য আত্মপ্রকাশ করে আক্রমণোদ্যত সকল নখরকে ভোঁতা করে ফেলে এবং সমগ্র নগর পরিবেশের উপর তাদের অন্যায় আধিপত্য বিস্তার পূর্ণ করে। তারা ধারণা করে যে, তার ফলে তাদের জন্য একটি নবীন রাজশক্তির ভিত্তি স্থাপিত হল, যা তাদের বংশাবলিতেও উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তাবে। সুতরাং এ ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে ও বৃহৎ সাম্রাজ্যের অনুরূপ উজ্জীবন ও অবক্ষয়ের সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে।

অনেক সময় তাদের অনেকেই বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারীদের ন্যায় জাঁকজমকের উচ্চাশা পোষণ করে। তারা যেমন গোত্র, জনগোষ্ঠী, গোত্রপ্রীতি, অভিযান, যুদ্ধবিগ্রহ, দেশ ও রাজ্যের অধিপতি হয়ে রাজকীয় বৈভব লাভ করেছে, এরাও তেমনি আড়ম্বরে তাদেরকে ভূষিত করে। এরাও সিংহাসনে উপবেশন করে, রাজকীয় পরিচ্ছদ তৈরি করে, বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য বাহন ব্যবহার করে এবং অঙ্গুরীয়, আদবকায়দা ও

www.amarboi.org

রাজকীয় অভিভাষণের দ্বারা একটি রাজবিভ্রমের সৃষ্টি করে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাদের এ প্রকার আচরণ একান্ত উপহাসযোগ্য। কারণ তারা এমন কিছু করেছে, যার কোনো যোগ্যতা তাদের নেই। একমাত্র সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও তাদের কিছু সংখ্যক আত্মীয়-স্বজনই তাদেরকে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করতে সুযোগ দিয়েছে এবং এর ফলে তারা একটি গোত্রপ্রীতির অধিকারী হয়ে উঠেছে। অবশ্য অনেকে এ অবস্থা থেকে সসম্মানে দূরে সরে দাঁড়ায় এবং সরলভাবে নিজেদের অসারতা অনুধাবন করে অপরের নিকট হাস্যাস্পদ ও বাতুল হবার পূর্বেই সরে পড়ে।

বর্তমানকালে হেফসী সাম্রাজ্যের শেষের দিকে আফ্রিকিয়ার জারিদ অঞ্চলে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। সেখানে তারাবলিস, কাতেস, তোজারা, নপ্তা, কফসা, বস্করা, যাব এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে পূর্বোক্ত উচ্চাশার প্রসার কয়েক দশক যাবত লক্ষ করা যাচ্ছে। তারা তাদের নগর কেন্দ্রগুলোতে প্রাধান্য বিস্তার করে সাম্রাজ্যের শাসন এবং রাজকোষের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছে। তারা সাম্রাজ্যের প্রতি একটি দৃশ্যমান আনুগত্য ও সন্তুষ্টি বজায় রেখে তাকে অত্যন্ত ভদ্রতা, সদাশয়তা ও বশংবদতার সাহায্যে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে। তাদের প্রকৃত অবস্থা এ বাহ্যরূপের সম্পূর্ণ বিরোধী। বরং বর্তমানে তাদের এ অন্যায় অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তীদের মধ্যে বর্তেছে। তাদের চরিত্রেও সেই স্থূলতা ও অহংকার দেখা দিয়েছে, যা সাম্রাজ্যাধিপতি ও তাদের বংশাবলির মধ্যে দেখা দিয়ে থাকে। তাদের অবস্থা-ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে সুলতানদের শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করে।

অবস্থা এভাবে চলবার পর আমাদের নেতা আমীরুল মোমেনীন আবুল আব্বাস এ অন্যায্য অধিকারের সমস্ত নিদর্শন বিলুপ্ত করে তাদের সকল ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন। তাঁর সাম্রাজ্যের ইতিহাস বর্ণনাকালে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করব।[৫৪] সিনহাজাদের সাম্রাজ্যের শেষের দিকেও অনুরূপ কিছু ঘটনা লক্ষ করা গিয়েছিল। সেখানেও জারিদ অঞ্চলের নগরসমূহের অধিবাসীরা অন্যায়ভাবে সাম্রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করেছিল। অতঃপর আল-মোহেদদের নেতা ও সম্রাট আবদুল মোমেন ইবনে আলী তাদের সকল ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন এবং তাদেরকে স্বস্ব অধিকার হতে মাগরিবের দিকে বিতাড়িত করেন। এর ফলে উক্ত অঞ্চল থেকে তাদের সমুদয় নিদর্শন বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন আমরা তাদের ইতিহাস বর্ণনার সময় উল্লেখ করব। বনি আবদুল মোমেন সাম্রাজ্যের শেষের দিকে 'সেবতা'তেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে।

সাধারণভাবে এ প্রকার অন্যায় হস্তক্ষেপ তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়, যারা নগরীর মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশ ও পদমর্যাদার অধিকারী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের নেতৃত্ব ও ক্ষমতার প্রভাব বিদ্যমান। অনেক সময় গোলযোগ সৃষ্টিকারী নিচে শ্রেণীর সাধারণ লোকের হাতেও এ অন্যায় অধিকারের ক্ষমতা এসে পড়ে। কারণ গোত্রপ্রীতি, সাধারণ সম্প্রীতি ও জনতার সমর্থনে সে এর যোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। এমন কিছু কার্যকারণ এসে একত্র হয়, যার অনুপাতে এরা গোত্রপ্রীতিহীন উচ্চ শ্রেণীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে বসে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ তাঁর সর্ব কর্মে বিজয়ী।[৫৫]

---

৫৪. রোজেনথালে আবুল আব্বাসের নামের উল্লেখ নেই।

৫৫. কোরান, ১২, ২১।

www.amarboi.org

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

[নগরবাসীদের ভাষা]

জেনে রাখুন, নগরবাসীদের ভাষা একমাত্র জাতি, প্রাধান্য বিস্তারকারী গোত্র এবং নগর পত্তনকারীদের ভাষাই হয়ে থাকে। এ কারণে বর্তমানকালে পূর্ব-পশ্চিমের সমুদয় ইসলামী সাম্রাজ্যাধীন শহরগুলোর ভাষা আরবি; যদিও মুজারী আরবি ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা ও তার কারক চিহ্নাদি বহুলাংশে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এর কারণ এই যে, ইসলামী সাম্রাজ্যশক্তি বিচিত্র জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায় এর অস্তিত্বকে যেমন রক্ষা করেছে, তেমনি রাজশক্তিরও বিকাশ ঘটেছে। অন্যান্য সকল জাতিই তার এ বিকাশ ধারায় উপাদান হিসাবে কাজ করেছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও আকৃতি সর্বদাই উপাদানের উপর অগ্রাধিকার লাভ করে। এ ক্ষেত্রে ধর্ম অগ্রাধিকার লাভ করেছে এবং তার ভিত্তি হল ধর্মীয় বিধান। তা যেহেতু আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং তার প্রবর্তক নবী (সঃ) ও যেহেতু আরবি ভাষাভাষী, এ জন্য তার অধিকৃত সকল রাজ্যে আরবি ব্যতীত অন্য সকল ভাষা পরিত্যাগ করা হয়েছে।

পাঠক, এ ব্যাপারে হজরত উমর (রাঃ)-র নিষেধাজ্ঞার কথা বিবেচনা করুন। তিনি অনারব বাগ্‌বিধি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলতেন, এটা ধূর্তামি অর্থাৎ কূটকৌশল ও প্রতারণা। সুতরাং ধর্ম যখন অনারব ভাষার সংশ্রব ত্যাগ করল এবং সমগ্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের ভাষা আরবি হয়ে দাঁড়াল, তখন সকল রাজ্যেই অন্য ভাষা পরিত্যক্ত বিবেচিত হল। কারণ মানুষ সর্বদাই শাসক ও তাঁর ধর্মকে অনুসরণ করে থাকে। এর ফলে আরবি ভাষার ব্যবহার ইসলামী নিদর্শন ও আরবের আনুগত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। সকল মানুষই সকল রাজ্যে তাদের বাগ্‌ধারা ও ভাষা পরিত্যাগ করল। আরবি ভাষাই তাদের ভাষা হল এবং ধীরে ধীরে তা সকল নগরে সকল রাজ্যে স্থায়ী হয়ে উঠল। অনারব ভাষাগুলোই বরং সেখানে অনুপ্রবেশকারী ও অপরিচিত ঠেকতে লাগল। অতঃপর আরবি ভাষা এই ব্যাপক মিশ্রণের ফলে তার বিধি ও অন্ত্য চিহ্নাদির ক্ষেত্রে বিকৃত হয়ে উঠল, যদিও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তার শক্তি তখনো বিদ্যমান। এভাবে পরিবর্তিত আরবি ভাষাকে সকল ইসলামী শহর-নগরে 'নাগরিক ভাষা' বলে আখ্যায়িত করা হল।

তদুপরি বর্তমানকালে নগরবাসীদের অধিকাংশই আরবদের সন্তান-সন্ততি। ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোতে তারাই এ সকল নগরের অধিপতি এবং তাদের বিলাস-ব্যসনের শিকারে পরিণত হয়েছিল। তারা তখন সংখ্যার দিক থেকে অনারবদেরকে

www.amarboi.org

কোণঠাসা করে নিজেরা তাদের উত্তরাধিকার ও ভূমির অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল। ভাষা যেহেতু উত্তরাধিকারের ব্যাপার; এজন্য পূর্বপুরুষদের ধারা অনুসারেই বর্তমানকালেও আরবি ভাষাই অবশিষ্ট রয়েছে। যদিও অনারবদের সাথে মেলামেশায় ক্রমশ তার বাগ্‌বিধিতে বিকৃতি দেখা দিয়েছে। এ কারণেই উক্ত ভাষাকে নাগরিক ভাষা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ শহর-নগরেই তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ। কেননা যাযাবরী জীবনের অধিকারী আরবদের ভাষা অনুরূপ নয়; তার আরবিয়ত্ব এখনও অটুট রয়েছে।

অতঃপর যখন তাদের পরে অনারব দায়লমী ও সলজুকীরা পূর্বাঞ্চলে এবং জানাতা ও বারবাররা মাগরিবে আধিপত্য বিস্তার করল, সমুদয় ইসলামী সাম্রাজ্যের উপরই তাদের প্রাধান্য ও রাজশক্তি স্থাপিত হল, তখন এ ক্ষমতা বিচ্যুতির ফলে আরবি ভাষা আরো বিকৃত হয়ে উঠল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মুসলমানরা যদি কোরান-হাদিসের প্রতি সমীহের ভাব পোষণ না করত, তা হলে তার অস্তিত্বই লোপ পেত। যেহেতু কোরান-হাদিস ব্যতীত ধর্মের সংরক্ষণ সম্ভবপর নয়, এজন্য তাদের ভাষার কল্যাণে অল্প করে হলেও আরবি কাব্য ও মুজারী বাগ্‌বিধির কিছুটা নগরগুলোতে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর তাতার ও মোঙ্গলরা পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করলে, তারা মুসলমান না হওয়ায়, আরবি ভাষার এই সহায়ক শক্তিটিই বিলুপ্ত হয়ে তা একেবারেই অপাংক্তেয় হয়ে পড়ল। এমনকি মুসলমানদের রাজ্যগুলোতেও তার চিহ্ন রইল না। ইরাক, খুরাসান, পারস্য, হিন্দু, সিন্ধু, মাওরায়ান্নাহার, উত্তরাঞ্চল, রোমদেশ—কোথাও এর অস্তিত্ব নেই। আরবি গদ্য ও পদ্যের যে ধারা প্রবাহিত ছিল, তা রুদ্ধ হয়েছে। শুধু আরবি জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় আরবি ভাষা শিক্ষার একটা প্রচেষ্টা বিদ্যমান এবং তাও আল্লাহ্ যাদেরকে এরূপভাবে আরবি ভাষা সংরক্ষণের ক্ষমতা অর্পণ করেছেন, তারাই করে থাকে।

অবশ্য আরবি মুজারী ভাষার অনেকখানি এখনও মিশর, সিরিয়া, আন্দালুস ও মাগরিবে বর্তমান। ধর্মের অস্তিত্বই এর কারণ। অবশ্যই তাও কতকাংশেই মাত্র সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু ইরাক ও তার পরবর্তী রাজ্যগুলোতে তার বিকৃতরূপ ও মূল, কোনোটারই অস্তিত্ব নেই। এমনকি আরবি গ্রন্থগুলো অনারব ভাষায় লিখিত হচ্ছে এবং পাঠদান কেন্দ্রেও অনারব ভাষাতেই তাদের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

আল্লাহ্ই সত্য সম্পর্কে অধিকতর অবগত। আল্লাহ্ই দিবারাত্রি নির্ধারণ করেন। আমাদের নেতা মুহম্মদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং তাঁর বংশধর ও সহচরদের উপর অসংখ্য অবারিত শান্তি সর্বদা মহাপ্রলয়ের দিবস পর্যন্ত বর্ষিত হতে থাকুক। সমস্ত প্রশংসাই নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিমিত্ত।

www.amarboi.org

ইবনে খালদুন

তিউনিসিয়ার
স্মারক ডাকটিকিট

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ Arnold J. Toynbee
মুকাদ্দিমা সম্পর্কে বলেছেন
"undoubtedly the greatest work of its kind
that has ever yet been created by
any mind in any time or place."

Bernard Lewis তার *The Arabs in History*
গ্রন্থে ইবনে খালদুনকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে
"the greatest historian of the Arabs
and perhaps the greatest
historical thinker of the Middle Ages"